দ্য স্পিরিট অব ইসলাম

স্যর সৈয়দ আমীর আলী

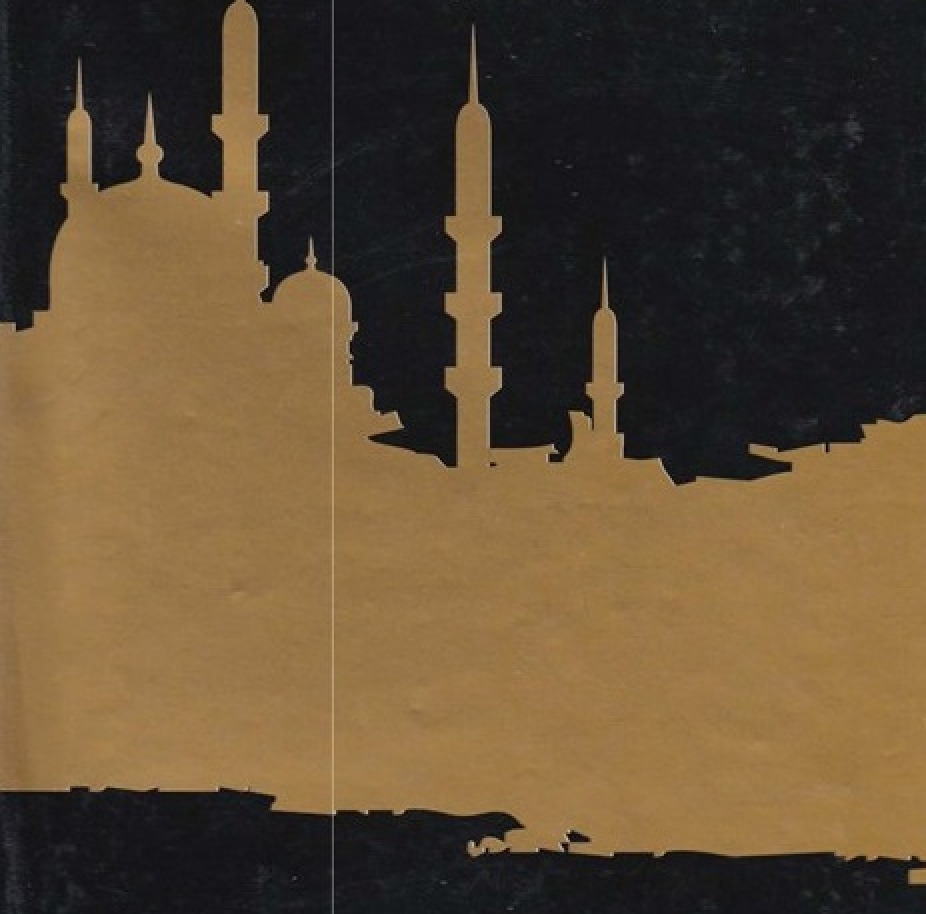

দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম

www.amarboi.org

স্যর সৈয়দ আমীর আলী

দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম

ভাবানুবাদ

খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান

প্রার্থনা তোর ঝরে পড়ুক সিরীয় বা হিব্রু ভাষায়
শিরটি তোর হোক না নত 'জবালকা' বা 'জবালসায়'।
তাতে কিবা যায় রে আসে
খোদার প্রেমের জোয়ারে তোর হৃদয় যদি নাহি ভাসে।
— সানায়ী

জ্ঞান বিতরণী

www.amarboi.org

©
প্রকাশক

জ্ঞান বিতরণী প্রথম সংস্করণ
একুশে বইমেলা-২০১২

প্রচ্ছদ

সুব্রত সাহা

প্রকাশক

মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম

জ্ঞান বিতরণী
৩৮/২-ক বাংলাবাজার মান্নান মার্কেট (৩য় তলা)
ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১৭৩৯৬৯

মুদ্রণ
নিউ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি. কে. দাস রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০

পরিবেশক
প্রফেসর বুক কর্ণার
১৯১, মগবাজার, ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা
আহসান পাবলিকেশন
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা

যুক্তরাজ্য পরিবেশক
সঙ্গীতা লিমিটেড, ২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

মূল্য
৪০০ টাকা U.S.$-15

THE SPIRIT OF ISLAM
By Sir Syed Amir Ali
Translated by **Khandakar Mashood-ul-Hasan**
Published By Mohammad Shahidul Islam
Gyan Bitaroni, 38/-2ka Banglabazar
Dhaka-1100, Tel : 7173969

ISBN : 978-984-90108-8-3

www.amarboi.org

ভূমিকার প্রয়োজন নেই তবুও ....

পূর্বোক্ত শিরোনাম দেখে অনেকেই চমকে যেতে অপ্রয়োজনকে অস্বীকার করার চেয়ে স্বীকার করায় বৈ কম নয়। কিন্তু তবুও আমাকে এই চরম সত্যকে মেনে নিতে আমি বাধ্য।

এ কথা কোনভাবেই অনস্বীকার্য নয়, *দ্য স্পিরিট অব ইসলাম* বইয়ের গ্রন্থকার স্যর সৈয়দ আমীর আলী সাহেব জাস্টিস আমীর আলীর চেয়ে লেখক হিসেবে অনেক উপরের স্তরে। তিনি ইসলাম সম্পর্কে ও আইন-বিষয়ক অনেক গ্রন্থের গ্রন্থকার যেগুলো সমগ্র বিশ্বের মুসলিম-অমুসলিম সুধী পাঠক তথা জ্ঞানপিপাসু গবেষক এবং ইতিহাসবিদদের পাঠকোচিত মনে সাড়া দিয়েছে নাড়া দিয়েছে তাঁদের জ্ঞানচক্ষুকে।

১৮৪৯ সনের ৬ এপ্রিল, হুগলি জেলার চুচঁড়ায় ইরান থেকে আসা এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত সি.আই.ই. খেতাবপ্রাপ্ত সৈয়দ আমীর আলী সাহেবের অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে, *এ হিস্ট্রি অব স্যারাসিনস, এ থিকস অব ইসলাম* মোহামেডান ল প্রভৃতি। মেধাবী ছাত্র সৈয়দ আমীর আলী এম.এ. উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন।

কিন্তু কিছুকাল পরেই স্বাধীনচেতা স্পষ্টবাদী সৈয়দ আমীর আলী চাকরি ছেড়ে দিয়ে আইন ব্যবসা শুরু করেন। এরপর স্কলারশীপ নিয়ে ১৮৭৩ সনের বিলেতের ইনার টেম্পল থেকে কৃতিত্বের সাথে ব্যারিস্টারি পাশ করে সেই বছরই নিজ দেশে ফিরে এসে হাইকোর্টে আইন-ব্যবসায় শুরু করে প্রভূত প্রসার জমিয়ে ফেলেন। ১৮৭৪ সনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। পরের বছর হয়ে গেলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। অপরদিকে, ১৮৮১ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে টেগোর ল'-এ প্রফেসর নিযুক্ত করে।

হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর জীবন ও নব্যুয়তের কার্যকালের যে রূপরেখা খুব অল্পসময়ের মধ্যে ইসলাম ধর্মকে যে দ্রুত লক্ষ লক্ষ মানুষের মন-মগজ ও বিবেককে অসাধারণভাবে প্রভাবিত করেছিল স্যর সৈয়দ আমীর আলী। তাঁর দ্য স্পিরিট অব ইসলাম বই-তে তা-ই বিস্তারিতভাবে বিবৃত করেছেন, ধারণা মতে, এই গ্রন্থ ইসলামি সাহিত্যে এক অনন্য গ্রন্থ।

এই গ্রন্থ পাঠান্তে পাঠক ইসলামের অভ্যুত্থান এবং এর বিস্তৃততার অনেক অজানা বিষয় জানবেন বলেই বাংলাদেশের পাঠকদের উদ্দেশে এই গ্রন্থের ভাবার্থ ক্ষাণিকটা পঠন-ঝামেলা থেকে পাঠকদের মুক্ত রেখে গ্রন্থনা এবং প্রকাশ।

গ্রন্থ প্রকাশনায় জ্ঞান বিতরণীর, *'জ্ঞান বিতরণী'*-ই বললাম। 'জ্ঞান বিতরণী' একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান হলেও এর স্বত্ত্বাধিকারী জনাব মোহাম্মদ সহিদুল ইসলাম

www.amarboi.org

বাংলাদেশে যেন নিজেই জ্ঞান বিতরণীর দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রকাশনা ব্যবসায় যে দুর্ভেদ্য আকাল চলছে তারমধ্যেও নিজের ধ্যান-জ্ঞান প্রকাশনায় নিয়োজিত করে নিজেকেই জ্ঞান বিতরণী বানিয়ে ফেলেছেন; আর এই জনাব সহিদুল ইসলামই এই গ্রন্থ প্রকাশনে প্ররোচিত করেন এবং নিজে বাংলাদেশের পাঠকদের হাতে এক 'অমূল্য রতন" এই বইটি তুলে দেয়ার দায়িত্ব নিলেন। এই সময়ে পাঠকদের হাতে গ্রন্থের গ্রন্থকার আমি নিজে বইটির প্রচারবাহুল্য কামনার্থে প্রুফরিডিং পেশায় জড়িত থেকেও সহিদুল সাহেবের অনুরোধে গ্রন্থটি গ্রন্থণা করেছি; আমাদের মূল উদ্দেশ্য গ্রন্থটি বিষয়বস্তু জ্ঞান বিতরণীর মাধ্যমে আরও মানুষ জানুক, এতে কোন বাণিজ্যিক ভাবনা বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিযোগিতা নেই।

আমরা সম্ভব উভয়েই সম্ভব হলে এই অমূল্য বইটি দুর্মূল্যের বাজারেও পাঠকদের হাতে তুলে দিতে অনিচ্ছুক ছিলাম না। কিন্তু বাঁধ সাধলো প্রকাশনা খরচ এবং নিজের আর্থিক অনটন, তবুও যথাসম্ভব কম বিনিময়ে পাঠকদের হাতে বইটি তুলে দিতে জনাব সহিদুল ইসলাম প্রয়াসী থাকলেন বলে আমি খুবই খুশি, সম্ভবত আপনারাও খুশি হবেন।

যাহোক, এই বইয়ের বিষয়ে, এই বই গ্রন্থনার বিষয়ে প্রকাশনার প্রসঙ্গে আরও অনেক কথাই বলা যায় তাতে "*ভূমিকার প্রয়োজন নেই তবুও....*" শিরোনামের ব্যাঘাত ঘটবে, পাঠকদের সময় নষ্ট হবে তাই সংক্ষিপ্তভাবে ইতি টানতে গিয়ে শুধু কামনা করি, এমন একটি গ্রন্থ গ্রন্থনায় ও প্রকাশনায় জনাব সহিদুল ইসলাম এবং আমার স্ত্রী শামীমা হাসান যে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের ভূমিকার যেন সর্বাঙ্গীন ফলোদয় হয় এবং আমার একমাত্র সন্তান খন্দকার শামস্ ইবতেহাজ জাহানের প্রজন্ম তো বটেই তার পরের পরের প্রজন্মও যে সেই প্রজন্মের কাছে বইটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে বইটিকে বাঁচিয়ে রাখেন। বইটির গ্রন্থকার খন্দকার মাশহুদ-উল-হাছান কারও কারও কাছে প্রিয়ভাজন হয়ে তাঁদের দ্বারা আদৃত হয়ে কখনো "মাসুদ হাসান" কখনো মাসুদাসান প্রভৃতি নামে পরিচিত হয়েছে আমাকে এই দেয়ার মাঝে তাঁদের মনে কোন বিকৃতভাব পোষিত হয়নি এবং আদৃততাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁদেরকে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, তাঁদের অনেকেই এখন এ দুনিয়ায় নেই বলে তাঁদের অনেকের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি। যাহোক, আমাকে আদর করে যাঁরা আমার নামকে ইচ্ছে করেই "মাসুদাসান" লিখতেন আমি এই ভূমিকাতে সেই নামটি ব্যবহার করলাম এবং আমার সকলরকম ভুলের জন্য সর্বমহলের নিকট ক্ষমা-প্রার্থনা করে নিলাম।

—গ্রন্থকার

প্রুফরিডার মাসুদাসান
সুমন'স এডুকেশন
১৯৩/এ, খিলগাঁও, তিলপাপাড়া
ঢাকা-১২১৯

www.amarboi.org

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

অবতারণিকা	১৭ — ৬৩
প্রথম অধ্যায় : রাসুল মুহম্মদ (সাঃ)	৬৪ — ৯৮
দ্বিতীয় অধ্যায় : হিজরত বা স্বদেশ ত্যাগ	৯৯ — ১০৭
তৃতীয় অধ্যায় : মদিনায় রাসুল মুহম্মদ	১০৮ — ১১২
চতুর্থ অধ্যায় : কোরাইশ ও ইহুদীদের শত্রুতা	১১৩ — ১২১
পঞ্চম অধ্যায় : কোরাইশদের মদিনা অভিযান	১২২ — ১৩৭
ষষ্ঠ অধ্যায় : মুহম্মদের ক্ষমাশীলতা	১৩৮ — ১৪৪
সপ্তম অধ্যায় : ইসলামের ব্যাপক প্রসার	১৪৫ — ১৫২
অষ্টম অধ্যায় : প্রতিনিধি প্রেরণের বর্ষ	১৫৩ — ১৫৯
নবম অধ্যায় : হযরতের নবুয়্যতের কার্যভার সম্পন্ন	১৬০ — ১৭১
দশম অধ্যায় : খিলাফতের উত্তরাধিকার ঃ ইমামত	১৭২ — ১৮০

দ্বিতীয় পর্ব

প্রথম অধ্যায় : ইসলামের আদর্শ	১৮৩ — ২০৩
দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামের ধর্মীয় মর্মবাণী	২০৪ — ২২৯
তৃতীয় অধ্যায় : ইসলামে পরকালের ধারণা	২৩০ — ২৪৩

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায় : ইসলামে অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ২৪৪ — ২৫৯

পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামে নারীর মর্যাদা ২৬০ — ২৯১

ষষ্ঠ অধ্যায় : ইসলাম ও দাসপ্রথা ২৯২ — ৩০০

সপ্তম অধ্যায় : ইসলামের রাজনৈতিক মর্মবাণী ৩০১ — ৩১৯

অষ্টম অধ্যায় : ইসলামে রাজনৈতিক দল ও উপদলসমূহ ৩২০ — ৩৭৯

নবম অধ্যায় : ইসলামের সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক মর্মবাণী ৩৮০ — ৪১৭

দশম অধ্যায় : ইসলামের বুদ্ধিবাদী ও দার্শনিক মর্মবাণী ৪১৮ — ৪৬২

একাদশ অধ্যায় : ইসলামের মরমীবাদী ও ভাববাদী মর্মবাণী ৪৬৩ — ৪৮০

www.amarboi.org

অবতরণিকা

এমন কোথাও নাই যেথায় তুমি নাই
আমি তো বিস্ময়ে দেখি তা-ই।

—বোহালি

তোমার খোঁজে "কুফর" "দীন" দুই-ই চলে
তুমি যে অদ্বিতীয়-এক, সে-কথাটিই বলে।

—সানায়ী

মানবজাতির ধর্মীয় অগ্রযাত্রায় যে ইতিহাস তা জানার জন্য মানবিক বিষয়ের শিক্ষার্থীদের রয়েছে এক আশ্চর্য রকমের কৌতূহল। জগতব্যাপী যে মহাপুরুষের সুমহান ইচ্ছা শক্তির প্রকাশ মানব মনের ক্রমাগত জাগরণ সাধন করেছে তা মানবজাতির অস্তিত্বে মিলে গিয়ে মানবাত্মাকে নিয়ন্ত্রণ ও বিকাশ করে চলছে। কিন্তু মানবজাতির এই বিকশিত ও নিয়ন্ত্রিত ধারণায় পৌঁছার আগে যে ক্লান্তিকর পথ-পরিক্রমা পেরুতে হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীর জন্য অনেক বিষয়। যেভাবে বা যে পথে মানবজাতি জড়বস্তুর উপাসনা থেকে আল্লাহর উপাসনার প্রতি ব্যাপৃত হয়েছে সেই পথে বারবার আঘাত এসেছে। মানুষ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় দিক থেকেই বারবার ছিটকে পড়েছে মূল গতিধারা থেকে। নিজমনের মন্দ তাড়নায় চলেছে। তারা আল্লাহর বাণী না শুনলেও আল্লাহর বাণী সর্বদাই ঝঙ্কৃত হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর মনোনীত নবী পাঠিয়েছেন। তিনিও সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহর আদেশ প্রচার করেছেন। এঁরা হলেন মূলত পয়গম্বর বা সত্যের বাণীবাহক। তাঁরা তাঁদের জাতির ভেতর থেকেই তাঁদের কালের সন্তান হিসেবেই জন্ম নিয়েছেন। পয়গম্বরগণ ছিলেন মিথ্যা, কৃত্রিমতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানবাত্মার জলন্ত দৃষ্টান্ত। সকল পয়গম্বরগণই তাঁর সময়ের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের মূর্ত-প্রকাশ। প্রত্যেকেই অধপতিত মানবগোষ্ঠী, পঙ্কিল জনসাধারণকে শুদ্ধ করে সঠিক ও উন্নতির দিশা দিতে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ হয়তো এসেছিলেন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে ক্ষুদ্র পরিসরের সাংস্কৃতিক শিক্ষক হিসেবে; কেউবা এসেছেন সমগ্র বিশ্বের

www.amarboi.org

জন্য সুসংবাদ নিয়ে—তাঁদের সংবাদ সকল জাতির জন্য—সমগ্র বিশ্বমানবের লক্ষ্যে প্রণীত। তাঁদেরই মধ্যে একজন হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (দঃ)।[১] শুধু আরবজাতির জন্য ধর্মপ্রচার করতে তিনি আসেননি। যেমনই তিনি আসেন নি কোন যুগ বা বিশেষ ভূখণ্ডের জন্য। বরং তিনি আল্লাহ্র বাণী নিয়ে এসেছেন "কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের সকল মানুষের জন্য"। এই মহামানবের উত্থান তাঁর নবুয়াতপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই। তাঁর জীবন এক প্রামাণ্য দলিল। তাঁর আবির্ভাব কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বিশ্ব ইতিহাসের এক অবিচ্ছিন্ন কাহিনী। তাঁর আবির্ভাব, সপ্তম শতাব্দীর বিশ্ব পরিস্থিতির জন্য একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সপ্তম শতাব্দীর আরম্ভ হয়েছিল মানবজাতির বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে। সেই বিচ্ছিন্নতা ছিল জাতীয়, সামাজিক ও ধর্মীয়। তাঁর অভিব্যক্তিসমূহ এমনই ছিল যে তা "ব্যক্তিগত উপাসনাকে পরিশুদ্ধকরণের দিকে" আধ্যাত্মিক গতিধারার পথে সকল বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন শক্তিকে একসূত্রে গাঁথার ব্যাপারে এক বিস্ময়কর ফলপ্রসূ হয়েছে। সে সময় ইহুদী ও খ্রিস্টধর্ম মূলতঃ প্রত্যাদেশ পাওয়ার পর্যায়ে চলে এসেছিল। জরথুস্ত্র, মুসা ও ঈসা যে বাণী প্রচার করে গিয়েছিলেন তা মানবজাতির ঐতিহ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না বললেই চলে। কলুষিত জরথুস্ত্রবাদ আরও কলুষিত খ্রিস্টবাদের সাথে কয়েক'শ বছর ধরে সংঘর্ষ করে আসছিল। যেজন্য মনুষ্যত্বের শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল এবং বিশ্বের কতগুলো সুখী জনপদকে রূপান্তরিত করেছিল যথার্থ বধ্যভূমিতে। বিশ্বের জাতিগুলোর জীবনী শক্তি নিঃশেষ করে চলছিল নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন জাতির বিরামহীন যুদ্ধ, চিরস্থায়ী আত্মঘাতী বিবাদ এবং তার বিরামহীন যুদ্ধ এবং তার সঙ্গে মুক্ত বিশ্বাস ও গোষ্ঠীর বিরামহীন বাক্-বিতণ্ডা। অন্যদিকে আল্লাহ্র কাছে আকুল ফরিয়াদ জানিয়েছিল বিশ্বের মানুষ, যেন তারা তাদের নির্জীব যাজকতন্ত্রের নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত হয়ে তাদের প্রভুদের অপকর্ম থেকে মুক্তি পায়। বিশ্ব ইতিহাসে একজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের প্রয়োজন এর আগে এত প্রবলভাবে বোধ হয়নি। সুতরাং নৈতিক জগতে হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর সফলতা সম্যকরূপে বুঝতে হলে ইসলামী বিধান ঘোষিত হওয়ার আগের বিশ্বের জাতিসমূহের ধর্মীয়ও সামাজিক অবস্থা নিখুঁতভাবে জানা প্রয়োজন। তাহলেই জানা যাবে, সেই কারণগুলো, যে মহা অশুভ শক্তিগুলি, এক সর্বব্যাপী মহাশক্তি "নিশ্চিত বিশ্বাসে"র জন্য যে একান্তিক দাবী যা গ্যালিলী নদীর তীরে অগাস্তাস সীজারের রাজত্বকালে একজন প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাবে সম্ভব হয়েছিল।

আরব ভৌগোলিকগণ ব্যাকটিরিয়ার সমতল মালভূমিকে যে উম্মুল বিলাদ' বা দেশসমূহের জননী বলে অভিহিত করেছিলেন তা যথার্থ ছিল। মানবজাতির সূতিকাগার, সকল ধর্ম ও জাতির মূল আবাসভূমি বলে ব্যাক্টিরিয়াকে মনে করা হয়। তুলনামূলক জাতিতত্ত্ব মানবজাতির শৈশব অবস্থার উপর যে ক্ষীণ, আবছায়া আলোকসম্পাত করেছে তার মাধ্যমে আমরা দেখি যে, বিভিন্ন বংশোদ্ভূত দল মানবজাতির এই আদিম আবাসভূমিতে মিলিত হয়ে ধীরে ধীরে পরিবার ও গোত্রে রূপান্তর হয়েছিল। এরপর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জনসংখ্যার চাপে এরা বসতি স্থাপনের জন্য বাধ্য হয়ে দলে দলে

www.amarboi.org

বিভক্ত হয়ে যায়। মোটামুটি যা বোঝা যায় তা হলো হেমিটিক শাখার লোকেরাই সর্বপ্রথম তাদের প্রাচীন আবাসভূমি ত্যাগ করে। উগ্রো-ফিনিসীয় গোত্র, যারা মূলত তুরাণী, এরাও হেমিটিকদের পথ অনুসরণ করে আবাসভূমি ত্যাগ করেছিল। অনুমান করা হয় তারা জাফেটিক বংশের একটি শাখা। তাদের কিছু কিছু লোক উত্তরদিকে এগিয়ে গিয়ে পরে পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা মানবজাতির বর্তমান মঙ্গোলীয় শাখার প্রতিষ্ঠা করেছিল। এদের অন্য আরেকদল পশ্চিমদিকে এগিয়ে গিয়ে আজারবাইজান, হামদান, ঘিনান—কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমের দেশগুলোতে বসবাস করতে থাকে। 'মিডিয়া' নামে এরা প্রাচীন ইতিহাসে সর্বাধিক পরিচিত। ব্যাবিলনের উর্বর সমভূমিতে এই দলের একটি অংশ বসবাস আরম্ভ করেছিল। এরা আগের হেমিটিক উপনিবেশগুলোকে দাসত্বের নিগড়ে বেঁধেছিল। সময়ের আবর্তনে এরা হেমিটিক জাতির লোকজনের সাথে মিশে গিয়ে আক্কাডিয়ান জাতি গড়ে তুলেছিল। আক্কাডিয়ান জাতিই ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে কুশাইজাতি বলে উল্লিখিত হয়েছে। এই মিশ্র জাতিই ব্যাবিলন প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারা এমন এক ধর্মের জন্ম দিয়েছিল যা উচ্চতর পর্যায়ে সর্বখোদাবাদের সমগোত্রীয়। এই ধর্মের নিম্নপর্যায়ে রয়েছে সর্বদৈত্যবাদ, সূর্যদেবতা ও চন্দ্রদেবতাদের পূজা, যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়েছে লিঙ্গ পূজা ও যৌনপ্রবৃত্তি, বল ও মলচের প্রতি সন্তান বলিদান এবং বেলটিশ ও অ্যাশটোরেথের কাছে কুমারী বলিদান। এই ধর্মেতিহাস এমন এক যুগের নির্দেশ করে যখন উচ্চ জড়সভ্যতা স্থূল ইন্দ্রিয়পরাণতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং নিষ্ঠুরতা লাভ করেছিল ধর্মের অনুমোদন।

এরপর সেমিটিক জাতি তাদের আদি আবাসভূমি ত্যাগ করে। তুরাণীয়দের পথ ধরে তারাও দেশ ছেড়ে পশ্চিম দিকে চলে গিয়ে মেসোপটিমিয়া ব-দ্বীপের উত্তর দিকে বাহ্যত বসতি গড়েছিল। দ্রুত তারা সংখ্যায় ও শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য অধিকার করে নেয় এবং সুদূরপ্রসারী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিল প্রতিবেশি রাজ্যগুলোর উপর। একেশ্বরবাদের গঠনমূলক ধারণায় এক সময় অ্যাসিরীয়গণ বিশ্বস্ত হয়েছিল। তাদের অপার্থিব পুরোহিততন্ত্রের রীতি এক সার্বভৌম ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট স্বীকৃতির পরিচয় দেয়।

যখন সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল ব-দ্বীপটির উপরিভাগে উপনিবেশিকদের প্রধান দল, তখন তাদের একটি ছোট দল চ্যাল্ডিয়ান রাজ্যের[২] সীমানার মধ্যে, উর নামক একটি জেলার অনেক ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। এই গোষ্ঠীর অধিপতি, যিনি নিজেই নির্বাসন ও ভ্রমণের জীবন বেছে নিয়েছিলেন, তিনি একাধিক ধর্মের পৌরাণিক কাহিনীতে স্থান পেয়েছিলেন, তিনিই ইতিহাসের ভাবী নির্মাতাদের জনকের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[৩]

ধারণা করা হয় জাফেটিক বংশই তাদের প্রাচীন বাসভূমিতে দীর্ঘকাল অবস্থান করেছে। মূল বংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন অন্যান্য বংশের লোকেরা সামাজ্যের পত্তন

www.amarboi.org

ও ধর্মমতের উদ্ভব ঘটাচ্ছিল তখন জাফেটিক বংশ নিজস্ব স্বকীয়তায় বিকাশ লাভ করছিল। কোন জাতি যদি একবার গতিশীল হয়ে যায় তখন তা আর থামে না। যে উদ্দীপনা বর্বর জাতিগুলোকে সক্রিয় করে, অনুপ্রাণিত করে তা হলো লোকসংখ্যার চাপ এবং প্রাচীন আবাসভূমিতে পশুচারণের অভাব বা যেকোন কারণই হোক তারা একের পর এক গোত্র পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রথমদিকের দলগুলোর মধ্যে ছিল পেলাজিসীয় ও কেল্ট। তাদের অনুসরণ করেছিল অন্যান্য গোত্রের লোকেরা। ঐ সময় পর্যন্ত আর্যগণ তাদের প্রাচীন আবাসভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এদের একটি দল বসত করতো বদখশানে, অন্যরা বাস করতো বলখের কাছাকাছি। এরা সেখানে কয়েকশ' বছর ধরে বিচ্ছিন্ন ছিল জাতিগুলো থেকে। তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ ও আন্দোলন করে অবিচল ছিল। ইতিহাসের যে আলো পাশ্চাত্য জাতিগুলো, রাজত্ব ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতাদের উপর পড়েছিল সেই আলোই জগতের এসব প্রাচীন অধিবাসীদের উপর ছায়াপাত করেছিল। যার জন্য অপ্রকাশ্য ও রহস্যের মধ্যে হলেও এটা সত্য যে অনেকগুলো গোত্র এই উপত্যকায় মিলিত হয়েছিল। এই গোত্রগুলো নিষ্ঠুর বর্বরতা ত্যাগ করে সার্বজনীন আদর্শের তাৎপর্যে সচেতন হচ্ছিল। যে-সব প্রাকৃতিক বস্তু পুজিত হতো ঐগুলোকে তারা ত্যাগ করে অগণিত আদর্শে অনুপ্রাণিত হচ্ছিল। তাদের কিছু আদর্শের সঙ্গে অনেক নৈর্ব্যক্তিক ও প্রাকৃতিক শক্তিসমূহে আরোপিত ব্যক্তিত্ব—আলো ও অন্ধকার এ দুটো নীতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। জীবন ও আলোকের উজ্জ্বল অগ্রদূত সূর্যকে তারা ঐশী সত্তা বলে গণ্য করেছিল। অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তুর সঙ্গে বর্তমান আদর্শিক যোগ সাধন করে একাকার করে তুলেছিল। ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসলো। দেখা গেল, গোত্র ও গোষ্ঠীর গঠনতন্ত্র রাজতান্ত্রিক কাঠামোতে বন্দী হয়ে গেল। ধীরে ধীরে কৃষিকার্য রূপান্তরিত হয়ে গেল পশুচারণ বৃত্তিতে। আদিম শিল্পকলা কর্ষিত হচ্ছিল, ধাতুর ব্যবহার আরম্ভ হয়ে গেল—সবচেয়ে বড় কথা সার্বভৌম ব্যক্তিত্বে উচ্চতর ধারণা তাদের মনে চেপে বসলো। এ সকল ব্যক্তিত্বের নাম বলতে গেলে বলতে হয় কাইউমুর, হোশাং ও অন্যান্য প্রাচীন নৃপতিদের নাম। এদের সম্পর্কে ফেরদৌসী তাঁর অপূর্ব লেখনীতে গুণকীর্তন করেছেন, তিনি মন্তব্য করেছেন, তারা এক ক্রমবর্ধমান সভ্যতার নমুনা। প্রকৃত আর্যদের মধ্যে যে রাজতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত তা আর্য-গোষ্ঠীর দুটি শাখার মধ্যে বিরোধের সমকালীন। ব্যাকটিয়ার আবাসভূমি থেকে এই বিরোধই তাদের পূর্ব শাখাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। একজন ধর্মগুরু পাশ্চাত্য আর্যদের মধ্যে একটা প্রবল ধর্মীয় বিপ্লব শুরু করেন। তিনি সিতমা-জরথুস্ত্র নামে তাঁর ধর্মের সাহিত্যে পরিচিত। এই আন্দোলনের পরিণতি হিসেবে যে ধর্মীয় বিরোধের শুরু হয় তা গোষ্ঠী ও ধর্মের শত্রু বলে বৈদিক স্তোত্র গায়কদের জমাটবাধা ক্ষোভের মধ্যে আরও কঠিনভাবে রেখাপাত করে। প্রকৃত আর্যদের দু'শাখায় বিভক্ত হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল মূলত রূপান্তরিত ধর্মের প্রতি বৈদিক স্তোত্রগায়কদের অন্ধ দৃষ্টিভঙ্গী। সম্ভবত মানবজাতির ধর্মীয় ইতিহাসের মধ্যে এই বিরোধই সর্বপ্রথম ধর্মীয় বিরোধ। পাশ্চাত্য দ্বৈতবাদী গোত্রসমূহ তাদের অর্ধ-বহুঈশ্বর,

www.amarboi.org

অর্ধ-সর্বেশ্বরবাদী ভাইদেরকে প্যারোপেমিসেডের ওপারে তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়। ভারতে প্রাচ্যের আর্যগণ জোরপূর্বক প্রবেশ করেছিল। আর্যরা প্রাচীন কৃষ্ণবর্ণ জাতিগুলোকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। হত্যা করেছিল বিনাদ্বিধায়। যেমনি আবদ্ধ করেছিল দাসত্বে, আর্যরা এই জাতিসমূহকে নিকৃষ্ট জীব, দাস মনে করতো। বৈদিক ধর্ম ও জরথুস্ত্র ধর্ম নিছক আপেক্ষিক। জরথুস্ত্রবাদ প্রাকৃতিক ঘটনার উপাসনাকে কারণের আরাধনায় রূপ দিয়েছিল। এ বেদের দেবদেবীকে দৈত্যদানবে এবং দেবদেবীর উপাসকদেরকে অবিশ্বাসীতে পরিণত করেছিল। অপরপক্ষে বৈদিক স্তোত্র গায়করা 'আহুরা'কে অনিষ্টের দেবতা ও আশুরাকে দেবতাদের বিরোধী শক্তি হিসেবে বর্ণনা করতো। আর জবরদস্তির উদ্দেশে আগুনঝরা অভিশাপ দিত। আজও রহস্যাবৃত প্রথম জরথুস্ত্রের জন্মকাল ও জন্মস্থান। অন্য আরেকজন শিক্ষকের আবির্ভাব হয়েছিল দারিউস হিসটাস্পের শাসনামলে। তিনি একই নামে প্রাচীন শিক্ষার ভিত্তিকে পুনরায় চালু করেন, তবে তা তিনি সংহত এবং সম্প্রসারিত করেছিলেন।

যদি পূর্বালোচিত ধর্মবিবর্তনের স্তরগুলি আমরা আলাপ আলোচনা করি তবে স্পষ্ট হয় যে, ভারতে আর্যদের অভিযান কয়েকশ' বছর ধরে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়েছিল। অভিযানকারীরা তাদের মাতৃভূমি থেকে যে প্রাচীন আর্যধর্ম বয়ে এনেছিল তা ছিল পূর্বপুরুষদের আত্মাকে পূজা এবং দৃশ্যমান নয়নাভিরাম ঘটনাবলীর মধ্যে রূপ দেয়া প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের অর্চনা করা। তাদের আধ্যাত্ম ধারণার উন্নতি হয়েছিল যখন তারা পাঞ্জাবে বসবাস করছিল। বেদ পাঠ করলে জানা যায়, এই আধ্যাত্ম অগ্রগতি ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে উপনিষদে এসে হিন্দুদের ধর্মীয় ধারণার উচ্চশিখরে উঠে আসে, এটাই আধ্যাত্মিক কৌতূহলের তীব্রতায় সর্বোচ্চ একেশ্বরবাদে পৌছে। উপনিষদে বলা হয়, মানুষের অন্তরে পরমাত্মা আসীন। আর এই পরমাত্মা সকল জীবের সংরক্ষক এবং সমগ্র সৃষ্টির অধীশ্বর। এ শিক্ষা থেকেই ভারতে চালু হয় জড়াত্মক সর্বেশ্বরবাদের ধারণা। পরিশেষে পরমাত্মা ব্যক্তিরা আত্মাকে অনন্তের মধ্যে বিলোপ সাধন করেন "যেমন সমুদ্র নদীকে নিজের মধ্যে মিলিয়ে নেয়। আর যখনই পরমাত্মা মানবাত্মাকে এভাবে মিলিয়ে নেয় তখন মানবাত্মা তার জাগতিক কাঠামোতে সকল অভিজ্ঞতায় চেতনা হারায়। কিন্তু মানুষের এগিয়ে যাওয়ার এই ইতিহাসে আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের প্রশ্নাতীত বীজ নিহীত রয়েছে যা দ্রুত ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়ায় বিপরীত স্রোত এনেছিল। কাজেই ভালভাবে এগিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান অবনতি ঘটেছিল বলে ইতিহাস সাক্ষী দেয়। উপনিষদ পৌরাণিক উপাসনার পথকে করেছিল প্রশস্ত, যেমনি করেছিল পৌরাণিক উপাসনা, তান্ত্রিক উপাসনার শক্তির কাছে নতি স্বীকার।

উপনিষদে যে একটি ধারণা বহুবার স্পষ্ট হয়েছে তা হলো ঃ বিভিন্নভাবে পরমাত্মা নিজেকে প্রকাশ করে। এই ধারণা অবতার প্রসঙ্গে ধারণার জনক। পাশ্চাত্য পৌত্তলিক জগতের দর্শন যেমন ব্যক্তিগত খোদার ধারণার প্রতি লৌকিক মনের আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করতে সমর্থ হয়নি, তেমনি প্রভু মানুষের মধ্যে বিরাজ করেন ও মানুষের সঙ্গে

www.amarboi.org

ভাবের আদান-প্রদান করেন উপনিষদের এই আস্তিক আকাঙ্ক্ষাও তেমনি মানব-হৃদয়ে স্থান করতে ব্যর্থ হয়েছে। অন্যকথায় ভারতের জনমনের আবেগকে স্পর্শ করতে পারেনি। যোদ্ধগোষ্ঠীর একজন সদস্যের মধ্যে বীর দেবতা দ্রুত আবিষ্কৃত হল যিনি অনেক আগে থেকেই পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে পড়েছিলেন এবং পার্থিব জীবনে অবতার হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে ঘটমান ধর্মীয় বিশৃংখলা প্রতিপক্ষ 'করালী কালীমাতা'র উপাসনার মতো বৈষ্ণবধর্মের সাধনপদ্ধতির বিবর্তনকে নির্দেশ করে। যেমনই নির্দেশ করে 'উপনিষদসমূহ' ও 'ভাগবত গীতা' যারা রচনা করেছিলেন সে-সব ব্যক্তিদের মানসিকতার পার্থক্যের নিদর্শনকে। 'ভাগবত গীতা' হলো ধর্মীয় সংগীত।[৪] জনসাধারণের চিন্তা ও অনুভূতির প্রতিচ্ছবি থেকেও সেই ব্যাপারে দৃষ্টান্ত মেলে। সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট যে, ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার অনেক আগেই পাঞ্জাবের আর্য উপনিবেশিকগণ বা তাদের পুরোহিত তথা ধর্মীয় শিক্ষকগণ এমন সব বিধান প্রণয়ন করেন যাতে বিজেতা ও বংশধররা পূর্বদিকে এগিয়ে দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী অভিযানে বিজিত ও দাসত্বে রূপান্তরিত জাতিগুলোর সঙ্গে মিশে না যায়। এসব নিম্নশ্রেণী ও দাসদের সংস্পর্শে আসা অপবিত্র বলে বিবেচিত হত। উচ্চবর্ণের লোকদের জন্য যে-সকল রীতিনীতি চালু ছিল তা নিম্নবর্ণের লোকদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল।

সর্বখোদাবাদের ক্ষেত্রে আর্য-হিন্দুদের চিন্তার জোয়ার-ভাটার মধ্যে মৃত পূর্ব-পুরুষদের আত্মাকে দেবতারূপে পূজার বিষয়টি ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থার অন্যতম অপরিহার্য অংশ হিসেবে হিন্দু মননে দৃঢ়ভাবে সংস্পৃক্ত ছিল। শুদ্রগণ তাদের মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য অর্পণ করতে অনুমতি পেত। কিন্তু এ ধরনের অনুষ্ঠানে কোন ব্রাহ্মণ কোন বড় রকমের দক্ষিণা ছাড়া অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করতো না। কোন শুদ্র যদি ব্রাহ্মণের বেদপাঠ লুকিয়ে শুনতো তবে সেই শুদ্রের কানে গলিত সীসা ঢেলে দিয়ে শাস্তি দেয়া হতো। লৌহ-শলাকা গরম করে গায়ে দাগ লগিয়ে দেয়া হত যদি কোন শুদ্র কদাচিৎ এবং হঠাৎ কোন ব্রাহ্মণের আসনে বসতো। যদি 'দ্বিজ' শ্রেণী অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর (তিনটি গোত্রের লোক) এবং শুদ্র শ্রেণীর মধ্যে বৈধ অথবা অবৈধ মিলন ঘটত, তবে তার জন্য নির্মম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হত—সংশ্লিষ্টদের সমাজচ্যুত করা হত। কোন আইন দিয়েই তাদের বিশ্বাস প্রভাবিত চিন্তা ও রীতিনীতি থেকে তাদেরকে দূরে সরাতে পারেনি। কালক্রমে আর্যপূর্ব গোত্র ও বংশসমূহের দেবদেবী হিন্দু দেবদেবীদের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এবং তাদের উপাসনা ও হিন্দুদের দৈনন্দিন উপাসনার অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। অসম বিকাশসম্পন্ন বিচিত্র বিশ্বাস ও পরস্পর বিরোধী প্রবণতাসমূহের সংমিশ্রণ হওয়ায় দার্শনিকগণ যুগ যুগ ধরে যে জটিল ও দুর্বোধ্য সর্বখোদাবাদের উদ্ভবের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাকে কলুষিত করে তুলেছিলেন।

শত শত সহস্র বছর ধরে ভারতবর্ষ যে রহস্য যবনিকার অন্তরালে আবৃত ছিল ইসলামের অনুসারীরা তা উন্মোচিত করার আগে এর কোন ইতিহাস ছিল না। আমরা

www.amarboi.org

জানতে পারি না বাসুদেব কৃষ্ণ কেমন ছিল এবং কখন জন্মেছিল। এমনসব অগণিত পৌরাণিক কাহিনীর জন্ম দিয়েছিলেন পুরোহিতরা। এ সকল পুরোহিতরা দেবতাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত না হলেও বিবেচিত হতেন সমকক্ষ হিসেবে। এ সকল আখ্যানগুলো উদ্ভট ও অকিঞ্চিৎকর বলে পর্যবসিত হয়েছিল। মূলত অশিক্ষিত জনগণের মন-মগজকে বিমোহিত করা ছিল এসব অলীক উপাখ্যান রচনার মূল উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্মে বিষ্ণু অবতার হিসেবে স্থান করে আছেন বাসুদেব কৃষ্ণ। এরই জন্য ভাকাত সীতার ভক্তিমূলক অংশে মূল চরিত্রে রয়েছেন বাসুদেব কৃষ্ণ। তিনি স্পষ্টত সংমিশ্র দেবতা। কৃষ্ণ অন্যতম নরনারায়ণ, তিনি আনন্দের প্রতীক—কৃষ্ণ রাখালদের সঙ্গে বাস করে বৃন্দাবনের বিখ্যাত কুঞ্জবনে আনন্দ সঙ্গিনী গোপীদের নিয়ে রঙ্গলীলায় মেতে থাকতেন।[৫]

বাসুদেব কৃষ্ণের ধর্মমতে মুক্তির উপায় হিসেবে পরম বিশ্বাস বিবেচিত হয়েছে। ভক্তের আচরণ যা-ই হউক কেন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশ্বাস তাকে চিরন্তন স্বর্গীয় শান্তির নিশ্চয়তা দেয়।

এখনও ভারতে চালু রয়েছে সেই সনাতন ধর্মের জন্ম দেয়া রীতিনীতি ও বিশ্বাস। যেহেতু ধর্মপরায়ণতা ব্যক্তির মনোসংযোগ থেকে, সেহেতু আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে কৃষ্ণরূপে অভেদ্য বলে মনে করা হতো। তাই কৃচ্ছসাধন প্রণালী সাধারণ লোকদের দৃষ্টিতে সর্বোত্তম ধর্ম-সাধন হিসেবে বিবেচিত ছিল। মানবদেহের একটি বিশেষ স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং মন শ্রীকৃষ্ণের উপর নিবিষ্ট করে নির্জনে দীর্ঘসময় অতিবাহিত করা, এক পায়ে দীর্ঘসময় দাঁড়িয়ে থাকা এবং বঁড়শিবিদ্ধ হয়ে চড়কে দোল খাওয়া ধর্মীয় কাজ বলে বিবেচিত হয়েছে। ধারণা করা হতো—তা সকল পাপ দূর করে দেয়। প্রায়শ্চিত্তকারীর আবাস ও দেবতার মন্দিরের মধ্যে যে দূরত্ব তা কোন ব্যক্তির দেহের দৈর্ঘ্য দিয়েই পরিমাপ করা হত পাপ স্খলন ও ব্রত পালনের ক্ষেত্রে। নিষ্ঠার সাথে 'ভাগবতগীতা' পড়া অথবা গঙ্গা বা অন্য কোন পবিত্র পানিতে স্নান করে নৈতিক নিয়ম লঙ্ঘনের অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া যায় বলে মনে করা হত।

হিন্দুজাতির বৃহত্তর অংশের উপর 'শক্তিধর্ম মতবাদ' আজ যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে তা কবে অর্জিত হয়েছিল সে কথা বলা সহজ নয়। "শক্তি" প্রত্যেক হিন্দু-ঈশ্বরের 'প্রকৃতি'—সৃজনধর্মী নারী শক্তির দিক। শিবের স্ত্রী 'শক্তি'। সে ছিল ভয়ঙ্করী দেবী—পার্বতী, ভবানী, কালী, মহকালী, দুর্গা, চামুণ্ডা, বিভিন্ন নামে অভিহিত। আনুমানিক খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে লিখিত ভবভূতির নাটকে যেভাবে চিত্রায়ন করা হয়েছে তাতে স্পষ্ট হয় যে, এই দেবীর পূজা নরবলি ও অন্যান্য বীভৎস আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হত। যে নামেই পূজিত হন আর অভিহিত হন না কেন 'শিবানীর মধ্যে দুঃখিনী মাতৃত্বের কোন ভাব নেই। আলেকজান্দ্রিয়ার উপাসকগণ বহু নামবিশিষ্ট "আইসিস' দেবীর সঙ্গে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি যে করুণা বা সহানভূতি-আরোপ করতো তা শিবানীর মধ্যে নেই। ক্ষীয়মাণ ধর্মীয় মনের এই বিস্ময় উৎপাদনকারী (ভয়ানক নয়) ধারণা স্পষ্টত আর্য-পূর্ব-বংশসমূহের কাছ থেকে ধার করা হয়েছে।

www.amarboi.org

মানুষের রক্তপাতে ছিল এই সকল আর্য-পূর্ব-বংশগুলোর আনন্দ। এরা মানুষের দুঃখ-দুর্দশায়-উল্লাস অনুভব করতো। এমন নিষ্ঠুর ইতিহাস পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মমতগুলোর মধ্যে নেই বললেই চলে, থাকলেও নিতান্ত বিরল। এমনকি রোমানদের মহাদেবী 'সিবেলী' ও সংহারিণী কালিমাতার মতো এত নির্মম নন কিংবা যন্ত্রণা দিয়ে এত বেশি আনন্দও পেতেন না। 'শক্তিধর্মের নিয়মপ্রণালী 'তন্ত্র', যাকে এই ধর্মের বাইবেল বলা যেতে পারে তার আচার ও নিয়মানুসারে এই দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। 'তন্ত্রের' অনেক স্তোত্র ভক্তিরসে ছিল আপ্লুত এবং দেবীর উদ্দেশে, তার করুণার প্রতি নিবেদিত ছিল প্রার্থনাগুলো। সাধারণ মানুষ 'তন্ত্রে'র মরমী অর্থকে উপাসনা হিসেবেই গ্রহণ করেছিল; দার্শনিকদের বেলায় তা যা-ই অর্থ করুক-না-কেন।[৬]

"পাণ্ডব ও কৌরবের যুদ্ধ" এবং "লঙ্কার রাজা কর্তৃক সীতা হরণ" ঘটনাকে উপাখ্যান করে রচিত দুটি প্রধান মহাকাব্য থেকে আমরা মোটামুটি সেই সময়ের জনসাধারণের ধর্মমত সম্পর্কে জানতে পারি। এই মহাকাব্য দুটিতে এমন একটি বিকাশপ্রাপ্ত সমাজের চিত্র পাওয়া যায় যেই সমাজে প্রভূত পার্থিব উন্নতির সাথে বিপুল নৈতিক অবক্ষয়ের নিদর্শন মেলে। ফলে বৌদ্ধধর্মের স্থপতি গৌতমের আবির্ভাবের অনেক আগে ভারতের জনগণের ধর্মীয় উপাসনা ও উৎসর্গ ও আহুতির যান্ত্রিক কার্যক্রমে রূপ নেয়—পুরোহিতদের পরিচালনা ছাড়া এই উপাসনা অনুষ্ঠিত হতো না, আর এই উপাসনা কার্যক্রমে উপসনাকারীর আচরণ বা ধর্মভীরুতার পরিবর্তে উপাসনা-পরিচালকের অন্তর-ছোঁয়া ইষ্ট-দেবতা-তুষ্টকারী ধর্মীয় আচার পালনের শক্তিই ধর্মীয় উপাসনার উৎকর্ষের মাপকাঠি ছিল। স্বার্থপর যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে গৌতম ও মহাবীরের বিদ্রোহ হিন্দু মননের স্বাভাবিক অভ্যুত্থান। এই দুই মহাপুরুষ বিশ্বজগতের নিয়ন্তা হিসেবে কোন সৃজনধর্মী নীতি ও সর্বদর্শী প্রজ্ঞাকে স্বীকার করেননি। তাঁরা জোর দিয়েছেন ব্যক্তি-জীবনের চূড়ান্ত বিলুপ্তির উপর। উভয়েই মানবজীবনের শান্তিপূর্ণ পরিসমাপ্তির জন্য কর্মফলের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে ব্রাহ্মণ্যধর্ম-জৈনধর্ম থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়নি এবং তা মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদের এক উপগোষ্ঠী, অন্যদিকে বৌদ্ধধর্ম সাহসিকতার সাথে একটি নতুন পথের উদ্ভাবন করেছিল। "কর্ম"কে বৌদ্ধধর্ম মোক্ষলাভের আশায় সর্বোচ্চস্থলে স্থান দিয়েছিল। আর এই ধর্মের মহান শিক্ষক বুদ্ধদেব তাঁর জীবনে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল এই ধর্মের মৃত্যুর পর মানব- জীবনের শেষ পরিণতির ধারণা। এই ধর্মের রহস্যময় মরমীবাদ দ্রুত অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছিল। তবে কিছুদিনের মধ্যে গৌরবময় অস্তিত্বলাভের পর নিজ জন্মভূমিতে বৌদ্ধধর্ম নিয়তির শিকার হয়েছিল। আর বিজয়ী ব্রাহ্মণ্যবাদ যে নিগ্রহ ও দুর্ভোগ এ ধর্মের ভাগ্যে নির্ধারণ করে দিয়েছিল তা দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের গায়ে খোদাই করা আছে। যাহোক, আমাদের এ কথা স্বীকার করতেই হচ্ছে যে, এই ধর্মের আদিম পরিকল্পনায় হিন্দুধর্ম তার অনুসারীদের প্রতি যে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল তা অনুপস্থিত ছিল। এই ধর্ম কখনও গঠনমূলক ধর্ম

www.amarboi.org

হিসেবে দাবী করতো না। আর এর 'পুরস্কার' ও 'নিয়ন্ত্রণ'গুলোও মরণোত্তর জীবনে শান্তিময় অবস্থানের প্রতিজ্ঞা, এ জীবনে কর্তব্য সমাধানের ব্যর্থতার শাস্তি ইত্যাদি এমন অস্পষ্ট ছিল যে, তা জনসাধারণের মনকে উদ্বেলিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে দ্রুত এই ধর্মকে বাইরের জগতের সাথে তার প্রতিযোগিতার মনোভাব অথবা যে ধর্মকে প্রতিহত করতে চেষ্টা করেছিল তা থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। অন্যদিকে কিছুদিনের মধ্যেই বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মে সৎকাজের জন্য অপেশাদার অনুসারীদেরকে প্রার্থনা চক্র উদ্ভাবিত করতে হয়েছিল। এই ধর্মের দুর্বল চেষ্টাকে তন্ত্রবাদের মাধ্যমে সম্পূর্ণতা দান করতে হয়েছিল। নিজ জন্মভূমিতে সবচেয়ে অনুকূল পরিস্থিতিতে এর ব্যর্থতা উদ্দীপনাময় ধর্মমত হিসেবে এর ভাগ্যকে চিরদিনের জন্য বিদায় করে দিয়েছিল। যদিও কিছু মরমীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধর্ম পশ্চিম এশিয়া ও মিশরের দার্শনিকদের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে দূর হওয়ার পর আবার প্রভুত্ব দখল করে নিল ব্রাহ্মণ্যধর্ম। যখন বুদ্ধদেবের ধর্মমত এদেশে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তখন যে অস্বচ্ছতার মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম সময় অতিবাহিত করছিল তার আধ্যাত্মিক ধারণাগুলোর মধ্যে কোন উন্নতি হয়নি। আর বুদ্ধদেব যে জীবনহীন বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তা দৃঢ়তর ভিত্তির উপর পুনরায় স্থান করে নিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্মের চালু করা নিয়মে নর-নারীর জীবন চলতে থাকলো। আগের চেয়ে ব্যাপকভাবে বলিপ্রথা জনজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকলো। এই যজ্ঞীয় ধর্মমত নরনারীর ইন্দ্রিয়ের কাছে অধিকতর আবেদন সৃষ্টি করেছিল এই আবেদন তাদের আবেগের কাছে ছিল, আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তির কাছে নয়। কতগুলো প্রাত্যহিক আচারে রূপান্তরিত হয়েছিল জনগণের ধর্মীয় উপাসনা। তারা "উপাসনা করতে থাকলো পুরোহিত, পিতৃপুরুষের আত্মাসমূহ এবং বিগ্রহের জন্য বৈদিক দেবতাগণকে"। আদিম বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে বস্তু-পূজাকে দার্শনিক হিন্দুধর্ম অথবা ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্ম কখনও ভারত উপমহাদেশ থেকে উৎপাটিত করতে পারেনি। এখন তা শিকড় গেড়ে বসলো সকল শ্রেণীর মানুষের অন্তরে; বংশদেবতা, গৃহদেবতা ও প্রাচীন দেবদেবীর প্রতীক প্রতিমাগুলো সঙ্গে বৃক্ষ, প্রস্তর ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বস্তু জনগণের উপাস্য দেবতায় পর্যবসিত হল। হিন্দুধর্ম সঙ্গতভাবেই মনুর-সংহিতার জন্য গর্ব বোধ করতো, যা পরবর্তী শতাব্দীগুলোর অন্যান্য পূর্বাঞ্চলের জাতিগুলোর আইন-সংক্রান্ত মতবাদগুলোর আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। যে সমাজে এমনটি হয়েছিল সে সমাজে পার্থিব সভ্যতায় প্রভূত অগ্রগতির সঙ্গে পুরোহিত শ্রেণীর সার্বভৌম প্রভুত্ব এবং জনগণের বিস্ময়কর নৈতিক অধঃপতন বিজড়িত। এ সময় পুরোহিতদের ন্যায় রাজাও দেবত্ব পেয়ে যায়। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে মনুর সংহিতা সশ্রদ্ধ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলো এবং চূড়ান্ত মিমাংসার ধারক হিসেবে বিবেচিত হলো। এ সময় "ধেয়ানী শিক্ষক," যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষ্য মনুর সংহিতার স্থান অধিকার করে নেয়। মনুর ন্যায় তাঁর মতেও বর্ণাশ্রম ছিল লৌহ-নিগড়ে বাঁধা এবং শূদ্ররা আগের মতো অপবিত্র শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভারতে নারী-শিশু হত্যা চলছিল প্রাচীন আরবদের মতো। কখন থেকে সতীদাহ প্রথা আরম্ভ হয়েছিল তার হদিস নেই। তবে এটা ঠিক যে সপ্তম শতাব্দীতে এই প্রথা চালু

www.amarboi.org

ছিল। মৃত্যু যদিও বেদনাদায়ক তবুও বিধবার কাছে তা-ই ছিল মুক্তির পথ। কেননা, বিধবা যদি নিঃসন্তান হতো তবে তার দুর্দশার অন্ত ছিল না।

বেদ-অধ্যয়ন কিংবা পূর্বপুরুষের আত্মাসমূহের উদ্দেশে বা দেবদেবীদের উদ্দেশে আয়োজিত নৈবেদ্য অনুষ্ঠানে নারীজাতিকে যোগদান করতে দেয়া হত না। স্ত্রীর একমাত্র ধর্ম ছিল স্বামী-সেবা। আর এই কর্তব্য পালনের নিষ্ঠার উপরই নির্ভর করতো তার চিরন্তন শান্তির বিষয়। যে সাধ্বী-স্ত্রী স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিতেন তিনি হিন্দুযুগের অনুসারীদের হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ সতীর আসনে অধিষ্ঠিত হতেন এবং প্রায়ই উপাসনার বিষয়বস্তুতে পর্যবসিত হতেন।

ধর্মের এই বাল্যসুলভ আচরণের মধ্যে চিন্তাশীল মন বের করেছিল এক গূঢ় তত্ত্ব। তাদের আত্মা ধর্মের যে অনুষ্ঠানের কথা চিন্তাবিদগণ প্রচার করতেন তার অনেক উর্ধ্বে উঠে যেত। একজন দার্শনিক কিংবা পুরোহিত সাধারণত একটি শিশুর চেয়ে অধিক পরিমাণে অসহায়, বিধবার নির্মম বলের দৃশ্যটিকে বিভীষিকার সঙ্গে অবলোকন করতেন না। সাধারণত নরনারীর সমন্বয়ে ধর্মীয় সংঘ গড়ে উঠত। তারা সবসময় যে কৃচ্ছসাধনার জন্য বিশিষ্ট ছিলেন তা কিন্তু নয়। বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসকগণ কর্তৃক অগণিত সন্ন্যাস-আশ্রম গড়ে উঠেছিল। তারা নিয়মমাফিক আশ্রমে মিলিত হতেন যেখানে মহিলাগণও সাধারণ সদস্য হিসেবে প্রবেশাধিকার পেতেন। এ সকল আশ্রমের লোকদের মধ্যেও এ সময় প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু ভ্রাতৃসংঘের মত স্বীকৃত কৌমার্য ছিল নামমাত্র, বাস্তব নয়, এই কৌমার্য-প্রথাকে লঙ্ঘন করাই যেন ছিল সম্মানের বিষয়। অসংখ্য ভিক্ষু-সন্ন্যাসীরা মন্দির ও মঠে-আরাম আয়াসে দিনাতিপাত করতেন। মধ্যযুগের মঠবাসী ভিক্ষু ও খ্রেস্টীয় যুগের অমার্জিত সংসারত্যাগীদের মতো অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তিদের দান থেকে পুরস্কার লাভের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াতেন। ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বদান্যতার প্রতি তাদের একমাত্র সুপারিশের মাধ্যম ছিল জটধারণ, অকর্তিত দাড়ি, গৈরিক বসন, ভস্মমাখা উন্মুক্ত দেহ এবং ভিক্ষুদের লাউ ও অন্যান্য সামগ্রী।

নাচগানে আসক্ত ছিলেন দেবতারা, তাই অনেকসংখ্যক নর্তকী বালিকা মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতো। কোনভাবেই তারা সন্ন্যাসী ছিল না, তাদের সেবা ধর্মশালার ব্যবস্থাপকদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। অত্যন্ত নিকৃষ্ট মর্যাদায় পতিত ছিল নারীজাতি। আর মনু যেভাবে নারীজাতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে তা শুধু খ্রিস্টান টারটুলিয়ানের ধর্মন্মোত্ত ঘোষণার সাথেই তুলনা করা যেতে পারে। মনু বলেন, "নারীজাতির রয়েছে কলুষিত ক্ষুধা" তারা দুর্বল নমনীয়তা ও মন্দ আচরণের অধিকারীণী। দিবারাত্র তাদেরকে অধীন করে রাখতে হবে।"

শুদ্র সম্প্রদায় প্রসঙ্গে তিনি রোমান প্যাণ্ডেক্টের ন্যায় বলেন যে, স্রষ্টা তাদের দাস করে সৃষ্টি করেছেন। আর এই সম্প্রাদায়ভুক্ত কোন লোককে তার প্রভু মুক্ত করে দিলেও সে স্বাধীন হতে পারে না; কারণ দাসত্ব তার স্বভাবদত্ত ও জন্মগত, এমন কেউ নেই যে তাদের তা থেকে মুক্তি দিতে পারে।

www.amarboi.org

যখন ইসলামের নবী বিশ্বমানবের কাছে তাঁর পয়গাম নিয়ে আসেন তখন আর্যজাতির সর্বাপেক্ষা মেধাবিশিষ্ট একটি অংশের জনগণের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপ।

এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হচ্ছে পারস্যের দিকে। এই দেশটি ইসলামের জন্মভূমির খুব কাছে। অন্যদিকে মুসলমানদের চিন্তাধারার উপর এই দেশ এত প্রবলভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল যে তা আমাদের আন্তরিক পর্যালোচনার দাবী রাখে। যদিও আমরা ইহুদী ও খ্রিস্টানধর্মের প্রভাব এদের কতটুকু আচ্ছন্ন করেছিল তা না-ও বলি। পশ্চিমের আর্যগণ দ্রুত একটি জাতিতে সংহত হয়ে ও নতুনভাবে আধ্যাত্মিক দিক থেকে বিকশিত হয়ে তাদের জন্মভূমির সীমানা পেরিয়ে আধুনিক পারস্য ও আফগানিস্তানের ভূ-খণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছিল। সম্ভবত তারা সেখানে যে হেমিটিক ও কুশাইট বংশসমূহের অধিবাসীরা ছিল তাদের অনেকাংশকে বিজিত তথা পর্যুদস্ত করেছিল। তারা ধীরে ধীরে কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে উপনীত হয়ে সেখানে একগুঁয়ে ও কষ্টসহিষ্ণু তুরাণীদের মিডিয়া ও মুসিয়ানায় সুপ্রতিষ্ঠিত দেখতে পায়। আগে যদিও তারা তুরাণীদের পরাভূত ও নিয়ন্ত্রণাধীন করেছিল, তবুও তারা কুশাইট অথবা অ্যাসিরীয়, খুব সম্ভব যে, অ্যাসিরীয় বংশের একজন অভিযানকারীর শাসনাধীন হয়ে পড়েছিল। এই অভিযানকারী ছিল ইস্পাত-কঠিন শাসক। তার এই দুর্দান্তপ্রতাপী শাসনে তারা বেশ কিছুকাল কাটিয়েছে।[৭] ইরাণ ও তুরাণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার আগে এই আগন্তুকদের তাড়ানো হল। ইরাণ-তুরাণ বিবাদ চলে শত বছর ধরে। এতে উভয়পক্ষের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। মেডিয়া ও সুসিয়ানায় তুরাণীদের আংশিক পরাভবের মধ্যদিয়ে তা শেষ হয়েছিল।[৮] আফ্রাসিয়াব ও কায়কাউসের অনুসারীদের কার্যক্ষেত্র ও দরবারে নিয়মিত যাতায়াত পারসিক ধর্মমতের উপর স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। ইরাণীদের অবিকশিত ভাববাদকে তুরাণীদের চরম জড়বাদী বিরোধিতায় কলঙ্কিত করতে ছাড়েনি। মিডিয়ার প্রাচীন অধিবাসীদের উপর ইরাণীগণ যখন তাদের ভাবধারা চাপিয়ে দিয়েছিল তখন এরা তুরাণীদের উপাসনা-পদ্ধতির কিছু কিছু নিজেদের উপাসনা-পদ্ধতির মধ্যে গ্রহণ করে নিয়েছিল। এমনভাবেই পারস্যে শুধুমাত্র অরমুজদের উপাসনা করা হত। তাছাড়া আহরিমানও নির্বাসিত হয়েছিল। সুনীতি ও কুনীতি উভয়ের অর্চনা হতো মিডিয়ায়। স্বাভাবিক কারণে আগ্রহী ছিল বিজেতা আর্যদের দেবতার চেয়ে তাদের প্রাচীন জাতীয় দেবতার প্রতি। অন্যদিকে জনসাধারণের উপাসনার প্রসঙ্গে আহরিমান বা আফ্রিসিয়াব অরমুজদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল।

মিডিয়া ও ব্যাবিলনের অধিবাসীদের রাজনৈতিক আঁতাতের সম্মুখীন হয়েছিল অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্য। আর এটাই ছিল ইতিহাসে এ ধরনের প্রথম ঘটনা। আর্য-অধিকৃত বহু অঞ্চলে আসুরের ধর্মের সুদীর্ঘ প্রভুত্ব জরথুস্ত্র-অনুসারীদের ধারণাসমূহের উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছিল। অরমুজরা তখন থেকেই দ্বিতীয় অসুর হিসেবে পূজিত হতে লাগলেন। পারসিকদের আলোকের দেবতা সর্বকালের প্রতীক হয়ে বিশ্বচক্রের মধ্যে আবদ্ধ

www.amarboi.org

পক্ষবিশিষ্ট যোদ্ধা বনে গেলেন। তাদের বিকাশের প্রতীক দীপাধারের মতো ডালাপালাবিশিষ্ট বৃক্ষ উর্ধ্বে উঠে দেবদারু বৃক্ষের মোচাকৃতি ফলে এসে শেষ হয়েছে— এই প্রতীক পারসিক ফারগাছের মোচার আকৃতি নিল। ফারিস্তানে সাইরাসের উত্থান ও তার বিজয়াভিযানগুলোর আগে আদিম প্রবাসী ও বসবাসস্থাপনকারীদের মধ্যে চালু প্রতীকধর্মী উপাসনা জনসাধারণের মধ্যে এসে অগ্নিপূজায় অবনমিত হয় অথবা চ্যাল্ডীয় অ্যাসিরীয় সাবাইজমে রূপ লাভ করে।

প্রায় সহস্র বছর ধরে আসুর মধ্যএশিয়া শাসন করেছিল। যার ব্যাপ্তি ছিল ভারতের প্রান্তসীমা পর্যন্ত এবং মিশর সাম্রাজ্য ফেরাউন সম্রাটদের কাছ থেকে বলপূর্বক অধিকার করে নিয়েছিল। ব্যাবিলন ও মিডের[৯] সম্মিলিত বাহিনীর কাছে শক্তিশালী সার্গন ও বৃহৎ সেনাচেরিবের শহর এমন পর্যুদস্ত হয়েছিল যে বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে দ্বিতীয়বার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। নিনেভার সাথে প্রাথমিক বিরোধের পর ব্যাবিলন অ্যাসিরিয়ার আশ্রিত রাজ্যে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। হাজার বছরের বিকশিত শিল্পকলা ও বিজ্ঞান এবং 'সংমিশ্রিত জাতি ও ধর্মসমূহ, মন্দির ও পুরোহিততন্ত্রে'র পরিণতি একত্রিত করেছিল। আর প্রাচীনকালের অজৈব ধর্মসমূহ এবং আধুনিক বিশ্বাসসমূহের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। অ্যাসিরিয়া অনেক কিছুই ধার করেছিল আদি অ্যাক্কাডিয়ানদের সভ্যতা ও সাহিত্যসহ তাদের ধর্ম থেকে। ব্যাবিলন আড়ম্বরপূর্ণ ঐশ্বর্যে উন্নীত হয়েছিল নিনেভার ধ্বংসাবশেষের উপর। ব্যাবিলন অ্যাসিরীয় ও চ্যাল্ডীয় ধর্ম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছিল। ব্যাবিলনের সাম্রাজ্য বিশাল ক্ষমতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল নেবুচাঁদ নেজ্জারের অধীনে। এ সময় জুডিয়ার পতন হয়। জিহোভার সাম্রাজ্যের পতনকে ব্যাবিলনের অশ্রুপাতের মাধ্যমে অভিষিক্ত করার জন্য জাতির কুসুমকে বন্দী করা হল। আরবে শক্তিশালী বিজেতা অভিযান চালিয়ে ইসমাইলীয়দেরকে পরাভূত ও প্রায় ধ্বংস করেছিল। সে তাইরিয়ানদের পর্যুদস্ত ও মিশরের ফেরাউনদের ধ্বংস করেছিল। হিব্রু প্রেমিকদের দ্বারা অভিশাপ স্তূপীকৃত করলেও ব্যাবিলনে মিশরের মতো অত কঠিন তত্ত্বাবধায়ক ছিল না।[১০] ব্যাবিলিনীয়দের উদার আচরণ সম্পর্কে ইসরাইলীরা নিজেরাই সাক্ষ্য রেখে গেছে। যিশুখ্রিস্ট যতদিন না তাঁর শক্তিশালী অতিথি সেবকদের নিয়ে বিধ্বস্ত শহর জয়ের জন্য সামনে এগিয়ে যাননি ততদিন পর্যন্ত ইসরাইল-সন্তানগণ ব্যাবিলনের বিরুদ্ধে তাদের কোন প্রতিবাদ জানায়নি। এরপরই অভিশাপের ঝড়-দুর্দশার ভবিষ্যদ্বাণীর তুফান সৃষ্টি করলো, যার মধ্যদিয়ে স্পষ্ট হলো প্রাচীন নির্মমতার বৈশিষ্ট্য। "ব্যাবিলনের নদীগুলোর তীরে আমরা বসতাম, হ্যাঁ, আমরা যখন জিউনকে স্মরণ করতাম তখন কাঁদতাম, ওহে ব্যাবিলনের কন্যা, যে তোমার ছোট ছোট সন্তানদেরকে পাথরে আছড়ে মারে সে সুখী হবে।"[১১]

ব্যাবিলন সমুদয় অস্তিত্বশীল সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল নেবুচাঁদনেজ্জারের অধীনে। শুধু সাম্রাজ্যের কাজেই এই দেশের পুরোহিতদের প্রভাব থেমে থাকেনি। ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মীয় ব্যবস্থার অভ্রান্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও ব্যাবিলনীয়

www.amarboi.org

ধারণাসমূহের বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। চ্যাল্ডীয় পুরোহিতদের মধ্যে ইহুদীদের দীর্ঘ নির্বাসন, হিব্রু ভাষা-ভাষীর কেউ কেউ ব্যারিবলনের রাজদরবারে যে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন এবং দুটি জাতির অবশ্যম্ভাবী সংমিশ্রণ পরবর্তী ইহুদী ধর্মের চরিত্র-রূপায়ণের দিকে শক্তি জুগিয়েছিল। ব্যাবিলনে ইহুদীরা এসেছিল অর্ধসভ্য জাতিরূপে। নির্বাসন থেকে দীর্ঘদিন নবিশি করার পর তারা ধর্ম ও মতবাদের দিক দিয়ে এগিয়ে যাওয়া নতুন জাতি হিসেবে জেরুজালেমের পার্বত্য এলাকায় ফিরে এলো। তখন তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল বহুমুখী এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সুদূরপ্রসারী।

ধর্মীয় বিকাশ শুরু হয়ে যায় ব্যাবিলন-বিজয়ের সাথে সাথেই। তখন থেকে দ্বৈতবাদের ধর্ম এশিয়ার সাম্রাজ্যকে অধিকার করে। সাইরাস ইহুদীদের প্রতি যে মহৎ সহনশীলতা দেখিয়েছিলেন তা স্বাভাবিকভাবে তাকে 'মসিহ' বা পবিত্র ত্রাণকর্তার মর্যাদায় উন্নীত করেছিল। হিব্রুগোত্রগুলোর বন্দীত্ব, পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানীর কাছাকাছি তাদের বাধ্যতামূলক বসবাস এবং সাইরাসের অধীনে পারসিকদের সাথে তাদের পরবর্তী সংমিশ্রণ দরিউসের হিসটাসাপিসের রাজত্বকালে জরথুস্ত্র-অনুসারীদের মধ্যে যে ধর্মীয় সংস্কার সাধন করেছিল সম্ভবত তাতে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল। এক্ষেত্রে ঘটেছিল পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। ইসরাইলীগণ উদ্ভাসিত এই জরথুস্ত্রবাদকে এক ঐশীসত্তার সর্বপ্লাবী ক্ষমতার গভীর ও স্থায়ী ধারণার সাহায্যে প্রভাবিত করেছিল। এরা ইরাণীদের কাছ থেকে আকাশ সম্পর্কীয় পারম্পর্য ও সৃষ্টিতে ভাল ও মন্দের দ্বৈতনীতি সম্পর্কীয় ধারণা লাভ করেছিল। তখন থেকে এদের মধ্যে এ ধারণা দৃঢ়মূল রূপ নেয় যে, স্রষ্টা অনিষ্টকারীদের রসনার মধ্যে মিথ্যাভাষী শক্তি প্রেরণ করেন না। আহরিমানের মতো শয়তান হিব্রুদের ধর্ম ও নৈতিকতার ইতিহাসে এই সময় থেকে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে থাকে।

যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে সাইরাসের রাজত্বকাল নির্ধারণ করা হয়, কিন্তু গঠনমূলক কাজের দ্বারা আদৌ তার রাজত্বকাল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল না। অরমুজদের কঠোর উপাসক হিসেবে তিনি তার সব বিজয় অরমুজদের কৃপা বলে বিবেচনা করতেন। তিনি প্রচেষ্টা চালিয়েছেন জরথুস্ত্রের ধর্মমতকে সর্ববিধ বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত করতে, যেমনই চেষ্টা করেছেন মিডিয়দের মাজীবাদের সুরক্ষিত দুর্গ ধ্বংস করতে এবং আর্য-অধ্যুষিত পারস্যকে সভ্য-জগতের নিয়ামক শক্তি হিসেবে টিকিয়ে রাখতে। কিন্তু কোন প্রচেষ্টাই অবক্ষয়ের গতিকে রোধ করতে পারেনি। একশো বছর যেতে-না-যেতেই জরথুস্ত্রবাদ শৈশবে যে-সব অনিষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল সেগুলি পুরোপুরি অধিগত করেছিল। পৌত্তলিকতার কেশাঘাতকারী, আপোষহীন প্রতিমাভঙ্গকারী তাদের আগুন-লাগা উদ্দীপনায় মিশরীয় এপিসে চালিয়েছিল হত্যাকাণ্ড; ধ্বংস করেছিল ধর্মমন্দির। এরপর তারা অরমুজদের উপাসনার মধ্যে তাদের অধীনস্থ রাজ্যগুলোর দেবতাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল। পুনরায় প্রাণ পেয়েছিল পুরাতন মাজীবাদী উপাদান পূজা এবং দরিউসের অব্যবহিত অন্যতম সহগামী আর্টাজারজেসমিনিমন জরথুস্ত্র অনুসারীদের মধ্যে মিশ্র-নারীপুরুষধর্মী

www.amarboi.org

মিথ্যা উপাসনা-চ্যাল্ডীয় মাইলিটা বা অ্যানাইটিসের পারসিক পরিপূরক, যার সহগামী লিঙ্গপূজা। মিথ্যা এই ধর্মমতের সুন্দর সূর্যদেবতার আড়ম্বরপূর্ণ উপাসনার রূপান্তর ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়। ফাটলবিশিষ্ট পর্বতের উপরে সমুজ্জ্বল সূর্য উঠছে, ষাঁড়কে তাড়া করছে তার বিবরে, আর মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে তার রক্ত—এই ধারণা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধর্মের উপর অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। রোমান সেনাদল এই মিথ্যা উপাসনাকে ইউফ্রেটিসের উপত্যকা থেকে ইউরোপের সুদূরপ্রান্তে বহন করে নিয়েছিল এবং ডায়োক্লিশিয়ানের রাজত্বকালে তা রোমের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পর্যবসিত হয়েছিল।

নারীজাতির অবস্থা মাজো-জরথুস্ত্র অনুসারীদের শাসনাধীনে যতদূর খারাপ ছিল, পরাধীনতার শৃংখলে যেভাবে শৃংখলিত হয়েছিল, যেভাবে পুরুষজাতির যতটা খেয়ালখুশীর দাসত্বে পরিণত হয়েছিল ততটা এর আগে-পরে কখনও কোথাও হতে দেখা যায়নি। মনু-সংহিতায় সতীত্বের কতগুলো নিয়ম চালু করেছিল এবং আদিম অসমবর্ণ বিবাহের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি, মানব-প্রবৃত্তির উপর দমনমূলক প্রভাব বিস্তার করেছিল। পারসিকগণ স্বেচ্ছাচার ছাড়া যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য কোন আইনের স্বীকৃতি দেয়নি। একজন অত্যন্ত নিকট আত্মীয়াকে একজন পারসিক বিয়ে করতে পারতো। আবার তার খেয়ালখুশীমত ত্যাগ করতে পারতো। শুধু পারসিক জাতির মধ্যেই নারীর বন্দীত্ব সীমিত ছিল না। নারীদের নির্জন-প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখতো আয়োনিয়ার গ্রীকরা। নারীদের প্রায়ই তালাবদ্ধ করে ঘরে আটকে রাখা হতো। বের হতে দেয়া হতো না। অনেক পরে গ্রীকের অবরোধ-প্রথায় মনুষ্যত্বের অঙ্গচ্ছেদন গ্রহণ করা হয়েছে। অনেক আগে থেকেই পারস্যে নপুংসকদের দিয়ে মহিলাদের পাহারা দেয়ার নিয়ম চালু হয়েছিল। গ্রীকে বিয়ের আগে অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষদের যৌন মিলন একটি সামাজিক প্রথায় রূপ নিয়েছিল। অন্যদিকে পারসিকরা লাম্পট্যকে উপাসনার সঙ্গে যুক্ত হতে দেয়নি। তারা প্রেমের দেবতার পূজা করতো না। জরথুস্ত্র অনুসারীদের সমাজেও এ ধরনের "নৈতিক মহামারী"[১২] ছিল না। পরবর্তী সময়ে গ্রীসের সেই পাপ-কর্ম রোমেও প্রবেশ করে। খ্রিস্টধর্মও সেই পাপ-প্রথাকে দূর করতে পারেনি।

বিশ্বের ক্রমবিকাশের সঞ্চালক শক্তি হিসেবে জরথুস্ত্রের অনুসারীদের শক্তি শেষ হয়ে যায় অ্যাকেমেনীয় সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে। ঘূর্ণি হাওয়ার মতো পারস্যের উপর দলন ক্রিয়া চালিয়ে যায় বিজেতাদের দল। ফলে সকল রকম সামাজিক ও নৈতিক জীবন হয়ে গিয়েছিল ধ্বংস। বিচিত্র বাহিনী ম্যাসিডনীয় অভিজেতাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল লেসার এশিয়ার সকল নীচ শ্রেণী যেমন, সিসিলীয় : টায়ারীয়, প্যামফিলীয়, ফ্রাইজীয় এবং অর্ধ-গ্রীক ও অর্ধ-এশীয় আরও অনেক জাতি, যারা কোন নৈতিক নিয়ম পালন করতো না, অভিজেতার অবিবেচক ও স্বেচ্ছাচারী মেজাজ সব মিলে জরথুস্ত্র ধর্মকে নিম্নস্তরে টেনে নামিয়েছিল। জাতীয় জীবনে প্রতিনিধিত্বকারী মোবেডদেরকে বিদেশীদের নিষেধাজ্ঞার অধীনে রাখা হয়েছিল, আর এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল এশিয়াকে হেলেনীয় কৃষ্টিতে প্রভাবিত করা।

www.amarboi.org

অল্পস্থায়ী ছিল আলেকজান্ডারের জীবন-প্রবাহ। যেমন অলীক কাহিনী তাঁর জীবনকে পরিবেষ্টন করে মহাকাব্যের সৃষ্টি করেছে তা ছেঁটে ফেললে তিনি এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত হন, যিনি বিশাল ধারণা ও প্রভুত্বব্যঞ্জক উদ্দেশ্য, হিমাদ্রির মতো সুউচ্চ আকাঙ্ক্ষার অধিকারী; যিনি প্রতিভা দিয়ে সমস্ত বাধা-বিপত্তিকে ভেঙে ফেলেছিলেন। তিনি ব্যক্তিত্বের বলে চারপাশের সকলের মননকে নিজের মতে এনেছিলেন। তবে তিনি নিজেই ছিলেন স্ববিরোধী। এ্যারিস্টটলের একজন শিষ্য ছিলেন আলেকজান্ডার। তিনি চেয়েছিলেন সমগ্র এশিয়াকে হেলেনীয় কৃষ্টি দিয়ে প্রভাবান্বিত করতে। দার্শনিক ও জ্ঞানী-ব্যক্তিদের সঙ্গী হয়েও বিদ্রোহী চরিত্রের আতিশয্য তাঁর জীবনকে হীনবল করেছে। আলেকজান্ডারের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং আলেকজান্ডারের প্রশংসা করেছেন এমন একজনের ভাষায়, "টায়ার অধিকার ও তার অধিবাসীদের দাসত্বে পরিণত করা, ভারত ও ব্যাকটিরিয়ায় ধ্বংস ও নিধন, ক্লাইটাসের গণহত্যা, ফিলোটাস ও বিশ্বাসী পারমেনিয়োর মৃত্যু-পরোয়ানা, পারসিপোলিসে অগ্নিসংযোগ ও একজন দেহোপসারিণীর প্ররোচনায় সেখানকার জমকাল গ্রন্থগার জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য ঐতিহাসিকগণ দোষক্ষালনের কোন অজুহাত খুঁজে পান না।" আলেকজান্ডারের বিজয় ও অ্যাকেমেনীয় বংশের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে জরথুস্ত্রবাদ হেলেনীয় মতবাদ ও চ্যাল্ডীয় সভ্যতার দুষ্টতম প্রথার কাছে নতি স্বীকার করেছিল। অনেক অলীক কাহিনীর নায়কের ব্যাবিলনের প্রতি চরম পক্ষপাতিত্ব, এই নগরীকে পুনরুজ্জীবিত করা ও একে অধিকতর শক্তিশালী এবং পূর্ণতর সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত করার উদ্বেগ ও ইচ্ছা সকল রকম ধর্মমত ও বিশ্বাস এবং সর্বপ্রকার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংগঠন যা তাঁর বৃহৎ অভিলাষের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল তা তাঁকে নিরুৎসাহিত করতে বাধ্য করেছিল। সেলুসিডার অধীনে নাগরিক অধিকার হরণের প্রক্রিয়া চলতে লাগলো। তাদের ও জরথুস্ত্র-অনুসারীদের কাছ থেকে জিহোভার উপাসকদের নির্মম পীড়নকারী এন্টিওকাম এপিফেনম "আহরিমান" খেতাব লাভ করেছিলেন। এমনকি জরথুস্ত্রবাদের অবনতি ও ধ্বংসেকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেছিল পার্থিয়ান শক্তির অভ্যুত্থান। সেলুসিডা শাসন করছিল টাইগ্রীস ও অরোনটাস অঞ্চল। অ্যাকেমেনীয় সাম্রাজ্যের মধ্যাংশে পার্থিয়ানগণ তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ ব্যাকটিরিয়া ও আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চলে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল গ্রীকো-ব্যাক্টিরীয় বংশ। চ্যাল্ডীয় ও হেলেনীয়বাদের সংমিশ্রণে উদ্ভাবিত ধর্ম ছিল সেলুসিডার রাষ্ট্রীয় ধর্ম। নিষেধাজ্ঞা জারী ছিল ইহুদী ও জরথুস্ত্র অনুসারীদের উপর, তাদের সমাজচ্যুত করা হত। পার্থিয়ান শাসনাধীনে মাজদীবাদ যদিও বাস্তবে নিশ্চিহ্ন হয়নি তবুও শাসকদের দৃষ্টির আড়ালে চলতে বাধ্য হত। যেখানে জরথুস্ত্রবাদ নির্বিবাদে ও প্রতিষ্ঠিত অবস্থায় বিরাজমান ছিল সেখানে তা মিডিয় ও চ্যাল্ডীয়দের প্রাচীন সেবীবাদের সংগে সংমিশ্রণ ঘটাতো। কখনো কখনো মতবাদ তার আদিম বিশুদ্ধতায় সঞ্জীবিত ছিল সেখানে তা কতিপয় পুরোহিতদের হৃদয়ের মধ্যেই ছিল আবদ্ধ। দেশের দুর্গম এলাকায় এ সকল পুরোহিত আশ্রয়

www.amarboi.org

নিয়েছিল। তবে পার্থিয়া সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হলে পার্থিয়ান নৃপতিগণ রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করার পর অত্যাচার সহ্যসীমার মধ্যে চলে আসে। আর বিশ্বের ধর্মগুলোর মধ্যে মাজো-জরথুস্ত্রবাদ আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। আর সাসানীয় রাজবংশের অভ্যুত্থান তাকে শক্তির আরেক জাদুমন্ত্রে মোহাবিষ্ট করেছিল। নতুন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মোবেডদেরকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে সমাসীন করেছিল। হায় একটি মরণোন্মুখ ধর্মবিশ্বাসের শেষ বিষণ্ন প্রতিনিধিগণ। সাসানীয় রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি পুনরুজ্জীবিত ধর্মের আশা-আকাঙ্খা তাদের চারপাশে পুঞ্জীভূত হয়েছিল। ইতিহাস বিচার করবে নতুন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আরডেশির বাবেকান (আটাজারজেস)-এর সমুজ্জ্বল অভিলাষ কতখানি কার্যকর হয়েছিল। পারস্যের রাজনৈতিক স্বাধীনতা পারস্যের অধিবাসীদের জাতীয় জীবন আবার চালু করেছিল। কিন্তু তার সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন এত বেশি অধঃপতিত হয়েছিল যে তা পুনরুজ্জীবিত করা শাসকদের সাধ্যাতীত ছিল। প্রাচীনকালে হয়তো পুঁথিগত শিক্ষার মধ্যেই শিক্ষার পরিধি সীমিত ছিল। যেগুলো জনগণের হৃদয়ে বিগতকালের গাশটাম্প বা রুস্তমের মতো প্রাণহীন অবস্থায় বিরাজিত ছিল।

ক্ষমতার শিখরে উঠতে পেরেছিল জরথুস্ত্র অনুসারীগণ সাসানীয় রাজবংশের শাসনামলে। তারা এশিয়ার সাম্রাজ্যের জন্য কয়েকশ বছর ধরে রোমের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছিল। বারবার তারা রোমের সৈন্যবাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছিল। লুঠতরাজ করেছিল নগরীগুলোতে, তার সেনাধ্যক্ষদের বন্দী করে নিয়ে এসেছিল। নৈতিক শক্তি হিসেবে নিভে গিয়েছিল জরথুস্ত্রবাদের অগ্নিশিখা। মন্দিরগুলোর উচ্চবেদীগুলো শুধু জরথুস্ত্রবাদের চিহ্ন বয়ে বেড়াতো। জাতীয় হৃদয়ে তার কোন উত্তাপ ছিল না। চাল্ডীয়ো-মাজিয়ান ধর্মমত প্রকৃত খোদার উপাসনার স্থান দখল করেছিল। আর্দেশির ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ যে প্রবল অসহিষ্ণুতার সঙ্গে প্রতিপক্ষ ধর্মমতের উপর জুলুম করেছিল তাতে তারা উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছে। পরবর্তী সাসানীয় নৃপতিদের অধীনে পারস্য সাম্রাজ্য বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতো। তবুও তা শুধু বিভিন্ন গোত্রকলহ ও বাদশাহদের স্বেচ্ছাচারিতা, আভিজাত্যের অধোগতি ও পুরোহিতদের দাম্ভিকতার জন্য অসম্ভব হয়েছে। দেবতার আসনে আসীন ছিলেন নৃপতিগণ। প্রজাদের জীবন ও সম্পদের উপর ছিল তাদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব—প্রজাদের অধিকার বলতে কিছুই ছিল না—তারা মূলত দাসে পরিণত হয়েছিল। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকে মাজদাক যখন সাম্যবাদ বা কমিউনিজম প্রচার করছিলেন তখন নীতিভ্রষ্টতা চরমে পৌঁছেছিল। সেই সাম্যবাদই এখন ইউরোপে পরিচিত। মাজদাক "আদেশ করেছিলেন সকল মানুষকে ঐশ্বর্য ও নারীর সহচর হতে, ঠিক যেমন অগ্নি, জল ও তৃণের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। ব্যক্তিমালিকানা থাকবে না, পৃথিবীর ভাল ও মন্দ সবকিছুই সে ভোগ করবে এবং সহ্য করবে।"[১৩] মাজো-জরথুস্ত্রবাদে আগেই স্বীকৃত ছিল বোন ও অন্যান্য রক্তের সম্পর্কযুক্ত নারীদের সাথে বিবাহের আইনগত বৈধতা। পারসিকদের মধ্যে উত্তম

www.amarboi.org

চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরও এই চরম সাম্যবাদের ঘোষণা প্রতিবাদমুখর করেছিল। হত্যা করা হয়েছিল জরথুস্ত্রের উত্তরাধিকারী হিসেবে এই মাজদাককে। তবে তার মতবাদগুলো শিকড় গেড়ে বসেছিল। তদুপরি পারস্য থেকে পাশ্চাত্য মহাদেশে বিস্তার লাভ করেছিল।

এ সকল মন্দনীতি নৈতিক জীবনের সকল রকম অধঃপতনের সূচনা করেছিল এবং নিজের পাপাচারে জাতির দ্রুত বিলুপ্তির ইঙ্গিত দিচ্ছিল। যদিও কেস্‌রা আনুশিরওয়ানের ব্যক্তিগত চরিত্রের ফলে কিছুকালের জন্য এই নিয়তি বিলম্বিত হয়েছিল। তবুও তাঁর মৃত্যুতে তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। তবে ইতিমধ্যে বিশ্বের একজন শিক্ষকের আবির্ভাব ঘটে; যিনি বিশ্বের সকল রকম পরিবর্তনের জন্য নির্ধারিত ব্যক্তিত্ব।

ইহুদীরা ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে তাদের ভাগ্যের অনেক সুদিন-দুর্দিন দেখতে দেখতে পার করলো দীর্ঘ এগারোশ' বছর। যে-সব বিপদসমূহ একের পর এক মুসার অধঃপতিত জাতির উপর আপতিত হয়েছে তা টিটাস ও হাড্রিয়ানের যুদ্ধগুলোতে পর্যবসিত হয়েছে। প্রাচীন রোম তাদের মন্দির ধ্বংস করেছে এবং অগ্নি-সংযোগে রক্তের বন্যায় একটি জাতি হিসেবে তাদের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করেছে। তাদেরকে খ্রিস্ট ধর্মাধ্যুষিত কনস্তান্তিনোপল সমান নির্মম আক্রোশে নিগৃহীত করেছে, তবে আগের দুর্দশা ও দুর্গতি থেকে তারা ভবিষ্যতের কোন শিক্ষাগ্রহণ করেনি। নির্মম নির্যাতনকারীদের হাতে নিস্পেষিত হয়েও তারা মানবতা ও শান্তির মূল্য বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে। মিশর, সাইপ্রাস ও সিরিনের শহরগুলোত তারা যে বর্বর নির্মমতার পরিচয় দিয়েছিল, সেখানে তারা বিশ্বস্ত স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার নজির দেখিয়েছিল তা তাদের ভাবী দুর্ভাগ্যজনক নিয়তির জন্য কারও মনে বিন্দুমাত্র করুণার সঞ্চার করেনি। সম্পূর্ণ ভরাডুবি হয়েছিল ইসরাইলদের আবাসভূমির। পৃথিবীতে তারা পলাতকের মত সর্বত্র আশ্রয় খুঁজে ফেরে। এত কিছুর পরও তারা সবখানে তাদের অদম্য অহঙ্কার ও অনমনীয় বিদ্রোহীভাব বহন করে চলেছিল। অসংখ্য প্রেরিতপুরুষদের নিন্দা করে প্রত্যাখ্যান করেছে। আশায় বুক বেঁধে এ জাতি পথ চলেছে। তবে সে আশা একদিকে শক্ত আপোষহীন ধর্মান্ধতা ও অন্যদিকে ইন্দ্রিয়পরায়ণ ভোগেচ্ছার সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছে। যিশুর আগমন-প্রত্যাগমন মূলত তাদের মধ্যে কোন প্রভাব রাখতে পারেনি। ত্রাণকর্তার ন্যায় তিনি যুগের সন্তান হিসেবে উদ্দীপিত হয়েছিলেন এবং তাঁর যুগে তাঁর প্রচারিত উপদেশ চলমান ছিল। জাতির এক চরম ক্লেশকর শ্রম-সাধনাকালে প্রণীত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিবেদক ড্যানিয়েলের গ্রন্থ যন্ত্রণা-পীড়িত জাতির জন্য শোকাভিভূত শিক্ষকের মনে গভীরভাবে ছাপ ফেলতে পারেনি। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী চরম গোঁড়া মনোভাবাপন্ন অধিবাসীদের প্রবল অসহিষ্ণুতা ইহুদীদের আচার-নিষ্ঠা, ফ্যারিসী-সম্প্রদায়ের উদীমন উদারনীতি, এসেনি গোষ্ঠীর স্বপ্নীল আশাবাদ বা একদিকে আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যদিকে বৌদ্ধ ভারতের দিকে বিস্তৃত ছিল, ভ্রমণশীল দরবেশের প্রচার ও প্রকাশ্য দোষারোপ যার জীবন হিরোডিয়ান কোর্টের নৈতিক অধপতনের কাছে বলিস্বরূপ—এসব যিশুর হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ইসল

www.amarboi.org

চক্ষু হৃদয়ধারী ইহুদীরা দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছিল এবং তার প্রাবল্য আকস্মিক পরিবর্তনের সব আশা খানচাল করেছিল। যীশুর বৈরাগ্য এবং স্রষ্টার সরাসরি কর্তৃত্বের মাধ্যমে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা তাঁর যুগের ফলশ্রুতি। যীশু এক উন্মত্ত ও দুর্বিনীত ধর্মান্ধ জাতির মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও প্রেমের বাণীবাহক হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি বিনয় ও শিষ্টাচারের পথ অনুসরণ করেছিলেন এক দাম্ভিক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতির মধ্যে। সরাসরি অনুসারীদের কাছে তিনি দয়ার্দ্র ও নরম হৃদয়ের মানুষ। সকলের প্রতি তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ তিনি রেখে গিয়েছিলেন এক সুউচ্চ আত্মত্যাগী মহামানবের দৃষ্টান্ত। তিনি বিদ্বেষ, ভীতি ও বিরোধ জাগিয়েছিলেন শক্তিমান, সম্পদশালী ও শাসকশ্রেণীর মধ্যে। অবজ্ঞাত, মূর্খ ও অত্যাচারিত দরিদ্রদের কাছে তিনি সুমহান ক্ষমাশীল হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে জগৎ-প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রেমের আবেগ জাগিয়ে দিয়েছিলেন। ইহুদীদের শক্তিশালী আশ্রয়স্থলে তিনি এক সূর্যকরোজ্জ্বল দিনে প্রবেশ করেন। তিনি আশাবাদী ছিলেন সেই প্রতিশ্রুত পয়গম্বরের ন্যায়। কিন্তু ধর্মান্ধ ইহুদীদের সাথে একপক্ষকাল অতিবাহিত করেও কোন ফল পেলেন না। বরং তাঁকে তাঁর কালের কায়েমী স্বার্থবাদীদের বেদীমূলে আত্মহুতি, দিতে হল।

যে সকল আখ্যান তাঁর মহাজীবনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে তা থেকে অন্তত এটুকু সুস্পষ্ট যে, তিনি জন্মেছিলেন দরিদ্রদের মধ্যে, আর তাদের মধ্যেই তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন। হিন্দুদের ধর্মমত সম্পর্কে তিনি গভীর জ্ঞান রাখতেন। তাঁর অল্প কিছুদিনের নবুয়্যত গ্রাম্য এলাকার সরল সহজ অধিবাসী—গ্যালিলির দারিদ্র্যপীড়িত কৃষককূল ও মৎস্যজীবীদের প্রতি অনেকাংশে নিয়োজিত হয়েছিল। তাঁর শিষ্যগণ দরিদ্র ও অশিক্ষিত লোক ছিলেন। তাদের বিশ্বাসপ্রবণতা এবং শিক্ষাগুরুর চিরবিদায় বা তাদের মনের উপর সুস্পষ্ট—অলৌকিক নয়—এমন যে কল্পনা বিস্তার করেছিল তা সত্ত্বেও তারা তাঁকে মানুষ ছাড়া অন্য কিছুই মনে করতেন না। যতদিন পর্যন্ত না পল তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সরাসরি দেখেছিলেন যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণের দৃশ্য। তাঁর আগে খ্রিস্টধর্মের মধ্যে খোদা বা ফিরিশতার অবতারতত্ত্ব প্রবেশ করেনি। যাজকতন্ত্রের একজন ঐতিহাসিক জানান, "পবিত্র আত্মার ধারণা প্রবেশের" অঙ্গীকার সংযুক্ত থাকলেও এটা অপরিহার্য বলে গৃহীত হয়েছিল যে, অধীত কলাসমূহে এমন পারদর্শী ব্যক্তি যিনি সুসমাচারের সংরক্ষক হবেন, তিনি নিজের দক্ষতার মাধ্যমে ইহুদী পণ্ডিত ও প্রাচীন বিধর্মী দার্শনিকদের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন। এই লক্ষ্য নিয়ে যীশু নিজেই স্বর্গালোক থেকে অলৌকিক বাণী সহযোগে তাঁর ধর্মের সেবায় ত্রয়োদশতম ধর্মপ্রচারক নিয়োগ করেন। যার নাম সল (পরে পল বলে পরিচিত) এবং যিনি ইহুদী ও গ্রীক বিদ্যা সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।"[১৪]

মাজো-জরথুস্ত্রবাদীরা বিশ্বাস করতো যে, এমন একজন ত্রাণকর্তা বা দেবদূত আবির্ভূত হবেন যিনি পূর্বদেশ থেকে আসবেন। বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করতেন কুমারীর

www.amarboi.org

গর্ভজাত ঈশ্বর-অবতারে; আলেকজান্দ্রিয়ার মরমীবাদীরা পবিত্রাত্মা এবং মানুষ ও খোদার মধ্যবর্তী সত্তার প্রচার করতেন। ওসিরিসের জন্ম, মৃত্যু ও পুনরুত্থান বিষয়ে গুহ্য ধারণা, আইসিস-সিরিসের ধারণা—কুমারীমাতা "তার হাতে সদ্যোজাত সূর্যদেবতা হোরাসকে ধারণ করে আছেন"[১৫]—এই ধারণাসমূহ মিশর ও সিরিয়া উভয় দেশে চালু ছিল। ফ্যারিসি ও পণ্ডিত পল তাঁর কালের অর্ধ-মরমী ও অর্ধ-দার্শনিক মতবাদের দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। স্ট্রস জানিয়েছেন যে, স্বভাবগতভাবে পল একজন স্বপ্নবিলাসী ও গভীরভাবে আগ্রহশীল ছিলেন এবং দৈহিক ব্যাধি থেকেও তিনি মুক্ত ছিলেন না। কখনও তিনি যিশুর সরাসরি সংস্পর্শে আসেননি। তিনি যিশুর প্রতি সহজে ঐশী অবতারত্ব—ফিরিশতা অবতারত্বের দিকে ঝুঁকেছিলেন। তিনি যিশুর সহজ শিক্ষার মধ্যে প্রজ্ঞা-বিষয়ক মতবাদ এবং দূর পূর্বদেশ থেকে অনুকৃত ত্রিত্ববাদের ধারণাসমূহ নব্য-পিথাগোরীয় মতবাদের অধিকাংশ নীতিগুলোকে প্রবেশ করিয়েছিলেন।

নিজদেশে ও পরদেশে ইহুদী ও ইহুদী বিরোধী দলের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষ দু'জন ধর্মপ্রচারক পিটার ও পলের[১৬] সুবিদিত অথচ অদ্ভুত বিতৃষ্ণার মধ্যে পরিদৃষ্ট। ধারণা করা হয়, এবিওনিটগণ নাজারাথের প্রেরিত পুরুষের আসল সহচরদের ধর্মবিশ্বাসসমূহের প্রতিবেদন করতো। তাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত তিনি তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং "বৌদ্ধিক ও জৈবিক জীবনের সব ক্রিয়াই" তাদের কাছে একই ধরনের মনে হত। শৈশব থেকে কৈশোরে এবং কৈশোর থেকে যৌবনে তারা তাঁকে পদার্পণ করতে দেখেছেন অবয়ব ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিকাশিত হতে দেখেছেন। তাঁকে তারা দেখেছেন একজন মানুষ হিসেবে, আর এই মৌলিক বিশ্বাসের ফলেই মধ্যবর্তী পর্যায়ের জাতিসমূহের অধঃপতন ঘটেছে ডোসেট, মারশেসিট, পেট্রিপেশিয়েন[১৭] এবং ৩২৮ খ্রিস্টাব্দে নাইসের কাউন্সিলে গৃহীত সিদ্ধান্ত পর্যন্ত অন্যান্য মতগোষ্ঠীর প্রভাবে এসব মত নিরবচ্ছিন্ন এক অধঃপতন—শৃংখল সৃষ্টি করেছিল। ঈশ্বরত্বে স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষ বিশ্বাসপ্রবণ ছিল। বিশেষভাবে পয়গম্বরকে যারা দেখেননি, তাঁর বিনয়, তাঁকে দৈনন্দিন জীবন প্রত্যক্ষ করেননি এমন লোকদের বেলায় ছিল বিনাপ্রশ্ন ও বাক্য ব্যয়ে।

যিশু যে-সময় তাঁর ধর্মমত প্রচার আরম্ভ করলেন, সে-সময় ইউরোপের অর্ধেকের চেয়েও বেশি, উত্তর আফ্রিকার প্রায় সমগ্র আর পশ্চিম এশিয়ার এক বিশাল অঞ্চল রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর পরের শতাব্দীতে এই বিশাল এলাকা দৈবক্রমে খ্রিষ্টধর্মের শস্যক্ষেত্র এবং বিরোধী গোত্রগুলোর সমরক্ষেত্রে রূপ নিয়েছিল।

ফ্রাইজীয় সীবিল[১৮]-কে রোমে আনার একশো বছর আগে আলেকজান্ডারের সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান ও সম্ভবত সর্বাপেক্ষা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সেনাধ্যক্ষ টলেমি সটার মিশরের প্রভু হয়ে বসলেন। মিশরী ও গ্রীকদের একটি সাধারণ ধর্মের ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করে একটি সমন্বিত জাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে তিনি এমন একটি উপাসনা-ব্যবস্থার চালু করেন যার অনুশীলনের মাধ্যমে দুটি জাতি একত্রে সমান্তরাল গতিতে চলতে পারে। দুই হাজার বছর পর সম্রাট আকবরের মনে একই ধারণা উদিত হয়েছিল। আকবর

www.amarboi.org

যেখানে ব্যর্থ হয়েছিলেন টলেমি যেখানে সফল হয়েছিলেন। কেননা, অবস্থা ছিল তাঁর অনুকূলে। জিউস, ডিমিটার এবং এপোলো বা ডায়োনিমাসের উপাসনা করতো গ্রীকরা। অন্যদিকে, মিশরীয়রা উপাসনা করতো ওসেরিস, আইসিস ও হোরাসের। উভয়ের ক্ষেত্রে ত্রিত্ববাদ ছিল সাধারণ যোগসূত্র। মিশরীধর্ম পুত্র হোরাসের প্রবৃত্তি ও পুনরুজ্জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত, আর গ্রীকধর্ম ডায়ানোমিসের প্রবৃত্তি ও পুনরুজ্জীবনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। গ্রীকরা ইলিউসিয়ান রহস্যবাদ গ্রহণ করেছিল সকল রকম দীক্ষা ও যোগমূলক মরমী আচার-ব্যবস্থায়। অন্যদিকে আইসিসের অনুরূপ তাৎপর্যপূর্ণ আচার মিশরীয় পুরোহিতগণ পালন করতো। দেবতাগণ কার কাছে কিভাবে পূজিত হচ্ছেন তা তাদের কোন ভাবনার বিষয় ছিল না। ধর্মীয় মূল ধারণার মধ্যে গরমিল দেখা না দেয়া পর্যন্ত তারা দেবতাগণের নাম ও পূজার পদ্ধতির ব্যাপারে উদাসীন থাকতো। মহান ফ্রানসিস্কান ধর্মমতের ধারণার উদ্ভব এভাবেই ঘটেছিল। গ্রীকদের মধ্যে জিউসের স্থান দখল করেছিল সিরাপিস। অন্যদিকে মিশরীয়দের মধ্যে ওসেরিসের স্থান। আলেকজান্দ্রিয়ান ধর্মমতের অনুসারীদের কাছে আইসিস "দুঃখিনী মাতা" হয়েছিলেন। আর ডিমিটারকে স্থানচ্যুত করে হোরাস হোপোক্রেটস ডায়োনিসাসের প্রতি এখনও পর্যন্ত নিবেদিত ভক্তি ও পূজা গ্রাস করেছিলেন। ধারণা করা হয়, এই দেবতা এশিয়া মাইনরের উপকূল অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে তাঁর প্রভাব হারাননি। মানুষের মধ্যে একজন দেবতা বাস করেছিলেন, ক্লেশ ভোগ করেছিলেন এবং মারা গিয়েছিলেন এই প্রচলিত ধারণা পরের শতাব্দীগুলোতে খ্রিস্টধর্মের বিস্তারকে সহজ করে তুলেছিল।

তার সঙ্গীর ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দিয়েছিল তার মহিমা। তাদের সেই উপাস্য ছিল আইসিস, আইসিসের উপাসনায় তারা মত্ত থাকতো। কথিত আছে যে, যীশুখ্রিস্টের জন্মের আশি বছর আগে এই ধর্মীয় উপাসনা পদ্ধতি রোমে আনা হয়েছিল। জনসাধারণ, কৃষক জনতা এই কল্পনায় অধিকৃত হয়ে পড়েছিল। এই ধর্মের আড়ম্বরপূর্ণ আচার, মস্তকের উপরিভাগ ও দাড়িমুণ্ডিত পুরোহিত, সাদা কাপড় পরিহিত তরুণ ক্ষুদ্রদীপ বহনকারী পুরোহিতের সহকারী, আবেগ জাগরিত করে এমন আয়োজনের অভাবশূন্য ভাবগম্ভীর মিছিল, ওসেরিস-হোরাস ক্লেশভোগ ও মৃত্যুতে আবেগপ্রবণ শোক প্রকাশ, তাঁর পুনরুজ্জীবনে উন্মাদের মতো আনন্দ প্রকাশ, মরমী তাৎপর্যসহ রহস্য, দীক্ষা, সর্বোপরি অবিনশ্বর প্রতিজ্ঞা সব মিলে এমন একটি জগতের প্রতি তীব্রভাবে আবেদনশীল হয়েছিল, যার প্রাচীন দেবতাগণ ছিলেন মূক এবং যে জগৎ বিশ্বের শাশ্বত সমস্যার কাছাকাছি আসার জন্য উদগ্রীব হয়েছিল। আইসিস রোমকদের হৃদয়ে শক্তিশালী আসন গেড়ে বসেছিলেন, এতে বিস্ময় অনুভব করার কিছুই নেই।[১৯]

যদিও ভাগ্যহীনদের উপর মায়ের মধুর স্নেহবর্ষণকারী, আইসিসের উপাসনা কখনও তার অনুসারীদের উপর প্রভাবহীন হয়নি, তবুও মিথ্যার অধিকতর বীর্যবান ধর্মমত তার মরমী আচার, প্রায়শ্চিত্তের মতবাদ, মানবতাসহ তার দেবতার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের উপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদানসহ, মনোহর সূর্যদেবতা রোমান সৈনিকদের মধ্যে অনুকূল আসন

www.amarboi.org

লাভ করেছিলেন। যে জায়গায় রোমক সৈনিকরা ছাউনি গেড়েছে, সে জায়গায়ই তারা তাদের উপাস্য দেবতার স্মৃতিচিহ্ন গেঁথে রেখেছে।

খ্রিস্টধর্ম নিজ পতাকাতলে একত্রিত করা ও সারা মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করার যে সর্বোত্তম ও নিরঙ্কুশ দাবী করেছে ঐ সম্পর্কে যথাযথ মূল্যায়ন হলে কনস্ট্যানটাইনের সিংহাসনে আরোহণের আগে খ্রিস্টধর্মের প্রসারের কারণগুলো আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক। একটি আশ্বাসবাক্য অবনত লোকদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনা সঞ্চার করেছিল, তা হলো যীশু দ্বিতীয়বার এই পৃথিবীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে "খোদার রাজত্বের পত্তন হবে, তখন দীন দরিদ্র লোকদের অবস্থার উন্নীত হবে এবং স্বর্গীয় সুখশান্তির অনুভূতিতে দীনহীন বিত্তশালীর স্থান অধিকার করবে। যীশুখ্রিস্টের সরাসরি শিষ্য ও অনুসারীদের ঐকান্তিক প্রত্যাশা স্বভাবত প্রতিবেশী জাতিগুলোকে বিশেষভাবে জানানো হয়েছিল এবং ধর্মপ্রচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এসব জীবন্ত বিশ্বাসগুলো সর্বত্র বিস্তর লাভ করেছিল। জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেছিল এই ধর্ম। এই ধর্মমত অসাম্যের দূরীকরণ ও অন্যায় অবিচারের প্রতিকারের আশু ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যীশুর দ্বিতীয়বার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এই বিশ্বাস জনগণের মধ্যে এত শক্তিশালী প্রভাব ফেলেছিল যে, যদিও এই প্রতিশ্রুতি তাঁর প্রাথমিক শিষ্যদের জীবদ্দশায় সংঘটিত হওয়ার আশ্বাস দেয়া হয়েছিল, তবুও যুগের পর যুগ পার হওয়ার পরও, এই ধারণা অস্পষ্ট হয়ে গেলেও যে প্রত্যাশা ও আশ্বাস এই প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছিল, ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের পতনের আগে পর্যন্ত তার শক্তি হ্রাস হয়নি। প্রথমদিককার দুঃখ-দুর্দশার পরে সফলতার এক হাজার বছর পরে খ্রিস্টধর্মের যোদ্ধারা অন্যান্য ধর্মের পণ্ডিতদের ধ্বংস করতে এগিয়ে এসেছিল এই বিশ্বাসে যে, প্রভু যীশুর আগমন নিকটবর্তী।

তদুপরি অন্যান্য বিশ্বাসযোগ্য কারণও ছিল, যা পয়গম্বরের মৃত্যু অথবা প্রাথমিক পর্যায়ের খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের বিশ্বাস অনুসারে তাঁর অন্তর্ধানের পর খ্রিস্টানধর্মের বিস্তৃতিতে সহায়ক ছিল।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদী ছাড়া এশিয়া মাইনর, সিরিয়া ও ভূমধ্য সাগরের উপকূলের কাছের অঞ্চলের জাতিগুলোর মধ্যে ঈশ্বর মৃত্যুবরণ করে আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছেন এবং ঈশ্বরের ত্রিত্বের ধারণা ছিল সার্বজনীন। সেরাপিয়ান ধর্মমতের এ একটি অপরিহার্য অংশ। আইসিসের উপাসনা বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে রোমান জগতের সকল অংশে ত্রিত্ববাদ প্রবেশ করেছিল। যীশু পরবর্তী খ্রিস্টানধর্মের প্রধান মতবাদগুলোর গ্রহণের আবেগ বা ধর্মীয় পূর্বানুরাগের ক্ষেত্রে কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি।

তখন দার্শনিকগণ নিজেদের অজ্ঞাতে ও খ্রিস্টধর্মকে সহায়তা করার কোন অভিপ্রায় ছাড়া, এমনকি তার প্রধান মূল নীতিগুলোর জ্ঞান ছাড়াই এই ধর্মের এগিয়ে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাদের খোদার স্বরূপ ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন সম্পর্কে তাদের

www.amarboi.org

অনুধ্যান আইসিস ও মিথ্রার রহস্যাবলী সম্পর্কে অনেক প্যাগান চিন্তাবিদদের বিশ্বাস এবং প্রাচীন ধর্মমতগুলোর আচার-অনুষ্ঠানে আস্থা মূলোচ্ছেদ করেছিল। এতকিছু ঘটলেও আলেকজান্দ্রিয়ার দেবদেবীগুলো ও সূর্যদেবতার প্রভাব কৃষকশ্রেণীর অন্তরে সুদৃঢ় ছিল, তারা নতুন ধর্মমতের বৈপ্লবিক মতবাদগুলো সন্দেহের চোখে দেখতো। যার জন্য প্রায় তিনশোবছর ধরে খ্রিস্টধর্মের বিস্তার অশিক্ষিত জনসাধরণের মধ্যে সীমিত ছিল। যতদিন পর্যন্ত খ্রিস্টান ধর্মসম্প্রদায় তাদের ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের প্রধান ও চিত্তাকর্ষক প্রতিপক্ষের অনেক মতবাদ অধিকাংশ আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি সংমিশ্রিত করেনি, ততদিন পর্যন্ত কৃষ্টিবান লোকদের মধ্যে এই ধর্মের কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। এই রূপান্তরগুলো যখন ধর্মীয় উৎপীড়ন বা রাজকীয় চাপ প্রয়োগের ফলে শুরু হয়েছিল, তখন নতুন আসা দল এমন সব উপাদান এই ধর্মের মধ্যে এনেছিল যা আধুনিক খ্রিস্টধর্মকে অগণিত সম্প্রদায়ে ভাগ করে ফেলে।[২০] শত শত বছর ধরে স্থায়ী হওয়া প্রবল নিপীড়ন এই ধর্মের প্রাথমিক বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে ধর্মমত ও মতবাদগুলোর কিছুটা ঐক্য কার্যকরী করেছিল।

জনসাধারণের মধ্যে আইসিস-উপাসনা কুমারী মেরীমাতার উপাসনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। যিশুর মাতা মেরী মিশরীয় দেবীর বদলে "শান্তির আশ্রয়স্থল" ও "করুণার বেদী"তে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন। এখনও লাতিন ভাষাভাষী জাতিগুলোর মধ্যে যেমন পূজিত হচ্ছেন তেমনি তখন থেকে তিনি 'জিউসের মাতা' হয়ে পূজিত হয়ে আসছিলেন।

কৃচ্ছ্রতা একটি সমাদৃত অনুষ্ঠান ছিল আলেকজান্দ্রিয়ার ধর্মমতগুলোর অনুসারীদের মধ্যে। কৃচ্ছ্রতা মেনে চলতো পিথাগোরীয় ও আফিকগণ। তারা গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকার পুরোহিতদের কাছ থেকে এ প্রসঙ্গে প্রভূত উদ্দীপনা লাভ করতো। এটা এই অঞ্চলে ছিল সাধারণ রেওয়াজ। এই অনুষ্ঠানটি খ্রিস্টান ধর্মে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই পবিত্র বলে ঘোষণা করেছিল। দীক্ষাদাতা জন কর্তৃক সহজ তন্ময়তার শিক্ষা হতে আরম্ভ করে আইসিস ধর্মমতের অধীনে দীক্ষা মরমী ও কঠিন আচারে রূপান্তরিত হয়েছিল। পারস্পরিক কথপোকথন দীক্ষার স্থান অধিকার করেছিল। এমনকি সুরার শোকার্ত দেবতার শোনিতে রূপান্তর হওয়া সম্পর্কে আইসিসের রহস্যগুলোর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মমতগুলো খ্রিস্টধর্মের মধ্যে মিশে গিয়েছিল। মস্তক ও দাড়িমুণ্ডিত অনুজ্জ্বল পোশাক পরিহিত পুরোহিত, শ্বেতবস্ত্র পরিহিত তাদের তরুণ সাহায্যকারী খ্রিস্টধর্মের "উপবাস ও ধর্মোৎসবের সময় ভাবগম্ভীর" জমকালো আচার অনুষ্ঠান যার মধ্যদিয়ে বিভিন্ন যুগের দৃশ্য প্রতিবিম্বিত তা জোর করে আমাদেরকে প্রাচীন ধর্মমতগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। খ্রিস্টধর্ম যেসব ধর্মকে স্থানচ্যুত করেছিল সেগুলো আমাদের সামনে জাকজমক আড়ম্বর নিয়ে দেখা দেয়। আমরা চার্চের ধর্মসংগীতের মধ্যে শুনি হাজার হাজার সাদাবস্ত্র পরিহিত বালক-বালিকাদের কণ্ঠে (পাশ্চাত্য প্যাগান জগতের দুঃখিনী মাতা) সুন্দর সুন্দর হৃদয়স্পর্শী স্তবগান যেগুলি আলেকজান্দ্রিয়ার দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত। নিজেকে সেন্ট পিটার বা সেন্ট পল থেকে সরিয়ে এনে সিরাপিয়ামে উত্তরণ ঘটাতে সামান্য একটু কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় মাত্র।

www.amarboi.org

যিশুর প্রধান শিষ্যদের প্রচার করা ধর্ম সুস্পষ্টভাবে সশ্রদ্ধ প্রশংসা কুড়িয়েছিল। যারা আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় বিশৃংখলার ফলে একটি আশ্রয়স্থলের জন্য আধা-অন্ধকারে ঘুরছিল। তারা এমন একটি আশ্রয়স্থল খুঁজছিল যেখানে উচ্চনীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত একই আসনে আসীন হতে পারে। প্রধান যিশু-শিষ্যদের ধর্মীয় আবেদনে মানবজাতির উচ্চ পর্যায়ের প্রবৃত্তিগুলো সাড়া দিয়েছিল যা আইসীক বা মিথ্রাইক ধর্মমতের চেয়ে অধিকতর গায়ের জোরে না হলেও নিশ্চিতভাবে অধিকতর আশ্বাসবহ ছিল। এই ধর্মমতে পরজীবন সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি অপেক্ষাকৃত কম রহস্যাবৃত ছিল। এর মতবাদগুলো দার্শনিকদের বিমূর্ত অনুধ্যানের চেয়ে অধিকতর সদর্থক ও বাস্তবধর্মী। এ ধর্ম স্বস্তি ও সান্ত্বনা বহন করে এনেছিল নিপীড়িত জনগণের কাছে। দিয়েছিল মানবজাতির মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকার। যা এ সময়েও পরিপূর্ণতা পায়নি। আর এ নিশ্চয়তাও দিয়েছিল যে এই মতবাদ যারা গ্রহণ করবে তাদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র প্রত্যেকেই ভবিষ্যতে মুক্তি পাবে। প্রায়শ পার্থিব শক্তির সহায়তায় প্রচারকদের নির্বিচারবাদ জিজ্ঞাসু মনকে স্তব্ধ করে দিত। তবে যারা পুরনো ধর্মমতের মরমীবাদ থেকে বিরত থাকতো অথবা প্রকৃতিপূজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুপ্ত অশ্লীলতা থেকে পালিয়ে থাকতো, আর এ জগৎ শুধু বৃহত্তর অস্তিত্বের অংশ—এই নিশ্চয়তার জন্য লালায়িত ছিল, তাদের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করতো। সারা পাশ্চাত্য জগৎ সংক্ষেপে বলতে গেলে একটি সার্থক ও অপরোক্ষ প্রত্যাদেশের জন্য অপেক্ষমাণ ছিল এবং অতীতের সামগ্রিক শিক্ষা তাদেরকে এমন একটি আহ্বানের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিল। খ্রিস্টধর্ম সেই সুযোগটি ধরেছিল। তার পূর্ববর্তী ও বিরোধী অনুষ্ঠানগত ও মতবাদ-বিষয়ক উত্তরাধিকারকে অধিগত ও আত্মস্থ করে ক্রমে ক্রমে রোমকদের দ্বারা নির্যাতিত জনগণের সশ্রদ্ধ প্রশংসা একচেটিয়াভাবে অধিকার করে নিয়েছিল। অন্যের কাছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণযোগ্য করার জন্য যিশুর সরল শিক্ষার এই উপযোজন বিবর্তন অথবা অধোগতি হিসেবে বিবেচিত সেই প্রসঙ্গে এখন এখানে অনালোচিত রইল। তবে মুসলমানরা যিশুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে যে তারা তাঁর ধর্মকে কলুষিত করেছে এবং এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন তা আদৌ বলা যাবে না।

যিশুর কার্যকালের দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া এবং কোন সংহত শিক্ষার অনুপস্থিতি কল্পনার অনেক সুযোগ করে দিয়েছিল, প্রাথমিক পর্যায়ের খ্রিস্টানদের জীবনে সম্ভবত "বিশ্বাস ও অনুশলীনের অধিকতর অবাধ স্বাধীনতা।"[২১] শুধু মতবাদ ও অনুশীলনের ক্ষেত্রেই নয়। তাদের প্রেরিত পুরুষের স্বভাব সম্পর্কেও বিরোধী দলগুলোকে বিবাদ-বিসম্বাদ করার অমীমাংসিত ভিত্তি দিয়েছিল। জেরুজালেম থেকে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বিতাড়ন যে জেরুজালেমে মানুষ যিশু সম্পর্কে অনেক জনশ্রুতি চালু ছিল। চারিপাশে পরিবেষ্টিত অ-ইহুদীদের সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের সংমিশ্রণ, যাদের মধ্যে বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে কমবেশি নব্য-পিথাগোরীয় বা প্লেটোনিক মতবাদ চালু ছিল, যিশুর ব্যক্তি-সত্তা প্রসঙ্গে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যে অস্পষ্ট ধারণা ছিল দৃঢ়ভাবে—সবকিছু মিলে দ্রুত বহু মতবাদ ও গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিল। যুগের পর যুগ যা কিছু মানবিক, "যা শুধু আদর্শ নয়,

www.amarboi.org

তা অবতার ঈশ্বরের পূর্জিত প্রতিবিম্ব থেকে ধীরে ধীরে নরম হয়ে গিয়েছিল, যিশুর মূল বেদনাদায়ক ইতিহাস "অলীক কাহিনী"তে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং বানোয়াট কাহিনী দিয়ে তাঁর জীবন এমনভাবে পরিবেষ্টিত হয়েছিল যে আজ আমাদের পক্ষে এ কথা জানা অসম্ভব যে "তিনি বাস্তবিক কি ছিলেন এবং কি করেছিলেন।"

খ্রিস্টধর্ম হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর আবির্ভাবের আগে বহু শত বছর ধরে যে কাল্পনিক আকার ধারণ করেছিল তা কৌতূহলোদ্দীপক ও শিক্ষণীয়।

ধারণা করা হয়, প্রথম শতাব্দীর শেষদিকে যে নষ্টিক মতবাদগুলো ইহুদী খ্রিস্টানদের মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী সেগুলো বিঘোষিত হয়েছিল। এ সময় হাড্রিয়ান জেরুজালেম অবরোধ ও ধ্বংস করেছিল। এই শতকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নষ্টিক শিক্ষক সেরিনথাস তার শিষ্যদের মধ্যে পিতা ও পুত্রের দ্বৈত উপাসনা বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেন, যিনি "জগতের স্রষ্টা" মানুষ যিশু থেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্ররূপে অনুমিত।

অ্যামোনিয়াস সাক্কাসের নব্য-প্লেটোবাদী সারসংগ্রহের জন্ম দিয়েছিল। পল-এর প্রচার করা খ্রিস্টধর্মের সংকীর্ণতা এবং আলেকজান্দ্রিয়া—গোষ্ঠীর দর্শনের সঙ্গে এর মতবাদগুলোর সমন্বয় সাধনের ব্যর্থ চেষ্টা। পরে তা গ্রহণ করেছিলেন অরিজেন ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় খ্রিস্টধর্মাবলম্বীগণ। এই বহুমুখী লেখকের প্রভাব প্রথম দিকের কয়েক শ' বছরের বিখ্যাত চিন্তাবিদদের মধ্যে বিদ্যমান। তিনি অস্তিত্বশীল মতবাদ ও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সাধারণ সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করেন। কোন কোন দিক দিয়ে অ্যামোনিয়াস, মানী বা মৃতাত্মাপূজাবাদের আদর্শ এবং নিঃসন্দেহে তাঁর সমসাময়িকদের ঊর্ধ্বে ছিলেন। তিনি একটি সম্প্রদায় তৈরি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর শিক্ষা কখনো সমাজের নৈতিকতাকে নিয়ন্ত্রিত করেনি অথবা তার ধর্মকে প্রভাবিত করেনি।

বিরোধ ও বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে। খ্রিস্টান গির্জায় বিভেদ ও প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতা পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রচণ্ড শক্তি পেয়েছিল নষ্টিক মতবাদ। আর খ্রিস্টধর্মের উপর তার অনপনেয় চারিত্রিক প্রভাব এঁকে দিয়েছিল। এই শতকে যে কয়টি গোষ্ঠী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তা ক্ষণস্থায়ী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কেননা, এই সব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের মধ্যে গির্জার শিক্ষা হতে উৎসারিত অনিষ্টই অভিব্যক্ত হয়নি, অধিকন্তু খ্রিস্টধর্মের উপর জরথুস্ত্রবাদ, নব্য-পিথাগোরীয়বাদ এবং চ্যাল্ডীয়দের প্রাচীন সেবীয়দের প্রভাবও ছিল।

প্রাথমিক নষ্টিকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ছিল হয়তো মারশেন্টিকগণ। এরা একটি সম্পূর্ণরূপে কল্যাণকর ও একটি সম্পূর্ণরূপে অনিষ্টকর এই দুটি মূলনীতির অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল। এই দুটোর মধ্যবর্তী সত্তা হলো জগৎ ও মানবেশ্বর। এদের ধারণ করা ঈশ্বর কল্যোণকরও ছিল না, অনিষ্টকরও ছিল না। বরং মিশ্র প্রকৃতির—তিনি পুরস্কার ও শাস্তি দিয়ে থাকেন। এই ঈশ্বর, মারশেন্টিদের মতবাদ অনুযায়ী এই নিকৃষ্ট জগতের স্রষ্টা, তিনি অনিষ্টের মূলনীতির সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্বে ব্যাপৃত—জরথুস্ত্রের ধারণার নির্দেশক। তারা বিশ্বাস করতো, সার্বভৌম মূলনীতি এই বিরোধকে দূর করে স্বর্গীয় ও ঐশী উৎসের

www.amarboi.org

অধিকারী আত্মাকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করার জন্য ইহুদিদের কাছে "নিজের মত অনেকটা, এমনকি তাঁর পুত্র যিশুখ্রিস্টের অনুরূপ সত্তা পাঠান" তাঁকে একটি দেহের কিছুটা ছায়া-সাদৃশ্য দিয়ে যাতে মানুষের কাছে দৃশ্যমান হতে সমর্থ হন। এই স্বর্গীয় পয়গম্বরের অর্পিত দায়িত্ব ছিল অনিষ্টের নীতি ও এই নিকৃষ্ট জগতের স্রষ্টা—এই দুইয়ের সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা এবং বিভ্রান্ত আত্মা আল্লাহ্‌র সমীপে ফিরিয়ে আনা।" এ কারণে অনিষ্টে নীতি এবং এই নিকৃষ্টজগাতের স্রষ্টার অকথ্য নির্যাতন ও উন্মত্ততা দ্বারা তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে সবকিছুই তাঁর পক্ষে নিস্ফল হয়েছিল, কেননা, শুধু দৃশ্যত তিনি দেহের অধিকারী ছিলেন। কোন দুভোগ বা নির্যাতন তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

অধিকতর প্রভাব ছিল ভ্যালান্টাইনপন্থীদের প্রভাব। তারা শিক্ষা দিয়েছিল যে, "মহাপ্রভু খোদা তদীয় পুত্র যিশুকে মানবজাতি যে নিম্নস্তরে নিপতিত হয়েছিল এ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে বাস্তব দেহের পরিবর্তে স্বর্গীয় ও সূক্ষ্ম দেহ দান করেছিলেন।" যিশুখ্রিস্ট ঐশী সত্তা থেকে নিক্রান্ত হয়েছিলেন, অন্ধকারের যুবরাজের রাজত্ব ধ্বংস করার জন্য তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন।

মিশরে ওফাইটগণ প্রতিপত্তিশালী হয়েছিল। অন্যান্য মিশরীয় নষ্টিকদের মতো তারা ঈয়ন জড়ের নিত্যতা, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জগতের সৃষ্টি, নিকৃষ্ট জগতের অধীশ্বরের অত্যাচার, "অন্যায়ভাবে বিজেতার সাম্রাজ্য ধ্বংস করার জন্য মানুষ যিশুর সঙ্গে ঐশী যিশুর মিলন" সম্পর্কে একই ধারণা বহন করতো। অধিকন্তু, এরা যুক্তি প্রদর্শন করে বিশ্বাস করতো যে, হযরত আদম(আঃ) ও বিবি হাওয়া (আঃ) সাপের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন। আর এই সাপের ছদ্মবেশে ছিল খ্রিস্ট নিজে অথবা সোফিয়া।

চ্যাল্ডীয় দর্শনের প্রভাবে নষ্টিক ধর্মবিশ্বাস অস্তিত্বশীল হয়ে উঠছিল, গ্রীকগণ তাদের দিক থেকে 'পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা এবং খ্রিষ্টের মধ্যে মিলিত দুটি স্বভাব' সম্পর্কীয় পলের মতবাদ এবং জগতের শাসন বিষয়ক তাদের নিজস্ব মতবাদের মধ্যে কিছুটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করলো। খ্রিস্টধর্মের এই তার্কিক প্রচারকদের মধ্যে প্রাকসিয়াস প্রথম। তিনি "পিতা ও পবিত্র আত্মা"র মধ্যে কোন বাস্তব পার্থক্য অস্বীকার করে প্রথমে এই কাজের সূত্রপাত করেন এবং যুক্তি দিয়ে সমর্থন করেন যে, পিতা তাঁর পুত্র, মানুষ খ্রিস্ট্রের সঙ্গে এত বেশি অন্তরঙ্গভাবে মিলিত হন যে, তিনি তার সাথে যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনের মনস্তাপ ও অপবাদজনক মৃত্যুর তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করেন।

মোশেম বলেন, "এই সম্প্রদায়গুলো দর্শনের সন্ততি। এক নিকৃষ্টতম অনিষ্ট ঘটেছিল খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ভাগ্যে ফ্রিজিয়ার অধিবাসী মনটেনাসের ব্যক্তিগত প্রভাবে।" সকল রকম জ্ঞান ও শিক্ষাকে অবজ্ঞাকারী এই ব্যক্তি যিশুখ্রিস্ট কর্তৃক অঙ্গীকৃত পবিত্র আত্মার প্রবক্তা হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন। অনেকেই খুব দ্রুত তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এ সকল শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন প্রিস্‌সিলা ও ম্যাক্সিমিলা বিখ্যাত ছিলেন। এই দুই ধর্মপ্রচারিকা তাদের ধর্মনিষ্ঠার চেয়ে প্রাচুর্যের জন্য বেশি প্রচার পেয়েছিলেন বলে

www.amarboi.org

মোশেম জানান। যারা উত্তর এশিয়াকে বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিলেন এবং তাদের নির্বিচার উন্মত্ততা মানবজাতির উপর ভয়াবহ দুর্দশা নামিয়ে এনেছিল।

সমগ্র রোম সাম্রাজ্যে নিজেদের মতবাদ প্রচারের জন্য চেষ্টা করেছিল মার্শেনিট, ভ্যালান্টাইনারী মন্টেনিস্ট ও অন্যান্য নস্টিক সম্প্রদায়। এই সময়ে পারস্যে এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, যার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দুই মহাদেশের দর্শনের অমোচনীয় প্রভাবের বিস্তৃতি হয়। এই ব্যক্তি একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পদার্থবিদ, সংগীতবিশারদ ও প্রখ্যাত শিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর শিল্পশালা[২২] প্রসঙ্গে আখ্যায়িকাগুলো প্রবাদে রূপ নিয়েছে। ব্যক্তিটির নাম ছিল মানি। মানি সকল বর্ণনানুযায়ী তাঁর যুগের সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা নিখুঁত ব্যক্তি ছিলেন।

মানি ক্যাবেলা ও নস্টিক শিক্ষকদের শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন পরিপূর্ণরূপে। তিনি পাশ্চাত্যের প্রাচীন দর্শন ও মরমীবাদে উদ্বুদ্ধ, জন্মসূত্রে একজন মাজী এবং শিক্ষার দিক দিয়ে একজন খ্রিস্টান ছিলেন। মানি তাঁর বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত মতভেদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বিশ্বাসের বিশৃঙ্খলা থেকে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন এমন এক সারগ্রাহী ধর্ম সৃষ্টির জন্য যা যাবতীয় প্রয়োজন ও হৃদয়ের সকল আকাঙ্খাকে পরিতৃপ্ত করবে। তিনি যে সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ সমালোচনার মাধ্যমে প্রচলিত ধর্মগুলোর মূলোৎপাটন করতে চেয়েছিলেন তা নবদীক্ষিতদের ক্ষেত্রে ধর্মের সকল ভিত্তি নসাৎ করে দিয়েছিল। পরবর্তীতে তাঁর এই প্রক্রিয়া তাঁর সমগোত্রীয় ইসমাইলিয়াগণ অনুকরণ করেছিলেন এবং বাতেনীদের মতো সব ধরনের ধর্মীয় মতবাদে গভীর অন্তর্দৃষ্টির নিশ্চিত স্বীকৃতি প্রত্যেক ধর্ম ও গোত্রকে তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করেছিল। ফলে তিনি বা তাঁর শিষ্যরা যেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন সেখানেই তুলনাতীত হিংস্রতায় নিপতিত হন।

খ্রিস্টধর্ম এবং পারসিক ও চ্যাল্ডীয়দের প্রাচীন দর্শনের এক উদ্ভট সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল মানির মতবাদ। তিনি মত দিয়েছিলেন যে, জড় ও মন পরস্পর এক চিরন্তন বিরোধে লিপ্ত। এই বিরোধকালে ঐশী ও জড়াত্মক এই দ্বিবিধ স্বভাব বিভূষিত জড়-নীতি কর্তৃক মানুষ সৃষ্ট হয়েছে—এই ঐশী স্বভাব স্বর্গ থেকে অপহৃত আলোক বা শক্তির অংশ। কারাগারে বন্দী সংগ্রামরত ঐশী আত্মাকে মুক্তি করার জন্য সর্বশক্তিমান খোদা সৌর অঞ্চল থেকে নিজস্ব উপাদান থেকে সৃষ্ট এক সত্তা প্রেরণ করেছিলেন। এই সত্তা খ্রিস্ট। সেই অনুযায়ী ইহুদিদের নিকট যিশু মানবদেহের ছায়ামূর্তি ধারণ করে আবির্ভূত হন। যিশু মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কীভাবে পঙ্কিল দেহ থেকে বুদ্ধিময় আত্মাকে পৃথক করতে হয়—কীভাবে ভয়ানক শত্রু জড়ের উন্মত্ততাকে জয় করতে হয়। অন্ধকারের যুবরাজ তাঁকে হত্যা করার জন্য ইহুদিদেরকে উত্তেজিত করেছিল। তিনি দৃশ্যত ক্রুসবিদ্ধ হয়েছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ক্রুশাবদ্ধ হননি। মূলত তিনি তাঁর ব্রত পালন করে সূর্যালোকে তাঁর সিংহাসনে ফিরে গিয়েছিলেন।

কাজেই ম্যানিকীয় খ্রিস্ট পান, ভোজন, দুর্দশা ভোগ করতেও পারেন না, মরতেও পারেন না। এমনকি তিনি খোদার অবতারও নন। তিনি মায়াময় ছায়ামাত্র। “তিনি

www.amarboi.org

আলো-উপাদান হয়ে প্রকৃতিতে আবদ্ধ। তিনি কোন রূপ গ্রহণ না করেই জড়কে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত।" এ সকল মতবাদ যতই নিন্দনীয় ও অযৌক্তিক হোক না কেন মুসলমানদের কাছে সেগুলো ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের পদার্থ রূপান্তর মতবাদ অর্থাৎ রুটি ও মাদিরার খ্রিস্টের মাংস ও রক্তে রূপান্তর অপেক্ষা আদৌ অধিকতর নিন্দনীয় ও অযৌক্তিক বলে মনে হয় না।

"নির্বাচিত এবং 'শ্রোতা' এই দুই নামে মানি তাঁর শিষ্যদেরকে দু শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। প্রাণীজ খাদ্য ও উত্তেজক পানীয় গ্রহণ, বিবাহবন্ধন ও ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি থেকে কঠোরভাবে বিরত রাখা হত 'নির্বাচিত' শ্রেণীর শিষ্যদের। আর 'শ্রোতা' শ্রেণীর শিষ্যদের জন্য যে বিধি-ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল তা এতোটা কঠোর ধরনের ছিল না। তাদেরকে ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমি, ধনদৌলতের অর্জন করতে, গোশ্ত খেতে, বিয়ে করতে বাধা দেয়া হয়নি। তবে অনেক ধরনের বাধা-নিষেধ এবং সংযম মিতাচারের কঠোর শর্ত দিয়ে তাদেরকে এই স্বাধীনতা দেয়া হত।

বাহরাম গর হত্যা করেছিলেন মানিকে। কিন্তু তাঁর মতবাদগুলো খ্রিস্টধর্মের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। পরবর্তীতে খ্রিস্টানধর্মের মধ্যে যে ভাঙ্গন ধরেছিল তার মূলীভূত সকল প্রচেষ্টার মধ্যে এই মতবাদগুলোর প্রভাব দেখা যায়।

স্যাবেলিয়াস সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে। আর ঐ সময় থেকে খ্রিস্টধর্মে এক অভিনব ব্যতিক্রম স্পষ্ট হয়। একজন মানুষ হিসেবেই যিশুখ্রিস্টকে তারা মনে করতো এবং বিশ্বাস করতো যে কিছুটা শক্তি সর্বশক্তিমান পিতার কাছ থেকে এসে মানুষ যিশুকে খোদার পুত্রে রূপান্তর করেছে। গিবন এই অদ্ভুত মতবাদকে ত্রিমূর্তিবাদে অবিশ্বাসের একটি দৃষ্টিকোণ বলে ব্যক্ত করেন। এই মতবাদ খ্রিস্টান ধর্মমতকে মারাত্মকভাবে বিশৃঙ্খলার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। এরই ফলে চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে অবিজেন কর্তৃক খোদার তিনটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব মতবাদ ঘোষণার জন্ম দিয়েছিল। খোদার ত্রিত্ববাদ হলো, যে জনগণ যিশুর ধর্মমত গ্রহণ করেছিল তাদের চরিত্রের প্রাচীন পৌত্তলিকতারই রূপান্তর। তাদের বিশ্বাসে পৌত্তলিকতা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। আর খোদার ত্রিত্ববাদ ছিল যিশুর শিক্ষা ও বহু ব্যক্তিত্বের প্রাচীন উপাসনার মধ্যে এক আপোষ। কালক্রমে খোদার ত্রিত্ববাদ খ্রিস্টান-ত্রিতত্ত্বে পর্যবসিত হয়। পরবর্তীতে ইহা খ্রিস্টধর্মের সর্বাপেক্ষা দার্শনিক মতবাদের জন্ম দিয়েছিল।

মানব-প্রজ্ঞার বিদ্রোহ থেকেই মূলত জন্ম নিয়েছিল গির্জার অযৌক্তিক শিক্ষার বিরুদ্ধে অ্যারিয়াসের মতবাদ। ঐ সময় সর্বাপেক্ষা ধর্মান্ধ খ্রিস্টান-অধ্যুষিত শহর ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। এখানেই সাহসিকতার সাথে অ্যারিয়াস তাঁর ধর্মযাজকের বিরুদ্ধে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, যিশু ও খোদার মূল সত্তা পৃথক। মিশর ও উত্তর আফ্রিকার অ্যারিয়াসের মতবাদ দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। এ অঞ্চলে ও স্পেনে প্রচণ্ড ও বারবার নির্যাতনের পরেও ইসলামের ছায়াতলে তাঁর শিষ্যদের আশ্রয় নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই মতবাদের সুদৃঢ় প্রভাব ছিল।

www.amarboi.org

কনস্ট্যানটাইনকে অ্যারিয়াসের ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদের জন্য উদ্ভূত বিরোধ ৩২৫ খ্রিস্টাব্দে বিথিনিয়ার নিসিয়ায় পরামর্শ সভা ডাকার জন্য উৎসাহিত করেছিল। এই সাধারণ সভায় উভয়পক্ষের প্রচণ্ড চেষ্টার পর অ্যারিয়াসের মতবাদ দোষী বলে সাব্যস্ত হয় এবং 'খ্রিস্টকে বিবেচনা করা হল খোদার একই প্রকৃতি বিশিষ্ট বলে।' খ্রিস্টধর্ম সম্প্রদায়ের অবস্থা আগে যা-ই হোক-না-কেন, তখন থেকে তার ইতিহাস গোলযোগ ও আক্রমণ, আত্মবিনাশী সংঘর্ষ ও বিসম্বাদ, বিভাষিকাপূর্ণ ও নিষ্ঠুর উৎপীড়ন, তীব্র ঘৃণা ও মানুষের মন থেকে বিচারবুদ্ধি মুছে ফেলার নিরন্তর ও শোচনীয় প্রয়াসের ইতিহাস। বিভৎস রূপ নিয়েছিল নিয়মিত যাজকবর্গের অসদাচার। তদুপরি যাজকীয় ব্যবস্থার বিলাসিতা, ঔদ্ধত্য ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা সর্বসাধারণের অভিযোগের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছিল। পূর্বের কৃচ্ছতার স্থানে সন্ন্যাসী স্থান করে নিয়েছিল, আর মঠের মধ্যে আবাস স্থাপনকারী সন্ন্যাসীদের স্বেচ্ছাচারিতা প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তারা গির্জার অবাধ বল্লম—তারা সর্বদা রাজদ্রোহে গোলমাল সৃষ্টি করে রাখতো। প্রায়ই রক্তাক্ত হয়ে উঠতো তাদের অবাধ্যতা ও দাঙাবাজির ফলে কনস্টান্টিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া ও রোমের রাজপথগুলো।

খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো হাইপাটিয়ার হত্যাকারী সিরিলের সঙ্গে নেস্টোরিয়াসের বিরোধ। গির্জার ভিতরে যেসব দলের সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির মধ্যে ঐগুলোর সমন্বয় করার জন্যই এফিসাসের দ্বিতীয় সম্মেলন আংশিকভাবে আহৃত হয়েছিল। তবে গিবন বলেন, 'আলেকজান্দ্রিয়ার মহাযাজকের স্বেচ্ছাচারিতা পুনরায় বিতর্কের স্বাধীনতাকে রহিত করেছিল। আনুষ্ঠানিকভাবে নিন্দিত হল দ্বৈত-স্বভাবের বিরুদ্ধ মত। একটি খ্রিস্টীয় ধর্মসভার বদান্য মিনতি ছিল—'তারা জীবন্ত দগ্ধীভূত হোক।' 'যারা খ্রিস্টকে দ্বিখণ্ডিত করে তারা তরবারির দ্বারা দ্বিখণ্ডিত হোক।' 'তারা টুকরো টুকরো হয়ে যাক? তারা জীবন্ত দগ্ধীভূত হোক।'

দুই স্বভাবে একই ব্যক্তি-সত্তায় খ্রিস্টের অবতারত্ব মতবাদ নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয় রোমের বিশপের দৃষ্টান্তে আহূত চ্যাল্‌সেডনের সম্মেলনে। যিশুর অবতারত্ববাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার চেষ্টা করেছিল মনোফিজাইটি এবং নেস্টোরিয়াসপন্থীরা। তবে তারা গোঁড়াপন্থীদের আক্রমণের সামনে অবসন্ন হয়ে গিয়েছিল। অপরদিকে ঐ গোঁড়াপন্থী খ্রিস্টানরা তাদের প্রেরিত পুরুষের স্বভাবের রহস্যের সমাধানে সফলতা অর্জন করলো। মঠবাসী একদল সন্ন্যাসী খ্রিস্টান সেনাদল জেরুজালেম অধিকার করেছিল; তারা এক অবতার স্বভাবের নামে লুণ্ঠন ও হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল—রক্তাপ্লুত করেছিল যিশুর সমাধিস্থল। যে আলেকজান্দ্রিয়ার খ্রিস্টানগণ এক মহিলাকে হত্যা করেছিল তারা তাদের মহাযাজককে গির্জায় দীক্ষা স্থানে হত্যা করে, নিহত-যাজকের দেহকে ছিন্নভিন্ন করে অগ্নিদগ্ধ করে সেই ভস্মাবশেষকে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে দ্বিধা করেনি।

এডেসার বিশপ জ্যাকরের নেতৃত্বে প্রায় ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মনোফিজাইটদের ক্রমে ক্রমে আসা সৌভাগ্য পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। তাঁর ও তাঁর

www.amarboi.org

উত্তরসূরীর নেতৃত্ব তার পূর্ব সাম্রাজ্যে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। খ্রিস্টান গীর্জাতন্ত্রকে আত্মঘাতী সংঘর্ষ ও রক্তপাতের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল তাদের অপ্রতিহত নেস্টোরিয়ান-উৎপীড়ন এবং গোঁড়া বা চ্যালসৃডীয়দের সঙ্গে তীব্র বিসম্বাদ। ঐ সময়ের একজনের মতে, যিনি খ্রিস্টান ছিলেন না, মেনোফিজাইটদের মতবাদ হলো যে, তারা শিখিয়েছিল : খ্রিষ্টের ঐশী ও মানবিক প্রকৃতি এমনিভাবে প্রকাশ হয়েছিল যে, তা একটি প্রকৃতিতে রূপান্তর হয়ে গিয়েছিল। তবুও দুই মতবাদের কোন পরিবর্তন ভুল বুঝাবুঝি অথবা মিশ্রন ছাড়াই তা কোন দিক দিয়েই চ্যাল্সেডনের সম্মেলনে গৃহীত মতবাদগুলো থেকে পৃথক মনে হয় না। তবে কোন পার্থক্য ছাড়াই এই স্বাতন্ত্র্য বহু মানবগোষ্ঠীর বর্ণনাতীত দুর্দশার কারণ হয়েছিল। পরিশেষে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে হিরাক্লাইটাস মনোথিলাইট নামের একটি নতুন সম্প্রদায়ের মতবাদগুলোও কম অদ্ভুত ও ধর্মান্ধতায় পরিপূর্ণ ছিল না। মনোথিলাইট নামক এই সম্প্রদায় যুক্তির সাহায্যে সমর্থন করতো যে, 'যিশু ছিলেন পূর্ণ খোদা ও পূর্ণ মানুষ এবং তাঁর মধ্যে দুটি পৃথক স্বভাবের মিলন এমনভাবে হয়েছিল যে তা কোনভাবেই কোন রকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেনি। বরং তাদের মিলন একটি ব্যক্তিসত্তারই জন্ম দিল।" যাক ঐ প্রসঙ্গ, যিশুর গির্জার ভিতরে শান্তি আনার পরিবর্তে, এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব অনিষ্টের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছিল। খ্রিষ্টের নামে হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে চলতে লাগল।

এমনই ছিল খ্রিস্টান জগতের ধর্মীয় অবস্থা ইসলামের আবির্ভাবের আগে।

এই ধর্ম রোম সাম্রাজ্যের প্রবল শক্তিতে রূপান্তরিত হয় কনস্ট্যান্টইনের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের পর। চিরতরে বন্ধ হয়ে যায় পৌত্তলিকতার গতি। যদিও কিছুকালের জন্য শ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা অকপট রোমক সম্রাটগণ কিছুদিনের জন্য এর পতন বন্ধ করতে পেরেছিলেন তবুও তা অবশ্যম্ভাবী হয়ে গিয়েছিল। গিবন জানান, "পৌত্তলিকতার অবলুপ্তির পর খ্রিস্টানগণ শান্তি ও ধর্মনিষ্ঠার ক্ষেত্রে হয়তো একক বিজয় উপভোগ করেছেন। তবে তাদের মনের মধ্যে মতভেদের নীতি জেগে রয়েছিল এবং তারা তাদের ধর্মপ্রবর্তকদের নিয়মকানুন না অনুসরণ করে তাঁর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য বেশি উৎকণ্ঠিত ছিল।"[২৩] ইউরোপীয় খ্রিস্টানগণ ছিল বিভীষিকাময় অন্ধকারের গভীরে। এ ছাড়াও যিশুর যাজকতন্ত্র বিভেদ আর দলাদলিতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। পৌত্তলিক পর্যায় পেরিয়ে যেতে পারেনি জনসাধারণের ধর্মীয় ধারণা। তারা মৃত ব্যক্তির আত্মার পূজা করতো এবং যে সকল ব্যক্তি পৃথিবীতে জীবিতাবস্থায় সম্মানিত ছিলেন তাদের তারা উপাস্যে পরিণত করতো। পৌত্তলিকতায় পুনরাবর্তিত হয়েছিল খ্রিস্টধর্ম।

একই রকমভাবে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল খ্রিস্টধর্মের আয়ত্ত্বাধীন জাতিগুলোর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা। খ্রিস্টধর্মত্যাগী যেসব লোক শক্তিশালী ধারণার বশে নতুন বা পৃথক মতবাদের ঘোষণা দিত তাদের হত্যাযজ্ঞের উপর খ্রিষ্টের রাজত্বের আনন্দোৎসব হতো।

একজন মহাপ্রাণা মহিলা অবর্ণনীয় নৃশংসতার সাথে নিহত হয়েছিলেন আলেকজান্দ্রিয়ার রাজপথে; সভ্যজগত তা দেখেছে, প্রতিবাদ করেনি। প্রাচীন ঐতিহ্যের

www.amarboi.org

অধিকারিণী এই মহিলার হন্তক খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসে একজন সেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। এই হন্তক যিনি আধুনিককালে যুক্তিবাদের সমর্থক হিসেবেও পরিচিত। চিরদিনের জন্য খ্রিস্টধর্মের অন্যতম কলঙ্কের ছবি হিসেবে ফুটে উঠছে এই হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক ড্রেপারের বর্ণনা। একদল খ্রিস্টান অতি উৎসাহী অধ্যাপক একজন সুন্দরী, বিদুষী ও ধর্মপ্রাণা মহিলাকে আক্রমণ করে। এই মহিলার বক্তৃতা-কক্ষ আলেকজান্দ্রিয়ার ঐশ্বর্য ও জাকজমক দ্বারা সজ্জিত ছিল। তিনি যখন তার একাডেমি থেকে বের হচ্ছিলেন তখনই তাঁকে আক্রমণ করা হয়। এসব আক্রমণকারী তথাকথিত ধর্মরক্ষকদের ভয়ার্ত তীব্র চিৎকারের মধ্যে ভদ্রমহিলাকে তাঁর শকট থেকে টেনে নামিয়ে প্রকাশ্যে রাজপথে বিবস্ত্র করা হয়েছে। তিনি এই পরিস্থিতিতে সন্ত্রাস বিহ্বল হয়ে পাশের এক গির্জায় আশ্রয় নিলে সেই গির্জার 'সেন্টের সঙ্গীরা পিটিয়ে তাঁকে নিহত করে। তারপর প্রাণহীন এই মহিলার মৃতদেহের উপর তারা বলৎকার চালিয়ে কেটে টুকরো টুকরো করে। এখানেই এই নারকীয় বিভৎসতার শেষ নয়। ওরা মহিলার কর্তিত দেহ থেকে ঝিনুকের খোলা দিয়ে মাংস বিচ্ছিন্ন করে আগুনে পুড়ে। এই বর্ণনাতীত ঘৃণ্য অপরাধ সংঘটনে যে প্ররোচনা দিয়েছিল খ্রিস্টান জগত তাঁকে সাধু পুরুষের আসনে অসীন করেছে। এ জন্যই কথিত রয়েছে, শহীদ হাইপাটিয়ার রক্তের প্রতিশোধ শুধু আমরের তরবারীর দ্বারাই নেয়া হয়েছে।

খ্রিস্টধর্মাবলম্বী দুনিয়ায় নীতিবিগর্হিত ও অধপতিত সামাজিক অবস্থার শ্রেষ্ঠ নির্দেশক হল খ্রিস্টান আইনপ্রণেতা জাস্টিনিয়ানের অধীনে কনস্ট্যান্টিপোলের অবস্থা। তখন সামাজিক ধারণায় সাধারণ ও ব্যক্তিগত জীবনে নৈতিকতার কোন বালাই ছিল না। একজন বেশ্যাও সিজারের সিংহাসনে বসে রাজকীয় সম্মান পেত। থিওডোরা কনস্ট্যানটাইনের নগরে সাধারণ্যে তার দেহব্যবসা চালাত এবং ওখানকার লম্পট বাসিন্দাদের কাছে তার নাম প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। এখন সে একই নগরে রাজমহিষী হিসেবে 'স্থির প্রকৃতি ম্যাজিস্ট্রেট' গোঁড়া পিশপ, বিজয়ী সেনাধ্যক্ষ এবং বন্দী রাজন্যদের দ্বারা পূজিত হয়েছিল। তার নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিল গোটা সাম্রাজ্য। তার এই নিষ্ঠুরতার গতি কোন ধর্মীয় বা নৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়নি। ধর্মযাজকগণ সবসময়ই সর্বপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতো রাজদ্রোহ, বিশৃংখলা ও রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায়। তাঁরা এমনই মাতরম হতো যে, মানবিক বা ঐশী কোন আইনই তাদের কাছে কোন বাধা ছিল না। নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে তারা গির্জা ও ধর্মশালার পবিত্রতার হানি ঘটিয়েছে। ধ্বংস ও লুটতরাজ থেকে কোন স্থানই মুক্তি পায়নি। সামাজিক অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত প্রকাশ্য দিবালোকে বীভৎস বলৎকার করা হতো। যাহোক, জাস্টিনিয়ানের রাজত্বের পঞ্চমবর্ষে নিকা দাঙ্গার বিভীষিকার সঙ্গে আর কোন নৃশংসতার তুলনা হয় না। অবিরাম রক্তপাত ও ইন্দ্রিয়াপরাণতা ছাড়াও সার্কাসের ভয়াবহ নৈরাজ্য গোঁড়ামির রাজকীয় সমর্থকদের পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রেরণায় চরম অধঃপতনে পৌছেছিল এবং বর্বরতম দলাদলিতে হয়েছিল নিমজ্জিত। পৌত্তলিক জগতে এমনটি অদ্বিতীয়।

তখন কনস্টান্টিনোপলের মত পারস্যে আইন-শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল।

www.amarboi.org

যে সকল অপরাধের ঘটনা কলঙ্কিত করেছে খ্রিস্টান কনস্ট্যান্টিনোপলের ইতিহাসকে তাতে মানবজাতি বিক্ষুব্ধ। ইসলামের নবী মুহম্মদ (সাঃ) তখন শিশু, একজন সর্বাপেক্ষা পুণ্যাত্মা সম্রাট তখন বাইজান্টাইনের সিংহাসনে, অথচ তাঁকে সপরিবারে হত্যা করা হয়েছিল একজন খ্রিস্টান নৃপতির অনুরোধে। সম্রাটকে তাঁর কক্ষ থেকে টেনে হিঁচড়ে বের করা হয়েছিল এবং তাঁর পাঁচটি পুত্রকে একের পর এক তাঁর চোখের সামনে হত্যা করা হয়েছিল। আর এই নির্মম মর্মন্তুদ দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটেছিল সম্রাটকে হত্যা করে। সম্রাজ্ঞী ও সম্রাটের কন্যাদের উপরও বর্ণনাতীত নির্যাতন চালিয়েছিল। তাঁদেরকে শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল যে স্থানে সম্রাটকে হত্যা করা হয়েছিল সেই রক্তে রঞ্জিত স্থানে। নিঃসন্দেহে এটা সত্য যে, সম্রাটের বন্ধুবান্ধব, সহচর ও পারিষদবর্গের প্রতি যে নিষ্ঠুরতা করা হয়েছিল তা বাইজান্টাইন তা বাইজান্টাইন খ্রিস্টানদের নৈতিকতার এক ঘৃণ্য নিদর্শন। ছিদ্র করা হয়েছিল তাঁদের দুটো চক্ষু, কেটে ফেলা হয়েছিল জিহ্বা, বিচ্ছিন্ন করেছিল তাদের দুই হাত-পা। পাষাণ হৃদয়ধারীদের বেত্রাঘাতের সময়ই এদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গিয়েছিলেন। কেউবা মারা যান তীরবিদ্ধ হয়ে। এ প্রসঙ্গে গিবন জানান, "সহজ দ্রুত মৃত্যু ছিল নিহতদের জন্য করুণা যা তাদের ভাগ্যে প্রায়ই জুটতো না।"

ধীরে ধীরে রক্তপাতের মাধ্যমে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন হল। বাইজান্টাইন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কোন্দলের দ্বারা। বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো ধর্মতাত্ত্বিক বিতণ্ডায় উদ্ভূত উন্মত্ততার ফলে। "ধর্মীয় বিশ্বাসের একানুবর্তিতা চাপিয়ে দেয়ার মত্ততায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিল"—এসব হত্যা লাম্পট্য নিষ্ঠুরতার চিত্র।"

ইউফ্রেটিসের পশ্চিম পাড়ের এশিয়াটিক তুর্কীর দেশগুলিতে একের পর এক পার্থিয়ান ও রোমান এবং পরে পারসিক ও বাইজান্টইনদের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়ে এক চরম হতাশাব্যঞ্জক ছবি ফোটে উঠেছিল। জনসাধারণের অনৈতিকতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে তারা পার্থিব ক্ষয়-ক্ষতিকেও ত্যাগ করতে পেরেছিল। যিশুর অনুসারীরা অনিষ্টতা দূর না করে বরং তার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। খ্রিস্টধর্মের সাথে মাজো জরথুস্ত্রবাদ মেসোপটিমিয়ায় বিবাদে লিপ্ত ছিল। আর এই বিবাদ ডেকে এনেছিল অধঃপতন। সেখানে সে সময় বিরোধের শেষ ছিল না, যেমন ছিল নেস্তোরাসপন্থীরা গোঁড়াপন্থীদের সঙ্গে মারাত্মক বিরোধে লিপ্ত, মনটেনাস ও ধর্মপ্রচারিকাদের প্রাথমিক পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের লড়াই—সব মিলে পশ্চিম এশিয়াকে হতাশা ও বিনাশের বিরাণভূমিতে রূপ দিয়েছিল।

আফ্রিকার উপর দিয়ে রাজ্য জয়ের ঘূর্ণিহাওয়া বয়ে গিয়েছিল। ধ্বংস, হত্যাকাণ্ড, খ্রিষ্টধর্মের প্রচারক ও শিক্ষকদের বিধিহীনতা মিশর ও ধ্বংসোন্মুখ আফ্রিকার প্রদেশগুলোতে নৈতিক জীবনের প্রতিটি শিখা নিভিয়ে দিয়েছিল। প্রচণ্ড দুর্দশাক্রান্ত হয়েছিল ইউরোপের জনগণ। প্রকাশ্য দিনের আলোতে কনস্টান্টিনোপলের বাজারে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল ধর্মের পুরোহিত ও জনগণের সম্মুখে দেশের কল্যাণকামী নার্সেসকে। গভর্নরের চোখের সামনে রোমের রাজপথে খ্রিস্টানদের রক্তে গির্জায় বন্যা

www.amarboi.org

বইয়ে দিয়েছিল যুদ্ধ বাধিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী বিশপদের দলের লোকেরা। হৃদয়-বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করেছিল স্পেনে নৈরাজ্য ও ধ্বংসলীলা ঘটিয়ে। চাপমুক্ত ছিল যে-সব ধনী ও সুবিধাবাদী ব্যক্তি সম্রাটের অধীনে প্রদেশের প্রধান প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বহাল হয়েছিল। তারা সুরম্য প্রাসাদে দাসদাসী পরিবেষ্টিত অবস্থায় বিলাসিতার মধ্যে দিনযাপন করতেন। তারা তাদের সময় পাপাচারের প্রাণকেন্দ্র বিভিন্ন স্নানাগারে এবং খেলার টেবিলে কাটাতো। জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশার পাশাপাশি এই বিলাসিতা ও প্রাচুর্যের দৃশ্য বৈসাদৃশ্যের বাস্তবতা উপস্থাপন করতো। রোমকদের অত্যাচারে নিস্পেষিত হয়ে ভূপাতিত হয়েছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণী, গ্রাম ও শহরের স্বাধীন জনগণ। দূর হয়ে গিয়েছিল ভূমিদাসপ্রথা, এর স্থলে স্থান করে নিয়েছিল ঔপনিবেশিকরা। তারা দখল করে নিয়ে গেল স্বাধীনতা ও দাসত্বের মাঝামাঝি অবস্থা। বরং অনেক দিক দিয়ে তারা দাসদের চেয়ে সুখি ছিল। তার বৈধ বিবাহের চুক্তি করার অধিকার ভোগ করতো। তারা যে জমি চাষ করে ফসল ফলাতো তা থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ পেত। তাদের জিনিসপত্র অস্থাবর সম্পত্তি তাদের পৃষ্ঠপোষকেরা দখল করে নিতে পারতো না। তবে তারা অন্যান্য ক্ষেত্রে ছিল দেশের দাস। রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ অধিকারে ছিল তাদের ব্যক্তিগত কাজকর্ম। বাড়ির দাসদাসীর মত তাদেরও কায়িক শাস্তির বিধান ছিল। এক অবিচ্ছেদ্য এবং উত্তরাধিকারসূত্রে যে জমি তারা চাষ করতো তার সঙ্গে তারা সংশ্লিষ্ট থাকতো এই যুক্তিতে যে, তারা কোন ব্যক্তির দাস নয়, ভূমির দাস। জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ ছিল দাসগণ, তাদের অবস্থা ছিল বর্ণনার অসাধ্যকর শোচনীয়। তাদের ভাগ্যে সর্বদাই জুটতো ইতর প্রাণীর চেয়েও খারাপ ব্যবহার, নির্মম আচরণ। এই দুর্ভাগা দেশে এক ভয়াবহ শাস্তি নিয়ে এসেছিল অসভ্য জাতিগুলোর আক্রমণ। তারা এই দেশে লুঠ ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে নারী, শিশু ও যাজক সম্প্রদায়কে দাসে পরিণত করলো। দেশ ভয়াবহ বিরাণভূমিতে রূপান্তরিত হল।

কয়েকশ বছর ধরে অগণিত ইহুদি স্পেন ও পর্তুগালের উপদ্বীপে বসতি গড়ে তুলেছিল। ৬১৬ খ্রিস্টাব্দে ভিসিগথ সিসবাটের শাসনামলে ধর্মযাজকদের হাতে তারা যে নির্মম নিগ্রহ ভোগ করেছিল তা নিরক্ষরতা ও ধর্মান্ধতার হতভাগ্য বলিদেরকে ইসলামের জন্যই ইহুদিদের পক্ষে মায়মোনাইডস বা ইবনে গেবরলের জন্ম দেয়া সম্ভব হয়েছিল।

এখন আমরা আবরদেশের দিকে দৃষ্টিপাত করি। আরব ছিল রহস্য ও রোমান্সের দেশ। এই দেশ ছিল নীরবতা ও নির্জনতায় আচ্ছাদিত। জগতের বৃহৎ জাতিসমূহ থেকে বিচ্ছিন্ন আরব ভিনজাতীয় যুদ্ধবিগ্রহ ও শাসনব্যবস্থার প্রভাব থেকে এ পর্যন্ত ছিল মুক্ত। শত শত বছর ধরে আরবের সীমান্তে খসরু ও সিজারের সৈন্যবাহিনী অভিযান চালিয়েও আরবের টিকিটিও ছুঁতে পারেনি। আরবের কানে যদিও বাইজাইন্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের উপর অনেকবার আক্রমণের সংবাদ পৌঁছেছে, কিন্তু তার ঘুম ভাঙেনি। কিন্তু তাই বসে সে ঘুমে থাকতে পারলো না তার ঘুম ভাঙলো তার মহানতম সন্তানের বাণীর মাধ্যমে। আরব তাঁর বাণীর মধ্যে নিজের পথ খুঁজে পেল।

www.amarboi.org

যে পর্বতমালা প্যালেস্টাইন থেকে সুয়েজ যোজকের দিকে নেমে গেছে তা আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তসীমা পর্যন্ত লোহিত সাগর বরাবর প্রায় সমান্তরালভাবে চলে গেছে। এই পর্বতমালা আরবী ভাষায় হিজাজ বা পর্বত প্রাচীর নামে অভিহিত। ইয়েমেনে প্রদেশের সীমারেখা পর্যন্ত ভূখণ্ড এই নামেই পরিচিত। এই পর্বতমালা কোথাও সাগরের খুব কাছাকাছি, কোথাও বা উপকূল ভাগ থেকে অনেক দূরে। এখানে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়ার ফলে সবুজ উপত্যকা ও উর্বর মরুদ্যান ছাড়া রয়েছে, দীর্ঘ অনুর্বর ও জনবসতি শূন্য নিম্নভূমি। এই সীমা পেরিয়ে পূর্বদিকে রয়েছে বৃক্ষহীন নজদ—আরবদেশের উচ্চভূমি—মরুভূমি, গিরিখাত ও স্থানে স্থানে নয়নভোলানো আবাদী জমিসহ বিশাল মালভূমি। হিজাজের এই পার্বত্য অঞ্চলে জন্ম নিয়েছে লালিত হয়েছে ইসলাম। এখানেই পবিত্র মক্কা ও মদিনা নগরী।

মোটামুটি চারটি অঞ্চলে বিভক্ত এই বিশাল ভূখণ্ড। আরব পেট্রিয়া, এটি উত্তরে প্রাচীন ইডোমিট ও মিডিয়ানিটদের দেশ নিয়ে গঠিত। এরপর তিহামা প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত হিজাজ প্রদেশ। এরমধ্যে রয়েছে প্রসিদ্ধ শহর ইয়াসরিব এই শহর পরবর্তীতে নবীর শহর মদিনাতুন্নবী বা মদিনা নামে পরিচিত হয়। হিজাজের দক্ষিণে তিহামা প্রদেশ এখানে মক্কা এবং মুসলিম তীর্থযাত্রীদের অবতরণস্থল জেদ্দা বন্দর অবস্থিত। চতুর্থ ও সর্বদক্ষিণাংশ আছির, ইয়েমেনের প্রান্তসীমায় শেষ হয়েছে। ইয়েমেনের নামকরণ করাই হয়েছে—এ আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তসীমা, পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, উত্তরে হিজাজ ও পূর্বে হাদ্রামাউত দ্বারা পরিবেষ্টিত। দক্ষিণ আরবের ক্ষেত্রে প্রায়ই ইয়েমেন নামটি ব্যবহৃত হত। ফলে যথার্থ ইয়েমেন ছাড়া হাদ্রামাউত এবং হাদ্রামাউতের পূর্বে অবস্থিত মাহ্রা জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মাহ্রার পরে ওমান এবং তার উত্তরে পারস্য উপসাগরের উপর আল্ বাহ্রায়েন বা আল্ আহ্সা। তার প্রধান প্রদেশের নাম থেকে এই দেশ হিজর বলেও অভিহিত হয়।

নজদ বৃহৎ উচ্চমালভূমি। এটি পূর্বদিকে হিজাজের পর্বতসমূহ থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম দিকে চলে গেছে এবং মধ্য আরবভূমি গঠন করেছে। ইয়েমেনের সীমান্ত ঘেঁষে নজদের যে অংশ বিদ্যমান তাকে ইয়েমেনের নজদ বলে। তার উত্তরাংশ শুধু নজদ হিসেবে পরিচিত। ইসলামের ইতিহাসের বিখ্যাত একটি পার্বত্য প্রদেশ ইয়ামামা। ইয়ামামা এই দুটি বিভাগকে বিচ্ছিন্ন করেছে। সিরিয়ার মরুভূমিতে নজদের উত্তরাংশ বিস্তৃত হয়েছে—প্রকৃতই এটা আরবের অংশ নয়। তবে সেখানে আরবের বিভিন্ন গোত্র স্বাধীন ও দুর্বারভাবে ঘোরাফেরা করতো। এদের পূর্বপুরুষ প্রাচীন আরামীয়দের ন্যায় যাযাবর ছিল। ইরাকের মরুভূমি ছিল উত্তর পূর্ব অংশ। এটা ইউফ্রেটিসের দক্ষিণ পাড়ে অবস্থিত চ্যালডিয়ার উর্বর ভূখণ্ডে গিয়ে শেষ হয়েছে। সেই সাথে আরবের আবাদভূমিকে পৃথক করেছে। পূর্বদিকে নজদ আরবগণ যাকে নাফুদ অর্থাৎ মরুভূমির খনি বলতো তার দ্বারা আল্ আহ্সা থেকে পৃথকীকৃত। দাহনার বিশাল মরুভূমি ছিল দক্ষিণদিকে। এই মরুভূমি হাদ্রামাউত ও মাহ্রা থেকে নজদকে আলাদা করেছে।

www.amarboi.org

ফ্রান্সের দ্বিগুণ আয়তন ছিল এই বিরাট ভূখণ্ডের। তখন ইহা শক্তির শিখরে অবস্থান করছিল। 'শহরবাসী' ও 'মরুবাসী' এই দুই শ্রেণীর অধিবাসী দ্বারা অধ্যুষিত ছিল এই ভূখণ্ডটি। বার্টন ও প্লুলের মন্তব্যে স্পষ্ট ছবি ভেসে ওঠে সে সময়ের এই জনপদের বেদুইনদের সদগুণ ও ত্রুটি, নিজ গোত্রের প্রতি অবিচল ভক্তি, অদ্ভুত আত্মসম্মানবোধ, হঠকারিতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা এবং মানুষ্য জীবনের প্রতি অবজ্ঞা সমাজের নিত্যচিত্র। যদিও বেদুইন ও শহরবাসীদের মধ্যে পার্থক্য যাই থাক-না-কেন উভয়ই মরুভূমির সন্তান। স্বাধীনতার প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা এসেছে আরবজাতির মূলত আধ্যাত্মিক সমুন্নতির মাধ্যমেই। মক্কা এবং ওকাজে বার্ষিক মেলা হলেও যে-সব গোত্র ও জাতি আরবদেশে বসবাস করতো তারা সমজাতীয় ছিল না। এক গোত্রের সাথে অন্য গোত্রের কমবেশি পার্থক্য পরিলক্ষিত হত। তাদের উৎপত্তির বিভিন্নতার জন্যই এই পার্থক্যের মূল কারণ। এই উপদ্বীপে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বংশের লোক বাস করেছে। বিলুপ্ত হয়ে গেছে অনেক বংশই। তবে তাদের দুষ্কৃতি বা তাদের পরাক্রম পরবর্তী বংশধরদের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে এবং এই ঐতিহ্যই জাতিগুলোর ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। আরবরা নিজেরাই এই উপদ্বীপে যারা বাস করতো তাদেরকে তিনটি দলে বিভক্ত করেছে। ১. 'আরাবুল বায়দানে', ধ্বংসপ্রাপ্ত আরবগণ, এদের অন্তর্ভুক্ত হল হেমেটিক উপনিবেশগুলো (কুশাইটগণ)—তারা উপনিবেশিকতার বেলায় সেমিটিকদের পূর্ববর্ত ছিল, এমনকি সিরিয়া, ফিনিসিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলের আরামিয়ান জনগণের ন্যায়। ২. 'আরাবুল আরিবা' বা 'মুত্তারিবা' মূল আরবগণ, মূল সেমিটিকগণ, যাদেরকে ঐতিহ্য 'খাতান' বা 'যোকতান' থেকে অবতরণ করেছে বলে চিহ্নিত করে এবং যারা দক্ষিণে এগিয়ে যাওয়ার সময় আদিম অধিবাসীদের ধ্বংস করেছিল। তারা অধ্যুষিত দেশগুলোর আদিম অধিবাসীদের হেমিটিক আকাশপূজারীগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। এদের আদি বাসস্থল ছিল যেখান থেকে ইব্রাহীম বংশোদ্ভূত লোকেরা এসেছিল সেখানে। ইউফ্রেটিস নদী, দক্ষিণতীরের ব্যাবিলন বাইরাক-আরাবী নামে বর্তমানে যে জেলা বলা হয়ে থাকে তার নেপথ্যে রয়েছে যোকতানের দুজন প্রত্যক্ষ পূর্বপুরুষের অর্থবহ নাম—আরফাজাদ, 'চ্যাল্ডিয়ানদের সীমান্ত', এবার, (নদীর) 'অপর তীরবর্তী লোক'—যারা সঠিকভাবে নির্দেশিত হয়ে থাকে।[২৪] ৩. 'আরাবুল মুস্তারিবা বা 'দেশীকৃত আরবগণ', শান্তিপূর্ণ আগন্তুক বা সামরিক উপনিবেশিক হিসেবে এই উপদ্বীপে প্রবেশ করেছিল ইব্রাহিম বংশোদ্ভূত সেমিটিকরা এবং বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল আরবদের সঙ্গে (তারা ছিল যোকতান বংশোদ্ভূত আরব)। এই যোকতান-আরবীয়কের সাথে পারস্পারিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এই ইব্রাহিম বংশোদ্ভূত সেটিকরা এখানে বসতি গড়ে তোলে।[২৫] 'আরিবা', 'মুত্তারিবা', 'মুস্তারিবা' এই ধাতুর উৎপন্ন। আর এই শব্দগুলোর বৈয়াকরণিক রূপান্তর বিভিন্ন সময়ে বংশগুলো যে এ-দেশীকৃত হয়েছিল তার ইঙ্গিত দেয়।

ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখের দাবীদার বংশগুলোর মধ্যে 'আরাবুল আরিবা' শ্রেণীর বংশগুলো বিশেষভাবে উল্লিখিত সেগুলো হল, বণী জাদ,[২৬] আমালিকা, বণী

www.amarboi.org

সামুদ[২৭] এবং বণী যাদিস (ডায়ো ডোরাস সিসুলাস ও টলেমীর সামুদিয়েন ও যডিসাইট)। উৎপত্তির দিক দিয়ে বণী আদ হেমেটিক বংশোদ্ভূত তারা আরব উপদ্বীপের প্রথম আগন্তুক ও ঔপনিবেশিক—এরা মধ্য আরবে প্রধানভাবে বসতি প্রতিষ্ঠা করেছিল—এই অঞ্চলকে 'আহসাফুর রামাল' বলে আরব-ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিকগণ অভিহিত করেছেন, এ ইয়েমেন, হাদ্রামাউত ও ওমানের সন্নিকটবর্তী। তাদের অস্তিত্বের একটি যুগে তারা শক্তিশালী ও বিজেতা জাতিতে পরিণত হয়েছিল। নৃপতি সাদ্দাদ এই বংশেরই ছিলেন, তার নাম কোরআনে উল্লেখ রয়েছে। তিনি হয়তো তার শক্তি ও প্রতিপত্তি আরবের বাইরেও বিস্তৃতি সাধন করেছিলেন। শোনা যায়, তিনি ইরাক পেরিয়ে ভারতের প্রান্তসীমা পর্যন্ত জয় করেছিলেন। এই পরম্পরাগত জনশ্রুতি নির্দেশ করে যে, খ্রিস্টধর্মের ২০০০ হাজার বছর আগে আরবগণ ব্যাবিলনিয়া বা চ্যালডিয়া জয় করেছিলেন। এই ঘটনা পারস্যের লোক-পরম্পরায় সম্ভবত যাহক—অভিযান বলে অভিহিত। মিশর ও সুদূর পশ্চিমে একই শাদ্দাদ অথবা একই নামযুক্ত তার উত্তরাধিকারী অভিযান চালিয়েছিলেন। আরবগণ কর্তৃক এই মিশর অভিযান হিকসসের অভিযানের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেভাবে দক্ষিণদিকে যাযাবর অভিজেতাগণকে চিরতরে থেবাইড ও ইওথপিয়া বা কোসাইট প্রতিবেশীদের যুগ্ম সহযোগিতায় বিতাড়িত করা হয়েছিল—এই ঘটনা কিছুটা হলেও মতবাদটির স্বপক্ষে পরিপোষকতা করে।

শ্রুতি আছে যে, দেশে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়ার ফলেই আদদের একটা বিরাট অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। এই বংশের কতিপয় লোক বেঁচেছিল, আর তারাই হল দ্বিতীয় 'আদ' জাতি। তারা ইয়েমেনে যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করে। এরপরের আদগণ যোকতান প্রবাহের মধ্যে মিশে গিয়েছিল।

সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আমালিকাইটস হলো এই বণী আমালিকা বংশ। লেনোরম্যান্ট তাদেরকে আরাসীয় বংশ বলে অনুমান করেছেন। মিশরীয় মনুমেন্টের শাশু—যারা আরবে প্রবেশ করেছিল প্রাথমিক অ্যাসিরীয় নৃপতিদের দ্বারা বহিষ্কৃত হয়ে এবং ধীর ধীরে ইয়েমেন ও হিজাজ, প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ায় বিস্তৃত হয়েছিল। তারা মিশরে প্রবেশ করে এবং বেশ কয়েকজন ফেরাউন (মিশরের নৃপতিদের পদবী) তাদের মধ্য থেকেই আসেন। বণী যুরহুম হিজাজের আমালিকাদের এবং বণী কাহাতনের একটি শাখাকে বিতাড়ন অথবা ধ্বংস করেছিল। দক্ষিণ আরবে এই বণী যুরহুম বংশ বসতি স্থাপন করেছিল এবং পরবর্তী সময় উত্তরদিকে এগিয়ে আমালিকাদের পর্য্যুদস্ত করে।

কুশাইট বা হিমিটিক বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিল বণী সামুদগণও, যেমনি ছিল বণী আদ। প্রথমে তারা ইদম সীমান্ত এবং পরে হিজর নামক দেশে বসতি স্থাপন করে। হিজর ছিল আরব প্যাট্রিয়ার পূর্বে হিজাজ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে। গুহায় বসবাসকারী এই গোষ্ঠী পাহাড়ের পাশ কেটে বাড়ি তৈরি করতো। 'আর্লী ট্রাভেলস্' গ্রন্থে স্যার হেনরী লেয়ার্ড এসব পার্বত্য ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপের বর্ণনা দিয়েছেন। সামুদদের সঠিক অবস্থানের

www.amarboi.org

ব্যাপারটি স্থির করা যায় আরবদের লোক-পরম্পরায় আসা ঐতিহ্যকে আধুনিক পর্যটকদের বর্ণনা ও সাম্প্রতিক আবিষ্কারের ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করে। সিরিয়া এবং নজদ বা হিজাজের মধ্যে বাণিজ্যের 'অপরিহার্য মধ্যস্থতাকারী' হিসেবে সামুদগণ সমৃদ্ধির এক চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। পরিশেষে তারা সিরিয়া ও আরবে বিজয় অভিযান চালানোর সময় বিখ্যাত ইলামাইট অভিজেতা চেদরলাওমার (খুজার আল-আহমার) কর্তৃক বহুলাংশে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন এই গুহাবাসীগণ তাদের ঐশী গজব থেকে নিরাপদ মনে করতো এই পার্বত্য বাসস্থানে বাস করে। কিন্তু এক ভয়াবহ দুর্গতি তাদের ভাগ্যে এলো। কোরাইশদের প্রতি সাবধান বাণী উচ্চারণ প্রসঙ্গে কোরআনে সে বিষয় অনেকবার উচ্চারিত হয়েছে। ইলামাইটিক উপসাগরের উত্তরে সের পর্বতে এই বিপদের পরেও যে-সব বণী সামুদগণ বেঁচে রয়েছিল তারা আশ্রয় নিল। তারা এখানে ইসহাক ও ইয়াকুবের সময় বাস করতো। কিন্তু তারা দ্রুত বিলীন হয়ে গিয়েছিল, প্রতিবেশী বংশগুলোর মধ্যে মিশে গিয়েছিল এবং তাদের স্থান দখল করেছিল ইদমবাসীরা যারা কিছুদিনের জন্য সের পর্বত অধিকার করে নিয়েছিল। বণী কাহ্তন বংশোদ্ভূত আরবগণ এই ইদমবাসীদের উত্তরাধিকারী। তারা ডায়োডোরাস সিকুলাসের সময় তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় একই নামে রোমক বাহিনীতে সেনাদল পাঠাতো।

আমরা এখন বণী যুরহুমদের আলোচনা করতে চাচ্ছি। তাসম, যাদিস ও অন্যান্য ছোট ছোট গোত্র, যেগুলি বিশেষভাবে উল্লিখিত নয় তাদের প্রসঙ্গে আলোচনা থেকে বিরত থাকলাম। বণী যুরহুম 'আরাবুল আরিবা' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এবং হিজাজে 'সোমালিকা বংশকে পরাভূত পর্যুদস্ত ও স্থানচ্যুত করেছিল বলে অনুমান করা হয়। ধারণা করা হয় এই যুরহুম নামে দুটি গোত্রের অস্তিত্ব ছিল—একটি অনেক পুরানো এবং আদদের সমসাময়িক। তারা হয়তো কুশাইট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আর অপর গোত্র কাহ্তানের বংশধর—তারা এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সময় ইয়েমেনের উপত্যকা থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং হিজাজের আমালিকাদেরকে তাড়িয়ে সেখানে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে। যখন ইসমাইলীয় আরবগণ বণী আমালিকাদের মধ্যে প্রাধান্য অর্জন করছিল ঠিক তখনই কাহ্নাইট বংশের বণী যুরহুম গোত্রের আক্রমণ হয়। আক্রমণকারী দলগুলোর সাথে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল ইসমাইলীগণ। ইসমাঈলীয়রা এখানে অনেক আগে থেকেই বসতি স্থাপন করেছিল। তারা আক্রমণকারীদের পাশপাশি বাস করতো। যুরহুম গোত্রের লোকেরা উপত্যকায় তাদের শক্তি হারাচ্ছিল ইসমাইলের বংশধরদের অগ্রসরমান প্রবাহের সামনে। একশ' বছর পার হতে-না-হতেই হিজাজ ও তিহামা ইব্রাহিমীয় আরবদের করায়ত্ত হয়। যদিও 'মুস্তারিবা' আরবগণের ক্রমশবিকাশ ব্যাবিলনীয় নৃপতির আক্রমণের ফলে সমসাময়িকভাবে বিপর্যস্ত হয় তবুও তারা দ্রুত তাদের প্রাণশক্তি ফিরিয়ে আনে। আর নিজেদের বিস্তৃত করেছিল হিজাজ, নজদ, ইরাক ও মেসোপটিমিয়ার মরুভূমিতে। এখানে তারা তাদের পূর্বসূরী কাহ্তনদেরকে বিলীন করে দিল নিজেদের মধ্যে।

www.amarboi.org

ইবারের পুত্র কাহতান থেকে 'আরাবুল মুতারিবা' গোত্রগুলো উদ্ভূত হয়। আরবের উত্তর-পূর্বদিক থেকে কাহতানের বংশধরেরা আরবে প্রবেশ করে এবং দক্ষিণদিক পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। কুশ বংশের আদ গোত্রের সঙ্গে এখানে তারা কিছুদিন তাদের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের অধীনে বাস করে। শুধু দক্ষিণ আরবেই কাহাতন বংশের লোকেরা সীমাবদ্ধ ছিল না। এদের আদিবাস ছিল মেসোপটিমিয়া। সেখান থেকে তারা যখন দক্ষিণদিকে ইয়েমেনে যায় তখন কাহাতন বংশের লোকেরা সমস্ত আরব উপদ্বীপ পরিক্রমণ করেছিল এবং তাদের যাত্রাপথের পাশে বসতির চিহ্ন রেখে গিয়েছিল।

আরব ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেন যে, এ সময় ইবার বা হেবারের পুত্র আরব উপদ্বীপে যে জনপ্রবাহ চলছিল তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কাহ্তান ও ইয়াকতান ছিল দুই ভাই। কাহাতানের পুত্র ইয়ারেব যাকে ঐতিহাসিকগণ ইয়েমেনের প্রথম যুবরাজ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি তার নামানুসারে তার বংশধরদের এবং সমগ্র উপদ্বীপটির নামকরণ করেছিলেন। শ্রুতি আছে যে, ইয়ারেবের পুত্র ইয়েশহাদ পিতার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। তিনি রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী মারেবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বিখ্যাত আব্দুস সামশ ওরফে 'সাবা'র পিতা। বিজয়াভিযানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এই উপনাম পেয়েছিলেন। বিভিন্ন কাহাতান গোত্রের পূর্বপুরুষ সাবার পরবর্তী বংশধর। এরা আরব ঐতিহ্য পরম্পরায় বিখ্যাত। হিমার ও কুহলান নামে সাবা দুই পুত্র রেখে যান। হিমার তার পিতার সিংহাসনে বসেছিলেন এবং তাঁর নামানুসারেই সাবা রাজবংশ হিমাইরা বলে অভিহিত হত। হিমার অর্থ লাল।[২৮] তাঁর ও তাঁর বংশধরেরা মুহম্মদ (সঃ)-এর আগমনের পূর্ব শতাব্দী পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেছেন। মহান যুলকার নায়েন এই বংশেই জন্মেছিলেন। এ ছাড়াও আরও জন্মেছেন বিখ্যাত রানী বিলকিস যিনি সোলাইমান (আঃ)-এর সময় জেরুজালেমে গিয়েছিলেন।

প্রচলিত ঐতিহ্য অনুযায়ী আরবে যখন ইব্রাহিম চ্যালেডিয়া থেকে নির্বাসিত হন তখন থেকেই আদি ইসমাইলীয় বসতির শুরু হয়। বাবিলনের পরাক্রমশালী রাজা নেবুচাদনেজ্জার কর্তৃক পর্যুদস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মিত্রশক্তি যুরহুম গোত্রগুলোসহ ইসমাইলের বংশধরগণ হিজাজে বিস্তার লাভ করেছিল ও সমৃদ্ধশালী হয়েছিল। যেসব নৃপতি আরবদেশের হৃৎপিণ্ডে আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে শুধু নেবুচাদনেজ্জারই সফল হন। মক্কা নগরীর পতন আরব উপদ্বীপে ইব্রাহিমের বংশধরদের প্রতিষ্ঠার সমসাময়িক। কেননা, আরবদের ঐতিহ্য অনুযায়ী যুরহুম বংশের প্রধান মেগহাস বিন আমরের কন্যাকে মুস্তারিবা আরবদের প্রতিষ্ঠাতা ইসমাঈলের সঙ্গে বিবাহ দেয়া হয়েছিল। মক্কা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা ইসমাইল। প্রায় একই সময়ে মক্কার কাবাগৃহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই কাবাগৃহ আরবের অন্যান্য নগরীর উপর মক্কার বিপুল প্রাধান্য বিস্তার করে। গোত্রগুলোর বিশুদ্ধ পিতা ইব্রাহিম কর্তৃক সুদূর অতীতে প্রতিষ্ঠিত কাবাগৃহ জাতির সর্বাপেক্ষা পবিত্র ইবাদতখানা হিসেবে সমাদৃত ছিল। এখানে শোভেত ছিল প্রত্যেকদিনের জন্য দেবাদিদেব হোবলের চারিপাশে বিন্যস্ত আকিক পাথরে নির্মিত

www.amarboi.org

তিনশত ষাটটি মূর্তি, দুটি গজল, স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি দ্রুতগামী মৃগ। ইব্রাহিম ও তদীয় পুত্রের প্রতিমূর্তি। এখানে প্রতিবছর "হযরত আদম (আঃ)-এর সময় স্বর্গ থেকে পতিত কালো পাথর (হজরে আসওয়াদ) চুম্বন করতে এবং নগ্ন অবস্থায় কাবাগৃহ সাতবার প্রদক্ষিণ করতে" বিভিন্ন গোত্রের লোক আসতো। সুতরাং প্রাচীনকাল থেকেই মক্কা শুধু আরবদের ধর্মীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ছিল না, বরং বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতীতকালের বাণিজ্যের রাজপথে অধিষ্ঠিত থাকায় মক্কা প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে সম্পদ ও সংস্কৃতি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিল। এমনকি মক্কার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির উপর ব্যাবিলনের নৃপতিও হাত দিতে পারেনি। কারণ অবস্থানের অপরিহার্যতার ফলে হিজাজের আরবগণ বিশ্বের জাতিগুলোর পরিবাহক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল।

বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র ছিল মক্কা। ফলে প্রাচ্যের অন্যান্য জাতিগুলো থেকে আরবগণ সবসময় স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত হয়েছিল। কারাভার যাত্রা মক্কা থেকে শুরু হত। তারা পণ্যসামগ্রী ইয়েমেনে ও ভারত থেকে বাইজান্টাইন রাজ্যসমূহে ও পারস্যে নিয়ে যেত। তারা বাণিজ্যিক দ্রব্য ছাড়াও অনেক কিছু আমদানি করতো এবং পারস্য থেকে সিল্ক ও অন্যান্য দ্রব্য আনত। এ সকল কারাভার সঙ্গে এসেছিল বিলাসী জীবনের অভ্যাস ও পাপ যা প্রতিবেশী সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ড কুরে কুরে খাচ্ছিল। সিরিয়া ও ইরাক থেকে আমদানিকৃত গ্রীক ও পারসিক দাসীরা তাদের পাপের ইন্ধন যোগাত। জাতির গর্বের বিষয় হিসেবে যেসব কবির কবিতা গণ্য হতো তারা শুধু ঐহিক জীবন-বন্দনা গাইতেন এবং জাতির ইন্দ্রিয়পরায়ণতাকে উদ্দীপিত করতেন। কেউই আগামীদিনের কথা ভাবতো না।

আরবগণ, বিশেষভাবে মক্কাবাসীগণ গভীরভাবে আসক্ত ছিল মদ্যপান, জুয়া ও সঙ্গীতের প্রতি। অন্যান্য প্রাচ্য দেশের মতো নৃত্য ও গীত একশ্রেণীর দাসী রমণীরা অনুশীলন করতো, তাদেরকে 'কীয়ান', একবচনে 'কায়না' বলা হত এবং তাদের নীতিহীনতা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। তবুও তারা সর্বোচ্চ সম্মানে অধিষ্ঠিত ছিল এবং বড় বড় দলপতিগণ তাদের প্রতি প্রণয় নিবেদন করত।[২৯] বহুবিবাহ হিন্দুদের মত অবাধে অনুশীলিত হত। মাতা ছাড়া অন্য বিধবা মৃত ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পর্যবসিত হত এবং পুত্রের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে পর্যবসিত হত। নালী-শিশু বিক্রয়ের মতো নিষ্ঠুর ও অমানবিক ব্যবসা ছিল সার্বজনীন।

ইহুদিরা আরবদের মধ্যেই তাদের নিরাপত্তা ও আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল ইহুদিরা পরপর অ্যাসিরীয়, গ্রীক ও রোমকদের দ্বারা জন্মভূমি থেকে তাড়িত হয়। কিন্তু তারা তাদের ধর্মের সঙ্গে সংঘাতের সেই সুতীব্র মনোভাব বহন করে এনেছিল যা তাদের অধিকাংশ দুর্গতির মূলে ছিল। তারপরেও তারা আরবের অনেক ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করতে পেরেছিল। আর মুহম্মদ (দঃ) যখন নবুয়ত প্রাপ্তির ঘোষণা করতে যাচ্ছিলেন তখন ইয়েমেনে কুহলানের পুত্র, হিমইয়ার ও কিন্দার বংশধরদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ইহুদিধর্ম পালন করতো। খায়বর ও ইয়াসরেবে ইসমাইলী বংশোদ্ভূত বণী কুরাইজা ও

www.amarboi.org

বণী নাজির গোত্র ও ইহুদিধর্ম পালন করতো। তবে অনেক আগে থেকেই তারা আরবদের মতো স্বদেশী হয়ে গিয়েছিল। আরবে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল নেস্তোরিয়ান ও জ্যাকোবাইট খ্রিস্টানগণও। আরবের প্রদেশগুলোতে এই দুই ধর্মাবলম্বী লোকদের প্রভুত্ব বিস্তারের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে প্রচুর ক্ষতি-সাধিত হয়েছে। মেসোপটোমিয়ায় প্রতিষ্ঠিত তাগলিবাইত ও বাহরাইনে বসতি স্থাপনকারী বণী আব্দুল কায়েস গোত্রগুলোর বিভিন্ন শাখার মধ্যে খ্রিস্টানধর্ম প্রবেশ করতে লাগলো। নযরানে বণী হারিস-বিন-কাব, ইরাকে বণী ইবাদ, সিরিয়ায় গাসানাইড, ও কতিপয় খুজাইত পরিবারে এবং দুমাতুল জান্দালে সাকোনি বণী কালবদের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল। সে সমস্ত গোত্র প্যালেস্টাইন ও মিশরের মধ্যবর্তী মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াতো তাদের কিছু কিছু ছিল খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। আরবদের মধ্যে, বিশেষ করে হিমাইয়ার বংশোদ্ভূতদের মধ্যেও মাজীবাদ এবং জোধাম, বৃহস্পতির, বণী তাঈ ক্যানোপাসের; কায়েস আইলানের বংশধরগণ, লকক নক্ষত্রের৩০ এবং কোরাইশদের একটি অংশ তিন চন্দ্রদেবীর দীপ্তিমান চন্দ্র আল্লাত—অন্ধকারাচ্ছন্ন চন্দ্র-আলামানাত এবং দীপ্তি আঁধিয়ার সমন্বিত চন্দ্র—আউজ্জল। এদেরকে আল্লাহ্র দুহিতা (বানাতুল্লাহ্) বলে অভিহিত করা হত, তাদের উপাসনা করত। তখন মক্কানগরী সুদূরপ্রসারী পৌত্তলিকতার কেন্দ্র ছিল। আর তার শাখা-প্রশাখা সমগ্র আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। রাজনৈতিক ও বংশগত সম্পর্কের দিক দিয়ে কোরাইশদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত কিনান আলডোবারণ নক্ষত্র ছাড়াও মক্কা থেকে দেড় দিনের পথ নাখলায় অবস্থিত একটি বৃক্ষ দ্বারা প্রতিবেদিত, দেবী উজ্জার উপাসনা করত। মক্কার দক্ষিণ পূর্ব দিকে হাওয়াজিম গোত্র ঘুরে বেড়াতো। তায়েফে অবস্থিত দেবী লাভের মূর্তিই ছিল তাদের প্রিয় উপাস্য। একটি পাহাড় মানাতের প্রতিবেদন করতো, পাহাড়টি মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন সেমিটিক, ফিনিশিয় ও ব্যবিলনীয় জাতিসমূহের মধ্যে প্রচলিত উপসানার প্রকৃতির মতো এসব মূর্তির পূজা ছিল প্রধানত সৃষ্টিরূপিণী মাতৃপূজা। কিন্তু আরবজাতির অধিকাংশ গোত্র, বিশেষ করে মোজার বংশের অন্তর্গত গোত্রগুলো অত্যন্ত নিম্নস্তরের এক জড়বাদে ছিল আসক্ত। প্রধান উপাস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ, দ্রুতগামী হরিণ, ঘোড়া, উট, খেজুর গাছ, পর্বত পাথর ইত্যাদির মতো অজৈব বস্তু। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র ধারণা তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোকের ছিল। তারা যুগের অন্ধকারের সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করে একজন পরিত্রাণকারীর আবির্ভাবের জন্য ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করছিল। তারা তাদের অন্তরে অনুভব করতো যে শীঘ্রই পরিত্রাণকারীর আবির্ভাব ঘটবে।

সেকালে কোন কোন গোত্রের মধ্যে এমনও ছিল যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হলে কবরে উট বলি দেয়া হত অথবা অনাহারে মরতে দেয়া হত এই বিশ্বাসে যে, পরকালে জবেহকৃত পশু মৃতের বাহন হিসেবে কাজ করবে। কেউ কেউ বিশ্বাস করতো যে, আত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর 'হামাক' বা 'ছাদাহ' নামক পাখির আকার নেয়। আর

www.amarboi.org

যদি কেউ নিহত হয় তবে পাখিটি কবরের উপর থেকে বলে 'আমাকে পানি দাও'। 'আমাকে পানি দাও'। এই কথা সে বলে যতক্ষণ না পর্যন্ত তার হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া হয়। সার্বজনীন বিশ্বাস ছিল জিন, পিশাচ এবং তাদের বিগ্রহ থেকে পাওয়া ভবিষ্যদ্বাণী বা 'আযলাম' বা 'কিদাহ্' বলে অভিহিত অর্থহীন তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে পাওয়া যেত তার উপর। বিশেষ বিগ্রহ ও বিশেষ মন্দির ছিল প্রত্যেক গোত্রের। মূল্যবান উপঢৌকন পেতেন এ সকল মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত পুরোহিত ও প্রচারকর্গণ ভক্তদের কাছ থেকে। অনেক সময়ই রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হত বিরোধী মন্দিরের সমর্থক বা উপাসকদের মধ্যে।

কিন্তু ইব্রাহিম ও ইসমাইল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত উপাসনালয় কাবার খ্যাতি সকল মন্দিরের মধ্যে অমলিন রয়েছে। এমনকি ইহুদি এবং সেবিয়ানরা সেখানে তাদের নৈবেদ্য পাঠাতো। বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে ভীষণ ঈর্ষার কারণ ছিল এই ভজনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। কেননা কাবার হিফাজতকারীদেরকে সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক ভূমিকা ও সুযোগ-সুবিধায় অভিষিক্ত করতো। হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর জন্মকালে তাঁর বংশের লোকেরা এই সম্মানের অধিকারী ছিল। তাঁর পিতামহ কাবাগৃহের সেবাইতদের সম্মানিত প্রধান ছিলেন। নরবলি প্রায় সময়ই অনুষ্ঠিত হত। মন্দিরগুলোতে বিশেষ মূর্তি, প্রত্যেক পরিবারে গৃহদেবতাদের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর এসব গৃহদেবতাদের প্রতি আনুষ্ঠানিকতা অত্যন্ত কঠোরতার সাথে পালন করতো।

আরবদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা এমন ছিল যে খ্রিস্টধর্ম কিংবা ইহুদিধর্ম কোনটাই তাদেরকে মানুষের স্তরে উন্নীত করতে ব্যর্থ হয়েছে। মুয়ির বলেন, 'খ্রিস্টধর্ম প্রচারের পাঁচশত বছর পরে আমরা বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কিছুসংখ্যক খ্রিস্টধর্মাবলম্বী লোকের সন্ধান পেয়ে থাকি—নযরানের বনী হারিস, ইয়েমামার বনী হানিফা, তায়ামার কিছুসংখ্যক বনী তাই এবং কদাচিৎ এর বাইরে। তুলনামূলকভাবে বিপুল শক্তির অধিকারী ছিল ইহুদিধর্ম। তবে সক্রিয় ও ধর্মান্তকরণে সমর্থশক্তি হিসেবে ইহুদিধর্ম তখন আর ছিল না। যদিও হঠাৎ একসময় জুনওয়াজের নেতৃত্বে প্রচণ্ডভাবে ইহুদি ধর্ম ধর্মান্তকরণে মোড় নিয়েছিল। পরিশেষে ধর্মীয় দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে আরব ভূখণ্ড মাঝে মাঝে খ্রিস্টধর্মের হীন প্রয়াসে দোলায়িত হত। ইহুদিধর্মের তীব্রতর প্রভাব কোন কোন সময় গভীর এবং প্রচণ্ডভাবে আরবে বিভিন্ন ঘটনা ঘটাতো। কিন্তু দেশজ পৌত্তলিকতা ও ইসমাইলীয় কুসংস্কারের প্রবাহ, প্রত্যেক জায়গা থেকে কাবার প্রতি নিবদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন ও অকৃত্রিম আবেগ প্রভৃতি সাক্ষ্য দেয় যে, মক্কার ধর্ম ও উপাসনা আরব মননশীলতাকে কঠিন ও বিরামহীন দাসত্বের নিগড়ে বেঁধে ফেলেছিল।"[৩১]

এক গোত্রকে অন্য গোত্রের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হতে যে-সব কারণ থাকে সেসব কারণের সঙ্গে গোত্রগুলোর বিভেদ ও ঈর্ষা অ্যাসিরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রীক, পারসিক ও হাবশীদের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিমের বিভিন্ন প্রদেশের অধীশ্বর হতে প্রেরণা যুগিয়েছিল। জাতীয় 'ভজনালয়' কাবাগৃহ ধ্বংস করার ইচ্ছা নিয়ে হিজাজ আক্রমণ করেছিল আবিসিনিয়ার অধিবাসী হাবশীরা। কিন্তু তাদের শক্তিমত্তা আব্দুল মুত্তালিবের

www.amarboi.org

সবল দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ শক্তির কাছে মক্কার সম্মুখে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তারা বিশ বছর অত্যাচারের পর বিখ্যাত সায়েক জুল্ ইয়েজেনের পুত্র, একজন স্বদেশী যুবরাজ পারস্যের সাহায্যে তাদেরকে ইয়েমেন থেকে সরে যেতে বাধ্য করে। এই যুবরাজ মহান পারস্যসম্রাট নওশেরওয়ানের পৃষ্ঠপোষকতায় সার্বভৌমত্ব ভোগ করছিলেন। এখন তা সম্পূর্ণরূপে পারসিকদের করায়ত্ত হয় এবং ইয়েমেন পারস্য সাম্রাজ্যের করদরাজ্যে রূপ নেয়।[৩২]

আরবদেশের বিভিন্ন প্রদেশের উপর সরাসরি প্রভুত্ব চালিয়েছিল দুটি পরস্পরবিরোধী সাম্রাজ্য কন্স্ট্যান্টিনোপল ও টেসিফোন। এছাড়াও ঘাসান ও হীরার অধিপতি দুইজন শীর্ষতম দলপতি সিজার ও খসরুর মধ্যে তাদের আনুগত্য ভাগ করেছিল। তাছাড়া পারস্য ও বাইজান্টাইন পরস্পরের বিরুদ্ধে যে নিস্ফল ও উদেশ্যবিহীন মারাত্মক যুদ্ধ বাধিয়েছিল তা একমাত্র ধ্বংসের উদ্দেশ্যেই জনগণের রক্ত শুষছিল। খ্রিস্টানদের চেয়ে জরথুস্ত্রবাদীদের দাবী যদিও প্রায় সময়ই থাকতো ন্যায়সঙ্গত। তবুও যুদ্ধসাজে পরস্পর পরস্পরের সম্মুখীন হত ঘাসানবাসী ও হীরাবাসীরা অনেক সময় যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তো।

আরব উপদ্বীপের জনগণ যে-সব মিশ্র উপাদানে গঠিত তা দেশের লোকালয়ে নানা বৈচিত্র্য এনেছে। পৌরাণিক কাহিনীকে মাধ্যম নিয়ে ঘটনাকে সাজানো ছিল সংস্কৃত বর্জিত লোকদের প্রবণতা। তাদের কল্পনার বস্তুকে তারা শুধু রঙিন করেনি, দূরবর্তী বস্তুকে অত্যন্ত বিশালাকার করে তোলে। সংস্কৃতির বিভিন্নতা যতকিছুই হউক বাস্তবনির্ভর ক্ষেত্রে পৌরাণিক ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। ইয়েমেন ও দক্ষিণ পশ্চিমের হেমিটিক উপনিবেশ, পূর্বে আর্যদের মত প্রকৃত সেমিটিক তাদের সমর্থন করেছিল। সকলেই, সে ইহুদী হউক আর খ্রিস্টান হউক তাদের ঐতিহ্য ও পৌরাণিক কাহিনী সঙ্গে করে এনেছিল। সময়ের স্রোতে অতীতের এই ধ্বংসাবশেষ স্থায়ীভাবে একটি চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছিল। সাধারণ দৃষ্টিতে যতই অসার বলে মনে হউক-না-কোন, প্রকৃতপক্ষে দেখা যাবে যে বাস্তব অবস্থার একটি স্তর সেখানে বিদ্যমান থাকতো। আমরা এক পরাক্রমশালী সাম্রাজ্যের বিচিন্তা দেখতে পাই শাদ্দাদ ও তার ইরেম স্বর্গের পৌরাণিক আখ্যানে। চ্যাল্ডিয়ার মত এগিয়ে আসা এক সদৃশ সভ্যতা, ব্যাবিলনীয়দের আচরিত এক সদৃশ ধর্মসহ অট্টালিকাগুলোর নির্মাতা, দেখি একটি ঐশ্বর্যশালী জাতি, যে জাতি মিশর জয় করেছিল। মোটকথা, এমন এক জাতির সন্ধান আমরা পাই যে জাতির ক্ষেত্রে পরমভাবে পার্থিব উন্নতির সঙ্গে চরম নৈতিক পতন হয়েছিল। আদ ও সামুদ জাতির ঐতিহ্যগত, অর্ধ-পৌরাণিক উপাখ্যানগত, অর্ধ-ঐতিহাসিক ধ্বংসের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে অ্যাসিরীয় ও আরব, সেমিটিক প্রবাহের আগে ধ্বংসাত্মক নিয়তি পর্যুদস্ত করেছিল হেমিটিকদের।[৩৩]

নির্মম শত্রুদের কবল থেকে ইয়াকুব (আঃ) এর সন্তানেরা পালিয়ে গিয়েছিল। সেইসাথে হেমিটিকদের সাথে তাদের পৌরাণিক কাহিনী ও ঐতিহ্য একসূত্রে গেঁথেছিল।

www.amarboi.org

আরব উপদ্বীপের জন্যে তারা এভাবে তাদের অবদান রেখেছিল। আরবে সেমিটিকদের যে শেষ ঔনবেশিকগণ প্রবেশ করেছিল তারা ও তাদের প্রতিবেশীরা নিজেদের পরিচয় দিত ইব্রাহিমের বংশধর বলে। এই বিশ্বাস বয়ে এনেছিল ঐতিহ্য। আর শুধু বয়ে আনা নয় এটাকে রূপ ও বৈশিষ্ট্য দিয়েছে সময়ের বিবর্তন।

ম্যানেকীয় মতবাদ পারস্য ও বাইজান্টাইন থেকে দূর হওয়ার পর আশ্রয় নিয়েছিল আরবে।[৩৪] এই স্বাধীন দেশে আদি ডোসেট, মার্শিনাট, ভ্যালেন্টাইনদের সকলেরই প্রতিনিধি ছিল। নিজেদের মতামত ও ঐতিহ্য প্রচার করত তারা সকলেই। এসব দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে সময়ের স্রোতে তারা এক সময় মিশে গিয়েছিল। চিন্তার দিক থেকে এ সকল খ্রিস্টানরা সমঝোতায় বিশ্বাসী ছিল অনেকটা, ধর্মান্ধতা তাদের তেমন ছিল না। তারা মনে করতো যে, খোদার অবতার অথবা খোদার পুত্র, অনন্তের মাঝেই জন্মেছে। তিনি আলোকিত সিংহাসন থেকেই উদ্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরতে পারেন না, মরেননি। যিশুর মুখ দিয়ে গোঁড়া খ্রিস্টান ঐতিহ্য যে বেদনার বাণী বের করিয়েছে তা তাঁর মুখঃনিসৃত নয়। এই কথার অর্থ দাঁড়ায় যে, যে ব্যক্তি ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল সে ঐশী যিশু থেকে ভিন্ন ব্যক্তি। ঐশী যিশু তাঁর জুলুমকারীদের দৃষ্টি এড়িয়ে সেখানেই চলে গেছেন যেখান থেকে এসেছিলেন। এই মতবাদ যতই কল্পনাপ্রসূত হউক-না-কেন যিশুর পুত্রত্বের ধারণার সঙ্গে অনেকটা সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তা কিছুটা শক্তিশালী সম্ভাব্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে প্রতীয়মান হয়। পাইলেটের আন্তরিকভাবে যিশুকে বাঁচানোর চেষ্টা, নাজারাথের প্রেরিত পুরুষের হত্যায় ঘৃণা-বিদ্বেষ নিপতিত হয় সেদিকে হেড়োরের অনিচ্ছা; যখন সেই অন্ধকার মানবতার মহান কল্যাণকামীকে সেই বিভীষিকাপূর্ণ নাটকের শেষ দৃশ্যে নিয়ে গেল সারা রাতের সংঘটিত ঘটনা। এই নাটকের সর্বাপেক্ষা ভীতি-বিহ্বল অংশে অতি প্রাকৃতিক আঁধিয়ার পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করেছিল।[৩৫] এ সকল সমসাময়িক ঘটনা নির্দোষ ব্যক্তি যে পরিত্রাণ পেয়েছিল এবং দোষী ব্যক্তি সাজা পেয়েছিল, এই বিশ্বাসের সম্ভাব্যতাকে শক্তিশালী সম্ভাব্যতায় রূপ দেয়।[৩৬]

জনগণের বিশ্বাসের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বাসা বেঁধেছিল এই সব ঐতিহ্য, যা ছিল তথ্য-নির্ভর ও কল্পনার রঙে অঙ্কিত। হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর জন্ম হওয়ার পূর্বপর্যন্ত তাঁদের এ বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল। এসব ঐতিহ্যকে জনগণের মধ্যে প্রচলিত দেখতে পেয়েছিলেন যখন হযরত মুহম্মদ(দঃ) ইসলাম ধর্ম ও শরিয়তী আইন প্রচার করছিলেন এবং তিনি সেসব আরবজাতি আর আশপাশের জাতিগুলোকে সামাজিক ও নৈতিক পতন থেকে বাঁচাতে ভারোত্তলন দণ্ড হিসেবে প্রয়োগ করলেন।

সিনাই পর্বতে জ্বলে উঠা আলো গ্যালিলির কৃষক ও মৎস্যজীবীদের জীবন আলোয় ভরে দিয়েছিল। সেই আলো এখন দেদীপ্যমান এখন ফারান পর্বতের শিখরে।[৩৭]

www.amarboi.org

পাদটীকা

১। বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের নাম উচ্চারিত হলে দরূদ পড়া মুসলমানদের কর্তব্য। অন্যান্য নবীদের বেলায় একই নির্দেশ প্রযোজ্য। অনুবাদে 'দঃ' কিংবা "সাঃ" থাক বা না থাক, পাঠকগণ এ বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।—অনুবাদক

২। র. শিলথন—এনসিয়েন্ট মনার্কী, পৃ ৯৩।

৩। আরব্য শ্রুতি অনুযায়ী ইবরাহিমের পিতা আজর। 'আজর' স্পষ্টতই 'আশুর' শব্দের সঙ্গে একার্থক : মুসলমানদের সাহিত্যে আজরের তৈরি সুন্দর সুন্দর মূর্তির কথা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়। ইবরাহিম যিনি অ্যাসিরীয় বংশোদ্ভূত ছিলেন এসব শ্রুতিপরম্পরা এই বিশ্বাস প্রমাণ করে।

৪। একজন সমকালীন গ্রন্থকার মন্তব্য করেন যে ভাগবত গীতা নিঃসন্দেহে খোদাবাদের নির্দেশক; কিন্তু এই খোদাবাদ অন্যান্য ও অ-খোদাবাদ উপাদানের সঙ্গে সংমিশ্রিত।

৫। শ্রীকৃষ্ণ সাধারণত 'গোপাল কৃষ্ণ'—রাখাল কৃষ্ণ নামে অভিহিত হয়ে থাকেন; তার সঙ্গিনীরা 'গোপী' বা গোয়ালিনী নামে খ্যাত। উত্তর ভারতের গোপালন-গোত্র, 'আহীর'দের বীরদেবতাকে কেন্দ্র করে বহু সুন্দর উপাখ্যান গড়ে উঠেছে। শ্রীকৃষ্ণকে অনেকটা অসঙ্গতভাবেই হিন্দু জাতির 'এপোলো' বলে অভিহিত করা হয়েছে, কেননা যে কল্পনা গ্রীক দেবতা এপোলোকে চিত্রিত করা হয়েছে তাঁকে সেভাবে চিত্রিত করা কঠিন।

৬। তান্ত্রিকদের মধ্যে দু'টি প্রধান শ্রেণী রয়েছে—'দক্ষিণাচারী ও বামাচারী'—দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী তন্ত্র-উপাসক। দক্ষিণপন্থী তান্ত্রিকদের উপাসনা সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত, এবং বিষ্ণুর 'শক্তি'—'লক্ষ্মী' বা 'মহালক্ষ্মী'র উদ্দেশে নিবেদিত। পক্ষান্তরে বামপন্থী তান্ত্রিকদের উপাসনা 'তান্ত্রিকা' নামে পরিচিত এবং একমাত্র উপাস্য 'কালী'। এই উপাসনা গোপনীয়, এবং অবিশুদ্ধ আচারের মাধ্যমে উদযাপিত হয়। এই ধর্মমতের অনুসারীদের সংখ্যা ভারতে বিপুল এবং তারা বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত 'দুর্গপূজা'র উৎসব সাধারণত আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং এই পূজায় দুর্গা-প্রতিমা একটি সিংহাসনের উপর স্থাপিত হয়। উত্তর ভারতে এই মূর্তিকে হলুদ বর্ণে রঞ্জিত করা হয়, কিন্তু বাঙলায় এই মূর্তি চারখানা হস্তবিশিষ্ট এবং ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে সমাসীন এবং কালো বর্ণে রঞ্জিত। কালীঘাটের (যা থেকে কলকাতার নামকরণ করা হয়েছে) মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কালী প্রতিমায় নরমুণ্ড স্কন্ধদেশে শোভিত দেখা যায়। জয়পুরের মন্দিরের কালী-প্রতিমা দেবীর মস্তক পিছনদিকে ঘোরানো : লোকমুখে প্রচলিত আছে যে এই দেবীর যখন নরবলির পরিবর্তে পাঠাবলি দেওয়া হয়েছিল তখন দেবী ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যসহকারে তার মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

৭। পারস্যের ঐতিহ্য অনুসারে জাহাক হাজার বছরেরও অধিক কাল ধরে ইরান শাসন করেছিলেন এবং অ্যাসিরীয় শাসনকাল সঠিকভাবে নির্ণয়ের জন্য কিছু সংখ্যক পণ্ডিত এটা অনুমান করেন। এই মতানুসারে ফরিদুনের অভ্যুত্থান নিনেভার পতন সমকালীন।

৮। লিনোরম্যান্ট, অ্যানসিয়ান্ট হিস্ট্রী অব দি ইস্ট, পৃ. ৫৪।

৯। খ্রীস্টপূর্ব ৬০৬।

১০। জেট ৪৯, ২৭—২৯।

১১। সমি. ১৩৭।

১২। ডলিঞ্জার, 'দি জেনস্টাইল এন্ড দি জু', দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৩৯।

১৩। মোহসিনী ফানী—'দাবিস্তানে মাযাহিব' : শেখ মুহম্মদ ইকবালকৃত 'ডেভোলাপমেন্ট অব মেটাফিজিকস ইন্ পারিয়িা', পৃ. ১৮ দেখুন।

www.amarboi.org

১৪। মোশেম, 'একলেসিয়াসটিক্যাল হিস্ট্রি', ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩।

১৫। তুঃ মি. আর্নেস্ট ডি. বুনসেনের প্রবন্ধ : 'মুহম্মদ'স প্লেস ইন দি চার্চ', এশিয়াটিক কোয়াটারলি রিভউ, এপ্রিল ১৮৮৯।

১৬। মিলনার, 'হিস্ট্রি অব্ দি চার্চ অব্ ক্রাইস্ট' ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭।

১৭। ডোসেটগণ যিশুকে নির্ভেজার খোদা হিসেবে বিশ্বাস করত। "খোদার পুত্র যিশুখ্রীস্ট একটি দেহের ছায়ায় আবরিত থাকলেও এবং মরণশীল মানুষের দৃষ্টিতে অনুরূপ প্রতীত হলেও" মারশেনিটগণ যিশুকে "প্রায় খোদার সদৃশ" সত্তা হিসেবে বিবেচনা করত। পেট্রিপেশিয়েনগণ বিশ্বাস করত যে ক্রুশে পিতা খোদা পুত্র খোদার সঙ্গে নিগ্রহ ভোগ করেছেন। মোশেস এন্ড গিবন, প্রাগুক্ত; নিয়েন্ডার, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫০, ৩০১ এবং পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে।

১৮। সিবিলের উপাসনা বিখ্যাত হিন্দু দেবী দুর্গা বা কালী-ধর্মমতের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যে যুক্ত।

১৯। ডিলের "রোমান সোসাইটি ফ্রম নিরো টু মার্কস অবেলিয়ার্স ", ৫ম অধ্যায় ; লেগির "ফোররানার্স এন্ড রাইভাল্স অব্ খ্রিস্টিয়ানিটি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৭।

২০। ডিলের "রোমান সোসাইটি ফ্রম নিরো টু মার্কাস অরেলিয়াস", ৫ম অধ্যায়।

২১। মোশায়েম, পৃ. ১২১।

২২। আর সঙ্গ-ই মানি।

২৩। প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, ১০ম অধ্যায়।

২৪। মোশে, পৃ. ৪১১।

২৫। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগে (ইতালীর) সিয়েনার সেমিনাস অ্যারিয়াসের মতবাদ পুনরুজ্জীবিত ও সম্প্রসারিত করেছিল। বর্তমান কালের ইউনিট্যারিয়ানিজম সোসিয়ানদের প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক উত্তরসূরী। তারা যিশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেছিল। তারা মূল পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত মতবাদও বর্জন করেছিল। তাদের কাছে একমাত্র খোদাই উপাসনার যোগ্য।

২৬। গিবন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০৭।

২৭। সম্রাট জুলিয়ান (তথাকথিত স্বধর্মত্যাগী) বলেছেন বলে কথিত আছে : "সাধারণভাবে খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলি পরস্পর যেভাবে শত্রুভাবাপন্ন ছিল কোন বন্য হিংস্রপ্রাণীও মানুষের প্রতি তদ্রূপ শত্রুভাবাপন্ন নয়।"

২৮। আমর ইবনুল্ আস্ কিংবা 'আরব-ইতিহাসে'র আস্।

২৯। মিলম্যান সে যুগের খ্রিস্টধর্মের চিত্র এভাবে উপস্থাপন করেছেন : "কনস্টান্টিনোপলের বিশপ বাইজ্যানটাইন সাম্রাজ্যের নিষ্ক্রিয় বলি, বিনীত দাস ও রাজদ্রোহী প্রতিদ্বন্দ্বী; তিনি তার স্বেচ্ছাচারের উপর কোনরূপ উচ্চনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রায়শ বিস্তার করতে পারেননি। অধঃস্তন ধর্মযাজকেরা সমাজে গোপনীয় কল্যাণকর ও শুদ্ধি কাজ যাই করুন না কেন, তারা পর্যাপ্ত শক্তি, সম্পদ ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন যা উচ্চভিলাষ উদ্বুদ্ধ করতে বা ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে সমর্থ ছিল। কিন্তু তারা জনসাধারণের চিত্তকে কোন মহৎ প্রশংসনীয় লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে, ক্ষীয়মাণ যুগের দৃঢ়মূল নীতিহীনতাকে দমন করতে, বিবাদমান স্বার্থের সমন্বয় সাধনে, যুযুধান বংশসমূহকে একত্র করতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। সাধারণভাবে যখন তারা শাসন কাজ চালাতেন, তখন তারা সংস্কারাচ্ছন্ন ভীতিসহকারে শাসন চালাতেন, একটি কৃতজ্ঞ জাতির প্রতি সম্মানবোধ ও আসক্তি নিয়ে কাজ করতেন না। তারা ইতরজনের মূর্খতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিলেন এবং একটি

www.amarboi.org

ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার চরম বর্বরতার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। যে সব লোক শক্তিসম্পন্ন ও সমাজের কল্যাণকামী নাগরিক হতে পারত তাদের অনেককেই সন্ন্যাসধর্ম নিষ্ফল নির্জনতা ও ধর্মীয় আলস্যের মধ্যে টেনে এনেছিল। সন্ন্যাসীরা প্রায়ই প্রচণ্ড রাষ্ট্রনৈতিক কিংবা বিরোধী উপদল গঠন করত; তখন ছাড়া অন্য কোন সময়ে সমাজের অবস্থার উপর তাদের কোন প্রভাব থাকত না। তারা সমগ্র বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করত—তারা তাদের মরুর নির্জন নিবাসে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, তারা তাদের সতর্কপ্রহরাধীন মঠে অধিষ্ঠিত থেকে মনে করত যে তারা নিশ্চিত পরিত্রাণ লাভ করেছে এবং বিশ্বের অবশিষ্ট লোক পরকালে অবশ্যম্ভাবী বিনাশের অপেক্ষায় আছে।"

—মিলম্যান, 'ল্যাটিন ক্রিশ্চিয়ানিটি', ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৪।

৩০। তুচ্ছ দোষের জন্য তিনশত বেত্রদণ্ড প্রচলিত ছিল। ডোজির 'হিস্ট্রি দাস মুসলমানস দ্য এসপ্যাগন', ২য় খণ্ড পৃ. ৮৭ দেখুন।

৩১। লিওনারম্যান্ট, অ্যানসিয়েন্ট হিস্ট্রী অব দি ইস্ট, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩।

৩২। ইবনুস্ আসির, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৮।

৩৩। কাসিন দ্রা পার্সিভ্যাল 'বায়দা' ও 'আরিবা' সমার্থক বলে মনে করেন এবং মুতারিবাকে দ্বিতীয় দলে গণ্য করেন। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমি তদীয় শ্রেণীবিন্যাস গ্রহণ করেছি।

৩৪। কথিত আছে যে আদ সম্প্রদায় যেকতান বংশোদ্ভূত আরবদের দ্বারা পরাভূত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল; "গুহাবাসী অদ্ভুত বংশ" সামুদগণ চেদরলেমার (খোজার আল্ আহমার) অধীনে অ্যাসিরীয়দের দ্বারা পর্যুদস্ত হয়েছিল।

৩৫। আরবি স্থা (. .) অক্ষর ব্যবহৃত হয়েছে।

৩৬। জেনেসিস, ১৪শ অধ্যায়, ৪, ৬।

৩৭। ফেরাউনদের অনুকরণে তিনি কাল উষ্ণীষ পরিধান করতেন।

৩৮। ইয়েমেনের হিমাইরী নৃপতিগণ যাদেরকে তোববাস বলা হত তারা প্রথম থেকেই পারস্য ও বাইজানটাইনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল।

৩৯। যুলকারনায়েনের পরিচয় নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। বেশ কয়েকজন মুসলীম ঐতিহাসিক মনে করেন যে কোরআনে বর্ণিত যুলকারনায়েন ও ম্যাসিডনের আলেকজান্ডার একই ব্যক্তি। এই মত প্রশ্নবোধক। প্রাথমিক অর্থে যুলকারনায়েন মানে "দুই শৃঙ্গের অধিকারী"। যখন আমরা সেবীয় নৃপতিদের, দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট অর্ধচন্দ্রাকৃতি শিরস্ত্রাণ যা তারা পরিধান করতেন এবং যা সম্ভবত এই সময়ের মিশরের সম্রাটদের কাছ থেকে অনুকরণ করেছিলেন তা স্মরণ করি তখন সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে, কোরআনে বর্ণিত যুলকারনায়েম কোন স্বদেশীয় নৃপতি যিনি শৌর্যবীর্য-পরাক্রমের জন্য তার পরবর্তী বংশধরদের কল্পনায় বিশ্ববিজয়ী হিসেবে অতিরঞ্জিত হয়েছেন।

লেনোরম্যান্ট মনে করেন শাদ্দাদ, যুলকারনায়েন এবং বিলকিস কুশাইট।

হিমাইরী নৃপতিদের প্রজাবৃন্দের মধ্যে ইহুদীবাদ প্রবলভাবে উপস্থিত ছিল, ৩৪৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট কনস্ট্যানটাইন কর্তৃক ইয়েমেনে প্রেরিত দূতের অনুরোধে তাদের রাজ্যসমূহে অনেকগুলি গির্জা স্থাপন করেছিল। জনসাধারণের বেশির ভাগ লোক আদিম সেমিটিক ধর্মমতের অনুসারী ছিল।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বাইজানটাইনদের নিকট ডিমিয়ন নামে পরিচিত, যু-নওয়াজ, নৃশংস হরণকারী যু-শিনাতিরকে হত্যা করে ইয়েমেন ও তার অধীনস্থ অঞ্চলসমূহের অধিপতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি ইহুদীদের ধর্মমত

www.amarboi.org

গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের প্ররোচনায় খ্রিস্টানদের উপর নির্মম অত্যাচার করেছিলেন, আর বাইজানটাইন আক্রমণকারীদের প্রতিহিংসা গ্রহণ করেছিলেন। কনস্টান্টিনোপল কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে একদল আবিসিনীয় সেনাদল হারিস্ বা আরিয়েতের নেতৃত্বে ইয়েমেনের কূলে অবতরণ করে; যু-নওয়াজকে পরাজিত ও নিহত ক'রে তারা ইয়েমেনের অধিপতি হয়ে বসে। ৫২৫ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি এই অভিযান সংঘটিত হয়।

কিছুদিন পরে (৫৩৭ খ্রি.) আবরাহা আলূআশরাম আরিয়েতকে হত্যা করে, আবরাহা পরবর্তীকালে আবিসিনীয় রাজপ্রতিনিধিত্ব লাভ করে। আবরাহার অধীনেই খ্রিস্টান আবিসনীয়গণ হিজাজ অধিকার করার ধ্বংসাত্মক প্রয়াস পায়। ইয়েমেনে অর্ধ-শতাব্দী কাল ধরে আবিসিনীয় কর্তৃত্বাধীন ছিল। এই সময়ে প্রখ্যাত সায়ফুল ইয়েজেনের পুত্র মা'দি কারিব যার বীরদৃপ্ত কার্যাবলীর জন্য অদ্যাবধি আরবগণ তার স্তবগান করে, তিনি কেসরা আনও শেরতয়াণ—প্রেয়িত সেনাদলের সাহায্যে হিমাটীয় বংশের প্রতিপত্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন (৫৭৩ খ্রি.)। ৫৯৭ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টানদের দ্বারা মাদি কারিব নিহত হওয়ার পর ইয়েমেন সরাসরি পারস্যের অধীনে নিপতিত হয় এবং কেসিফনের দরবার কর্তৃক নিযুক্ত রাজপ্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হয়। ওয়াহ্রাজ ছিলেন প্রথম মার্জবান। তার শাসনাধীনে ইয়েমেন, হাদ্রামাউত, মাহরা ও ওমান পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। শেষ রাজ প্রতিনিধি ছিলেন বাজান। ৬০৬ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি তিনি খসরু প্যারভেজের আমলে মার্জবান হয়েছিলেন। বাজানের রাজ-প্রতিনিধিত্বের সময়েই ইসলাম ইয়েমেনে প্রবেশ লাভ করেছিল এবং তিনি নিজেও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইয়েমেনে পারসিক শাসন ছিল অত্যন্ত মোলায়েম। সব ধর্মই সমান স্বাধীনতা উপভোগ করত, মার্জবানের অধীনে বিভিন্ন গোত্রপতি নিজ নিজ এলাকায় কর্তৃত্ব প্রয়োগ করত।

৪০। যে সব নাগরিক সম্বর্ধনায় শহরের জ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যোগদান করতেন তাতে এ সব রমণী আপ্যায়নের কাজ করত—এ থেকেই জাতির নৈতিক অধঃপতনের সাক্ষ্য মেলে।

শহুরে আরবগণ দাবা খেলায় এত বেশি আসক্ত ছিল যে তারা প্রায়ই টেসিটাসের জার্মানদের মতো তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বাজি রাখত। এ সব অনিষ্টকর অনুশীলনের জন্য এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনৈতিক কার্যাবলীর জন্য মুহম্মদ (দঃ) তাঁর অনুসারীদের জন্য অত্যন্ত বিজ্ঞতার সঙ্গে জুয়াখেলা নৃত্য ও মদ্যপান নিষিদ্ধ করেছিলেন। উমাইয়া বংশের নৃপতিগণ তিনটি অনিষ্টই পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। প্রভূত পরিশ্রম ক'রে হযরত মুহম্মদ (দঃ) যে প্রাচীন পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন তারা প্রকৃতপক্ষে সেই উৎসাদিত অবস্থার পুনরুত্থান ঘটিয়েছিল।

৪১। ইবনুল আতাহর, ১ম খণ্ড, ৩০৮ পৃ.; 'ডিক্লাইন এন্ড ফল অব্ দি রোমান এম্পয়োর', ১ম খণ্ড পৃ. ১১৪-১১৫; কসিন দ্যা পারসিভ্যাল হিস্ট্রীজাস্ এরাবস, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৮-১৩১।

৪২। আল্ কোরআন, সুরা ১২ আ-৩৭।

৪৩। অন্যান্যের মধ্যে ইয়েমেনের জুল খুলাসা মন্দির বণী খাস্রামদের; নজদের রোধা মন্দির বণী রাবিয়াদের; ইরাকের জু সাবাত্ মন্দির; সমুদ্র থেকে বেশি দূরে নয় ফোজাইদে মানাতের মন্দির, ইয়াসরিবে বসতিস্থাপনকারী আস ও খাজরাজ গোত্রের এইগুলি সর্বাধিক প্রসিদ্ধ মন্দির।

৪৪। মুয়ির, ১ম খণ্ড, ভূমিকা পৃ. CCXXXIV.

৪৫। এসব গোত্রগত ঈর্ষা ও পারিবারিক কোন্দল যা আমাকে পরে বর্ণনা করতে হবে তা আরব সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল।

www.amarboi.org

৪৬। ইবনুল আসির ১ম খণ্ড পৃ. ৩২৪, ৩২৭; 'কসিন দ্য পারসিভ্যাল' ১ম খণ্ড পৃ. ১৩৮; তাবারী (জোটেনবার্গের অনুবাদ) ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৭-২১৮।

৪৭। ইয়েমেন, বাহরায়েন ও ইরাকের আরব জনগণের অলস অংশটি পারসিকদের বশ্যতা স্বীকার করত। এসব প্রদেশের বেদুইনগণ সব বন্ধন থেকে মুক্ত ছিল। সিরিয়ার আরবগণ রোমানদের অধীন ছিল; মেসোপটেমিয়ার আরবগণ পর্যায়ক্রমে রোমক ও পারসিকদের শাসন মানত। মধ্য আরব ও হিজাজের বেদুইনগণ, যাদের উপর হিমাইয়ার বংশোদ্ভূত নৃপতিগণ কমবেশি কার্যকর সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করত তারা নামমাত্র পারসিক শাসনের অধীনে এসেছিল, কিন্তু তারা যথার্থরূপে স্বাধীনতা ভোগ করত।

৪৮। লেনোরম্যান্ট, 'অ্যানসিমেন্ট হিস্ট্রী অব্ দি ইস্ট', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৬।

৪৯। ইবনুল আসির, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৮।

৫০। বিউসবা, 'হিস্ট্রী ডু ম্যানিকিজম', ১. ১, ২, অধ্যায় ৪

৫১। মোশেম ও গিবন, প্রাগুক্ত।

৫২। ব্লান্ট, 'হিস্ট্রী অব্ দি ক্রীশ্চান চার্চ, পৃ. ১৩৮।

৫৩। ড্রু মিলম্যান, 'হিস্ট্রী অব ক্রিশ্চিয়ানিটি ১ম খণ্ড পৃ. ৩৪৮-৩৬২।

৫৪। এই অদ্ভুত বিশ্বাসের স্বপক্ষে যদি কোন কিছু অধিক সম্ভাব্যতার সমর্থন জোগায় তা হল লুক, ২৪, ৩৬-এ প্রদত্ত যিশু সম্পর্কে পরিস্থিতি-সংক্রান্ত বিবরণ। (পুনরুজ্জীবনের পর) ভীতসন্ত্রস্ত শিস্যদেরকে নিজের শরীর স্পর্শ ও অনুভব করতে অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে শান্ত করার জন্য তিনি "মাংস" চেয়েছিলেন এবং একটি ভাজা মাছ ও একটি মৌচাক" থেকে আহারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কারণ তাঁর সন্ত্রস্ত শিষ্যগণ তাঁকে ভূত বা শক্তি বলেই বিশ্বাস করেছিল।

৫৫। যে লোক ঐতিহ্যটির ইংরেজি ভাষান্তর করা হয়েছে তা নিম্নরূপ : জায়াল্লাহো মেন্ সিনায়ে ওয়া আশরাকা মেন সারিয়ে আও আসতা লানা মেন ফারান।

ইয়াকুত তাঁর ভৌগোলিক বিশ্বকোষে বলেন, "সা য়্যির প্যালেস্টাইনের একটি পাহাড় এবং সঙ্গে মক্কার পাহাড়।"

—মুযামুল বুলদান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৩৪।

www.amarboi.org

প্রথম অধ্যায়
রাসূল মুহম্মদ (সাঃ)

সম্মানের ওই শীর্ষশিরে বসলেন ওগো মোদের নবী
মানবগুণের পূর্ণতায় তিনি হলেন জগৎ রবি।
চরিত্রের মহত্ত্বে, নাইতো আর কেউ মর্তে
তাঁর আলোর আলোতে অন্ধকার গেল দূরে।
চলুন সবাই দরুদ পড়ি, সেই নবীকে স্মরণ করি
তাঁর দেখানো পথে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়ি।[১]

—শেখ সাদী।

মূল পংক্তিগুলো এতোই সুন্দর যে তা অনুবাদ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এখানে আমরা যে মহাপুরুষের জীবন কথা ও শিক্ষা প্রসঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করছি, তাঁর ব্যক্তিত্বের পর্যালোচনায় হউক আর আলোচনায়ই হউক এই পংক্তিগুলো কোনভাবেই অতিরিক্ত কোন ভাব প্রকাশ করেনি। খ্রিস্ট্রীয় সপ্তম শতাব্দী যখন আরম্ভ হচ্ছে তখন মক্কার জনপথে, কাঁধ পর্যন্ত বিন্যস্ত আরবীয় পোশাক পরিহিত, তারপরেও এক খণ্ড কাপড় দিয়ে চিবুক পর্যন্ত আচ্ছাদিত[২] একজন মানুষ, যাঁর জীবনের মধ্যাহ্ন পেরিয়ে গেছে, প্রশান্ত চিন্তাশীল এই লোকটি একজন আরবীয়। কখনও কখনও তিনি ধীরগতিতে চলেছেন, কোন কোন সময় দ্রুতগতিতে হেঁটেছেন, পথচারীদের প্রতি নির্লিপ্ত, আশপাশের সুন্দর দৃশ্যাবলীর প্রতি দৃষ্টিহীন। যদিও নিজের চিন্তায় নিমজ্জিত তবুও কারো সালামের জবাব দিতে একটুও অমনোযোগী নন। অন্যদিকে যে সকল শিশুরা তাঁর চারপাশে ভিড় জমাচ্ছে তাদের সাথেও হাসিমুখে কথা বলছেন। এই ব্যক্তিই তিনি, যিনি 'আল-আমীন্' বা বিশ্বাসী। তিনি এত কঠোর অধ্যাবসায়ের সাথে জীবন-যাপন করেছেন যার ফলে তাঁর নিজের দেশের লোকদের কাছ থেকে তিনি 'সত্যবাদী' বা 'বিশ্বাসী' অর্থাৎ, 'আল-আমীন' উপাধি পেয়েছেন। তবে এখন তাঁর শহরবাসী তাঁর অদ্ভুত প্রচারণার জন্য তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে আরম্ভ করছে। এখন তাঁকে শহরবাসী একজন বল্গাহীন কল্পনাবিলাসী, উদ্‌ভ্রান্ত বিপ্লবী মনে করছে। আর তাই তিনি সমাজের পুরাতন পরিচিত নিদর্শনগুলো

www.amarboi.org

নিশ্চিহ্ন করতে, প্রাচীন সুবিধাগুলো উঠিয়ে দিতে, পুরানো ধর্মবিশ্বাসকে ও রীতিনীতিগুলোকে প্রত্যাহার করতে চাচ্ছেন।

তখন আরব জনপদগুলোর মধ্যে সবদিক দিয়ে গুরুত্ব ও খ্যাতির শীর্ষে ছিল মক্কা নগরী, তা যোগাযোগ ও অবস্থান উভয়দিক থেকেই। মক্কা উত্তর-দক্ষিণে চালু উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত। পশ্চিমে পর্বতশ্রেণী ও পূর্বে উচ্চ গ্রানাইট পাহাড় মক্কাকে ঘিরে রেখেছে। মক্কা নগরীর কেন্দ্রস্থলে রয়েছে কাবাগৃহ। মক্কা নগরীটি সাধারণ ও পাকা রাস্তাসমূহ, সুরক্ষিত বাড়িঘর, কাবাগৃহের প্রাঙ্গনমুখী গণমিলনায়তসহ শহরটি সমৃদ্ধি ও শক্তির এক অসাধারণ সৌন্দর্যের প্রকাশ করতো। ইসমাঈলের বংশধরদের উপর অর্পিত ছিল কাবাগৃহের দেখা শোনার দায়িত্ব। ব্যাবিলনীয়দের আক্রমণের পর তা জুরহুম বংশোদ্ভূতদের উপর ন্যস্ত হয়। জুরহুম গোত্রের প্রধানগণ 'মালিক' বা নৃপতি উপাধি গ্রহণ করেছিলেন পার্থিব ও ধর্মীয় ক্ষমতার মিলনের মাধ্যমে। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে জুরহুম বংশীয় লোকেরা পর্যুদস্ত হয় বণী খোজা নামীয় একটি কাহাতান গোত্রের লোকদের দ্বারা। তারা ইয়েমেন থেকে এসে মক্কা ও হিজাজের দক্ষিণ এলাকাগুলো দখল করে নিয়েছিল। ইতিমধ্যে ব্যাবিলনের নৃপতিদের অধীনে ভয়ানকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত ইসমাইলের বংশধরগণ ধীরে ধীরে তাদের হারানো শক্তি ফিরিয়ে আনছিল। যীশু খ্রিস্টের আবির্ভাবের প্রায় একশো বছর আগে ইসমাঈলের অন্যতম বংশধর আদনান তাঁর এক পূর্বপুরুষের মতো জুরহুম বংশের একজন প্রধানের মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন মক্কায়। হিজাজ ও নজদের ইসমাঈল বংশোদ্ভূতদের যথার্থ আদিপুরুষ ছিলেন তার পুত্র মা'আদ। ফিহ্র ছিলেন মা'আদের বংশধর, গোত্রের নাম কুরাইশ। এই গোত্রের মাধ্যমেই পৃথিবীতে এসেছিলেন আল্লাহ্‌র প্রেরিতপুরুষ ও আইনবেত্তা।

দু'শ' বছরেরও বেশি সময় ধরে বণি খোজা গোত্র কাবাঘরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিল। আর এই দু'শ বছর ধরেই কাবাগৃহের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকায় তারা যে সামাজিক প্রাধান্য ও প্রভাব পেয়েছিল তা-ও ভোগ করেছিল। খোজাগণকে মক্কার বাইরে তাড়িয়ে দিলেন শেষ খোজা গোত্র প্রধান হোলাইলের মৃত্যুর পর ফিহ্রের এক বংশধর কোসাই[৩]। কোসাই হোলাইলের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। কোসাই নিজেই নগরের পার্থিব ও ধর্মীয় সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেন। আর এভাবেই তিনি হিজাজের শাসনকর্তা হন[৪]। এখন আমরাও ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর এসে দাঁড়িয়েছি।

ধারণা করা যায় যে, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে মক্কা নগরীর অধিপতির আসনে আসীন হয়ে দ্রুত নগরীর শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। কোসাইয়ের আগে বিভিন্ন সময় কুরাইশ পরিবার বিক্ষিপ্তভাবে কাবাগৃহ থেকে অনেক দূরের এলাকায় বসবাস করতো। কাবাগৃহের প্রতি তারা যে আত্যন্তিক পবিত্রতা আরোপ করতো তাই তাদেরকে তার কাছাকাছি ঘরবাড়ি নির্মাণে বাঁধা দিত। অরক্ষিত অবস্থায় জাতীয় প্রার্থনালয় যে বিপদের সম্মুখীন ছিল তা নিরীক্ষণ করে কাবাগৃহ তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ)-এর জন্য চারদিকে অনেক খালি জায়গা রেখে দিয়ে কোরাইশদের ঘরবাড়ি

www.amarboi.org

নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করেন। যে-সব পরিবার বণ্টিত জমি পেয়েছিল তারা সুরক্ষিত ঘরবাড়ি নির্মাণ করেছিল।

কোসাই নিজেও তাঁর জন্য একটা প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এই প্রাসাদ 'দারুন নাদওয়া'[৫] বা পরামর্শ সভা নামে পরিচিত ছিল। এখানে কোসাইয়ের সভাপতিত্বে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো সরকারি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে। এই দরবারে চল্লিশ বছরের কম বয়সের কেউ প্রবেশ করতে পারতো না যদি তিনি কোসাইয়ের বংশধর না হতেন। এখানে সম্পাদিত হত দেওয়ানি কাজকর্ম। কোসাইয়ের হাত থেকে কোরাইশগণ কোন যুদ্ধবিগ্রহে যোগ দেয়ার আগে 'লিওয়া' বা পতাকা গ্রহণ করত। কোসাই নিজেই এক টুকরো সাদা কাপড় বল্লমের অগ্রভাগে সংযুক্ত করে তা কোরাইশ দলপতিদের হাতে তুলে দিতেন অথবা নিজের কোন পুত্রের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিতেন। এই অনুষ্ঠান কোসাই কর্তৃক আরম্ভ হওয়ার পর থেকে আরব সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত চালু ছিল। আরও একটি নিয়মও কোসাই চালু করেছিলেন এবং তা চলেছিল আরও দীর্ঘ কাল ধরে। যে-সকল তীর্থযাত্রীরা প্রত্যেক বছর মক্কা দর্শনে আসতেন তাদের আহার্যবস্তু প্রদানের প্রয়োজনীয়তা এবং অতিথি সৎকারের কর্তব্য সম্পর্কে কুরাইশদেরকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধ করে কোসাই তাদেরকে বাৎসরিক দরিদ্র কর 'রিফাদা' দিতে বাধ্য করেছিলেন। এই অর্থ তিনি ব্যয় করতেন 'আইয়ামুল মিনা' অর্থাৎ কোরবাণীর দিন ও তার পরবর্তী যে দুদিন তীর্থযাত্রীরা মিনায় অতিবাহিত করেন সেই তিন দিনে দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের আহারের ব্যয় বহনে। এই নিয়ম ইসলাম চালু হওয়ার পরও চলছিল। প্রতিবছর মিনাতে হজ চলাকালে খলিফা ও তাদের স্থলাভিষিক্ত সুলতানগণের নামে যে খাদ্য বিতরণ করা হত তার উৎপত্তির কারণও এই নিয়মই। কোসাই কর্তৃক পরিচালিত অনুষ্ঠানগুলোর নাম 'নাদওয়া', 'লিওয়া', ও 'রিফাদা' শব্দগুলো। কোসাই জাতীয় পরামর্শসভা আহ্বান করা, ও তাতে সভাপতিত্ব করার ক্ষমতা, পতাকা প্রদানের ক্ষমতা—সামরিক নেতৃত্বের প্রতীক, তীর্থযাত্রিদের আহার্য প্রদানের জন্য কর আদায়ের ক্ষমতাসহ মক্কা ও আশপাশের এলাকার কূপগুলো থেকে পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসনার ব্যবস্থাসহ কাবাগৃহের কুঞ্জি সংরক্ষণ করতেন।

কোসাই এভাবে নিজেই প্রধান প্রধান ধর্মীয়, বেসামরিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলী পরিচালনা করতেন। বাদশাহ, হাকিম ও প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ কোসাই নিজেই ছিলেন। তিনি প্রায় রাজকীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রতিপত্তি কোরাইশ বংশের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করেছিল এবং তাঁর সময় থেকে ইসমাইলের বংশধরদের মধ্যে কোরাইশগণ উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব অর্জন করেছিল। ৪৮০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কোসাই পরিণত বয়সে মারা যান।

তিনি জীবিতাবস্থায় তার জ্যেষ্ঠপুত্র আব্দুদ দারকে উত্তরাধিকারী করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর নির্বিবাদে পুত্র পিতার আসনে আসীন হন। আব্দুদ দারের মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্রদের এবং তাঁর ভাই আব্দুল মান্নাফের পুত্রের মধ্যে ভয়ানক বিরোধ শুরু হয়।

www.amarboi.org

বিবদমান দুই দলে যোগদান করে বিভিন্ন গোত্র, তাদের মিত্র ও প্রতিবেশীগণ। সবকিছুর পরও এ বিরোধ সাময়িকভাবে মিমাংসা হয়েছিল। এই মর্মে এই মিমাংসা হয় যে, আব্দুল মান্নাফের পুত্র আব্দুস সামসের উপর দায়িত্ব থাকবে 'সিকায়া' ও 'রিফাদা', অন্যদিকে 'হিযাবা' 'নাদওয়া' ও 'লিওয়া' আব্দুদ দারের পৌত্রদের তত্ত্বাবধানে থেকে যায়। তুলনামূলকভাবে আব্দুস শামস ছিলেন দরিদ্র। তিনি তাঁর ভাই কোরাইশদের মধ্যে প্রতিপত্তিশীল ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি হাশিমের উপর তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। এই কর থেকে আসা আয় থেকে ও হাশিমের ধনসম্পদ হজের মৌসুমে মক্কায় আগন্তুক তীর্থযাত্রীদের আহারের জন্য ব্যয় হত।

হাশিম অধিকাংশ মক্কাবাসীর মতো বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। কোরাইশদের মধ্যে হাশিম নিয়মিতভাবে দুটি বাণিজ্য যাত্রীদল প্রেরণের নিয়ম চালু করেন—একটি শীতকালে ইয়েমেনে ও অন্যটি গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায়। ৫১০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে হাশিম সিরিয়ায় এক বণিজ্য অভিযানকালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে তাঁর ইয়াসরিববাসিনী স্ত্রী সালমার গর্ভজাত একমাত্র পুত্র শায়বাকে রেখে যান। 'রিফাদা' ও 'সিকায়ার দায়িত্ব তাঁর মৃত্যুতে তাঁর ছোট ভাই মুত্তালিবের উপর অর্পিত হয়। স্বদেশবাসীর দৃষ্টিতে তিনি উচ্চস্থান লাভ করেছিলেন। তাঁর যোগ্যতা ও দানশীলতার জন্য তিনি মহান উপাধি 'আলফয়েজ' (দানবীর) পেয়েছিলেন। সাদাচুলের যুবক শায়বাকে মুত্তালিব ইয়াসরিব থেকে মক্কায় আনেন। মক্কাবাসীরা শায়বাকে মুত্তালিবের দাস মনে করে তাকে আব্দুল মুত্তালিব বলে ডাকতো। ইতিহাসে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর পিতামহ ছাড়া অন্য কেউ 'আব্দুল মুত্তালিব' বা মুত্তালিবের দাস[৬] বলে অভিহিত নহেন।

ইয়েমেনের কাজওয়ানে মুত্তালিব ৫২০ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে মারা যান। তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আব্দুল মুত্তালিবের উপর মক্কা নগরীর যথার্থ প্রধান বলে তার উত্তরাধিকারীত্ব আসে। এই সময় কোসাই পরিবারের নেতৃস্থানীয় সদস্যদের সমবায়ে গঠিত একটি অভিজাততন্ত্রের উপর ন্যস্ত ছিল মক্কার শাসনভার। আব্দুল মুত্তালিব কর্তৃক পবিত্র কূপ জমজম আবিষ্কার ও তার তত্ত্বাবধান সম্পর্কিত বিরোধ নিষ্পত্তির পরে দশ জন সিনেটর, যাদেরকে 'শরীফ' বলা হত। এদেরকে নিয়েই কার্যনির্বাহী কমিটি গড়ে তোলা হয়েছিল। রাষ্ট্রব্যবস্থাপনায় এই দশজন সদস্য প্রথম স্থান দখল করে রয়েছিলেন। আর এদের স্থলাভিষিক্ত হতেন প্রত্যেক পরিবারের অগ্রজতম সদস্য অথবা প্রধান বংশানুক্রমিকভাবে। পদগুলো নিম্নরূপ :

১. 'হিযাবা'—এই পদের দায়িত্ব ছিল কাবাগৃহের চাবির তত্ত্বাবধান করা। এই কাজ উচ্চপর্যায়ের কাজ বলে পরিগণিত হত। আর এই পদ আব্দুদ দারের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বণ্টিত হত। যে সময় মক্কায় ইসলামের পতাকা উড়েছিল তখন তালহার পুত্র ওসমানের কাঁধে এই দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল।

২. 'সিকায়া'—এই পদের দায়িত্বে ছিল পবিত্র জমজম কূপ ও হজযাত্রিদের জন্য পানির তত্ত্বাবধান করা। হাশিম পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই পদটি। মক্কা

www.amarboi.org

বিজয়ের সময় এই পানি বিতরণের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন মহানবীর চাচা আব্বাস।

৩. 'দিয়াত' বা দেওয়ানি ও ফৌজদারী শাসন। তায়েম ইবনে মুর্রা পরিবারের আয়ত্বে ছিল দীর্ঘদিন এই পদটি। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে কুহাফা, গোত্র নাম আবু বকর, হযরতের আবির্ভাবকালে এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন।

৪. 'সিফারা' বা কূটনৈতিক প্রতিনিধিত্ব। এই পদাধিকারী রাষ্ট্রের রাজদূতের পূর্ণ ক্ষমতাধারী হতেন। তাকে কোরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রের মধ্যে মতানৈক্য সম্পর্কে আলোচনা ও মীমাংসার পূর্ণ ক্ষমতা দেয়া হতো। ওমর ছিলেন এই কাজের দায়িত্বে।

৫. 'লিওয়া' বা পতাকার সংরক্ষক, যে পতাকার তলে জাতি শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করতো। এই পতাকার তত্ত্বাবধায়ক রাষ্ট্রের সকল বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন। উমাইয়া পরিবারের উপর এই সামরিক দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। হার্বের পুত্র আবু সুফিয়ান, মহানবীর সর্বাপেক্ষা নির্মম শত্রু, এই ফৌজী তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন।

৬. 'রিফাদা' বা দরিদ্রকর পরিচালনা। এই তহবিল গঠন করা হতো জাতির দান-খয়রাত দিয়ে। আর দরিদ্র তীর্থযাত্রিদের বহিরাগত অথবা বাসিন্দা যাই হোক-না-কেন রাষ্ট্র যাদেরকে আল্লাহ্‌র অতিথি হিসেবে বিবেচনা করে তাদের খাবার দেয়ার জন্য এই অর্থ ব্যয় করা হতো। এই দায়িত্ব আবু তালিবের উপর এসেছিল আব্দুল মুত্তালিবের পর। আবু তালিবের মৃত্যুর পর এই দায়িত্ব আব্দুল মান্নাফের পুত্র নওফেলের পরিবারে স্থানান্তরিত হয়। মহানবীর সময় এই দায়িত্বে আসীন ছিলেন আমর-বিন-হারিস।

৭. 'নাদওয়া'—জাতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতিত্ব করা। এই বিভাগের প্রধান ছিলেন রাষ্ট্রের প্রথম কাউন্সিলার। তাঁর পরামর্শে যাবতীয় সরকারি কার্য সম্পাদিত হত। হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর সময় এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন কোসাইয়ের পুত্র আব্দুল উজ্জা পরিবারের আসওয়াদ।

৮. 'খাইয়্যেমচ'—পরামর্শকক্ষের তত্ত্বাবধান করা ছিল এই পদাধিকারীর কাজ। পরামর্শ সভার অধিবেশন ডাকা ছিল এই বিভাগের দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তির এখতিয়ারে। তিনি সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে আহ্বান করতেন। এই বিভাগের তত্ত্বধায়ক ছিলেন মার্রা পুত্র ইয়াখজুম পরিবারের খালিদ-বিন-ওয়ালিদ।

৯. 'খাজিনা' বা রাজস্ব তত্ত্বাবধান। কাবের পুত্র হাসান পরিবারের আওতাভুক্ত ছিল এই বিভাগ। আর এই বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন হারিস-বিন-কায়েস।

১০. 'আযলাম'[৭] : তীরনিক্ষেপ করে কোন বিষয়ে দেবদেবীর সিদ্ধান্ত নেয়া হত, আর এই তীরনিক্ষেপ কাজটি পরিচালনা করতো এই বিভাগ। এই বিভাগ

www.amarboi.org

পরিচালনা করতেন আবু সুফিয়ানের ভাই। সাফওয়ান। একই সঙ্গে এই নিয়ম চালু ছিল যে, সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি সর্বাধিক প্রভাব খাটাবেন এবং 'রইয়স' বা 'সৈয়দ' এই সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করবেন। হযরতের সময় প্রথম সিনেটর ছিলেন আব্বাস।

যদিও সুবিধা ও ক্ষমতার বন্টন ছিল তবুও আব্দুল মুত্তালিবের ব্যক্তিগত চরিত্র ও প্রভাব তার জন্য এনেছিল নিরঙ্কুশ প্রধান্য। এই সম্মানিত পরিবার প্রধান জাতীয় নিয়মানুযায়ী কাবাগৃহের উপাস্য ও বিগ্রহদের কাছে একটি সন্তান উৎসর্গের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন এবং বহুসংখ্যক সন্তান তিনি লাভ করেছিলেন।[৮] তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য কাবাগৃহের অপ্রতিরোধনীয় দেবদেবীর কাছে তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়পুত্র আব্দুল্লাহকে বলি দেয়ার জন্য দৃঢ়ভাবে মনোস্থির করেছিলেন। তবে তা আর হয়নি। কাবাগৃহের অন্তর্ভুক্ত পিথিয়ার বাণী দ্বারা মনুষ্য জীবনের বলিদানের পরিবর্তে একশত উট উৎসর্গের নিয়ম চালু হয়েছিল। এই নিয়মই এরপর থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল।

আবদুল্লাহ্‌র বিয়ে হয়েছিল জহুরি পরিবারের প্রধান ওয়াহাবের কন্যা আমিনার সঙ্গে। আবদুল্লাহ্‌র বিয়ের পরের বছর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর সমাবেশে পরিপূর্ণ। বছরের প্রথমেই এমন ঘটনা ঘটেছিল যা আরবদেশকে চমকে দিয়েছিল, এতে সমগ্র জাতি শিহরিত হয়ে গিয়েছিল। ইয়েমেনের ভাইসরয় বা বড়লাট, আবরাহা আল্-আশরাম্ সানাতে একটি প্রার্থনালয় নির্মাণ করেছিলেন। কাবাগৃহের পবিত্রতা মক্কায় যে ধন-সম্পদ আকর্ষণ করতো তিনি তা তাঁর নিজস্ব শহরে চালান করে দিতে ছিলেন সচেষ্ট। একজন মক্কাবাসীর দ্বারা সানার সেই প্রার্থনালয় অপবিত্র হলে তিনি সেই সুযোগে নিজের ইচ্ছার বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য কাবাগৃহ ধ্বংসের জন্য জাঁকজমকের সাথে একটি সুসজ্জিত হাতির পিঠে চড়ে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে একটি বিশাল বাহিনী পরিচালনা করেছিলেন। এই বিশাল বাহিনীর মাঝখানে চলমান বিশাল প্রাণীটির দৃশ্য আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকদের এতোই হতবাক করেছিল যে, এই ঘটনা থেকে তারা একটি বছরের নাম দিয়েছিল। আর ঐ বছরের নাম দেয়া হয়েছিল হস্তীর বছর বা হাতী বছর (৫৭০ খ্রিঃ)। আবিসিনীয়গণ এগিয়ে আসতে থাকলে নারী ও শিশুসহ কুরাইশগণ কাছের পাহাড় পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সেখান থেকে ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করছিল। তারা সর্বদা আশা করতো যে, দেবদেবীগণ তাদের আবাসগৃহ রক্ষা করবেন। তখন সকাল, যখন আবিসিনীয়গণ মক্কার কাছাকাছি আসে, আকাশ ছিল পরিষ্কার ঝকঝকে। তবে ঐতিহ্যবাদীরা বলেন, দেখতে দেখতে ছোট ছোট আবাবিল পাখিতে আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল। এসব পাখি হতভাগ্য সৈন্যদের উপর ছোট ছোট কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিল। এই সকল কঙ্কর মানুষ ও অশ্বের বর্ম ভেদ করে অভিযানকারীদের মধ্যে ভয়াবহ ভীতির সঞ্চার করেছিল। এ সময় মুষলধারে বৃষ্টি নামছিল। আর ঐ প্রবল বৃষ্টির জলধারা মৃত ও মুমূর্ষুদের সাগরের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

www.amarboi.org

ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় আবরাহা সানাতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এই অলৌকিক ঘটনার বর্ণনায় ইবনে হিশাম বলেন, "ঐ বছরই আরবে সর্বপ্রথম বসন্তরোগ দেখা দিয়েছিল।" কসিন দ্য পারসিভেল মন্তব্য করেন, "এই নিদর্শন ঘটনার অলৌকিক ব্যাখ্যার নির্দেশক।" যে কোন লোক পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে যে, সেনাচেরিরের ভাগ্য যেভাবে বিড়ম্বিত হয়েছিল তেমনি এক ভয়াবহ মহামারী আবরাহার সৈন্যদলকে ধ্বংস করেছিল; আর এর সঙ্গে সম্ভবত যুক্ত হয়েছিল এক তুমুল বৃষ্টিপাত যা মক্কা-উপত্যকায় প্রায়ই ভয়ানক প্লাবণের সৃষ্টি করতো। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ।[৯]

এই ঘটনার কিছুদিন পর ইয়াসরিব শহরে যাওয়ার সময় আবুদল্লাহ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর ছয়মাস পর তাঁর বিধবা স্ত্রী এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তাঁর নাম রাখা হল মুহম্মদ। হস্তী বছরের ১২ই রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৫৭০ খ্রিস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট তারিখে মুহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন।[১০] ঐতিহ্যবাদীরা মন্তব্য রাখেন যে, তাঁর জন্মকালে এমন কতগুলো অশুভ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল যা থেকে জগতের মানুষ বুঝতে পেরেছিল যে পরিত্রাণকারীর আবির্ভাব ঘটেছে। বুদ্ধিবাদী ঐতিহাসিকরা এ কথায় কোন গুরুত্ব দেন না। তারা অবজ্ঞা প্রকাশ করেন যা ধর্মীয় তার্কিকগণ পূর্বসিদ্ধ যুক্তির উপর ভিত্তি করে তারকা অনুসরণে প্রদত্ত জ্ঞানীদের বিবরণ বিনাবাধায় গ্রহণ করেন। যেসব ছাত্রের মন পূর্ববর্তী চিন্তাপদ্ধতির প্রতি অনেকটা অন্ধভাবে দুর্বল নয় তাদের কাছে মুসলমান-কথিত 'চিহ্ন ও অশুভ লক্ষণ' যা মহানবীর জন্মের সঙ্গে উপস্থিত ছিল তা এমন ঘটনা যা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দাবীদার। আমরা বর্তমানে সাধারণ ঘটনাবলীর মধ্যে ব্যক্ত ও জাতির জীবনে এক চিরায়ত নিয়মের উপস্থিতি বুঝতে পারি। তবে এতে বিস্ময়ের তো কিছু নেই যে, ১৫০০ শত বছর আগে তারা জাতির স্মৃতি-চিহ্নের পতনে ঐশী হস্তক্ষেপ দেখতে পেয়েছিলেন যা নিয়তির নির্দেশক, যা তার পাপের ক্ষেত্রে ধ্বংস আনতো। আরব-জাতির নিয়মানুযায়ী, হাওয়াজিন শাখার বণীসাদ গোত্রের এক বেদুইন মহিলার[১১] কাছে জন্ম হওয়ার পর থেকেই শিশু মুহম্মদের লালন-পালনের ভার ন্যস্ত হয়েছিল। মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেয়ার পর মা আমিনার গভীর অপত্য স্নেহে তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মা আমিনা ইন্তেকাল করেন। আর এই শিশুর দায়িত্ব আসে পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের উপর। এরপর তিনি যে কয়েক বছর জীবিত ছিলেন ততদিন যথার্থ আদরযত্ন সহকারে পৌত্রের দেখাশোনা করেছেন। কিন্তু মহানবী (সাঃ) পেলেন না পিতামাতার স্নেহ যা সন্তানের জন্য আশীর্বাদ। তিনি পৃথিবীতে আগমনের আগেই পিতাকে হারিয়েছিলেন। আর মাতৃহারা হন ছয় বছর বয়সে, আর এই শোক সাংবেদনশীল শিশুমনের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল। এর তিন-চার বছর পর তিনি পিতামহকেও হারান। আব্দুল মুত্তালিব সানা থেকে ৫৭৯ খ্রিস্টাব্দের[১২] দিকে ফিরে আসার কিছুদিন পরেই পরলোক গমন করেন। তিনি সেখানে গিয়েছিলেন পারসিকদের সাহায্যে জুল ইয়েজেনের পুত্র সায়েফের তোব্বাসের সিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে অভিনন্দন জানানোর জন্য কোরাইশদের প্রতিনিধি হিসেবে।

www.amarboi.org

পিতৃমাতৃহীন শিশুর জীবনে পিতামহ আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর নতুন আরেক অধ্যায়ের সূচনা হল। মৃত্যু শয্যায় বৃদ্ধ পিতামহ তাঁর লালন-পালনের দায়িত্ব দিয়ে যান আবু তালিবের উপর। মহানবীর জীবনের প্রথম অংশ আবু তালিবের গৃহেই অতিবাহিত হয়। লক্ষ্যণীয় যে আমরা মহানবীর জীবনীতে দেখতে পাই যে, তিনি বালক বয়সে উৎসুক ও চিন্তাশীল ছিলেন। তিনি যেন ভবিষ্যতদ্রষ্টা ছিলেন। প্রকৃতির সুষমা নিরীক্ষণে প্রায়ই মরুভূমিতে চলাফেরায় অভ্যস্ত মহানবী সর্বদাই ছিলেন মিষ্টভাষী ও কোমল স্বভাবের মানুষ। মানুষের দুঃখদুর্দশার প্রতি তিনি ছিলেন অত্যধিক সংবেদনশীল। তিনি বালক বয়সে তাঁর ক্ষুদ্র পরিচিত মহলের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। আর চাচা ও ভ্রাতুস্পুত্রের মধ্যে গভীরতম অনুরাগ বিরাজ করতো। "আল্লাহ্‌র ফিরিশতারা তাঁর হৃদয় উন্মোচিত করে ঐশী আলোকে উদ্ভাসিত করেছিলেন।" "জীবনের প্রথমাংশ ছিল তাঁর পরিশ্রমের ভারে ভারাক্রান্ত। তিনি কিশোর বয়সে তাঁর চাচার মেষপাল চরাতে মরুভূমিতে যেতেন। হাশিম ও আবদুল মুত্তালিবের উত্তরাধিকারীদের সময় রাজকীয় ঐশ্বর্য প্রভূত পরিমাণে কমে যায়। হাশেমীয়গণ অর্থাভাবের দরুন তাদের নেতৃত্ব দ্রুত হারাতে থাকেন। উমাইয়াদের হাতে চলে যায় তীর্থ-যাত্রিদের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব। সবসময়ই উমাইয়ারা হাশিমের সন্তানদের প্রতি চরমতম ঈর্ষা পোষণ করতো।

যখন হযরত মুহম্মদ (দঃ) শিশু তখন 'গাজাতুল ফিজার' বা অবমাননাকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ নানা ভাগ্য বিপর্যয় ও বহু মানুষের প্রাণহানির মধ্য দিয়ে দীর্ঘকাল চলে। এই যুদ্ধ ওকাজ নামক স্থানে বাধে—যুদ্ধের একপক্ষ ছিল কোরাইশ ও বনী কিনানা আর অপরপক্ষে কায়েম ও আয়লান গোত্র। পবিত্র জুলকাদ মাসে আরবের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ এই স্থানে একটি বার্ষিক মেলা বসতো। ঐ সময় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অথবা ক্রোধের বশে মানুষের রক্তপাত করা ছিল নিষিদ্ধ। এ ছিল "এক ধরনের ঐশী যুদ্ধ-বিরতি"। মক্কার অনতিদূরে অবস্থিত মারুজ জুহরানের কাছে মাজনায় এবং আরাফাত পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত জুল মার্জাজে মেলা বসতো। তবে এক বিরাট ব্যাপার ছিল ওকাজের মেলা। এখানে এই পবিত্র মাসে সকলরকম শত্রুতা ও গোত্রবিরোধ স্থগিত থাকতো বলে আরবে বিভিন্ন স্থান ও অন্যান্য দূরের দেশ থেকে বিশ্বের বাণিজ্যসম্ভার এখানে জমা হতো। এখানে 'আরবের আশীর্বাদধন্য' হিজাজ ও নজদের ব্যবসায়ীরা আসতো। তারা অনেক সময়ই রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণকারীদের ছদ্মবেশে মুখোশ বা আবরণ পরিধান করে তাদের কবিতা আবৃত্তি করতো ও সমবেত জাতির অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়াতো। 'আরব দেশের অলিম্পিয়া' ছিল ওকাজ। এখানে তারা শুধু বাণিজ্যের উদ্দেশ্যেই আসতো না। তারা আসতো তাদের পরাক্রম ও গৌরব গাঁথা ঘোষণা করতে—কবিত্ব শক্তি ও সাহিত্যিক প্রতিভার প্রকাশ ঘটাতে। সমবেত জনগণের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন কাসিদাস। এসব কবিতা সোনালী অক্ষরে লিখে পরবর্তী বংশধরদের জন্য স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে জাতীয় প্রার্থনালয় কাবাগৃহে টাঙ্গিয়ে রাখা হতো।[১৩] এই উৎসবমুখর সপ্তাহগুলোতেওকাজ জমকালো হয়ে উঠতো। তবে এই চিত্রে একটি নেতিবাচক দিকও

www.amarboi.org

ছিল। নর্তকীগণ তাদের আধুনিক প্রতিনিধি, মিশরের 'আলমাস ও গাওয়াজিনদের মতো তাবু থেকে তাঁবুতে গিয়ে তাদের গান ও স্ফুর্তির মাধ্যমে মরুভূমির প্রমত্ত সন্তানদের উত্তেজিত করতো। এ সকল মদ্যপায়ী লম্পট ও হৈহুল্লোরকারীরা অনেক সময়ই তুমুল বাকবিতণ্ডা ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হত। সারা রাত কাটিয়ে দিত মক্কায় জুয়াড়ীরা জুয়ার আড্ডায়। এ সকল ঘটনা ওকাজের চিত্রকে বিষাদময় করে তুলতো। এসব চিত্র আমিনার এতিম সন্তানের মনের উপর গভীরভাবে দাগ কেটেছিল।

এই ভ্রাতৃঘাতী প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধের মধ্যবর্তী বিরতিকালে এই যুদ্ধকে অবমাননাকর যুদ্ধ বলেও বর্ণিত করা হয়েছে। কারণ এই বিশেষ মাসে সব বিবাদ বিসম্বাদ নিষিদ্ধ—মুহম্মদ তাঁর চাচা ও অভিভাবক আবু তালিবের সাথে বাণিজ্যোদ্দেশ্যে সিরিয়ায় যান।[১৪] এখানে তাঁর দৃষ্টিতে সামাজিক দুরবস্থা ও ধর্মীয় স্খলনের দৃশ্য ধরা পড়ে। এই দৃশ্য তাঁর স্মৃতি থেকে কখনও মুছে যায়নি। এই নিঃসঙ্গ পিতৃমাতৃহীন বালক ধীরে ধীরে নানাবিধ চিন্তা মনে নিয়ে নীরবে প্রাপ্ত বয়স্ক হলেন।

তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল জাতির লৌকিক কাহিনী সম্পর্কে। তবে বর্তমান যুগে শিক্ষা বলতে যা বুঝায় তা তাঁর ছিল না। যদিও নিজ জাতির লোকদের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল কিন্তু নিজের চিন্তাভাবনার জন্য তিনি তাদের থেকে বহু দূরে চলে গিয়েছিলেন। সেই উচ্ছৃঙ্খল সমাজের মধ্যে তিনি ছিলেন এক পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মক্কাবাসীদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত যাচ্ছে তাই ব্যবহার, ওকাজ মেলায় যোগদানকারী বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে হঠাৎ বিনাকারণে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া, কোরাইশদের অনৈতিকতা ও সন্দিগ্ধতা স্বাভাবিকভাবেই সংবেদনশীল যুবক মুহম্মদের মনে তীব্র ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার অনুভূতি জাগিয়ে তোলে।

মহানবীর বয়স যখন পঁচিশ তখন খাদিজা নামের মহাপ্রাণা এক কোরাইশ মহিলার প্রতিনিধি হিসেবে তিনি আরেকবার সিরিয়া গিয়েছিলেন। তিনি ঐ মহিলার প্রতিনিধি হিসেবে যে বিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে কাজ সম্পাদন করেছিলেন তাতে ঐ মহিলার (খাদিজার) মনে তাঁর সম্পর্কে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। আর এই প্রতিক্রিয়া ধীরে ধীরে অনুরাগে রূপান্তরিত হয়। যার ফলে কিছুদিনের মধ্যেই মহানবী (দঃ) ও খাদিজার মধ্যে বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাদের উভয়ের মধ্যে বয়সের তারতম্য থাকলেও অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর চেয়ে বেশি বয়স্কা হলেও উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান ছিল গভীর অনুরাগ। এই বিবাহ তাঁর জন্য বয়ে এনেছিল শান্তি ও প্রাত্যহিক পরিশ্রম থেকে মুক্তি যা তাঁর আধ্যাত্মিক কাজের জন্য মনকে প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ছিল অপরিহার্য। এ ছাড়াও তিনি লাভ করেছিলেন এক অনুরক্তা নারীর হৃদয়, যে নারী সর্বপ্রথম তাঁর নবুয়্যতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। যিনি তাঁর হতাশার মুহূর্তে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এবং যখন কোন ব্যক্তি তাঁকে বিশ্বাস করতো না, এমনকি নিজেকেও নিজে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না, যখন তাঁর সামনে ছিল এক বিশাল রহস্য তখন এই খাদিজা তাঁর মনের আলোকে জাগরুক রাখার নিমিত্তে ছিলেন সদাপ্রস্তুত।

www.amarboi.org

মুসলিম নারীজগতে স্মরণীয় চরিত্র ও আদর্শস্থানীয় ব্যক্তিত্ব হলেন খাদিজা। যে মিথ্যা অপবাদ মহানবীর প্রচারিত ধর্ম সম্পর্কে দেয়া হয় যে, এতে নারীজাতিকে অবনমিত করা হয়েছে তা তাঁর সহধর্মিণী এবং কনিষ্ঠা কন্যা ফাতিমা যে মর্যাদার আসনে আসীন আছেন তা দ্বারা অনায়াসে খণ্ডিত হয়েছে। খাদিজার গর্ভে মহানবীর তিন পুত্র ও চার কন্যা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে পুত্রসন্তানগণ শৈশবেই মৃত্যুবরণ করেন। তাঁদের অকাল মৃত্যুতে শোকাতুর মহানবীর পিতৃহৃদয় যেভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল তাতে বিরোধী কোরাইশগণ পরবর্তীতে বিশ্বনবীর প্রতি নিন্দনীয় উপাধি আরোপ করেছিল।[১৫] তাঁর নবুয়্যত প্রাপ্তির পরও কন্যাগণ জীবিত ছিলেন। নিজের অবস্থানগত মর্যাদার কারণে অথবা তাঁর জন্মভূমির প্রয়োজন ছাড়া তিনি জনসাধারণের সামনে উপস্থিত হননি। বিবাহের পরের পনেরো বছর ছিল তাঁর জীবনের আত্মদর্শন, প্রস্তুতি ও আধ্যাত্মিক যোগসাধনের কাল। মক্কার কর্তৃত্বভার আব্দুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর থেকে কমবেশি বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সীমিত কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন প্রত্যেক সিনেটর বা ব্যবস্থাপক এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলতা না থাকার কারণে নাগরিকগণ শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের অধিকার ও সম্পত্তি ভোগ করতে পারতো না। অন্যায় ও জোরজবরদস্তির বিরুদ্ধে আত্মীয়তার বন্ধন ও সামাজিক অন্তরঙ্গতা কিছুটা রেহাই দিত। তবে আগন্তুকদের সব ধরনের জুলুম সহ্য করতে হতো। অনেক সময়ই তাদেরকে লুণ্ঠনের শিকার হতে হতো। তারা শুধু জিনিসপত্র, অর্থসম্পদই হারাতো তা নয়, স্ত্রী কন্যাদেরকেও হারাতো। বণী কায়ান গোত্রের একজন বিখ্যাত কবি হানজালা, যিনি আবু তামাহান নামে অধিক পরিচিত ছিলেন, তিনি আবদুল্লাহ-বিন-জুদান নামক একজন বিখ্যাত কোরাইশের খদ্দের হিসেবে মক্কা শহরে প্রবেশ করা সত্ত্বেও জনসাধারণের চোখের সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে লুণ্ঠিত হন। এই গুরুতর অবস্থাকে আরও গুরুতর করে তুলেছিল নীতিহীনতার আরেকটি দৃষ্টান্ত। মুহম্মদের (দঃ) দৃষ্টান্ত মেনে নিয়ে হাশিম ও মুত্তালিবের বংশধরগণ এবং জুহ্‌রা ও তায়াম পরিবারের প্রধান সদস্যগণ একটি পবিত্র শপথ করে অঙ্গীকারবদ্ধ হন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি, সে মক্কাবাসী বা আগন্তুক হোক, স্বাধীন নাগরিক বা দাস হোক, মক্কার যেকোন এলাকায় তাকে যেকোন অন্যায় বা অবিচার থেকে রক্ষা করতে হবে। প্রতিকার করতে হবে এই জুলুমবাজীর। এই বিরোচিত সংঘ জুরহুম বংশের লোকদের মধ্যে এরকম উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি প্রাচীন সংগটনের স্মরণে 'হিলফুল ফুজুল' নাম হয়েছিল সংগঠনের। চারজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ফজল, ফজাল, মুফাজ্জাল, ও ফুজাইলের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল সংগঠনটি। এই 'ফুজুল সংঘ' দুর্বল ও মজলুম মানুষের রক্ষার্থে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চার করেছিল। এই সংঘ ইসলামের আবির্ভাবের পর পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত সক্রিয় ছিল। 'হিলফুল ফুজুল' প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পরে এবং খ্রিস্টীয় শতকের প্রথম দিকে হুয়ারিসের পুত্র ওসমান বাইজান্টাইনের অর্থপুষ্ট হয়ে হিজাজকে রোমানদের করতলগত রাজ্যে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়েছিল। তার এই চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল মহানবীর কর্তৃত্বপ্রভাবে।

www.amarboi.org

ফলে ওসমান পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল সিরিয়ায়। পরে খাসানিয়া যুবরাজ তাকে সেখানে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে। ৬০৫ খ্রিষ্টাব্দে, যখন মহানবীর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর, কাবাগৃহ পুনর্নির্মাণের কাজে হাত দিয়েছিল কোরাইশরা। এই কাজ চলার সময় এই কাজে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে এমন একটি কলহের সূত্রপাত হয়েছিল যে, একসময় ভয়ানক রক্তপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। মুহম্মদ (সাঃ) এর যথাযোগ্য হস্তক্ষেপের ফলে তার সন্তোষজনক সম্ভাবনা ঘটেছিল। তিনি এই ধরনের জনহিতকর কাজ করেছেন এই পনেরো বছরের মধ্যে। কোমল স্বভাব, নিষ্কলুষ চরিত্র, জীবনের কঠোর বিশুদ্ধি, বিবেক-সম্পন্ন শিষ্টাচার, দীন ও দুর্বলের প্রতি সাহায্যে সদা প্রস্তুত, সম্মানবোধের মহৎ ধারণা, অবিচলিত বিশ্বস্ততা, কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা তাঁকে তাঁর নিজ দেশবাসীর কাছে মহান আল-আমীন বা বিশ্বাসী উপাধিতে ভূষিত করেছিল।

তিনি এই সময় চাচা আবু তালিবের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ কিছুটা লাঘব করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি আবু তালিবের পুত্র আলীর শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। আবু তালিবকে পরিবারের পূর্বতন অবস্থা বজায় রাখতে গিয়ে আর্থিক ব্যয়-বরাদ্দকে অনেকাংশে সংকুচিত করতে হয়েছিল। মহানবীর সঙ্গে খাদিজার বিবাহ হওয়ায় মহানবী সম্পদশালী হলেন এবং আবু তালিবের ভাই আব্বাস মক্কার সর্বাপেক্ষা সম্পদশালী নাগরিক ছিলেন। একবার দেশের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় মুহম্মদ (দঃ) তার চাচা আব্বাসকে আবু তালিবের একটি পুত্রের প্রতিপালনের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি নিজেও চাচার অপর এক পুত্রের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এভাবে আব্বাস জাফরকে এবং মুহম্মদ (দঃ) আলীকে গ্রহণ করেন; আকিল তাঁর পিতার সাথেই ছিল।[১৬] শিশু অবস্থায় মহানবীর পুত্র-সন্তানদের মৃত্যু ঘটে আলীকে গ্রহণ করে তার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের মধ্যদিয়ে তিনি পুত্রদের হারানোর বিয়োগ ব্যথার সান্ত্বনা পেয়েছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা ফাতিমার[১৭] সঙ্গে আবু তালিবের পুত্র আলীর ভাবী বিবাহ স্নেহ ও আনুগত্যের বন্ধন চিরস্থায়ী করেছিল।

মহানবী তখন তাঁর মানব হিতৈষী কাজের মাধ্যমে তাঁর দেশবাসীর কাছে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। এই কাজটি তাঁর স্বদেশবাসীর মনে হিতকর প্রভাব বিস্তার করেছিল, একটি প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র বন্দী করে মক্কায় নিয়ে এসেছিল জায়িদ-বিন-হারিস নামক এক আরব যুবককে। তাকে খাদিজার ভাগিনেয়ের কাছে বিক্রী করা হয়েছিল। খাদিজাকে তিনি উক্ত যুবকটিকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন, মহানবী খাদিজার কাছ থেকে উক্ত যুবকটিকে উপহার হিসেবে পেলেন এবং অনতিবিলম্বে তাকে মুক্ত করে দিলেন। যুবকটি এতে এতই অনুরাগিত হয়েছিল যে পিতার সনির্বন্ধ অনুনয় থাকলেও সে মহানবীর কাছ থেকে নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যায়নি। পনেরো বছর কেটে গেছে এ ধরনের চেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। এ সময়টা অনেক দুঃখ-দুর্দশার সাক্ষী। তবে তিনি মানুষের দুঃখ-বেদনার প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল ছিলেন।

তিনি দেখেছিলেন যে তাঁর নিজ দেশ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধবিগ্রহ ও আন্তগোত্রীয় বিবাদ-বিসম্বাদের দ্বারা রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত, অজ্ঞতার তিমিরে নিমজ্জিত দেশবাসী, অশ্লীল

www.amarboi.org

আচার-আচরণ ও কুসংস্কারে জর্জারিত এবং সদগুণকে ত্যাগ করে উচ্ছৃঙ্খল ও নিষ্ঠুরতায় ব্যাপৃত। তাঁর চোখ খুলে দিয়েছিল দু'বার সিরিয়ায় গিয়ে অনৈতিক বিপর্যয়ের দৃশ্য দেখে। বিরোধী ধর্মমত ও সম্প্রদায় একে অন্যকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করছিল, তারা যে ঈশ্বরের উপাসনা করছিল সেই ঈশ্বরকে নিয়ে তারা বিবাদ-বিসম্বাদ করছিল। তারা বিদ্বেষ বহন করছিল হিজাজের মরুভূমি ও উপত্যকায়। আরবের শহর এলাকাগুলো তাদের ঝগড়া ও রেষারেষি করে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করছিল। তাঁর চোখের সামনে সীমাহীন হতাশার ছবি ভেসে উঠছিল। খুব কম লোকই একটি নির্ভরযোগ্য আশ্রয়ের জন্য অন্ধকার পথ খুঁজছিল তাদের পুরাতন বিশ্বাস পরিত্যাগ করে। তাদের মাঝে অস্থিরতা স্পষ্ট হয়েছিল।[১৮] তাদের মানসলোকে এমন কিছুই ছিল না যা তাদের ব্যক্তিগত জীবনের বাইরে মানবজাতির কাছে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে। মুহম্মদ (দঃ)-এর আত্মা ঊর্ধ্বে উন্নীত হয়ে সৃষ্টি, জীবনমৃত্যু, ইষ্ট-অনিষ্টের রহস্যের যবনিকা ভেদ করার এবং বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা খুঁজে পাবার প্রয়াসী হয়েছিলেন। মহান আল্লাহ্র যে বাণী তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তা অবশেষে জগতের প্রাণসঞ্চারী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে। বিবাহের পর বেশির ভাগ সময় তিনি হিরা পর্বতের[১৯] গুহায় গিয়ে প্রার্থনায় রত থাকতেন। কোন কোন সময় পরিবারসহ যেতেন। সেখানে তিনি ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। হিরা পর্বত একটি বিশাল পাহাড়, একটি বিদীর্ণ ও শূন্যগর্ভ গিরিখাত দিয়ে বিচ্ছিন্ন। মরুভূমির সূর্যকিরণে এক ছায়াহীন, পুষ্পহীন, কূপ বা নদীবিহীন গিরি হিসেবে দণ্ডায়মান। তাঁর কাছে নির্জনতা সত্যই ভাবাবেগের উৎস হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। এই গুহায় তিনি প্রায়ই সারারাত ধরে গভীরতম চিন্তায়, বিশ্বের অদৃশ্য অথচ সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ্র ধ্যানে তন্ময় থাকতেন। ক্রমশ স্বর্গমর্ত্য এক পূর্বনিধারিত দৃষ্টি ও আদেশ দ্বারা পূর্ণ হচ্ছিল। প্রাণহীন বস্তু থেকেও যেন বাণী উঠছিল, যে মহান কার্য-সম্পাদনের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাঁকে পরিচালিত করেছিলেন পাহাড় পর্বত বৃক্ষলতা তা পূর্ণ করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানাচ্ছিল।[২০] আত্মার কবিত্ব শক্তি এর চেয়ে বেশি কী দিতে পারে? সেই সব সত্যের স্পষ্ট প্রকাশ হয়েছিল সেই সময় ফিরিশতাদের মানসিক দর্শন ও ভীতি সঞ্চারী মূর্তির মাধ্যমে। এর দ্বারা মহানবী জগতের প্রাণ সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। আজ পর্যন্ত বাস্তবক্ষেত্রে এই পৃথিবীতে আবির্ভূত প্রত্যেক মহান পথদ্রষ্টার আত্মা অদৃষ্ট নয়, কিন্তু অনুপলবদ্ধ প্রভাবগুলো প্রসঙ্গে সচেতন হয়েছেন যা মানবজাতির কিছু সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক সাফল্যের পথ দেখিয়েছে। স্যামুয়েল প্রাচীন যুগের মহাপুরুষ, অতীতের কুয়াসাচ্ছন্ন পরিমণ্ডলে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল এক বিস্ময়কর। যীশু খ্রিস্ট তাঁর লোকদের অস্পষ্ট অদৃষ্ট ও তাঁর কর্মপরিকল্পনার গুরুত্ব প্রসঙ্গে অনুধ্যান করেছিলেন, পার্বত্য-নির্জনবাসে মুহম্মদ ধ্যান করেছেন। স্যামুয়েল হতে যীশুখ্রিস্ট, যীশুখ্রিস্ট হতে মুহম্মদ কেউ এই প্রভাবের বাহিরে নন।[২১] নিথর নিস্তব্ধ রাতে, ভোরের প্রশান্তমুহূর্তে, গভীর নির্জনতায় বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দেরমত তাঁর কাছে আকাশ থেকে ভেসে এলো বাণী ঃ "আপনি সেই মানুষ। আপনি আল্লাহ্র রসুল"; অথবা চিন্তামগ্নবস্থায় প্রবল বেগে

www.amarboi.org

ধ্বনিত হল ঃ "আপনার প্রভুর নামে পাঠ করুন।"[২২] এই পর্যায়ে ধ্যানীমগ্ন মনের পর্দায় সাক্ষাৎ মিললো স্বর্গীয় ফিরিশতাদের, যারা কাজ করেন আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগের বাহন হিসেবে। "সত্যের ধারক নিজের প্রেরিত পুরুষদের মনোনীত করেন এবং বজ্র-নির্ঘোষের থেকেও শক্তিশালী ভাষায় তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন। একই অন্তরের বাণীতে তিনি আমাদের সকলের সঙ্গে কথা বলে থাকেন। ঐ বাণী ধীরে ধীরে কমে গিয়ে অশ্রুতপ্রায় হয়ে যায়; তা তার ঐশী শক্তি হারিয়ে জাগতিক বিজ্ঞতার ভাষায় পর্যবসিত হতে পারে। তবে সময় সময় আল্লাহ্র মনোনীত পুরুষদের কাছে সেই বাণী স্বরূপে ব্যক্ত হতে পারে এবং তাদের কর্ণকুহরে ঐশী বাণী হিসেবে শোনা যেতে পারে।[২৩]

একজন মহান গ্রন্থকার[২৪] মন্তব্য করেন, "যুগের পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আল্লাহ্র ব্যক্তিত্ব সম্পর্কীয় মুহম্মদের বিরাট ধারণার স্বাভাবিক সম্বন্ধ, যে বিস্ময়কর মিতাচার ও আত্মসংযম নিয়ে তিনি তাঁর সর্বব্যাপী দর্শন পোষণ করেছিলেন তার একমাত্র ব্যাখ্যা"; এরপরও তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে, "এটা হঠাৎ নয় যে, সে যুগের এক সার্বভৌম শক্তি সেই বিশাল উপদ্বীপে নির্জনতা ভেঙে উঠে এসেছিল, যার আশেপাশে সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের জোয়ার-ভাটার খেলা হচ্ছিল। মরুভূমি থেকেই আবির্ভাব হয়েছে এক সার্বভৌম ইচ্ছাশক্তির নামে প্রত্যেক স্বতন্ত্র নবুয়্যতের দাবী। খ্রিস্টান প্রেরিত পুরুষের প্রত্যাহারের মাধ্যমে আরবদেশের প্রতি যে প্রতীকধর্মী তাৎপর্য দেয়া হয়েছে রক্তমাংস শূন্য এক শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তা মুহম্মদের নিকট প্রতীকের চেয়ে অধিক ধারণা হয়েছিল। এক ঘটনপটিয়াসী শক্তিতে আরবদেশ রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। আর এর মূল ব্যক্তিত্ব হলেন ইসলামের নবী মুহম্মদ (দঃ)। তারকাখচিত রাত্রিতে নির্জন জায়গাগুলোতে এক গোপন বাধ্যবাধকতাবোধের দ্বারা চালিত, দেশের ধূলিধূসরিত, সুমহান ঐতিহ্যধারী এই মহান পুরুষের প্রতি মরুভূমি মন উজাড় করে কথা বলেছিল।

এক রাত্রি, "শক্তি ও সৌভাগ্যের রাত"—তখন ঐশী শান্তি সারা দুনিয়ায় বিরাজমান এবং গোটা প্রকৃতি তার স্রষ্টার দিকে অবনমিত, সেই রাতেরই মধ্যভাগে মহাগ্রন্থ কোরআন তৃষ্ণার্ত আত্মার নিকট উদ্ভাসিত হল। চিন্তায় নিমগ্ন মহানবী সাগরের গর্জনের মতো মহাশক্তিশালী এক কণ্ঠস্বর দ্বারা জেগে উঠলেন সেই কণ্ঠস্বর উচ্চৈস্বরে দু'বারই ধ্বনিত হলো, কিন্তু তিনি সেই বাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। তাঁর উপর চেপে বসলো এক বিভীষিকাপূর্ণ ভার এবং একটি উত্তর তাঁর হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসলো। তৃতীয়বারের মতো কণ্ঠস্বরটি ঘোষিত হল "পড়ুন"।

মহানবী বললেন, "আমি কি পড়বো?" উত্তর এল পড়ুন আপনার প্রভুর নামে।"

মানুষকে কিভাবে ক্ষুদ্রতম সূচনা থেকে অস্তিত্বে আনা হয়েছে এবং প্রতিপালকের উপলব্ধি ও জ্ঞানের মাধ্যমে ঊর্ধ্বে উন্নীত করা হয়েছে তা মানুষ জানতো না, যিঁনি পরম করুণাময় এবং যিনি কলমের দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন,[২৫]—এই কথা বলে কণ্ঠস্বরটি থেমে গেল, মুহম্মদ বিমোহিত অবস্থা থেকে জেগে উঠলেন এবং তাঁর মনে হল তাঁর নিকট যে

www.amarboi.org

কথাগুলো উচ্চারিত হয়েছে তা তাঁর অন্তরে খচিত হয়ে গেছে। তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপতে থাকলো, তিনি দ্রুত বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে বললেন, "হে খাদিজা, আমার কি হয়েছে?" তিনি শুয়ে পড়লেন ও খাদিজা তাঁকে লক্ষ করতে লাগলেন। ভাবাবেশ দূর হলে তিনি খাদিজাকে বললেন, "হে খাদিজা, যার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না (অর্থাৎ মহানবী নিজে) সে হয় ভবিষ্যদ্বক্তা।[২৬] নয়তো বিকারগ্রস্ত—উন্মাদ হয়েছে।" তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহ্ আমার রক্ষক, হে আবুল কাশিম (কাশিমের পিতা—হযরতের একটি নাম এই নামটি তাঁর শিশুপুত্র 'কাশিমের নামানুসারে হয়েছে), নিশ্চয়ই, আল্লাহ্ আপনাকে এ রকম অবস্থার মুখোমুখী করবেন না; কেননা, আপনি সত্যবাদী, অনিষ্টের প্রতিশোধে অনিষ্ট করেন না, বিশ্বাস রক্ষা করেন, সৎজীবন যাপন করেন এবং আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের প্রতি সদয়। আর হাটে-বাজারে আপনি ধৃষ্টতা করেন না। আপনার কি হয়েছে? আপনি কি ভয়ানক কিছু দেখতে পেয়েছেন?" মুহম্মদ (দঃ) উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ।" এবার তিনি যা দেখেছিলেন তাঁকে সব বললেন। এতে তিনি জবাব দিলেন, "হে স্বামী, আপনি উৎফুল্ল হোন। যাঁর হাতে খাদিজার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি, আপনি এই জাতির প্রেরিত পুরুষ হবেন।" এ কথার পর তিনি জ্ঞাতি ভাই ওয়ারাকা-বিন-নওফলের কাছে গেলেন। ওয়ারাকা "ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন।" তিনি বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। যখন খাদিজা তাঁকে যা ঘটেছিল তা বললেন তখন তিনি আনন্দে উচ্চৈস্বরে বললেন, "কুদ্দুসুন, কুদ্দুসন! পবিত্র, পবিত্র! নিশ্চয়ই ইনি 'নামুসুল আকবর'[২৭]—যিনি এসেছিলেন মুসা ও ঈসার কাছে। তিনি তাঁর জাতির প্রেরিত পুরুষ হবেন। তাঁকে এ কথা জানিয়ে সাহসী থাকতে বলো।"

সর্বত্র, সাম্রাজ্য ও জাতিসমূহের ধ্বংসের মধ্যে, গোত্র ও পরিবারের প্রচণ্ড কলহ-কোন্দলের মধ্যে পূর্ব-পশ্চিমে, উত্তর-দক্ষিণে সর্বত্রই ভেসে বেড়াচ্ছিল আল্লাহ্র পয়গাম খুব শীঘ্রই আসছে ঃ মেষপালক নিকটবর্তী হয়েছেন তিনি পথভ্রষ্ট মানুষকে প্রভুর নিয়ন্ত্রিত পথে পরিচালিত করবেন। ওয়ারাকার মনে এ কথাই বলছিল।

পরবর্তীতে যখন রাস্তায় মহানবী (দঃ) এবং ওয়াকারের সাক্ষাৎ ঘটতো তখন ইহুদি ও খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থের অন্ধ বৃদ্ধ পাঠক ওয়াকার বলতেন তিনি জানেন মানবজাতির নিকট একজন ত্রাণকর্তা প্রেরণের ঐশী ওয়াদা রয়েছে। বৃদ্ধ বলেছিলেন, "আমি তাঁরই নামে শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন নির্ভরশীল যে আল্লাহ এই জাতির প্রেরিত পুরুষ হিসেবে আপনাকে মনোনীত করেছেন; 'নামাসুল আকবর' আপনার নিকট এসেছেন। আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে এই জাতি; আপনাকে অত্যাচার করবে, আপনাকে নির্বাসন দেবে, আপনার সঙ্গে যুদ্ধ হবে। হায়! আমি যদি ততদিন বাঁচতাম তবে আপনার পক্ষে যুদ্ধ করতাম।"[২৮] এ কথা বলে তিনি মহানবীর কপালে চুম্বন করলেন। উদ্বেগপূর্ণ হৃদয়ে আশা ও বিশ্বাসের এই বাক্যগুলো শান্তি এনেছিল।[২৯] তারপর শুরু হলো আবার সেই কণ্ঠস্বরের জন্য অপেক্ষা, চঞ্চল উদ্বিগ্ন হৃদয়ে স্বর্গীয় প্রেরণার প্রতিফলনের অপেক্ষা।

www.amarboi.org

মুহম্মদ (সাঃ) আধ্যাত্মিক শূন্যতা, সাংঘাদিক মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংশয়, আশা এবং আশঙ্কা দ্বারা পর্যায়ক্রমে আন্দোলিত হয়েছিলেন তার যথার্থ পরিমাপ করা যায় যখন আমরা শুনি তিনি নিজ জীবনের উদ্দেশ্য অনুধাবন করার আগে আত্মহননের তীরে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন আল্লাহর ফিরেশতা তাঁকে মানবজাতির প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য আবার আহ্বান করেছিলেন।[৩০] স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর সংশয় ও ভীতি আলোড়িত ব্যথিত চিত্তে আশা ও বিশ্বাস ও সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন যখন তিনি দেখলেন এক মহাসত্যের ছায়াতলে বিশ্বের মানুষ মিলিত হচ্ছে।

তিনি অনুরক্তা স্ত্রীর কাছে গৃহে ফিরে আসলেন সদাশয় উপদেশের দ্বারা নিষ্কৃতি লাভ করে অবসন্ন দেহ মনে। আচ্ছন্নতা এড়াতে নিজেকে আবৃত করার জন্য স্ত্রীকে অনুরোধ জানালেন।

আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগ সাধন তাঁর ক্ষেত্রে আত্মকেন্দ্রিক সাধকদের মত নয়। যে সকল সাধকরা মরুভূমি বা অরণ্যে নির্বাসিত হন এবং ব্যক্তিগত আত্মোৎকর্ষের জন্য জীবন ধারণ করেন। কিন্তু মুহম্মদের কঠোর সংগ্রাম এমন ছিল যা এক মহাপুরুষের সংগ্রাম-সাধনা। যার পরিণতি ক্রমশ সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর জাতিকে মুক্তি দিয়েছিল পৌত্তলিকতার নাগপাশ থেকে। তিনি যখন গভীর অনুধ্যানমগ্ন বিষন্ন অবস্থায় অনুভব করলেন যে, তিনি স্বর্গীয় বাণী শুনেছেন, যে বাণী তাঁর আগে যাঁরা চলে গেছেন তাদেরকেও আহ্বান জানিয়েছে সত্য প্রচার করতে। তখনি তাঁর কাছে তাঁর ভবিষ্যতের কর্ম-পরিকল্পনা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। "ওহে বস্ত্রাবৃত, আপনি উঠুন, সতর্ক করুন, আর নিজ পালনকর্তার মহিমা ঘোষণা করুন।"[৩১] তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তিনি যে কাজের জন্য আহুত হয়েছিলেন তা সম্পন্ন করতে প্রস্তুতি নিলেন। তারপর থেকেই তাঁর জীবন মানবতার সেবায় উৎসর্গিত। তিনি তাঁর নিজ দায়িত্বে সীমাহীন নিষ্পেষণ, জুলুম ও অবমাননার মধ্যেও ছিলেন অবিচল। তাঁর প্রচারিত ধর্মমত সর্বপ্রথম খাদিজা গ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম প্রত্যাদেশে বিশ্বাস স্থাপন করেন। আরবজাতির পৌত্তলিকতা বর্জন করেন এবং বিশুদ্ধ অন্তরে স্বামীর সঙ্গে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপাসনায় যোগদান করেন। শুধু এমন নয় যে, তিনি সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ও তাঁর নবুয়্যতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, বরং যে সংগ্রাম শুরু হচ্ছিল তিনি সেই সংগ্রামের ব্যাপারেও ছিলেন প্রকৃত সান্ত্বনা দাত্রী। হাদিস দ্বারা জানা যায় "যখন তিনি (মুহম্মদ) তাঁর (খাদিজার) নিকট প্রত্যাবর্তন করেছিলেন আল্লাহ তাঁর মাধ্যমেই তাঁকে (মুহম্মদ) সান্ত্বনা ও শান্তি প্রদান করেছিলেন। তাঁর প্রতি স্বীয় বিশ্বাসের নিশ্চয়তা দান করে এবং মানুষের কাজে কথার অসারতা প্রতিপন্ন করে তিনি (খাদিজা) তাঁর মধ্যে আশার সঞ্চার করেছিলেন তাঁর বোঝা তাঁর কাছে লঘু করে তুলেছিলেন।"

প্রথমদিকে মহানবী তাঁর হৃদয় দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন অনুরক্তজনদের কাছে। তাদের তিনি পূর্ব-পুরুষদের স্থূল রীতি-নীতি থেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। খাদিজার পর তাঁর দ্বিতীয় শিষ্য আলী।[৩২] হযরত প্রায়ই মক্কার মরুভূমির গভীর

www.amarboi.org

নির্জনতায় তাঁর স্ত্রী ও তরুণ চাচাতো ভাই আলীসহ্ যেতেন যেন তারা মহান আল্লাহ্‌র বহুমুখী করুণার জন্য তাদের হৃদয় উজাড় করা কৃতজ্ঞতা জানাতে পারেন। তাঁরা একদিন আলীর পিতা আবু তালিব কর্তৃক তাঁদের প্রার্থনার ভঙ্গীর ব্যাপারে বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি একদিন হযরত মুহম্মদ (দঃ)কে বললেন, "ওহে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি কোন ধর্ম অনুসরণ করছ?" মহানবী উত্তরে বলেন, "এই ধর্ম আল্লাহ্‌র, তাঁর ফিরেশতাদের তাঁর নবীদের এবং আমাদের পূর্বপুরুষ ইব্রাহিমের ধর্ম। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের নিকট আমাকে পাঠিয়েছেন তাদেরকে সত্যের দিকে পরিচালিত করতে; হে চাচা, আপনি সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি, এটা একটা সম্মেলন, আপনি এই ধর্ম গ্রহণ করে এর প্রচারে সহায়তা করুন, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।" একজন দৃঢ়চিত্ত সেমেটিকের যথার্থ ভঙ্গিতে আবু তালিব বললেন, "হে আমার ভ্রাতুষ্পত্র, আমি আমার পিতা-পিতামহদের ধর্ম জলাঞ্জলি দিতে পারি না, তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি যতদিন বেঁচে আছি কেউ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" তারপর সম্মানিত গোত্রপতি তাঁর পুত্র আলীর দিকে ফিরে তার ধর্ম কি জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে আলী জানালেন, "হে পিতা, আমি আল্লাহ্ ও তাঁর প্রেরিত পুরুষে বিশ্বাস করি এবং তাঁকে অনুসরণ করি।" আবু তালিব বললেন, "হে আমার পুত্র, সে তোমাকে যা ভাল নয় এমন কোন পথে আহ্বান করবে না, তাই তুমি স্বাধীনভাবেই তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে পার।"[৩৩]

মুক্তি পাওয়ার পরও যিনি মহানবীকে পরিত্যাক্ত করেননি সেই জায়েদ-বিন-হারিস কিছুদিন পরেই দীক্ষিত হলেন। তাঁর পরেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন কোরাইশ গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় সদস্য আবদুল্লাহ-বিন-কুহাফা। পরবর্তীকালে ইতিহাসে তিনি আবু বকর নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন।[৩৪] তিনি তায়িম ইবনে মুর্রা নামক গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের সদস্য ছিলেন। ইতিহাসে তিনি সম্পদশালী ব্যবসায়ী, স্বচ্ছ, ও সুস্থির বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি এবং সেই সঙ্গে কর্মঠ, বিজ্ঞ, সৎ ও অমায়িক ব্যক্তি। প্রভূত প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন তিনি তাঁর দেশবাসীদের মধ্যে। তিনি শেষ নবীর মাত্র দু'বছরের ছোট ছিলেন এবং নতুন ধর্মের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন এই ধর্মের নৈতিক শক্তির উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে পাঁচজন নামজাদা ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইসলামের তৃতীয় খলিফা উমাইয়া বংশের ওসমান-বিন-আফফান, আউফের পুত্র আব্দুর রহমান, আবি ওয়াক্কাসের পুত্র সাদ যিনি পরবর্তীকালে পারস্য জয় করেছিলেন এবং আয়্যেমের পুত্র ও খাদিজার জ্ঞাতী ভাই জুবাইর—এঁরা সকলেই হযরতের হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া, অনেক নিম্নস্তরের লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আরবের নবীর চরিত্রের অকপটতা, তাঁর শিক্ষার পরিপূর্ণতা, তাঁর আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতার শক্তিশালী সাক্ষ্য বহন করে তা হল এই যে, তাঁর নিকটতম আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী, জ্ঞাতী ভাই ও অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব তাঁর প্রচারিত ধর্মের সত্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং তাঁর নবুয়্যতি পাওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহী হয়েছিলেন। তাঁরা তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে

www.amarboi.org

অবগত ছিলেন। নিকটতম আত্মীয়-স্বজন ও অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব, যে-সব লোক তাঁর সঙ্গে বসবাস করতেন ও তাঁর যাবতীয় গতিবিধি লক্ষ্য করতেন তাঁরাই ছিলেন তাঁর নিষ্ঠাবান ও ত্যাগী অনুসারী। তাঁরা সকলেই ছিলেন শিক্ষিত এবং অবশ্যই গ্যালিলির ধীবরদের চেয়ে কম শিক্ষিত ছিলেন না। মহানবীর মধ্যে যদি তারা পৃথিবীর প্রতি মোহ, প্রতারণা বা বিশ্বাসের অভাব দেখতে পেতেন তবে আর মহানবীর নৈতিক পুনরুজ্জীবন ও সামাজিক সংস্কারের সকল আশা ধূলিসাৎ না হয়ে থাকতো না। মহানবীর জন্য তাঁরা সকল জুলুম ও অত্যাচার বুক পেতে সহ্য করেছেন। সামাজিক অন্তরীণ করার মাধ্যমে দৈহিক যে নির্যাতন ও মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়েছিল তা-ও তাঁরা সহ্য করেছেন। এতোকিছুর পরও তাঁরা তাঁদের মহাশিক্ষক মুহম্মদ (দঃ)-কে আদর্শ থেকে বিচ্যুৎ হতে দেখেননি। এ সকল লোক যদি মহানবীর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন না করতো তাহলে তাঁদের অবিশ্বাস দেখা দিত মহানবীর কর্ম-পরিকল্পনার মহত্ত্ব বা তাঁর নিষ্ঠার গভীরতার প্রতি। যীশুর প্রভাব অত্যন্ত নগণ্য ছিল তাঁর নিকটতম জ্ঞাতিবন্ধুদের মধ্যে। তাঁর প্রতি কখনও তাঁর ভ্রাতাগণ বিশ্বাস স্থাপন করেনি[৩৫] তারা এতোদূর গিয়েছিল যে একবার তারা তাকে মৃত মনে করে তাঁর দেহ অধিকার করার চেষ্টা করেছিল।[৩৬] এমনকি তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যগণ বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন না।[৩৭]

চরিত্রের বিচলতা হয়তো দৃঢ়তার অভাবের জন্যে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মিলম্যানের[৩৮] মত হলো তা যীশুর পরিবর্তনশীল শিক্ষণ-নীতি থেকে হয়েছে। তবে তথ্যটি অনস্বীকার্য।[৩৯] মহানবীর সাক্ষাৎ অনুসারীদের সুতীব্র বিশ্বাস ও প্রত্যয় তাঁর ঐকান্তিকতা এবং আরোপিত প্রচারকার্যের প্রতি তাঁর নিরতিশয় আত্মনিমগ্নতার মহত্তম সাক্ষ্য দেয়।

নীরবে দীর্ঘ তিন বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন তিনি তাঁর লোকদেরকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত করার জন্য। তাদের মধ্যে পৌত্তলিকতা গভীরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল। প্রাচীন ধর্মমত নানা ধরনের প্রলোভন দেখিয়েছিল কিন্তু নতুন ধর্মমতে তা ছিল অনুপস্থিত। প্রাচীন ধর্মে কোরাইশদের কায়েমী স্বার্থ ছিল এবং তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের সঙ্গে তাদের মানসম্মান জড়িত ছিল। তাই মহানবীকে একমাত্র যুগ যুগ ব্যাপী আচরণ ও বিশ্বাসের দ্বারা শুদ্ধিকৃত মক্কার পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে হয়নি, তাঁকে পৌত্তলিকতার ভাগ্যনিয়ন্তা শাসকদের বিরোধিতার মোকবেলাও করতে হয়েছে। তাদের মধ্যেও সাধারণ লোকদের মত কুসংস্কার ও সংশয়বাদ ছিল। এ সকল শক্তির বিরুদ্ধে তিন বছরের জীবন-মরণ লড়াইয়ের মধ্যদিয়ে তিনি যে মাত্র ত্রিশজন অনুসারী করতে সমর্থ হয়েছিলেন এতে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু এই মহান শিক্ষকের হৃদয় এতে এতটুকু টলেনি। তিনি এগিয়ে চলেছিলেন যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র আদেশ তিনি বাস্তবে রূপ দিতেছিলেন তাঁর উপর দৃঢ় আস্থা রেখে। তিনি ধর্ম প্রচার করতে থাকলেন নীরবে ও বিনীতভাবে। তাঁর দিকে তাঁর দেশবাসীরা বাঁকাচোখে তাকাতে থাকলো, তারা তাঁর আল-আমীন উপাধির স্বাভাবিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছিল, মহানবীকে তারা মস্তিষ্কবিকৃত বা "আবিষ্ট" বলতে লাগলো। তবে তাঁর বিচ্ছিন্ন প্রচারকার্য তাদের

www.amarboi.org

বিরোধিতার মুখোমুখী হয়নি। এবার তিনি প্রকাশ্যে কোরাইশদের পৌত্তলিকতা বর্জন করতে আবেদন জানাতে মনোস্থির করলেন। আর তাই সাফা পর্বতের উপরে একটি সভা ডেকে সেখানে তিনি আল্লাহর দৃষ্টিতে পৌত্তলিকদের অপরাধের ব্যাপকতা, খোদিত মূর্তির প্রতি তাদের পূজা দেয়ার মধ্যে যে মূর্খতা রয়েছে সে সম্পর্কে বলেন। তাদেরকে তিনি সতর্ক করে দিলেন অতীতকালে পয়গাম্বরদের আহ্বানে সাড়া না দেবার জন্য বিভিন্ন গোত্রের যে ভয়াবহ পরিণতি হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে। আর আহ্বান জানালেন পুরাতন পঙ্কিল ধর্ম-পরিত্যাগ করে প্রেম, সত্য ও বিশুদ্ধতার ধর্ম গ্রহণ করতে। কিন্তু তাঁর আহ্বানের প্রতি ব্যঙ্গকারীরা ব্যঙ্গোক্তি করল, হেসে উড়িয়ে দিল তরুণ আলীর উদ্দীপনাকে, তারা মুখে উপহাস ও তামাসা করতে করতে এবং তাদের মধ্যে বিপ্লবের যে মনোভাব জেগে উঠছে তাতে মনের মধ্যে ভয় নিয়ে সেই স্থান ত্যাগ করল। তিনি এভাবে কোরাইশদেরকে আল্লাহর হুঁশিয়ারী শুনিয়ে ব্যর্থ মনোরথে বাণিজ্য বা তীর্থ উপলক্ষে মক্কা নগরীতে আগত লোকদের প্রতি দৃষ্টি দেন। কিন্তু কোরাইশরা এ ক্ষেত্রেও তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। তীর্থযাত্রীরা যখন নগরীর সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে থাকলো তখন কোরাইশরা বিভিন্ন প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে তাদেরকে মুহম্মদের (দঃ) সঙ্গে যে-কোন রকম যোগাযোগ না করতে ভয় দেখালো। কারণ তারা তাঁকে বিপজ্জনক একজন যাদুকর হিসেবে প্রচার করছিল। এই কৌশলে এমন ফল হয়েছিল যা মক্কাবাসীরা আশা করতে পারেনি। নিজ নিজ দেশে তীর্থযাত্রী ও বণিকগণ ফিরে গিয়ে খবর প্রচার করতে থাকলো যে, আরবের বিভিন্ন জাতিকে তাদের পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করতে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছেন একজন অদ্ভুত উদ্দীপনা-সঞ্চারী ধর্ম প্রচারক।

মহানবী তাঁর জ্ঞাতীদের দ্বারা গ্রাহ্য হবেন না এই ধারণা যদি কোরাইশগণ পোষণ করে থাকত তবে তারা শীঘ্রই আবু তালিব কর্তৃক তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে প্রতারিত হত। বৃদ্ধ পরিবার প্রধান বংশগত আনুগত্যের ফলে যিনি প্রাচীন ধর্ম বর্জন ও নতুন ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন তিনিই সংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর দেশবাসীর অবিচার ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি প্রকৃত মরুভূমির বীরত্ব নিয়ে একটি কবিতায় নিরতিশয় বেদনা প্রকাশ করেছেন "আল-আমীন" যিনি এতিম ও বিধবাদের কল্যাণ কামনা করেন এবং যিনি কথায় ও কাজে নিজ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি তাঁর বিরুদ্ধে কোরাইশদের অত্যাচারের ভয়াবহতা সম্পর্কে। এই কবিতাটি ইতিহাসে অন্তরের সুরভিতে মণ্ডিত হয়ে আছে এবং তিনি এ কথাও ঘোষণা করেছিলেন যে হাশিম ও মুত্তালিব পরিবারের লোকেরা জীবন দিয়ে হলেও নির্দোষ এই ব্যক্তিটিকে রক্ষা করবেন। তখন ইয়াসারবের একজন প্রধান মক্কার কোরাইশদের পুরাতন যুগের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে একটি চিঠিতে পরামর্শ দেন অন্তর্ঘাতী বিভেদ ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত না হওয়ার জন্য। তিনি লিখেন, "একজন সম্মানিত ব্যক্তি কোন বিশেষ ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁকে নির্যাতন করতে হবে কেন? একমাত্র স্বর্গের প্রভু মানুষের হৃদয়ের খবর রাখেন।" তাঁর উপদেশ কোরাইশদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাদের কর্মধারায়

www.amarboi.org

পরিবর্তন এনেছিল। এক সময় তদনুযায়ী মিথ্যা অপবাদ ও দুর্নাম গালিগালাজ ও অবমাননার বিনিময়ে প্রকাশ্য ও প্রচণ্ড নিষ্পেষণ শুরু হল। হযরতকে বিরোধী কোরাইশগণ কাবাগৃহে নামায পড়া বন্ধ করে দিল; সর্বদা সর্বত্র তাঁকে অনুসরণ করতে থাকলো। তারা ময়লা ও নোংরা জিনিস তিনি ও তাঁর শিষ্যরা নামাজে দাঁড়ালে তাঁদের উপর নিক্ষেপ করত। তাঁকে তারা অপমান করার জন্য শহরের শিশু ও দুশ্চরিত্রের লোকদের লেলিয়ে দিত। তিনি উপাসনা করা ও ধ্যানমগ্ন হওয়ার জন্য যে সব রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতেন সেই সকল রাস্তায় কাঁটা ছড়িয়ে রাখত। এ ধরনের অমার্জিত নির্মমতা ঘটানোর ব্যাপারে মহানবীর চাচা আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মুল জামিল সর্বদা নেতৃত্ব দিত। হযরতের অত্যাচারিতদের মধ্যে সে ছিল সবচেয়ে দৃঢ়চেতা। যে সকল জায়গায় মহানবীর শিষ্যরা উপাসনার জন্য ভ্রমণ করতেন সে-সকল জায়গায় কাঁটা ছড়িয়ে রাখত। এই ক্রুদ্ধ আচরণের জন্য এই মহিলা "কাষ্ঠ বহনকারিণী" খেতাব পেয়েছিল।

মহানবী এতো দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও সর্বদা ছিলেন অবিচল। তাঁর মহান ব্রতপালনের প্রতি তীব্রতম আত্মপ্রত্যয় নিয়ে দ্বিধাহীনচিত্তে কাজে এগিয়ে চলেছিলেন। তিনি অনেকবার কোরাইশদের শত্রুতায় আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন। একবার তিনি তাদের খুনের ক্রোধকে তাঁর শান্ত ও ধীর আত্মসংযমের মাধ্যমে প্রশমিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু জুলুম যতই বাড়তে লাগল নতুন ধর্মের শক্তিও ততই বাড়তে থাকল। "শহীদের রক্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি" এ কথা শুধু একটি ধর্মমতের ক্ষেত্রেই সত্য নয়। মুহম্মদের প্রতি কোরাইশদের উৎপীড়ন, তাদের তীব্র অসহিষ্ণুতা আব্দুল মুত্তালিবের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বীর হামজাকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করেছিল। এই অকুতোভয় সাহসী, উদার ও সত্যপরায়ণ যোদ্ধা মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং তারপর থেকেই তিনি ইসলামের একজন অনুরক্ত সমর্থক এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি শেষপর্যন্ত আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। কোরাইশগণ প্রচণ্ড ভয় পেত হামজার তরবারীর আঘাতকে।

মহানবীকে এতসব অত্যাচার করেও অবিশ্বাসীরা পারেনি পাপপঙ্কে নিমজ্জিত, আত্মসংশোধনে বিমুখ জাতির প্রতি তাঁর আহ্বান বন্ধ করতে। ধর্ম প্রচারের মধ্যে তিনি নিজেকে মনেপ্রাণে উৎসর্গিত করেছিলেন। উদ্দীপনা-জাগরুক ভাষায় তিনি তাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন, কিন্তু সেই ভাষা তাদের হৃদয়কে কলুষমুক্ত করতে পারেনি। তিনি বলেন আদ এবং সামুদ জাতি খোদার প্রেরিত পুরুষদের উপদেশ অগ্রাহ্য করলে তাদের উপর শাস্তি নেমে এসেছিল। নূহের লোকদের পাপের পরিণতি হিসেবে তাদের উপর নেমে এসেছিল মহাপ্লাবন। তিনি প্রকৃতির বিস্ময়কর দৃশ্যাবলীর, মধ্য দিনের উজ্জ্বলতার, রাত্রি যা সবকিছুকে ঢেকে ফেলে তার, দিনের আলোর শপথ করে বলেছিলেন যে, তোমরা বিগত যুগের মত ধ্বংস সংঘটিত হওয়ার পূর্বে হুঁশিয়ার হও। তিনি তাদের বিচার-দিবসের কথা বলেছিলেন যেদিন মহাবিচারকের সামনে এ জগতে মানুষের কৃত কার্যাবলীর হিসাব-নিকাশ হবে, সেদিন যেসব শিশুকে জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে কি অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। আকাশ ও

www.amarboi.org

পৃথিবী সেদিন গুটিয়ে রাখা হবে এবং আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ কাছে থাকবে না। তিনি তাদেরকে পরজগতের পুরস্কার ও শাস্তির কথা বলেছিলেন, তিনি "প্রাচ্যের উপমাসমূহের আভায়" তার জড়বাদী লোকদের কাছে স্বর্গের আনন্দ ও নরকের যন্ত্রনার কথা বর্ণনা করেছিলেন। তিনি অবিশ্বাসীদের প্রসঙ্গে বলেন :

"এদের অবস্থা এ রকম—যেমন একটি লোক আগুন জ্বালিয়ে নিল—তার চারপাশের সবকিছু আলোকিত হল; কিন্তু আল্লাহ্ পাক সেই আলো নিবিয়ে দিলেন সব অন্ধকারে ঢেকে দিলেন—যেন কিছুই দেখতে না পায়।"

"তারা বধির মূক ও অন্ধ, তাই তারা ফিরবে না।" "অথবা আসমান থেকে ঘন বৃষ্টি পড়ছে, যাতে রয়েছে ঘন অন্ধকার, গুরুগর্জন ও বিদ্যুৎ; তারা বজ্রের গর্জন শুনে মরণের ভয়ে কানে আঙ্গুল দেয়। অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহ্ ঘিরেই রেখেছেন।"

"মনে হয় তাদের চোখ এই বুঝি বিদ্যুৎ ঝলক ঝলসে দেবে। যখন বিদ্যুৎ চমকায় তখনই তারা পথ চলে। যখন আবার অন্ধকার হয় তখন দাঁড়িয়ে থাকে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে অনায়াসে তাদের কান ও চোখ ছিনিয়ে নিতে পারেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সকল বিষয়ে শক্তির একমাত্র অধিকারী।"[৪০]

"আর যারা অবাধ্য, তাদের কাজকর্ম যেন ঠিক মায়া মরীচিকা—যা দেখে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানি বলেই মনে করে। অথচ সে যদি তার কাছেও পৌছায়, তবুও সেখানে পাবে না কিছুই। অবশ্য আল্লাহ্ তায়ালাকেই সে নিজের কাছে পায়। আর তিনিই দান করবেন তার পুরোপুরি প্রাপ্য। কেননা, আল্লাহ শীঘ্রই হিসেব নিবেন।"

"কিংবা ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে গভীর সাগরের বুকে উত্তাল তরঙ্গমালা—একটার উপর দিয়ে আরেকটা তরঙ্গ ধেয়ে আসছে, তার উপরে ঘন কালো মেঘ একটার উপর দিয়ে আরেকটা ছুটে বেড়াচ্ছে। তখন যদি সে নিজের হাত প্রসারিত করে তবে সে তাও দেখবে না। আসলে যে কেউ এমন হবে, তার জন্য আল্লাহ্ পাক আলো দান করেননি—তার জন্য কোথাও যে বিন্দুমাত্র আলো নেই।"[৪১]

হতবাক হয়ে পড়ল মক্কাবাসীরা। প্রায়ই ধর্মান্তকরণ হতে লাগল। এ পর্যায়ে সম্পূর্ণভাবে সন্ত্রস্ত হয়ে গেল কোরাইশরা। এক মারাত্মক বৈপ্লবিক আন্দোলনের পূর্বাভাষ হিসেবে দেখা দিল মহানবীর ধর্মপ্রচার। হুমকির মুখোমুখী হল তাদের শক্তি ও প্রতিপত্তি। এরা প্রতীমাগুলোর দেখাশুনা করতো যা হযরত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছিলেন। যে উপাসনার তত্ত্ববধায়ক তারা ছিল মহানবী তা ত্যাগ করেছেন; প্রাচীন অনুষ্ঠানাদির পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণাদির মধ্যেই ছিল তাদের অস্তিত্ব। তারা যদি হযরতের ভবিষ্যৎবাণীগুলো বাস্তবায়িত করতো তবে আরবের জাতিগুলোর মধ্যে তাদের প্রভাব নিষ্ক্রিয় হয়ে যেত। নতুন ধর্ম-প্রচারকের প্রবণতা অত্যন্ত গণতান্ত্রিক। কেননা প্রভুর দৃষ্টিতে সকল মানুষই সমান। তাদের প্রাচীন পার্থক্যবাদের ঐতিহ্যের পরিপন্থী। এ ধরনের কোন ঐতিহ্য তাদের ছিল না। কাজেই এই আন্দোলন অধিকতর শক্তিশালী হওয়ার আগেই তার গতিরোধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

www.amarboi.org

এই পরিস্থিতিতে তারা অত্যাচারের এক সুসংহত ব্যবস্থা গ্রহণ করল। প্রত্যেক পরিবার নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে বংশগত বিরোধ-নীতি লঙ্ঘন না করার জন্য নতুন ধর্মের গতিকে স্তব্ধ করার দায়িত্ব নিল। নতুন ধর্মের সঙ্গে পরিবারের নিজস্ব সদস্য, আশ্রিত ব্যক্তি বা দাস যদি যুক্ত হত তবে তাদের উপর অত্যাচার করা হত। যারা তাদের পদমর্যাদার জন্য বিশিষ্ট ছিল মহম্মদ, আবু তালিব ও তাঁর জ্ঞাতি কুটম্ব আবু বকর ও আরও কয়েকজন অথবা কোরাইশদের মধ্যে যাদের প্রভাবশালী বন্ধু বা আশ্রয়দাতা ছিল, তাদের আশ্রয় দেয়ার জন্য কিছুদিনের জন্য ক্রমাগত জুলুমের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। অন্যান্য নব-দীক্ষিত ব্যক্তিদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অনাহারে ক্লিষ্ট হয়েছিল এবং শেষে বেত্রাঘাতে জর্জরিত হয়েছিল। নির্মম অত্যাচারের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল রামফার পাহাড় ও বাসা।[৪২] মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে প্রচণ্ড রৌদ্রে রাখা হত যে-সব নরনারীকে কোরাইশগণ মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করতে দেখতে পেত। তারা যখন পিপাসার শেষপ্রান্তে পৌঁছত তখন তাদের সামনে দুটি বিকল্প দেয়া হত—মূর্তিপূজায় ফিরে যাও অথবা মৃত্যুবরণ কর। কেউ কেউ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার পর পূর্বধর্মে ফিরে যেত। তবে নব-দীক্ষিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল তাদের গ্রহণ করা ধর্মে অবিচল থাকতো। এদের মধ্যে একজন ছিলেন বেলাল। তিনি ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন। যখন সূর্য প্রচণ্ডতম উত্তাপ বর্ষণ করত তখন তাঁর প্রভু উমাইয়া-বিন-খালাক তাঁকে 'বাসা' নামক স্থানে নিয়ে তাঁকে খালি পিঠে সূর্যের দিকে মুখ করে শোয়াত এবং বুকে একটি বড় পাথর দিয়ে বলত, "যতক্ষণ না তুমি মারা যাবে বা ইসলাম ত্যাগ করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে এ অবস্থায় এখানে থাকতে হবে।" বড় পাথরের গুরুভারে প্রায়শ্বাসরুদ্ধবস্থায় শুয়ে থেকে, পিপাসায় মৃতপ্রায় অবস্থায় তিনি শুধু উত্তর দিতেন— "আহাদুন" "আহাদুন" অর্থাৎ "আল্লাহ্ এক, আল্লাহ্ এক"। পরদিন তার উপর পুনরায় একই ধরনের নির্যাতন চললে তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন। হযরত আবু বকর বন্দীপণ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করেন দাসত্ব থেকে। হযরত আবু বকর (রাঃ) এভাবে ছয়জন দাসকে মুক্তিপণ দিয়ে মুক্ত করেন। তারা নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়ে ইয়াসার ও তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছিল। তারা তাদের সন্তান আম্মারের উপরও ভয়াবহ নির্যাতন চালিয়েছিল। মহানবী প্রায়ই তাঁর অনুসারীদের দুঃখ-দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেছেন। তারা প্রচণ্ড ধৈর্য ও দৃঢ় সংকল্পে সব সহ্য করে শহীদের সম্মান লাভ করেছেন। এঁরাই শুধু ইসলামের ইতিহাসের প্রথম যুগের শহীদ ছিলেন না।[৪৩]

যীশুখ্রিস্টকে ফ্যারিসিরা যেভাবে লোভ দেখিয়েছিল কোরাইশগণ মহানবীকে সেভাবে পার্থিব সম্মান ও প্রতিপত্তির প্রলোভন দিয়ে তাঁকে তাঁর কর্তব্যপথ থেকে সরাতে চেয়েছিল। একজন জীবনীকার বলেন, একদিন মুহম্মদ বিরোধীদলের নেতাদের মজলিসের অনতিদূরে বসেছিলেন। একজন নরমপন্থী বিরোধী নেতা, ওতবা-বিন-রাবিয়া তাঁর কাছে এসে বলল, "হে ভ্রাতুষ্পুত্র, তুমি তোমার ব্যক্তিগত গুণাবলী ও বংশগৌরব বিশিষ্ট। এখন তুমি আমাদের লোকদের মধ্যে দলাদলি এবং আমাদের পরিবারের মধ্যে বিরোধ বাঁধিয়েছ। আমাদের দেবদেবীদের অস্বীকার করেছ। আমাদের পূর্বপুরুষদের

www.amarboi.org

নাস্তিক ঠাওরেছ। তোমাকে আমরা একটি প্রস্তাব দিতে চাই; ভাল করে ভেবে দেখবে তুমি গ্রহণ করবে কিনা।" হযরত বললেন, "হে ওলিদের পিতা[৪৪], বলুন।" ওতবা বললেন, "আমি শুনছি, হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, যদি তুমি যা করছো তা দিয়ে সম্পদশালী হতে চাও তবে তোমার জন্য আমরা আমাদের প্রত্যেকের চেয়ে অধিকতর সম্পদ জোগাড় করে দেব; তুমি যদি সম্মান ও প্রতিপত্তি চাও তবে আমরা তোমাকে আমাদের নেতা হিসেবে মেনে নেব। তোমার নির্দেশের বাইরে কোন কাজ হবে না। যদি রাজ্য চাও তাহলে আমরা তোমাকে নৃপতি বানাব এবং যে দুষ্টাত্মা তোমার উপর ভর করেছে সে যদি তোমাকে ছেড়ে যেতে না চায় তবে আমরা বড় বড় চিকিৎসক দিয়ে তোমার চিকিৎসা করাবো, তোমাকে সুস্থ করে তুলবো। হযরত প্রশ্ন করলেন, "হে ওয়ালিদের পিতা, আপনার কথা শেষ হয়েছে?" উত্তরে তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। মহানবী বললেন, "তবে শুনুন।" "হ্যাঁ, শুনছি," তিনি উত্তর দিলেন। সতর্ককারী হযরত বললেন, পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকেই যে এই কালাম নাযিল করা হয়েছে। এ এমন কিতাব যার আয়াতগুলো সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত; আরবী ভাষায় কোরআন—জ্ঞানী কওমদের জন্যেতো সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী। কিন্তু অধিকাংশ লোকই যে তা এড়িয়ে যাচ্ছে—যেন তারা শুনতেই পায়নি। তারা বলছে, আপনি আমাদের যেদিকে ডাকছেন, তা থেকে আমাদের মন যে পর্দার আড়ালেই রয়েছে। আর আমাদের কানে ছিপি আটকানো রয়েছে। আর আমাদের আর আপনার মাঝখানে যেন একটা পর্দা রয়েছে। সুতরাং আপনি আপনার কাজ করুন। আর আমরাও নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকব। আল্লাহ্র নির্দেশ আপনি ঘোষণা করে দিন; "আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে এই ওহী এসেছেঃ তোমাদের মাবুদ একজনই। সুতরাং সোজা তাঁর দিকেই নিবিষ্ট হও। আর তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। আর মুশরিকরা ধ্বংস হোক। যারা যাকাত আদায় করে না, আর আখিরাতকেও[৪৫] যারা স্বীকার করেনা। যারা ইমান এনেছে আর নেক কাজও করেছে—তাদের জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে— যা মওকুফ করা হবে না—এ কথা সত্য সুনিশ্চিত।[৪৬] কোরআনের আয়াতগুলো আবৃত্তি করে হযরত ওতবার দিকে ফিরে বললেন, "আপনি আল্লাহ্র নির্দেশ শুনলেন, এখন আপনার কাছে যে পন্থা উত্তম মনে হয় সেটাই আপনি গ্রহণ করুন।[৪৭]

দিনের পর দিন অসহনীয় হয়ে উঠল হযরতের অনুসারীদের দুঃখ-দুর্দশা। মহানবী তাঁর শিষ্যদের দুরবস্থায় মর্মাহত হয়ে তাদেরকে প্রতিবেশী খ্রিস্টান রাজ্য আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নেয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। তাঁদের সেখানে অবস্থান করার জন্য বললেন কোরাইশদের মনোভাব পরিবর্তন হওয়া পর্যন্ত। একজন ধার্মিক রাজা সেখানে রাজত্ব করতেন। তিনি খ্রিস্টান-রাজ্যের ধর্মপরায়ণতা, সহিষ্ণুতা ও আতিথেয়তার কথা শুনেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যরা সেখানে অভ্যর্থনা পাবেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন।

অবিলম্বে কেউ কেউ হযরতের উপদেশ অনুসরণ করেছিলেন এবং পনেরো জনের একটি দল 'নেগাস' বা নাজ্জাশীর রাজ্য আবিসিনিয়ায় উপস্থিত হলেন। ইসলামের

www.amarboi.org

ইতিহাসে হযরতের নবুয়্যতি লাভের পঞ্চম বৎসরে এটাই প্রথম দেশত্যাগ বা হিযরত। ৬১৫ খ্রিস্টাব্দের এই দেশত্যাগী দলের সঙ্গে আরও নরনারী যুক্ত হল। এদের মোট সংখ্যা দাঁড়ালো ৮৩ জন পুরুষ ও ১৮ জন মহিলা।[৪৮] কোরাইশদের সীমাহীন শত্রুতা সেখানেও তাদের মুক্তি দেয়নি। কোরাইশরা প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ল তারা পালিয়ে যাওয়ায় এবং রাজার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করল তাদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য যাতে তাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায়। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হল তারা তাদের পূর্ব-পুরুষদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছে এবং একটি নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছে। নাজ্জাশী হিযরতকারীদের ডেকে পাঠালেন এবং শত্রুরা তাদের বিরুদ্ধে যা বলছে তা সত্য কিনা জানতে চাইলেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এই ধর্মটি কি যার জন্য তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী ধর্ম ত্যাগ করেছ এবং আমার ধর্ম বা অন্য কোন জাতির ধর্ম গ্রহণ করনি?" দেশত্যাগীদের মুখপাত্র হিসেবে আবু তালিবের পুত্র ও আলীর ভাই জাফর জবাব দিলেন, "হে রাজন, আমরা মূর্খতা ও বর্বরতার মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, আমরা মূর্তি পূজা করতাম, ব্যভিচারে লিপ্ত ছিলাম, আমরা মৃত প্রাণীর মাংস খেতাম, আমরা অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করতাম; আমরা মনুষ্যত্বের প্রত্যেকটি অনুভূতি, অতিথি ও প্রতিবেশীদের প্রতি দায়িত্ব একেবারে জলাঞ্জলি দিয়েছিলাম। আমরা নীতি বলতে জানতাম জোর যার মুল্লুক তার। এই পর্যায়ে আল্লাহ্র রহমতে এমন একজন মানুষের উদয় হয়েছে, যাঁর জন্য, সত্যবাদিতা, সততা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে আমরা অবহিত ছিলাম; আমাদেরকে আল্লাহ্র একত্বের দিকে তিনি আহ্বান করেছেন এবং আল্লাহ্র সঙ্গে কোন বস্তুর অংশীদার না করার শিক্ষা দিয়েছেন।[৪৯] তিনি আমাদের মূর্তিপূজা ত্যাগ করার আদেশ দিলেন। সত্য কথা বলতে, বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে, দয়ালু হতে এবং প্রতিবেশীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে নির্দেশ দিলেন। নারীজাতির বিরুদ্ধে দুর্নাম রটনা না করতে শেখালেন। এতিমের ধন অপহরণ না করতে তিনি আদেশ দিলেন; তিনি পাপ ও অনিষ্ট থেকে দূরে থাকার জন্য, নামাজ কায়েম করার জন্য, যাকাত দেয়া ও রোজা রাখার জন্য আমাদের আদেশ দিয়েছেন। তাঁর কথার উপর আমরা বিশ্বাস রেখেছি, তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেছি এবং এক আল্লাহ্র ইবাদত ও কোন কিছুর সঙ্গে তাঁর শরীক স্থাপন না করার নির্দেশ মেনে নিয়েছি। আমাদের লোকেরা এই কারণেই আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আমাদের উপর জুলুম করেছে যাতে আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত ত্যাগ করে কাঠ, পাথর ও অন্যান্য দ্রব্যের পূজায় পুনরায় ফিরে যাই। আমাদের তারা অত্যাচার করেছে, আমাদের ক্ষতিসাধন করেছে। আমাদের নিজেদের নিরাপত্তার অভাবে আমরা ওদের মধ্য থেকে আপনার রাজ্যে এসেছি এবং আশা রাখি তাদের অত্যাচার থেকে আপনি আমাদের রক্ষা করবেন।"[৫০]

রাজা কোরাইশদের দাবী নাকচ করলেন। প্রতিনিধিদল বিভ্রান্ত হয়ে মক্কায় ফিরে আসে।

মুহম্মদের অনুসারীবৃন্দ বিভিন্ন দেশে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিলেন অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তবে হযরত কোথাও না গিয়ে তাঁর কর্তব্য সাহসিকতার সাথে প্রচণ্ড

www.amarboi.org

অবমাননা এবং অত্যাচারের মধ্যেও চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কোরাইশগণ আবার সম্মান ও ঐশ্বর্যের প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিল, তাঁকে তাঁর কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হযরতের জবাব ছিল আগের মতই অটুট ও অনড়। "আমি ঐশ্বর্যলাভে ইচ্ছুক নই, বিন্দুমাত্র লোভও আমার নেই প্রতিপত্তি ও রাজ্য লাভ করতে। আল্লাহ্ আপনাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন সুসংবাদ ঘোষণার জন্য। আপনাদেরকে আমি আল্লাহ্র বাণী শুনিয়েছি, আমি আপনাদেরকে উপদেশ দিয়েছি। আমি যে পয়গাম প্রাপ্ত হয়েছি তা যদি গ্রহণ করেন তবে আল্লাহ্ আপনাদের প্রতি ইহজগতে ও পরজগতে প্রসন্ন থাকবেন; আর আপনারা যদি আমার উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেন তবে আমি ধৈর্য ধারণ করবো এবং আমার ও আপনাদের বিচারের ভার তাঁর হাতেই ন্যস্ত করব।" এবারও তাঁকে তারা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করল এবং কপটতাপূর্ণ প্রশ্নের দ্বারা তাঁর শিক্ষার ভ্রান্তি ধরানোর চেষ্টা করল।[৫১] প্রভুর সমীপে নিজেকে সমর্পণ পৌত্তলিকদের সংশয়বাদের উর্ধ্বে উন্নীত হয়েছিল। তারা পানির ফোয়ারা এনে নহর প্রবাহিত করতে, স্বর্গের টুকরা আনতে, পর্বত সরিয়ে দিতে, স্বর্ণের তৈরি একটি ঘর বানাতে এবং মই দিয়ে আকাশে উঠতে বলল।[৫২] এটা পুরানো ঘটনারই পুনরাবৃত্তি, পার্থক্য এই যে,যীশুর ক্ষেত্রে তাঁর শিষ্যবৃন্দ তাঁর নবুয়্যতের সত্যতা সম্পর্কে পরিতৃপ্ত হওয়ার জন্য তাঁকে অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। অধ্যাপক মোযেরী জানান, "তাঁর (যীশুর) সাক্ষাৎ শিষ্যগণ সবসময় তাঁকে তাঁর কাজকে ভুল বুঝেছিল। তারা চাইছিল যে তিনি স্বর্গ থেকে আগুন নিভিয়ে দিক, নিজেকে ইহুদিদের রাজা বলে ঘোষণা করুক, তিনি তাঁর ডান হাত এবং তাঁর রাজত্বে বাম হাতের উপর আসন গ্রহণ করুক, তিনি তাদেরকে আল্লাহ্কে দেখান এবং তাদের চর্মচক্ষেই তাঁকে দৃশ্যমান করুন, তিনি নিজে করুন এবং তাদের জন্য করুন সবকিছু যা তার পরিকল্পনার সঙ্গে বেমানান। তারা এভাবেই তাঁর সঙ্গে তাঁর শেষ সময় পর্যন্ত আচরণ করেছিল। যখন তাঁর শেষ সময় এল, তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে পলায়ন করল।"

এইসব অপরিতৃপ্ত উদাসীন মানুষগুলোর অলৌকিকতার প্রতি আকর্ষণ কোরাইশদের চেয়ে কম ছিল না। পরবর্তীতে এরা যীশুর সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে অস্পষ্টতায় ঢেকে দিয়েছিল, আধুনিক ভাববাদী খ্রিস্টধর্মও এই ঐতিহ্যকে ত্যাগ করতে পারেনি। মাঝে মাঝে যীশু রাগ হয়ে বলতেন যে, এই যুগে নিষ্ঠতা ও বিশুদ্ধতা নেই—এই যুগ অলৌকিক নিদর্শন দেখতে চায় এবং কোন অলৌকিক নিদর্শন দেখানো উচিত হবে না। যদি কোন ব্যক্তি মুসা ও অন্যান্য নবীদের বিশ্বাস না করে তবে তিনি মোটেই অনুতপ্ত হবে না, যদিও মৃত থেকে জীবিত হয়ে ওঠে।[৫৩]

এটা অবশ্যই প্রশংসনীয় যে, আরবের নবীর অনুসারীদের পক্ষ থেকে পয়গাম্বরের কাছে কখনো অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর জন্য দাবী জানানো হয়নি। তাঁর মহান নবুয়্যতের নৈতিক ভিত্তির উপর তাঁর জ্ঞানী, ধনিক ও সৈনিক সকল ধরনের শিষ্যদের দৃষ্টিনিবদ্ধ ছিল। তারা নিঃসঙ্গ ধর্মপ্রচারকের পাশে মিলিত হয়েছিলেন যাবতীয় পার্থিব

www.amarboi.org

স্বার্থ ও জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে। তারা জীবনে-মরণে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁর মানবিক ব্যক্তিত্বের প্রতি সশ্রদ্ধ থেকে তাঁর পাশেই ছিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা অদ্বিতীয়।

এমন এক সময় ছিল যখন অলৌকিক ঘটনা সাধারণ সাধু-সজ্জনদের কাছে আট-পৌরে ঘটনার মত ছিল, অলৌকিকতা যখন সমগ্র পরিবেশ অধ্যুষিত করত, তখন শুধু আরবে নয়, প্রতিবেশী দেশগুলোতে সভ্যতা আরও এগিয়ে গিয়েছিল। 'আল্লাহ্ আমাকে অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর জন্য প্রেরণ করেননি। আপনাদের কাছে তাঁর বাণী প্রচারের জন্যই আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার প্রভুর প্রশংসা তিনি পবিত্র মহান। আমি একজন মানুষ ও রাসুল।...দুনিয়ায় যদি ফিরেশতারাই চলাফেরা করতো, বিশ্রাম করত, তবে তাদের জন্য আসমান থেকে একজন ফিরেশতাকেই রাসুল হিসেবে পাঠিয়ে দিতাম[৫৪] আল্লাহ্র ধন-সম্পদ আমার কাছে, এ কথা আমি কখনো বলিনি, সব গোপন বিষয় আমি জানি কিংবা আমি একজন ফিরেশতা...এমন কি আমি নিজের প্রতি আস্থা রাখতে বা নিজেকে সাহায্য করতে পারি না আল্লাহ্ পাক যদি ইচ্ছা না করেন" অলৌকিকতা সন্ধানী পৌত্তলিকদের জবাবে কথাগুলো বলেন বুদ্ধিবাদের মহান অগ্রনায়ক মহানবী। মহানবীর চরিত্র বা ব্যক্তিত্বের গুণবৃদ্ধির কোন চেষ্টা এখানে করা হয়নি। তিনি সব সময়ই বলতেন, "আমি আল্লাহ্র বাণীর প্রচারক মাত্র। মানুষের কাছে আল্লাহর বাণীর প্রচারক বৈ কিছু নই।" হযরত জীবনে কখনো "এমন কোন উক্তি করেন নাই যা মানুষের উপাসনার দিকে কোন রকম অনুরোধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।"[৫৫] হযরতের ভাষায় সর্বদা সংযম, যুগ ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে অধিকতর বিস্ময়কর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্রষ্টার প্রতি তাঁর গভীর বিনম্র ভাব ছিল প্রজ্জ্বল্যমান। আর আধ্যাত্ম উপলব্ধির চূড়ান্ত মুহূর্তে তাঁর অনুভূতি ছিল সাবলীল ও সুন্দর।

"পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে। গগণমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্ পাকের জন্য পবিত্রতা ঘোষণা করছে —যিনি অধিপতি, পবিত্র মহান, পরম প্রতাপশালী ও মহান কুশলী। তিনিই মহান সত্তা—যিনি জনগণের মধ্য হতে তাদের জন্য একজন রাসুলকে পাঠিয়েছেন, যিনি তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ শোনাচ্ছেন, তাদেরকে পাক পবিত্র করছেন; আর তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান কৌশল শেখাচ্ছেন। আর এই লোকগুলো পূর্ব থেকেই গোমরাহিতে নিমজ্জিত ছিল। ... এইতো হচ্ছে আল্লাহ্র সাহায্য সামগ্রী তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্তায়ালাই যে বিপুল সাহায্য সামগ্রী দানের অধিকারী।[৫৬]

ইসলামের নবী অলৌকিক ক্ষমতাকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণরূপে তাঁর প্রচারের উপর ন্যস্ত করেন নবুয়্যতের কর্মভারকে। তাঁর প্রভাব কিংবা নবুয়্যতের বিষয়বস্তু প্রচারের জন্য অলৌকিকতার আশ্রয় নেননি। আল্লাহ্র অস্তিত্বের নিদর্শন হিসেবে প্রকৃতির পরিচিত ঘটনাবলীর দিকে তিনি সর্বদা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৫৭] তিনি সাড়া জাগাতে চেয়েছেন মানুষের প্রজ্ঞার ও চেতনার প্রতি; আবেদন জানিয়েছেন মানুষের দুর্বলতা বা

www.amarboi.org

তার বিশ্বাসপ্রবণতার প্রতি। আপনারা সর্বত্র দৃষ্টি দিন, এই যে বিস্ময়কর জগৎ, সূর্য, চন্দ্র ও তারকারাজী নীল আকাশে তাদের নিয়মিত নীরব পথ পরিক্রমণ করছে, সমগ্র পৃথিবীতে সক্রিয় রয়েছে নিয়ম ও রীতিপদ্ধতি, শুকনো পৃথিবী সজীব করে তুলছে বৃষ্টি, সমুদ্রে ভেসে চলছে লাভজনক পণ্যবাহী জাহাজ, আর কাঁদি-কাঁদি খেজুর ঝুলছে ঐ সুন্দর খেজুর গাছে—সে কি আপনাদের কাঠ বা পাথরের নির্মিত দেবতাদের কাজ?[৫৮]

হায় নির্বোধ! তুমি একটিমাত্র নিদর্শন চাও, যখন সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্র নিদর্শন ঘোষণা করছে তখন তুমি একটি মাত্র নিদর্শন চাও? তোমার শরীরের গঠনতন্ত্র কতই না জটিল, কিন্তু কতই না সাবলীলভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে; দিবস-রজনীর যাওয়া-আসা, জীবন-মৃত্যুর উঠাপড়া, নিদ্রা ও জাগরণ; আল্লাহ্র প্রাচুর্য থেকে তুমি পেয়ে থাকো; জলেভ্যা মেঘকে বাতাস তাড়িয়ে নিয়ে যায় দেশ দেশান্তরে; এ-তো স্রষ্টার করুণার সংকেত; বৈচিত্র্যের মধ্যেও রয়েছে সামঞ্জস্য, বৈচিত্র্যে ভরা মানবজাতির মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র; ফল, ফুল, প্রাণী, মানুষ এসব কি মহাজ্ঞানী আল্লাহ্র অস্তিত্বের জন্য যথেষ্ট নয়?[৫৯]

মহান নবীর কাছে এই বিশ্বচরাচর বা প্রকৃতি নিজে একটি প্রত্যাদেশ ও অলৌকিক ঘটনা বলে বিবেচিত হয়েছে।

“প্রতিটি পাতা যা কয়
প্রতিটি স্রোতোস্বিনী তা-ই কয়
সে কথা ব্যাপ্ত, সমগ্র বিশ্বময়
—আকাশ, বাতাস, সাগর ভূমিময়।
সে ভাষা কোথাও কখনো স্তব্ধ নয়।[৬০]

প্রকৃতপক্ষে তৌহিদবাদী/একত্ববাদী নবী আল্লাহ্র নবী। তাঁর নৈতিকতা আল্লাহ্র একত্বের ঘোষণা এক সর্বব্যাপী ঐক্য শৃঙ্খলা, এক সর্বব্যাপী মনের দৃশ্যমান অস্তিত্বও এক বিশ্বনিয়ন্ত্রক ইচ্ছাশক্তির বৌদ্ধিক স্বীকৃতির উপর নির্মিত। এই মহান নবীর সবচেয়ে অলৌকিক ঘটনা হল কোরআন, যা প্রেরণালব্ধ জবানীতে “প্রকৃতি বিবেক ও ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত নির্দেশনা”। হে অবিশ্বাসীর দল, তোমরা কি এর চেয়ে অধিকতর অলৌকিক ঘটনা চাও যে তোমাদের অমার্জিত ভাষাকে সেই তুলনাবিহীন গ্রন্থের ভাষা হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে, যার সামান্য অংশ তোমাদের সোনালী কবিত্ব ও মোয়াল্লাকা (কাবাঘরে ঝুলন্ত কবিতাগুচ্ছ) দীপ্তিকে চিরতরে মুছে দিয়েছে সার্বজনীন করুণার সুসংবাদ এবং অহঙ্কার ও জুলুমের প্রতি সাবধানবানী বহন করে এনেছে।

কিন্তু কোরাইশগণ মুহম্মদের উপদেশের প্রতি কান দিল না। আল্লাহ্র নিদর্শনগুলোর প্রতি তারা ছিল অন্ধ, প্রকৃতিতে ঐশী ব্যক্তত্বের উপস্থিতির বিষয়ে তারা ছিল ভ্রুক্ষেপহীন, ধর্মনিষ্ঠায় আবার ফিরে আসার জন্য, তারা সম্পূর্ণ অমনোযোগী ছিল প্রাচীন যুগের অপরাধ ও অশ্লীলতা বর্জন করার জন্য জ্ঞানীদের আহ্বানের প্রতি। তাঁর প্রতি তাদের জবাব এমন শত্রুতার রূপ নিয়েছিল যা খ্রিস্টানজগতের শুধু এরিয়ান বা পেলাজিয়ানদের

www.amarboi.org

নির্বাচনের আঁধারতম দিনগুলোর সাথে তুল্য। ওরা বলেছিল, ওহে মুহম্মদ, জেনে রাখো যতদিন পর্যন্ত তুমি অথবা আমরা নিশ্চিহ্ন না হচ্ছি ততদিন পর্যন্ত আমরা তোমাকে প্রচারকার্যে বাধা দিয়েই যাবো।"

এই বিরতির অবসরে একটি ঘটনা ঘটেছিল যা মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ও মহানবীর খ্রিস্টান জীবনীকারগণ ভিন্নভাবে বুঝেছিলেন। একদিন হযরত পয়গাম-প্রাপ্তির এক তন্ময় মুহূর্তে কাবাগৃহের ভিতরে কয়েকটি আয়াত আবৃত্তি করছিলেন যা এখন কোরআন পাকের ৫৩নং সূরা (নজমের) অন্তর্ভুক্ত। যখন তিনি আয়াত পর্যন্ত পৌছেছিলেন।, "তোমরা কি লাত ও উজ্জাকে ও জঘন্য মানাতকেও এবং তৃতীয় আরেকজনকে," এ সময় একজন পৌত্তলিক সেখানে উপস্থিত ছিল। যাকে হাদিসে শয়তান বলে বিবেচনা করেছে, এই ভয়ংকর দোষারোপসূচক উক্তি নিবারণ করার জন্য "তারা সম্মানিত কুমারী, খোদার নিকট তাদের সুপারিশ আশা করা যেতে পারে।" এই শব্দগুলো হযরতের নিকট প্রত্যাদিষ্ট বিষয়ের অংশ বিশেষ বলে অনুমান করা হয়েছিল। কোরাইশরা এই কৌশল বা মুহম্মদের আন্দাজকৃত অনুমোদনে উৎফুল্ল হয়ে মুহম্মদের সাথে আপোষরফা করতে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল, হযরত ব্যাপারটি যখন বুঝতে পারলেন তৎক্ষণাৎ তিনি ঘোষণা করলেন ঃ "এইসব ত শুধু নামই—যা তোমরা আর তোমাদের বাপ-দাদারা রেখেছে।" মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ও হাদিসবেত্তাগণ এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। খ্রিস্টান জীবনীকারদের মন্তব্য হলো ঃ ঘটনাটি হযরত মুহম্মদের পক্ষে কোরাইশদের সঙ্গে সংঘর্ষ বন্ধ করার জন্য একটা আপোষরফা করার সাময়িক বাসনা হিসেবে অনুমিত হয়েছে। ধর্মান্ধরা একে "একটি ভ্রান্তি" ও "একটি অধঃপতন" বলে অভিহিত করে। অন্যদিকে উদার ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনাকে এমনভাবে বিবেচনা করেন যা আরবের নবীর চরিত্রের উপর নতুন আলোকপাত করে। নির্যাতন প্রতিদিন প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হচ্ছিল, তাঁর অনুসারীদের দুর্দশা বৃদ্ধি পাচ্ছিল এবং গোটা মক্কানগরী তাঁদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াচ্ছিল। তাঁর অভাগা অনুসারীদের দুর্দশার ছবি তাঁকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছিল, আরব পৌত্তলিকদের সঙ্গে তাঁর ক্লান্তিকর সংগ্রাম তাঁকে দুঃখভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, তাঁর শত্রুদের ধর্মান্ধতার কাছে সামান্য সুবিধাদানের মাধ্যমে শত্রুতার অবসান ঘটানোর কথা তাঁর মনে এ সময় আসতেই পারে।" সুতরাং মুহম্মদ তাঁর প্রথম ও শেষ সুবিধা দিলেন। তিনি কোরাইশদের নিকট প্রত্যাদেশের অংশবিশেষ উল্লেখ করেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে তাদের সুপারিশ আশা করা যেতে পারে, অতএব আল্লাহ্‌র নিকট প্রণিপাত কর এবং তাঁর বন্দেগী কর'। এতে শ্রোতৃমণ্ডলী আনন্দে আপ্লুত হল, মুহম্মদের আল্লাহ্‌র নামে প্রণিপাত করল সারা শহরবাসী দু'ধর্মে সমন্বিত হল। কিন্তু মরুর এই স্বাপ্নিক মিথ্যার উপর নির্ভর করার লোক ছিলেন না। সমগ্র মক্কা শহরের সমর্থনের কারণে তিনি নিজের লব্ধ সত্যকে অসত্য হতে দিতে পারেন না। তিনি এগিয়ে এলেন ও ঘোষণা করলেন যে তিনি ভুল করেছেন শয়তান তাঁকে প্রলুব্ধ করেছে। তিনি যা বলেছিলেন তা মুক্তকণ্ঠে ও সরলভাবে প্রত্যাখ্যান

www.amarboi.org

করলেন, আর তাদের মূর্তিসমূহ সম্পর্কে বললেন যে তারা শূন্যগর্ভ নাম মাত্র এবং তারা ও তাদের পূর্বপুরুষগণ এই নামগুলো বানিয়েছে।"

বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেছে "পাশ্চাত্য জীবনীকারগণ মুহম্মদের পতন বা স্খলন" এর উপর। তবুও এটা ছিল চিত্তাকর্ষক আপোষ, কম লোকই এতে বাধা দিত। মুহম্মদের জীবন কোন দেবতার জীবন নয়, মানুষের জীবন; প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত এ জীবন মনুষ্য জীবন। যদি তিনি একবার সমগ্র শহরবাসীর চিত্তজয়ের প্রলোভনের উপর পেয়েও তা পৌরুষ সহকারে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন স্বাধীনভাবে তাঁর বিচ্যুতি স্বীকার করেছিলেন এবং দৃঢ়তার সাথে পুরাতন অসম্মান ও অবমাননা আবার কাঁধে নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে বলতে পারতাম? যদি তিনি একবার কপট হতেন, তিনি তা ছিলেন না, তবে কতখানি ভয় শূন্য হত তাঁর পরবর্তী অকপটতা। কিছুক্ষণের জন্য তিনি নিজের প্রতি সুবিচারক ছিলেন না এ কথা তিনি লজ্জা ও অনুতাপের সঙ্গে সর্বদা তাঁর ধর্মপ্রচার সভায় প্রকাশ করতেন। তাঁর গৌরবব্যাঞ্জক প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে সেই মিথ্যা পদক্ষেপটির অতিরিক্ত প্রায়শ্চিত্ত হয়েছিল।"[৬১]

নির্যাতনের মাত্রা নতুনভাবে বৃদ্ধি পেল যখন ঘোষণা করলেন লাত, উজ্জা ও মানাত শূন্য গর্ভ নাম মাত্র। এতকিছুর পরও ঐশী সাহায্যের অবিচল বিশ্বাস নিয়ে এবং ফিরিশতার মাধ্যমে প্রদত্ত ঐশী পরামর্শের সাহায্যে তিনি তাঁর প্রচারকার্য চালিয়ে যান। যদিও কোরাইশদের বাধা-বিপত্তি কখনো বিরতি ছিল আবার কখনো বা প্রচণ্ড ছিল। তারই মধ্যে ক্রমশ ধীরে ধীরে নিশ্চিতভাবে নতুন ধর্মের গতি এগিয়ে চলে। সত্যে যে বীজ ছড়িয়ে পড়েছিল তা পুষ্পিত হতে ব্যর্থ হয়নি। মরুভূমির দুর্বার আরবগণ, দূরবর্তী শহরের ব্যবসায়ীগণ যারা জাতীয় মেলায় আসত তারা সেই অদ্ভুত লোকের কথা শুনেছিল যাঁকে অপ্রকৃতস্থ বলে তাঁর শত্রুরা অভিহিত করেছিল। তারা তাঁর হৃদয় নিংড়ানো উপদেশ শুনছিল, তারা বিস্ময় ও হতবুদ্ধির সঙ্গে তাদের দেবত্ব ও কুসংস্কার, তাদের ধর্মহীনতা ও ক্ষতিকর জীবন পথের কথা শুনছিল, এবং এমন কি তাদের অজ্ঞাতসারে তাদের দূরবর্তী বাসভূমিতে বয়ে নিয়ে গিয়েছিল নতুন আলোক ও নতুন জীবন-দর্শন। যে ব্যঙ্গোক্তি ও দুর্নাম তারা মুহম্মদের উপর দিয়েছিল তা শুধু তার বাণীকে সুদূরপ্রসারী করেছিল।

কিন্তু মক্কাবাসীগণ সক্রিয় ছিল। আবু তালিবের নিকট অনেকবার কোরাইশগণ প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল। তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারণা বন্ধ করার জন্য। আবু তালিব প্রথম দিকে কোমলতা ও ভদ্রতার সঙ্গে তাদের ফিরিয়ে দিতেন। ফলে মুহম্মদ তাদের ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী নিন্দাবাদ অব্যাহত রেখেছিলেন, কাজেই তারা কাবা থেকে তাঁকে বের করে দিল, এখান থেকে তিনি নিয়মিত প্রচারকার্য চালাতেন। সদলবলে তারা তাঁর চাচার কাছে গেল।[৬২] তারা বললো, "আমরা আপনার বয়স ও পদমর্যাদাকে সম্মান করি, কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। আর নিশ্চয়ই আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেবদেবীর প্রতি যে নিন্দা করে যাচ্ছে এবং

www.amarboi.org

আমাদের পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে যে অশ্লীল কথা বলছে তা থেকে আপনি তাকে নিবৃত্ত করুন নতুবা তার সঙ্গে অংশগ্রহণ করুন যাতে আমরা যুদ্ধের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করতে পারি।"[৬৩] কোরাইশরা এই বলে বিদায় হল। আবু তালিব তাঁর লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে আগ্রহী ছিলেন না। অন্যদিকে ভ্রাতুষ্পুত্রকে কোরাইশদের নিকট ছেড়ে দিতেও তিনি রাজী ছিলেন না। তিনি মহানবীকে ডেকে পাঠালেন, কোরাইশদের কথা তাঁকে জানালেন এবং তাঁকে তাঁর প্রচারকার্য বন্ধ করতে অনুরোধ করলেন। মহানবী ভাবলেন যে, তাঁর চাচা তাঁর প্রতি দেয়া সমর্থন তুলে নিতে চাচ্ছেন। কিন্তু এই অসহায় মুহূর্তেও তাঁর মনোবল হ্রাস পেল না। তিনি দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন। "হে আমার চাচা, যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয় তবুও আমি আমার প্রচারকার্য থেকে সরে দাঁড়াবো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ্ কোন নতুন কারণ উদ্ভব করেন অথবা আমি আমার কাজ সম্পাদন করতে মারা না যাই। কিন্তু তাঁর রক্ষণাবেক্ষণকারী তাঁকে পরিত্যাগ করতে পারেন এই চিন্তায় অভিভূত হয়ে তিনি যাত্রার উদ্যোগ করলেন। আবু তালিব তখন উচ্চৈস্বরে ডাকলেন, "হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, ফিরে এসো" মহানবী ফিরে আসলেন। আবু তালিব বললেন, "তোমার যা ইচ্ছা তাই প্রচার কর। আল্লাহ্র কসম, আমি কোন অবস্থাতে তোমাকে ত্যাগ করব না, কখনো নয়।"[৬৪] এরপর কোরাইশরা আবু তালিবকে আরেকবার তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাদের কাছে ছেড়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। তারা তাঁর পরিবর্তে মাখজুম পরিবারের এক যুবককে তাকে প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছিল। এতে কোন ফল হল না।[৬৫] আবু তালিব যে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে সমর্থনের ঘোষণা করলেন তাতে কোরাইশদের ক্রোধ আরো বেড়ে গেল এবং তারা তাদের নির্যাতনের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি করল। মাননীয় গোত্রপ্রধান, যিনি বনী-হাশিম ও বনী মুত্তালিব গোত্রের লোক, মুহম্মদের জ্ঞাতিদের আত্মসম্মানবোধের নিকট আবেদন করলেন তাদের বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বিরোধী গোত্রের বিদ্বেষের হাত থেকে রক্ষা করতে। মহৎ প্রতিক্রিয়া হল তাঁর এই আবেদনে, শুধু আবু লাহাবের কোন পরিবর্তন হল না। আবু লাহাব "আগুনের পিতা"—পরিশিষ্টে আমরা দেখতে পাব।

এ সময় ওমরের মতো একজন দৃঢ়চেতা মানুষ নতুন ধর্ম গ্রহণ করলেন। ইসলামের ভাবী গণতন্ত্রে তাঁর চরিত্রশক্তি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। ইসলামের ইতিহাসে তাঁর উৎসর্গীত সেবা অমর হয়ে থাকবে। মুসলমানদের নির্যাতনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন আদ-বিন-কাব পরিবারের সদস্য এই ওমর-বিন-খাত্তাব। ইসলাম-বিরোধী ওমর ছিলেন মুহম্মদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বী। কথিত আছে, তিনি তাঁর বোনের ঘরে কোরআনের একটি সুরার আবৃত্তি শুনে ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বোনের বাড়ি গিয়েছিলেন প্রচণ্ড ক্রোধ ও খুনের ইচ্ছা নিয়ে।

সেখানে গিয়ে তিনি যে বাণী শুনতে পান তাতে অভিভূত হয়ে মুক্ত তরবারী হাতে সোজা মুহম্মদের নিকট চলে যান। মুহম্মদ ও তাঁর শিষ্যদের তিনি এই তরবারী দিয়েই হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ওমরের হাতে মুক্ত তরবারী দেখে হযরতের উপদেশ শ্রবণরত

www.amarboi.org

তাঁর শিষ্যদের মনে কিছুটা ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল। ওমর হযরত মুহম্মদের হাতে চুমু দিলেন এবং তাঁকে ইসলামের ছায়াতলে স্থান দিতে অনুরোধ করলেন। মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন ওমরের উপর তাঁর করুণা বর্ষিত হওয়ায়। দীক্ষা লাভের পরে তিনি ইসলামের এক শক্তিশালী আশ্রয়স্থলে রূপান্তরিত হলেন। এখন হতে ইসলাম মুক্ত গতিতে চলল, আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য গোপন আশ্রয়ের খোঁজ ও ভীতির প্রয়োজন থাকলো না। জীবনের নিম্ন অবস্থা থেকে আসা ইসলামের বহু অনুসারী ছাড়াও এখন মহানবীর পাশে সমবেত হলেন একদল নির্বাচিত শিষ্য হামযা, আবু বকর এবং ওমর শক্তি, প্রতিভা ও সম্মানের অধিকারী—অশিক্ষিত অজ্ঞ নন। আলি যদিও তখন তরুণ তবুও তিনি দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের দিকে এগিয়ে চলছিলেন।

মুসলমানদের এসব গুরুত্বপূর্ণ অন্তর্ভুক্তি অনুপ্রাণিত করল এবং তারা প্রকাশ্য ধর্মপালন করতে শুরু করলেন। ওমর ইসলাম গ্রহণ করলে প্রথমে কোরাইশগণ হতবাক হলেও পরে তারা পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারল। এ পর্যায়ে তারা চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য অপেক্ষা করতে থাকল।

কোরাইশ প্রতিনিধিদের আবিসিনিয়া থেকে ফিরে আসা এবং তাদের কার্যক্রমের ব্যর্থতার সংবাদ তাদেরকে উন্মাদ করে তুলল। পরিশেষে তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা এক আঘাতেই সমগ্র হাশিম ও মুত্তালিব গোত্রের মূলোৎপাটন করবে। এই উদ্দেশ্যকে মুখ্য করে তারা নবুয়্যতের সপ্তম বর্ষে ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে হাশিম ও মুত্তালিবের বংশধরদের বিরুদ্ধে একটি সংঘ গঠন করল। তারা একটি পবিত্র দলিলের মাধ্যমে অঙ্গিকারবদ্ধ হল যে, হাশিমীয়দের সাথে তারা বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হবে না, তাদের সঙ্গে কোন রকম পণ্যদ্রব্যের বেচাকেনা করবে না। হাশিম ও মুত্তালিব পরিবারের মুসলমান ও পৌত্তলিকগণ এতে সন্ত্রস্ত হলেন ও ভাবলেন যে এই বাহানা কোন ভাবী আক্রমণেরই পূর্বাভাষ। কাজেই তারা শহরের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে বাস না করে এক জায়গায় সমবেতভাবে বাস করা নিরাপদ মনে করলেন। সেই অনুযায়ী তারা আবু তালিবের একটা বাসগৃহ শেব গিরি-সংকটে সমবেত হলেন। এই গিরিসংকটটি মক্কার পূর্ব-প্রান্তসীমায় অবস্থিত দীর্ঘ সংকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল, মক্কা-নগরী থেকে ছোট পাহাড় বা প্রাচীর দিয়ে বিচ্ছিন্ন এবং সেখানে মাত্র একটি প্রবেশপথ বিদ্যমান ছিল। আবু লাহাব একাকী এই দল থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল।

কোরাইশদের হাতে বন্দী হয়ে সকলরকম অভাব-নিগৃহীত এই রক্ষণাত্মক অবস্থায় তারা মহানবীকে নিয়ে প্রায় তিন বছর কাটিয়েছেন। তারা যে-সব খাদ্যদ্রব্য নিয়ে গিয়েছিলেন তা অতি অল্পসময়ের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল, অনাহারে ক্লিষ্ট শিশুদের কান্না বাইরে থেকে শোনা যেত। সম্ভবত তারা যদি কম ধর্মান্ধ দেশবাসীর সাময়িক সাহায্য না পেত তবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। তাদের অন্যায় অবরোধের জন্য কোন কোন গোত্রপ্রধান লজ্জাবোধ করতে লাগল। আমরের পুত্র হিশাম নবুয়্যতের দশম বছরের (৬১৯ খ্রিঃ) কাছাকাছি সময়ে হাশিমীয়দের ব্যাপারে প্রাণবন্ত আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছিলেন। তিনি একটা আপোষ রফার জন্য চেষ্টা করছিলেন হিশাম ও মুত্তালিব

www.amarboi.org

পরিবারদ্বয়ের মধ্যে। তাঁর এই কাজে তাঁর সঙ্গী হিসেবে তিনি আবু উমাইয়ার পুত্র জোবাইরকে পেয়েছিলেন। চুক্তিটি তাঁর এবং আরও কয়েকজনের সমর্থনে ভেঙে গেল। পুনরায় দুটি পরিবারকে সামাজিক অধিকার ভোগ করতে এবং মক্কায় ফিরে যেতে দেওয়া হল।

ওই সময় হযরত শেব গিরি সংকটে জ্ঞাতীবর্গসহ বন্দী ছিলেন, ইসলামের প্রগতি তখন বাইরে সাধিত হয়নি। পবিত্র মাসগুলিতে, যখন বাদ-বিসম্বাদ রক্তপাত নিষিদ্ধ থাকতো তখন মহানবী তাঁর অবরুদ্ধ অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসতেন এবং তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ধর্মের বাণী শোনাবার জন্য লোক খুঁজতেন, এই সময় বক্রদৃষ্টি আবু লাহাব (আগুনের পিতা) তাঁর গতিবিধির প্রতি দৃষ্টি রাখতো, মহানবী কিছু বললে সে বলে উঠত; "একজন মিথ্যাবাদী ও একজন সেবীয়।" এভাবে সে ধূলিসাৎ করে দিত হযরতের গুরুত্বকে।

ইসলামের ইতিহাসে এর পরের বছর "শোক-বছর" হিসেবে বর্ণিত; কেননা এই বছর আবু তালিব এবং খাদিজার মৃত্যু হয় মহানবী ও তাঁর শত্রুদের মধ্যে মিমাংসার একটি যোগসূত্র ছিলেন মহানবীর যৌবনের অভিভাবক আবু তালিব। স্ত্রী খাদিজার মৃত্যুও তাঁকে দিল দুঃসহ আঘাত। যখন তাঁকে প্রত্যেকে অবিশ্বাস করত, যখন তাঁর চারদিকে ছিল অন্ধকার ও ভয়াবহ এবং তাঁর মন ছিল সন্দেহে ভরপুর। তখন তাঁর এই সহধর্মিনী খাদিজাই তাঁর প্রগাঢ় ও অবিচল বিশ্বাস নিয়ে তাঁকে সমর্থন ও সান্ত্বনা দিয়েছেন।" তিনি ছিলেন চিরকালের মুহম্মদের আশা ও স্বর্গীয় দূত।" মহানবীর হৃদয়ে চিরঅম্লান ছিল খাদিজার ভালবাসা ও নিষ্ঠার কোমল স্মৃতি।

প্রথম অধ্যায়ের টীকা

১. স্যার উইলিয়াম মন্তব্য করেন যে, এম, কাসিম দ্যা পার্সিভেল 'বাসা'কে একটি স্থানের নাম অনুমান করে ঠিক করেননি। তিনি মনে করেন যে, শব্দটি মাটির উপর এই লোকদেরকে অত্যাচার করা হয়েছিল তার প্রকৃতিকে বুঝায়। ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা ১২৮। এম. কাসিম দ্যা পার্সিভেল ও আমার মতের সমর্থনে আমি এইটুকু বলতে পারি যে, এই জায়গার অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে একটি ঘটনা; আর মুসলমান গ্রন্থকারগণ 'বাসাকে বার বার মক্কার সন্নিকটবর্তী একটি জায়গা বলে উল্লেখ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বিখ্যাত হাকিম সানাই বলেন ঃ

চো ইলমাত হাস্ত খিদমত কুন চো
বি ইল্‌মান কী যিস্ত আয়েদ
গিরিফৎ চিনিয়ান ইহ্‌রাম, ওয়া মেক্কী
খুফতা দর বাসা।

অর্থাৎ ঃ যদি জ্ঞানী হও তবে যারা মূর্খ তাদের মত কাজ করবে কি? কেননা এটা অশোভন যে চায়না থেকে লোক এসে ইহরাম করবে (অর্থাৎ মক্কায় এসে হজ্জব্রত পালন করবে), আর মক্কার অধিবাসীরা বাসায় ঘুমিয়ে পড়বে।

২. ইকরা শব্দটিকে 'আবৃত্তি' অর্থেও অনুবাদ করা যায়।

www.amarboi.org

পাদটীকা

১. এই পঙক্তিগুলো পারস্যের অমর কবি মোসলেহ্ শেখ সাদী (রঃ) রচিত বিখ্যাত বালাগাল্ উলা বেকামালিহি ... ওয়া আলিহির বাংলা ভাবানুবাদ।

২. মাথার উপরে দেয়া একটুকরো কাপড় যা চিবুকের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম বগলের উপর দিয়ে বিস্তৃত থাকে।

৩. কোসাই ফিহ্র থেকে পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ। ৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 'কারাশ' শব্দ থেকে 'কুরাইশ' শব্দের উদ্ভব। 'কারাশ' অর্থ ব্যবসা করা। ফিহ্র ও তার বংশধররা ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল।

৪. তারপর আমরা খোজা গোত্র সম্পর্কে বলব যখন কুরাইশগণ হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য প্রার্থনা করে।

৫. এই অট্টালিকা অনেকবার সংস্কার করা হয়েছিল। পরে উমাইয়া বাদশাহ্ দ্বিতীয় আব্দুল মালিকের শাসনামলে তা মসজিদে রূপান্তর করা হয়।

৬. আব্দু মান্নাফের পুত্রদের মধ্যে হাশিম প্রথমে মারা যান গাজ্জায়। তারপর আবদুস শামস মক্কায়, তারপর মুত্তালিব কাজওয়ানে এবং সর্বশেষে নওফেল মুত্তালিবের কিছু পরে ইরাকের সিলমানে।

৭. (আঃ) যহ, যালামের বহুবচন।

৮. আব্দুল মুত্তালিবের বারজন পুত্র ও ছয়জন কন্যা ছিল। পুত্রদের মধ্যে হারিস ৫৩৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে জন্মগ্রহণ করেন মধ্যে আব্দুল উজা ওরফে আবু লাহাব হযরতের জুলুমকারী, আব্দুল মান্নাফ তিনি আবু তালিব নামে সমধিক পরিচিত। জন্ম ঃ ৫৪০ খ্রিঃ মৃত্যুঃ ৬২০ খ্রিস্টাব্দে; জোবায়ের ও আব্দুল্লাহ্ (৫৪৫)—আমরের কন্যা ফাতিমার গর্ভজাত; যীরার ও আব্বাস (৫৬৬—৬৫২)—নুতাইলার গর্ভজাত, মুকাইম, জাহ্ম ওরফে গায়জাক (উদার হৃদয়) ও হামজ্জা—হালার গর্ভজাত। আত্তিকা, ওমায়মা, আরওয়া, বার্রা, উম্মী হাকিম ওরফে আল বায়জা (সুন্দরী) ফাতিমার গর্ভজাত এবং সাফিয়া হলো গর্ভজাত কন্যাগণ। তিনি প্রখ্যাত আবদুল্লাহ্ ইবনে জোবায়ের-এর পিতামহ আয়ওয়ামকে বিবাহ্ করেন। জোবায়ের ইসলামের ইতিহাসে বিরাট অবদান রেখেছিলেন। আব্দুল মুত্তালিবের অপর দুই পুত্রের নাম অজ্ঞাত সম্ভবত তারা কোন সন্তান রেখে যাননি বলে।

৯. তার মামা, আদী পুত্রদের অধিকৃত অঞ্চলে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

১০. খসরু নওশেরওয়ানের শাসনের চল্লিশ বছরের শেষের দিকে এবং সেলুসিডা বর্ষের ৮৮০ বছর পূর্তির শেষের দিকে।

১১. পরবর্তী জীবনে যখন এই বেচারী বেদুইন রমণীকে কোরাইশগণ বন্দী করে মক্কায় এনেছিল তখন হযরত মুহম্মদ আনন্দ উদ্বেল সাশ্রু নয়নে তাকে চিনেছিলেন এবং তাঁর সম্পদশালিনী স্ত্রীর কাছ থেকে ধাত্রীমাতার মুক্তিপণ সংগ্রহ করেছিলেন।

১২. আব্দুল মুত্তালিব সিকায়্যা ও রিফাদা এই দুটি বিভাগের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ছিলেন। জমজম কূপের রক্ষণাবেক্ষণসহ সিকায়্যা তাঁর পুত্র আব্বাসের উপর অর্পিত হয়। আর দ্বিতীয় কাজটি পড়ে আবু তালিবের উপর। আবু তালিব মক্কা নগরীতে বিশেষ ক্ষমতা ও সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তিনি এই 'রিফাদা'র ভার তার সন্তানদের উপর ন্যস্ত করেননি। তাঁর মৃত্যুর পর এই আব্দু মান্নাফের পুত্র নওফেলের পরিবারে হস্তান্তরিত

www.amarboi.org

হয়েছিল। মক্কা যখন হযরতের নিকট আত্মসমর্পণ করে তখন আমরের পুত্র হারিস নওফেলের পৌত্র 'রিফাদা'র পরিচালনায় নিয়োজিত ছিলেন—এ কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। জৈনী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪।

১৩. এ সকল কবিতা মুয়াল্লাকাত বা 'ঝুলন্ত কবিতাবলী' নামে অভিহিত হত।

১৪. আবু তালিব তদীয় পিতা ও পিতামহের মতো সিরিয়া ও ইয়েমেনের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালিয়েছিলেন। তিনি দামেস্ক, বসরা ও সিরিয়ার অন্যান্য স্থানে হিজাজ ও হিজরের খেজুর এবং ইয়েমেনের সুগন্ধি দ্রব্য রপ্তানি করতেন এবং বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য আমদানি করতেন।

১৫. কোরাইশরা হযরতকে 'আবতার' উপাধি দিয়েছিল—শব্দটির আক্ষরিক অর্থ লেজ বা লাঙ্গুলবিহীন—ভাবার্থ নিঃসন্তান।

১৬. ইবনে হিশাম, পৃঃ ১০০; আল্ হালাবী 'ইন্সানুল উয়ান' ২১২শ খণ্ড ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২।

১৭. ফাতিমা ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

১৮. জায়েদ, ওয়ারাকা-বিন-নওফেল—খাদিজার জ্ঞাতী-ভাই এবং ওয়াবায়দুল্লাহ্ ও ওসমান এই চারজন লোক স্বদেশবাসীর পৌত্তলিক ধর্ম পরিহার করে প্রকৃত ধর্মের অন্বেষণে বের হয়েছিলেন। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন জায়েদ। ঈসা (আঃ)-এর মতো হযরত মুহম্মদ (দঃ) আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের জন্য নিজকে ধ্যানমগ্ন হওয়ার পূর্বে জায়েদের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং পৌত্তলিকতার প্রতি জায়েদের আত্মার জন্য আল্লাহ্‌র মাগফেরাত কামনার জন্য অনুরোধ করেছিল, হযরত তা সানন্দে করেছিলেন, যদিও তিনি নিজের পিতামহের জন্য কোন প্রার্থনা করেননি, কারণ তিনি পৌত্তলিক হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ইবনে হিশাম, পৃ. ১৪৩।

১৯. এখন এই পর্বতকে আলোকের পর্বত বলা হয়ে থাকে। ইবনে হিশাম, ইবনুল আসির ও আবুল ফেদা রমজান মাসকে এমন মাস হিসেবে অভিহিত করেছেন যখন মুহম্মদ প্রায়ই হিরায় প্রার্থনারত থাকতেন এবং মরুভূমির দরিদ্র ও বুভুক্ষু পথচারীদের সাহায্যের জন্য অতিবাহিত করতেন। আবার রজব মাসের উল্লেখ করেন।

২০. ইবনে হিশাম, পৃঃ ১৫১।

২১. আল-কোরআন, সুরা, ৯৬ ইবনে হিশাম, পৃঃ ১৫৩ আল্ হালাবীর ইন্সানুল আয়ান' ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৯ ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪।

২২. ঈসা ১০.৬।

২৩. অধ্যাপক মুলার, ডিন স্ট্যানলির লেকচারস অন দি হিস্ট্রি অব জিউইন চার্চ, ১ম খণ্ড, ভাষণ ১৮, পৃঃ ৩৯৪ থেকে উদ্ধৃত।

২৪. জনমন ওরিয়েন্টাল রিলিজিয়ানস, পৃঃ ৫৬১।

২৫. সুরা ৯৬, আ. ১—৫। 'ইকরা' শব্দ সাধারণত 'পড়' হিসেবে অনুবাদিত হয়; কিন্তু আমি ডিউশা নির্দেশিত ভাষান্তর পছন্দ করি যা হযরতের প্রতি আহবানের সঙ্গে অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ রডওয়েলও দেখুন এবং জামাকশারীর (কাশশাফ) সঙ্গে তুলনা করুন।

২৬. গণক ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের প্রতি হযরতের বিশেষ বিতৃষ্ণা ছিল; তারা অধিকাংশ মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

২৭. আরবিতে 'নামুস' শব্দটির প্রাথমিক অর্থ বানীবহ্ যিনি গোপনীয় বার্তা সরবরাহ করেন। এ শব্দ আইনও বুঝায়, যেমন গ্রীক 'নোমোস'। ডিউশ বলেন, "তালমুদ শব্দ-রীতিতে

www.amarboi.org

শব্দটি প্রত্যাদিষ্ট আইন বুঝায়। ওয়ারাকার মনে এসব বিভিন্ন অর্থ সমন্বিত ছিল; ঐশীবার্তাবহ ও বার্তা উভয়ই মুহম্মদেরও নিকট এসেছিল যেমন এসেছিল মুসা ও ঈসার নিকট।"

২৮. ইবনে হিশাম, পৃঃ ১০৩; আল্ হালাবীর 'ইনসানুল আয়ান' ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৬।

২৯. এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ওয়ারাকা মারা যান। ইবনে হিশাম, পৃঃ ১০৪।

৩০. ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫—৩৬ টিবরি (রোটেনবার্গের অনুবাদ) ২য় খণ্ড পৃঃ ৩৯২।

৩১. সুরা ৭৪ আঃ ১—৩।

৩২. ইবনে হিশাম, পৃঃ ১৫৫, আল্ হালাবীর 'ইনসানুল আয়ান' ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫।

৩৩. উপরের অনুচ্ছেদটি ইবনে হিশামের দেয়া বর্ণনারই শব্দান্তর। পৃ. ১৫৯—১৬০; এবং ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২—৪৩।

৩৪. ডিভারজার্স টীকায় (পৃ. ১০৮) উল্লেখ করেন যে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে তিনি আব্দুল কাবা, "কাবার বান্দা" বলে অভিহিত হতেন।

৩৫. বাইবেল, জন ৭,৫।

৩৬. প্রাগুক্ত, মার্ক ৩,২।

৩৭. এইসব লোককে যীশু নিজের মাতা ও ভ্রাতাদের পরিবর্তে "তাঁর মাতা ও সহযোগী ভাই" বলে অভিহিত করেছেন। ম্যাথু ১২, ১৫—৪৮, মার্ক ৩, ৩২, ৩৩।

৩৮. 'মিলম্যানের 'হিস্ট্রি অব ক্রিশ্চিয়ানেটি' ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৪—২৫৫।

৩৯. স্যার উইলিয়াম মুয়ির দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বীকার করেন যে (২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৪) "যীশুর শিষ্য ধর্মপ্রচারকগণ বিপদের আভাস মাত্র পেয়েই পালিয়ে গিয়েছিলেন"।

৪০. সু. ২. আ. ১৭-২০

৪১. সু. ২৪. আ. ৩৯-৪০।

৪২. ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ, ৫০; ইবনে হিশাম ২০৫-২০৯।

৪৩. দৃষ্টান্ত। খোবাই-বিন-আদিকে বিশ্বাসঘাতকতার ভেতর দিয়ে কোরাইশদের কাছে বিক্রয় করা হয়েছিল। কোরাইশরা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে ও শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে মাংস কেটে নিয়ে তাকে হত্যা করেছিল। সমূহ অত্যাচারের মধ্যে তাকে জিজ্ঞেস করা হত যে মুহম্মদের অবস্থা তার মত হোক 'সে কি তা' চায়। উত্তরে তিনি বললেন "মুহম্মদের গায়ে একটি কাঁটা বিদ্ধ হোক এই শর্তে আমি আমার পরিবার, আমার ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাই না।"

৪৪. ওয়ালিদ ওতবার পুত্র। আরবদের রেওয়াজ ছিল, এমনকি এখনও আছে কোন ব্যক্তির নিজের নাম না ধরে অমুকের পিতা বলে ডাকবার। এটা বিশেষ বিবেচনায় করা হত।

৪৫. আরবদের মধ্যে আতিথেয়তা একটি বড় গুণ হিসেবে বিবেচিত হত, কিন্তু দানশীলতা একটা দুর্বলতা হিসেবে গণ্য হত। তারা পারলৌকিক জীবনকে বৃদ্ধ মহিলাদের রূপকথা মনে করত।

৪৬. সু. ৪১ আঃ ২—৮।

৪৭. ইবনে হিশাম, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

৪৮. ইবনে হিশাম, পৃ. ২০৮ ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ, ৫৮ আব্দুল ফেদা।

৪৯. মূর্তিপূজকদের কোরআনে প্রায়ই 'মুশরিকিন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। মুশরিকিন তারাই যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য বস্তুর শরীক করে।

৫০. মুহম্মদের মহান কার্য বা তাঁর শিক্ষার সংক্ষেপ-সার-এর চেয়ে উত্তম হতে পারে কিঃ- ইবনুল আসির,২য় খণ্ড, পৃ. ৬১ এবং ইবনে হিশাম, পৃ. ২১৪-২২০।

www.amarboi.org

৫১. ইবনে হিশাম, পৃ. ১৮৮। একজন খ্রীষ্টান ঐতিহাসিক পৌত্তলিকদের যুক্তি কৌশলে উল্লাসিত হয়েছিলেন। ওসবোর্নের ইসলাম আণ্ডার দি অ্যারাবস দেখুন।

৫২. সু. ১৭. ৯২-৯৬।

৫৩. প্রাচীন খ্রিস্টধর্ম অলৌকিকতাকে যীশুর ঐশীত্বের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং এখনও করে থাকে। কিন্তু আধুনিক খ্রিস্টধর্ম এ সবকে কুসংস্কার বলে অভিহিত করে থাকে। লিটারেচার এণ্ড ডগমার গ্রন্থকার বলেন যে, এটার সম্ভাবনা খুব বেশি যে অলৌকিকতার শেষ ঘন্টাধ্বনি বাজছে; আর খ্রিস্টধর্মে অলৌকিক বীরত্ব গাঁথা আজ হোক কাল হোক, সমুদয় প্রাচ্য প্রতীচ্যের পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে বিলুপ্ত হবে।

৫৪. সু. ১৭.আ. ৯৫-৯৮; সু. ৭২ আ. ২১-২৪।

৫৫. অধ্যাপক মোমেরি।

৫৬. সু. ৬২ আ. ১-৫।

৫৭. এই বিষয়ে স্যার ডব্লু. মুয়িরের অনুচ্ছেদটি কম উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "মক্কার পৌত্তলিকতা মুহম্মদের ধর্মপ্রচারের পূর্বে কোন সংগ্রাম ছাড়া নিশ্চিহ্ন হত কিনা, ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দ্বারা টিকে থাকত কিনা তা অনুমানের বিষয়। ২য় খণ্ড পৃ. ১৪৪। কোরাইশদের মতো স্যার ডব্লু. মুয়ির শিক্ষার শক্তিতে পরিতৃপ্ত নন, যদি না তা অলৌকিকতার দ্বারা সমর্থিত হয়।

৫৮. সু. ২৫ আ. ৪৯-৫৯; সু.৫০ আ. ৯ ইত্যাদি।

৫৯. সু. ৬ আ. ৯৬-৯৯; সু. ৫১ আ. ২০.সু. ১৫ আ. ৫০-৫৭; সু. ৩৪ আ. ২০-২৮, ৩৯ ইত্যাদি।

৬০. ফুঃ হর গয়াহে কিহ্ আয় জমিন রুইয়াদ
ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু গুইয়াদ।—মৃত্তিকা থেকে উত্থিত প্রতিটি পত্রফলক আল্লাহ্‌র একত্ব ঘোষণা করছে।

৬১. স্টেনলী লেন পুল, 'ইনট্রোডাকশান টু দি সিলেকশন ফ্রম দি কোরআন' পৃ. ৪৯।

৬২. তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৬। গ্রন্থকারের প্রমাণ অনুযায়ী এই সময় কোরআনের ২১ তম সূরার ২১৪ আয়াত নাজিল হয়েছিল।

৬৩. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড পৃ. ৪৭ ইবনে হিশাম পৃ. ১৬৭, ১৬৮।

৬৪. ইবনে হিশাম পৃ. ১৬৮; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮; আবুল ফেদা, পৃ. ১৭।

৬৫. ইবনে হিশাম, পৃ. ১৬৯; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়
হিজরত বা স্বদেশ ত্যাগ

"মুহম্মদ ইহকালের ও পরকালের, মানবজাতি ও জ্বিনজাতির, আরব ও অনারব (আযম) সকলের নেতা।"

উমাইয়া ও অন্যান্য বিরোধী গোত্রগুলো তাদের পুরাতন ধর্মমতের প্রতি অনুরাগ, হাশেমীয়দের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতার দ্বারা বশে মক্কা থেকে ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্য বর্তমান অবস্থাকে উপযুক্ত সময় বলে মনে করল; আর আবু তালিবের মৃত্যু, যার ব্যক্তিগত প্রভাব ও চরিত্র তাদের ক্রোধকে একটা সীমার মধ্যে রেখেছিল, তা কোরাইশদের পক্ষে তাদের নির্যাতনকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করার সংকেত হয়ে দেখা দিল।[১]

শ্রদ্ধাস্পদ অভিভাবক ও বাঞ্ছিত সহধর্মিনীর ইন্তেকালে শোকাভিভূত ও কোরাইশদেরকে পৌত্তলিকতা থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার কাজে হতাশ হলেও দুঃখপূর্ণ ও বিশ্বাস উদ্দীপিত মনে মুহম্মদ অন্যত্র তাঁর প্রচারকার্য চালানোর জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। মক্কা তাঁর বাণীকে গ্রহণ করেনি, হতভাগ্য তায়েফ তাঁর বাণী গ্রহণ করতে পারে। বিশ্বাসী অনুচর জায়েদ সমভিব্যাহারে তিনি তায়েফবাসীদের[২] কাছে হাজির হলেন। তিনি তাদের তাঁর নবুয়্যতের কথা জানালেন, তাদের পাপাচারের বিষয় শোনালেন এবং আল্লাহর উপাসনা করার জন্য পরামর্শ দিলেন। তাঁর কথায় তারা বলল, "কে এই উন্মাদ যে তাদেরকে তাদের সুন্দর উপাস্য দেবতাদের ত্যাগ করার জন্য বলছে, ভারমুক্ত হৃদয়ে ও নৈতিক স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে তারা যাদের উপাসনা করে আসছে?" তারা শহর থেকে মহানবীকে বের করে দিল। তাঁর পিছনে তারা ইতর ও দাস শ্রেণীর লোকদেরকে লেলিয়ে দিল—তারা তাঁকে গালিগালাজ করতে করতে ও পাথর মারতে মারতে সারা শহর তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল যতক্ষণ না তিনি শহর থেকে বের হয়ে সন্ধ্যায় নিজ পথে চলা শুরু করলেন। আহত ও রক্তাপ্লুত মহানবী একটা খেজুরের বাগানে নামাজের জন্য প্রবেশ করলেন সেখানে তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত পথচারী স্বাগত অভ্যর্থনা পান। আকাশের পানে হাত তুলে তিনি প্রার্থনা করলেন, "ওগো প্রভু, আমার দীনতা ও বঞ্চনার ঔদ্ধত্যের জন্য আমি তোমার সকাশে নালিশ জানাচ্ছি যে, আমি মানুষের দৃষ্টিতে তুচ্ছ। ওগো পরম

www.amarboi.org

করুণাময়, ওগো দীনজনের প্রভু, তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করো না। তুমি আমাকে অপরিচিত লোক ও আমার দুশমনদের শিকারে পরিণত করো না। যদি তুমি আমার প্রতি অখুশী না হও তবে আমি নিরাপদ। আমি তোমার প্রসন্নতার আলোতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যার ফলে সব অন্ধকার দূরীভূত হয়, ইহজগতে ও পরজগতে শান্তি নেমে আসে। তোমার ক্রোধ যেন আমার উপর বর্ষিত না হয়। যেভাবে তুমি সন্তুষ্ট হও সেভাবেই আমার সমস্যাবলী সমাধান কর। তুমি ছাড়া আমার কোন শক্তিবল, কোন সাহায্য আশ্রয় নেই।"[৩]

ভগ্ন হৃদয়ে হযরত মুহম্মদ মক্কায় ফিরে আসেন। তিনি এখানে অল্প সময় অবস্থান করেছিলেন। তাঁর লোকজনদের কাছ থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন; আর সাময়িকভাবে তিনি যারা মক্কায় ও তার সন্নিকটবর্তী স্থানে বার্ষিক তীর্থ ব্যপদেশে সমবেত হত তাদের কাছে ধর্মপ্রচার কার্যে ব্যাপৃত থাকতেন। ঐতিহাসিক তাবারী বলেন, এই আশায় তিনি প্রচার চালাতেন যে, তাদের মধ্যে তিনি কিছুলোক পাবেন যারা তাঁর ধর্ম গ্রহণ করবে এবং তাদের লোকজনদের নিকট সত্যের বাণী পৌঁছে দিবে।

তিনি একদিন যখন বিষণ্ন অথচ আশাবাদী মনে এসব আধাব্যবসায়ী আধা-তীর্থযাত্রীদের মধ্যে প্রচারকার্য চালাচ্ছিলেন, তখন দূর ইয়াসরিব থেকে আসা পরস্পর আলাপরত ছয়জন লোকের একটি দলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি তাদেরকে বসতে ও শুনতে অনুরোধ করলেন। তারা বসে মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনলো। তাঁর ঐকান্তিকতা ও বক্তব্যের সত্যতায় বিমুগ্ধ হয়ে তারা তাঁর শিষত্ব বরণ করল (৬২০ খ্রিঃ)।[৪] দেশে ফিরে তারা প্রচার করল যে, আরবদের মধ্যে একজন প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে যিনি আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বান করছেন এবং শতাব্দীব্যাপী আত্মঘাতী কলহ দূর করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন।

পরের বছর এই ইয়াসরিববাসীরা মক্কায় ফিরে আনল এবং সেই শহরের দুটি প্রধান গোত্রের[৫] প্রতিনিধি হিসেবে আরও ছয়জন সহ-নাগরিকদের সঙ্গে আনে।

যে স্থানে মুহম্মদের নিকট পূর্ববর্তী ছয়জন লোক দীক্ষা নিয়েছিল সেখানে আগন্তুক ছয়জন লোকও বয়েত হল। এই শপথের নাম যে পর্বতের পাদদেশে এই আলোচনা সভা সংঘটিত হয়েছিল তার নামানুসারে হল আকাবার প্রথম শপথ।[৬]

তারা যে শপথ গ্রহণ করেছিল তা ছিল নিম্নরূপ : "আমরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করব; আমরা চুরি করব না; ব্যভিচার করব না; আমরা আমাদের শিশুসন্তানদের হত্যা করব না; আমরা সর্বপ্রকার অশোভন ও অশ্লীল কাজ ত্যাগ করব। সকল উত্তম কাজে আমরা হযরতের নির্দেশ মেনে চলব এবং সুখে-দুঃখে আমরা তাঁকে মেনে চলব।"[৭]

এই শপথ অনুষ্ঠানের পর নতুন ধর্মের মূল নীতিসমূহ শিক্ষা দেওয়ার জন্য মুহম্মদের একজন সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে ইয়াসরিববাসীগণ দেশে ফিরে গেল। এই নতুন ধর্ম অল্পদিনের মধ্যেই ইয়াসরিবের অধিবাসীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করল।

www.amarboi.org

মুহম্মদের নবুয়্যতের প্রচারকার্যের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটপূর্ণ কালসমূহের মধ্যে আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় শপথের অন্তর্বর্তীকাল অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত। আল্লাহর প্রতি মুহম্মদের পরম নির্ভরতা ও তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব এই সময়ে যে গুরুত্ব নিয়ে দেখা দিয়েছিল তেমনটি আগে দেখা যায়নি। মানুষ শিরকের মধ্যে যেভাবে আসক্ত ছিল তাতে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন,[৮] তবে সত্যের জয় একদিন হবে—এই বিশ্বাস তাঁর মর্মব্যথা প্রশমিত করেছিল,[৯] তিনি তা দেখার জন্য হয়তো বেঁচে থাকবেন না,[১০] যেহেতু সূর্যের আলোকের সামনে অন্ধকারের ঘনঘটা দূরীভূত হয় কাজেই সত্যের আগমনে মিথ্যা দূর হবেই।[১১] ঐতিহাসিক মূয়িরের মুখ থেকে এই সময় প্রসঙ্গে অবচেতনভাবে কিছু প্রশংসার বাণী প্রকাশ পেয়েছে। "এমনইভাবে মুহম্মদ তাঁর লোকজনদেরকে বিপদের সম্মুখে রেখে, বাহ্যত তার ছোট দলটিকে সিংহের সামনে রেখেও সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর নির্ভর করে নিষ্কম্প দৃঢ়ভাবে অপেক্ষা করছিলেন যে তিনি বিজয়ী হবেন—এটা এমন একটা মহান দৃশ্যের অবতারণা করে যা শুধু ইসরাইলদের নবীর পবিত্র বিবরণের মধ্যেই পাওয়া যায়, যিনি তাঁর প্রভুর কাছে অভিযোগ করেছিলেন, "আমি, একমাত্র আমি আছি, প্রভু।"[১২]

মেরাজের বিখ্যাত সন্দর্শন দ্বারাও এই কালের উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা বিশেষিত। এই মেরাজের ঘটনা জগতের কবি ও ঐতিহ্যবাদীদের কাল্পনিক প্রতিভার সোনালী স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছে। তারা কোরআনের সহজ সরল বর্ণনাকে কেন্দ্র করে সুন্দর ও জমকাল রূপকথার জন্ম দিয়েছে। "তিনিই পবিত্র মহান সত্তা, যিনি তাঁরই এক বান্দাকে এক রাতে কাবাগৃহ থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যান, যার চারদিক আমি বরকত মহিমায় ঘিরে রেখেছি যেন আমার কতকগুলো আয়াত আমিই তাঁকে দেখাতে পারি। এ কথা সত্য সুনিশ্চিত যে একমাত্র তিনিই সব শোনেন ও দেখেন।" (১৭ ঃ ১)[১৩] আর আপনি স্মরণ করুন, আমি আপনাকে বলেছিলাম, নিশ্চয়ই আপনার প্রভু মানুষ জাতিকে ঘিরে আছেন। আমিই মেরাজ নিয়মিত করেছিলাম, আমিই তা আপনাকে দেখিয়েছিলাম।" ঐতিহ্যবাদীরা যে সুন্দর সাজে এই ঘটনাকে সজ্জিত করেছিলেন তা সত্ত্বেও এ সন্দর্শন গৌরবব্যঞ্জক দৃশ্যাবলীতে পরিপূর্ণ এবং গভীর তাৎপর্য বহন করে।[১৪]

পরের বছর (৬২২ খ্রিঃ) ইয়াসরিববাসীদের মধ্যে যাঁরা নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা তাঁদের পৌত্তলিক নাগরিকসহ মোট সত্তরজন হযরত মুহম্মদকে তাদের শহরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আসেন।[১৫] তবে আগত পৌত্তলিকগণ তাদের সাথীদের অভিপ্রায় কী তা জানত না।

রাত্রির নীরবতায়[১৬] যখন সব বিরোধী শক্তি নিদ্রায় অসাড় হয়ে পড়েছিল তখন এই নতুন ধর্মের পথিকৃৎগণ যেখানে প্রথম শপথ গ্রহণ করেছিলেন সেখানে পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হলেন। চাচা আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে হযরত মুহম্মদ সেখানে আসেন। আব্বাস তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি তবে ইসলামের অগ্রগতিতে তিনি খুবই আগ্রহ প্রকাশ করতেন। তিনি আলোচনার উদ্বোধনকালে স্পষ্ট ভাষায় ইয়াসরিববাসীদের বুঝিয়ে

www.amarboi.org

দিলেন যে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে ও পয়গাম্বরকে তাদের দেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে তারা কি ধরনের বিরাট ঝুঁকি নিয়েছে। তারা সকলে সমস্বরে উত্তর দিলেন যে, বিপদের গুরুত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েই তারা এ ধর্ম গ্রহণ করেছেন। তারা বললেন, "হে আল্লাহর নবী, আপনি বলুন, এবং আপনার ও আপনার প্রভুর জন্য যে কোন শপথ করান। হযরত অভ্যস্ত পথে কোরআনের কতিপয় আয়াত আবৃত্তি করে শুরু করলেন; তারপর তিনি উপস্থিত সকলকে আল্লাহর উপাসনা করার জন্য বললেন এবং ইসলামের আশীর্বাদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন।[১৭] প্রথম শপথটি পুনর্বার উচ্চারিত হল যে তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্যের ভজনা করবে না, তারা ইসলামের নির্দেশাবলী মেনে চলবে, তারা যাবতীয় ন্যায়সঙ্গত কাজে মুহম্মদের নির্দেশ মেনে চলবে এবং তাঁকে ও তাঁর লোকজনদের রক্ষা করবে। তারা বললেন, "যদি আমরা আল্লাহর কাজে মৃত্যুবরণ করি তবে আমাদের পুরস্কার কি?" তিনি জবাব দিলেন, "পরকালে শান্তি।[১৮] তারা বললেন, "যখন আপনার সুদিন আসবে তখন কি আপনি আমাদের ছেড়ে আপনার লোকদের কাছে ফিরে যাবেন না?" হযরত মৃদু হেসে বললেন, "না কখনো না; তোমাদের রক্ত আমার রক্ত; আমি তোমাদের, তোমরা আমার।" "তাহলে এবার আপনার হাত দিন"—প্রত্যেকে হযরতের হাতে হাত রেখে তাঁর ও আল্লাহর কাছে শপথ নিলেন। শপথ-পর্ব প্রায় শেষ এমন অবস্থায় দূর থেকে দৃষ্ট এই ঘটনার দ্রষ্টা একজন আরবের কণ্ঠস্বর নিশীথের বাতাসে ভেসে এল। এতে সমবেত আত্মোৎসর্গীত লোকদের মধ্যে সহসা আতঙ্ক দেখা দিল। হযরতের দৃঢ়চিত্ততা অবিলম্বে তাদের সম্বিৎ ফিরিয়ে আনল।

অতঃপর মুহম্মদ তাদের ভেতর থেকে বারজন লোক নির্বাচন করলেন—সকলেই মর্যাদাসম্পন্ন লোক—সকলের অনুমোদনক্রমে নির্বাচিত—তারা হযরতের প্রতিনিধি (নকিব)।[১৯] এরূপে আকাবার দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠিত হল।

এই সম্মেলনের খবর মক্কার গুপ্তচর সারা শহরে প্রচার করে দিল। মুহম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের দুঃসাহস দেখে হতবাক হয়ে কোরাইশরা সদলবলে ইয়াসরিববাসীদের কাফেলার নিকট গিয়ে মুহম্মদের সঙ্গে অঙ্গীকারবদ্ধ লোকদেরকে দাবী করল। কোন্ কোন্ লোক শপথ নিয়েছে তার কোন ইঙ্গিতলাভে ব্যর্থ হয়ে কোরাইশরা কাফেলাকে উৎপীড়ন না করেই যেতে দিল। কিন্তু কোরাইশদের এমন ব্যবহার মুহম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর প্রচণ্ড উৎপীড়নের পূর্বাভাষ হিসেবে স্পষ্ট হয়েছিল। ধীরে ধীরে তাদের অবস্থার মারাত্মক অবনতি হয়। হযরত তাঁর শিষ্যদের সামগ্রিক বিপর্যয় আশঙ্কা করে তাদেরকে অবিলম্বে ইয়াসরিবে্ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নির্দেশ দিলেন। দু'তিনটি পরিবার একবারে নীরবে ইয়াসরিবের পথে মক্কা ত্যাগ করতে লাগল এবং একশোটি পরিবার ইয়াসরিবে পাড়ি দিল, সেখানে তারা উদ্দীপনার সঙ্গেই অভ্যর্থিত হল। এভাবে শহরের গৃহগুলো পরিত্যক্ত হল। বারিয়ার পুত্র ওতবা প্রাণবন্ত ধরনের লোক হয়েও এসব পরিত্যক্ত গৃহের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিম্নোক্ত কবিতার পঙতি আবৃত্তি করেছিল : "প্রত্যেকটি বাসগৃহ যা এতকাল স্বর্গীয় আনন্দে ছিল ভরপুর তা একদিন

www.amarboi.org

অসন্তোষ ও তীব্র অশান্তির শিকারে পরিণত হবে।" সে দুঃখের সঙ্গে আরও উক্তি করল—"এসব আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রের কাজেরই ফল, সে আমাদের দলবল ধ্বংস করেছে, আমাদের কর্মপন্থাকে ধূলিসাৎ করেছে এবং আমাদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে।"[২০]

মুহম্মদের ক্ষেত্রে তেমনি হয়েছিল যেমন যীশুর ক্ষেত্রে হয়েছিল। দু'জনের মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে এক ক্ষেত্রে ধর্মপ্রচারক স্বয়ং বলেছিলেন : "ভেবো না যে আমি জগতে শান্তি প্রেরণের জন্য এসেছি, আমি শান্তি প্রেরণের জন্য আসিনি, তরবারি প্রেরণের জন্য এসেছি; কেননা আমি ছেলেকে পিতার বিরুদ্ধে, কন্যাকে মায়ের বিরুদ্ধে এবং পুত্র-বধূকে শাশুড়ীর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করার জন্যই এসেছি।"[২১] মুহম্মদের ক্ষেত্রে তাঁর একজন অধ্যাবসায়ী প্রতিপক্ষ শুধু এই বলে অভিযোগ করেছিল যে তিনি বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন।

ঐ সময়, যখন ঝড়ের তাণ্ডব ছিল সবচেয়ে উঁচুতে এবং যখন তখন তাঁর উপর তা আঘাত করতে পারত। কিন্তু হযরত মুহম্মদ মোটেই ভীত হননি। তাঁর সকল শিষ্য ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়েছে, তিনি একাকী অনুগত আলী ও শ্রদ্ধাস্পদ আবু বকরসহ সাহসিকতার সঙ্গে নিজ অবস্থানে থেকে গেলেন।

ইতিমধ্যে বিপদ দ্রুত ঘনিয়ে আসছিল। হযরত মুহম্মদ যে কোন সময়ে পলায়ন করতে পারেন—এই আশঙ্কায় দার-উন-নাদওয়ায় কোরাইশদের একটা জরুরী অধিবেশন বসল, অন্য গোত্র থেকেও কিছুসংখ্যক প্রধানকে এই অধিবেশনে আনা হল। সভা অতিশয় বাকবিতণ্ডাপূর্ণ ছিল, কারণ কোরাইশরা ভয় পেয়েছিল। অধিবেশনে মুহম্মদকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া ও নগর থেকে বের করে দেয়া নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়। অতঃপর তাঁকে হত্যা করার প্রস্তাব উঠল কিন্তু একজন তাঁকে হত্যা করলে সে ও তার পরিবার রক্তের প্রতিশোধ-প্রতিহিংসায় কবলিত হয়ে পড়বে, অবশেষে আবু জেহেল[২২] এই অসুবিধার মীমাংসার জন্য একটি প্রস্তাব রাখল। প্রস্তাবটি এই : বিভিন্ন পরিবার থেকে কয়েকজন সাহসী লোক বেছে নেওয়া হবে তারা একই সময়ে একইভাবে মুহম্মদের বুকে তরবারী বসাবে এর ফলে হত্যার দায়িত্ব কোন ব্যক্তি-বিশেষের উপর বর্তাবে না—সকলের উপর বর্তাবে, ফলে মুহম্মদের আত্মীয়গণ হত্যাকারীর উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করতে পারবে না। প্রস্তাবটি গৃহীত হল এবং রক্তক্ষয়ী কাজটি সম্পাদনের জন্য কতকগুলো উচ্চবংশজাত তরুণকে নির্বাচন করা হল। রাত্রি এসে পড়ল, হযরতের বাড়ির চারিদিকে হত্যাকারীদেরকে মোতায়েন করা হল। তারা সারা রাত্রি জেগে পাহারা দিতে লাগল এবং খুব ভোরে যখন তিনি ঘর থেকে বের হবেন তখন তাঁকে হত্যা করতে অপেক্ষা করতে থাকল। দরজার একটি ছিদ্র দিয়ে তারা মাঝে মাঝে দেখতে লাগল যে মুহম্মদ এখনও বিছানায় আছেন কিনা। ইত্যবসরে আত্মসংরক্ষণের প্রবৃত্তি যা নাজারাতের মহান প্রেরিত পুরুষকে প্রায়ই শত্রুদের[২৩] এড়িয়ে চলতে চালিত করত তা মুহম্মদকে বিপদ সম্পর্কে সাবধান করল। হত্যাকারীদের দৃষ্টি তাঁর শয্যার উপর নিবদ্ধ করার জন্য তিনি তাঁর সবুজ পোশাক অনুগত ও বিশ্বস্ত আলীকে পরিধান

www.amarboi.org

করালেন, ও তাঁর বিছানায় শোয়ার জন্য আদেশ দিলেন,[২৪] এবং তিনি "দাউদের মত জানালা দিয়ে পালিয়ে গেলেন"। তিনি আবু বকরের বাড়িতে গেলেন এবং তাঁরা একই সঙ্গে সকলের অলক্ষ্যে তাঁদের নির্দয় জন্মভূমি ত্যাগ করলেন। তাঁরা মক্কার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত সওর গিরি-গুহায় কয়েকদিন আত্মগোপন করেছিলেন।[২৫]

এবার সীমাহীন আক্রোশে ফেটে পড়ল কোরাইশদের উন্মত্ততা। হবু হত্যাকারীরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে এবং মুহম্মদ স্থান ত্যাগ করেছে—এই সংবাদ তাদের সমগ্র শক্তিকে জাগিয়ে তুলল। অশ্বারোহীগণ দেশময় তন্ন তন্ন করে মুহম্মদকে খুঁজতে লাগল। তাঁর মস্তিষ্কের উপর মূল্য নির্ধারিত হল।[২৬] একবার বা দু'বার বিপদ এত কাছে এসে পড়েছিল যে বৃদ্ধ আবু বকর সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, "আমরা যে মাত্র দু'জন।" হযরত বললেন, "না, আমরা তিনজন; আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে আছেন।" সত্যই আল্লাহ্ তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। তিনদিন পর কোরাইশদের তল্লাসী চেষ্টা থেমে গেল। এই কয়দিন আবু বকরের এক কন্যা হযরত ও তাঁর সঙ্গীর জন্য রাত্রিতে আহার সরবরাহ্ করত। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যায় পলাতকদ্বয় গুহা ত্যাগ করলেন; বহু কষ্টে তাঁরা দু'টি উট জোগাড় করলেন ও স্বল্প ব্যবহৃত পথে ইয়াসরিবে উপস্থিত হওয়ার জন্য যত্নবান হলেন। মুহম্মদের শিরের জন্য ধার্য উচ্চ মূল্য মক্কা থেকে বহু অশ্বারোহীকে পথে টেনে এনেছিল এবং তখনও তারা সযত্নে অসহায় গৃহত্যাগীকে খুঁজে ফিরছিল। একজন দুর্বার, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা পলাতকদের দেখতে পেয়ে তাদের পিছু নিয়েছিল। পুনরায় আবু বকর ভয়ার্ত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন, "আমাদের সর্বনাশ।" হযরত বললেন, "ভীত হবেন না। আল্লাহ আমাদের রক্ষা করবেন।" পৌত্তলিকটি মুহম্মদকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ঘোড়ার পিছনের পা মাটিতে দেবে গেল ও ঘোড়াটি ভূতলশায়ী হল। হঠাৎ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে সে যাঁকে অনুসরণ করছিল তাঁর কাছেই ক্ষমাপ্রার্থী হল এবং ক্ষমা-প্রদর্শনের সাফাইয়ের জন্য অনুরোধ করল। আবু বকরের দেয়া একখানি অস্থির উপর এই সাফাই প্রদত্ত হল।[২৭]

আর কোন বিড়ম্বনা ছাড়াই পলাতকদ্বয় তাদের যাত্রার অগ্রগতি অব্যাহত রাখলেন এবং তিনদিন পথ চলার পর ইয়াসরিবের সীমানায় প্রবেশ করেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের এক গরমের দিনে হযরত মুহম্মদ তাঁর উষ্ট্র থেকে নামলেন ইয়াসরিবের মাটিতে। যা পরে তাঁর স্বদেশ ও আশ্রয়স্থল হল। একজন ইহুদী গৃহের চূড়া থেকে প্রথমে তাঁকে দেখেছিল[২৮] আর এরূপে কোরআনের বাণী বাস্তবায়িত হল। "যাদেরকে কিতাব দান করেছি তারা সে জিনিসটিকে বেশ জানে—ঠিক যেমন নিজেদের সন্তানদেরকে তারা জানে।"[২৯] 'কোবা' নামক গ্রামে মুহম্মদ ও তাঁর সঙ্গী কয়েকদিনের জন্য[৩০] অবস্থান করেন। ইয়াসরিবের মাত্র দু'মাইল দক্ষিণে এই কোবা গ্রাম। সৌন্দর্য ও উর্বরতার জন্য প্রসিদ্ধ। এখানেই তাদের সঙ্গে আলী মিলিত হন। মুহম্মদ তাদের নাগালের বাইরে যাওয়ায় কোরাইশগণ হতাশ হয়ে আলীর প্রতি চরম দুর্ব্যবহার করে।[৩১] আলী মক্কা থেকে পালিয়ে হেঁটে এখানে পৌঁছেন। তিনি দিনে লুকিয়ে থাকতেন ও শুধু রাত্রে পথ চলতেন যাতে কোরাইশদের সামনে না পড়েন।[৩২]

www.amarboi.org

বণী আমর বিন আউফ গোত্র এই গ্রামের মালিক ছিল। দীর্ঘদিন তাদের মধ্যে অবস্থান করার জন্য তারা হযরতকে অনুরোধ জানায়। কিন্তু কর্তব্য তাঁর সামনে জাগরিত ছিল। তিনি অগণিত শিষ্য সাথে নিয়ে ইয়াসরিব নগরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। তিনি ১৬ই রবিউল আউয়াল, ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২রা জুলাই (এম কসিন দ্য পার্সিভালের মতানুযায়ী) শুক্রবার সকালে নগরে প্রবেশ করেছিলেন।৩৩

এভাবে হিযরত সম্পন্ন হয়, যা ইউরোপের বর্ষপঞ্জীতে "ফ্লাইট অব মুহম্মদ" বলে উল্লিখিত। এ থেকে মুসলমানদের বর্ষপরিক্রমা শুরু হয়।

টীকা ঃ ১

"হিযরা" বা হিযরী বর্ষ দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) সতের বছর পরে চালু করেন। অবশ্য ৪ঠা রবিউল আউয়াল হযরত মক্কা ত্যাগ করেছিলেন—এই যথার্থ তারিখ থেকে বর্ষ গণনা শুরু হয় না বরং প্রথম চান্দ্র মাস মহরমের প্রথম দিন থেকে গ্রহণ করা হয়। যখন প্রথম হিজরী সাল চালু হয় তখন পহেলা মহরম ছিল ১৫ই জুলাই।

যদিও ওমর সরকারি হিজরী বর্ষ চালু করেন, তবুও কতিপয় হাদিস অনুযায়ী স্পষ্ট হয় যে, হযরত নিজেই ঘটনা উল্লেখের সময় হিযরতের পূর্বে বা পরের প্রেক্ষিতে বর্ণনা করতেন। হযরতের ধর্মপ্রচারের ইতিহাসে এই ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই প্রধানতম সংকট হিসেবে চিহ্নিত।

তুঃ—আল্ হালাবীর ইন্সানুল উয়ুন।

টীকা ঃ ২

বারটি মুসলিম মাস হল মহরম (পবিত্র মাস), সফর (বিদায়ের মাস), রবিউল আউয়াল (বসন্ত ঋতুর প্রথম মাস), রবিউস সানী (বসন্ত ঋতুর দ্বিতীয় মাস), জামাদিউল্ আউয়াল (প্রথম শুষ্ক মাস), জামাদিউস্ সানী (দ্বিতীয় শুষ্ক মাস), রজব (সম্মানিত মাস), শাবান (গাছের কুঁড়িফোটার মাস), রমজান (গরমের মাস), শাওয়াল (সংযোগের মাস), জুলকাদ (সন্ধি, শান্তি বা আরামের মাস) জুল হাজ্ব (হজ্জব্রত উদযাপনের মাস)। প্রাচীন আরবগণ ৩৫৪ দিন ৮ ঘন্টা ৪৮ সেকেন্ডে চন্দ্র বর্ষ গণনা করত এবং তারা সময়কে পর্যায়ক্রমে ২৯ ও ৩০ দিনে মাস ধরে ১২ মাসে বিভক্ত করত। প্রতিবেশী গ্রীক ও রোমানদের সৌর বর্ষের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এবং প্রত্যেকটি মাস যথার্থ ঋতুতে পড়ার জন্য আরবেরা প্রত্যেক তৃতীয় বছরের সঙ্গে এক মাস যোগ করত। এই অন্তর-সংযুক্তিকে 'নসি' বলা হত; যদিও এটা খুব একটা নিখুঁত ছিল না তথাপি তা মাস ও ঋতুর মধ্যে একটা সমন্বয়ের চেষ্টা ছিল। যে বছরে এই সংযুক্তি ঘটত সেই বছরে অনেক পৌত্তলিক প্রথা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা অনুষ্ঠিত হত; এই কারণে 'নসি' বন্ধ করে দেয়া হয়। এই প্রথা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মাসের নামসমূহের সঙ্গে ঋতুর কোন সম্পর্ক থাকল না।

www.amarboi.org

পাদটীকা

১. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৯।
২. 'তাকিয়া'-এর অর্থ তায়েফের বাসিন্দা।
৩. ইবনে হিশাম, পৃ. ২৭৯-২৮০; ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০-৭১।
৪. ইবনে হিশাম, পৃ. ২৮৬-২৮৭; তাবারী (জোটেনবার্গের অনুবাদ) ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৩৮।
৫. আস ও খাজরাজ।
৬. ইসলামের ইতিহাসে এই শপথ "নারীদের শপথ" নামেও উল্লিখিত। দ্বিতীয় আকাবার শপথের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, এই দ্বিতীয় বারের শপথে ইয়াসরিবের প্রতিনিধিবৃন্দ এই শপথ নিল যে মুসলমানদের পক্ষে শত্রুদের আক্রমণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে তারা অস্ত্র হাতে নিবে।
৭. ইবনে হিশাম, পৃ. ২০৯; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩-৭৪।
৮. সু ৬ আ. ১০৭।
৯. সু. ৪০ আ. ৭৮; সু. ৪৩ আ. ৪০ ইত্যাদি।
১০. সু. ২১ আ. ১৮।
১১. সু. ১৭ আ. ১৮।
১২. 'লাইফ অব মহমেট', ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৮।
১৩. কোরআন : ১৭ ঃ ১। "মেরাজ সম্পর্কে যা মুসলমানেরা অবশ্যই বিশ্বাস করেন তা হল এই ধ্যান সন্দর্শনে হযরত মুহম্মদ (দঃ) নিজেকে মক্কা থেকে জেরুজালেমে নীত দেখতে পেয়েছিলেন এবং এই ধ্যান সন্দর্শনে তিনি যথার্থই তার প্রভুর অনেকগুলো শ্রেষ্ঠ নির্দশন দেখতে পেয়েছিলেন। পাঠকদের কাছে এ অবশ্যই সুস্পষ্ট হবে যে নবীদের সন্দর্শনও এক ধরনের ঐশী প্রেরণা"—সৈয়দ আহম্মদ খান, এসেজ, ৯, পৃ. ৩৪। মুয়ির বলেন যে "প্রাথমিক প্রামাণ্য দলিল নির্দেশ করে মেরাজ শুধু সন্দর্শন—প্রকৃত দৈহিক ভ্রমণ নয়।"—২য় খণ্ড, পৃ. ২২১, টীকা। ইবনে হিশাম (পৃ. ২৬৭) যে ঐতিহ্য পরম্পরা পেশ করেছেন তা এই মত সমর্থন করে। আমার মনে হয় এই প্রশ্ন আসতে পারে না, খ্রিস্টানগণ যারা যীশু ও এলিজার দৈহিক পুনরুজ্জীবন ও দৈহিক উড্ডয়নে বিশ্বাস করেন তারা মুহম্মদের দৈহিক উড্ডয়নে বিশ্বাসী মুসলমানদেরকে নিজেদের চেয়ে কম বুদ্ধিদীপ্ত বলে মনে করবেন।
১৪. স্টেনলী লেনপুল, 'ইনট্রোডাক্শন টু দি সিলেকশানস ফ্রম দি কোরআন' পৃ. উপক্রম ৫৬।
১৫. ইবনে হিশাম, পৃ. ২৯৬; আল্ হালাবী, 'ইনসানুল উয়ুন' ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৯।
১৬. 'তাশরিকে'র প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের রাত্রি—হজ্জব্রত পালনের অব্যবহিত পরের তিন দিন।
১৭. ইবনে হিশাম, পৃ. ২৯৬; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড পৃ. ৭৬।
১৮. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭।
১৯. ইবনে হিশাম, পৃ. ২৯০-৩০০। এই শপথে পঁচাত্তর জন নরনারী অংশ নিয়েছিল। এই ঘটনা ঘটেছিল জিল হজ মাসে এবং হযরত এই মাসের অবশিষ্ট দিনগুলি, মহরম ও সফর মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। রবিউল আউয়াল মাসে তিনি মদিনায় চলে যান।—ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮।
২০. ইবনে হিশাম, পৃ. ৩১৬।
২১. বাইবেল, ম্যাথু. ১০, ৩৪, ৩৫।

www.amarboi.org

২২. ইবনে হিশাম, পৃ. ৩২৩-৩২৫; ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯; কোরআন ৮ ঃ ৩০। হিশামের মতানুসারে অন্যতম কোরাইশ আবু জেহেলের প্রস্তাব নজদের সম্মানিত শেখের ছদ্মবেশে একজন অপরিচিত ব্যক্তি সমর্থন করেছিল যাকে হাদিসে শয়তান বলে অভিহিত করেছে। আবু জেহেল ছিল হযরতের একজন উগ্রতম দুশমন। তার প্রকৃত নাম ছিল আমর, এবং বিচক্ষণতার জন্য সে 'আবুল হিকাম' ("জ্ঞানের পিতা") উপাধি পায়। ধর্মান্ধতার জন্য নতুন ধর্মের মধ্যে সে কল্যাণ দেখতে পায়নি, সে জন্য হযরত মুহম্মদ তাকে 'আবু জেহেল' ("অজ্ঞানতার পিতা") বলতেন। অজ্ঞনতার সব যুগেই ধর্মান্ধতার প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, এভাবে আবু জেহেল একটা নমুনায় পরিণত হয়েছে। বিখ্যাত মরমী কবি হাকিম সানায়ী নিম্নোক্ত দুই পঙক্তি কবিতায় ঘটনাটির ইঙ্গিত করেছেনঃ

"নবী আহমদ যেথায় বসে আছেন জ্ঞানের মশাল সঙ্গে নিয়ে
কেমনে সেথায় বু' জেহেলের অবিশ্বাস পশে হৃদয় দিয়ে।"

২৩. তুলনা—মিলান, 'হিস্ট্রী অব্ ক্রিশ্চিয়ানিটি', ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩।
২৪. ইবনে হিশাম, পৃ. ৩২৫; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০।
২৫. ডেস ভারজার্সের টীকা (৫৭), পৃ. ১১৬।
২৬. একশত উট হযরতের শিরের মূল্য নির্ধারিত হয়। ইবনে হিশাম, পৃ. ৩২৮। ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১।
২৭. ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৩১, ৩৩২; ইবনুল আসির, প্রাগুক্ত।
২৮. ইবনে হিশাম, ৩৩০।
২৯. ৬ ঃ ২০।
৩০. সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার—ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৫৫।
৩১. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০।
৩২. প্রাগুক্ত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২।
৩৩. কসিন দ্য পার্সিভেল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭-২০; ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৩৫।

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায়
মদিনায় রাসুল মুহম্মদ

সব নবীদের প্রথম তুমি,
গড়িয়াছে প্রভু তোমায়
সবার শেষে আসছ তুমি
এ পৃথিবীর ধূসর ধূলায়;
খাতেমুন নবী তুমি
পরশ তোমার পেয়েছি যে
সবার পরে এসেছো
সুদূর হতে এসেছো যে।

অধ্যায়ের শুরুতে যে মরমী কবিতার পঙতিগুলি উদ্ধৃত করা হয়েছে এই যুগের খুব কম মুসলমানই তার পরিপূর্ণ তাৎপর্য অনুভব করে থাকেন কিন্তু যে মহান সাধকের কথা এখানে বলা হয়েছে তাঁর প্রতি অনুরাগের বিষয় সকলেই প্রশংসার সঙ্গে মূল্যায়ন করেন। এই অনুরাগ কোন পৌরাণিক আদর্শকে কেন্দ্র করে অথবা কালের বিস্মৃতির ফলে সৃষ্টি হয়নি। যখন ইয়াসরিবে তিনি এসেছেন তখন থেকেই তিনি দিনমণির পূর্ণ রশ্মিতে উদ্ভাসিত—ঐতিহাসিক উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্বে প্রদীপ্ত হয়েছেন—তাঁর উপর ইতিহাসের পরিপূর্ণ আলোকচ্ছটার প্রতিফলন ঘটেছে। তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি ব্যাপার অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়েছে ও পরবর্তী বংশধরদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে জানার জন্য, অনেক সময় তাঁর শিক্ষার বিপরীতেও। অথচ তাঁর শিক্ষা মানবজাতির বিরামবিহীন বিকাশকে কেন্দ্র করে প্রবর্তিত। আমরা এই বিস্ময়কর ব্যক্তিকে দেখেছি একজন পিতৃহীন শিশু হিসেবে যিনি পিতার স্নেহ কোনদিন জানতে পাননি, শৈশবে মাতৃহারা হয়ে মায়ের আদর থেকে বঞ্চিত হয়েছেন—এমনি করুণ তাঁর শৈশব—তিনি চিন্তাশীল শিশু থেকে অধিকতর চিন্তাশীল যুবকে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর শৈশবের মতই তাঁর যৌবন নির্ভেজাল ও সত্যনিষ্ঠ; তাঁর পরিণত বয়স তাঁর যৌবনের মতই কঠোর

www.amarboi.org

ও অকপট! তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় দীন ও দুর্বলদের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি চিরউন্মুক্ত; তাঁর হৃদয় খোদার সমগ্র জীবের প্রতি দরদ ও সহানুভূতিতে পূর্ণ। এত বিনয় ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে তিনি চলাফেরা করতেন যে, লোকে তাঁকে দেখে বলত—'ওই যে আল্ আমিন—বিশ্বাসী, সত্যবাদী ও বিশ্বাসভাজন চলেছেন'। একজন বিশ্বস্ত বন্ধু, একজন অনুরক্ত স্বামী, জীবন-মৃত্যুর রহস্য, মানুষের ক্রিয়াবলীর দায়িত্বসমূহ, মানুষের অস্তিত্বের পরিণতি ও লক্ষ্য উন্মোচনের জন্য নিবেদিত চিন্তাবিদ হিসেবে তিনি একটি জাতি তথা বিশ্বকে ঢেলে সাজানো ও পরিশ্রুত করার মহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। একটিমাত্র অনুরক্ত হৃদয় এই ব্রতে তাকে শান্তি ও সান্ত্বনা জুগিয়েছে। ব্যর্থতা দ্বারা হতবুদ্ধি হলেও তিনি সর্বদা অবিচল ছিলেন; পরাভবের সামনে পড়েও নিরাশ হননি। যে কার্য সম্পাদনের জন্য তিনি দায়িত্ব পেয়েছিলেন তার সফল বাস্তবায়নের জন্যে তিনি অবিরত সংগ্রাম করেছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা ও মহত্ত্ব, আল্লাহর করুণা সম্পর্কে তাঁর সুতীব্র ও ঐকান্তিক বিশ্বাস তাঁর চারপাশে টেনে এনেছিল বিপুল সংখ্যক অনুরক্ত ভক্তমণ্ডলীকে। তীব্রতম পরীক্ষার সময় উপস্থিত হলে তিনি বিশ্বাসী নাবিকের মতো তাঁর শিষ্যগণ নিরাপদ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিজ অবস্থানে অবিচল রয়েছেন এবং তারপর তিনি অনুকূল আশ্রয়ের দিকে পা বাড়িয়েছেন—এটাই আমরা তাঁর ক্ষেত্রে দেখতে পেয়েছি। এখন থেকে আমরা তাঁকে জানব মানুষের অধিপতি, মনুষ্যহৃদয়ের নিয়ন্ত্রক, নেতা, আইন-প্রণেতা, প্রধান প্রশাসক হিসেবে। অহমিকা তাঁর মধ্যে স্থান পায়নি—তিনি ছিলেন অত্যন্ত নম্রনত। এই সময় থেকে তাঁর ইতিহাস তিনি যে প্রজাতন্ত্রের মধ্যমণি ছিলেন তার সঙ্গে মিলিত হয়ে বয়ে গেছে। এখন থেকে যে ধর্মপ্রচারক নিজ হাতে তাঁর পোশাক সেলাই করতেন এবং প্রায়ই অনাহারে অতিবাহিত করতেন, তাঁর ব্যক্তিত্ব জগতের প্রবলতম নৃপতিদের চেয়েও প্রবলতর ব্যক্তিত্ব।

"মানুষ দেখতে পেয়েছে মুহম্মদ কি ছিলেন, তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব, তাঁর কঠিন বন্ধুত্ব, তাঁর সহনশীলতা ও সাহসিকতা, সর্বোপরি, তিনি যে সত্য প্রচার করার জন্য এসেছিলেন তার প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ও অগ্নিগর্ভ উদ্দীপনা—এসব উৎকর্ষ তাঁর ব্যক্তিত্বকে প্রমূর্ত করে তুলেছিল—এসব গুণ গুরুকে অমান্য করা ও তাঁর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ পোষণ না করার ব্যাপারকে অসম্ভব করে তুলেছিল। এর পর থেকে শুধু সময়ের প্রশ্ন। মদিনার অধিবাসীরা যখন তাঁকে জানতে পারবে তারাও তাঁকে মনেপ্রাণে ভালবাসবে—তাঁর প্রতি প্রবল অনুরাগ পোষণ করবে। এই উদ্দীপনায় অগ্নির ন্যায় ছড়িয়ে পড়বে ও সকল গোত্রের মধ্যে বিস্তৃত হবে, যতদিন না সমগ্র আরবদেশ এক আল্লাহর পয়গাম্বরের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে। 'মুকুটধারী কোন সম্রাটই নিজের হাতে সেলাইকৃত ছিন্নবস্ত্র পরিহিত এই মানুষটির মতো আনুগত্য পায়নি।' তাঁর ছিল মানুষকে প্রভাবিত করার মহত্ত্ব।

বহু নামে ভূষিত আলোয়-উদ্ভাসিত মদিনা নগরী[১]। এই নগরী মক্কার উত্তরে প্রায় এগার দিনের দূরত্বে অবস্থিত। শহরটি এখন প্রাচীরবেষ্টিত ও বেশ শক্তিশালী। তখন এ

www.amarboi.org

শহর ছিল সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত এবং হযরত মুহম্মদ কোরাইশদের আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার জন্য যে বিখ্যাত পরিখা খনন করিয়েছিলেন তার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে তা বহিরাক্রমণের অনুকূল ছিল। এই শহর একজন আমেলাকাইত প্রধান প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। হযরতের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এই শহর প্রতিষ্ঠাতার নামেই পরিচিত ছিল। প্রাচীনকালে ইয়াসরিব[২] ও তার আশেপাশের অঞ্চলে আমেলাকাইতগণ বাস করত। ইহুদী ঔপনিবেশিকদের হাতে তারা পর্যুদস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে জানা যায়। তারা আরবে প্রবেশ করেছিল ব্যাবিলনীয়, গ্রীক ও রোমান অত্যাচারীদের আগমনের পূর্বে এবং হিজাজের দক্ষিণ অংশে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই ঔপনিবেশিকদের মধ্যে খায়বরের বনী নাজির, ফিদাকে বনী কোরাইজা ও মদিনার নিকটবর্তী বনী কাইনুকা—এই তিনটি গোত্র সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান করে তারা প্রতিবেশী আরব গোত্রদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। ইয়াসরিবে আস ও খাজরাজ, এই দুটি কাহতান গোত্রের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত তারা এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রাখে। এই দুটি গোত্র প্রথমে ইহুদীদের নিকট বিশেষ ধরনের বশ্যতা স্বীকার করলেও পরে তাদেরকে আশ্রিত করে রাখতে সমর্থ হয়। বহুপূর্ব থেকেই এ দুটি গোত্রের মধ্যে কোন্দল চলছিল। যখন হযরত মক্কায় তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে উদ্যোগী হন তখন তাদের ভেতরকার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটিয়ে তারা তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

যে-সময় হযরত ইয়াসরিবে ইয়াসরিববাসীদের মধ্যে আসলেন তখন সেখানকার রাজনৈতিক অবস্থা এমন ছিল, তাঁর আগমনের ফলে শহরে এক নতুন যুগের ঢেউ খেলে গেল।

বনী আস ও বনী খাজরাজ গোত্রদ্বয় ইসলামী বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রভাবে তাদের দৃঢ়মূল ও সাংঘাতিক রক্তক্ষয়ী বিবাদ ত্যাগ করে ইসলামের আদর্শকে কেন্দ্র করে সংঘবদ্ধ হয় এবং মুসলিম প্রজাতন্ত্রের কেন্দ্রীয় শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পুরাতন বিভেদ মুছে গেল; বিপদের সময়ে ইসলামকে যারা সাহায্য করেছিল তারা পেলেন সম্মানিত উপাধি 'আনসার' বা সাহায্যকারী। যে বিশ্বাসীর দল তাদের প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করেছিলেন, গৃহের সব বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন তারা 'মুহাজেরিন' বা স্বদেশত্যাগী উপাধি পেলেন।

'আনসার' ও 'মুহাজেরিনে'র মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য হযরত তাদের মধ্যে ভ্রাতৃসঙ্ঘ গড়ে তোলেন এবং এই সঙ্ঘ তাদেরকে আনন্দ ও বেদনায় একাত্ম করে তুলেছিল।

ইয়াসরিবের নাম পরির্বতন হল। তখন থেকে এর নাম হল মদিনাতুন্নবী—নবীর শহর, সংক্ষেপে মদিনা—চরম উৎকর্ষসম্পন্ন শহর।

শীঘ্রই একটি মসজিদ নির্মাণ করা হল। মুহম্মদ স্বহস্তে এই মসজিদের নির্মাণকার্যে কাজ করেছিলেন। মুহাজেরিনের বাসস্থানের জন্যও দ্রুত ঘরবাড়ি তৈরি হয়েছিল। যে

www.amarboi.org

জমির উপর মসজিদ নির্মাণের জন্য প্রস্তাব হয়েছিল তা ছিল দুই ভ্রাতার—তা তাঁরা দান করে দিয়েছিলেন; কিন্তু যেহেতু তাঁরা ছিলেন এতিম তাই হযরত তাদেরকে জমির মূল্য দিয়েছিলেন।

মসজিদটি গঠনকৌশলের দিক দিয়ে ছিল সাদাসিধে ধরনের—তিনি যে আড়ম্বরহীন ধর্মপ্রচার করেছিলেন তার সাথে ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। গৃহের দেওয়াল তৈরি হয়েছিল ইট ও মাটি দিয়ে এবং ছাউনি দেওয়া হয়েছিল খেজুর পাতার। যাদের ঘরবাড়ি ছিল না তাদের বসাবাসের জন্য মসজিদের একটি অংশ রাখা হয়েছিল।

মসজিদের প্রত্যেকটি কার্যক্রম অত্যন্ত সরলভাবে সম্পাদিত হয়। মুহম্মদ খালি মৃত্তিকার উপর দাঁড়িয়ে কিংবা একটা খেজুর গাছের কাণ্ডের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে দর্শনপ্রচার ও প্রার্থনার কাজ চালাতেন। আর অনুরক্ত ভক্তের দল তাঁর উদ্দীপনাময়ী ভাষণে শিহরিত হত।

তিনি বলতেন, "আল্লাহর সৃষ্টজীব ও তার নিজ সন্তান-সন্ততিদের প্রতি যে স্নেহশীল নয় আল্লাহ্ তার প্রতি করুণা করবেন না। যে মুসলমান বস্ত্রহীনকে বস্ত্র প্রদান করবে আল্লাহ্ তাঁকে স্বর্গের সবুজ পোশাক পরাবেন।"[৩]

হযরত তাঁর একটি ভাষণে দান প্রসঙ্গে বলেন : "যখন আল্লাহ্ পৃথিবী সৃষ্টি করলেন তখন তা কম্পিত ও শিহরিত হল। যখন তিনি তার উপর পাহাড় স্থাপন করলেন, কম্পন থেমে গেল। তখন ফিরেশতারা জিজ্ঞাসা করল, "হে আল্লাহ্, তোমার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের চেয়ে অধিকতর শক্ত কোন বস্তু আছে কি?" আল্লাহ্ বললেন, 'লৌহ পাহাড়ের চেয়ে শক্ত, কেননা লৌহ দিয়ে পাহাড় ভাঙা যায়।' আবার ফিরেশতারা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ্, তোমার সৃষ্টিতে লৌহ অপেক্ষা শক্ত কিছু আছে কি? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, অগ্নি লৌহ অপেক্ষা শক্ত, কারণ অগ্নি লৌহকে গলায়।' পরে প্রশ্ন উঠল : 'আগুনের চেয়ে শক্ত কোন বস্তু আছে নাকি তোমার সৃষ্টিতে?' জবাব এল, 'হাঁ, পানি; কেননা পানি আগুন নিবিয়ে দেয়।' আবার প্রশ্ন হল : 'পানির চেয়ে শক্তিশালী কিছু আছে কি?' উত্তর হল, 'বাতাস' কেননা বাতাস পানিকে জয় করে ও তাকে গতি প্রদান করে।' তারা আবার প্রশ্ন করল, 'হে আমাদের প্রভু, বাতাসের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী কোন কিছু আছে কি?' তিনি বললেন, 'হাঁ, কোন ভাল লোক যখন দানখয়রাত করে; যখন সে বাম হস্তে দান করে আর তার দক্ষিণ হস্ত তা জানতে না পারে, তখন সে সবকিছুকে অতিক্রম করে।"

দান খয়রাত সম্পর্কে তাঁর সংজ্ঞা বিভিন্ন ধরনের দয়ার কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি বলতেন, "প্রত্যেকটি ভাল কাজ দানশীলতার অন্তর্ভুক্ত। ভাইয়ের মুখ দেখে উৎফুল্ল হয়ে স্মিত হাস্য করাও তোমার পক্ষে দানশীলতা; তোমার নিজের লোকদের ভাল কাজ করতে উপদেশ দেওয়া দান খয়রাত করার সমান। বিপথগামী লোককে সঠিক পথের নির্দেশ দেওয়া দানশীলতা; অন্ধ ব্যক্তিকে সাহায্য করাও দানশীলতা; পথ থেকে পাথর, কাঁটা ও অন্যান্য বাধা অপসারণ করা দানশীলতা, তৃষ্ণার্তকে জল দেওয়াও দানশীলতা।"[৪]

www.amarboi.org

"পরজগতে মানুষের সম্পদ হল ইহজগতে সে মানুষের কল্যাণের যা কিছু কাজ করে। যখন সে মারা যায়, লোকে জিজ্ঞাসা করে, বেচারা কি রেখে গেল? কিন্তু যে সব ফিরেশতা তাকে কবরে[৫] পরীক্ষা করবে তারা জিজ্ঞাসা করবে, তুমি পূর্বে কি ভাল কাজ প্রেরণ করেছ?"

হযরতের একজন শিষ্য বললেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল, আমার আম্মা উম্মে সাদি মৃত্যুবরণ করেছেন; কি উত্তম দান খয়রাত আমি তাঁর আত্মার কল্যাণের জন্য করতে পারি?" মুহম্মদ মরুভূমির ছাতিফাটা রৌদ্রতাপের কথা মনে এনে বললেন, "পানি।" "তাঁর জন্য একটি কূপ খনন কর এবং তৃষ্ণার্তকে পানি বিলাও।" সেই ব্যক্তি তার মায়ের নামে একটি কূপখনন করল এবং বলল, "এটা আমার মায়ের জন্য করা হল, এর আশীর্বাদ যেন তাঁর আত্মায় পৌছায়।

আরভিং বলেন, "মুখের দানশীলতা যা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা কম অনুশীলিত তার উপর মুহম্মদ ঐকান্তিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বসরার অধিবাসী, আবু জারিয়া, মদিনায় এলেন এবং মুহম্মদের নবুয়্যতের সত্যতা সম্পর্কে সংশয়াতীত হয়ে আচরণের কিছু মহান বিধি অবহিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। হযরত উত্তর দিলেন, "কারও মন্দ বলো না।" আবু জারিয়া বলেন, "সেই থেকে আমি মালিক বা দাস, কখনো কারও কুৎসা রটনা করিনি।"

ইসলামের শিক্ষাসমূহ জীবনের শিষ্টাচারসমূহের প্রতি সম্প্রসারিত হয়েছিল। কোন গৃহে প্রবেশ করতে হলে ও সেখান থেকে বের হতে হলে সালাম করতে হবে।[৬] বন্ধুবান্ধব, পরিচিত লোকজন এবং পথের পথচারীদের সালামের উত্তর দিবে। অশ্বারোহী পদচারীকে প্রথমে সালাম করবে; যে উপবিষ্ট ব্যক্তির কাছে হেটে আসবে সে তাকে সালাম করবে। ছোটদল বড়দলকে সালাম করবে এবং যুবক বৃদ্ধকে সালাম করবে।"[৭]

পাদটীকা

১. মানওয়ারাহ।
২. 'ইয়াসরিব' শব্দের 'ছা' ধ্বনিটি আরবগণ 'থ' এবং অনারবগণ 'স' উচ্চারণ করত।
৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাজি:) বর্ণিত এই হাদিসটি মিশকাত শরীফে ১২শ খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায় প্রথম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।
৪. আবু সাঈদ খাজরী থেকে বর্ণিত।
৫. পরবর্তী ২য় খণ্ড, অধ্যায়—১০।
৬. তুলনীয় : কোরআন—২৪ : ২৭, ২৮ ও ৬১ ও ৬২।
৭. আবু হোরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। মিশকাত শরীফ, খণ্ড ২২, অধ্যায় ১, বিভাগ ১ দ্রষ্টব্য। এছাড়া 'কিতাবুল মুস্তাত্রাফ' অধ্যায় ৪, ৫, ১০, ১৯, ২২, ২৩ ও ২৪ দেখুন। মুস্তাত্রাফ পরিপূর্ণভাবে তিরমিজী, মুসলিম ও বোখারী শরীফের উল্লেখ করেছে। আরও দেখুন 'মজলিশ আবরার' 'মজলিশ' ৮৪।

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায়

কোরাইশ ও ইহুদীদের শত্রুতা

১ম হিজরী—১৯শে এপ্রিল, ৬২২—৭ই মে, ৬২৩ খ্রিস্টাব্দ

আল্লাহপাক পৌঁছে দিন নবীর পরে
আমার সালাত, আমার সালাম
রাসুলে আরাবী, রাসুলে মক্কী,
রাসুলে মাদানী—আমার ইমাম।
সূর্যের মতো জ্বলছেন তিনি
মহিমা তাঁর আকাশ-ছোঁওয়া
তাঁর উদারতা, স্নিগ্ধতা ও কোমলতা
সুধাকরের পীযূষ-চুয়া।
সারা সৃষ্টির সেরা তিনি
মহত্ত্ব ও মাধুরিমায়
ব্যক্তিত্বের কিরণ তাঁর ঝরে নিতি
মানবতার নীল দরিয়ায়।

তখন মদিনায় তিনটি স্বতন্ত্র দল ছিল। মুহাজির (বাস্তুত্যাগী) ও আনসার (সাহায্যকারী) ইসলামের প্রাণশক্তি ধারণ করেছিলেন। হযরতের প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল অসীম। মুহাজিরগণ তাদের মাতৃভূমি ত্যাগ করে আরব ঐতিহ্যের বিপরীত ধর্মের জন্য তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সব রকম দুঃখদুর্দশার মোকাবিলা করেছিলেন, যাবতীয় প্রলোভনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তাঁদের অনেকেই কপর্দকশূন্য অবস্থায় মদিনায় আসেন। তাঁরা মদিনার দীক্ষিতের দ্বারা আন্তরিকতার সাথে অভ্যর্থিত হন। মদিনার মুসলমান ভাইয়েরা তাঁদের দেশত্যাগী ভাইদের মধ্যে তাঁদের সম্পত্তি বন্টন করে দেন। হযরত অত্যন্ত জ্ঞানবত্তার সঙ্গে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করেন। এ ঈর্ষা—বিদ্বেষের বিকাশকে বন্ধ করেছিল এবং আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে উদার দানশীলতার

www.amarboi.org

প্রতিযোগিতার জন্ম দিয়েছিল যে, কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের জন্য সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। যে উদ্দীপনা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে এই নরনারীগণ নতুন ধর্মীয় উজ্জীবনের প্রতি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, করেছিলেন তেমন অভিব্যক্তি ধর্মীয় বিকাশের খ্রিস্টীয় পর্যায়ের উত্তম দিনগুলিতে দেখা যায়নি। দ্বিতীয় দলটিরও প্রথমে গুরুত্ব ছিল। এই দল প্রধানত ইসলামে দীক্ষিত উদাসীন দীক্ষিতদের নিয়ে গড়ে উঠে। এরা পৌত্তলিকতার জন্য গোপনীয় পূর্বানুরাগ বজায় রেখেছিল। এ দলের নেতা ছিলেন এবং তাঁর মদিনার রাজত্ব লাভের উচ্চাভিলাষ ছিল। মক্কার আবু সুফিয়ানের মতো তিনিও তার অভিসন্ধি চরিতার্থ করতে একটি শক্তিশালী সমর্থক দল গড়ে তোলেন। মদিনার শাসনভার দখলের সকল রকম প্রস্তুতি নেয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু হযরতের মদিনায় আগমণ তার পরিকল্পনাকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। লৌকিক উদ্দীপনা তাকে ও তার সমর্থকদের নামমাত্র ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। সামান্যতম সুযোগ পেলেই মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তারা সর্বদা ছিল প্রস্তুত; তারা নবোদ্ভূত মদিনার প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যথেষ্ট বিপদজনক ছিল। কাজেই হযরতকে তাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হত। তিনি তাদের প্রতি সর্বোত্তম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা দেখাতেন এবং আশা পোষণ করতেন যে শেষ পর্যন্ত তারা ইসলামের পতাকাতলে আসবে। আর এই আশা পরিণতি দ্বারা পরিপূর্ণভাবে সমর্থিত হয়েছিল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুতে তার দল বা 'মুনাফেকিন' (ধর্মদ্রোহী) হিসেবে নিন্দিত[১] হয়েছিল তা কিছুকালের জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হয়েছিল।

ইহুদীরা ছিল তৃতীয় দল এবং সবচেয়ে মারাত্মক বিপদের কারণ ছিল। কোরাইশদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল এবং তাদের দল-উপদলসমূহ বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হয়েছিল ও নতুন ধর্মের ঘোর বিরোধী ছিল। প্রথমে তারা মুহম্মদের ধর্মের প্রতি কিছুটা অনুকূল মনোভঙ্গী নিয়ে দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি তাদের অঙ্গীকৃত মসিহ্ হতে পারেননি, তিনি তাদের নিকট সম্ভবত তাদের পুরাতন শত্রুদের আতিথেয়তার উপর নির্ভরশীল একজন স্বপ্নবিলাসী, একজন তুচ্ছ প্রচারক হিসেবে ছিলেন। এই পুরাতন শত্রুরা, আস ও খাজরাজ গোত্র এখন তাদের পৃষ্ঠপোষক, তাদের প্রতিশোধগ্রহণকারী হতে পারে, আরবদের জয় করতে ও ইহুদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে পারে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে হযরতের অভ্যর্থনায় তারা উদাসিনতার সঙ্গে মদিনাবাসীদের সাথে যোগ দেয়। আর কিছুদিনের জন্য তারা শান্ত মনোভাব গ্রহণ করেছিল। এটা নেহায়েত সাময়িক ছিল, এক মাস যেতে-না-যেতে তাদের বিদ্রোহী মনোভাব যা তাদের পয়গাম্বরদের হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং গোপন বিশ্বাসঘাতকতায় স্পষ্ট হয়। মদিনায় আগমনের পর হযরতের অন্যতম প্রথম কর্তব্য ছিল মদিনা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা যে বিভিন্ন জাতি ও বিরোধী উপাদান নিয়ে গঠিত তা একটি সুশৃঙ্খল সন্ধিবদ্ধ জাতিতে ঐক্যবদ্ধ করা। এই লক্ষ্য সামনে নিয়ে তিনি মদিনার বিভিন্ন জাতির লোকদের অধিকার ও কর্তব্যসমূহ, মুসলমান ও ইহুদীদের

www.amarboi.org

পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হল। ইহুদীরা সামগ্রিকভাবে সনদের দুর্দমনীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য নিরুৎসাহিত হলেও আনন্দের সঙ্গে চুক্তি মেনে নিয়েছিল। এই দলিল ইবনে হিশাম তাঁর গ্রন্থে সযত্নে রক্ষা করেছেন। এ হযরতের প্রকৃত মহত্ত্ব ও বিরাটত্বকে প্রকাশ করে—মুয়ির বলেন, তিনি শুধু তাঁর যুগের মহানায়ক ছিলেন না, তিনি সব যুগেরই মহানায়ক। তিনি অবাধ স্বাপ্নিক ছিলেন না, আর সমাজজীবনের প্রচলিত কাঠামোকে ভেঙেচুরে দেওয়ার জন্যও তিনি কোমর বেঁধে লাগেননি। তিনি ছিলেন একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতার অধিকারী রাষ্ট্রনায়ক, যিনি অতীত হতাশাব্যঞ্জক বিচ্ছিন্নতার যুগেও আল্লাহ তাঁকে যে উপাদান ও জনশক্তি প্রদান করেছিলেন তা দিয়েই বিশ্বমানবতার ভিত্তিতে একটা রাষ্ট্র, একটা প্রজাতন্ত্র, একটা সমাজ পুনর্গঠনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। বিবেকের স্বাধীনতা সম্বলিত সনদের বর্ণনা এরূপ : "পরম করুণাময় দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে আল্লাহর প্রেরিতপুরুষ হযরত মুহম্মদ কর্তৃক বিশ্বাসীদেরকে, তারা কোরাইশ-বংশোদ্ভূত বা ইয়াসরিবের নাগরিক হোক এবং যে কোন বংশোদ্ভূত লোক যারা তাদের সঙ্গে সাধারণ স্বার্থে জড়িত তাদেরক সনদ প্রদান করা হচ্ছে যে তারা সকলে এক জাতি বলে বিবেচিত হবে।" এরপর তিনি 'দিয়াতে'র[২] মূল্য গোত্র বা বংশ কর্তৃক নিরূপণ করেন। নির্ধারণ করেন মুসলমানদের পারস্পরিক জীবনের ব্যক্তিগত কর্তব্যসমূহ। দলিলে আরও বলা হয়েছে : শান্তি-অবস্থা ও যুদ্ধাবস্থা সকল মুসলমানের জন্য সাধারণ; তাদের মধ্যে কারও পক্ষে তাদের সহ-ধর্মাবলম্বী লোকদের শত্রুদের সঙ্গে শান্তির চুক্তি অথবা যুদ্ধের চুক্তি করা যাবে না। যে সমুদয় ইহুদী আমাদের এই কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত তাদের সর্ববিধ অবমাননা ও হয়রানি থেকে রক্ষা করা হবে; তারা আমাদের নিজস্ব লোকদের মতো আমাদের সাহায্য সহযোগিতা ও সেবার সমান অধিকারী বিবেচিত হবে; আউফ, নাজ্জার, হারিস, জাশম, সালাবা, আস ও অন্যান্য শাখার ইহুদী যারা মদিনায় বসবাস করে তারা মুসলমানদের সঙ্গে এক মিশ্রজাতি গড়ে তুলবে; তারা মুসলমানদের মতো স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মপালন করতে পারবে; ইহুদীদের আশ্রিত ও মিত্রগণও সমান নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ভোগ করবে; "অপরাধীকে অবশ্যই খুঁজে বের করা হবে ও শাস্তি দেয়া হবে"; সকল দুশমনের বিরুদ্ধে ইহুদীরা মুসলমানদের সঙ্গে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে মদিনাকে রক্ষা করবে; এই সনদ যারা গ্রহণ করবে তাদের জন্য ইয়াসরিব একটি পবিত্র স্থান; মুসলমান ও ইহুদীদের আশ্রিত ও মিত্রপক্ষ তাদের পৃষ্ঠপোষকদের মতোই সম্মানিত হবে; প্রকৃত মুসলমানগণ অপরাধী, জুলুমকারী, বিশৃঙ্খলাকারীকে ঘৃণা করবে; যদি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নিন্দনীয় হয় তাহলেও তাকে সমর্থন করবে না।" তারপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ পরিচালনার অন্যান্য শর্তাদি বর্ণনার পরে এই অসাধারণ দলিল এরূপে সমাপ্ত হয়েছে : "এই সনদ যারা গ্রহণ করে তাদের মধ্যকার যাবতীয় ভাবী বিবাদবিসম্বাদ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে তাঁর প্রেরিতপুরুষের নিকট সমর্পিত হবে।"[৩]

আরবদের যে নৈরাজ্যমূলক প্রথার ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত ব্যথিত ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিজেদের বা তাদের জ্ঞাতিদের শক্তির উপর নির্ভর করতে হত, প্রতিশোধ গ্রহণ বা

www.amarboi.org

বিচারের প্রয়োজন চরিতার্থ করতে সে প্রথার প্রতি এভাবে মরণাঘাত করা হল। এ সনদ মুহম্মদকে জাতির প্রধান প্রশাসকে পরিণত করল, এ যেমন তাঁর জনগণের ভেতরকার চুক্তির দ্বারা সাধিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় হিজরী ৭ই মে, ৬২৩ থেকে ২৬শে এপ্রিল, ৬২৪ খ্রি. ঃ মদিনার উপকণ্ঠে বসবাসকারী বণী উন্ নাজির, বণী কোরাইজা ও বণী কাইনুকা প্রমুখ ইহুদী বংশসমূহকে প্রথমে এই সনদের মধ্যে আওতাভুক্ত করা হয়নি, কিন্তু কিছুদিন পরে তারাও সকৃতজ্ঞ চিত্তে এই সনদের শর্তাদি মেনে নিল।

যা'হোক, মুহম্মদের দয়া বা উদারতা, কোনটাই ইহুদীদের শান্ত করতে পারত না। ইহুদীরা হযরতের মাধ্যমে সমগ্র আরবকে ইহুদীবাদে রূপান্তরিতকরণে সমর্থ না হওয়া এবং তাঁর ধর্মমত তালমুদীয় পুরানের চেয়ে সরলতার হওয়ায় ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর সঙ্গে শীঘ্রই সম্পর্ক ছিন্ন করল এবং নতুন ধর্মের শত্রুদের পক্ষ নিল। যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হল তারা পৌত্তলিকতা অথবা ইসলামকে পছন্দ করে তারা বহু খ্রিস্টান তার্কিকদের মতো ঘোষণা করল যে, তারা মুহম্মদের ধর্মমত অপেক্ষা আনুষঙ্গিক অনিষ্টসহ পৌত্তলিকতা পছন্দ করে। হযরতকে তারা গালাগালি করত; তারা "মুখ ভেঙচাত", বিকৃতভাবে কোরআনের শব্দাবলীর উচ্চারণ করত, ইসলামের দৈনন্দিন প্রার্থনা ও পদ্ধতি বিকৃত করত, এভাবে সেসব অর্থহীন, অবান্তর বা অপবিত্র বলে প্রতিপন্ন করত। সে সময় অনেক ইহুদী পুরুষ ও মহিলা কবি মুসলিম মহিলাদের সম্পর্কে ব্যক্তিগত বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করে আরবদের মর্যাদাবোধ ও সাহসিকতা বিষয়ক যাবতীয় সাধারণ মার্জিত রুচি ও স্বীকৃত বিধানকে পদদলিত করত। কিন্তু এ সব ছিল গৌণ অপরাধ। শুধু মুসলমান রমণীদেরকে অপমান ও হযরতকে অপদস্থ করে তারা পরিতৃপ্ত হয়নি, তারা রাষ্ট্রের শত্রুদের নিকট গোপনে দূত পাঠাল, যে রাষ্ট্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তারা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। কোরাইশরা মুহম্মদকে হত্যা করার জন্য প্রতিজ্ঞা করল। তারা মুসলমানদের প্রকৃত জনশক্তি সম্পর্কে অবহিত হয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের দল ও অবিশ্বাসী ইসরাইলদেরকে ধন্যবাদ জানাল। তারা এ ঘটনাও জানত যে ইহুদীরা মুহম্মদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে সাময়িক উপযোগিতার অভিপ্রায় থেকে এবং যে মুহূর্তে তারা মদিনার সমীপবর্তী হবে জিহোবার উপাসকেরা মুহম্মদের দল পরিত্যাগ করে পৌত্তলিকদের দলে যোগদান করবে।

এবার ইসলামের তীব্রতম পরীক্ষার সময় উপস্থিত। হযরত নগরের সংরক্ষণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে ও বিশ্বাসীদের সুগঠিত করতে-না-করতে ভীষণ আঘাত তাঁর উপর হানা হল।[৪] মুহম্মদের প্রাথমিক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল মদিনার ষড়যন্ত্রকারী ও প্রতারণামূলক শক্তি দ্বারা ভয়াবহ বিপদপাতের সম্ভাবনা কিংবা বাইরে থেকে আকস্মিক আক্রমণের বিপক্ষে সতর্কতা অবলম্বন করা। তিনি শুধু ইসলামের প্রচারক মাত্র ছিলেন না, তিনি তাঁর জনগণের জীবন ও স্বাধীনতার রক্ষকও ছিলেন। একজন প্রেরিতপুরুষ হিসেবে তিনি তাঁর শত্রুদের গালিগালাজ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ উপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু একজন রাষ্ট্রপ্রধান

www.amarboi.org

হিসেবে, "প্রায় বিরামবিহীন যুদ্ধবিগ্রহকালে সেনাপতি হিসেবে" যখন মদিনাকে সামরিক প্রতিরোধব্যবস্থা বা এক ধরনের সামরিক সংরক্ষণের অধীনে রাখা হয়েছিল, তিনি বিশ্বাসঘাতকতাকে গুরুত্ব না দিয়ে পারতেন না। অধীনস্থদের প্রতি কর্তব্য হিসেবে তিনি সেই দলকে দমন করতে বাধ্য ছিলেন। যে দল শত্রু দ্বারা শহর লুণ্ঠন করতে পারত কিংবা শহর লুণ্ঠনের জন্যে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। যে বিশ্বাসঘাতকেরা মদিনার ভেতরে রাজদ্রোহের বীজ বপন করছিল। কিংবা বাইরের শত্রুদের কাছে সংবাদ সরবরাহ করছিল রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য তাদের নিষিদ্ধকরণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। ছ'জন বিশ্বাসঘাতককে নিষিদ্ধকরণের আওতায় আইন বহির্ভূত করা হয়েছিল, প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

কোরাইশ সৈন্যদলকে মুহম্মদ যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার পূর্বে যুদ্ধের ময়দানে মোতায়েন করা হয়েছিল। যিনি জীবনে কোনদিন অস্ত্র ধারণ করেননি, যাঁর কাছে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তীব্র বেদনা সঞ্চার করত, যিনি আরবদের পৌরুষ বিষয়ক বিধিসমূহের বিরুদ্ধে তাঁর সন্তান বা শিষ্যদের ক্ষতিতে প্রচণ্ড মনোকষ্ট পেতেন। যাঁর চরিত্র এতই কোমল ও দয়ার্দ্র ছিল যে তাঁর শত্রুরা তাঁকে স্ত্রীজনোচিত বলে অভিহিত করত[৫]—প্রয়োজনের তাগিদে এই মানুষটি এখন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অস্ত্রের বলে তাঁর শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করতে বাধ্য হলেন, আত্মরক্ষার জন্য তাঁর শিষ্যদেরকে সংগঠিত করেন এবং প্রায় বিশ্বাসঘাতকতামূলক ও আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তখনও আরবদের যুদ্ধ বিগ্রহ নিশাকালে বা ভোর রাত্রে পরিচালিত আকস্মিক ও হত্যামূলক লুণ্ঠন পর্যায়ে সীমিত ছিল; বিচ্ছিন্ন লড়াই বা সাধারণ দাঙ্গার পর্যায়ভুক্ত ছিল, যখন আক্রান্ত ব্যক্তিরা আক্রমণকারী দলের অভিপ্রায় সম্পর্কে সচেতন হত। মুহম্মদ তাঁর দেশবাসীর অভ্যস্ত কার্যপ্রণালী সম্পর্কে জানতেন। তিনি প্রায়ই পরিদর্শক দল পাঠিয়ে এসব আকস্মিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করতেন।

মদিনার প্রান্তসীমা পর্যন্ত মক্কাবাসী ও তাদের মিত্রগণ লুঠতরাজ শুরু করে দিয়েছিল। মুসলমানদের ফলের বৃক্ষ ধ্বংস করত ও তাদের গবাদি পশু ধরে নিয়ে যেত। এক হাজার সুসজ্জিত সেনাদল আবু জেহেল, "অজ্ঞতার পিতা"র অধীনে মুসলমানদেরকে ধ্বংস করার জন্য এবং যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রবাহী তাদের একটি কাফেলাকে হিফাযত করার জন্য মদিনার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। মুসলমানেরা যথাসময়ে এই অগ্রগতির খবর পেয়েছিলেন এবং তিনশত জন শিষ্যের একটি দল যে বদরের উপত্যকার উপর দিয়ে আবু জেহেল এগুচ্ছিল তা দখল করে পৌত্তলিকদের অভিসন্ধি ফাঁস করে দেওয়ার জন্য এতটুকু বিলম্ব না ক'রে যাত্রা করল। যখন মুহম্মদ ধর্মদ্রোহীদের সৈন্যবাহিনীকে ঔদ্ধত্যসহকারে উপত্যকার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখলেন তখন তিনি ইসরাইলদের প্রেরিতপুরুষদের মতো হাত উপরে তুলে প্রার্থনা করলেন যাতে বিশ্বাসীদের ক্ষুদ্র দলটি ধ্বংস না হয়। "হে প্রভু, তোমার সাহায্যের প্রতিশ্রুতির কথা

www.amarboi.org

বিস্মৃত হয়ো না। হে প্রভু যদি এই ক্ষুদ্র দলটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তবে তোমার নির্ভেজাল প্রার্থনা করার মতো কেউ থাকবে না।"[৬]

উন্মুক্ত প্রান্তরে কোরাইশদের তিনজন এগিয়ে এল এবং মুসলমানদেরকে পৌত্তলিকদের থেকে পৃথক করে ফেলল। আরবদের প্রথা অনুযায়ী মুসলমানদের মধ্য থেকে তিনজনকে একক যুদ্ধে আহ্বান করল। হামজা, আলী ও ওবাইদা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং বিজয়ী হলেন। তারপর যুদ্ধ সাধারণ রূপ পরিগ্রহ করল। এক সময়ে যুদ্ধের ভাগ্য বিপর্যস্ত হতে যাচ্ছিল। তবে শিষ্যদের প্রতি হযরতের আবেদন যুদ্ধের গতি ফিরিয়ে আনল। "দিনটি ছিল শীতের ঝড়ো দিন। সারা উপত্যকা দিয়ে এক প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে গেল।" মনে হয়েছিল ফিরেশতারা মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মুহম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা প্রাথমিক খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মতো মনের আন্তরিকতায় প্রকৃতির অবদানসমূহে, জীবনের প্রত্যেক সম্পর্কে, তাদের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত কার্যাবলীর প্রত্যেক পরিবর্তনে আল্লাহর দূরদর্শিতা দেখতে পেতেন,—তাঁদের নিকট ঝড় ও বালির তাণ্ডব, আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধনিরত উপাদানসমূহ সেই সংকটপূর্ণ মুহূর্তে যথার্থ স্বর্গীয় সাহায্য হিসেবে আবির্ভূত হল, যেন ফিরেশতারা বাতাসের পাখায় ভর করে অবিশ্বাসী ধর্মদ্রোহীদেরকে বিভ্রান্তির মধ্যে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।[৭] অনেক ক্ষয়ক্ষতি মক্কাবাসীরা সহ্য করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কেটে পড়ল; তাদের অনেক নেতা নিহত হল। আবু জেহেল তার দুর্নিবার অহঙ্কারের শিকার হল।[৮]

মুসলমানদের হাতে বহু সংখ্যক কোরাইশ বন্দী হল। তাদের মধ্যে দু'জনের প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। তারা নতুন ধর্মের অনুসারীদের প্রতি উৎকট বিদ্বেষ পোষণ করত এবং আরবদের মধ্যে প্রচলিত যুদ্ধনীতি অনুসারে এখন তাদেরকে তাদের আচরণের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল।[৯]

আরবদের মধ্যে প্রচলিত প্রথা ও ঐতিহ্য বিরোধী অবশিষ্ট বন্দীদের প্রতি উচ্চতম মানবতার সঙ্গে আচরণ করা হল। হযরত কড়া নির্দেশ দিলেন যে বন্দীদের দুর্ভাগ্যের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে এবং তাদের প্রতি সদয় আচরণ করতে হবে। হযরতের নির্দেশ যে-সব মুসলমানের তদারকীতে এ-সব বন্দী অবস্থান করছিল তারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করেছিলেন। তারা তাদের আহার্য রুটি বন্দীদের খেতে দিতেন এবং নিজেরা শুধু খেজুর খেয়ে কাটাতেন।[১০] এটা ছিল তাদের সম্মান দেখানোর শ্রেষ্ঠ নজির।

যুদ্ধের গণিমতের দ্রব্যের বন্টন নিয়ে মুসলমান যোদ্ধাদের মধ্যে তীব্র মতদ্বৈততা দেখা দিয়েছিল। মুহম্মদ তাদের মধ্যে এই মালের সমান বন্টন করে তাদের বিরোধের কারণ দূর করেন।[১১] যেহেতু এ-ধরনের বিরোধ দুর্বিনীত লোকদের মধ্যে ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে; তাই মুহম্মদ যুদ্ধে প্রাপ্ত গণিমতের মাল নিয়ে ভবিষ্যতে যে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে তা দূর করার জন্য একটি জরুরী আইন বলবৎ করলেন।

এ কোরআনের সুরা আনফাল (গণিমত)—এর মধ্যে সংযোজিত হয়েছে। এই আইনানুসারে গণিমতের বন্টনের ভার ইসলামী প্রজাতন্ত্রের প্রধানের কর্তৃত্বাধীন করা

www.amarboi.org

হয়েছিল। এর এক-পঞ্চমাংশ দীনদরিদ্রের প্রতিপালনের জন্য বায়তুল মালে সংরক্ষিত হয়েছিল।[১২]

যে অদ্ভুত পরিস্থিতি বদরের বিজয় সূচিত করেছিল এবং তা থেকে যে ফলাফল ঘটেছিল সে-সব মুসলমানদের মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে স্বর্গের ফিরেশতারা তাদের পক্ষে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

কোরআনের দু' একটি উক্তির মধ্য দিয়ে ফিরেশতারা আল্লাহর যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন—এই ধারণা যেভাবে জীবন্ত বৈশিষ্ট্যে কবিত্বপূর্ণ উপাদান সঞ্চার করেছে তা ধর্মগীত লেখকদের সর্বাপেক্ষা বাগ্মিতাপূর্ণ শব্দাবলীর সৌন্দর্য বা গরিমার কাছেও হার মানবে না। যথার্থই একই কবিত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উভয়ের মধ্যে লক্ষণীয়।[১৩]

যীশু খ্রিস্ট ও অন্যান্য ধর্মগুরুদের মতো সম্ভবত মুহম্মদ আল্লাহ ও মানুষের মধ্যবর্তী সত্তা, ফিরেশতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। ফিরেশতাদের প্রতি আধুনিকদের অবিশ্বাস আমাদের পূর্বপুরুষদের ধারণাকে হাস্যাস্পদ করার পক্ষে কোন যৌক্তিকতা বহন করে না। আমাদের অবিশ্বাস তাদের বিশ্বাসের মতো সমানভাবে কুসংস্কাররে অন্তর্ভুক্ত, শুধু পার্থক্য এই যে, একটি নঞর্থক ও অন্যান্য সদর্থক। আধুনিক যুগে যা আমরা প্রকৃতির নিয়মাবলী বলে দেখি তারা তাকে ফিরেশতা, স্বর্গের সাহায্যকারী হিসেবে দেখেছেন। আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে মধ্যবর্তী সত্তাসমূহ সম্পর্কে লক যেভাবে চিন্তা করেছেন তা মানুষ ও জীবসৃষ্টির মধ্যে মধ্যবর্তী সত্তাসমূহের মতোই এমন একটি প্রশ্ন যা মানবপ্রজ্ঞার উপলব্ধির অতীত।

সম্ভবত ব্যক্তিগত সত্তা হিসেবে অনিষ্টের নীতিতে মুহম্মদও খ্রিস্টের মতো বিশ্বাস করতেন। তবে তাঁর বক্তব্যের বিশ্লেষণ অধিকতর বাস্তবধর্মী উপাদান ব্যক্ত করে, তাঁর অনুসারীদের বোঝার উপযোগী ভাষায় ব্যক্তিনিষ্ঠ ধারণাই রূপায়িত। যখন কোন ব্যক্তি হযরতকে জিজ্ঞাসা করেছিল শয়তান কোথায় থাকে, তিনি জবাব দিয়েছিলেন "মানুষের হৃদয়ে" পক্ষান্তরে খ্রিস্টান ঐতিহ্য যে ফ্যারিসিগণ যীশুখ্রিস্টকে প্রলুব্ধ করেছিল তাদেরকেই দোজখের প্রকৃত যুবরাজে পরিণত করে।[১৪]

ফিরেশতা ও শয়তান বিশ্বাস ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মের ক্ষেত্রে অসংখ্য পুরাণের সৃষ্টি করেছে। স্বর্গের সাধুপুরুষ ও ফিরেশতারা খ্রিস্টানদের জন্য যুদ্ধ করেন। মুসলমানেরা জীবনযুদ্ধে শুধু ফিরেশতাদের সাহায্যই স্বীকার করেন।

টীকা

ওকবা বিন মুয়াতকে যখন প্রাণদণ্ড দেয়ার জন্য নেওয়া হচ্ছিল তখন তার প্রশ্নের যে উত্তর মুহম্মদ দিয়েছিলেন তা নির্মম। কথিত আছে যে ওকবার প্রশ্ন : "আমার সন্তানদের কে দেখাশোনা করবে", এর উত্তরে মুহম্মদ জবাব দিয়েছিলেন, "নরকের অগ্নি"। এই গল্প সত্যি অসঙ্গত; মুহম্মদের চরিত্রের এতই পরিপন্থী (তাঁর চরিত্রের একটি মহৎ গুণ

www.amarboi.org

শিশুদের প্রতি তাঁর ভালবাসা, যিনি এতিমদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের প্রতি ভালবাসাকে পরম কর্তব্য হিসেবে শিক্ষা দিতেন, এবং এ কাজটি আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়) যে এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। খ্রিস্টান লেখকগণ এর প্রতি লোলুপনেত্রে দৃষ্টিপাত করেছেন বলে মনে হয় এবং সে কারণে এ গল্প কিভাবে উদ্ভূত হয়েছে তা পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

ওকবার সন্তানদের প্রতি 'সিবাতুন্নার নার' (অগ্নির সন্তান)-এই ডাক-নাম প্রযুজ্য ছিল—খুব সম্ভব এই ডাক-নাম থেকে গল্পটির জন্ম হয়েছিল। ওকবা নিজে 'আয্লান' গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এই শাখা সাফরার নিকটবর্তী বিশেষ উপত্যকাসমূহে বাস করত এবং বানুন্-নার (অগ্নির সন্তান বা বংশধর) নামে পরিচিত ছিল। এই ডাক-নাম থেকে গৃহীত হয়েছিল।

সৎকার উপলক্ষে পৌত্তলিকদের মৃতদের প্রতি মুহম্মদের তীব্র আবেগপূর্ণ সম্বোধন সম্পর্কীয় অপর গল্পটি বলতে গেলে সর্বাপেক্ষা কম বিকৃত। যে পরিস্থিতি থেকে এই নিন্দার জন্ম হয়েছে, তাবারী এভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন : "মৃতের জন্য তৈরি কবরের পাশে মুহম্মদ উপবিষ্ট হতেন, যখন দেহ কবরে শয়ন করানো হত তখন মৃতের নাম ধরে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করা হত এবং মুহম্মদ তখন এই কথাগুলি উচ্চারণ করতেন "হে আমার জ্ঞাতি, তোমরা আমাকে মিথ্যা দোষারোপ করতে, যখন অন্য লোকে আমাকে বিশ্বাস করত; তোমরা আমাকে আমার গৃহ থেকে বাহির করে দিয়েছিলে, যখন অন্যরা আমাকে গ্রহণ করেছিল; তোমাদের কি ভাগ্য! হায়! আল্লাহ যে ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন তা পূর্ণ হল।" এই শব্দাবলী স্পষ্টত সহানুভূতি নির্দেশক, কিন্তু তা তিক্ততা বুঝানোর জন্য বিকৃত করা হয়েছে।

পাদটীকা

১. কোরআন সু. ১৩। ইবনে হিশাম পৃ. ৩৬৩, ৪১১। মুনাফিকগণ ইসলামিক প্রজাতন্ত্র থেকে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়নি। মাঝে মধ্যে তারা ইসলাম জাহানে সবচেয়ে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীকালে তারা ধর্মের গোড়ামির প্রবক্তা হিসেবে কাজ করেছে। আফ্রিকার 'খারেজীরা' তার দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

২. 'দিয়াত' হল কোন ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য যে মূল্য নিহত পরিবারকে দিতে হয় তাই, যদি নিহত ব্যক্তির পরিবার রাজী হয়।

৩. ইবনে হিশাম, পৃ. ৩৪১—৩৪৩। এ একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিলের শব্দান্তর।

৪. কোরআন সু. ৯ আ. ১৩। জামাকসারী (কাশ্ শাফ) মিশর সংস্করণ; পৃ. ৩১৪, ৩১৫, আল্ হালাবী, 'ইনসানুল উয়ুন' ২য় খণ্ড।

৫. তুঃ ডোজি, 'হিস্ট্রী দাস মুসলমানস দ্য এসপেগনি' খম ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২।

৬. ইবনে হিশাম, পৃ. ৪৪৪; ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭।

৭. কোরআন : সু. ৮ আ. ৯ এবং সু ৩ আ. ১১, ১২১—১২৮। তু: মূয়ির ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৬।

৮. ইবনে হিশাম পৃ. ৪৪৩; ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড পৃ. ২৬। স্যার উইলিয়াম মূয়ির বর্ণনা করেছেন যে যখন মুহম্মদের নিকট আবু জেহেলের ছিন্নশির আনীত হয়েছিল তখন তিনি

www.amarboi.org

বলেছিলেন, "আরবদেশের সর্বোৎকৃষ্ট উটের চেয়ে এটা আমার কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।" এই অনুচ্ছেদ ইবনে হিশাম ইবনে আসির। আবুল ফিদা বা তাবারীর গ্রন্থে নেই, কাজেই অপ্রমাণিত।

৯. হারিসের পুত্র নজর কোরআনের ৮ম সুরার ৩২ আয়াতে উল্লিখিত এবং এসব লোকদের অন্যতম।

১০. ইবনে হিশাম, পৃ. ৪৫৯, ৪৬০; কসিন দ্য পার্সিভেল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৯। মুয়ির এরূপ বলেন, "মুহম্মদের নির্দেশানুসারে মদিনার নাগরিকগণ ও যেসব মুহাজির তাদের গৃহের অধিকারী হয়েছিলেন তারা সকলে বন্দীদের অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং প্রভূত গুরুত্ব সহকারে তাদের প্রতি আচরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে একজন বন্দী বলেছিল "মদিনার লোকদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তারা আমাদের অশ্বপৃষ্ঠে যেতে দিতেন এবং নিজেরা হেঁটে যেতেন। তারা আমাদেরকে রুটি খেতে দিতেন, নিজেদের জন্য রুটি অবশিষ্ট থাকত না, তারা খেজুর ভক্ষণ করে ক্ষুধা নিবৃত্ত করতেন, তাতেই তৃপ্ত থাকতেন।" ৩য় খণ্ড পৃ. ১২২।

১১. মেল বলেন, "এটা উল্লেখ্য যে মুহম্মদের শিষ্যদের মধ্যে বদর যুদ্ধে প্রাপ্ত গনিমত নিয়ে যে বিরোধ বেধেছিল দাউদের সৈন্যদের মধ্যেও অনুরূপ পরিস্থিতিতে আমলেকাইতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত গনিমতের মাল নিয়ে বিরোধ বেধেছিল। যারা যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল তাদের দাবী ছিল যে যারা উক্ত দ্রব্য সংগ্রহ নিয়ে ব্যস্ত ছিল ও বিলম্ব করছিল তাদের উক্ত দ্রব্যে কোন অধিকার নেই। উভয় ক্ষেত্রে একইরূপে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছিল এবং ভবিষ্যতের জন্য তা আইনে রূপ লাভ করেছিল এবং স্থিরীকৃত হয়েছিল যে সবাই সমান অংশ পাবে।"—প্রাথমিক আলোচনা, ৬ দেখুন।

১২. কোরআন, সু. ৮ আ. ৪১। যদিও গনিমতের বন্টনের ভার রাষ্ট্রপ্রধানের উপর ন্যস্ত হয়েছিল, কতিপয় প্রথা অনুসৃত হত যা খলিফাদের আমলে নজির হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল এবং তা অধিকতর সুনির্দিষ্ট আইনের রূপ গ্রহণ করেছিল। তুলনীয় এম. কুইরীর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্রুয়িট মুসলমান, (প্যারিস ১৮৭১) পৃ. ৩৩৫।

১৩. ধর্মসংগীত (১৮)।

১৪. শেফারম্যাচার সম্প্রদায়ের সকলেই প্রধান পুরোহিতকেই প্রলুব্ধকারী হিসেবে বিশ্বাস করে। মিলম্যান এবং প্যাট্রিস্ট ও গোঁড়া খ্রিস্টানগণও এই মত পোষণ করেন। কিন্তু মিলম্যান কৌশলে পাঠকদেরকে যে কোন মত গ্রহণ করার সুযোগ করে দিয়েছে। রিউসের স্বর্গীয় দুতদের উপর যে অধ্যায় ('হিস্ট্রী অব ক্রিশ্চিয়ান থিয়োলজী ইন দি এপোসলিক এজ', ইংরেজী অনুবাদের টীকা, পৃ. ৪০১—৪০৪) তাতে যে সব নির্দেশিকা প্রদত্ত হয়েছে তাতে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, প্রাথমিক খ্রিস্টান, খ্রিস্টের প্রত্যক্ষ শিষ্যগণ ফিরেশতা ও শয়তানদেরকে ব্যক্তিগত সত্তা, সামান্য সূক্ষ্ম অথচ সব দিক দিয়ে মানুষের মতো বলে বিশ্বাস করতেন। এই বিশ্বাস খ্রিস্ট শিষ্যগণ অবশ্যই ধর্মগুরুর নিকট থেকে বুদ্ধির মানদণ্ডে স্বতন্ত্র ছিলেন না।—জেসাস ৩য় সং ১৮৬৭, পৃ. ২৬৭।
সি দ্য পার্সিভ্যাল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৯, অনুসারে 'আগাণী'।

www.amarboi.org

পঞ্চম অধ্যায়

কোরাইশদের মদিনা অভিযান

দ্বিতীয় হিযরী—৬২৪ খ্রিস্টাব্দ

ফুলের মত কোমল তিনি, পূর্ণ চাঁদের আলোকময়
সাগরের মত উদার তিনি কালের মতই দুর্জয়

সর্বদাই সফলতা সত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানদণ্ড। খ্রিস্টধর্মের প্রথমদিকে লোকমান্য ফ্যারিসী বলেছিলেন, "তাদের একা থাকতে দাও; যদি এ সব লোক মিথ্যাবাদী হয় তবে তারা তুচ্ছ হয়ে যাবে, যদি তা না হয়, তবে তোমরা নিজেরাই নিশ্চিহ্ন হবে।" "যদি কনস্তানতাইন ২ হি. = ৬২৪ খ্রি. স্বর্গে স্মরণীয় ক্রস চিহ্ন না দেখতেন অথবা কল্পনা না করতেন যে তিনি ক্রস চিহ্ন দেখেছেন; যদি তিনি এর আনুকূল্যে সাফল্যের পথে যাত্রা না করতেন; যদি তিনি বিজয় লাভ না করতেন ও সিংহাসনে আরোহণ না করতেন; তবে খ্রিস্টধর্মের ভাগ্যে কি ঘটত তা আমাদের পক্ষে আদৌ অনুমান করা সম্ভব নয়। বদরের বিজয় মুসলমানদের জন্য যেমন ছিল মিলভিয়ান ব্রীজের বিজয় খ্রিস্টানদের জন্যও তেমন ছিল।[১] সেই সময় থেকে এ সিংহাসন থেকে শাসন চালিয়েছিল।

মুসলমানদের জন্য বদর যুদ্ধে বিজয় সর্বাপেক্ষা শুভফলদায়ক হয়েছিল। এতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না যে অতীতকালের ইহুদি বা খ্রিস্টানদের মতো তারা পৌত্তলিকদের উপর তাদের বিজয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর হস্তক্ষেপ অনুধাবন করেছিলেন। যদি মুসলমানেরা ব্যর্থ হতেন তবে তাদের ভাগ্যে কি ঘটত তা আমরা কল্পনা করতে পারি—সার্বজনীন ধ্বংস।

এই অভিযানে মুহম্মদ যখন ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ওসমানের স্ত্রী—আবিসিনিয়রার নির্বাসন থেকে সবেমাত্র ফিরেছেন, তাঁর প্রিয় কন্যা রোকেয়াকে হারান। কিন্তু পৌত্তলিকগণ প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য যে মনে মনে জ্বলছিল তা তাঁকে পারিবারিক দুঃখের দিকে মনোযোগ দিতে দিল না। কোরাইশ বন্দীগণ দেশে ফিরে আসার পরেই আবু সুফিয়ান দু'শত অশ্বারোহী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে এই প্রতিজ্ঞা করে মক্কা থেকে রওনা

www.amarboi.org

হল যে মুহম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের উপর প্রতিহিংসা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত সে দেশে ফিরে আসবে না। মদিনার কয়েক মাইল ভেতরে পর্যন্ত সে দেশটাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তল্লাসী চালাতে চালাতে এগিয়ে চলল, অপ্রস্তুত মুসলমানদের উপর নৃশংস বাজপাখীর মতো নেমে আসল, জনগণকে হত্যা করল এবং যে খেজুরের বাগান আরবদের প্রধান আহার্য সরবরাহ করত তা ধ্বংস করে দিল। মক্কাবাসীরা তাদেরকে এই লুণ্ঠনের অভিযানে 'সয়িক'[২] পরিপূর্ণ থলিসমূহ দিয়েছিল। মুসলমানেরা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মদিনা থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মক্কার লুণ্ঠনকারীগণ ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে পালিয়ে গেল। পশুর বোঝা হাল্কা করার জন্য যাত্রাকালে তারা থলিগুলো ফেলে গেল। এই ঘটনাকে মুসলমানেরা বিদ্রূপাত্মকভাবে 'গাজাওয়াতুস্ সয়িক'[৩] বা আহার্যপূর্ণ থলির যুদ্ধ নামে বিশেষিত করে।

এই সময় হযরতের জীবনে একটি ঘটনা ঘটে যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ওয়াশিংটন আরভিং বলেছেন। মুহম্মদ তাঁর তাঁবু থেকে কিছুটা দূরে একটি গাছের তলায় নিদ্রায় ছিলেন; একটি কর্কশ শব্দ শুনে তাঁর ঘুম ভাঙে। তিনি দেখলেন যে দুরসুর নামের একজন দুশমন যোদ্ধা মুক্ত তরবারী হাতে তাঁর সামনে দাঁড়ান। সে চীৎকার করে বলল, "হে মুহম্মদ, কে এখন তোমাকে সাহায্য করবে?" হযরত উত্তর দিলেন, "আল্লাহ" দুরন্ত বেদুইন হতচকিত হয়ে পড়ল ও তার হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল। হযরত তৎক্ষণাৎ তরবারীখানা নিজের হাতে নিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "ওহে দুরসুর তোমাকে কে এখন রক্ষা করবে?" সৈনিক উত্তর দিল, "হায় কেউ নেই।"—"তবে আমার কাছ থেকে শিক্ষা নাও কিভাবে দয়ালু হতে হয়"। এই বলে তিনি সৈনিককে তরবারী ফেরত দিলেন। আরববাসীটির হৃদয় বিজিত হল; পরবর্তীকালে তিনি হযরতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবিচল শিষ্য হয়েছিলেন।[৪]

যে খণ্ডযুদ্ধগুলি পৌত্তলিক ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল তা পরবর্তী বিরাট যুদ্ধেরই পূর্বাভাষ ছিল।

পৌত্তলিকরা প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলছিল। তারা মুসলমানদের সঙ্গে আরেকটি ভীষণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল। তাদের দূত তিহামা ও কিনান গোত্রদ্বয়ের সাহায্য লাভে সমর্থ হয়েছিল এবং তাদের সম্মিলিত বাহিনী তিন সহস্র সুসজ্জিত সৈনিকে উন্নীত হয়েছিল (যাদের মধ্যে সাতশ' ছিল বর্মাবৃত সৈনিক), তারা একমাত্র প্রতিহিংসার বাসনায় উদ্দীপিত ছিল। এই সেনাবাহিনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরব গোত্রগুলোর কাছে ভীতিপ্রদ ছিল যেমন জারেক্সেসের বিপুল সৈন্যদল গ্রীস রাষ্ট্রসমূহের কাছে ভয়ংকর ছিল।

নিষ্ঠুর আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কোন দিক দিয়ে কোন বাধা না পেয়ে তারা মদিনার উত্তর-পূর্বদিকে একটি সুনির্বাচিত স্থানে অবস্থান নেয়। একমাত্র ওহুদের পর্বত ও একটি উপত্যকা এ স্থান থেকে মদিনাকে পৃথক করেছে। এই নিরাপদ সুবিধাজনক অবস্থান থেকে তারা মদিনাবাসীদের শস্যক্ষেত্র ও খেজুরের বাগান ধ্বংস করেছিল।

অনুসারীদের উদ্দীপনা ও তাদের সম্পদ ধ্বংসের ফলে জাত ক্রোধের দ্বারা মুহম্মদ এক হাজার অনুসারী নিয়ে মদিনার বাইরে আসতে বাধ্য হন। ইহুদীদের গোপন শত্রুতা,

www.amarboi.org

মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের তিনশত অনুসারীসহ দল ছেড়ে চলে গেল। এই দলত্যাগের ফলে মুহম্মদের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা মাত্র সাত শ'—তে নেমে আসল। তাঁদের সঙ্গে মাত্র দু'টি ঘোড়া ছিল। তথাপি এই সাহসী দলটি দৃঢ়তাসহকারে সামনে এগিয়ে যেতে থাকল। খেজুরের বনের মধ্য দিয়ে নীরবে এগিয়ে তাঁরা ওহোদের পর্বতে এসে পৌঁছল। তাঁরা সংকীর্ণ গিরিসংকটের মধ্যে রাত্রি যাপন করল এবং ফজরের নামাজ পড়ে সেই গিরিসংকট থেকে বেরিয়ে সমতল ভূমিতে উপস্থিত হল। মুহম্মদ এখন পর্বতের পাদদেশে অবস্থান নিলেন।[৫] একটি উচ্চ সুড়ঙ্গ মুখে সৈন্যবাহিনীর পিছনে তিনি কিছু সংখ্যক তীরন্দাজ মোতায়েন করলেন এবং তাঁদেরকে কোন অবস্থাতেই স্থান ত্যাগ না করতে কড়া নির্দেশ দিলেন; শত্রুর অশ্বারোহী সৈন্যদের অসুবিধা সৃষ্টি করা ও মুসলমান সৈন্যদের রক্ষা করাই তাঁদের একমাত্র কাজ ছিল। সংখ্যাধিক্য হওয়ায় সেনাবাহিনীর কেন্দ্রে মূর্তি রেখে পৌত্তলিকগণ কুচকাওয়াজ করতে করতে সমতল ভূমিতে নেমে আসে। গোত্রপ্রধানদের স্ত্রীগণ যুদ্ধের গান গেয়ে ও তাম্বুরা বাজিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল।[৬] হামজার নেতৃত্বে মুসলমানেরা কোরাইশদের প্রথম প্রচণ্ড আক্রমণ সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা করল। শত্রুপক্ষের বিশৃঙ্খলার সুযোগে হামজা কোরাইশ সৈন্যদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং শত্রু ধ্বংস করতে করতে ভীতি-বিহ্বল অবস্থার সৃষ্টি করলেন। বিজয় যখন মুসলমানদের প্রায় করতলগত এবং শত্রুরা পিছু হটছিল, তখন তীরন্দাজগণ হযরতের নির্দেশ ভুলে গিয়ে লুণ্ঠনে যোগ দিল।[৭] ওহোদ প্রান্তরে যেমন ঘটেছিল, তেমনই পরবর্তীকালে তুর প্রান্তরে ঘটেছিল।। কোরাইশদের অন্যতম সেনাধ্যক্ষ খালিদ বিন ওয়ালিদ মুসলমানদের বিচ্যুতি দেখে মুহূর্তের মধ্যে তার অশ্বারোহী সৈন্যদের ঘুরিয়ে এনে পেছন থেকে মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল।[৮] কোরাইশদের পদাতিক সৈন্যগণও যোগদান করল। সামনের ও পিছনের মুসলিম সৈন্যগণকে ভয়ানক বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে আবার যুদ্ধ শুরু করতে হল। মুসলমান সেনাদলের অসীম সাহসী বীর যোদ্ধাদের অনেকে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদৎ বরণ করলেন। অনেকের সঙ্গে অকুতোভয় হামজাও শহীদ হলেন। আলী যিনি অসম সাহসিকতার সঙ্গে পৌত্তলিকদের প্রথম যুদ্ধ আহ্বানের জবাব দিয়েছিলেন[৯] তিনি, ওমর ও আবু বকর গুরুতরভাবে আহত হলেন। যা'হোক পৌত্তলিকদের দৃষ্টি প্রধানত মুহম্মদের দিকে ছিল; তিনি কতিপয় শিষ্য দ্বারা পরিবৃত হয়ে মুসলমান সৈন্যদের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এখন তিনি কোরাইশদের আক্রমণের প্রধান বস্তুতে পরিণত হলেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবগণ তাঁকে ঘিরে যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হতে লাগলেন। যদিও তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন, দরদর ধারায় রক্ত তাঁর দেহ থেকে প্রবাহিত হতে থাকল; তথাপি তিনি তাদের অনুরক্ত হৃদয়ের কথা বিস্মৃত হননি। যিনি তাঁর কপালের ক্ষত থেকে প্রবাহিত রক্ত বন্ধ করার জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁর জন্য তিনি প্রাণভরে দোয়া করেছিলেন।[১০] মুক্তি প্রায় আসন্ন ছিল, আলীর নেতৃত্বে যে সব সাহসী যোদ্ধা কেন্দ্রস্থলে উঠে যুদ্ধ করছিলেন তাঁরা শত্রুদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ

www.amarboi.org

ছিলেন; কিন্তু তাঁরা তাঁদের পয়গাম্বরের মৃত্যু ঘটছে মনে করে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা যখন দেখলেন যে তাঁদের অন্যান্য সহকর্মী ভাইয়েরা তখনও যুদ্ধক্ষেত্রের অন্য স্থানে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন তখন তাঁরা পৌত্তলিকদের মধ্যে বিদ্যুৎ বেগে নেমে আসলেন। যেখানে ছোট মুসলিম যোদ্ধদল তখনও হযরতকে রক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন সেখানে তাঁরা প্রবেশ করে দেখলেন তিনি তখনও জীবিত। তারা বহু কষ্টে হযরতকে নিয়ে ওহোদের উপত্যকায় আশ্রয় নিতে সমর্থ হলেন ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আলী ঢালে ক'রে পাহাড়ের গহ্বর থেকে পানি আনলেন। এই পানি দিয়ে তিনি মুহম্মদের মুখমণ্ডল ও ক্ষতসমূহ ধুয়ে দিলেন এবং উপবিষ্ট অবস্থায় সাহাবাগণসহ জোহরের নামাজ আদায় করলেন।

এতই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল কোরাইশগণ যে মদিনা আক্রমণ করে অথবা ওহোদের উপত্যকা থেকে মুসলমানদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেনি। নৃশংস বর্বরতার সঙ্গে নিহত শত্রুদের দেহ বিকৃত ক'রে তারা মদিনার এলাকাসমূহ পরিত্যাগ করল, আবু সুফিয়ানের স্ত্রী, হিন্দ্ বিন্‌তে ওতবা অন্যান্য কোরাইশ রমণীদের প্রতিহিংসা গ্রহণের বন্যবর্বরতার ক্ষেত্রে অধিকতর হিংস্রতার পরিচয় দিয়েছিল। সে হামজার হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিয়েছিল এবং মৃতদের কান ও নাক কেটে গলার মালা ও বাজুবন্দ তৈরি করেছিল।

কোরাইশরা নিহতদের উপর যে বর্বরতা দেখিয়েছিল তাতে মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এমন কি মুহম্মদও প্রথমে এতই ক্রোধান্বিত হয়েছিলেন যে তিনি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে কোরাইশদের মৃতদেহের প্রতি অনুরূপ ব্যবহার করা হবে।[১১] কিন্তু পরিশেষে তাঁর স্বভাবসুলভ কোমলতা তাঁর হৃদয়ের তিক্ততাকে জয় করল। তিনি প্রচার করলেন, "ধৈর্য সহকারে কৃত অন্যায় সহ্য কর, নিশ্চয়ই ধৈর্যশীলদের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার।"[১২] ঐদিন থেকেই নিহতদের দেহ বিকৃত করার প্রাচীন পৈশাচিক প্রথা মুসলমানদের জন্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হল।[১৩]

মদিনায় ফিরে এসে হযরত তাঁর শিষ্যদের একটি ছোটদলকে প্রস্থানকারী শত্রুদের অনুসরণ করতে নির্দেশ দিলেন এবং তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দিতে বললেন যে যুদ্ধে মুসলমানদের শোচনীয় পরাজয় ঘটলেও তারা মোটেই মনোবল হারায়নি এবং তারা আবার আক্রান্ত হলে পরাজিত হবে না। মুসলমানেরা পিছু হটেছে শুনে জেনে আবু সুফিয়ান দ্রুত মক্কায় ফিরে গেল এবং পথিমধ্যে সে যে দু'জন মদিনাবাসীর সাক্ষাৎ পায় তাঁদেরকে হত্যা করে। যাহোক, সে হযরতের কাছে সংবাদ পাঠাল যে তাঁকে ও তাঁর দলকে ধ্বংস করতে সে শীঘ্রই ফিরে আসবে। হযরত তার উত্তরে যে জবাব দিয়েছিলেন তা ছিল বিশ্বাস ও নির্ভরতায় পরিপূর্ণ। "আল্লাহ্ আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি সর্বোত্তম অভিভাবক।"[১৪]

প্রতিবেশী যাযাবরগণ মদিনার বিভিন্ন অঞ্চল লুণ্ঠন করার জন্য যে প্রস্তুতি নিয়েছিল এই দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধের নৈতিক ফল তার মধ্যে পরিস্ফুট। অবশ্য তাদের অধিকাংশ

www.amarboi.org

প্রয়াস মুহম্মদের শক্তিশালী কার্যক্রমের সামনে অবদমিত হয়। কতিপয় বিরোধী গোত্র ইসলাম গ্রহণের ছলে মুসলিম ধর্মপ্রচারকদেরকে তাদের দলে নিতে প্রলুব্ধ করে এবং তারপর তাদের ধ্বংস করে। এ ধরনের একটি উপলক্ষে সত্তর জন মুসলমান বির্‌ মাউনা নামক ক্ষুদ্র তটিনীর কাছে বণী আমির ও বণী সুলায়েমদের রাজত্বের মধ্যে বণী সুলায়েমদের বিশ্বাসঘাতকতায় নৃশংসভাবে নিহত হয়। এদের মধ্যে যে দু'জন হত্যাকাণ্ড এড়াতে পেরেছিল তাঁদের একজন মদিনার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বণী আমির গোত্রের যে দু'জন অস্ত্রবিহীন আরব হযরতের অনুমতি নিয়ে ভ্রমণ করছিল তাদের সঙ্গে পথে তার সাক্ষাৎ ঘটে এবং শত্রু মনে করে তাদেরকে হত্যা করে। যখন হযরত এ ঘটনার কথা জানতে পারেন তখন তিনি প্রচণ্ড দুঃখ পেলেন। যদিও ভুলবশতঃ তাঁর এক শিষ্যের দ্বারা একটি অন্যায় সংঘটিত হল, তথাপি নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের আত্মীয়স্বজনেরা প্রতিকারের দাবীদার। কাজেই মুসলমান এবং সনদগ্রহণকারী অন্যান্য লোকদের কাছ থেকে মৃত্যুপণ সংগ্রহ করার আদেশ দেওয়া হল।[১৫] বণী উন্ নাজির, বণী কোরাইজা ও অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও মুসলমানদের সঙ্গে এই পণ প্রদানের ব্যাপারে সমভাবে দায়ী ছিল।[১৬] মুহম্মদ কতিপয় শিষ্য সঙ্গে নিয়ে বণী হাজির গোত্রের লোকদের নিকট গেলেন এবং তাদের কাছ থেকে তাদের দেয় পণের ভাগ দাবী করলেন। তারা তাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানাল। যখন তিনি একটি বাড়ির দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ রেখে বসলেন। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কুমতলব লক্ষ্য করলেন এবং এ থেকে তিনি তাদের হত্যার অভিসন্ধি বুঝতে পারলেন।

ইহুদীদের শত্রুতা জানতে হলে আমাদেরকে ঘটনার প্রবাহ অনুসরণ করতে হবে। আমরা লক্ষ্য করেছি ইহুদিরা মুহম্মদের মদিনায় আগমনের পরমুহূর্ত থেকে কী তীব্র শত্রুতা নিয়ে মুহম্মদের পদক্ষেপগুলির অনুসরণ করেছিল। তারা তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপণ করতে চেয়েছিল। তারা তাঁকে ও তাঁর শিষ্যদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটিয়েছিল। তারা কোরআনের শব্দাবলীর ভুল উচ্চারণ করে আপত্তিজনক অর্থ বোঝাত। এসব করেই তারা থেমে যায়নি। উৎকৃষ্ট শিক্ষাদীক্ষা ও বুদ্ধিবিবেচনা, মুনাফিকদের দলের সঙ্গে যোগসাজুজ্য এবং তাদের মধ্যকার সাধারণ সম্মতি দ্বারা (যা আরবদের মধ্যকার বিভেদ থেকে আলাদা) ইহুদিরা হযরতের গঠিত যুক্তরাষ্ট্রে একটি সবচেয়ে বিপজ্জক উপাদান হিসেবে আবির্ভাব হয়েছিল। অনগ্রসর জাতিসমূহের মধ্যে কবিগণ বর্তমান যুগের সাংবাদিকদের মতো মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী হত।[১৭] মদিনাবাসীদের মধ্যে ইহুদী কবিগণ তাদের উৎকৃষ্ট কৃষ্টির বলে স্বাভাবিকভাবেই প্রভূত প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিল। এই প্রতিপত্তি প্রধানত মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করা ও তাদের মধ্যকার পার্থক্যের প্রসার ঘটানোর জন্য নিয়োজিত ছিল। বদর যুদ্ধে পৌত্তলিকদের পরাজয় মক্কাবাসীদের মতো ইহুদীরাও প্রচণ্ডভাবে অনুভব করেছিল। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই কা'ব বিন আশরফ নামক নাজির গোত্রের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সাধারণ্যে পৌত্তলিকদের এই দুর্গতির গাথা গাইতে গাইতে মক্কার দিকে এগিয়ে

www.amarboi.org

গিয়েছিল। সেখানে কোরাইশদেরকে ব্যর্থতায় ম্রিয়মাণ দেখতে পেয়ে সে তাদের সাহস ফিরিয়ে আনার জন্য সকল রকম চেষ্টা চালিয়েছিল। সে হযরত ও তাঁর শিষ্যদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক এবং বদরযুদ্ধে বিপর্যস্ত মক্কাবাসীদের জন্য শোক গীতিমূলক কবিতার মাধ্যমে কোরাইশদের তীব্র প্রতিশোধের নেশা জাগিয়ে তুলত পেরেছিল যা ওহোদ প্রান্তরে বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়েছিল। অভীষ্ট সিদ্ধির পর সে মদিনার সন্নিকটবর্তী তার বাসগৃহ বণী নাজিরদের মধ্যে ফিরে গিয়েছিল। সেখানে সে তার অশ্লীল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতার সাহায্যে মুহম্মদ ও মুসলমানদের প্রতি অনবরত আক্রমণ চালায়। তার এ ধরনের কাজ থেকে মুসলিম মহিলারাও মুক্তি পেত না—সে অশ্লীল কদর্য ভাষায় তাদেরকেও চিত্রিত করত। তার কার্যাবলী সে যে প্রজাতন্ত্রের একজন সদস্য ছিল তার বিরুদ্ধেই প্রকাশ্যে নিয়োজিত ছিল। সে যে গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল সে গোত্র মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে মদিনা রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য নিরাপত্তার জন্য সকলে একযোগে কাজ করবে।[১৮] বণী নাজির গোত্রের অপর একজন ইহুদী আবুল হোদায়েকের পুত্র আবু রাফে সাল্লাম সমভাবে মুসলমানদের তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করত। সে বাস করত তার গোত্রের একটি অংশের সঙ্গে মদিনার উত্তর-পশ্চিমে মদিনা থেকে চার-পাঁচ দিনের দূরত্ব খয়বরে। মুহম্মদ ও মুসলমানদেরকে সে ঘৃণা করত; সে প্রতিবেশী আরবগোত্র সোলায়েম ও গাতাফানদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালাত মুসলিম প্রজাতন্ত্রের পক্ষে এসব প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকতা বরদাস্ত করা সম্ভব ছিল না—এসব প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতকদের প্রতি, সমর্থনের জন্য না হলেও নিরপেক্ষতা অবলম্বনের জন্য সর্ববিধ সুবিবেচনা দেখানো হত। মুসলমানদের অস্তিত্ব সংকটাপন্ন হয়ে উঠেছিল। নিরাপত্তার প্রয়োজনে এসব বিশ্বাসঘাতকতামূলক অভিসন্ধি নির্মূল হওয়া ছিল প্রয়োজন। মদিনাবাসীগণ এ সবের উপর থেকে আইনের শাসন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল—একটি ক্ষেত্রে আউস গোত্রের একজন সদস্যের মাধ্যমে এবং অপর একটি ক্ষেত্রে খাজরাজিয়া গোত্রের একজন সদস্যের মাধ্যমে।

এই দণ্ডাজ্ঞাকে খ্রিস্টান তার্কিকগণ "নিধন" বলে নিন্দিত করেছেন। যেহেতু একজন মুসলমানকে গোপনে অপরাধীকে হত্যা করার জন্য পাঠানো হয়েছিল, সেহেতু হযরতের বিরুদ্ধে তাদের পূর্ব-সংস্কার থাকার জন্য তারা এই দণ্ডাজ্ঞার ন্যায়পরায়ণতার ও দ্রুততা ও গোপনীয়তার সঙ্গে তা সম্পাদনের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন ছিল। সে যুগে পুলিশ আদালত, দেওয়ানী আদালত, এমনকি সামরিক আদালতও ছিল না যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত অপরাধ সম্পর্কে জানা যেত। রাষ্ট্রীয় আইন-প্রয়োগ সংস্থা না থাকায় ব্যক্তিই আইন হাতে তুলে নিত। এসব লোক তাদের আনুষ্ঠানিক চুক্তি লঙ্ঘন করেছিল; তাদেরকে বন্দী করা কিংবা অযথা রক্তপাত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও চিরস্থায়ী গোত্রগত বিরোধ এড়িয়ে তাদের গোত্রের লোকদের সামনে তাদের প্রাণদণ্ড কার্যকরী করা সম্ভব ছিল না। রাষ্ট্রের স্বার্থে জরুরী হয়ে পড়েছিল যে, যা করতে হবে তা দ্রুত করতে হবে এবং জনসমক্ষে যারা অভিযুক্ত ও দোষী তাদেরকে বিনা হৈ হুল্লোড়ে সাজা নিতে হবে।[১৯] প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব, নগররাষ্ট্রে

www.amarboi.org

শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা নির্ভর করত অপরাধীগণ তাদের গোত্রের লোকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শক্তিসঞ্চয় করার আগেই তাদের বিরুদ্ধে গৃহীত রায়ের দ্রুত কার্যকরী করার মধ্যে।

২য় হিজরী শাওয়াল, ফেব্রুয়ারি ৬২৪ খ্রি.

এই দু'জন দেশদ্রোহীর পরিণতি ও তাদের গোত্র বণী কাইনুকার মদিনা থেকে নির্বাসন হযরতের বিরুদ্ধে বণী নাজির গোত্রের লোকদের মধ্যে শত্রুতা তীব্র করেছিল। কাইনুকা গোত্রের নির্বাসনের সঙ্গে যেসব পরিস্থিতি জড়িত ছিল সে প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন। অন্যান্য ইহুদী গোত্র ছিল মুখ্যত কৃষিনির্ভর; বণী কাইনুকা গোত্রের কোন খামার বা খেজুরের বাগান ছিল না। তাদের বেশির ভাগ লোক ছিল কারিগর—বিভিন্ন শিল্পকার্যে নিয়োজিত।[২০] আলেকজান্দ্রিয়ায় বসবাসকারী তাদের স্বধর্মাবলম্বী লোকদের মতো দেশদ্রোহী; দুর্বিনীত ও কলহপ্রিয় বণী কাইনুকা গোত্র তাদের চরমনৈতিক শৈথিল্যের জন্যও ছিল বিখ্যাত। একদিন এক গ্রাম্য তরুণী বাজারে দুধ বিক্রি করতে আসে। ইহুদী তরুণগণ তার সঙ্গে অশ্লীল ব্যবহার করে। একজন মুসলমান পথচারী বালিকার পক্ষ নেয়। এর ফলে যে মারামারি হয় তাতে অশ্লীল আচরণকারী নিহত হয়। পরে উপস্থিত ইহুদীগণ মুসলমান ব্যক্তিকে হত্যা করে। তখন এক বন্য দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। স্বধর্মাবলম্বীর নিধনে উত্তেজিত মুসলমানগণ অস্ত্র হাতে নেয়; রক্তের স্রোত প্রবাহিত হয় এবং উভয়পক্ষে বহু লোক মারা যায়। দাঙ্গার প্রাথমিক খবর পেয়েই মুহম্মদ ঘটনাস্থলে যান এবং তাঁর শিষ্যদের উন্মত্ততা আয়ত্তে আনেন। তিনি অবিলম্বে বুঝতে পারলেন যে দেশদ্রোহ ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে যদি এভাবে চলতে দেওয়া হয় তবে এক ভয়াবহ পরিণতি ঘটবে। মদিনা রণাঙ্গণে পরিণত হবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সদস্যগণ একজন অন্যজনকে মেরে ফেলবে। ইহুদীরা প্রকাশ্যে ও জ্ঞাতসারে চুক্তির শর্তাদী অমান্য করছে। মেরে ফেলবে এ সবের পরিসমাপ্তি ঘটানো প্রয়োজন, নইলে শান্তি ও নিরাপত্তা চিরতরে বিদায় নিবে। ফলে মুহম্মদ কালক্ষেপন না করে বণী কাইনুকা গোত্রের আবাসস্থলে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে তাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে মুসলিম কমনওয়েলেথের অন্তর্ভুক্ত হতে অথবা মদিনা ত্যাগ করতে নির্দেশ দিলেন। ইহুদীরা অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় এই নির্দেশের জবাব দেয় : "হে মুহম্মদ, তোমার লোকেরা (কোরাইশদের) উপর বিজয়ী হয়েছে বলে গর্ব করো না। যুদ্ধবিদ্যায় অপারদর্শী এমন লোকদের সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করেছ। আমাদের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়ায় আসতে চাও তবে আমরা তোমাকে দেখিয়ে দেবো আমরা কেমন শক্তি রাখি।"[২১] তাদের দুর্গে তারা আশ্রয় নিল এবং মুহম্মদের নির্দেশ অমান্য করল। তাদের দমন করা একটি অপরিহার্য কর্তব্য ছিল এবং অবিলম্বে দুর্গ অবরোধ করা হল। তারা পনের দিন পরে আত্মসমর্পণ করল। প্রথমে তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে বলে মনস্থ করা হয়েছিল কিন্তু মুহম্মদের চরিত্রের কোমলতা বিচারের অনিবার্য রায় জয় করল এবং কাইনুকা গোত্রের লোকদেরকে শুধু নির্বাসন দেয়া হল।

www.amarboi.org

বণী নাজির গোত্রের লোকদের মনে এসব অবস্থা বিরক্তির উদ্রেক করছিল। তারা মুহম্মদের থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য শুধু একটা অনুকূল সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কাজেই তাদের মধ্যে মুহম্মদের উপস্থিতিকে তারা দৈব ঘটনা বলে ধারণা করেছিল। কিন্তু আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে তাদের অশুভ মনোবাসনা মুহম্মদের দৃষ্টি এড়ায়নি। ইহুদীদের সন্দেহের উদ্রেক না করেই তিনি অবিলম্বে স্থান ত্যাগ করলেন। এভাবে তিনি নিজেকে ও তাঁর শিষ্যদেরকে প্রায় নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচালেন।[২২]

বণী কাইনুকা গোত্র পূর্বে যে রকম করেছিল বণী নাজির গোত্র ঠিক একই অবস্থায় নিজেদের স্থাপন করেছিল। তারা তাদের কাজের দ্বারা সনদ-বহির্ভূত অবস্থায় পতিত হয়েছিল। কাজেই মদিনায় উপনীত হওয়ার পর মুহম্মদ কাইনুকা গোত্রের নিকট পাঠানো বার্তার অনুরূপ বার্তা তাদের নিকট পাঠালেন। মুনাফিক ও আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের সমর্থনের উপর নির্ভর করে বণী নাজিরগণ একটা উদ্ধত উত্তর দিয়েছিল। আব্দুল্লাহর এবং তাদের সহ-গোত্র বণী কুরাইজা গোত্রের অঙ্গীকৃত সাহায্যের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পনের দিন অবরোধের পর[২৩] তারা সন্ধির জন্য আবেদন জানায়। পূর্বের প্রস্তাব পুনরুজ্জীবিত করা হল, তারা তাদের আবাসস্থল ছেড়ে দিতে রাজী হল। অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া অন্যান্য যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হল।[২৪] মুসলমানরা যাতে তাদের বাসগৃহ দখল করতে না পারে সেজন্য তারা সেগুলো ত্যাগ করার আগেই ধ্বংস করে দিয়েছিল।[২৫]

তাদের জমি, যুদ্ধাস্ত্র যা তারা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি সেগুলো আনসারদের সম্মতি ও আন্তরিক অনুমোদন সহকারে মুহাজিরদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন, এ পর্যন্ত মুহাজিরগণ মদিনাবাসীদের দানশীলতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল ছিলেন। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে শক্তিশালী ভ্রাতৃসুলভ অনুরাগ থাকলেও মুহম্মদ জানতেন যে মদিনাবাসীদের সাহায্য তাদের জীবিকার একটি অনিশ্চিত উপায়। কাজেই তিনি আনসারদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় লোকদের ডেকে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ইহুদীদের পরিত্যক্ত দ্রব্যসম্ভার তাদের গরিব মুহাজির ভাই যারা তাঁর সঙ্গে মক্কা ত্যাগ করেছিলেন তাদের মধ্যে বন্টন করায় তাদের কোনরূপ আপত্তি আছে কিনা। সমস্বরে তারা উত্তর করল : "ইহুদীদের দ্রব্যাদী আমাদের ভাইদের মধ্যে বিতরণ করুন, আমাদের একটি অংশ ও তাদেরকে প্রদান করুন, আমরা স্বেচ্ছায় সম্মতি দিচ্ছি।" ফলে হযরত মুহাজিরিন ও যে দু'জন আনসার খুব গরিব ছিলেন তাদের মধ্যে উক্ত সম্পদ ভাগ করে দিলেন।[২৬]

বণী নাজিরদের নির্বাসন কার্যকরী হয়েছিল চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে।[২৭] এই বছরের বাকী সময় ও পরবর্তী বছরের প্রথম দিক মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাযাবর গোত্রগুলোর আকস্মিক শত্রুতামূলক তৎপরতা দমন করতে এবং মদিনা রাষ্ট্রের উপর বিভিন্ন হত্যামূলক আক্রমণের শাস্তি দিতে ব্যয় হয়েছিল।[২৮]

এই সময় ধর্মের শত্রুরা মোটেই হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। মুসলমানদের বিরুদ্ধে পৌত্তলিকগণ দেশে-বিদেশে তাদের দূত পাঠিয়ে বিভিন্ন গোত্রকে উত্তেজিত করে তুলল।

www.amarboi.org

ইহুদীরা ছিল এ ব্যাপারে সবচেয়ে সক্রিয়। খয়বরের ইহুদীদের পিছনে কিছু নাজির গোত্রের লোক ছিল। সেখানকার লোকেরা প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত হয়ে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য অপর একটি লীগ গঠনের চেষ্টা করতে লাগল।[২৯] তাদের চেষ্টা আশাতিরিক্ত সফল হয়েছিল। একটি প্রবল আঁতাত শীঘ্রই গড়ে উঠল' দশ হাজার লোকের একটি বাহিনী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনার দিকে এগিয়ে যায়। তারা পথে কোন বাধার মুখোমুখি না হওয়ায় মদিনার কয়েক মাইলের মধ্যে ওহোদের দিকে আক্রমণের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক স্থানে তাঁবু স্থাপন করল। এই সেনাবাহিনীকে বাধা দেওয়ার জন্য মুসলমানেরা মাত্র তিন হাজার সৈন্য সংগ্রহ করতে পেরেছিল।[৩০] সংখ্যার স্বল্পতা এবং মদিনার অভ্যন্তরে মুনাফিকদের দলগত প্রতিবন্ধকতা দ্বারা বাধ্য হয়ে তারা রক্ষণাত্মক ভূমিকা নেয়, তারা মদিনার অরক্ষিত এলাকার চতুর্দিকে গভীর পরিখা খনন করে। নিরাপত্তার জন্য সুরক্ষিত গৃহসমূহে নারী ও শিশুদের রেখে পরিখার সম্মুকে সম্মুখে নগরের বাহিরে তারা তাবু স্থাপন করল। এ সময়ে সক্রিয় সাহায্যের প্রত্যাশা না করলেও অন্য দিকের নিরাপত্তার জন্য অন্ততঃপক্ষে তারা বণী কোরাইজাদের নিরপেক্ষতার উপর নির্ভর করেছিল। এই গোত্রের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অনেকগুলি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল, এবং মুসলমানদের যাবতীয় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য তারা সনদের দ্বারা চুক্তিবদ্ধ ছিল। যাহোক, এসব ইহুদীরা তাদের অঙ্গীকার অমান্য ক'রে কোরাইশদের দলে যোগদান করার জন্য প্ররোচিত হল। তাদের চুক্তি ভঙ্গের খবর মুহম্মদের কানে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সাদ্‌বিন্ মোয়াজ ও সাদ বিন উবাদাকে পাঠিয়ে তাঁদের অনুরোধ করলেন তাঁদের কর্তব্য পালন করতে ফিরে যাওয়ার জন্য। তারা যে উত্তর দিয়েছিল তা ছিল অতীব ঔদ্ধত্যপূর্ণ। "কে মুহম্মদ, কে সেই প্রেরিতপুরুষ যাকে আমরা মানবো? আমাদের ও তার মধ্যে কোন চুক্তি নেই।[৩১]

ইহুদীরা এলাকাটির সঙ্গে সুপরিচিত ছিল এবং তারা অবরোধকারীদেরকে মদিনার দুর্বল জায়গাগুলো দেখিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে বাস্তবিক সাহায্য করতে পারত। সে কারণে মুসলমানদের মধ্যে ভীষণ আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। মদিনার অভ্যন্তরের শত্রুভাবাপন্ন লোকেরা বিপদের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছিল।[৩২]

পৌত্তলিক ও ইহুদীরা মুসলমানদেরকে সম্মুখ সমরে টেনে আনতে ব্যর্থ হয়ে কিংবা ইহুদীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে মদিনা নগরীকে চমৎকৃত করে দিতে না পেরে তারা নিয়মিত আক্রমণ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর হল। অবরোধ বিশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। মরুভূমির অস্থির গোত্রসমূহ কোরাইশ ও তাদের মিত্রদের সাথে জুটি বেঁধেছিল ও সহজ শিকারের জন্য প্রত্যাশা করছিল: কিন্তু বিলম্বিত অভিযানের দরুন তারা অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। এই সংকটময় মুহূর্তে অবরোধকারীদলের নেতারা পরিখা পার হয়ে ছোট্ট মুসলিম বাহিনীর উপর নিপতিত হওয়ার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকল। কিন্তু হযরতের অতন্দ্র প্রহরার ফলে তাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবরোধকারী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সবই মনে হচ্ছিল সম্মিলিত হয়ে আসছে; তদের ঘোড়াগুলো দ্রুত মরে যাচ্ছিল

www.amarboi.org

ও রসদও ফুরিয়ে আসছিল। তাদের মধ্যে মতপার্থক্য ঘনীভূত হয়ে আসছিল; দূরদর্শী মুসলমান প্রধানগণ অতুলনীয় বিজ্ঞতা সহকারে এই মতপার্থক্যকে প্রকৃত বিভেদে ফেনায়িত করে তুলেছিলেন। অকস্মাৎ এই বিশাল সমাবেশ যা মুসলমানদের মনে অনিবার্য ধ্বংসের ভয় সঞ্চারিত করেছিল তা শূন্যে মিলিয়ে গেল। রাত্রির অন্ধকারে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে তাদের তাবু উড়ে গেল, আলো নিভে গেল; আবু সুফিয়ান ও তাঁর দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনীর অধিকাংশ পালিয়ে গেল; অবশিষ্ট সৈন্য বণী কোরাইজা গোত্রের শরণ নিল।[৩৩] মুহম্মদ তাঁর শিষ্যদেরকে শত্রুদের অন্তর্ধানের পূর্বাভাষ রাত্রেই দিয়েছিলেন। প্রভাত হলেই তারা দেখতে পেলেন যে হযরতের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে। মুসলমানেরা আনন্দে শহরে ফিরে গেলেন।[৩৪]

৫ হিজরি ২৮শে ফেব্রুয়ারি; ৬২৬ খ্রিঃ ২৪শে মার্চ ৬২৭ খ্রিঃ

কিন্তু মুসলমানদের মতে বণী কোরাইজা গোত্র যতদিন মদিনা শহরের সন্নিকটে বিপজ্জনক নৈকট্যে ছিল ততদিন বিজয় আদৌ আসেনি। অঙ্গীকৃত চুক্তি থাকলেও তারা বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দিল এবং এক সময়ে তাদের দিক থেকে তারা মদিনাবাসীদেরকে প্রায় হতবাক করে দিল—এটা এমন একটি ঘটনা যা সফল হলে বিশ্বাসীগণ সাধারণভাবে নির্মূল হতেন। কাজেই মুসলমানগণ এই বিশ্বাসঘাতকতার ব্যাখ্যা দাবী করা তাদের কর্তব্য হিসেবে মনে করেছিলেন। এই দাবী বণী কোরাইজা গোত্র স্পর্ধার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে ইহুদীদের অবরোধ করা হল এবং স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হল। তারা শুধু একটি শর্ত দিয়েছিল যে আউষ গোত্রের প্রধান সাদ ইবনে মুয়াজের বিবেচনার উপর তাদের শাস্তি নির্ভর করতে হবে। এই লোকটি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা; আক্রমণের ফলে তিনি আহত হন এবং আঘাতের ফলে পরদিন মারা যান। তাদের বিশ্বাসঘাতকতামূলক আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি রায় দেন যে এই গোত্রের যোদ্ধাদেরকে প্রাণদণ্ড দিতে হবে এবং শিশু ও স্ত্রীলোকদেরকে মুসলমানদের দাসদাসী হতে হবে। এই দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী করা হয়েছিল।[৩৫] লেনপুল বলেন, "এই নির্মম রক্তাক্ত দণ্ডাজ্ঞা আলবিজেনবাসীদের বিরুদ্ধে বিশপ সেনাধ্যক্ষ কিংবা অগাস্তাইন যুগের অতিনৈতিকতা নির্দেশক কার্যাবলীর যোগ্য, কিন্তু এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এসব লোকের অপরাধ অবরোধকালে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বড় ধরনের রাজদ্রোহিতা; কিভাবে ওয়েলিংটন মরুবাসী ও লুণ্ঠনকারীদের হত্যা করে বৃক্ষে টাঙিয়ে রাখতেন যা থেকে তার অভিযানের পথ নির্দেশ করা হত সে-সম্পর্কে যারা অধ্যয়ন করেছেন তাদের পক্ষে একটি বিশ্বাসঘাতক গোত্রের সংক্ষিপ্ত দণ্ডাজ্ঞায় বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।"[৩৬]

বিভিন্ন ইহুদী গোত্রের প্রতি আরোপিত শাস্তি হযরতের খ্রিস্টান জীবনীকার মূয়ির, স্প্রেনজার, ওয়েল ও ওসবোর্ণকে আক্রমণের একটি ভিত্তি দিয়েছিল। তাদের তুলনায় বণী কাইনুকা ও বণী নাজিরদের উপর আরোপিত শাস্তি অনেক লঘু ছিল। শুধু বণী কোরাইজা গোত্রের প্রতি নির্মম আচরণ দেখানো হয়েছিল।

www.amarboi.org

মানুষের স্বভাব এমনিভাবে গঠিত যে কোন ব্যক্তির কার্যাবলী যতই অপরাধমূলক হোক না কেন, যখন তার সংগে নির্মম ব্যবহার করা হয় যা আমাদের কাছে নিষ্ঠুর বলে মনে হয় তখন অনুভূতির স্বাভাবিক আকস্মিক ও সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে, আমাদের মনে ন্যায়বিচারের অনুভূতির স্থানে করুণা অনুভূত হয়। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কোরাইজা গোত্রের উপর দেওয়া দণ্ডাজ্ঞা ছিল নিঃসন্দেহে নির্মম। আমরা যতই দুঃখ করি না কেন যে এই অভাগা লোকদের নিয়তি যদিও তাদের বিশেষ অনুরোধে একজন ক্রোধোন্মত্ত সৈনিকের হাতে পড়েছিল; আমরা যতই দুঃখ করি না কেন যে এই ব্যক্তির দণ্ডাজ্ঞা যথাযথভাবেই প্রতিপালিত হল; তত্রাচ করুণার আবেগে আমরা ন্যায়বিচার ও দোষ-বহতার কঠোর প্রশ্ন অবশ্যই উপেক্ষা করতে পারি না। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যে অপরাধে তারা অভিযুক্ত—তাদের বিশ্বাসঘাতকতা, তাদের প্রকাশ্য শত্রুতা, তাদের চুক্তিভঙ্গ যে চুক্তিতে তারা পবিত্র শর্তে আবদ্ধ ছিল। এছাড়া জিহোভার উপাসক হিসেবে পৌত্তলিক আরবদেরকে তাদের পৌত্তলিকতার অনুশীলনে যে প্রলোভন দেখিয়েছিল সেটাও সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়া যায় না। খ্রিস্টান নীতিবিদের সঙ্গে কোন কোন মুসলমান হয়ত স্বাভাবিকভাবেই বলতে চাইবেন : "অদ্যাপি নির্দোষ রয়েছে এমন ব্যক্তিদেরকে নিজেদের দলে ভিড়তে প্রলুব্ধ করার চেয়ে দুষ্টদের বহুবার মৃত্যুবরণ করা উত্তম।"[৩৭]

এই সব মুসলমান খ্রিস্টান নীতিবিদদের সঙ্গে মাত্র একটি শব্দ পরিবর্তন করে বলতে পারতেন : "আমাদের ভাগ্য আর পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ভাগ্য এ সময়ে কি হতে পারত যদি আরবদের তরবারী[৩৮] অধিকতর মিতব্যয়িতার সঙ্গে তার কার্য সম্পাদন করত, আসুন শুধু সে সম্পর্কে ভাবা যাক। আরবদের তরবারী রক্তপাতহীন দণ্ডাজ্ঞায় কিয়ামত পর্যন্ত জগতের সকল দেশের প্রতি করুণার কাজ করেছে।" যদি খ্রিস্টানদের যুক্তি ঠিক হয় ও অমানুষিক না হয়, তবে মুসলমানদের যুক্তিও অন্যথা হতে পারে না। যাহোক, অন্যান্য মুসলমানেরা বন্দী কোরাইজাদের উপর নিপতিত ভয়াবহ দণ্ডাজ্ঞা একইভাবে দেখতে পারেন, যেমন কার্লাইল দ্রোঘেদার আইরিশ অধিবাসীদের এলোপাথাড়ি ধ্বংসের জন্য ক্রমওয়েল যে নির্দেশ জারি করেছিলেন তা দেখেন।" একজন সশস্ত্র সৈনিক যিনি ন্যায়পরায়ণ আল্লাহর সৈনিক হিসেবে আত্মসচেতন—যে আত্মসচেতনতা সকল সৈনিক, সকল মানুষের সব সময় থাকা উচিত—সশস্ত্র সৈনিক মৃত্যুর মতো ভয়াবহ ধ্বংসের মতো প্রচণ্ড—আল্লাহর শত্রুদের উপর তিনি আল্লাহর বিচার কার্যকরী করে থাকেন।"

যাহোক, ইহুদীদের শাস্তির বিষয়টি আমরা এ দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চাই না। সে যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি যেভাবে যুদ্ধ বুঝত তার নিয়মাবলীর আলোকেই আমরা এই যুদ্ধ বিচার করব : "সে যুগে যুদ্ধের গৃহীত প্রথাসমূহের সঠিক প্রয়োগ"।[৩৯] যদি সাদের বিচার ব্যতিরেকেই তাদের প্রতি দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হত, সে ক্ষেত্রেও তদানীন্তন যুদ্ধনীতির সঙ্গেও তা সামঞ্জস্যপূর্ণ হত। কিন্তু তারা নিজেরাই সাদকে একমাত্র সালিস ও বিচারক মনোনীত করেছিল; তারা জানত যে তার বিচার আদৌ গৃহীত ধারণার বিপরীত

www.amarboi.org

নয়। কাজেই তারা অনুযোগ করেনি। তারা এ কথাও জানত যে যদি তারা জিতত তবে তারা কোন বিবেচনা ছাড়াই শত্রু নিধন করত। লোকেরা রাজা দাউসের ধ্বংস বিচার করে "তাঁর যুগের জ্ঞানালোকে"।[৪০] আদিম কালে খ্রিস্টানদের দ্বারা যে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তা বিশেষ "আলোকে" বিচার করা হয়ে থাকে। কেন আদি যুগের মুসলমানদের রক্ষণাত্মক যুদ্ধ একই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখা হবে না? যে কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা হোক না কেন কুসংস্কারমুক্ত মন[৪১] বণী কোরইজাদের দণ্ডাজ্ঞায় হযরতের প্রতি কোন দোষ সম্ভবত আরোপিত হত না।

যাদেরকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল তাদের সংখ্যা ২০০ কিংবা ২৫০ জনের বেশি নয়।

জীবিত ইহুদীদের বন্টনের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে রায়হানা নাম্নী এক ইহুদী তরুণীকে হযরতের ভাগে দেওয়া হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন যে তাকে আগে থেকেই আলাদা করে রাখা হয়েছিল। খ্রিষ্টান লেখকগণ মুহম্মদকে আক্রমণ করার জন্য কোন সম্ভাব্য ছুঁতা পেলেই তাঁর সমালোচনা করেন। এই গল্পকে মূলধন করতেও তারা বিরত থাকেনি। দাসত্বের প্রশ্নটি পরীক্ষার জন্য পরবর্তী একটি অধ্যায় রেখে এখানে আমরা শুধু এই মন্তব্য করব যে রায়হানার বন্টনের ব্যাপারটি সত্য হলেও তা আধুনিক আক্রমণের কোন ভিত্তি প্রদান করে না, কেননা এটা সে যুগের স্বীকৃত যুদ্ধনীতির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। রায়হানার পক্ষে হযরতের স্ত্রী হওয়া সম্পর্কীয় গল্পটি বানোয়াট, কেননা এই ঘটনার পর সে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে অন্তর্হিত হয়েছে এবং তার সম্পর্কে আমরা আর কিছু জানতে পারি নাই, পক্ষান্তরে অন্যান্যদের সম্পর্কে আমরা পূর্ণ ও পরিস্থিতি-সংক্রান্ত বিবরণ জানি।

পাদটীকা

---

১. খ্রিস্টধর্মাবলম্বীগণ কনস্তানতাইন কর্তৃক মেক্সেনটিয়াসের পরাজয় (৩২১ খ্রি.)-কে তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠতম সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। গিবনের গ্রন্থের ২য় খণ্ড, ২০তম অধ্যায়ে, যেখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও ইতিহাস সম্মিলিত হয়েছে তা নির্দেশ করে কিভাবে খ্রিস্টধর্মের সাফল্য ঐ ঘটনা থেকেই ধরা হয়।

২. খেজুর বা চিনি সহযোগে সবুজ শস্য পিষে ও সেঁকে যে আহার্য প্রস্তুত হয় তার প্রাচীন ও আধুনিক আরবি নাম 'সয়িক'। দীর্ঘ ভ্রমণকালে যখন রান্না-বান্না করা সম্ভব হয় না তখন এই খাদ্য ভক্ষণ করা হয়।

৩. যেখানে এই ঘটনাটি ঘটেছিল এখন সেই স্থানের নাম ধারণ করেছে 'সুয়ায়কা'—এই স্থানটি মদিনার দক্ষিণ-পশ্চিমে কয়েক ঘণ্টার রাস্তা।

৪. এই বছরের শেষ মাসে ওসমান বিন মাহ্‌জুনের মৃত্যু ঘটে এবং হযরতের কন্যা ফাতিমার সঙ্গে আবু তালিবের পুত্র আলীর বিবাহ হয়।
ওসমান ছিলেন প্রাথমিক পর্যায়ের একজন বিশ্বাসী এবং মুহাযিরদের মধ্যে তিনি প্রথম, যিনি মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন আর মদিনার উপকণ্ঠে জান্নাতুল বাকীতে সমাহিত হন।

www.amarboi.org

এখানে বহু বিখ্যাত ও সাধু পুরুষদের সমাধি বিদ্যমান এবং এখনও মুসলমানেরা সসম্মানে তাদের মাজার জিয়ারত করেন।

বদর অভিযানের কয়েকদিন পূর্বে আলীর সঙ্গে ফাতিমার বাগদান পর্ব সমাপ্ত হয়; মাত্র তিন মাস পরে বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। তখন আলীর বয়স একুশ বছর, আর ফাতিমার বয়স পনের।

৫. বার্টন এরূপে স্থানটির বর্ণনা করেছেন : "এই স্থানটি ইসলামের ইতিহাসে এত অধিক প্রসিদ্ধ, এ ওহোদ পর্বতের দক্ষিণ পাদদেশের সন্নিকটবর্তী তাক-তাক করে-সাজানো একখণ্ড জমিন। পৌত্তলিকদের সৈন্যবাহিনীর সেনাধ্যক্ষ আবু সুফিয়ান ও তার মূর্তিসমূহ মধ্যে রেখে নতুন চন্দ্রাকার অগ্রসর হল। এই জায়গা আল্ মদিনা থেকে উত্তর দিকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। দর্শকরা এখানে যা দেখতে পান তা হল শক্ত নুড়িযুক্ত মাটি। বিভিন্ন বর্ণের ছোট ছোট গ্রানাইড পাথরের স্তূপ, লাল বেলে পাথর ও শক্ত পাথরের টুকরা যা দ্বারা স্থানটি আবৃত। এসব দিয়ে যেসব জায়গায় শহীদগণ শাহাদাৎ বরণ করেছিলেন ও সমাহিত হয়েছিলেন তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দিক দিয়ে দেখলে এই পবিত্র পর্বতটির দর্শনে ভীতির উদ্রেক করে। এর বিবর্ণ ও এবড়ো-খেবড়ো ধার সমতল ভূমি থেকে লৌহের পিণ্ডের মতো উঠেছে এবং এর ফাটলের মধ্যে মুসলিম সৈন্যরা চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছিলেন, যখন তীরন্দাজগণ হযরতের নির্দেশ অমান্য করে শত্রুদের পরিত্যক্ত দ্রব্যসম্ভার লুণ্ঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এ অবস্থায় খালেদ বিন ওয়ালিদকে পিছন থেকে মুহম্মদের সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহায্য করেছিল। পর্বত-প্রাচীরের এটাই ছিল একমাত্র সুড়ঙ্গ পথ। তীব্র রৌদ্রতাপের ফলে এ স্থানে একটা সবুজ লতাগুল্ম বা গাছও জন্মে না, এদিকে একটা পাখি বা পশুও আসে না। উপরে উজ্জ্বল নীলাকাশ বৃক্ষলতাহীন প্রান্তরের উপর রৌদ্র ঝরায়, তাতে স্থানটি অধিকতর বীভৎস রূপ ধারণ করে।"—বার্টনের 'পিলগ্রিমেজ টু মেক্কা', ২য় খণ্ড পৃ. ২৩৬, ২৩৭।

৬. তাদের রণসংগীতের উদ্ধৃতি ইবনুল আসির তাঁর গ্রন্থের ২য় খণ্ডে, ১১৮ পৃষ্ঠায় দিয়েছেন। "হে আবুদ্দারের সন্তানগণ, সাহস সঞ্চয় কর। সাহস সঞ্চয় কর। হে নারীকুলের রক্ষক, তোমরা তোমাদের তরবারীর সাহায্যে অভীষ্ট লক্ষ্যে আঘাত কর।" অপর রণসংগীত এরূপ : "আমরা প্রভাতী তারকার কন্যা, আমরা সিল্কের কুশনের উপর দিয়ে চলি; সাহসের সঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করি এবং আমরা তোমাদেরকে বাহুর মধ্যে আলিঙ্গন করি। যদি পলায়ন কর তবে আমরা তোমাদের পরিত্যাগ করব, ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করব।"

৭. এই অবাধ্যতার কথা কোরআনের ৩য় আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

৮. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৯; আল্ হালাবীর 'ইনসানুল আয়ুন' ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৯।

৯. তবারী বলেন যে পৌত্তলিকদের পতাকাধারী বীরসুলভ শৌর্যের অধিকারী তালহা আলীর সম্মুখে হাজির হয়ে তার তরবারী ভাজতে থাকে ও আলীকে অগ্রাহ্য করে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকে, "ওহে মুসলমানগণ, তোমরা বল যে আমাদের মৃতেরা নরকে যাবে এবং তোমাদের মৃতেরা স্বর্গে যাবে : দেখি আমি তোমাদেরকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিতে পারি কিনা।" উত্তরে আলী বললেন, "তবে তাই হোক।" তাঁরা যুদ্ধ করলেন। আলীর আঘাতে তালহা ভূপাতিত হল। তালহা চিৎকার করে বলল, "হে আমার চচার পুত্র, করুণা চাই।" আলী বললেন, "তাই হোক, তুমি নরকাগ্নির যোগ্য নও।"—৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫।

www.amarboi.org

১০. ইনবুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৪ এবং আবুল ফিদা, পৃ. ৪৪। তাঁরা উল্লেখ করেন যে ৭ই শওয়াল ওহোদের যুদ্ধ হয়েছিল। তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১, ৮ই শওয়াল এবং ইবনে হিশাম ৫ই শওয়ালে ওহোদ যুদ্ধের দিন বলে উল্লেখ করেছেন; আরও অনেকে ১১ই শওয়াল এই দিন ধার্য করেন। সি. দ্য পার্সিভেল ১১ই শওয়ালকে ওহোদ যুদ্ধের সঠিক দিন বলে গণনা করেছেন, কেননা সকল ঐতিহাসিকের মতে দিনটি ছিল শনিবার এবং ১১ই শওয়াল (২৬শে জানুয়ারি) শনিবারে পড়েছিল।—'হিস্ট্রী দাস অ্যারাবস', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৬ টীকা।

১১. ইবনে হিশাম পৃ. ৫৮০; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৫, ১১৬; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬। আল্ হালাবী 'ইনসামুল য়ুয়ান' ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪২।

১২. কোরআনের সু-১৭ আ. ১২৭; ইবনে হিশাম পৃ. ৫৮৪, ৫৮৫; জামাকশারী (কাশ্‌শাফ), মিশর সংস্করণ, পৃ. ৪৪৬।

১৩. ইহুদীরা তাদের বন্দীদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারত, নিহতদের দেহ বর্বরভাবে বিকৃত করত। গ্রীক, রোমান ও পারসিকগণ একই রূপ বর্বর প্রথা অনুশীলন করত, এই ভয়াবহ অনুশীলনের ক্ষেত্রে খ্রিস্টানদের মধ্যেও কোন অগ্রগতির লক্ষণ দেখা যায়নি, কেননা ষষ্ঠদশ শতাব্দীতেও আমরা ভয়াবহ বিকৃতির ঘটনা দেখতে পাই।

১৪. ইবনে হিশাম পৃ. ৫৯০। কোরআন সু-৩ আ. ১৬৭।

১৫. এ বিষয়ে অধ্যায়—৪-এ আলোচিত হয়েছে।

১৬. ইবনুল আসির ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩; তাবারী ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩০। মূয়ির ও স্প্রেনজার এ বিষয়ের এ অংশ ছাটাই করেছেন। স্যার উইলিয়াম মূয়ির এম. সি. দ্য পার্সিভেলের উক্তি—সন্ধির দ্বারা ইহুদীগণও দিয়াত বা মৃত্যুপণ দিতে বাধ্য—গ্রহণের জন্য কোন যৌক্তিকতা দেখতে পান না। তিনি তাবারীর ৩য় খণ্ড পৃ. ৫০ (জাটেনবার্গের অনুবাদ) দেখলেই বিষয়টি পেয়ে যেতেন। ইবনুল আসির (৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩) এর গ্রন্থেও পাওয়া যেত।

১৭. অনগ্রসর জাতিসমূহের মধ্যে কবিগোষ্ঠী যে প্রভাব বিস্তার করত তার একটি উদাহরণ ওহোদ যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত একটি ঘটনার মাধ্যমে প্রদান করা যায়। এই ঘটনাবহুল অভিযানের প্রস্তুতিকালে কোরাইশরা আবু উজ্জা নামক একজন কবিকে মরুভূমির বিভিন্ন গোত্রের কাছে যেয়ে তার গান ও কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে উদ্দীপিত করতে এবং মুহম্মদ ও তাঁর শিষ্যদের ধ্বংস করার জন্য মক্কাবাসীদের গঠিত আঁতাতে যোগদান করার জন্য তাদেরকে প্ররোচিত করতে অনুরোধ করেছিল। বদরের যুদ্ধে মুসলমানেরা এই লোকটিকে বন্দী করেছিল, কিন্তু মুহম্মদ তাকে বিনাপণে মুক্তি দিয়েছিলেন এই অঙ্গীকারের উপর যে, সে আর কখনো মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে না। তবুও সে তার কথা রাখেনি এবং বিভিন্ন গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে তার কবিতার দ্বারা তাদেরকে অস্ত্রধারণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং এ কথা বলা হয়ে থাকে যে, সে এ কাজে খুবই সফল হয়েছিল। ওহোদ যুদ্ধের পর সে পুনরায় বন্দী হয়েছিল ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। ইবনে হিশাম, পৃ. ৫৯১।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

১৯. আমাদের খ্রিস্টান ঐতিহাসিকরা ভুলে যান যে "জ্ঞানী" সোলন তাঁর ক্ষুদ্র শহরটির নিরাপত্তার জন্য সব এথেন্সবাসীর উপর অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছিলেন। আইনের বলবৎকারী হওয়ার জন্য ও দলাদলিতে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য, দাঙ্গায় যে কোন দলে অংশ

www.amarboi.org

গ্রহণ করার জন্য। তারা একথাও ভুলে যান যে খ্রিস্টান ইংলণ্ডেও "একজন ডাকাত বা আইন বহির্ভূত লোককে" অনুসরণ করা ও হত্যা করার অধিকার দেওয়া হয়।

২০. তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮।

২১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৫৪৩। তাবারী কাইনুকা গোত্রের উপর সামান্য পরিবর্তিত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। সকল ঐতিহাসিক একমত যে তাদের উক্তি ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও আপত্তিকর। আমি বুঝতে পারি না গিবন কোত্থেকে তাদের বিনীত জবাব পেয়েছিলেন যা তিনি তাদের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন।

২২. যদি মুহম্মদ বা তাঁর শিষ্যগণ দেখাত যে তাঁরা ইহুদীদের অভিসন্ধি বুঝে ফেলেছে তবে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে মরিয়া হয়ে উঠত এবং ব্যাপারটি সংকটজনক হয়ে দাঁড়াত। তাই মুহম্মদ তাঁর শিষ্যদের রেখে নিজেই চলে গেলেন। এতে ইহুদীরা ভাবল যে তিনি বেশি দূরে যাননি এবং তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন।

২৩. তাবারী এগার দিন বলেছেন।—৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪।

২৪. ইবনে হিশাম, পৃ. ৬৫৩, ৬৫৫; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩, আবুল ফিদা পৃ. ৪৯।

২৫. কোরআন, সু. ৫৯, আ. ৫।

২৬. ইবনে হিশাম, পৃ. ৬৫৪; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৩; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪। এ সময় থেকে একটি মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, সে সম্পদ প্রকৃত যুদ্ধের মাধ্যমে করায়ত্ত হয় নি তা রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রপ্রধানের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এ সম্পদের ব্যবহার তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। (এম. কোয়েবার 'ড্রয়িট মুসলমান' পৃ. ৩৫৭') কোরআনের সুরা. ৫৯-তে বণী নাজির গোত্রের নির্বাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহের প্রায় সবিস্তারেই বর্ণনা করা হয়েছে।

২৭. ইবনে হিশামের মতানুসারে; পৃ. ৬৩৩ এবং আবুল ফিদা পৃ. ৪৯; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৫। তাবারী বলেন যে, মাসটি ছিল সফর।

২৮. এই অভিযান দুমাতুল জান্দালের স্থানটি আবুল ফিদার মতে দামেস্কের দক্ষিণে সাতদিনের পথ খ্রিস্টান আরবদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়েছিল। তারা সিরিয়াগামী মদিনার বাণিজ্যিক কাফেলা বন্ধ করেছিল এবং মদিনা লুণ্ঠনের ভয় দেখিয়েছিল। মুসলমানদের আগমনের কথা শুনে লুণ্ঠনকারীরা পলায়ন করেছিল। একজন প্রতিবেশি দলপতির সঙ্গে একটি সন্ধি সম্পাদন করে মুহম্মদ মদিনায় ফিরে এলেম এবং তাকে মদিনার সীমানায় গোচারণের অনুমতি প্রদান করলেন।—সি. দ্য পার্সিভেল, ৩য় খণ্ড পৃ. ১২৯; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০।

২৯. ইবনে হিশাম, পৃ. ৯৬৩, ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৩৯; তাবারী; ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬০, ৬১।

৩০. ইবনে হিশাম, পৃ. ৬৭৮।

৩১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৬৭৫; মুয়ির ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫৯।

৩২. কোরআনের সুরা আহজাব (৩৩ সংখ্যা)-এ সমগ্র পরিস্থিতি এত সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে যে তার দু'একটা (আয়াতের উদ্ধৃতি না দিয়ে পারছি না। "ওরা যখন তোমাদের উপর চড়াও হয়ে এল—উপর থেকে, তোমাদের নিচের দিক থেকে, আর যখন তোমাদের চোখ বিস্ফোরিত অবস্থায় ছিল আর যখন তোমাদের কলিজা মুখে এসে যাচ্ছিল আর তোমরা আল্লাহপাক সম্পর্কে নানা-রকম জল্পনা-কল্পনা করে যাচ্ছিলে। তখন কিন্তু সেখানে মুমিন মুসলমানদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছে, আর কঠিন ভূমিকম্পে ঘিরে ধরা হয়েছে। আর

www.amarboi.org

মুনাফিকরা আর যাদের মনে ব্যাধি রয়েছে তারা বলতে লাগল: আমাদের সাথে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল ত শুধু ধোঁকা দেবার জন্য ওয়াদা করে রেখেছেন (১০—১২)।

৩৩. ইবনে হিশাম, পৃ. ৬৮৩; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০।

৩৪. ইসলামের ইতিহাসে এই যুদ্ধ "পরিখার যুদ্ধ" নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

৩৫. ইবনে হিশাম, পৃ. ৬৮৬-৬৯০; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড পৃ. ১৪১; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৬৮।

৩৬. 'সিলেকশান ফ্রম দি হোলি কোরআন' গ্রন্থের সূচনা পৃ. LXV.

৩৭. আর্ণল্ডের 'সারমন' ৪র্থ 'সারমন'—"ইসরাইলদের যুদ্ধবিগ্রহ" পৃ. ৩৫, ৩৬।

৩৮. অবশ্য আসলে ইসরাইল।

৩৯. গ্রোটের হিস্ট্রী অব গ্রীস ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৯৯।

৪০. ২ সামু. ৮, ২ : তিনি অধিকতর হিংস্রতা সহকারে বিজিত অ্যামোনাইটদের সঙ্গে আচরণ করেছিলেন, তাদের কাউকে বিদে, কুড়াল ও করাত দিয়ে চেরা হয়েছিল; আর অন্যান্যদেরকে ইটের চুল্লিতে ঝলসিয়ে মারা হয়েছিল।" (XII,৩০) মৈয়ত্তাল্যাণ্ড, 'জিউয়িশ লিটারেচার এন্ড মডার্ন এডুকেশান' পৃ. ২১। তুলনীয়—স্টেনলীর লেকচারস অন্ জিউয়িশ চার্চ' ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯।

৪১. আমি ইউরোপীয়দের মধ্যে শুধু এম. বার্থেলিমি সেন্ট হিলেয়ার, মি. জনসন এবং মি. স্টেনলী লেনুপলের নাম স্মরণ করতে পারি যারা কুসংস্কার দ্বারা চালিত হননি।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ অধ্যায়
মুহম্মদের ক্ষমাশীলতা

"তিনি আল্লাহর পথে ডেকেছিলেন; যারা তাঁকে আঁকড়ে ধরেছিলেন তারা এমনভাবে ধরেছিলেন যা কখনো বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়।"

ইহুদী ও পৌত্তলিকরা মদিনার নতুন প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার ইচ্ছায় যে শক্তিশালী সম্মেলন গড়ে তুলেছিল তা এতটুকুও সফল হয়নি, অবশ্য মুসলমানেরা বলতে পারেন যে অলৌকিকভাবে তা হয়েছিল।[১] কিন্তু মরুভূমির আশপাশের বর্বর ও দুর্ধর্ষ গোত্রগুলি নরহত্যাসহ মদিনার রাজ্যগুলো লুঠ করছিল। মদিনা রাষ্ট্রের অস্তিত্বের খাতিরে তাদের দমনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। বেশকিছু অভিযান লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু মরুভূমির পিচ্ছিল সন্তানেরা সাধারণভাবে মুসলমানদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে সচেষ্ট ছিল। বণী লিহইয়ানারা মুহম্মদকে তাদের মধ্যে ইসলামের নীতি প্রচারের জন্য কয়েকজন শিষ্য পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানিয়েছিল। যখন এসব ধর্মপ্রচারক সেখানে পৌঁছল তখন তারা কয়েকজনকে হত্যা করল এবং কাবীদেরকে মক্কাবাসীদের কাছে বিক্রয় করল। এ পর্যন্ত এদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। কিন্তু এখন এই অপরাধের প্রতিশোধ নেওয়ার পরিস্থিতি এল। এই বছরের জমাদিউল আউয়াল মাসে হযরতের নেতৃত্বে একদল সৈন্য বণী লেহইয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। যথাসময়ে হযরতের আগমনের সংবাদ পেয়ে লুণ্ঠনকারীরা পর্বতে পালায় এবং মুসলমানেরা তাদের উদ্দেশ্য অর্জন না করেই মদিনায় ফিরে আসে।[২]

৬ হিজরি = ২৩শে

এপ্রিল ৬২৭ খ্রি.—১২ই

এপ্রিল ৬২৮খ্রি.

এই ঘটনা ঘটনার মাত্র কয়েকদিন পরে গাতাফান (খায়েল গাতাফান)-এর এক যাযাবার শাখা বণী ফিজারার প্রধান হঠাৎ মদিনার শহরতলী এলাকায় আক্রমণ করে উটের রাখালকে হত্যা করে তার স্ত্রীসহ অনেক উট নিয়ে যায়। মুসলমানেরা তাদের পিছু

www.amarboi.org

নিয়ে অল্প কয়েকটি উট উদ্ধার করেছিল, কিন্তু তারা অপহৃত গবাদীর এক বৃহদাংশ নিয়ে মরুভূমির মধ্যে পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

প্রায় এই সময়ে হযরত সিনাই পর্বতের নিকটবর্তী সেন্ট ক্যাথারিন মঠের সন্ন্যাসীদের ও সকল খ্রিস্টানদের একটি সনদ প্রদান করেছিলেন। জগতের ইতিহাসে এই সনদ সংস্কৃত সহিষ্ণুতার এক মহত্তম কীর্তিস্তম্ভ হিসেবে যথার্থই বিবেচিত হয়েছে। ইসলামের ঐতিহাসিকগণ এই স্মরণীয় দলিলটি বিশ্বস্তার সঙ্গে সংরক্ষণ করেছেন। এই দলিল মতবাদের বিস্ময়কর প্রশস্ততা ও ধারণার উদারতার নির্দেশ করে। হযরতের কাছ থেকে এর মাধ্যমে খ্রিস্টান সম্প্রদায় যে সব সুযোগ, সুবিধা ও স্বাধীনতা পেয়েছিল তা তারা তাদের স্বধর্মী নৃপতিদের শাসনাধীনেও পায়নি। আর তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, এই সনদের মধ্যে যেসব বিষয় নির্দেশ করা হয়েছে তা যে মুসলমান লঙ্ঘন ও নিন্দা করবে সে আল্লাহর নির্দেশনামার খেলাপকারী ও তাঁর ধর্মের অবহেলাকারী বলে বিবেচিত হবে। তিনি খ্রিস্টান ও তাদের গির্জা, ধর্মযাজকদের নিরাপত্তা ও তাদের বাসগৃহ রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদের প্রতি কড়া নির্দেশ করা হয় দিয়েছিলেন। সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছিল যেন খ্রিস্টানদেরকে অন্যায়ভাবে কর দিতে না হয়; কোন বিশপ তার নিজ এলাকা থেকে বিতাড়িত না হন; কোন খ্রিস্টানকে যেন নিজ ধর্ম ত্যাগ করতে বাধ্য না করা হয়; কোন সন্ন্যাসীকে যেন মঠ থেকে বহিষ্কৃত না করা হয়; সকল তীর্থযাত্রী যেন তীর্থ দর্শনে বঞ্চিত না হন। মুসলমানদের মসজিদ কিংবা তাদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য যেন খ্রিস্টানদের কোন গির্জা ধ্বংস করা না হয়। মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহিত খ্রিষ্টান মহিলাদের স্বীয় ধর্ম পালনের পূর্ণ অধিকার থাকবে, এবং সে বিষয়ে তাদের প্রতি কোনরূপ জুলুম বা উৎপাত করা চলবে না। যদি খ্রিষ্টানরা তাদের গির্জা বা মঠ সংস্কারের জন্য কিংবা তাদের ধর্মসংক্রান্ত কোন ব্যাপারে সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে তবে সাহায্য করতে হবে। এ কাজ তাদের ধর্মে অংশগ্রহণের সামিল বিবেচিত হবে না, এ শুধু তাদের প্রয়োজনে সাহায্য করা এবং হযরতের অধ্যাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল কর্তৃক তাদের অনুকূলে দেয়া হয়েছে। যদি মুসলমানেরা মদিনা বহির্ভূত খ্রিস্টানদের সঙ্গে শত্রুতায় অবতীর্ণ হয় তবে দেশের খ্রিস্টান অধিবাসীদের প্রতি তাদের ধর্মের জন্য অবমাননা করা চলবে না। কোন মুসলমান খ্রিস্টানদের প্রতি অন্যথা আচরণ করলে সে হযরতের অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে।

মানুষ সবসময়ই সেই ব্যক্তিকে মহৎ মনে করে যিনি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমতার স্বর্গীয় নীতির শুধু প্রচার করেন না বরং তার অনুশীলন করেন। রাষ্ট্রপ্রধান ও জনগণের জীবন ও সম্পদের অভিভাবক হিসেবে মুহম্মদ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতেন। কিন্তু রাসুল মুহম্মদ, ধর্মপ্রচারক মুহম্মদ ছিলেন তাঁর নিকৃষ্টতম শত্রুর প্রতিও কোমল হৃদয় ও দয়ালু। তাঁর চরিত্রে মানুষের চিন্তায় অধিগত শ্রেষ্ঠ গুণ—ন্যায়-বিচার ও করুণার মিলন ঘটেছিল।

www.amarboi.org

মুসলমানেরা মরুভূমির অবাধ্য আরবদের বিরুদ্ধে অভিযানে হানিফা গোত্রের প্রধান সুমামা বিন উসালকে বন্দী করেছিল। তাকে মদিনায় আনা হল; সেখানে সে হযরতের দয়ার্দ্র ব্যবহারে এতই অভিভূত হয়ে পড়ল যে সে দুশমন থেকে হযরতের সবচেয়ে অনুগত ভক্তে পরিণত হল। নিজের লোকদের কাছে ফিরে গিয়ে সে মক্কায় খাদ্যদ্রব্য পাঠানো বন্ধ করে দিল। সুমামার এই বাণিজ্যিক বিরতি মক্কাবাসীদেরকে নাজুক পরিস্থিতিতে ঠেলে দিল। হুনাফিয়াদেরকে তাদের সিদ্ধান্ত থেকে বিন্দুমাত্র নড়াতে না পেরে তারা অবশেষে মুহম্মদের শরণাপন্ন হয়ে তাঁকে মধ্যস্থতা করতে অনুরোধ করল। হযরতের হৃদয়ে উদ্রেক হল; তারা যা চায় তা দেয়ার জন্য তিনি সুমামাকে অনুরোধ জানালেন। তাঁর অনুরোধে পুনরায় মক্কার দিকে বাণিজ্য জাহাজ পাঠানো হল।

মুহম্মদের দয়ার্দ্র স্বভাবের অগণিত দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। আমরা মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত দেব। হযরতের একজন কন্যা—তাঁর অত্যন্ত প্রিয় সন্তান হোদাইবিয়ার সন্ধি হওয়ার পর মক্কা থেকে পালিয়েছেন। তাঁর সন্তান প্রসবের সময় নিকটবর্তী ছিল। তিনি যখন উটে চড়েছিলেন তখন হাব্বার নামক একজন কোরাইশ তার স্বভাবসুলভ হিংস্রতা নিয়ে বল্লমের বাটের খোচায় তাকে উট থেকে ভূতলে ফেলে দেয় এবং তিনি শেষ পর্যন্ত মারা যান। মক্কা বিজয়ের পর তাকে অপরাধী ঘোষণা করা হয়। কিছুদিন নিজেকে লুকিয়ে রাখার পর সে হযরতের সামনে হাজির হয় এবং সন্তানহারা পিতার করুণার উপর নিজেকে সমর্পণ করে। তার অন্যায় ছিল গুরুতর, অপরাধ ছিল বর্বরোচিত, কিন্তু ক্ষতিটি ছিল ব্যক্তিগত। লোকটি তার অনুশোচনা ও ধর্ম গ্রহণে দৃশ্যত অকপট ছিল। হযরত তাকে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রদান করলেন। যে ইহুদী রমণী খায়বারে তাঁর প্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং আবু জেহলের পুত্র ইকরামা যে হযরতের প্রতি গুরুতর শত্রুতা দেখাতো—উভয়কে তিনি নিঃশর্তে ক্ষমা করেছিলেন।

খ্রিস্টান বেদুইনদের একটি গোত্র বণী কালব দুমাতুল জান্দালের নিকট বাস করত। তারা লুণ্ঠন করতে করতে মদিনা রাজ্যসমূহে আবির্ভূত হল। তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ ও আইন লঙ্ঘন জনিত অনুশীলন পরিত্যাগ করার সমনসহ তিনি একটি অভিযান প্রেরণ করলেন। যে অধিনায়ক এই ক্ষুদ্র বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত তাকে স্মরণীয় বাক্যে উপদেশ দিলেন : "কোন ক্ষেত্রেই তোমরা প্রতারণা বা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় গ্রহণ করবে না কিংবা কোন শিশুকে হত্যা করবে না।"[৩]

লুণ্ঠনকারী ও শত্রুভাবাপন্ন গোত্র ও লোকদের বিরুদ্ধে পাঠানো অভিযানসমূহের নেতাদের প্রতি দেয়া নির্দেশে তিনি সর্বদা দুর্বলকে আঘাত না করার জন্য দ্ব্যর্থহীন ভাষা ব্যবহার করতেন। বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যদের উদ্দেশে তিনি বললেন, "আমাদের ক্ষতির প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে পরিবারের অন্তরালস্থিত নিরীহ ব্যক্তিদের অবমাননা করবে না; নারীদের ছাড় দেবে; শিশুদের কিংবা পীড়িত ব্যক্তিদের আঘাত করা থেকে বিরত থাকবে। বাধা দান করে না এমন অধিবাসীদের গৃহ ধ্বংস করবে না; তাদের জীবিকার অবলম্বন বিনষ্ট করবে না।" আবু বকর তাঁর নেতার অনুসরণে

www.amarboi.org

সেনাধ্যক্ষের উপর নির্দেশ দিলেন : "হে এজিদ, কোনভাবেই তুমি তোমার লোকজনদের উপর জুলুম করবে না, তাদের অস্বস্তির কারণ হবে না, আর তোমার প্রতিটি কাজে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করছ ও যথোচিত ও ন্যায়সঙ্গত কাজে যত্নবান হবে; কেননা যারা এর অন্যথা করে তারা উন্নতি করতে পারে না। যখন তোমরা শত্রুর মোকাবিলা করবে তখন সাহসের সঙ্গে তা করবে এবং কখনো পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না। যদি তোমরা বিজয়ী হও তবে শিশু-বৃদ্ধ-নারীদের হত্যা করবে না। খেজুর গাছ ধ্বংস করো না। শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে দিও না। কোন ফলের গাছ কাটবে না। গবাদী পশুর কোন ক্ষতি করো না, শুধু জীবিকার প্রয়োজনে জবেহ করা ছাড়া। যখন তোমরা কোন চুক্তি সম্পাদন করো তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে, যেমন কথা তেমন কাজ। তোমরা দেখবে যে কিছু সংখ্যক ধর্মপরায়ণ লোক মঠ বা আশ্রমে আশ্রমে নিয়ে আল্লাহর সেবা করতে চায় তাদেরকে তাদের পথে থাকতে দিও, তাদেরকে হত্যা করো না কিংবা তাদের মঠ ধ্বংস করোনা।"[৪] এই অধ্যাদেশসমূহ সেন্ট ল্যাক্ ট্যানটিয়াসের সময় থেকে কভেন্টারদির সময় পর্যন্ত ক্যাথলিক প্রটেস্ট্যান্ট ও গ্রীক খ্রিস্টানদের ভয়াবহ পরিবর্জনের সঙ্গে অদ্ভুত বৈপরীত্যপূর্ণ।[৫] "শান্তির যুবরাজের" অনুসারীরা সম্প্রতিকাল পর্যন্ত বিবেকের দংশন ছাড়া অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও এলোপাথাড়ি হত্যা করেছেন, যুবক, বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। আর পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি পোপ, যাজক, প্যাটিরিয়ার্ক, বিশপ, পুরোহিত ও প্রেসবিটারগণ তাদের অপরাধ অনুমোদন করেছেন এবং সর্বাপেক্ষা ন্যাক্কারজনক অপরাধের জন্যও পুনঃপুনঃ সম্পূর্ণ পাপস্খলনের সার্টিফিকেট দিয়েছেন।

বণী মোস্তালিকদের বিরুদ্ধে এই বছর শাবান মাসে (নভেম্বর ডিসেম্বর, ৬২৭ খ্রিঃ) একটি অভিযান পাঠানো হয়েছিল। এই সময় পর্যন্ত এই গোত্র মুসলমানদের সঙ্গে সৌহার্দের সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি তাদের প্রধান হারিস বিন আবু দিরার[৬] কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে তাদের আনুগত্যের বন্ধন ছিন্ন করে মদিনার শহরতলী লুণ্ঠন করল। এই অভিযান সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছিল এবং বেশ কয়েকজন বন্দীকে আনা হয়েছিল তাদের মধ্যে হারিসের কন্যা জুওয়ায়রিয়া।

মক্কার মুহাযিরগণ ছয় বছর হল তাদের দেশ ও ভিটামাটি ত্যাগ করেছিলেন তাদের ধর্মের জন্য ও তাঁর জন্য যিনি তাদের মধ্যে অভূতপূর্ব চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিলেন যা তারা কোনদিন অনুভব করেন। তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন ঐক্য, প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব। আরবের প্রত্যেক অংশ থেকে মানুষ এই বিস্ময়কর ব্যক্তির কথা শোনার জন্য, প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন কাজে পরামর্শ নেয়ার জন্য তাঁর নিকট আসতে লাগল যেমন অতীতে বণী ইসরাইলগণ পয়গম্বর ইসমাইলের সঙ্গে আলোচনা করত।[৭]

এই সব মুহাযিরের হৃদয় জন্মভূমির জন্য তখনও কাঁদত। গৃহ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তাঁরা একটি প্রতিদ্বন্দ্বী শহরে আশ্রয় নিয়েছিল; তাঁরা পবিত্র কাবাগৃহের সীমানা থেকে বিতাড়িত হয়েছিল—এই কাবাগৃহ ছিল তাঁদের সকল সমষ্টিগত সম্পর্কের গৌরবময় কেন্দ্র—এই স্থানটিকে কেন্দ্র করেই তাঁদের জাতীয় জীবনের ইতিহাস গড়ে উঠেছিল।

www.amarboi.org

তাঁরা ছয় বছর বঞ্চিত ছিল এই পবিত্র গৃহের তীর্থদর্শন থেকে। প্রাচীন ঐতিহ্যসহকারে কাবাগৃহের জিয়ারত বা দর্শনকে পবিত্রতার আলোকমালায় সুশোভিত করেছে। হযরত নিজেও জন্মভূমিকে দেখার প্রবল ইচ্ছা পোষণ করছিলেন। কাবাগৃহ সমগ্র আরবজাতির অধিকারভুক্ত ছিল। কোরাইশগণ শুধু এই পবিত্র গৃহের অভিভাবক ছিল। তারা দেশীয় আইন অনুসারে এমন কি একজন শত্রুর আগমনও নিবারণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়নি, যদি সে ব্যক্তি কোনরূপ শত্রুতামূলক অভিসন্ধি প্রদর্শন না করত এবং ধর্মীয় কর্তব্য পালনের প্রকাশ্য স্বীকৃতি ঘোষণা করত।[৮]

হজের মৌসুম এসে গেল; সেই মোতাবিক হযরত কাবাগ্রহ জিযারতের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এ কথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে অযুত কণ্ঠে সম্মতি ধ্বনিত হল। দ্রুত প্রস্তুতি নেওয়া হল; সাত শত মুসলমান সম্পূর্ণরূপে মুসলিম মুহাযির ও আনসার সঙ্গে নিয়ে হযরত হজের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।[৯] কোরাইশদের শত্রুতা কিন্তু থেমে যায়নি। মক্কায় প্রবেশের কয়েক মাইল দূরেই মুসলমানদের পথরোধ করার জন্য তারা এক বিশাল সেনাবাহিনীর সমাবেশ করল। মক্কায় প্রবেশের প্রত্যেকটি পথ বন্ধ করার জন্য তারা পিছনে হটে এল। তারা কঠিনভাবে প্রতিজ্ঞা করল যে তারা হযরতের অনুসারীদের কাবাগৃহে প্রবেশ করতে দেবে না এবং কাবাগৃহে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে যে দূতকে তাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল তার সঙ্গে তারা অসদ্ব্যবহার করল। একদল মক্কাবাসী হযরতের তাবুর চারপাশ দিয়ে পরিভ্রমণ করতে থাকল। এর উদ্দেশ্য ছিল কোন মুসলমান অসতর্ক অবস্থায় বের হলে তাকে হত্যা করা হবে। এমন কি তারা পাথর ও তীর দিয়ে হযরতকে আক্রমণ করল।[১০] পৌত্তলিকদের অনমনীয় মনোভাব লক্ষ্য করে, আর মুসলমান ও কোরাইশদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বন্ধ করতে মুহম্মদ মক্কাবাসীরা যে শর্ত আরোপ করতে চায় তাতেই তিনি সম্মত হতে রাজী হলেন। অনেক অসুবিধার পর একটি সন্ধি হল। উভয়পক্ষের স্বাক্ষরিত এই চুক্তি ইতিহাসে হোদাবিয়ার সন্ধি নামে খ্যাত। এতে উভয় পক্ষ সম্মত হল যে দশ বছরের জন্য শত্রুতা বন্ধ থাকবে; যারা অভিভাবক বা প্রধানদের সম্মতি ছাড়া কোরাইশদের পক্ষ থেকে মুহম্মদের দলভুক্ত হবে তাদেরকে পৌত্তলিকদের নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে; মুসলমানদের মধ্য থেকে যদি কেউ মক্কাবাসীদের নিকট ফিরে যায় তবে তাকে ফেরত দেওয়া হবে না; কোন গোত্র যদি কোরাইশ কিংবা মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে চায় তবে বাধামুক্ত অবস্থায় স্বাধীনভাবে তা করতে পারবে; এ বছর মুসলমানদেরকে হজব্রত পালন না করেই ফিরে যেতে হবে; তাদেরকে পরবর্তী বছর মক্কার কাবাগৃহ দর্শনের অনুমতি দেওয়া হবে এবং প্রয়োজনীয় তীর্থযাত্রীর অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে "কোশবদ্ধ অবস্থায়" তিন দিনের জন্য মক্কায় থাকতে পারবে।[১১]

এই সন্ধিস্থাপনে মুহম্মদ যে সংযম ও উদারতা দেখিয়েছেন তা তাঁর সর্বাধিক আবেগপ্রবণ শিষ্যদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল; তাঁদের হৃদয়ে কোরাইশদের দ্বারা অনুষ্ঠিত আঘাত ও নির্মমতা তখনও তুষের আগুনের মতো জ্বলছিল। সন্ধির তৃতীয়

www.amarboi.org

শর্তের বদৌলতে, যার দ্বারা মুসলমানেরা অভিভাবক বা প্রধানের বিনানুমতিতে যাঁরা মুসলমানদের দলভুক্ত হয়েছিল তাঁদের কোরাইশদের ফিরিয়ে দিতে বাধ্য ছিলেন, কোরাইশগণ হযরতের কয়েকজন শিষ্যকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য দাবী করল; কিছু কিছু মুসলমানদের আপত্তির মৃদু গুঞ্জন সত্ত্বেও মুহম্মদ তৎক্ষণাৎ তাদের দাবী মেনে নেন।[১২]

তাঁর প্রচারিত ধর্ম সর্বমানবের কাছে পৌছবে—যে উদার বাসনা দ্বারা মুহম্মদ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার অনুসরণে[১৩] তিনি প্রতিবেশী রাজন্যবর্গ ও তাদের প্রজাকুলকে সত্য ধর্ম ইসলাম গ্রহণের জন্য কয়েকজন দূত পাঠিয়ে আহ্বান করেছিলেন। দু'জন সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত গ্রীকসম্রাট হিরাক্লিয়াস ও পারস্য-সম্রাট খসরু পারভেজের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। মক্কার একজন দেশত্যাগী সমতার ভিত্তিতে তাঁকে মহান খসরু বলে অভিহিত করার স্পর্ধার জন্য সম্রাট খসরু বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তাঁর পত্রের ঔদ্ধত্যের জন্য ক্রোধান্বিত হন, পত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলেন এবং ঘৃণার সঙ্গে দূতকে তাড়িয়ে দেন। যখন এই আচরণের খবর হযরতকে বলা হল তিনি শান্তভাবে মন্তব্য করলেন "এরূপে খসরুর সাম্রাজ্য ভেঙেচুরে টুকরো টুকরো হয়ে পড়বে।"[১৪] এই ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় খোদিত হয়ে আছে। হিরাক্লিয়াস ছিলেন অধিকতর নম্র ও শ্রদ্ধাবান; তিনি দূতকে প্রভূত সম্মান দেখালেন এবং পত্রের একটি সদদয় ও সযত্ন উত্তর প্রদান কররেন। সিরিয়া ত্যাগের পুর্বে তিনি পত্রপ্রেরক ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে জানার জন্য সচেষ্ট হলেন। কথিত আছে, এই উদ্দেশ্যে তিনি আরবদেশ থেকে আগত গাজাতে উপস্থিত একটি কাফেলার কয়েকজন আরব ব্যবসায়ীকে ডেকে পাঠালেন। তাদের মধ্যে ছিল পাপিষ্ট আবু সুফিয়ান, তখনও ইসলামের চরমতম দুশমন। প্রতীয়মান হয় গ্রীক সম্রাট তাকে হযরত মুহম্মদ সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং তার প্রদত্ত উত্তর বা হাদিসে সংরক্ষিত হয়ে আছে তা জাফর নাজ্জাসী সমীপে মুহম্মদের শিক্ষা সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন। হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "কি মতবাদ মুহম্মদ উপস্থাপিত করছে?" "তিনি আমাদেরকে আমাদের পুরাতন মূর্তিপূজা ত্যাগ করতে এবং এক আল্লাহর উপাসনা করতে বলছেন; তিনি গরীবদুঃখীকে সাহায্য করতে, সত্য ও সূচিতার অনুশীলন করতে, ব্যাভিচার, পাপ ও মানুষকে ঘৃণা করা থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন।" তাঁর শিষ্যসংখ্যা বিরামহীনভাবে বেড়ে চলেছে এবং তাঁর একজন শিষ্যও তাঁকে পরিত্যাগ করেনি।"

শীঘ্রই দামেস্কের নিকটবর্তী বসরায় অবস্থানকারী হিরাক্লিয়াসের জায়গীর ভোগী গাসানিয়া যুবরাজের নিকট অপর একজন দূত পাঠানো হল। একজন দূতের প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার পরিবর্তে একই পরিবারের অপর একজন প্রধান এবং বাইজানটাইনদের অধীনে একটি খ্রিস্টান গোত্রের আমির তাকে হত্যা করল। আন্তর্জাতিক বাধ্যতাবোধের উপর এই যথেচ্ছ প্রকাশ্য অত্যাচার ও অবমাননার ঘটনা ক্রমে সেই যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যা ইসলামকে সমগ্র খ্রিস্টান জগতের সঙ্গে লিপ্ত করেছিল। এ বিষয়ে পরে আলোচিত হবে।

www.amarboi.org

পাদটীকা

১. তুলনীয়; কোরআন সু. ৩৩ আ.৯।
২. ইবনে হিশাম; পৃ. ১৭৮; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড. পৃ. ১৪৩, তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭২।
৩. ইবনে হিশাম, পৃ. ৯৯২। আরবের নবীর এই অধ্যাদেশকে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর কর্তৃক ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানকে প্রদত্ত নির্দেশের সঙ্গে তুলিত হতে পারে। বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে প্রেরণকালে ইসরাইলদের নবীর হুকুমনামা তিনি তার নিকট উদ্ধৃত করেছিলেন; "এরূপে জিহোভা বলেন ...এখন আমালেকদের হত্যা কর, আর তাদের যা আছে তা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস কর, তাদের কাউকে পরিত্রাণ দিও না, নরনারী, বালক শিশু, ষাঁড় ও মেষ, উট ও গাধা নির্বিচারে সব হত্যা কর।" ১ স্যামু ১৫.৩; "তরুণ বৃদ্ধ, নারী-শিশু, সবাইকে সম্পূর্ণরূপে হত্যা কর।" এজেক ৯.৬।
৪. তুলনীয় : মিলের 'হিস্ট্রী' এব্ মোহামেডানিজম' পৃ. ৪৫, ৪৬; গাজিনিয়ার 'ভাই দি মোহমেদ'।
৫. মাঞ্চুরিয়ার ব্লাগোভেস্টচেকে ৫০০০ চীনা নরনারী শিশুকে বিংশ শতাব্দীতে বিপুল খ্রিস্টান শক্তির সেনাবাহিনী হত্যা করে, একথা বলাই বাহুল্য।
৬. ও দিয়ে লিখিত; ইবনে হিশাম; পৃ. ৭২৫; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৬।
৭. স্টেনলী, "লেকচারস অন্ জিউইশ চার্চ, ১ম খণ্ড।
৮. তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪; কাসন দ্য পার্সিভেল ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪; ১৭৫।
৯. ইবনে হিশাম, পৃ. ৭৪০; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৪; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫২। আবুল ফিদা পৃ. ৬০ তাঁর মতে এই সংখ্যা ছিল ১৪০০ শত।
১০. যখন এসব লোকদের কয়েকজনকে ধৃত অবস্থায় হযরতের সম্মুখে আনয়ন করা হল তিনি তাদরেকে ক্ষমা করলেন ও মুক্ত করে দিলেন। ইবনে হিশাম, পৃ. ৭৪৫। এই উপলক্ষে মুসলমানেরা যে শপথ নেন তা "বায়াতুল রিদওয়ান" বা "বায়তুস্ শাজারা"। কাবাগৃহ পরিদর্শনের অনুমতির জন্য একই অনুরোধসহ ওসমানকে পাঠানো হয়েছিল, তারা তাঁকে ধরে আটক রাখল। ওসমান নিহত হয়েছেন, এই আশঙ্কা করে তারা হযরতের চারপাশে সমবেত হল এবং তাঁর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করল। ইবনে হিশাম, পৃ. ৭৪৬; কোরআন সু. ৪৮ আ. ১৭; তু : মুয়ির ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩২।
১১. সিলাহ উর রাকিব। ইবনে হিশাম পৃ. ৭৪৭; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড পৃ. ১৫৬। মিশকাত, বাব–১৭, পরিচ্ছেদ–১০, অংশ–১। এই সন্ধি উপলক্ষে কোরাইশ দূত যিনি মুসলমানদের তাবুতে গমন করেছিলেন তিনি মুহম্মদের প্রতি শিষ্যদের সুগভীর সম্মান ও ভালবাসা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিলেন এবং কোরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে বলেছিলেন যে তিনি খসরু, কায়সার ও নজ্জাসীর মতো রাজকীয় জাকজমকপূর্ণ নৃপতি দেখেছেন, কিন্তু মুহম্মদের মতো কোন নৃপতি দেখেন নি যিনি তাঁর অধীনস্থদের নিকট থেকে এত অধিক সম্মান ও আনুগত্য পেয়ে থাকেন।—ইবনে হিশাম; পৃ. ৭৪৫; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৪; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ৮৭; এবং আবুল ফেদা, পৃ. ৬১।
১২. যেহেতু সন্ধির মধ্যে নারীদের অন্তর্ভুক্তি ছিল না, সুতরাং মুসলিম নারীদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য পৌত্তলিকদের যে দাবী তা চূড়ান্তরূপে প্রত্যাখ্যাত হল।
১৩. কোরআন, সু. ৭ আ. ১৫৭, ১৫৮।
১৪. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৩, ১৬৪।

www.amarboi.org

সপ্তম অধ্যায়
ইসলামের ব্যাপক প্রসার

তাঁর চরিত্র ও স্বভাবে মহত্ত্ব যা আছে।
স্তুতিকারীর বাসনা কেমনে সেথা পৌছে।

ইহুদী গোত্রগুলো অনেক বিপর্যয়ের পরেও প্রবল ছিল—তখনও তারা মুসলমানদের ধ্বংসের জন্য ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত ছিল। মদিনা থেকে উত্তর-পূর্বে তিন চার দিনের দূরত্বে তাদের সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত একটি রাজ্য ছিল। এখানে অনেকগুলি দুর্গ ছিল, আলকামুস ছিল তাদের মধ্যে প্রধান—এটা প্রায় অগম্য পাহাড়ের উপর অবস্থিত ছিল। এই দুর্গগুলি 'খায়বার' নামে পরিচিত ছিল—শব্দটির অর্থ একটি সুরক্ষিত স্থান।

৭ হিজরী ১২ই এপ্রিল ৬২৮ খ্রি.—১লা মে ৬২৯ খ্রি. : খায়বারের অধিবাসীরা বণী নাজির ও বণী কোরাইজা গোত্রের লোক ছিল—তারা এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। খায়বারের ইহুদীরা মুহম্মদ ও তাঁর শিষ্যদের বিরুদ্ধে সক্রিয় ও দুর্দমনীয় বিদ্বেষ পোষণ করত এবং তাদের সমগোত্রীয় লোকদের আগমনে এই অনুভূতি একটি প্রবল শক্তিতে পরিণত হল। খায়বারের ইহুদীরা একটি প্রাচীন চুক্তির মাধ্যমে বণী গাতাফানদের বেদুইন দল ও অন্যান্য একটি সম্মিলিত দল গঠনের চেষ্টা চালাতে থাকল।[১] মুসলমানেরা তাদের ক্ষতিসাধনকারী শক্তি সম্পর্কে জানতেন। মদিনার বিরুদ্ধে অপর একটি সম্মেলনের কুফল এড়ানোর জন্য পদক্ষেপ নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছিল। সেই মোতাবেক এই বছরের মহরম মাসের প্রথম দিকে খায়বারের বিরুদ্ধে পাঠানো হল চৌদ্দ শত মানুষের এক বাহিনী। ইহুদীরা তখন তাদের মিত্রদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করল। বণী ফিজারগণ তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসল কিন্তু তারা এই আশঙ্কায় ভীত হল যে মুসলমানেরা তাদের আক্রমণ করতে পারে এবং তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের গবাদী পশুর দল নিয়ে নিতে পারে—এই আশঙ্কায় ভীত হয়ে তারা দ্রুত পিছু হটল। এভাবে শুধু ইহুদীরাই যুদ্ধের ঝক্কি নেওয়ার জন্য অবশিষ্ট রইল। মুসলমানেরা তাদের কাছে সন্ধির শর্তাদি দিলেন কিন্তু তারা তা মেনে নিল না। ইহুদীদের প্রবল বাধা থাকলেও

—১০

www.amarboi.org

একটির পর একটি দুর্গ হার মানতে থাকল। অবশেষে সর্বাপেক্ষা দুর্ভেদ্য দুর্গ আল-কামুসের পালা আসল। প্রাণবন্ত, রক্ষণাত্মক প্রয়াসের পর দুর্গটি মুসলমানদের অধিকারে এল। এই প্রধান দুর্গের দুর্ভাগ্য অন্যান্য ইহুদী নগরের অধিকতর প্রতিরোধের অযৌক্তিকতা প্রমাণ করল। তারা ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং ক্ষমা পেল। তাদেরকে তাদের জমিজমা ও স্থাবর সম্পত্তি ভোগ-দখলের নিশ্চয়তা দেয়া হল (সদাচরণের উপর) এবং এই সঙ্গে নিজস্ব ধর্ম আচরণের স্বাধীনতাও দেওয়া হল। যেহেতু তারা নিয়মিত করসমূহ থেকে মুক্তি পেয়েছে কাজেই এখন এক প্রজাতন্ত্রের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা ভোগের জন্য হযরত তাদের উপর প্রজাতন্ত্র-কর আরোপ করলেন—এই করের পরিমাণ উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক। দুর্গমধ্যে যে সব অস্থাবর সম্পত্তি পাওয়া গেল যা যুদ্ধে ও অবরোধের ফলে হ্রাস পেয়েছিল তা সেনাবাহিনী বাজেয়াপ্ত করল এবং সৈন্যদের মধ্যে হাতিয়ার অনুসারে বন্টন করা হল। অশ্বারোহী সৈন্যরা তিন ভাগ এবং পদাতিক সৈন্যরা এক ভাগ পেল।[২]

মুহম্মদ ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ কোরাইশদের সঙ্গে তাদের সন্ধি অনুসারে হিজরী সপ্তম বর্ষের শেষের দিকে তাদের হৃদয়ের বাঞ্ছা[৩]—পবিত্র কাবাগৃহসহ অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহ দর্শনার্থে হজব্রত উদযাপনের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। মুসলমানদের ইতিহাসে এই যাত্রা সশ্রদ্ধ "তীর্থদর্শন কিংবা কৃতকার্যতার দর্শন" নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ২০০০ মুসলমান সমভিব্যহারে হজব্রত ওমরা হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় উপস্থিত হলেন। মুসলমান তীর্থযাত্রী সবাইকে এক নিয়মাবলী পালন করতে হয়। এইসব তীর্থযাত্রীদেরকে কোরাইশদের কিছুই বলার ছিল না, আলোচনা করারও কিছুই ছিল না। যে তিনদিন ধরে উৎসব চলেছিল তারা নগর খালি করে দিয়েছিল এবং প্রতিবেশীর অট্টালিকার ছাদ থেকে তারা মুসলমানদের হজ বিধি পালন দেখতে থাকল। মুয়িুর অবচেতনমনের শিহরণ নিয়ে বলেন, "এই দৃশ্য নিশ্চয়ই এক বিস্ময়কর অপরিচিত দৃশ্য যা মক্কার উপত্যকায় দৃশ্যমান হল—পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্যদৃশ্য। প্রাচীন শহরটি তিন দিনের জন্য খালি করে দেওয়া হল, উচ্চ-নীচ সকলে বাসগৃহ ত্যাগ করল—বাসগৃহসমূহ পরিত্যক্ত হল। গৃহবাসীরা নিক্রান্ত হওয়ার পর নির্বাসিত ধর্মান্তরিত মুসলমানেরা যাঁরা দীর্ঘদিন তাদের বাসভূমি থেকে নির্বাসিত হয়েছিলেন তাঁরা বড় বড় দলে বিভক্ত হয়ে তাঁদের মিত্রদের সঙ্গে প্রবেশ করলেন এবং তাঁদের দীর্ঘপরিত্যক্ত গৃহসমূহ পুনঃদর্শন করলেন, বরাদ্দকৃত অল্প জায়গাতে হজের নিয়মাবলী পালন করলেন। বাইরের অধিবাসীরা চতুর্দিকের উচ্চস্থানসমূহে আরোহণ করল, তাঁবুতে কিংবা পর্বত ও সংকীর্ণ উপত্যকায় আশ্রয় নিল; আবু কুবের ঝুলন্ত চূড়ায় মিলিত হয়ে সেখান থেকে নিচে দর্শনার্থীদের গতিবিধি দেখতে থাকল—হযরতের নেতৃত্বে তীর্থযাত্রীদের কাবা প্রদক্ষিণ ও এস্-সাফা ও মারওয়ার ক্ষিপ্র মিছিল লক্ষ্য করল; তারা উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রত্যেকটি মানুষের অবয়ব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জরিপ করতে লাগল যদি সহসা তাদের দীর্ঘদিনের হারানো কোন বন্ধু বা আত্মীয়কে তীর্থযাত্রীদের মধ্যে দেখতে পায়। এ ধরনের দৃশ্য শুধু ইসলাম যে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল তা দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল।"[৫]

www.amarboi.org

মুসলমানরা সন্ধির শর্তাবলীর সঙ্গে পূর্ণ সামঞ্জস্য রেখে তিন দিন পরেই মক্কা ত্যাগ করলেন। মুসলমানদের দিবাস্বপ্নের এই শান্তিপূর্ণ সার্থকতায় কোরাইশদের মনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ উৎসাহ জুগিয়েছিল। মুসলমানেরা যে আত্মসংযম ও অঙ্গীকৃত নীতির প্রতি বিবেকসম্পন্ন শ্রদ্ধাবোধ দেখিয়েছিলেন তা ইসলামের শত্রুদের মধ্যে দৃশ্যত বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিল। কোরাইশদের মধ্যে যারা হযরতের প্রতি অত্যন্ত বিরোধী ছিল তারা অনেকেই পদমর্যাদাসম্পন্ন ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিল। তারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাকে ঘৃণা করেছে, তারা মুহম্মদের দয়া ও মহানুভবতা যা তাঁর বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত সকল অপরাধ উপেক্ষা করেছিল তাতে অভিভূত হয়ে পড়ল ও ইসলাম গ্রহণ করল।[৬]

গ্রীক সম্রাটের জায়গীরভোগী যে মুসলিম দূত হত্যা করেছিল তা এমন একটি প্রকাশ্য অবমাননা যা নীরবে বা শাস্তিবিহীন অবস্থায় যেতে পারে না। গাসানিয়া যুবরাজের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে তিন হাজার সৈন্যের একটি অভিযান প্রেরণ করা হল।[৭] বাইজানটাইন সম্রাটের সেনাধ্যক্ষরা অপরাধ স্বীকার করার পরিবর্তে অস্বীকার করল এবং গোলমালটিকে রাজকীয় পর্যায়ে তুলে নিল। সৈন্যসামন্ত ঐক্যবদ্ধ করে তারা সিরিয়ার বলখ থেকে দূরে নয় এমন একটি গ্রাম যেখানে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার কাছের একটি জায়গায় মুসলমানদেরকে আক্রমণ করল। বাইজানটাইন ও তাদের মিত্রদের প্রতিহত করা হল; কিন্তু দু'দলের মধ্যে সংখ্যা বৈষম্য ছিল বিশাল, ফলে মুসলমানেরা মদিনায় ফিলে এল।[৮]

প্রায় এই সময়ে কোরাইশ ও তাদের মিত্র বণী বকররা হোদাইবিয়ার সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে বণী খোজাদের আক্রমণ করল। বণী খোজাগণ মুসলমানদের রক্ষণাবেক্ষণে ও চুক্তিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। তারা বণী খোজাদের বেশ কিছু লোক হত্যা করল এবং বাকী লোকদেরকে তাড়িয়ে দিল। বণী খোজাগণ মুহম্মদের নিকট অভিযোগ এনে তাঁর কাছে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করল। দীর্ঘদিন ধরে মক্কায় অবিচার ও অত্যাচারের রাজত্ব চলছিল। মক্কাবাসীরা নিজেরা সন্ধি ভঙ্গ করেছিল এবং তাদের কিছুসংখ্যক নেতা বণী খোজাদের ধ্বংস সাধনে অংশগ্রহণ করেছিল। হযরত অবিলম্বে পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে দশ হাজার লোক পাঠালেন। ইকরামা[৯] ও সাফওয়ান[১০] তাদের গোত্রপ্রধান হিসেবে সামান্য প্রতিরোধ করেছিল তাতে কিছুসংখ্যক মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। এ ছাড়া প্রায় বিনা প্রতিরোধেই মুহম্মদ মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন।

অবশেষে এভাবে মুহম্মদ বিজেতা হিসেবে মক্কায় প্রবেশ করলেন। যিনি ছিলেন একদা দেশত্যাগী ও মজলুম তিনিই এবার করুণা দেখিয়ে তাঁর মহান কর্মপরিকল্পনা প্রমাণ করতে এলেন। যে মহানগরীর মানুষ একদিন তাঁর প্রতি নির্মম আচরণ করেছিল, তাঁকে ও তাঁর বিশ্বাসী দলকে বিদেশ বিভুঁয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল, যে শহর তাঁর ও তাঁর শিষ্যদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল তা আজ তাঁর পদতলে। তাঁর পুরাতন বিক্রমশালী ও নিষ্ঠুর জুলুমকারীরা যারা নির্দোষ নরনারীর উপর, এমনকি প্রাণহীন মৃতের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে মনুষ্যত্বের অপমান করেছিল তারা আজ সম্পূর্ণরূপে তাঁর করুণার

www.amarboi.org

ভিখারী। কিন্তু বিজয়-মুহূর্তে তিনি সব অনিষ্টের ব্যথা ভুলে গেলেন, সব আঘাত ক্ষমা করে দিলেন, আর সমগ্র মক্কাবাসীর জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। যখন তিনি তাঁর তীব্রতম শত্রুদের শহরে প্রবেশ করলেন তখন মাত্র চারজন অপরাধী যারা ন্যায়বিচারের তুলাদণ্ডে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েছিল তাদের নামই শুধু মুহম্মদের দণ্ডাজ্ঞার তালিকায় স্থান পেল। সেনাবাহিনী তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে শান্তভাবে ও শান্তির সঙ্গে প্রবেশ করল, কোন গৃহ লুণ্ঠিত হল না, কোন নারীও লাঞ্ছিত হল না। সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে বলা হয়েছে যে বিজয় অভিযানের ইতিহাসে এই ধরনের সফলকাম প্রবেশ আর দেখা যায় নি। কিন্তু জাতীয় মূর্তিসমূহ নির্দয়ভাবে ধূলিসাৎ করা হল। দুঃখের সঙ্গে পৌত্তলিকগণ চারিদিকে দাঁড়িয়ে তাদের উপাস্য মূর্তিগুলির অধঃপতন নিরীক্ষণ করতে লাগল। তখন তাদের কাছে সত্য প্রতিভাত হল, তারা অভ্যন্ত কণ্ঠে সেই পুরাতন ধ্বনি শুনতে পেল যা তারা একদিন ব্যঙ্গ করত যখন তিনি মূর্তিগুলি ভেঙে ফেলতে ফেলতে বললেন; "সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত; মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী"[১১]; তাদের দেবদেবী কতই না শক্তিহীন!

প্রাচীন এ সকল মূর্তি ধ্বংস করে পৌত্তলিক বিধি দূরীভূত করে মুহম্মদ সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিলেন। তিনি কোরআনের ভাষায় প্রথম মানবজাতির স্বাভাবিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে বর্ণনা দিলেন এবং তারপর নিম্নোক্তরূপে বলতে লাগলেন, "হে কোরাইশ বংশোদ্ভূতগণ, আমি তোমাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করব বলে তোমরা মনে কর?" তারা উত্তর করল, "হে দয়ালু ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র আমরা তোমার নিকট থেকে করুণা ও সহানুভূতি চাই।"[১২] তাবারী বললেন যে এ কথা শুনে হযরতের চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল এবং তিনি বললেন, "ইউসুফ তাঁর ভ্রাতাদের যেরূপ বলেছিলেন আমিও তেমনিভাবে তোমাদের বলব, "আমি আজ তোমাদের তিরস্কার করব না; আল্লাহ 'তোমাদের ক্ষমা করবেন।' আল্লাহ সবচেয়ে দয়ালু ও সহানুভূতিশীল।"[১৩]

এসময়ে এমন একটি দৃশ্যের অবতারণা হল পৃথিবীর ইতিহাসে যা আর নেই। দলে দলে সবাই মুহম্মদের ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল। সাফা-পবর্তের উপর বসে তিনি পুরাতন শপথনামা মদিনাবাসীদের নিকট থেকে গ্রহণ করেছিলেন; "তারা কোন বস্তুর উপাসনা করবে না; তারা চুরি, ব্যভিচার, কিংবা শিশুহত্যা করবে না; তারা মিথ্যা বলবে না কিংবা নারীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাবে না।"[১৪]

এভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করল কোরআনের ভবিষ্যদ্বাণী। "আল্লাহ সাহায্য ও বিজয় যখন এসে পড়ল। আর আপনি দেখে নিলেন : লোকজন দলে দলে আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থায় দাখিল হচ্ছে। সুতরাং আপনি নিজ পালনকর্তার প্রশংসায় তসবীহ পাঠ করতে থাকুন, আর তাঁর কাছেই ক্ষমা চাইতে থাকুন। নিশ্চয়ই তিনি তওবা মঞ্জুরকারী।"[১৫] এখন মুহম্মদ বুঝতে পারলেন যে তিনি যে মহান পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন তা বাস্তবায়িত হল। মরুভূমির দুর্ধর্ষ গোত্রগুলোকে ইসলামের শান্তির ছায়াতলে আহ্বান করার জন্য তাঁর প্রধান শিষ্যবৃন্দকে তিনি বিভিন্ন

www.amarboi.org

দিকে পাঠালেন এবং শান্তি ও শুভেচ্ছা প্রচারের কঠোর নির্দেশাবলী দিলেন। শুধু আক্রমণের বেলায় তারা আত্মরক্ষা করবে। এই নির্দেশাবলী শুধু একটি ব্যতিক্রম ছাড়া আনুগত্যের সঙ্গে প্রতিপালিত হয়। খালিদ বিন ওয়ালিদের সৈন্যগণ এই দুর্ধর্ষ ও নব্য ধর্মান্তরিত সেনাধ্যক্ষের আদেশে বিরোধী সৈন্য মনে করে বণী যাজিম[১৬] বেদুইনদের কয়েকজনকে হত্যা করেছিল, কিন্তু অন্যান্য মুসলমানরা বাধা দেওয়ায় তারা সংযম হয়। এই অপ্রত্যাশিত রক্তপাতে হযরত গভীরভাবে ব্যথিত হন এবং আকাশের দিকে হাত তুলে কেঁদে বলেন, "হে প্রভু, খালিদ যা করেছে সে বিষয়ে আমি নির্দোষ।" তিনি তৎক্ষণাৎ আলীকে পাঠিয়ে বণী যাজিমদের প্রতি সম্ভাব্য সব ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন। আলীর স্বভাবের সঙ্গে এই ধরনের দায়িত্ব পালন অসম্ভব ছিল না। তিনি তা বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পাদন করেছিলেন। তিনি সযত্নে খালিদ কর্তৃক নিহত লোকদের সংখ্যা, তাদের পদমর্যাদা এবং তাদের পরিবারের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করলেন এবং সঠিকভাবে 'দিয়াত' দিলেন। ক্ষতিপূরণ শেষে অবশিষ্ট যে অর্থ বেঁচে গেল তা তিনি নিহতদের আত্মীয়স্বজন ও গোত্রের অন্যান্য লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। ঐতিহাসিক বলেন যে, প্রত্যেকেই তাঁর কোমলতা ও উদারতা দ্বারা আনন্দিত হয়েছিল। সমগ্র গোত্রের শুভেচ্ছা নিয়ে আলী হযরতের নিকট ফিরে গেলেন। হযরত তাঁর প্রতি খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর প্রশংসা করলেন।[১৭]

হাওয়াজিন, সাকিফ[১৮] ও অন্যান্য শক্তিশালী বেদুইন গোত্রগুলো মক্কার সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোতে তাদের গবাদী চরাত; তাদের কোন কোন গোত্রের, তায়েফের মতো সুরক্ষিত শহর ছিল; তারা বিনা বাধায় মুসলমানদের আনুগত্য স্বীকার করতে অনিচ্ছুক ছিল। তারা এই উদ্দেশ্যে একটি সঙ্গবদ্ধ সৈন্যদল গড়ে তুলল যাতে মুহম্মদ প্রস্তুতি নিয়ে প্রতিহত করার পূর্বেই তাকে আক্রমণ করা যায়। যাহোক, মুহম্মদের সতর্কতা তাদেরকে হতাশ করে দিল। মক্কার প্রায় দশ মাইল উত্তর-পূর্ব দিকে গভীর ও সংকীর্ণ গিরিবর্ত হুনায়নের[১৯] নিকট প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক যুদ্ধের পর পৌত্তলিকগণ প্রভূত ক্ষতিসহকারে পরাজিত হল।[২০] শত্রুদের একটি দল, যারা ছিল সাকিফ গোত্রের লোক তাদের সৈন্যসামন্ত বিচ্ছিন্ন করে তায়েফ শহরে আশ্রয় নিল। এই তায়েফের লোকেরা আট-নয় বছর পূর্বে হযরতকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, বাকী সব আউতাস উপত্যকায় সুরক্ষিত শিবিরে পালিয়ে গেল। এটা বাধ্য করা হয়েছিল; হাওয়াজিন পরিবারসমূহ তাদের পার্থিব ফলাফল—গবাদী পশুপালসহ মুসলমানদের করতলগত হল। তারপর তায়েফ অবরোধ করা হল, কিন্তু কয়েকদিন পর মুহম্মদ অবরোধ তুলে নিলেন কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে অবস্থার চাপে তায়েফবাসীরা শীঘ্রই বিনা রক্তে আত্মসমর্পণ করবে। আটককৃত হাওয়াজিনদেরকে সেখানে নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছিল। সেখানে ফিরে এসে তিনি দেখতে পেলেন যে এই শক্তিশালী গোত্র থেকে তাঁর কাছে একটি প্রতিনিধি দল এসে তার আগমনের প্রতীক্ষা করছে, তাদের পরিবার পরিজনদের ফিরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ নিয়ে। নিজেদের অধিকার-সচেতনতা সম্পর্কে আরবদের

www.amarboi.org

স্বভাবসংবেদতা হযরত অবহিত ছিলেন, তাই তিনি বেদুইন প্রতিনিধিদের বললেন যে তিনি তাঁর লোকজনদের বিজয়ের সমুদয় ফলাফল পরিত্যাগ করতে বাধ্য করতে পারবেন না; কাজেই যদি তারা তাদের পরিবার-পরিজনদের ফিরে পেতে চায় তবে অন্ততঃপক্ষে তাদের দ্রব্যসম্ভার দণ্ড দিতে হবে। এতে তারা সম্মত হয়ে পরদিন মুহম্মদ ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ যখন জোহরের নামাজ পড়ছিলেন[২১] তখন তারা এসে একই অনুরোধ করল :

"আমাদের নারী ও শিশুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে আমরা হযরতকে মুসলমানদের সঙ্গে এবং মুসলমানদেরকে হযরতের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি।" প্রতিনিধিদেরকে হযরত জবাব দিলেন, "আমার এবং আব্দুল মুত্তালিবের পুত্রদের ভাগে যে সব বন্দী পড়েছে আমি এই মুহূর্তে তাদেরকে মুক্তি দিলাম।" হযরতের শিষ্যবৃন্দ তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল এবং এক মুহূর্তে ছয় হাজার বন্দী মুক্তি লাভ করল।[২২] এই মহানুভবতা অনেক সাকিফদের[২৩] অন্তর জয় করল, তারা আনুগত্য স্বীকার করল ও অনুরাগী মুসলমানে পরিণত হল। হাওয়াজিনদের বাজেয়াপ্ত গবাদী বন্টনের পরে যে ঘটনা ঘটল তা মদিনাবাসীদের হৃদয়ের উপর হযরতের কতটুকু অধিকার আছে এবং কিরূপ অনুরাগ তিনি তাদের মধ্যে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন সেটাই শুধু নির্দেশ করে না, বরং এ কথাও প্রমাণ করে যে তাঁর জীবনের কোন পর্যায়েই তিনি তাঁর শিষ্যদের জন্য কোন পার্থিব পুরস্কার প্রদান করেননি। গণিমতের বন্টনে বৃহদাংশ মদিনাবাসীদের চেয়ে মক্কার নব্য মুসলমানদের ভাগে পড়েছিল। কতিপয় আনসার এই কাজকে পক্ষপাতিত্বমূলক বলে বিবেচনা করলেন; তাদের অসন্তোষের কথা হযরত জানতে পেরে, তিনি তাদেরকে সমবেত হতে নির্দেশ দিলেন। তিনি নিম্নলিখিত ভাষায় তাদের সম্বোধন করলেন ঃ "হে আনসারগণ, তোমরা তোমাদের মধ্যে যে আলোচনা করেছ তা আমি শুনেছি। আমি যখন তোমাদের মধ্যে এসেছিলাম তোমরা তখন অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছিলে এবং আল্লাহ্ তোমাদের সঠিক পথ দেখিয়েছিলেন; তোমরা দুর্দশা ভোগ করছিলে এবং তিনি তোমাদের সুখী করেছিলেন। তোমরা যখন পরস্পরের শত্রু ছিলে তিনি তখন তোমাদের হৃদয় ভ্রাতৃসুলভ ভালবাসা ও ঐক্য দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। আমাকে বলো, একথা কি ঠিক নয়?" তারা উত্তর করল "হ্যাঁ, আপনি যা বলছেন তা সত্য। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল উদারতা ও করুণার আধার।" হযরত পুনরায় বলতে লাগলেন, "না, আল্লাহর শপথ, তোমরা হয়ত সত্যই বলেছ, কেননা আমি এর সত্যতা নিজেই পরখ করেছি : 'আপনি আমাদের কাছে এসেছিলেন যখন আপনি প্রতারক বলে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, এবং আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম; আপনি অসহায় দেশত্যাগী হিসেবে এসেছিলেন, আমরা আপনাকে সাহায্য করেছিলাম; আপনি দীন ও গৃহহীন অবস্থায় এসেছিলেন এবং আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম; আপনি সান্ত্বনাহীন অবস্থায় ছিলেন, আমরা আপনাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম।' হে আনসারগণ, তোমরা কেন ইহজগতের বস্তু নিয়ে তোমাদের

www.amarboi.org

হৃদয় পীড়িত করবে? তোমরা কি পরিতৃপ্ত নও যে অন্যান্যরা গবাদী ও উট নিয়ে যাবে এবং তোমরা তোমাদের মধ্যে আমাকে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে? যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ করে বলছি আমি তোমাদের কখনও পরিত্যাগ করব না। যদি জগতের সব লোক এক পথে যায় এবং আনসারগণ অন্য পথে যায়, আমি নিশ্চয়ই আনসারদের সঙ্গে থাকব। আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন থাকুন, তাদের, তাদের সন্তান ও তাদের সন্তানদের সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।" ঐতিহাসিক বলেন যে, এই কথা শুনে তারা কান্নায় ভেঙে পড়ল ও তাদের শ্মশ্রু বেয়ে অশ্রুর ঢল নামল। আর তারা সম্মিলিত কণ্ঠে ধ্বনি তুলল : "হে আল্লাহ্‌র রাসুল, আমরা আমাদের প্রাপ্যাংশ পরিতৃপ্ত।" অতঃপর তারা সুখী ও পরিতৃপ্ত হল।[২৪]

মুহম্মদ শীঘ্রই মদিনায় ফিরে গেলেন।

পাদটীকা

১. কসিন দ্য পার্সিভেল ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৩, ১৯৪।
২. ইবনে হিশাম, পৃ. ৭৬৪ ও ৭৭৩; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৯। কিনানা গুপ্ত ধনভাণ্ডারের কথা ফাঁস করে দিয়েছিলেন বলে তার উপরে অত্যাচার করা হয়েছিল—এই গল্পটি সত্য নয়। হত্যা করার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করা হয়েছিল। খায়বারে প্রবেশের পর এক ইহুদী রমণী প্রাচীনকালের জুডিথ বা বিশ্বাস ঘাতকদের মতো হযরত ও তাঁর কতিপয় শিষ্যের দিকে বিষাক্ত খাদ্য এগিয়ে দিল। সে আহার্যের কয়েক মুষ্টি ভক্ষণের পরই একজন শিষ্য মৃত্যুমুখে পতিত হল। হযরতের জীবন রক্ষা পেল, কিন্তু বিষের ক্রিয়া তাঁর শরীরের গভীরে প্রবেশ করল এবং পরবর্তীকালে তিনি এই বিষক্রিয়ার ফলে মারাত্মকভাবে ভুগেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত তার ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। এই অপরাধ সত্ত্বেও হযরত মহিলাটিকে ক্ষমা করলেন এবং তাকে তার লোকদের মধ্যে অক্ষত অবস্থায় বাস করার অনুমতি দিলেন; তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৪; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭০।
৩. কোরআন, সু. ৪৮ আয়াত ২৭।
৪. উমরাতুল কায়া।
৫. মূয়ির, লাইফ অব মুহমেট, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪০২।
৬. দৃষ্টান্তস্বরূপ খালিদ বিন ওয়ালিদ যিনি ওহোদ যুদ্ধে কোরাইশদের অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন এবং আমর ইবনে আল আউস যিনি আব্রত নামে বিখ্যাত।
৭. কসিন দ্য পার্সিভেলের মতে এই দলনেতা আমরের পুত্র সুরাহবিল (এবং আবুল ফিদা বলেছেন সুরাহবিলের পুত্র আমর—এ কথা ঠিক নয়।)—২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৩ এবং ২য় খণ্ড পৃ. ২১১।
৮. কসিন দ্য পার্সিভেল ২য় খণ্ড, পৃ. ২১১; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮-১৮০। এই যুদ্ধে জায়েদ বিন হারিস যিনি মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তিনি, মুহম্মদের ভ্রাতুষ্পুত্র জাফর এবং আরও কয়েকজন বিখ্যাত লোক নিহত হয়েছিলেন।
৯. আবু জেহেলের পুত্র, যে আবু জেহল বদর যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করেছিল।
১০. উম্মাইয়ার পুত্র।

www.amarboi.org

১১. কোরআন, সু. ১৭ আ. ৮৩; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯২।
১২. ইবনে হিশাম, পৃ. ৮২১; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৪।
১৩. কোরআন, সু. ১২ আ. ৩১।
১৪. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯২; কসিন দ্য পার্সিভেল ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪।
১৫. কোরআন, সু. ১১০। তু : জামাক্শারী (কাশ্শাফ) মিশর সং. ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯০, ৪৯১।
১৬. ১ (ষাল) দিয়ে।
২. ইবনে হিশাম; পৃ. ৮৩৪, ৮৩৫; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৫; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪১।
১৭. == (সা) দিয়ে।
১৮. কসিন দ্য পার্সিভেল ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৮। 'কামুস' গ্রন্থে হুনায়েন মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী পথমধ্যে অবস্থিত বলে অভিহিত হয়ে থাকে। 'মুজামুল বুলদানে' মক্কা ও হুনায়েনের (জুল মাজাজের দক্ষিণে অবস্থিত) দূরত্ব তিন রাত্রির পথ বলে বলা হয়েছে।—৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৫।
১৯. এই যুদ্ধের কথা কোরআনের সু. ৯ আ. ২৫, ২৬ এ উল্লিখিত হয়েছে, ইবনে হিশাম পৃ. ৮৪০; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ২০০,২০১।
২০. তাবারী ফজরের নামাজের কথা বলেছেন—৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫।
২১. ইবনে হিশাম, পৃ. ৮৭৬; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, ২০৬, তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৫৫।
২২. তায়েফের অধিবাসীদের সাকিফ বলা হয়। মুয়ির হযরতের জীবন পদ্ধতির অদ্ভুত দৃষ্টান্ত হিসেবে যে গল্পের (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪০) অবতারণা করেছেন তা বানোয়াট। এ কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রথমত, গণিমতের মালের কোন বন্টন হয়নি এবং ফলে হযরতের নিজের প্রাপ্যাংশে তিনি দান করতে পারেননি'. কিন্তু তিনি হাওয়াজিনদের তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য বন্টনের পূর্বে অঙ্গীকার করেছিলেন। গল্পটি বানোয়াট ও নিতান্তই মূল্যহীন।
২৩. ইবনে হিশাম পৃ. ৮৮৬; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৮; আবুল ফিদা পৃ. ৮২।

www.amarboi.org

অষ্টম অধ্যায়
প্রতিনিধি প্রেরণের বর্ষ

চেহারা ও স্বভাবে সকল নবীর অতুল তিনি
জ্ঞান আর মহত্ত্বে কেউ পারেনি তাঁরে যিনি।
ছেড়ে দাও খ্রিস্টানেরা যা বলেছে তাদের নবীর 'পরে
তুমি বলো তোমার মনে যা আসে তব নবীর তরে।
—কাসিদাতুল বারদা ॥

আমার রাসুল নূরের রবি পথের আলো
আল্লাহ্পাকের তরবারী, কেটে চলেন পথের কালো।
—বানাত সুয়াদ ॥

মদিনায় দূতের আগমনের মাধ্যমে নবম হিজরী স্মরণীয় হয়ে আছে। ইসলামের নবীর প্রতি এই বছর অনেক দূত মদিনায় এসে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন। বন্য বিক্রম, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও পৌত্তলিকতাসহ যে মেঘভার দেশের উপর এতদিন চেপে বসেছিল তা চিরদিনের জন্য উঠে গেল। বর্বরতার যুগের অবসান হল।

৯ম হিজরী ২০শে এপ্রিল—৯ই এপ্রিল ৬৩১ খ্রি. ঃ মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে আরব থেকে পৌত্তলিকতাবাদি চিরতরে দূর হয়ে গিয়েছিল। যে সব লোক তখনও লাত, মানাত ও উজ্জা প্রমুখ সুদর্শনা চন্দ্র-দেবীদের ও তাদের ধর্মমত সমীহ্ করত তারা-এর শক্তিশালী আশ্রয়ের পতন ঘটায় জাগরিত হল। মরুবাসীদের মধ্যে মক্কার লোকদের আত্মসমর্পণের নৈতিক ফলাফল ছিল প্রভূত। অদ্যাবধি যে সব গোত্র মুসলমানদের প্রতি চরম শত্রুভাবাপন্ন ছিল তাদের আনুগত্য ও একাত্মতা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে প্রতিনিধিদল আসতে শুরু করল।[১] হযরতের প্রধান প্রধান সাহাবী ও মদিনার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ তাঁর অনুরোধে তাদের গৃহে এসব দূতকে গ্রহণ করলেন এবং আরবের যুগনন্দিত আতিথেয়তার সঙ্গে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করল। বিদায়ের সময় তারা সর্বদা পাথেয়ের প্রচুর অর্থ এবং তাদের পদমর্যাদা অনুসারে অতিরিক্ত উপহার পেতেন।

www.amarboi.org

গোত্রের সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করে সন্ধি স্বাক্ষরিত হত এবং ইসলামের খেদমতে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নব্য মুসলমানদের প্রশিক্ষণের জন্য একজন করে প্রশিক্ষক প্রেরিত হত যাতে তাদের মধ্যে থেকে পৌত্তলিকতার শেষ চিহ্নটুকু মুছে যায়।

নতুন ধর্মের নিয়ন্ত্রণে মহান শিক্ষাগুরু যখন আরবের গোত্রসমূহ সংহত করার জন্য নিয়োজিত ছিলেন তখনও তিনি নবোদ্ভূত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ত্রাস-সঞ্চারী বাইরের বিপদের প্রতি সতর্ক ছিলেন।

আরববিজয়ের স্বপ্নে বাইজানটাইনগণ এ সময় বিভোর ছিল বলে মনে হয়, যা এক সময়ে রোমক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতাকে আরবে অভিযান প্রেরণে প্ররোচিত করেছিল।[২] পারসিকদের উপর বিজয়-সাফল্যে স্ফীত হয়ে হিরাক্লিয়াস তার রাজ্যে ফিরে গেলেন। আরবে যেসব বিস্ময়কর ঘটনা ঘটছিল সে সম্পর্কে তার রাজনৈতিক দৃষ্টি সজাগ ছিল। আর মাত্র কয়েকজন আরবদের দ্বারা তার সেনাধ্যক্ষগণ এক প্রকাণ্ড বাহিনীর নেতা হিসেবে যেভাবে হটতে বাধ্য হয়েছিল তা তিনি সম্ভবত ভুলে যাননি। সিরিয়ায় অবস্থানকালে আরব অভিযানের উদ্দেশ্যে এক বিশাল বাহিনী সংগ্রহ করার জন্য তিনি তার সামন্তরাজাদের আদেশ দিলেন। এই সুবিশাল আয়োজনের সংবাদ পেয়ে মুসলমানদের মনে ভীতির সঞ্চার হল। এই সংবাদ সত্য হলে তা ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের জন্য মহাবিপদের সংকেত ছিল। এই সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য সম্ভাব্য সকল জায়গা থেকে স্বেচ্ছাসেবক আনা হল। দুর্ভাগ্যবশত সম্প্রতি হিজাজ ও নেজদে ভয়ানক অনাবৃষ্টি দেখা দিল, খেজুরের উৎপাদন বিপর্যস্ত হল, অনেক উট মারা গেল; গ্রাম্য লোকেরা গৃহ থেকে অনেক দূরে এ ধরনের অভিযানে যোগদান করতে বহুলাংশে অনিচ্ছা প্রকাশ করল। কারও কারও কাছে বছরের এই সময় যুদ্ধের জন্য অনুপযুক্ত মনে হয়েছিল, এ সময়ে তাপের তীব্রতা, পথের কষ্ট এবং বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের শক্তি সম্পর্কে বিস্ময়কর গল্প অনেকাংশে ভীরু প্রকৃতি লোকদের মনে ভয় জাগিয়ে তুলল। অনেকে যুদ্ধে যোগদান থেকে মুক্ত থাকার দরুন আবেদন জানাল, যারা দুর্বল কিংবা অস্ত্রধারণ করতে কিংবা গৃহত্যাগ করতে নিতান্ত অপরাগ এবং ব্যক্তিবৃন্দ যাদের পরিবারের সদস্যদের দেখা শোনা করার মতো কেউ নেই হযরত শুধু তাদেরই আবেদন গ্রহণ করলেন।[৩]

মুনাফিকদের দুরভিসন্ধি অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের অনিচ্ছাকে বৃদ্ধি করে তুলেছিল। এটাকে অসন্তোষে রূপান্তরিত করার জন্য তারা চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি।[৪] যাহোক হযরতের প্রধান প্রধান শিষ্য ও ইসলামের নিষ্ঠাবান অনুসারী ভীরুদের প্রাণে শক্তি সঞ্চার করল এবং পিছু হটা ব্যক্তিদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করল। এই উদ্দীপনা দেখতে দেখতে সাধারণ লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করল। চারদিক থেকে চাঁদা বৃষ্টির মতো আসতে থাকল। অভিযানের খরচের জন্য আবু বকর তাঁর সব সম্পদ দান করলেন; ওসমান তাঁর নিজের খরচে বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবককে সজ্জিত করলেন ও তাদের খরচ বহন করলেন এবং অন্যান্য নামজাদা ও বিত্তশালী মুসলমানও মুক্ত হস্তে দান করলেন।

www.amarboi.org

মহিলারা তাদের অলঙ্কারাদি হযরতের কাছে পৌঁছে দিলেন এবং রাষ্ট্রের কাজে সেগুলোকে ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত পর্যাপ্ত সেনাবাহিনী সংগৃহীত হল এবং স্বেচ্ছাসেবকগণসহ হযরত সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করলেন।

তাঁর অনুপস্থিতির সময় মদিনায় তিনি আলীকে শহরের তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত করেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইসহ মুনাফিকগণ আরাফাতের পর্বত পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারা সেখান থেকে নীরবে পিছু হটল এবং শহরে ফিরে গেল। এখানে তারা এই সংবাদ প্রচার করল যে হযরত তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে অভিযানের সঙ্গে নেননি কারণ তিনি এই অভিযানে বিপদের আশঙ্কা করেছেন। এই বিদ্বেষপরায়ণ গুজবে আহত হয়ে আলী অস্ত্র হাতে নিয়ে বাহিনীর পিছু নিলেন। সেনাবাহিনীর নাগাল পেয়ে তিনি যা শুনেছিলেন তা হযরতকে জানালেন। মুহম্মদ এটিকে একটি নীচ মিথ্যা অপবাদ বলে ঘোষণা করলেন। "আমি তোমাকে আমার খলিফা (প্রতিনিধি) নিযুক্ত করেছি এবং আমার দায়িত্বে রেখে এসেছি। তাহলে তুমি তোমার কার্যস্থলে ফিরে যাও এবং আমার জনগণের কাছে আমার প্রতিনিধি হয়ে কাজ কর। হে আলী, তুমি কি তৃপ্ত নও যে হারুণ মূসার কাছে যা ছিলেন তুমিও আমার কাছে তাই।"[৫]

সেই অনুযায়ী আলী মদিনায় ফিরে এলেন।

উত্তাপ ও তৃষ্ণায় সেনবাহিনীর দুর্ভোগ হয়েছিল প্রচণ্ড। দীর্ঘ ক্লেশকরপথ পেরিয়ে তারা মদিনা ও দামেস্কের[৬] মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত তবুক নামক স্থানে উপস্থিত হলেন এবং এখানেই যাত্রা বিরতি করলেন। এখানে তারা সবিস্ময়ে ও সম্ভবত স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে জানতে পারলেন যে আশঙ্কিত আক্রমণটি গ্রীকদের স্বপ্ন এবং গ্রীকসম্রাট তখন দেশের নানান সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত। হযরত দেখলেন যে এই মুহূর্তে মদিনা প্রজাতন্ত্রের নিরাপত্তার জন্য কোন আশঙ্কা নেই; কাজেই তিনি সেনাবাহিনীকে ফিরে আসার জন্য আদেশ দিলেন।[৭] তবুকে বিশ দিন প্রবাসের পর মুসলমানগণ রমজান মাসে মদিনায় ফিরে আসলেন।[৮] সেখানে তারা নিজেদের জন্য পর্যাপ্ত জল ও ভারবাহী পশুর জন্য প্রচুর আহার্য পেয়েছিলেন।

যে সব তায়েফবাসী তাদের মধ্য থেকে অপমান ও অত্যাচার করে বেচারা হযরতকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সেই অবাধ্য ও কঠিন হৃদয় পৌত্তলিকদের প্রতিনিধিরা হযরতের মদিনায় প্রত্যাবর্তনকে সংকেত দ্বারা জ্ঞাত করিয়েছিল। তায়েফবাসীদের নেতা, ওয়ারওরা হোদাইবিয়ার ঘটনার পর কোরাইশদের দূত হিসেবে মক্কা যান। তিনি হযরতের কথাবার্তা ও তাঁর দয়ায় বিমুগ্ধ হয়েছিলেন; তাঁর দায়িত্বপালনের কিছু দিন পরে তিনি হযরতের নিকট গিয়ে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করলেন। বিপদ সম্পর্কে হযরতের পুনঃপুনঃ হুঁসিয়ারী থাকলেও তিনি তার শহরের ধর্মান্ধদের মধ্যে ছুটে গেলেন, তিনি তায়েফে ফিরে গিয়ে তার পৌত্তলিকতা বর্জনের কথা ঘোষণা করলেন এবং নতুন ধর্মপ্রদত্ত কল্যাণে শরীক হওয়ার জন্য তার স্বদেশবাসীদেরকে আহ্বান জানালেন। সন্ধ্যায় পৌঁছে তিনি সাধারণ্যে তার ধর্মান্তর গ্রহণের কথা জানালেন এবং সকলকে তার সঙ্গে যোগদান করতে আহ্বান জানালেন। পরদিন সকালে আবার তিনি তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তার ভাষণ 'উজ্জা'র পুরোহিত ও উপাসকদের মধ্যে উন্মত্ততা সৃষ্টি করল এবং তারা তাকে

www.amarboi.org

পাথর ছুঁড়ে হত্যা করল। তিনি মৃত্যুকালে বলে গেলেন যে তার জাতির কল্যাণের জন্য তিনি তার প্রভুর সমীপে তার রক্ত উৎসর্গ করলেন এবং তিনি শাহাদাৎবরণের সম্মানের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন এবং অসিয়ত করে গেলেন হুনায়েনের যুদ্ধে যে মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন তাদের কবরের পাশে যেন তাকে কবর দেওয়া হয়।[৯] জীবিতকালে তার প্রয়াসের চেয়ে মৃত্যুকালে তিনি যা বলে গিয়েছিলেন তার প্রভাব তার স্বদেশবাসীর উপর হয়েছিল প্রচণ্ড। হত্যাকারীদের হৃদয়ে শহীদের রক্ত বিশ্বাসের ফুল হয়ে ফুটল। হঠাৎ অনুশোচনাবিদ্ধ হয়ে, সম্ভবত মরুভূমির গোত্রগুলোর সঙ্গে শত্রুতায় ক্লান্ত হয়ে তায়েফবাসীরা ক্ষমা ও ইসলাম গ্রহণের অনুমতি চেয়ে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল, যে প্রসঙ্গে আগেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যা হোক, তারা তাদের মূর্তিগুলোর জন্য কিছুটা সময় প্রার্থনা করল। প্রথমে দু'বছর, পরে এক বছর, পরে ছয় মাস; কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। শেষ আবেদনে তারা এক মাস সময়ের জন্য যুক্তি দেখালো, যা মঞ্জুর হবে বলে তারা ধারণা করেছিল। মুহম্মদ ছিলেন অনমনীয়। ইসলাম ও মূর্তি একসঙ্গে অবস্থান করতে পারে না। তখন তারা প্রাত্যহিক প্রার্থনা বা নামাজ কায়েম করা থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করল। মুহম্মদ উত্তর দিলেন যে প্রার্থনা ছাড়া ধর্ম অর্থহীন।[১০] অবশেষে দুঃখের সঙ্গে তারা সব প্রয়োজনীয় বিষয় মেনে নিল। যাহোক তাদেরকে নিজ হাতে মূর্তি ভাঙা থেকে মুক্তি দেওয়া হল; আর হার্বের পুত্র দুষ্ট আবু সুফিয়ান, বিখ্যাত মুবিয়ার পিতা—ইসলামের "জুডাস ইস্ক্রিয়াট", যাকে অন্যতম 'মুল্লাফাতুল কুলুব' (নামমাত্র বিশ্বাসী) নামে নিন্দিত করা হয়েছে—কারণ তারা শুধু নীতির খাতিরে ইসলাম গ্রহণ করেছিল এবং ওরওয়ার ভাগ্নে মুগিরা—এই দু'জন মূর্তি ধ্বংসের জন্য নির্বাচিত হল। তায়েফের নারীদের হতাশা ও দুঃখ উচ্চনাদী চীৎকারের মধ্যে তারা তাদের ন্যস্ত কাজ সমাপ্ত করল।[১১]

এ সময় তাঈয়ের গোত্রটি অবাধ্য ছিল এবং পৌত্তলিক পুরোহিত তন্ত্র তাদের ধর্মদ্রোহিতা জিইয়ে রাখছিল। আলির নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠানো হল তাদের আনুগত্য আদায় করতে এবং তাদের মূর্তিগুলোকে ধূলিসাৎ করতে। আদি বিখ্যাত হাতেমের পুত্র হাতেমের মহানুভবতা ও উদারতার কথা কবি ও চারণ কবিরা গেয়েছেন সারা প্রাচ্যজাহানে। এই আদি তখন এই গোত্রের প্রধান। আলীর আসার কথা শুনে সে সিরিয়ায় পালিয়ে গেল; কিন্তু তার বোন কিছু সংখ্যক জ্ঞাতি প্রধানসহ মুসলমানদের হাতে বন্দী হল। তাদেরকে সসম্মানে ও সহানুভূতির সঙ্গে মদিনায় নিয়ে যাওয়া হল। অবিলম্বে মুহম্মদ হাতিম-দুহিতা ও তার লোকজনদেরকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলেন এবং তাদেরকে অনেক মূল্যবান উপঢৌকন দিলেন। সে সিরিয়ায় তার ভাইয়ের কাছে গিয়ে মুহম্মদের পদতলে আত্মসমর্পণ করল এবং শেষপর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করল। নিজের লোকজনদের কাছে ফিরে গিয়ে সকলকে পৌত্তলিকতা বর্জন করতে প্রবুদ্ধ করল। একদা সে বণী তাঈ পৌত্তলিকতায় নিমজ্জিত ছিল এখন থেকে তারা মুহম্মদের ধর্মের অনুগত ভক্তে রূপান্তরিত হল।[১২]

বণী তাই গোত্রের ধর্মান্তরকরণের প্রায় একইসময়ে অপর একটি উল্লেখযোগ্য ধর্মান্তরকরণ সংঘটিত হয়েছিল যা শুধু উল্লেখেরই দাবী রাখে না। মুসলমানদের বিরুদ্ধে

www.amarboi.org

শত্রুতা উদ্দীপিত করার জন্য মোযায়না গোত্রের একজন বিশিষ্ট কবি কাব ইবনে জোয়াহের নিষেধাজ্ঞার অধীন ছিলেন। তার ভাই ছিলেন মুসলমান এবং তিনি তাকে পৌত্তলিকতা বর্জন এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রবলভাবে উপদেশ দিয়েছিলেন। কাব তার ভাইয়ের উপদেশ মেনে নিয়ে গোপনে মদিনায় গিয়েছিলেন এবং মসজিদে, যেখানে সকলকে উপদেশ দিতেন তিনি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি দেখলেন যে একজন মানুষকে ঘিরে বহু আরববাসী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর উপদেশ শুনছে। তিনি তৎক্ষণাৎ হযরতকে চিনতে পারলেন এবং বেষ্টনী ভেদ করে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, "হে আল্লাহর রাসুল, আমি যদি কাবকে মুসলমান হিসেবে আপনার সামনে আনি, আপনি কি তাকে ক্ষমা করবেন?" মুহম্মদ বললেন, "হ্যাঁ, আমিই যুহায়ের পুত্র কাব।" কিছু সংখ্যক লোক তাঁকে হত্যা করার জন্য হযরতের অনুমতি চাইল। হযরত বললেন, "না। আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" কাব তখন কাসিদা[১৩] (কবিতা) পড়ে শোনানোর জন্য অনুমতি চাইল, যা আরবী কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে সর্বকালে বিবেচিত হয়ে থাকে। যখন তিনি আবৃত্তি করতে করতে এই অধ্যায়ের শীর্ষদেশে উদ্ধৃত অংশে[১৪] পৌঁছলেন তখন হযরত তাকে নিজের উষ্ণীষ দান করলেন। এই উষ্ণীষটি এই পরিবার মুয়াবিয়ার নিকট ৪০,০০০ দিরহামে বিক্রয় করেছিল এবং উমাইয়া ও আব্বাসিয়াদের হাতে চলে গেল, এবং এখন তা অটোম্যান খলিফাদের অধিকারে রয়েছে।[১৫]

এখনও পর্যন্ত পৌত্তলিকদের কাবাগৃহে প্রবেশ কিংবা পবিত্র কাবাপ্রাঙ্গণে পুরাতন পৌত্তলিক প্রথা অনুষ্ঠানের উপর কোন বিধিনিষেধ জারি করা হয়নি। এখন এই মিশ্র অবস্থা বন্ধ করার জন্য এবং যারা নতুন ও বিশুদ্ধ ধর্মমত কতকটা হাল্কাভাবে গ্রহণ করছে তাদের ক্ষেত্রে পৌত্তলিকতার সম্ভাবনার চির অবসান ঘটানোর জন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হল। সেই মোতাবেক এই বছরের শেষের দিকে হজের মাসে ইয়াওমুন নাইরে অর্থাৎ মহান কোরবানীর দিনে জনতার সামনে একটি ঘোষণাপত্র পাঠ করে শোনানোর জন্য আলীকে নিযুক্ত করা হল। এই ঘোষণাপত্র সরাসরি পৌত্তলিকতা এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অনৈতিক ক্রিয়াবলীর মর্মমূলে আঘাত হানল।" এই বছরের পরে কোন পৌত্তলিক কাবাগৃহে হজ করতে পারবে না, আর নগ্ন অবস্থায়[১৬] কেউ এই গৃহ প্রদক্ষিণ করবে না; যাদের সঙ্গে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে সন্ধির শেষ সীমা পর্যন্ত এটা বলবৎ থাকবে; অবশিষ্ট লোকদের ক্ষেত্রে দেশে ফিরে আসার জন্য চার মাস সময় দেয়া হল; অতঃপর যাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তাদের ছাড়া আর কারও প্রতি হযরতের বাধ্যবাধ্যকতা থাকবে না।"[১৭]

মুসলিম লেখকগণ এই ঘোষণাকে "ভারমোচনের ঘোষণা" বলে অভিহিত করেছেন। এটা হযরতের পক্ষে দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার প্রকাশ। তখনকার সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার পক্ষে টিকে থাকা দায় ছিল। যদি বছরের পর বছর পৌত্তলিক তীর্থযাত্রীরা মুসলমান তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মিশে তাদের ধর্মমতের কামুকতাপূর্ণ ও অধোগামী

www.amarboi.org

প্রথাসমূহ অনুষ্ঠিত ও অনুমোদিত হত, তবে মুহম্মদ কঠিন পরিশ্রমের মাধ্যমে যা সম্পাদন করেছিলেন তা শীঘ্রই নির্মূল হয়ে যেত। ইতিহাসে দেখা যায় পৌত্তলিকদের মধ্যে আরবদের মতো আর একটি মেধাবী অথচ অমার্জিত শাখা ছিল, ব্যালের উপাসকদের পাইকারী হত্যার মাধ্যমে এই শাখার নেতৃবৃন্দ জিহোভার উপাসনাকে সংরক্ষিত করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হলেন। ইসরাইলগণ তাদের চারপাশের অনিষ্টকর প্রভাবের অধীনেই শুধু অবসিত হয়নি বরং তারা প্রথমে যাদের প্রতি অকথ্য অশ্লীল ভাষায় ঘৃণা প্রকাশ করত তাদেরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মুহম্মদ অনুভব করেছিলেন যে পৌত্তলিকতার সঙ্গে যে কোন ধরনের আপোষ তাঁর সব প্রয়াস ব্যর্থ করে দেবে। ফলে তিনি আপাতদৃষ্টিতে কঠোর উপায় অবলম্বন করলেও তা ছিল চূড়ান্তভাবে হিতকর প্রবণতায় পরিপূর্ণ। যে বিশাল জনতা আলীর ঘোষণা শুনেছিল তারা দেশে ফিরে এল এবং পরবর্তী বছর শেষ হওয়ার আগেই তাদের অধিকাংশ ইসলাম গ্রহণ করল।

পাদটীকা

১. ইবনে হিশাম্ পৃ. ৯৩৪; ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯।
২. আমি অগাস্তাসের অধীনে এলিয়াম গ্যালাসের অভিযানের ইঙ্গিত দিচ্ছি।
৩. এদের 'বাক্কাউন' বা 'ক্রন্দনকারী' বলা হত, কেননা তারা বিপদজনক শত্রুকে প্রতিরোধ করার পবিত্র প্রচেষ্টায় সামিল না হতে পারার অক্ষমতার জন্য বিব্রত বোধ করেছিল।— ইববে হিশাম, পৃ. ৭৯১; আল্ হালাবীর ইনসানুল উয়ুন, ৩য় খণ্ড, , পৃ. ৭৫।
৪. মুনাফিকদের দুরভিসন্ধি কোরানের নবম সুরার ৮২ আয়াতে নিন্দিত হয়েছে। এই গুপ্তষড়যন্ত্রকারীরা জাসুমের শহরতলীর কাছে সোয়ায়লিম নামক এক ইহুদীর গৃহে সমবেত হত। পরিশেষে এই গৃহ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই সময় মহান শিক্ষক ভবিষ্যাণী করেছিলেন যে প্রকৃত অনুসারীদের কল্যাণ-প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য ইসলামে সব সময়েই মুনাফিকদের আবির্ভাব ঘটবে।
৫. ইবনে হিশাম, পৃ ৮৯৭।
শিয়াদের মতে, হযরত এই বাক্যাবলীর মধ্যে স্পষ্টত নির্দেশ করেছেন যে আলী তাঁর প্রতিনিধি হবেন।
৬. কসিন দ্য পার্সিভ্যাল, ৩য় খণ্ড, , পৃ. ২৮৫, ২৮৬
৭. ৭ ইবনে হিশাম, পৃ. ৯০৪; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৫; আবুল ফিদা, পৃ. ৮৫।
৮. সি দ্য পার্সিভেলের মতে ৬৩০ খ্রীঃ-এর ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। কোরআনের ৪র্থ অধ্যায়ে এ সব ঘটনা বিষদভাবে বিবৃত হয়েছে। তাবুকে মুহম্মদ বহু স্থানীয় নেতাদের আনুগত্য লাভ করেছিলেন।
৯. ইবনে হিশাম, পৃ. ৯১৪, ৯১৫; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৬।
১০. ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৭।
১১. ইবনে হিশাম পৃ. ৯১৭, ৯১৮; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৬১-১৬৩। নবম হিজরীতে হযরত মুহম্মদ বহুসংখ্যক প্রতিনিধি গ্রহণ করেছিলেন এবং এই ঘটনাবলী "প্রতিনিধি প্রেরণের বৎসর" হিসেবে অভিহিত হয়েছে। সাকিফদের ধর্মান্তরকরণের অব্যবহিত পরেই যারা

www.amarboi.org

ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তারা হল ইয়েমেন, মাহরা, ওমান, বাহরায়েন এবং ইয়ামামার যুবরাজগণ।

১২. ইবনে হিশাম. পৃ. ৯৪৮-৯৪৯; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৮; 'ইনসানুল উয়ুন' ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৪। আদির ধর্মান্তকরণ ঘটেছিল নবম হিজরীর রবিউস সানী মাসে (৬৩০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই-আগস্ট) এবং সেই অনুসারে তাবুক অভিযানের পূর্বেই তা বিন্যস্ত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমি আরব ঐতিহাসিকদের ঘটনাবিন্যাস প্রণালী অনুসরণ করেছি। হাতিম-দুহিতার নাম ছিল সুফানা। সে যখন হযরতের সামনে উপস্থিত হল তখন সে নিম্নোক্ত ভাষায় তাঁকে সম্বোধন করল : "হে আল্লাহর রাসুল, আমার পিতা মৃত; আমার ভ্রাতা আমার একমাত্র আত্মীয় মুসলমানদের আগমনের কথা শুনে পর্বতে পালিয়ে গেছে। আমি আমার মুক্তিপণ দিতে অক্ষম। আমার মুক্তির জন্য আপনার বদান্যতা কামনা করি। আমার পিতা একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন—তিনি তাঁর গোত্রের যুবরাজ ছিলেন, তিনি মুক্তিপণ দিয়ে বহু বন্দীর মুক্তি দান করতেন; নারীদের সম্মান রাখতেন; দীনদরিদ্রদের আহার্য দান করতেন; দুর্দশাগ্রস্তদের সান্ত্বনা দিতেন; কারও বাঞ্ছা অপূরণ রাখতেন না। আমি হাতিম-দুহিতা সুফানা। মুহম্মদ উত্তর দিলেন, "তোমার পিতার একজন মুসলমানের গুণাবলী ছিল; যদি আমার পক্ষে এমন কোন ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করা সম্ভব হত যে পৌত্তলিকতার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছে তাহলে আমি হাতিমের আত্মার জন্য প্রার্থনা করতাম।" তখন আশেপাশের মুসলমানদের সম্বোধন করে হযরত বললেন, "হাতিম-দুহিতা স্বাধীন; তার পিতা একজন দানশীল ও দয়ালু মানুষ ছিলেন, আল্লাহ দয়ালু লোকদের ভালবাসেন ও পুরস্কার দেন।" সুফানাসহ তার সব লোকজনকে মুক্তি দেওয়া হল। পারস্যের কবি সাদার বোস্তানে এই হৃদয়স্পর্শী ঘটনা সম্পর্কে কতিপয় সুন্দর পঙ্‌ক্তি রয়েছে।

১৩. কবিতাটির প্রারম্ভিক শব্দগুলি থেকে এর নাম 'বানাত সুয়াদের কাসিদা' বলে অভিহিত হয়েছে। সাধারণভাবে আরবী 'কাসিদা' যেভাবে প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু হয় এ কবিতাও তেমনি শুরু হয়েছে। সোয়াদের (কবির প্রেমিকার) তিরোভাবে কবি তার বেদনা প্রকাশ করেছেন; তিনি তাকে ছেড়ে চলে গেছেন; তার হৃদয় বেদনা উদ্বেল হয়ে উঠেছে। এই ভেবে যে তার প্রিয়া আজ বন্দিনী। কবি প্রিয়ার সৌন্দর্য, তার মধুর কণ্ঠস্বর, তার উজ্জ্বল হাসি, তার হৃদয়স্পর্শী মুচকি হাসির প্রশংসা করছেন। বিষয়বস্তু হঠাৎ পরিবর্তিত হয়েছে এবং কবি তার কবিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উত্তরণ করেছেন যখন তিনি তার মহান বিষয়বস্তুর গান শুরু করেছেন। কাসিদার ভাষা সর্বত্র গম্ভীর ভাবপূর্ণ ও বীর্যবান—এমন একটি গুণ যা পরবর্তীকালের কবিতায় প্রায়ই অভাব রয়েছে—আর শেষপর্যন্ত কবিতাটিতে ছন্দের প্রবাহ ও স্বরের আন্দোলন অসাধারণ সমতার সঙ্গে রক্ষিত হয়েছে।

১৩. "হযরত হলেন আলোর মশাল উজ্জলিছেন ধরাভূমি—খোদার অসা, কেটে তিনি চলেন সদা না—খোদার ঐ বধ্যভূমি।"

১৫. 'খিরকা শরীফ' (পবিত্র উষ্ণীষ) নামে অভিহিত; জরুরী পরিস্থিতিতে এই খিরকা জাতীয় মানদণ্ড হিসেবে গৃহীত হয়ে থাকে। 'বানাত সুয়াদের কাসিদা' কে কোন কোন সময় 'কাসিদাতুল বারদা' (উষ্ণীষের কাসিদা)-ও বলা হয়ে থাকে। এই কাসিদা আব্দুল্লাহ মুহম্মদ ইবনে সায়িদ প্রণীত কাসিদা থেকে স্বতন্ত্র। আব্দুল্লাহ মুহম্মদ বিন সায়িদ মালিক জহীরের রাজত্বকালে জীবনাতিবাহিত করেছিলেন। তার কাসিদার আরম্ভ নিম্নরূপ ঃ জি সালামের প্রতিবেশী স্মরণে কি বইয়ে দিলে রুধির সাথে আখিবারি?

১৬. পৌত্তলিক আরবদের এক লজ্জাকর প্রথার উল্লেখ আছে।

১৭. ইবনে হিশাম পৃ. ৯২১, ৯২২; ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২২; আবুল ফিদা, পৃ. ৮৭।

www.amarboi.org

নবম অধ্যায়

হযরতের নবুয়্যতের কার্যভার সম্পন্ন

আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় যখন এসে পড়ল আর আপনি দেখে নিলেন : লোকজন দলে দলে আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থায় দাখিল হচ্ছে। সুতরাং আপনি নিজ পালনকর্তার প্রশংসায় তসবীহ্ পাঠ করতে থাকুন, আর তাঁরই কাছে ক্ষমা চাইতে থাকুন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাকারী, তাওবা মঞ্জুরকারী। —সু. ১১০ আ. ১-৩

১০ হিযরী ৯ই এপ্রিল ৬৩১ থেকে ২৯শে মার্চ ৬৩২ খ্রি. : পূর্ববর্তী অন্যান্য বছরের মতো এ বছরেও[১] আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে অসংখ্য রাষ্ট্রদূত তাদের গোত্রপ্রধান ও গোত্রের অন্তর্ভুক্তির প্রমাণস্বরূপ মদিনায় উপস্থিত হতে থাকলেন। বিভিন্ন প্রদেশে যে সব ধর্ম-প্রচারককে মুহম্মদ প্রেরণ করেছিলেন তাদের সবাইকে একইরূপে নিম্নোক্ত নির্দেশাবলী দিয়েছিলেন : "লোকজনদের সঙ্গে ভদ্রোচিত ব্যবহার করবে এবং কর্কশ হবে না; তাদেরকে উৎসাহিত করবে, অবজ্ঞা করবে না। আর তোমাদের সঙ্গে আসমানী কিতাবধারী[২] অনেক লোকের সাক্ষাৎ হবে, তারা প্রশ্ন করবে : বেহেশতে যাওয়ার উপায় কি? তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহর অস্তিত্বের সত্যতার সাক্ষ্য দেওয়া এবং সৎ কাজ করা স্বর্গে যাওয়ার উপায়।"[৩]

মুহম্মদের নবুয়্যতের দায়িত্বভার এবার অর্জিত হল। বর্বরতায় নিমজ্জিত এক জাতির নিকট একজন নবী এসেছিলেন "তাদের কাছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ বারবার আবৃত্তি করে তাদেরকে পবিত্র করতে; তাদেরকে প্রত্যাদেশ ও জ্ঞান শিক্ষা দিতে যারা একদা নিরতিশয় অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।"[৪] তিনি তাদেরকে দেখতে পেয়েছিলেন অবমাননাকর ও রক্তক্ষয়ী কুসংস্কারে নিমজ্জিত; তিনি সত্য ও প্রেমের ধারক একমাত্র আল্লাহর বিশ্বাসের দ্বারা তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তিনি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে লিপ্ত দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি ভ্রাতৃত্ব ও বদান্যতার বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। স্মরণাতীতকাল থেকে আরব উপদ্বীপ অনৈতিকতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। অধ্যাত্ম জীবনবোধ সম্পর্কে কিছুই জানত না। ইহুদীরা বা খ্রিস্টধর্ম আরবমননের উপর কোন স্থায়ী প্রভাব বিস্তার রাখতে পারেনি। দেশের জনগণ কুসংস্কার,

www.amarboi.org

নিষ্ঠুরতা ও পাপে ছিল নিমজ্জিত। অবৈধ যৌনাচার ও কন্যা-সন্তান হত্যার মতো নারকীয় পাপ অহরহ অনুষ্ঠিত হত। জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তান সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিসহ বিধবা মাতাকেও সম্পত্তি হিসেবে পেত। এর চেয়েও অমানুষিক প্রথা ছিল নির্দয় পিতা তার জীবিত কন্যা সন্তানকে কবর দিত। কোরাইশ ও কিন্দা বংশের লোকদের মধ্যে হিন্দু রাজপুতদের মতো এই প্রথা খুবই শক্ত শিকড় গেড়ে বসেছিল এবং তাতে তারা গৌরববোধ করত। মানুষের কর্মের উদ্দেশ্য হিসেবে পরকালের অস্তিত্ব, ভালমন্দের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অজানা। হযরতের আবির্ভাবের মাত্র কয়েক বছর আগে আরবের এই অবস্থা ছিল। এই কয়েক বছরের মধ্যে কি অভাবনীয় পরিবর্তন! স্বর্গের ফেরেশতা যথার্থই এই দেশের উপর দিয়ে বিচরণ করছিলেন এবং যেসব লোক তখনও পর্যন্ত অর্ধবর্বরতার বিদ্রোহাত্মক প্রথায় নিমজ্জিত ছিল তাদের হৃদয়ে একতা ও প্রেমের ভাব উদ্দীপিত করেছিলেন। যা ছিল একদা নৈতিকতার মরুভূমি, যেখানে মানবীয় ও ঐশী কানুন উপেক্ষিত ও বিনা অনুশোচনায় অবহেলিত হত, এখন তা পুষ্পকানন হয়ে গেল। সীমাহীন অবমাননাসহ পৌত্তলিকতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হল। ইসলাম একটি মহান ধর্মব্যবস্থার একমাত্র একক দৃষ্টান্ত। যদিও এমন এক জাতির মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল এবং বহুলাংশে অনুশীলিত হয়েছিল যারা আদিম সভ্যতার উষালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বের হয়নি তবুও তা তার অনুসারীদেরকে পৌত্তলিকতা থেকে মুক্ত রাখতে সমর্থ হয়েছিল। এই ঘটনা সঙ্গতভাবেই ইসলামের মুখ্য গৌরব ও এই ধর্মের প্রচারকের প্রতিভার সর্বাপেক্ষা নিরতিশয় কুসংস্কার, অমানুষিক অনুশীলন ও অবাধ নীতিহীনতা থেকে মুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছিল। কিন্তু যতক্ষণ না তারা "আল্লাহর মনোনীত রাসুলে"র "আত্মা-উদ্দীপিতকারী প্রয়াসে"র ঘটনা দেখেছে তার পূর্বে তারা শক্তি ও প্রেমের সর্বপ্লাবী মহাশক্তি আল্লাহর সত্যতা সম্পর্কে সচেতন হয়নি। এই সময় হতে তাদের লক্ষ্য শুধু এই জগতের উপরই নিবদ্ধ হল না, পরকালেও উচ্চতর, বিশুদ্ধতর ও অধিকতর বিষয় রয়েছে যা তাদেরকে দানশীলতা, সৎকর্মশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও সার্বজনীন প্রেম অনুশীলনের জন্য আহ্বান জানাল। আল্লাহ্ কাঠ বা পাথরে খোদিত আজ বা কালকের আল্লাহর নন, তিনি জগতের শক্তিশালী, প্রেমময়, দয়ালু সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহর নির্দেশের অধীনে মুহম্মদ এই নবজাগরণের উৎস—তিনি অত্যুজ্জ্বল প্রস্রবণ, যা থেকে তাদের অনন্তের প্রতি প্রবাহ উৎসারিত হয়েছে এবং তাঁর প্রতি তারা যথোপযুক্ত আনুগত্য ও সম্মান দেখিয়েছে, তারা একই বাসনায়, সত্য ও সততায় এবং জীবনের সকল কাজে নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার মহান ব্রতে উদ্দীপিত হল। সত্য, স্বতঃসিদ্ধ, উপদেশাবলী যা মুহম্মদ বিগত বিশ বছর ধরে তাঁর শিষ্যদের সামনে প্রচার করেছিলেন তা তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল এবং প্রত্যেক কার্যের নিয়ামক নীতি হিসেবে পরিণত হয়েছিল। আইন ও নৈতিকতার সমন্বয় ঘটেছিল। "আদি খ্রিস্টধর্ম জগতবাসীকে তাদের নিদ্রা থেকে জাগরিত করার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে মারাত্মক লড়াই শুরু করার সময় থেকে আধ্যাত্মিক জীবনবোধের এমন জাগরণ মানুষ আর দেখেনি—এমন ধর্ম যা

www.amarboi.org

প্রভৃত ত্যাগ করেছে এবং বিবেকের খাতিরে হাসিমুখে বিষয়-আশয়ের ক্ষতি স্বীকার করেছে।"[৪]

মুহম্মদের মহান কর্মভার এখন পূর্ণ হল। এই ঘটনা অর্থাৎ জীবদ্দশায় সমুদয় কার্য সুসম্পন্ন করার ঘটনার মধ্যে নিহিত রয়েছে অন্যান্য কালের, অন্যান্য দেশের নবীরাসূল, জ্ঞানী ও দার্শনিকদের উপর তাঁর বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব। খ্রিস্ট, মুসা, জরথুস্ত্র, শাক্যমুনী, প্লেটো—সকলেরই আল্লাহর রাজ্যসমূহ সম্পর্কে ধারণা ছিল, ছিল প্রজাতন্ত্র তাদের বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে প্রত্যয়, আর এ সবের সাহায্যে অধঃপতিত মানবতাকে নতুন নৈতিক জীবনে উন্নীত করতে হয়েছিল। সকলেই তাঁদের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রেখে তাঁদের উজ্জ্বল দিব্যদৃষ্টি অসমাপ্ত রেখে কিংবা তাদের রক্তপিপাসু শিষ্য বা সম্রাট শিষ্যদের হাতে তাদের উত্তরণের দায়িত্ব পালনের ভার ন্যস্ত করে বিদায় নিয়েছেন।[৫] একমাত্র মুহম্মদ তাঁর মহান কর্মের দায়িত্ব সমাপ্ত করতে পেরেছিলেন, তাঁর পূর্বসূরীদের আরব্ধ কাজের পরিপূর্ণতা দান করতে পেরেছিলেন। একমাত্র তিনি মানবজাতির উন্নয়নের কাজ পরিসমাপ্ত করতে পেরেছিলেন। তাঁর কোন সম্রাট শিষ্য তাঁর নতুন শিক্ষাসমূহ কবুল করতে তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেননি। মুসলমানেরা কি সঙ্গতভাবে বলেন না যে তাঁর যাবতীয় কাজ ছিল আল্লাহর কাজ?

এই সেদিন বিনয়নম্র প্রচারক যিনি তাঁর মাতৃভূমি শহর থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর বাণী প্রচার করতে গিয়ে প্রস্তরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি মাত্র নয় বছরের স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর জাতিকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবক্ষয়ের নিম্নতম স্তর থেকে পবিত্রতা ও ন্যায়পরায়ণতার একটি বিশেষ ধারণায় উন্নীত করেছিলেন।

হযরতের জীবন মহত্ত্ব ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সম্পাদিত এক মহান কার্যের মহত্তম দৃষ্টান্ত। একটি সুপ্ত জাতির মধ্যে তিনি প্রাণের সঞ্চার করেছিলেন; যুযুধান গোত্রসমূহকে তিনি একটি সুসংহত জাতিতে রূপ দিয়েছিলেন এবং চিরস্থায়ী জীবনের আশায় অনুপ্রাণিত করেছিলেন। মানুষের হৃদয়ে অদ্যাবধি যেসব বিচ্ছিন্ন আলোকরশ্মি নিপতিত হয়েছিল তা তিনি একটি জ্যোতির্কেন্দ্রে সুসংবদ্ধ করেছিলেন। এমন একটি কর্ম তিনি সম্পাদন করেছিলেন; আর তিনি তা এমন উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে করেছিলেন যাতে কোন আপোষ ছিল না, কোন বিরতি ছিল না; তিনি এমন অদম্য সাহস নিয়ে কাজ করেছিলেন যা কোন বাধা মানে নি, ফলাফলের কোন ভয় করেনি, তিনি এমন একক উদ্দেশ্যে কাজ করেছিলেন যার মধ্যে কোন আত্মচিন্তা ছিল না। গ্যালিলির কূলে একেশ্বরবাদী যে ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল তা এক অবতারবাদী খোদার উপাসনায় পর্যবসিত হয়েছিল; যারা নাজারাত-এর পয়গাম্বরের ধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে দেবীপূজার পুরাতন উপাসনা পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। হিরার আত্মসমাহিত, উম্মী এই দার্শনিকের এক দুর্বিনীত পৌত্তলিক জাতির মধ্যে জন্ম হয়েছিল এবং যারা তাঁর বাণী একবার শুনেছিল তিনি তাদের উপর আল্লাহর একত্ব ও মানুষের সমতা অমোচনীয়ভাবে এঁকে

www.amarboi.org

দিয়েছিলেন। তাঁর "গণতান্ত্রিক বজ্র-নির্ঘোষ" পুরোহিত ও শাসকদের বিরুদ্ধে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অভ্যুত্থানের সংকেত। "বিবদমান ধর্মমত ও নিষ্পেষণকারী ধর্মীয় বিধিনিষেধসমূহের জগতে" যখন মানুষের আত্মা অবোধ্য ধর্মমতের গুরুভারে পিষ্ট হয়েছিল এবং মানুষের দেহ কায়েমী স্বার্থের অত্যাচারে পদদলিত হয়েছিল, সেই সময় তিনি বর্ণ ও একচেটিয়া সুবিধার দেয়াল ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহর রাস্তায় মানুষের জন্য আত্মস্বার্থ যে মাকড়শার জাল বুনেছিল তা তাঁর নিঃশ্বাসের জোরে মিলিয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তিনি সব একচেটিয়া ভাব অপসারিত করেছিলেন। নিরক্ষর এই নবীর বাণী ছিল সর্বসাধারণের জন্য। তিনি জ্ঞান ও শিক্ষার মূল্য ঘোষণা করেছিলেন। কলমের সাহায্যে মানুষের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ হয়। কলমের সাহায্যে মানুষের কার্যাবলীর বিচার হবে। আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের কার্যাবলীর চূড়ান্ত মীমাংসক কলম, প্রজ্ঞা ও মানবজাতির নৈতিক শক্তির প্রতি স্থায়ী ও অপরিবর্তিত আবেদন, অলৌকিকতার বর্জন "তাঁর ঐশী প্রশাসনের সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ধারণা ধর্মীয় আদর্শের সার্বজনীনতা, অকপট মানবতা"—এসব তাঁকে তাঁর পূর্বসুরীদের থেকে পৃথক করেছে, 'ওরিয়েন্টাল রিলিজিয়ান্স'-এর গ্রন্থকার বলেন, "এ সব গুণ তাঁকে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সংযুক্ত করছে।" তাঁর জীবন ও কার্য রহস্যাবৃত নয়। তাঁর ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে রূপকথা গড়ে উঠেনি।

যখন আরববাসীগণ দলে দলে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল তখন হযরত বুঝতে পারলেন যে তাঁর দায়িত্ব শেষ হয়েছে।[৭] তাঁর যাওয়ার সময় ঘনিয়ে আসছে এই বিশ্বাসে কাবাগৃহে বিদায়ী হজ্জ পালনের জন্য সংকল্প গ্রহণ করলেন। জুলক্বাদ মাসের ২৫ তারিখে (৬৩২ খ্রি. ২৩শে ফেব্রুয়ারি) হযরত বিপুল সংখ্যক শিষ্য সঙ্গে নিয়ে মদিনা থেকে রওয়ানা হলেন।[৮] মক্কায় পৌঁছে এবং হজ্জের সব বিধি পালন সমাপ্ত করার আগে তিনি 'জাবালুল্ আরাফাতে'র শীর্ষদেশ থেকে সমবেত জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন (৮ই জিলহজ্জ, ৭ই মার্চ)। এই ভাষণ মুসলমানদের মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

"হে মানবমণ্ডলী, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো, কেননা এবারের পর আমি আর তোমাদের মধ্যে এখানে মিলিত হতে পারব কিনা জানি না।"

"এই দিন, এই মাস যেমন সকলের জন্য পবিত্র, তোমাদের জানমাল তেমনি তোমাদের জন্য পবিত্র ও অলঙ্ঘ্য যতদিন না তোমাদের প্রভুর সামনে উপস্থিত হচ্ছো: আর মনে রেখো যে তোমাদের প্রভুর সামনে তোমাদের উপস্থিত হতে হবে এবং তিনি তোমাদের কাজের হিসাব-নিকাশ গ্রহণ করবেন।...হে জনমণ্ডলী, তোমাদের স্ত্রীদের উপর যেমন তোমাদের অধিকার আছে, তোমাদের স্ত্রীদেরও তেমনি তোমাদের উপর অধিকার রয়েছে।...দয়া ও ভালবাসার মাধ্যমে তাদের সঙ্গে আচরণ করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর জামিনে তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তারা তোমাদের জন্য বৈধ হয়েছে।" "তোমাদের উপর যে বিশ্বাস ন্যস্ত হয়েছে তার প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত থাকবে এবং পাপ পরিহার করবে।" "সুদ অবৈধ ঘোষিত হল।"[৯] অধমর্ণ

www.amarboi.org

শুধু মূল দেয়টাই ফেরত দেবে, আর আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র আমার চাচা আব্বাসের নিকট থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ থেকেই শুরু হবে এর শুরু।[১০] ... এই সময় থেকে অন্ধকার যুগের অনুশীলিত রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ নিষিদ্ধ হল এবং আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র হারিস তস্যপুত্র ইবনে রাবিয়ার[১১] হত্যাকাণ্ড থেকে সব ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটল।...

"আর তোমাদের দাসগণ! তোমরা যে খাবার গ্রহণ করবে তাদেরকেও সেই খাদ্য প্রদান করবে, আর তোমরা যে বস্ত্রপরিধান করবে তাদেরকেও সেই বস্ত্র পরিধান করতে দেবে। যদি তোমাদের কোন দাস এমন দোষ করে থাকে যা তোমরা ক্ষমা করতে পারছ না তবে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কর, তারা প্রভুর দাস এবং রূঢ় আচরণের যোগ্য নয়।"

"হে জনমণ্ডলী, আমার কথা শোন এবং তা বুঝতে চেষ্টা কর। মনে রাখবে যে এক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। তোমরা এক ভ্রাতৃ-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত। কারও দ্রব্য অন্যের জন্য বৈধ নয় যদি সে তা সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে নিজের ইচ্ছায় দান না করে। অন্যায় থেকে বিরত থাকবে।"

"যারা এখানে আছ তারা এখানে যারা নাই তাদেরকে সব বলবে। সম্ভবত যে শুনবে সে যে শুনেছে তার চেয়ে অধিক স্মরণ রাখতে পারবে।"[১২]

আরাফাত পর্বতে দেয়া ভাষণ কবিত্বের দিক থেকে অন্যান্য ভাষণ হতে কম সুন্দর নিশ্চয়ই, কম মরমীবাদী হলেও তা বাস্তবতা ও শক্তিশালী সাধারণ বুদ্ধির মাধ্যমে উচ্চতর মননে আবেদনশীল এবং যে সব নিম্নস্তরের স্বভাব যা নৈতিক নির্দেশনার জন্য সদর্থক ও বোধগম্য দিক-নির্দেশের প্রয়োজন বোধ করে তার ক্ষমতা ও দাবীর সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ভাষণ সমাপ্তির সময় জনগণের উদ্বেলচিত্ততার দিকে লক্ষ্য করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে হযরত বললেন, "হে আমার প্রভু, আমি আমার পয়গাম পৌঁছে দিয়েছি ও আমার কার্য শেষ করেছি।" নিম্নে সমবেত বিশাল জনতা সম্মিলিত কণ্ঠে জবাব দিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আপনি আপনার দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন।" "হে আমার প্রভু, আমি মিনতি করছি, আপনি এ বিষয়ে সাক্ষী থাকুন।"

এই কথা বলে হযরত তাঁর ভাষণ শেষ করলেন। আরবের ঐতিহ্য অনুসারে এই ভাষণ বিস্তার, বাগ্মিতা ও প্রাণবন্ততার জন্য উল্লেখযোগ্য। হজ্জের আবশ্যিক বিধি পালন করেই হযরত তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে করে মদিনায় ফিরে গেলেন।[১৩]

১১. হি. ২৯ মার্চ ৬৩২-১৮ই মার্চ ৬৩৩ খ্রি. : মদিনা শহরেই মুহম্মদের জীবনের শেষ বছরটি অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি প্রদেশসমূহ ও গোত্রীয় সম্প্রদায়সমূহ যারা ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী যুক্তরাষ্ট্রের সদস্য হয়েছে তাদের সংগঠিত করলেন। যদিও ইসলাম ধর্ম সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ায় বসতি স্থাপনকারী আরব বংশোদ্ভূতদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেনি; তাদের অধিকাংশ ছিল খ্রিস্টধর্মাবলম্বী। কিন্তু সমগ্র আরবদেশ ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিল। ইসলাম ধর্মের কর্তব্যসমূহ শিক্ষা দেওয়ার

www.amarboi.org

জন্য, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, জাকাত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রদেশে ও বিভিন্ন গোত্রের নিকট অফিসার পাঠান হল। মোয়াজ ইবনে জবালকে ইয়েমেনে পাঠানো হল এবং মুহম্মদের বিদায়ী নির্দেশ হল যে সব ব্যাপারে কোরআনের কোন প্রত্যক্ষ পাওয়া যাবে না সে সব ব্যাপারে নিজস্ব বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে হবে। আলীকে, ইয়েমামায় প্রতিনিধি হিসেবে পাঠান হল, তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হল ঃ "যখন দু'দল তোমার কাছে বিচারের জন্য আসবে তখন তাদের উভয় দলের কথা না শুনে কোন সিদ্ধান্তে পৌছবে না।"

জায়েদের পুত্র ওসামার (যে জায়েদ মুতার যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন)নেতৃত্বে সিরিয়ায় মুসলিম দূত হত্যার দীর্ঘবিলম্বিত প্রতিশোধ নেয়ার জন্য একটি অভিযানের প্রস্তুতিও আরম্ভ হয়েছিল। বাস্তবিক যাত্রার জন্য সৈন্যবাহিনী শহরের বাইরে ছাউনী ফেলে অপেক্ষা করছিল। খায়বারে ইহুদী রমণী যে বিষ হযরতকে প্রয়োগ করেছিল এবং যা ধীরে ধীরে তাঁর দেহের সর্বত্র প্রবেশ করেছিল তা এখন চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে লাগল এবং প্রতীয়মান হল যে তাঁর দিন ফুরিয়ে আসছে। তাঁর আসন্ন মৃত্যুর খবরে ওসামার নেতৃত্বে যে অভিযান পাঠানোর জন্য প্রস্তুত হয়েছিল তা স্থগিত হল। এই সংবাদে সীমান্তবর্তী কয়েকটি প্রদেশেও বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তিনজন প্রতারক তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও লুঠতরাজের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঐশী পরোয়ানা প্রাপ্তির দাবী প্রচার করতে লাগল। তারা নিজেদেরকে পয়গাম্বর হিসেবে প্রচার করতে লাগল এবং সব ধরনের জালিয়াতির সাহায্যে তাদের গোত্রের লোকদের অনুমোদনের চেষ্টা চালাতে লাগল। তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক ব্যক্তি ছিল আয়হালা ইবনে কাব, আল্আস্ওয়াদ (কৃষ্ণকায়) নামে সমধিক পরিচিত। সে ছিল ইয়েমেনের প্রধান, বিপুল সম্পদ ও প্রভূত বুদ্ধির অধিকারী, অতীব চালাক লোক। তার গোত্রের সরল বিশ্বাসী লোকদের নিকট সে যে ভেল্কীবাজী দেখাল তা ঐশী বিশিষ্টতা পেল। সে শীঘ্রই তাদেরকে দলভুক্ত করল এবং তাদের সাহায্যে প্রতিবেশী অনেক শহরের বশ্যতা আদায় করল। সে শাহরকে হত্যা করল। হযরত মুহম্মদ বাজানের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র শাহরকে সানার প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন। পারস্যের খসরুর অধীনে বাজান ইয়েমেনের গভর্নর ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর হযরত তাকে ঐ পদেই বহাল রেখেছিলেন। তিনি তার জীবদ্দশায় শুধু ইয়েমেনে বসবাসকারী তার স্বদেশবাসী 'আবনা'দের উপরই প্রভাবশালী ছিলেন না, বরং প্রদেশের আরবদের উপরও প্রভাবশালী ছিলেন। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইয়েমেনের পারসিকগণ মুসলমান হয়ে গেল। প্রতারক আল্ আসওয়াদ শাহরকে হত্যা করল এবং জোর করে মারজাবানকে বিয়ে করল। এক নৈশপানোৎসব শেষে সে যখন মাতাল অবস্থায়, তখন মারজাবানার সাহায্যে এক 'আবনা' তাকে হত্যা করল। অপর দু'জন প্রতারক হল খোওয়ালিদের পুত্র তুলাইহা এবং হাবিবের পুত্র আবু সুমামা হারান, সাধারণ্যে মুসাইলিমা নামে পরিচিত। আবু বকরের খেলাফত লাভের পূর্বে তাদেরকে দমন করা যায়নি। মুসাইলিমা নিম্নোক্ত ভাষায় হযরতকে আহ্বান করার স্পর্ধা

www.amarboi.org

দেখিয়েছিল ঃ "আল্লাহর রাসূল মুসাইলিমা থেকে আল্লাহর রাসূল মুহম্মদের প্রতি ঃ আস্‌সালামু আলায়কুম! আমি আপনার অংশীদার; ক্ষমতা আমাদের মধ্যে অবশ্যই ভাগ করতে হবে।—পৃথিবীর অর্ধেক আমার, বাকী অর্ধেক আপনার কোরাইশদের। কিন্তু কোরাইশরা লোভী জাতি—তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার নেই।" মুহম্মদ যে উত্তর দিয়েছিলেন তাতে তাঁর চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে ঃ পরমদাতা ও দয়ালু আল্লার নামে আল্লাহর রাসুল মুহম্মদ থেকে প্রতারক মুসাইলিমার প্রতি ঃ যারা সত্যপথের অনুসারী তাদের প্রতি সালাম। পৃথিবী আল্লাহর; তিনি যার প্রতি সদয় হন তাকেই দুনিয়ার কর্তৃত্ব দান করেন। কেবল পরহিজগারদের জন্যই পরকাল (শুধু তারাই সুফল লাভ করবে যারা আল্লাহকে ভয় করবে)।

হযরতের শেষ দিনগুলি তাঁর মনের প্রশান্তি ও স্থৈর্যের জন্য উল্লেখযোগ্য। যদিও তিনি দৈহিক দিক দিয়ে দুর্বল ছিলেন তথাপি তাঁর মানসিক অবস্থা মৃত্যুর তিনদিন পূর্ব পর্যন্ত তাকে জামাতে ইমামতি করতে শক্তি জুগিয়েছিল। একদা গভীর রাত্রে তিনি তাঁর পুরাতন সঙ্গীদের সমাধি ক্ষেত্রে গেলেন এবং তাদের সমাধির পাশে তাদের জন্য আল্লাহর রহমত কামনা করে প্রার্থনা করলেন ও অশ্রু বিসর্জন করলেন। এই অসুস্থতার সময়ে মসজিদসংলগ্ন আয়েশার গৃহে অবস্থান করতেই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন এবং যতদিন পর্যন্ত শরীরে কুলাল তিনি জামাতে যোগদান করলেন। শেষবারে তিনি যখন মসজিদে গেলেন, তিনি আলী আব্বাসের পুত্র ফজলের কাঁধে ভর করে মসজিদে গমন করেছিলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে এক অনির্বচনীয় মাধুর্যের মৃদু হাসি প্রকাশিত হয়েছিল—তাঁর আশপাশে যারা ছিলেন তারা সবাই এটা লক্ষ্য করেছিলেন। আল্লাহর প্রতি অত্যন্ত প্রশংসা জ্ঞাপনের পর তিনি সমবেত সকলকে বললেন, "হে মোসলেমগণ, যদি আমি তোমাদের কারও প্রতি কোন অন্যায় করে থাকি তবে আমি তার প্রতিকারের জন্য এখানে উপস্থিত আছি। যদি কারও কাছে আমার ধার থেকে থাকে তবে আমার যা কিছু আছে তা তার বা তাদেরই। "এ কথা শুনে জনতার মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে তিন দিরহাম দাবী করল যা সে হযরতের অনুরোধে একজন গরীবকে দিয়েছিল। এই দিরহামগুলি তৎক্ষণাৎ ফেরত দেওয়া হল এবং বলা হল : পরকালের চেয়ে ইহকালে লজ্জিত হওয়া উত্তম।" অতঃপর হযরত সমবেত সকলের জন্য এবং যারা শত্রুর হাতে নিধন হয়েছে তাদের জন্য আল্লাহর করুণা ও রহমত প্রার্থনা করলেন। তিনি তাঁর উম্মতের জন্য ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ এবং শান্তি ও সদিচ্ছার জীবন অনুমোদন করলেন এবং কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াত দিয়ে বক্তব্য শেষ করলেন : "আখিরাতের এই ঘর—সে তা তাদের জন্যই আমি তৈরি করেছি—যারা দেশে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করতে, অশান্তি সৃষ্টি করতে মোটেই চায় না—আসলে পরহিজগারদের জন্যই ত উত্তম পরিণাম রয়েছে।"[১৪]

এরপর মুহম্মদ আর জামাতে উপস্থিত হতে পারেননি। তাঁর শক্তি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছিল। সোমবার দুপুরে (১২ই রবিউল আউয়াল ১১ হি.—৮ই জুন ৬৩২ খ্রি.) যখন হযরত ফিস্‌ফিস্ করে প্রার্থনা করছিলেন তখন মহান নবীর আত্মা পরম করুণাময় আল্লাহর সমীপে মহাপ্রয়াণ করলেন।[১৫]

www.amarboi.org

এভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ ও মানুষের সেবায় উৎসর্গীত একটি পূতপবিত্র জীবনের অবসান হল। সব পরীক্ষা ও প্রলোভনসহ অপর কোন জীবনের সঙ্গে এই জীবনের কি তুলনা হতে পারে? আর কোন জীবন আছে কি বা জগতের অগ্নিপরীক্ষায় এমন অক্ষত রয়েছে? বিনয়নম্র-ধর্মপ্রচারক খসরু ও সিজারের সমকক্ষ আরবের নৃপতির আসনে উন্নীত হয়েছিলেন, একটি জাতির ভাগ্যনিয়ন্তার রূপ লাভ করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিত্বের সেই বিনয়নম্রতা, আত্মার সেই মহত্ত্ব ও হৃদয়ের পবিত্রতা, চরিত্রের তপশ্চর্যা, অনুভূতির সূক্ষ্মতা ও কোমলতা এবং কঠোর কর্তব্যপরায়ণতা। যা তাঁকে আলআমিন উপাধিতে বিভূষিত করেছিল তা সমন্বিত হয়েছিল তাঁর আত্মসমীক্ষার কঠোর বোধের সঙ্গে—এসব তাঁর চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ। একবার তিনি মক্কার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে কথাবার্তা বলছিলেন তখন একজন অন্ধ বিনয়ী বিশ্বাসীকে তাঁর সমুখ থেকে বিমুখ করেছিলেন। তিনি সর্বদা অনুশোচনার সঙ্গে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতেন এবং এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌র অনুমোদনের কথা ঘোষণা করতেন।[১৬] এরূপ বিশুদ্ধ, কোমল অথচ বীরত্বব্যঞ্জক স্বভাব শুধু শ্রদ্ধারই উদ্রেক করে না, ভালবাসারও উদ্রেক করে। স্বভাবতই আরবের প্রবক্তাগণ আবদুল্লাহ্‌র পুত্রের সহজাত গুণাবলী ও বৌদ্ধিক মেধা সম্পর্কে গর্বিত আত্মপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। মহৎ ব্যক্তিত্বের প্রতি বিনয়, দীনদরিদ্রের প্রতি আন্তরিকতা এবং দাম্ভিকদের প্রতি মর্যাদাব্যঞ্জক ব্যবহার তাঁর জন্য বয়ে এনেছিল সার্বজনীন শ্রদ্ধা ও ভক্তি। তাঁর মুখাবয়বে ফুটে উঠেছিল তাঁর হৃদয়ের উচ্চশৌর্য। যদিও নিরক্ষর ছিলেন তথাপি প্রকৃতির বিশাল গ্রন্থখানি তিনি বিশাল মন নিয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং বিশ্বজগতের আত্মার সঙ্গে গভীর যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে সমুন্নতি লাভ করেছিলেন। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলকে সমানভাবে প্রভাবিত করার প্রতিভা তিনি লাভ করেছিলেন। এই সঙ্গে তাঁর মুখমণ্ডলে ছিল একটা গাম্ভীর্য, প্রতিভার দীপ্তি, যারা তাঁর সংস্পর্শে আসত তাদেরকে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মাধ্যমে অনুপ্রাণিত করত।[১৭]

তাঁর মনের অসাধারণ উন্নয়ন, অনুভূতির একান্ত কোমলতা ও বিশুদ্ধতা এবং তাঁর শুদ্ধাচার ও সত্যনিষ্ঠা হাদিসের অপরিবর্তিত বিষয়বস্তুতে রূপ লাভ করেছে। তিনি তাঁর চেয়ে নিম্নস্তরের লোকদের প্রতি সর্বাপেক্ষা দয়ালু ছিলেন এবং তাঁর আনাড়ি ছোট ভৃত্যটি তার কাজের জন্য বকুনি খাক তা তিনি কখনো চাইতেন না। তাঁর ভৃত্য আনাস বলেছেন, "আমি দশ বছর ধরে হযরতের খেদমতে ছিলাম, তিনি কখনো উঃ পর্যন্ত বলেননি।"[১৮] তিনি তাঁর পরিবারের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর এক পুত্র সন্তান কামারের স্ত্রী এক সেবিকার ধোঁয়াটে বাড়িতে তাঁর কোলেই মারা যায়। তিনি শিশুদের খুব ভালবাসতেন। তিনি শিশুদের রাস্তায় দাঁড় করাতেন এবং তাদের চিবুকে হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করতেন। তিনি জীবনে কখনও কাউকেও আঘাত করেননি। কথোপকথনে তাঁর ব্যবহৃত নিকৃষ্ট ভাষা হল : "তার কি হয়েছে? তার ললাট ধূলায় ধূসরিত হোক!"[১৯] যখন কোন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য বলা হত তিনি জবাব দিতেন, "অভিশাপ

www.amarboi.org

দেওয়ার জন্য আমাকে পাঠানো হয়নি, আমাকে বিশ্বমানবের নিকট আশীর্বাদ হিসেবে পাঠানো হয়েছে।"

তিনি পীড়িত লোকদের দেখাশোনা করতেন, প্রতিটি জানাজার মিছিল যা তাঁর নজরে পড়ত তাতে যোগদান করতেন, ভৃত্যের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতেন। তিনি নিজের পরিধেয় বস্ত্র পরিষ্কার করতেন। নিজের ছাগ দোহন করতেন এবং নিজের পরিচর্যা নিজেই করতেন—এসব কথা সংক্ষিপ্তভাবে একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।[২০] তিনি কখনো আগে কোন ব্যক্তি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতেন না এবং কেউ বিচ্ছিন্ন না হলে তিনি বিচ্ছিন্ন হতেন না। তিনি ছিলেন সবচেয়ে হৃদয়বান, সবচেয়ে সাহসী ও সবচেয়ে সত্যবাদী; তিনি যাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত রক্ষক ছিলেন। কথোপকথনে তিনি ছিলেন সবচেয়ে মিষ্টভাষী ও সবচেয়ে সদালাপী। যাঁরা তাঁকে দেখতেন তাঁরাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাপুত হয়ে পড়তেন; যাঁরা তাঁর নিকট আসতেন তারাই তাঁর প্রতি অনুরক্ত হতেন, যাঁরা তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা দিতেন তাঁরা বলতেন, "আগে বা পরে তাঁর সদৃশ কাউকে কখনো দেখিনি।" তিনি বিপুল মৌনীস্বভাবের; কিন্তু তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তা গুরুত্ব ও বিবেচনা সহকারে বলতেন এবং তা কেউ ভুলে যেতেন না। "বিনম্রতা ও অনুকম্পা, ধৈর্য, আত্মত্যাগ ও উদারতা তাঁর সমগ্র আচরণের মধ্য দিয়ে প্রবহমান ছিল এবং তিনি সকলের ভালবাসা পেয়েছিলেন। স্বজনহীন ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের প্রতি তিনি গভীর সহানুভূতি দেখাতেন ..., দুষ্প্রাপ্যতার সময়েও তিনি তাঁর খাবার অন্যের সঙ্গে ভাগ করে খেতেন এবং তাঁর চারপাশের প্রত্যেকের আরাম-আয়াসের দিকে অত্যন্ত দৃষ্টি রাখতেন।" তিনি নিম্নস্তরের লোকদের দুঃখদুর্দশার কথা শোনার জন্য পথের মধ্যে থামতেন।" তিনি নীচু লোকদের গৃহে যেতেন তাদের দুঃখ-দুর্দশায় সমবেদনা জানাতে, তাদের ব্যর্থতায় অনুপ্রেরণা দিতে। নীচতম দাসগণও তাঁর হাত ধরে টেনে নিয়ে তাদের মালিকদের কাছে গিয়ে দুর্ব্যবহারের প্রতিকার কিংবা দাসত্ব থেকে নিষ্কৃতি চাইত।[২১] তিনি কখনো প্রথমে আল্লাহর প্রশস্তি কীর্তন না করে আহার শুরু করতেন না এবং শুকরিয়া প্রকাশ না করে আহার থেকে গাত্রোত্থান করতেন না। তাঁর প্রতিটি কাজের সময় সুনির্দিষ্ট ছিল। দিবাভাগে যখন তিনি নামাজে অতিবাহিত করতেন না, তখন দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎ দান করতেন এবং জনসাধারণের কাজ করতেন। রাত্রিতে তিনি সামান্য নিদ্রা যেতেন, অধিকাংশ রাত্রি ধ্যানস্থ্ অবস্থায় অতিবাহিত করতেন। তিনি দীন-দরিদ্রের ভালবাসতেন ও তাদের শ্রদ্ধা করতেন। যাদের বসতবাড়ি ছিল না তারা তাঁর গৃহসংলগ্ন মসজিদের মধ্যে রাত্রিযাপন করত। প্রত্যেক সন্ধ্যায় তিনি তাঁর সামান্য আহার্যে সামিল হওয়ার জন্য তাদের কাউকে কাউকে ডাকতেন; অন্যান্যরা তাঁর প্রধান প্রধান সাহাবীর অতিথি হত।[২২] চরম শত্রুর প্রতিও তাঁর আচরণ ছিল মহানুভবতা ও ধৈর্যশীলতার নিদর্শন। রাষ্ট্রের শত্রুদের প্রতি তাঁর কঠোর মনোভাব এবং নিজের প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রুপ, হুমকি, জুলুম ও নির্যাতন বিজয় মুহূর্তে—মানবহৃদয়ের সংকট মুহূর্তে—সব বিস্মৃতির গহ্বরে নিমজ্জিত হতো এবং চরম অপরাধীর প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শিত হতো।

www.amarboi.org

মুহম্মদ অত্যন্ত সাদাসিধে স্বভাবের ছিলেন। তাঁর চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদ, জিনিসপত্র সবই ছিল অনাড়ম্বর। আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেন যে অনেক সময় হযরতকে অনাহারে থাকতে হতো। খেজুর ও পানি প্রায়ই তাঁর একমাত্র আহার্য ছিল। প্রায়শ কয়েক মাস ধরে অভাবের জন্য তাঁর গৃহে হাড়ি চড়ত না। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলেন যে আল্লাহ্ তাঁর সম্মুখে এই জগতের সম্পদের কুঞ্জি দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি তা নেননি।

বৌদ্ধিক ও প্রগতিশীল আদর্শের দিক থেকে এই বিশিষ্ট শিক্ষাগুরুর মনমানসিকতা ছিল প্রকৃতপক্ষে আধুনিক। তাঁর শিক্ষায় নিত্যপ্রয়াস ছিল মানুষের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য; "নিরন্তর প্রয়াসছাড়া মানুষ টিকতে পারে না।"[২৩]; "প্রয়াসের দিকটি আমার, আর তার সার্থকতা আসে আল্লাহ্র দিক থেকে।"[২৪] তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, জগৎ একটি সুশৃঙ্খল সৃষ্টি—যে সার্বভৌম ধীশক্তি সমগ্র সৃষ্টিকে সংরক্ষণ করছে তাঁর দ্বারা বিশ্বজগৎ পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত—"প্রত্যেক বস্তুরই নির্দিষ্ট কাল রয়েছে"[২৫]—তিনি ঘোষণা করেছেন। এতদসত্ত্বেও প্রত্যেক মানুষ তার মুক্তির জন্য চেষ্টার ব্যাপারে স্বাধীন। তাঁর সহানুভূতি ছিল সার্বজনীন; তিনি যাবতীয় জীবন্ত বস্তুর জন্য স্রষ্টার করুণা কামনা করতেন।[২৬] তিনিই ঘোষণা করেছিলেন যে একটি মানুষের জীবন রক্ষা করা সমগ্র মানবজাতিকে রক্ষা করার সমান।

তাঁর সামাজিক ধারণা ছিল গঠনমূলক—বিচ্ছিন্নতাধর্মী নয়। তাঁর সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মুহূর্তেও তিনি পারিবারিক জীবনের কর্তব্য উপেক্ষা করেননি। মানুষের সেবাই তাঁর কাছে ছিল সর্বোচ্চ ধর্মকার্য। বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ্র আহ্বান যাদের প্রতি কর্তব্য রয়েছে তাদের প্রতি কর্তব্য এড়িয়ে চলা নয়, বরং সেই কর্তব্য সম্পাদন করে "সুকৃতি ও পুরস্কার" অর্জন করা। শিশুরা আল্লাহ্র তরফ থেকে আমানত; স্নেহ ও সহানুভূতি দিয়ে তাদের লালন পালন করতে হবে—পিতামাতাকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে হবে। কর্তব্যের বৃত্ত নিজ পরিবার আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী ও অবহেলিত "ধুলি বিমলিন" মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে আছে।

এই পয়গাম প্রচারের পর চৌদ্দ শত বছর অতীত হয়েছে, কিন্তু এর মাধ্যমে তিনি যে নিষ্ঠা অনুপ্রাণিত করেছিলেন তার বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটেনি এবং সেদিনকার মতো আজও বিশ্বাসীদের অন্তরে ও মুখে সেই স্মরণীয় বাণী উৎসারিত হয় ঃ

"হে আল্লাহর রাসুল, আমার জীবন তোমাতে উৎসর্গীত হোক।"

পাদটীকা

১. দশম হিযরীতে ইয়েমেনের ও হিজাজের অবশিষ্ট গোত্রগুলোর ধর্মান্তরকরণ ঘটেছিল। অতঃপর হাজরামাউত ও কিন্দার গোত্রসমূহের ধর্মান্তরকরণ ঘটেছিল।
২. খ্রিস্টান, ইহুদী ও জরথুস্ত্রপন্থী।
৩. ইবনে হিশাম, পৃ. ৯০৭।
৪. কোরআন সু. ৪২ আ. ২-৫।

www.amarboi.org

৫. মুয়্যির, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬১। একজন সুস্পষ্ট ইসলামের শত্রু থেকে আগত এই মন্তব্য অতীব মূল্যবান।

৬. ইসরাইলীদের মধ্যে যত্তয়া, বৌদ্ধদের মধ্যে অশোক, জরথুস্ত্রদের মধ্যে দরিউস, খ্রিষ্টানদের মধ্যে কনস্তানতাইন।

৭. কোরআন সু. ১১০।

৮. ইবনে হিশাম, পৃ. ৯৬৬; ইবনুল আসির, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩০। কথিত আছে যে ৯০,০০০ থেকে ১৪০,০০০ মুসলমান হযরতের সঙ্গে হজ্জ করতে গিয়েছিলেন। এই হজ্জ 'হাজ্জাতুল বালাগ', 'হাজ্জাতুল ইসলাম' (মহান হজ্জ, ইসলামের হজ্জ) এবং কোন কোন সময় 'হাজ্জাতুল বিদা' (বিদায় হজ্জ) নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

৯. 'রিবা বা সুদ নিষিদ্ধ কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য জমা বা ধার দেওয়া টাকার মুনাফার অংশ নিষিদ্ধ নয়। যারা আরবের অর্থনৈতিক অবস্থা উপলব্ধি করেন না, তারা এই নিয়মের মূলীভূত প্রজ্ঞা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হবেন। বাস্তবিক যে সব কারণ মহান নবীকে তাঁর দেশে সুদ হারাম ঘোষণা করতে বাধ্য করেছিল তা-ই প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাশেষি সময়ে খ্রিষ্টান পাদরীদেরকে সুদের বিরুদ্ধে অভিসম্পাত দিতে প্ররোচিত করেছে। জ্যেষ্ঠ ডিসরেলীর 'কিউরিয়োসিটিস অব লিটারেচার', এ বিষয়ের উপর অধ্যায়টি সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক।

১০. এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে আব্বাস সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। 'রিবা'ও রক্তের প্রতিশোধ সম্পর্কীয় আইনের বলবৎকরণে তাঁর পরিবার থেকেই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে তাঁর দেশবাসীকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

১১. ইবনে রাবিয়া হযরতের চাচাত ভাই। শৈশবে তাকে বনী লাইস গোত্রের একটি পরিবারে প্রতিপালনের জন্য ন্যস্ত করা হয়েছিল। হুজাইল গোত্রের সদস্যরা নির্মমভাবে তাকে হত্যা করেছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয় নি।

১২. প্রত্যেক বাক্য শেষ হলে হযরত থামছিলেন এবং তা খালাফের পুত্র উমাইয়া অন্য পুত্র রাবিয়া উচ্চনিনাদী কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করছিল যাতে সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলী তা শুনতে পারে।

১৩. উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহ্ ছিল মুনাফিকদের নেতা। সে জুলকাদ মাসে (৬৩১ খ্রি. ফেব্রুয়ারি) মৃত্যুবরণ করে। মৃত্যুকালে সে হযরতকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান তার শেষকৃত্য বা জানাজার নামাজ পড়ার জন্য। মুহম্মদ কখনও কোন মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেন নি। উমরের প্রতিবাদ সত্ত্বেও যে আবদুল্লাহ্ নিয়ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত ও কুৎসা রটনা করত তার জন্য হযরত জানাজা নামাজ পড়লেন এবং নিজের হস্তে কবরে তার মৃতদেহ শুইয়ে দিলেন।

১৪. কোরআন, সু. ২৮ আ. ৮৩; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪১; তাবারী ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০৭।

১৫. ইবনে হিশাম, পৃ. ১০০৯; ইবনুল আসির ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৪, ২৪৫; আবুল ফিদা, পৃ. ৯১; তুঃ কসিন দ্য পার্সিভেল ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৪৪ ও টিকা, আল্ হালাবী।

১৬. এই ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সূরাটি হল। "আবাসা'—বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন" এবং এর বর্ণনা নিম্নরূপ :

"তিনি (হযরত) বিরক্ত হলেন, তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর কাছে একটি অন্ধ লোক এল।

আপনি কি জানেন : সে হয়ত শুধরে নেবে, পবিত্র হবে।

আপনি ভাবতেন, তাহলে তাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা পেলেই তার উপকার হত।

www.amarboi.org

যে লোক ধনী, যে লোক পরোয়া করে না তার দিকে আপনি মনোযোগ দিচ্ছেন অথচ সে যদি পবিত্র না হয় তবে তাতে আপনার উপরে দোষারোপ হবে না। আর যে লোক আপনার কাছে দৌড়ে এল আর আল্লাহকে সে ভয় করে। তার সাথে অবহেলা করছেন। কোনভাবেই আপনার এমন করা উচিত নয়।" (সু. ৮০, আ. ১-১১)

অতঃপর যখনই হযরত দীন অন্ধ লোকটিকে দেখতে পেতেন তখনি তাকে সম্মান দেখানোর জন্য কাজ পরিত্যাগ করে এগিয়ে যেতেন এবং বলতেন, "সেই ব্যক্তিকে বার বার অভিনন্দন যার জন্য প্রভু আমাকে তিরস্কার করেছেন।"

তিনি তাকে দু'বার মদিনার গভর্নর বানিয়েছিলেন। এই ঘটনা সম্পর্কে মুয়িরের উপর বসওয়ার্থ স্মিথের মন্তব্য দেখুন।

১৭. মিশকাত, বাব—২৪, অধ্যায়—৩, খণ্ড, ২।

১৮. প্রাগুক্ত, বাব—২৪, অধ্যায়—৪, খণ্ড ১।

১৯. প্রাগুক্ত, বাব—২৬, অধ্যায়—৪, খণ্ড ১।

মি. পুলের মুহম্মদ-চরিত্রের মূল্যায়ন এতই সুন্দর ও এতই সত্যনিষ্ঠ যে তা এখানে উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না, "এই লোকটির চরিত্রে কমনীয় ও রমণীয় অথচ বীরত্বব্যঞ্জক এমন কিছু ছিল যার ফলে কারও পক্ষে অবচেতনভাবে ভক্তি ও প্রেম দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কোন বিচারমূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমস্যার ব্যাপার। তিনি একাকী বহু বছর যাবত তার স্বদেশবাসীর বিদ্বেষ সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবিলা করেছিলেন, তিনি কোন সময়েই সর্বপ্রথম মৈত্রীর বন্ধন ছিন্ন করেন নি। তিনি ছিলেন শিশুদের প্রতি অনুরক্ত এবং কখনও শিশুদের দলের প্রতি মৃদু হাসি ও মিষ্টভাষায় সম্ভাষণ না জানিয়ে পথ অতিক্রম করতেন না। অকপট বন্ধুত্ব, মহান উদারতা, মানুষের অকুতোভয় সাহস ও আশা—সব মিলে তাঁর ক্ষেত্রে সমালোচনা প্রশংসায় পর্যবসিত করে। "তিনি মহত্তম অর্থে একজন আগ্রহশীল ব্যক্তি ছিলেন, যেখানে আগ্রহশীলতা জগতে অপরিহার্য, এমন একটি গুণ যা মানুষকে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে বিপথ থেকে রক্ষা করে। আগ্রহশীলতা প্রায়ই নিন্দনীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কেননা এ অনুপযুক্ত কাজে প্রযুক্ত হয় কিংবা নিষ্ফল ক্ষেত্রে পতিত হয়ে কোন ফলোৎপাদন করে না। কিন্তু মুহম্মদের ক্ষেত্রে তেমনটি ছিল না। তিনি একজন আগ্রহশীল ব্যক্তিত্ব ছিলেন যখন জগতবাসীকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য আগ্রহশীলতা ছিল অপরিহার্য এবং তাঁর আগ্রহশীলতা ছিল মহৎ উদ্দেশ্যে নিবেদিত। তিনি এমন একজন সুখী ব্যক্তি ছিলেন। যিনি একটি মহান সত্যকে তাদের জীবনের প্রেরণার উৎসে পরিণত করেছিলেন। তিনি ছিলেন এক আল্লাহর পয়গাম্বর। বাণীবহ এবং জীবনের শেষদিন তিনি বিস্মৃত হন নি, যে তিনি কে ছিলেন কিংবা যে বাণী তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা যে তাঁর জীবনের মেরুমজ্জা তা কোনদিন ভুলে যান নি। তাঁর সুমহান দায়িত্বপূর্ণ পদের সচেতনতা থেকে উদ্ভূত মহিমাব্যঞ্জক মর্যাদাবোধের সঙ্গে তিনি তাঁর লোকদের কাছে সুসংবাদ বহন করেছিলেন এবং তার সঙ্গে ছিল তাঁর বিনয় যার মূল তাঁর নিজের সীমাবদ্ধতার জ্ঞানের মধ্যে।"

২০. মিশকাত, ২৪শ খণ্ড, ৮র্থ অধ্যায়, ২য় বিভাগ।

২১. হায়াতুল কুলুব (শিয়া) ও রৌজাতুল আহ্বাব (সুন্নি)। দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম—১৩

২২. আবুল ফিদা পৃ. ৯৯; আল্ হালাবী, 'ইনসানুল উয়ুন' ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৬২।

২৩. লায়সা লিল ইনসানে ইল্লা মা সা'য়া।

২৪. লাস্সায়ি মিন্নি আল্ এত্মামো মিনাল্লাহে।

২৫. কুন্নু আমরিন মারহাওনুন বে আওকাতিহি।

২৬. রাহমাতুল্লিল্ আলামিন।

www.amarboi.org

দশম অধ্যায়
খিলাফতের উত্তরাধিকার ঃ ইমামত

"আল্লাহর রজ্জু মজবুতভাবে ধরো এবং তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

—আল্ কোরআন

হযরত তাঁর দেশবাসীর মধ্যে যে অধ্যাত্ম জীবনবোধ সঞ্চারিত করেন তা তাঁর জীবনাবসানে নিঃশেষ হয়নি। প্রথম থেকেই এটা ধর্মের একটি শর্ত ছিল যে, উপাসনায় তিনি আত্মিকভাবে উপাসকদের সঙ্গে উপস্থিত থাকতেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর উত্তরাধিকারিগণ ছিলেন তাঁর প্রতিনিধি। ধ্যানতন্ময় অবস্থায় হযরতের আত্মিক শক্তির অন্তর্ব্যাপিতা মানুষের আত্মা ঐশীসত্তার সঙ্গে ঐক্য স্থাপন করে। যাবতীয় বংশগত বিরোধ ও ধর্মীয় কোন্দলের মধ্যে উপাসনার সময় তাঁর আধ্যাত্মিক উপস্থিতির মরমী ধারণা ধর্মের ক্ষেত্রে যে শক্তির যোগান দিয়েছে তা অতিরঞ্জিত হতে পারে না।

যে দুটি প্রধান সম্প্রদায়ে ইসলাম আদিস্তরে বিভক্ত হয়েছিল তারা একমত হয়েছিল যে শরীয়ত কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন প্রথা ও কর্তব্যের ধর্মীয় উপকারিতা হযরতের প্রতিনিধির অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল ইসলাম ও বিশ্বাসীদের ধর্মীয় নেতা বা ইমাম।

খিলাফতীয় ইমামদের সমর্থকগণ "হাদিসের অনুসারীদের" থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দর্শনের অধিকারী। তাদের মতে, হযরতের আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার আলী এবং হযরতের কন্যা ফাতিমার বংশধরদের উপর ছিল। তাঁরা বলেন যে ইমামত ঐশী নিয়োগ বলে খিলাফতের পারম্পর্য রক্ষা করে থাকে। তারা আবু বকর, ওমর ও ওসমানের খিলাফতকে বৈধ বলে স্বীকার করেন না; তাঁরা মনে করেন যে আলীকে হযরত তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে ইঙ্গিত করেছিলেন, কাজেই তিনিই বিশ্বাসীদের সত্যিকার খলিফা ও ইমাম। আর হযরত আলীর হত্যার পর আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব তাঁর ও ফাতিমার বংশধরদের উপর বর্তে ছিল। "সরাসরি পুরুষ-পরম্পরায়" আলীর একাদশ পুরুষ ইমাম হাসান আল্ আসকারী পর্যন্ত, যিনি ৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে/২৬০ হিজরীতে আব্বাসীয় খলিফা মোতামিদের রাজত্বকালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ইমামত তদীয় পুত্র মুহম্মদ ওরফে আল্ মাহ্‌জী (সত্য

www.amarboi.org

পথপ্রদর্শক)—শেষ ইমাম-এর উপর বর্তে ছিল। মুহম্মদের পরিবারে এই ইমামদের কাহিনী অতীব শোকাবহ। অত্যাচারী মোতাওয়াক্কিল কর্তৃক হাসানের পিতা মদিনা থেকে সামরায় নির্বাসিত হন এবং আমৃত্যু সেখানে অন্তরীণ থাকেন। অনুরূপভাবে মোতাওয়াক্কিলের উত্তরাধিকারীরদের ঈর্ষার ফলে হাসানকে বন্দী রাখা হয়। তার মাত্র পাঁচ বছর বয়স্ক শিশুপুত্র পিতার অন্বেষণে তাদের বাসস্থান থেকে অনতিদূরে একটি সরাইখানায় যান, সে আর সেখান থেকে ফিরে আসেনি। এই দুর্দৈবের শোক শিয়াদের হৃদয়ে একটি আশা, একটি প্রত্যাশায় পরিণত হয়েছিল যে, একদিন এই শিশু দুঃখপূর্ণ ও পাপময় দুনিয়াকে তার দুঃখ ও পাপের ভার থেকে মুক্ত করতে ফিরে আসবে। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্তও যখন ইবনে খালদুন[১] তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস রচনা করেছিলেন তখনও সরাইখানার দ্বারে সন্ধ্যাকালে অভ্যস্ত নিয়মে একত্রিত হয়ে শিশুটিকে ফেরত দেওয়ার জন্য প্রার্থনা করত। দীর্ঘ ও পলকহীন অপেক্ষার পর তারা হতাশ ও ব্যথাভরা মনে গৃহে ফিরে আসত। ইবনে খালদুন বলেন যে এটা ছিল দৈনন্দিন ঘটনা। "যখন তাদের বলা হয়েছিল যে শিশুটির জীবিত থাকার সম্ভাবনা আদৌ নেই," তখন তারা জবাব দিত যে, "যদি পয়গাম্বর খিজির (আ')[২] জীবিত থাকতে পারেন তবে তাদের ইমাম কেন জীবিত থাকবেন না?" শিয়াদের মধ্যে এই ইমামের উপাধি 'মুনাতাজার'—প্রত্যাশিত, 'হুজ্জা'—সত্যের প্রমাণ,এবং 'কায়িম'—জীবন্ত।

ধর্মের দার্শনিক ছাত্রেরা প্রাচীন ধারণাসমূহের সঙ্গে শিয়া ও সুন্নী ধর্মবিশ্বাসের অদ্ভুত সাদৃশ্য নিরীক্ষণ করতে ব্যর্থ হবে না। জরথুস্ত্র-অনুসারীদের মধ্যে সেলুসিডাদের অত্যাচার এই বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল যে, সোসিয়োছ নামক একজন ঐশী-নির্ধারিত ত্রাণকর্তা বিদেশীদের হাত থেকে তাদেরকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য খোরাসান থেকে বের হবেন। একই কারণ ইহুদীদের মধ্যে তাদের মসীহের আগমন সম্পর্কীয় ধারণার সৃষ্টি করেছিল। ইহুদীরা বিশ্বাস করেন যে মসীহ এখনও আসেননি; তাদের মতো সুন্নী মুসলমানদেরও বিশ্বাস ইসলামের ত্রাণকর্তা এখনও জন্মগ্রহণ করেননি। খ্রিষ্টানেরা বিশ্বাস করেন যে মসীহ এসেছেন ও চলে গেছেন এবং আবার আসবেন। ইস্‌না আশারিয়াগণও খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মতো মাহদীর পুনরাবির্ভাবের জন্য প্রতীক্ষা করছেন। যিনি জগতবাসীকে অমঙ্গল ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করবেন। এই সব ধারণার উৎপত্তি ও তাদের বৈচিত্র্য বা একই কারণসমূহ থেকে উদ্ভূত। যুগের যে পরিস্থিতিসমূহের মধ্যে দুটি স্বতন্ত্ররূপে মাহদীর ধারণা রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা প্রাচীন যুগেও একই রূপ ছিল। ইসলাম, ইহুদী ধর্ম খ্রিস্টধর্মে প্রত্যেক সন্ধ্যায় জগতকে দুঃখ ও পাপ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্য ঐশী মনোনীত ইমামের আবির্ভাব কামনায় প্রার্থনা স্বর্গপানে ধাবিত হয়।

শিয়ারা বিশ্বাস করেন যে ইমাম 'গায়েব' (অনুপস্থিত) তথাপি তিনি তার দলের ধ্যানতন্ময়তার মধ্যে সর্বদা আত্মিকভাবে উপস্থিত থাকেন। আইনের ব্যাখ্যাতা ধর্মের ব্যবস্থাপকরা জগতে তার প্রতিনিধি; এমন কি ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানেরাও জগতে তার ঐহিক কার্যাবলীর প্রতিনিধিত্ব করেন। শিয়া ও সুন্নীদের মধ্যে অপর একটি পার্থক্য

www.amarboi.org

রয়েছে, তা হল ইমামতের গুণাবলী নিয়ে শিয়াদের মতে ইমামকে অবশ্যই পাপশূন্য বা নিষ্পাপ (মাসুম) হতে হবে এবং তিনি হবেন মানবজাতির মধ্যে সুন্দরতম ব্যক্তিত্ব।

সুন্নীদের ধারণা যা মুসলিম জাহানের বিপুলসংখ্যক বিশ্বাসীদের জীবন, চিন্তা ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে তা শিয়াদের ধারণার ঠিক বিপরীত। সুন্নী ধর্মীয় আইন জোর দেয় যে বিশ্বাসীদের নিষ্ঠা বৃদ্ধির জন্য ইমামকে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হবে এবং যেখানে ইমামো পক্ষে নামাজের ইমামতি করা সম্ভব নয় সেখানে এমন লোক নেতৃত্ব করবে যার ইমামতির অপরিহার্য গুণাবলী রয়েছে।

আইনবিজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্মতত্ত্বের অধিকাংশ গ্রন্থে এই নীতিসমূহ সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। খিলাফত হযরতের প্রতিনিধিত্ব হিসেবে ব্যাখ্যাত হয়েছে; ইসলামের চিরস্থায়িত্ব ও তার আইন ও নিয়মসমূহের নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনের জন্য একে সুনির্ধারিত করা হয়েছে। কাজেই ইসলামের অস্তিত্বের জন্য একজন খলিফা (প্রতিনিধি) থাকবেন, যিনি হযরতের বাস্তব ও প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। ইমামত হল আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব; কিন্তু এই দুটি উচ্চপদ অবিচ্ছেদ্য; হযরতের প্রতিনিধি সেই ব্যক্তি যিনি একমাত্র নামাজের ইমামতি করতে সমর্থ, যখন তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন। কেউই তার কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারে না যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তিনি তাকে "নিযুক্ত" না করেন। ইমাম ও জামাতের (মামুম)[৩] মধ্যে আধ্যাত্মিক বন্ধন রয়েছে যা ধর্মের ক্ষেত্রে একে অন্যকে পরস্পর বেঁধে ফেলে। এই নীতি ও 'ইসলামে পুরোহিততন্ত্র নেই'—এই নীতির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নেই। প্রত্যেক মানুষ তার প্রভুর সামনে নিজের জন্য অনুময়-বিনয় জানাবে এবং অন্য কোন মানুষের মধ্যস্থতা ছাড়া আল্লাহর সঙ্গে সংযোগস্থাপন করবে। ইমাম প্রত্যেক উপাসক ও ইসলামের মহাগ্রন্থ কোরআনের মধ্যে যোগসূত্র। ইসলাম ধর্মের এই মরমী উপাদান এর উল্লেখযোগ্য ঐক্যবদ্ধতার ভিত্তি।

উপরি-উক্ত মন্তব্য 'দারুল মুক্তারে' যে উক্তি রয়েছে তার উপরই গুরুত্ব আরোপ করে—ইমামত দু'প্রকারের 'ইমামাতুল কুবরা' ও 'ইমামাতুস্ ছোগ্‌রা'—সার্বভৌম আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ও বিশ্বাসীদের নিষ্ঠায় তত্ত্বাবধায়কের কাজ করার জন্য যে গৌণ উদ্ভূত অধিকার। 'ইমামুল কবির'—সার্বভৌম খলিফা সুন্নী জগতের খলিফা। হযতের প্রতিনিধি হিসেবে তার উপর যুক্তভাবে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব যাবতীয় কর্তৃত্ব বর্তায়। তিনি পরামর্শ সভার সঙ্গে আলোচনা করে জাগতিক ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যেমন প্রথম চার খলিফার আমলে হয়েছে কিংবা যেমন পরবর্তীকালে প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এককভাবে বা সমবেতভাবে হয়েছে। কিন্তু জামাতের নামাজ পরিচালনার ব্যাপারে দৈহিক দিক দিয়ে অপরাগ না হলে তিনি নিজে ইমামতি করতে বাধ্য।

শিয়াদের মধ্যে জুমার নামাজ ও অন্যান্য উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নামাজ বৈধভাবেই একাকী এবং সমবেতভাবে সমাধা করা যেতে পারে। সুন্নীদের মত অনুযায়ী যেখানে মসজিদ কিংবা ঈদগাহ্ আছে সেখানে সমবেতভাবে নামাজ কায়েম করা অপরিহার্য বা ফরয; বৈধকরণ ব্যতীত এই নামাজ থেকে বিরত থাকা পাপ; এই ধরনের নামাজ

www.amarboi.org

পরিত্যাগকারীদেরকে সামরিকভাবে শাস্তি পেতে হয়। নজ্‌দে ইসলামের চুক্তিকারী হিসেবে কথিত ওয়াহাবীদের শাসনামলে অমনোযোগীদেরকে মসজিদের মধ্যে বেত্রাঘাত করা হত। আজ ইবনে সাউদের শাসনকালে তাঁর শিষ্য যারা "ইখওয়ান" বা "ধর্মীয় ভ্রাতৃসঙ্ঘ" নাম গ্রহণ করেছে তারাও ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকেন। জামাতের নামাজ যেহেতু ফরয, ফলে ইমামের উপস্থিতি শর্তহীনভাবে অপরিহার্য।[৪]

সুন্নীরা জোর দিয়ে বলেন যে হযরতের অন্তিম অসুস্থতার সময়ে আবু বকরকে ইমামতি করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে সমাধিস্থ করার পূর্বে হযরতের মনোনয়ন "জনমণ্ডলী" গ্রহণ করেছিলেন এবং আবু বকর (রাঃ) সর্বসম্মতিক্রমে মুসলমানদের খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেই থেকে নিয়মিতভাবে এটাই সার্বজনীন রীতিতে পরিণত হয়েছে।

ধর্মীয় নেতার আসন অলংকৃত করার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলীর মধ্যে প্রথম ও সর্বাপেক্ষা আবশ্যকীয় গুণ হল এই যে, তিনি সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমান হবেন এবং বাইরের নিয়ন্ত্রণমুক্ত সার্বভৌম পার্থিব ক্ষমতা পরিচালনার যোগ্য হবেন। ইমামকে 'নির্দোষ' হতে হবে কিংবা তিনি মানবজাতির মধ্যে "সর্বোত্তম" হবেন অথবা তিনি হযরতের বংশধর হবেন—সুন্নীদের মতে এমন আবশ্যকতা নেই। তাদের মতে, তিনি ব্যক্তিগত ত্রুটিমুক্ত স্বাধীন শাসক চরিত্রবান লোক, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় কার্য পরিচালনায় সমর্থ হবেন। প্রাথমিক পর্যায়ের হাদিসবেত্তা পণ্ডিতগণ হযরতের একটি উক্তির বলে খিলাফতের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সম্পর্কিত অধ্যায়ের শেষে একটি শর্ত সংযোজিত করেছেন : খলিফা কোরাইশ বংশোদ্ভূত হতে হবে। 'দারুল মুখতার' ও 'রাদ্দুল মুহ্‌তার' গ্রন্থদ্বয়ে বর্ণিত এই শর্ত সংযোজনের অভীষ্ট লক্ষ্য হল আলী ও ফাতিমার বংশধরদের মধ্যে—হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর বংশের মধ্যে খিলাফতকে অন্তর্ভুক্ত করায় শিয়া সম্প্রদায়ের দাবীকে নাকচ করা এবং প্রথম তিনজন খলিফা এবং উমাইয়া ও আব্বাসিয়া খলিফাগণকে বৈধ খলিফাদের অন্তর্ভুক্ত করা। মহান আইনবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন* টৈমারলেনের সমসাময়িক; তিনি ওসমানের বংশধরদের খিলাফত লাভের বহুপূর্বে ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তাঁর 'মুকাদ্দমা'য় (উপক্রমণিকা) এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। তিনি উক্তিটির বৈধতা সম্পর্কে বিরোধিতা করেননি; তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে ব্যাপারটি এমন একটি অনুমোদন যা পরিস্থিতির ফলশ্রুতি। তিনি উল্লেখ করেন যে, যখন বিশ্বে ইসলামী বিধান প্রচারিত হয় তখন কোরাইশগণ আরবদেশে সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। মুসলমানদের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক অভিভাবকত্ব তাঁর বংশের একজন সদস্যের উপর বর্তানো উচিত—এ অনুমোদন বা কামনা করার সময়ে তিনি অব্যবহিত ভবিষ্যতের কথাই চিন্তা করেছিলেন, উত্তরাধিকার সম্পর্কে কোন বাঁধাধরা নিয়মের কথা ভাবেননি। সেকালে ইসলামের একজন যোগ্য ও সমর্থ শাসক শুধু কোরাইশদের মধ্যেই পাওয়া যেত। কাজেই খলিফা ও ইমাম তাদের মধ্য থেকে অনুমোদিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল।

www.amarboi.org

একজন সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ সুন্নী আইনজ্ঞ কর্তৃক ব্যক্ত এই মতবাদ আধুনিক পণ্ডিত ('মুতাখেরিন')-গণ সাধারণভাবে গ্রহণ করেছেন—অন্যান্য শর্তপূরণ সাপেক্ষে ইমাম-নির্বাচনের ব্যাপারে কোনরূপ গোত্রগত বা বর্ণগত বাধা-নিষেধ নেই। আবু বকর মৃত্যুর পূর্বে খিলাফতের দায়িত্বে ওমরকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করেছিলেন এবং মুহম্মদের বংশসহ সকলেই সার্বজনীনভাবে তা গ্রহণ করেছিলেন । এই মহান খলিফার কার্যাবলীতে ক্ষুব্ধ হয়ে একজন খ্রিস্টান কিংবা মাজী ধর্মোম্মাদ তাঁর উপর যে মারাত্মক আঘাত হেনেছিল তাতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। স্বজনপ্রীতির দোষ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ব্যাপারে মুসলমানদের ভেতর থেকে ছয় জন প্রখ্যাত সদস্যের সমন্বয়ে একটি নির্বাচনী কমিটি গঠন করেছিলেন। তাদের নির্বাচনী মনোনয়ন পড়েছিল ওসমানের উপর। তিনি উমাইয়া বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং জনগণের সার্বজনীন রায়ের বলেই খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ওসমানের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর পর হযরতের জামাতা, শিয়াদের মতে যিনি খিলাফতে বৈধ অধিকার বলে হযরতের অব্যবহিত উত্তরাধিকারী, খলিফা ও ইমাম হিসেবে ঘোষিত হলেন। ফাতিমার স্বামী বংশগতভাবে ও নির্বাচনের বলে এই অধিকার লাভ করেছিলেন। তাঁর পরিণত বয়স্ক পূর্ববর্তী খলিফাদের আমলে প্রশাসনে যে দুর্নীতি প্রবেশ লাভ করেছিল তা যখন তিনি দূর করতে সচেষ্ট হলেন তখন এক রাজ্যের শত্রু তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। উমাইয়া বংশোদ্ভূত মুয়াবিয়া, যিনি ওসমানের অধীনে সিরিয়ার গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। আলী বিদ্রোহ দমন করতে এগিয়ে এলেন, কিন্তু অমীমাংসিত যুদ্ধের পর যখন তিনি ইরাকে কুফার মসজিদে উপাসনায় নিমগ্ন ছিলেন তখন এক আততায়ীর হাতে নিহত হন। আলীর জীবনাবসানে প্রাথমিক পর্যায়ের সুন্নী বিদ্বান ও ধর্মতত্ত্ববিদেরা যাকে 'খিলাফাতুল কামিলা'[৬] (নিখুঁত খিলাফত) বলতেন তার সমাপ্তি ঘটল;কেননা এই চারজন খলিফা প্রত্যেকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

আলীর মৃত্যুর পর মুয়াবিয়া আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসানের নিকট থেকে খিলাফতের ভার গ্রহণ করেন। হাসান কুফা ও তার অধীনস্থ প্রদেশসমূহের সর্বসম্মত সমর্থন লাভ করে খলিফা পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন; মুয়াবিয়া এই উচ্চপদ গ্রহণে সিরিয়ার জনগণ সমর্থন করেন। ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে এই ঘটনা ঘটেছিল।

এখানে একথা স্মর্তব্য যে উমাইয়া ও হাশেমীয় বংশ একই কোরাইশ বংশোদ্ভূত কোরাইশ বংশের এই দুই শাখার মধ্যে তিক্ত বিরোধ চলছিল। হযরত তাঁর জীবদ্দশায় এই বিরোধ দূর করতে কিংবা তাদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের মহান প্রয়াস চালিয়েছিলেন। হযরতের প্রপিতামহ হাশেমের নামানুসারে হাশেমীয়দের নামকরণ হয়েছিল। হাশেমের পুত্র আব্দুল মুত্তালিবের অনেকগুলো পুত্র-সন্তান ছিল; তাদের মধ্যে একজন ছিলেন আব্বাস। তিনি আব্বাসীয় খলিফাদের আদিপুরুষ। অপর পুত্র আবু তালিব খলিফা হযরত আলীর পিতা এবং তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র আব্দুল্লাহ হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর পিতা।

www.amarboi.org

মুয়াবিয়া উমাইয়া বংশের প্রথম খলিফা। মুয়াবিয়ার পৌত্রের মৃত্যুর পর এই বংশের হাকামীয় শাখার মারওয়ান খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র আব্দুল মালিক ও পৌত্র ওয়ালিদের শাসনামলে সুন্নী খেলাফত সর্বাপেক্ষা প্রসার লাভ করেছিল—এ একদিকে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এবং অন্যদিকে ট্যাগাস থেকে সাহারা মরুভূমি ও আবিসিনিয়ার সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। ৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে হযরতের চাচা আব্বাসের বংশধর আবুল আব্বাস সাফফাহ উমাইয়া বংশের শেষ খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানকে পদচ্যুত ক'রে কুফার প্রধান মসজিদে খলিফা হিসেবে জনগণের নিকট 'বাইয়াত'[৭] লাভ করেন। শপথ গ্রহণের পর তিনি মিম্বরে আরোহণ ক'রে ইমাম বা তার প্রতিনিধিরা যে খোতবা পাঠ ক'রে থাকেন সেই খোতবা পাঠ করলেন। তার উত্তরাধিকারীগণ এই ভাষণ ধর্মীয় দিক থেকে যেভাবে সংরক্ষণ করেছিলেন তা আরব ঐতিহাসিক ইবনুল আসিরের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এ বক্তৃত খিলাফতে আব্বাসের বংশধরদের অধিকারের বৈধতা বিষয়ক সুদীর্ঘ সমর্থন। এখন থেকে আবুল আব্বাস-সুন্নী জাহানের বৈধ শাসক এবং সুন্নী ধর্মসম্প্রদায়ের বৈধ আধ্যাত্মিক গুরু। তাঁর প্রথম ছয় জন উত্তরাধিকারী উল্লেখযোগ্য ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন; এসব উত্তরাধিকারী বিভিন্ন ধরনের শক্তির অধিকারী ছিলেন। সাফফাহর পর তাঁর ভ্রাতা মনসুর খিলাফতের অধিকারী হন। তিনি বাগদাদ নগরীর প্রতিষ্ঠাতা। এই বাগদাদ নগরী তাঁদের রাজধানীতে পরিণত হয়। এ সচরাচর 'দারুল খিলাফত' (খিলাফতের নিলয়) এবং 'দারুস্ সালাম' (শান্তির নিলয়) বলে অভিহিত হত। এখানে আব্বাসীয় খলিফাগণ কয়েক শতাব্দী ধরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধ্যাত্ম ও জাগতিক কর্তৃত্ব চালিয়েছিলেন। কায়রোতে তাদের প্রতিপত্তিশালী বিরোধীরা সালাদীনের সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং কর্দোভার গৌরবান্বিত উমাইয়া বংশ একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে অন্তর্হিত হল। আল্‌মোয়াহিদ, আলমোরাভাইদ এবং আল্‌মোরাভাইদদের পতনের ফলে যে সব বার্বার ও আরব রাজবংশ মরক্কোর সিংহাসনে আরোহণ করছিল তাদের কারও সুন্নী সম্প্রদায়ের ইমামতি করার বৈধ অধিকার ছিল না। আটলান্টিক থেকে গঙ্গা নদী, কৃষ্ণসাগর ও জাক্সারটেস থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত আব্বাসীয় খলিফাগণ সুন্নী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দানের নিরঙ্কুশ অধিকার লাভ করেছিলেন। হিযরী ৪৯৩ (১০৯৯ খ্রি.)—তে আল্‌মোয়াহিদ বিজেতা ইউসুফ বিন্ তাশ্‌ফিন আয্‌যাল্লাকার যুগান্তকারী যুদ্ধে খ্রিস্টান সৈন্যবাহিনীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত ক'রে আব্বাসীয় খলিফা আল্‌মুকতাদিরের নিকট থেকে 'আমিরুল মুসলেমীন', উপাধিতে বিভূষিত হন; খলিফা মুস্তাজাহরও এই উপাধি বহাল রেখেছিলেন। একথা মনে রাখা উচিত যে কর্দোভার খলিফা কিংবা পরবর্তীকালের কোন মুসলমান নৃপতি 'খলিফাতুর রাসুল' (হযরতের প্রতিনিধি) উপাধি ধারণ করেননি কিংবা দাম্ভিকতার সঙ্গে 'আমিরুল মুমেনীন' (মুমিনদের নেতা) উপাধিও গ্রহণ করেননি।

পরিপূর্ণভাবে পাঁচ শ' বছর ধরে বাগদাদ ছিল ইসলামের সর্ববিধ চিন্তামূলক কার্যের প্রাণকেন্দ্র। এখানে খিলাফত এবং অন্যান্য পার্থিব ও ধর্মীয় ব্যাপার সম্পর্কে বিধিবিধান

—১২

www.amarboi.org

প্রণালীবদ্ধ হত। আজকের মতো খলিফা ইমাম হযরতের ঐশী নিযুক্ত প্রতিনিধি—এই ধারণা জনসাধারণের ধর্মীয় জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছিল। এভাবে দেখা যাবে যে সুন্নী মতানুসারে খলিফা শুধু পার্থিব শাসক নন; তিনি ধর্ম সম্প্রদায় ও প্রজাতন্ত্রের ধর্মীয় প্রধান এবং ঐশী শাসনতন্ত্রের সত্যিকার প্রতিনিধি।[৮] প্রথম প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলদের দ্বারা বাগদাদ ধ্বংস হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আব্বাসীয় খিলাফত পাঁচ শত বছরে ধরে স্থায়ী হয়েছিল। এ সময়ে মুস্তাসিম বিল্লাহ খলিফা ছিলেন; তিনি তাঁর পুত্রগণ এবং পরিবারের প্রধান সদস্যগণসহ পাইকারী হত্যাকাণ্ডে নিহত হন। আব্বাসীয় বংশের সেইসব অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের জীবন রক্ষা পেয়েছিল যাঁরা রাজধানীর বাইরে ছিল কিংবা পরিচয় এড়াতে সমর্থ হয়েছিল।

মুস্তাসিম বিল্লাহর হত্যাকাণ্ডের দু'বছর পর সুন্নী জাহান, তীব্রভাবে একজন খলিফা ও ইমামের অভাব অনুভব করেছিল; ধর্মের একজন আধ্যাত্মিক নেতার অভাবে দুঃখের তীব্রতা এবং বিশ্বাসীদের নিকটে সান্ত্বনা ও ধর্মীয় উৎকর্ষ আনতে পারেন হযরতের এমন একজন প্রতিনিধির সাতিশয় প্রয়োজনীয়তার কথা খলিফাদের ঐতিহাসিক সখেদে ব্যক্ত করেছেন।[৯] একজন স্বীকৃত ইমামের উপস্থিতিতে যে ধর্মীয় উপকার সাধিত হয় তা মানুষের নিষ্ঠা ও ভক্তি বর্জিত ছিল; মৃত ব্যক্তির জন্য প্রার্থনাও সমভাবে উৎকর্ষশূন্য ছিল। সুলতান বায়বার সমগ্র সুন্নী জাহানের সঙ্গে একজন খলিফা ও ইমামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। পাঁচ শ' বছর ধরে খিলাফতের অধিকার আব্বাসীয় বংশের মধ্যে অবিসম্বাদিতভাবে ন্যস্ত ছিল; আবুল কাসিম আহমদ নামে এই পরিবারের একজন সদস্য মোঙ্গলদের হত্যাকাণ্ড এড়াতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং খলিফার আসনে সমাসীন করার জন্য তাঁকে আহ্বান জানানো হয়েছিল। কায়রোর আবেষ্টনীতে উপনীত হলে সুলতান বিচারকমণ্ডলী ও পারিষদ সমভিব্যাহারে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে গেলেন। অভিষেক-উৎসব চিত্তাকর্ষক ও পবিত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর বংশপরিচয় প্রথমে প্রধান কাজী বা বিচারকের সমীপে প্রমাণ করতে হয়েছিল। অতঃপর তাঁকে খলিফার আসনে অভিষিক্ত করা হল এবং 'মুস্তাসির বিল্লাহ'—"আল্লাহর সাহায্য অন্বেষণকারী"—এই উপাধিতে খলিফা হিসেবে স্বীকার করা হল। প্রথম 'বয়েত' (শপথ) গ্রহণ করলেন সুলতান স্বয়ং; তারপর প্রধান কাজী তাজউদ্দীন, রাজ্যের প্রধানগণ ও মন্ত্রিবর্গ এবং অভিজাত বংশীয় লোকেরা তাঁদের পদমর্যাদা অনুযায়ী। ১২৬১ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মে এই অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং নতুন খলিফার নাম মুদ্রার উপর খোদিত হয়েছিল ও তাঁর নামে 'খুতবা' পড়া হয়েছিল। পরবর্তী শুক্রবারে আব্বাসীয় বংশের কালো[১০] পোশাক পরিধানপূর্বক মিছিলে সামিল হয়ে মসজিদে গমন করেন এবং খলিফার ভাষণ দান করেন। বিশ্বাসীদের খলিফা হিসেবে অভিষেক সম্পূর্ণ হওয়ার পর তিনি সুলতানকে পোশাক ও উপাধিতে ভূষিত করলেন, যা গোঁড়া মুসলমানদের দৃষ্টিতে বৈধ কর্তৃপক্ষের জন্য অপরিহার্য।

কায়রোতে এভাবে প্রতিষ্ঠিত আব্বাসীয় খিলাফত আড়াইশ' বছরের অধিককালে স্থায়ী হয়েছিল। এই সময় যারা মিশর শাসন করতেন ইতিহাসে তাদেরকে মমলুক

www.amarboi.org

সুলতান বলা হয়। প্রত্যেক সুলতান শাসনভার গ্রহণকালে খলিফা ও "সেই সময়ের ইমামের" (ইমামুল ওয়াক্ত) নিকট থেকে অভিষেক সনদ প্রাপ্ত হতেন এবং খলিফার প্রতিনিধি হিসাবে শাসন পরিচালনা করতেন। ধর্মাধ্যক্ষ ও বিচারক নিয়োগের ব্যাপারে খলিফার আনুষ্ঠানিক অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল। যাবতীয় পার্থিব ক্ষমতা শূণ্য হলেও খলিফায় ধর্মীয় ক্ষমতা এতই প্রবল ছিল এবং জনজীবনে এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশ্বাস সুন্নী জাহানের ধর্মীয় আবেগে এতই দৃঢ়মূল ছিল যে বাগদাদের দুবার পতনের পরও ভারতের মুসলমান নৃপতি আব্বাসীয় খলিফাদের নিকট থেকে অভিষেক উপাধি লাভ করতেন। ১৩৪৩ খ্রিস্টাব্দে তুঘলকাবাদের বিশাল অসমাপ্ত নগরীর প্রতিষ্ঠাতা, মুহম্মদ জুনা খান তুঘলক কর্তৃক খলিফার দূতকে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল তার বিবরণ থেকে এটা পরিষ্কার বুঝা যায় যে মিশর থেকে ছ'মাসের দূরবর্তী হিন্দুস্থানেও খলিফা কত গভীরভাবে সম্মানিত হতেন। দূতের আগমণ বার্তা শ্রবণ করে সুলতান সৈয়দ ও সম্ভ্রান্ত লোকজনসহ তাকে খোশ আমদেদ জানানোর জন্য রাজধানীর বাইরে গেলেন; আর যখন খলিফার পত্র সুলতানকে দেওয়া হল তিনি তা অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। অভিষেকের আনুষ্ঠানিক উপাধি প্রধান সুলতানের বৈধতার দলিল হিসেবে কাজ করত। রাজসভার কবি বিখ্যাত বদরুদ্দীন চাচের একটি কবিতা যা এখনও ভারতে বর্তমান তার মধ্যে এই ঘটনার আনুপূর্বিক বর্ণনা রয়েছে।

প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে ওসমানের বংশধর প্রথম সেলিম ওরফে সাফ্ফার আবির্ভাব ঘটে। ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় তাঁর জন্য বয়ে এনেছিল 'ধর্মের রক্ষক' এই উপাধি। কোন মুসলিম নৃপতি, এমনকি পারস্যে সুফী বংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম গোঁড়া শিয়া রাষ্ট্রের স্রষ্টা, তাঁর বড় প্রতিদ্বন্দ্বী শাহ ইসমাইলও মহত্ত্ব ও শক্তিতে ওসমানীয় নৃপতির সমকক্ষ ছিলেন না।

ঐ শতাব্দীর শেষ শতকগুলোতে মিশরের অবস্থার বিপুল পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। পরবর্তী মমলুক সুলতানদের অধীনে যে নৈরাজ্যের সূত্রপাত হয়েছিল কয়েক বছর পরে তা চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল। বিশৃঙ্খল দেশে শান্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য মিশরবাসীদের এক অংশদ্বারা আহূত হয়ে সেলিম সহজেই অযোগ্য মমলুকদের পরাভূত করে মিশরকে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এই সময় যে খলিফা হযরতের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছিলেন তিনি আল্ মুতাওয়াক্কিল্ আলাল্লাহ (প্রভুর করুণার মধ্যে পরিতৃপ্ত) এই উপাধি ধারণ করেছিলেন। সুন্নী বিবরণী অনুসারে, তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, একমাত্র মুসলিম নৃপতি যিনি এককভাবে খলিফা ও ইমামের দ্বৈত ভূমিকা পালন করতে পারতেন, আর যিনি নীতিগত ও ব্যবহারিকভাবে ইসলামের খিলাফতকে পুনঃপ্রবর্তন করতে পারতেন তিনি সেলিম। অই তিনি ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে হস্তান্তরকরণের আনুষ্ঠানিক দলিলের সাহায্যে খিলাফত অটোম্যানবিজেতার উপর অর্পণ করলেন এবং রাজকর্মচারী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ সহ "সুলতানের হাতে 'বয়েত' গ্রহণ করলেন।" একই বছরে মক্কার শরীফ, আলীর বংশধর, মুহম্মদ আবুল বারাকাতের নিকট

www.amarboi.org

থেকে সেলিম খিলাত সম্মান লাভ করলেন। তিনি তাঁর পুত্র আবু নউমির মাধ্যমে রজত রেকাবীতে মক্কার চাবি উপহার পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁর মাধ্যমে আব্বাসীয় অধিকার এবং সে সময়ে পবিত্র নগরীসমূহের তত্ত্বাবধায়ক হযরতের বংশধরদের প্রতিনিধির সংযুক্তি অটোম্যান সুলতানদের খিলাফতের অধিকারকে নিখুঁত করেছিল, "যেমন খিলাফতে আলীর অন্তর্ভুক্তি প্রথম তিনজন খলিফার নির্বাচনকে পূর্ণতা দিয়েছিল।" মক্কা ও মদিনার প্রদত্ত চিরাচরিত খুতবার সঙ্গে পবিত্র প্রার্থনা সেলিমের খিলাফতের অধিকারকে প্রয়োজনীয় পূর্ণতা দিয়েছিল। তারপর থেকে তাঁর প্রশাসন কেন্দ্র—রাজধানী কনস্টান্টিনোপল 'দারুল খিলাফতে' রূপান্তরিত হল এবং "ইসলানবোল"—"ইসলামের শহর" বলে অভিহিত হতে শুরু করল। আগে থেকেই বিভিন্ন সুন্নী রাষ্ট্র হতে রাষ্ট্রদূত সেলিম ও তাঁর পুত্র, মহান সম্রাট সোলায়মানের দরবারে তাদের সম্মান জানাতে আসত। এভাবে সুন্নীদের মতে খিলাফত ওসমানের বংশের উত্তরাধিকারে পর্যবসিত হল এবং কোন প্রতিরোধ বা বিরোধ ছাড়াই তারা চার শ' বছর ধরে এই উত্তরাধিকার উপভোগ করেছিল।

পাদটীকা

১. কয়েক পৃষ্ঠা পরে দ্রষ্টব্য।
২. পরিশিষ্ট—৩ দ্রষ্টব্য।
৩. এই শব্দটি 'ফাতওয়ায়ি আলমগিরি'তে ব্যবহৃত হয়েছে। এককভাবে অনুসারীদের সচরাচর 'মুক্তাদি' বলা হয়ে থাকে।
৪. বিভিন্ন সুন্নী মযহাবের মধ্যে এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে। বিখ্যাত মালেকী ফেকাহ্ প্রণেতা, আইনবিজ্ঞানী খলিল ইবনে ইসহাক হানাফী ও শাফেয়ী আইন-প্রণেতাদের মতো একই ভাষায় আইন প্রণয়ন করেছেন।
৫. তিনি বহু বছর ধরে কায়রোতে মালেকী সম্প্রদায়ের কাজী ছিলেন।
৬. হযরত আবু বকর থেকে আলী পর্যন্ত চারজন খলিফাকে 'খোলাফায়ে রাশেদীন'ও বলা হয়।—অনুবাদক
৭. জনগণের নৈতিক বা ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের পবিত্র শপথ।
৮. সয়ুতি।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. আব্বাসীয়দের রাজকীয় বর্ণ কালো, উমাইয়াদের বর্ণ সাদা এবং মুহম্মদের বংশধর ফাতেমীয়দের বর্ণ সবুজ।

www.amarboi.org

দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম

দ্বিতীয় পর্ব

ইসলামের মর্মবাণী

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের আদর্শ

যদি আলো আমার কাছে
খুঁজো নাকো আমায় ছাড়া,
আমি দাতা, দয়ার সাগর;
খুঁজলে পাবে আমার সাড়া।
কোনদিন কি পাওনি তুমি
ডেকে আমায় সংগোপনে?
তবে কেন ডাকছ তুমি?
—ডাকো আমায় ফুল্লমনে।
বিরহী মন যখন বলে :
"আমায় তুমি খুঁজো নাকো",
তখনি ধাই তার পানে যে,
তাইতো বলি আমায় ডাকো।
বান্দার মধ্যে অবাধ্যতা দেখলে পরে
সাজা আমি দিই যে তারে।
তাইতো বলি ডাকলেই পাবে
অন্তর দিয়ে ডাকো মোরে।

যীশুর প্রচারিত ধর্ম খ্রিষ্টধর্ম নাম ধারণ করেছে। এটা তাঁর উপাধি 'খ্রিষ্ট' থেকে গৃহীত। মুসা ও বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মও প্রবর্তকদের নামানুসারে রাখা হয়েছে। একমাত্র মুহম্মদ-প্রচারিত ধর্ম বিশিষ্ট নামের অধিকারী। তা হল ইসলাম। মুহম্মদের ধর্মের সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে 'ইসলাম' শব্দটির প্রকৃত তাৎপর্য প্রয়োজন। 'সালাম' (সালামা) শব্দটি প্রাথমিক অর্থে শান্তিতে থাকা, কর্তব্য সম্পাদন করা, দেনা শোধ করা, পরিপূর্ণ শান্তির মধ্যে অবস্থান করা বুঝায়, আর গৌণ অর্থে শব্দটি যাঁর সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হয় তাঁর কাছে

www.amarboi.org

আত্মসমর্পণ করা বুঝায়। এর থেকে যে বিশেষ পদ গঠিত হয় তার অর্থ হল শান্তি, অভ্যর্থনা, নিরাপত্তা, পরিত্রাণ। সাধারণ্যে যেভাবে অনুমিত হয় শব্দটি সেভাবে আল্লাহ্র ইচ্ছায় সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ বুঝায় না, বরং ধর্মপরায়ণতার প্রতি প্রয়াস বুঝায়।

ইসলামের নৈতিক মূলনীতিসমূহের সার কোরআনের দ্বিতীয় সুরা বাক্বারার মধ্যে সংক্ষেপে-সারের আকারে বিবৃত হয়েছে : "এ যে সেই কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। এ যে ধর্মভীরুদের জন্য সঠিক পথের সন্ধান। অদৃশ্যে যারা বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম রাখে, আমি যে রুজী তাদেরকে দান করি তা থেকে খরচ করে। আর আপনার উপর যা নাজিল হয়েছে তার উপরে আর আপনার আগেও যা নাজিল হয়েছে তাও যারা বিশ্বাস করে। আর আখিরাত সম্পর্কে যারা আস্থাবান। 'এরাই তাদের পালনকর্তার পথগামী— এরাই সফল হবে।"[১]

যেসব মৌলিক ভিত্তির উপর ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত তা হল (১) স্রষ্টার একত্ব, বিমূর্ততা, ক্ষমতা, করুণা ও সর্বোচ্চ প্রেমের প্রতি বিশ্বাস, (২) মানবজাতির মধ্যে বদান্যতা ও ভ্রাতৃত্ব, (৩) প্রবৃত্তিসমূহের দমন, (৪) যাবতীয় কল্যাণ-প্রদাতার প্রতি সকৃতজ্ঞ হৃদয়, এবং (৫) পরকালে মানুষের কার্যাবলীর হিসাবনিকাশ। আল্লাহ্র ক্ষমতা ও প্রেম সম্পর্কে যে মহান ধারণাসমূহ ব্যক্ত হয়েছে আর কোন ভাষায় তার তুলনা নেই। আল্লাহ্র একত্ব, বিমূর্ততা, শক্তি-মহিমা ও করুনা আল্ কোরআনের সর্বাপেক্ষা বেগবান ও উদ্দীপনামূলক অনুচ্ছেদসমূহের নিরবচ্ছিন্ন বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। জীবন, জ্যোতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ কখনও থামেনি। কিন্তু এই গ্রন্থে নির্বিচারবাদের কোন আভাস নেই। মানুষের অন্তর্চৈতন্য, একমাত্র তার স্বজ্ঞা ও প্রজ্ঞার প্রতি আবেদন করা হয়েছে।

এবার আসা যাক, হযরতের ইসলাম প্রচারকালে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির ধর্মীয় ধারণা সম্পর্কে একটু পর্যালোচনা। পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে খোদার ধারণা ব্যক্তি বা গোত্রভেদে বিভিন্ন ধরনের ছিল। তুলনামূলকভাবে বললে কোন কোন ব্যক্তি প্রাকৃতিক বস্তুতে দেবত্ব আরোপ করত, কেউ কেউ মৃত্তিকা, দণ্ড কিংবা পাথর পূজা করত; কেউ কেউ পরকালে বিশ্বাস করত, আবার কারও সে সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। সিরীয়-ফিনিসীয়দের মতো প্রাক্-ইসলামী আরবদের কানন ছিল, দৈববাণীর জন্য বৃক্ষ ছিল, পুরোহিতবৃন্দ ছিল। লিঙ্গপূজা তাদের মধ্যে অজানা ছিল না; স্বর্গীয় আপ্যায়ণকারীদের মতো প্রজননক্ষম শক্তিসমূহ পাথর ও কাঠের তৈরি স্মৃতিস্তম্ভের তলায় পূজা লাভ করত। এখনকার মতো তখনও মরুভূমির অবাধ্য অধিবাসীরা যে অদৃশ্য শক্তি দেশের উপর দিয়ে ঝটিকা প্রবাহিত করত কিংবা পথচারীকে বিভ্রান্ত করার জন্য মনোরম দৃশ্য জাগিয়ে তুলত তার ধারণা সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞেয় ছিল না। এরূপ উচ্চতর উপাস্য, সবকিছুর প্রভুর[২] দুর্বোধ্য, অনভিজ্ঞতাপূর্ণ ধারণা আরবজাহানে ভেসে বেড়াত।

ইহুদীগণ, যাদেরকে একত্ববাদী ধারণার মহান রক্ষক বলে ইতিহাসে সাধারণভাবে বিবেচনা করা হয়েছে, সম্ভবত এই ধারণা গঠনে সাহায্য করে থাকবে। ধর্মীয় বিধান

www.amarboi.org

ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিমূলক উপাদান দ্বারা পরিপোষিত না হলে একটা জাতির চিন্তায় কী বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটতে পারে তা তারা নিজেরাই প্রমাণ দিয়েছে।

ইহুদীরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতির চাপে আরবে প্রবেশ করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই আগন্তুকদের বিভিন্ন দল, শরণার্থী বা ঔপনিবেশিকদের ধারণার মধ্যে পার্থক্য ছিল। যারা ভেস্পাসিয়ান, ট্রাজান বা হাড্রিয়ানদের আগে পালিয়েছিল তাদের চেয়ে অ্যাসিরীয় বা ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা বিতাড়িত লোকদের ধারণা আরও বেশি ঈশ্বরে মানব গুণাবলীর আরোপ করেছে কিংবা ঈশ্বরে মানব-আবেগসমূহের আরোপসূচক ছিল। যে, বৈশিষ্ট্যগুলি ইসরাইলদেরকে তাদের নিজ জন্মভূমিতে বারবার পৌত্তলিকতার মধ্যে টেনে নামিয়েছিল তখন তাদের শিক্ষকগণ তাদের মধ্যে থেকে তাদেরকে অধঃপতনের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন, তা তাদেরকে তাদের আরব ভাইদের পৌত্তলিকতা থেকে রক্ষা করতে পারেনি। ইবরাহিমের আল্লাহর ধারণার সঙ্গে তারা স্বাভাবিকভাবে উপাস্যের জড়াত্মক ধারণার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিল। তাই তারা কাবাগৃহের ভিতরে "ইবরাহিমের পাশে উৎসর্গের জন্য একটি ভেড়ার মূর্তি" নির্মাণ করেছিল।

পরবর্তী আগন্তুকদের মধ্যে শাম্মাইত ও জীলটগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। তাদের মধ্যে আইনের উপাসনা পৌত্তলিকতার পর্যায়ে পৌঁছেছিল, আর ইহুদী পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ প্রায় উপাস্যের মতই শ্রদ্ধা দাবী করতেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে তারাই জনগণের অভিভাবক, আইন ও ঐতিহ্যের রক্ষক, "জীবন্ত দৃষ্টান্ত ও দর্পণ যাতে আইনানুসারে জীবনের সঠিক পন্থা সংরক্ষিত"।[৩] তারা নিজেদেরকে 'জাতির পুষ্প' বলে বিবেচনা করতেন এবং খোদার সঙ্গে যোগাযোগের দরুন তারা ভবিষ্যদ্বাণী করার অধিকারী বলে বিবেচিত হতেন। বস্তুতঃ, জনগণও নিজেদের দ্বারা তারা আল্লাহর প্রধান অনুগৃহীত বলে বিবেচিত হতেন।[৪] জোসফাস বলেন যে, মুসার প্রতি ইহুদীদের সম্মানবোধ এতই অধিক গড়িয়েছিল যে তারা তাঁকে খোদার পরেই সম্মান দিত এবং কায়নীয়া বংশের[৫] অন্তর্গত জাতীয় জীবন ও আইনের পুনঃপ্রবর্তক এজরার প্রতি এই সম্মান বিনিময় করেছিল।

তারপরেও ইহুদী জনগণ সম্ভবত কখনও টেরাফিমের প্রার্থনা বাতিল করেনি। এটা ছিল এক ধরনের পারিবারিক দেবতাদের উপাসনা। এ সব দেবতা মানুষের আকৃতিতে তৈরি করা হত এবং পারিবারিক দৈববাণীরূপে তাদের পরামর্শ প্রার্থনা করা হত কিংবা তাদেরকে অভিভাবক গৃহদেবতা হিসেবে সম্ভবত অধিকতর বিবেচনা করা হত।[৬] পৌত্তলিক আরবদের সংস্পর্শে এসে এই প্রার্থনা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকবে।

যখন জুডিয়ায় যীশুর আবির্ভাব হল তখন একটি বংশ—জিহোভার উপাসকগণ আল্লাহর একত্ববাদ এবং ক্ষমতা ও করুণার মাধ্যমে বিশ্বপ্লাবী পরম ইচ্ছাশক্তির ধারণা গ্রহণ করেছিল। এমনকি এই বংশের লোকদের মধ্যেও সকল প্রয়াস সত্ত্বেও আল্লাহর ধারণা হয় পৌত্তলিক জাতিসমূহের কাছাকাছি এসে বাধাপ্রাপ্ত নয়তো বিধর্মী দর্শনসমূহের প্রভাবে রূপান্তরিত হয়েছিল। এক পক্ষে চ্যাল্ডীয়-মাজীয় দর্শন ইহুদী ঐতিহ্যের উপর তার অনপনেয় প্রভাব বিস্তার করেছিল, পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে সর্বোত্তম চিন্তাবিদেরা

www.amarboi.org

গ্রীক ও রোমান দার্শনিকদের মধ্যে মহান আদি কারণের ধারণার সূচনা করলেও আলেকজান্দ্রিয় চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যে এমন সব ধারণা সংযুক্ত করেছিল যা তাদের একত্ববাদী ধর্মমতের সঙ্গে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না।

যীশু যখন তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন তখন হিন্দুরা অনেক দেবদেবীর পূজা করত; ম্যাজো-জরথুস্ত্রবাদীগণ দুই ঐশী সত্তার ধারণা নিয়ে প্রভুত্ব অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছিল; গ্রীক, রোমান ও মিশরীয়দের মন্দির বিভিন্ন উপাস্য-বিগ্রহে পরিপূর্ণ ছিল, আর তাদের নৈতিকতা উপাসকদের নৈতিকতারও নিচে ছিল। এই ছিল সেকালের সভ্যজগতের অবস্থা। যীশু তাঁর যাবতীয় স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা নিয়েও তাঁর অত্যুৎসাহী অনুসারীদের আরোপিত সকল প্রবঞ্চনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। তিনি কখনও নিজেকে 'আল্লাহর পরিপূরক' কিংবা 'ঐশী সত্তার অংশ' হিসেবে দাবী করেননি।

এমন কি আধুনিক ভাববাদী খ্রিস্টধর্ম আগের যুগের অবতারবাদের ঐতিহ্য এখনও পর্যন্ত ঝেড়ে ফেলতে পারেনি। যুগ যুগ ধরে মহান শিক্ষকের ইতিহাস থেকে যাবতীয় মানবিক উপাদান বাতিল করে তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে পৌরাণিক কাহিনীর জগাখিচুড়িতে পর্যবসিত করা হয়েছিল। 'এক শতাব্দীর তা দেয়ার ফলে' নিউ টেস্টামেন্ট সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে অস্পষ্টতার কুজ্ঝটিকায় ঢেকে ফেলেছিল। প্রতিদিন 'অনন্তের বুকে জাত কাল' শক্তি সংগ্রহ করেছিল এবং নিসের পরামর্শ সভায় তার আকৃতি ও সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছিল ও একটি ধর্মমতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল।

অনেক মানুষ সার্বজনীন পিতার দূরবর্তিতায় বিভ্রান্ত হয়ে মধ্যবর্তী পথে এক মানবিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে আশ্রয় খোঁজে এবং তাঁকে তারা ঐশী বলে অভিহিত করে। উপাসনার নিকটবর্তী বস্তুর এই আবশ্যকতা আধুনিক খ্রিস্টধর্মকে একটি আদর্শের নামকরণ করে সেই আদর্শকে রক্তমাংসের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুতে রূপান্তরিত করেছে এবং তাকে মানব-ঈশ্বর বলে পূজা করেছে।

নাজারাতের প্রেরিত পুরুষ যে পৌনঃপুনিকতা সহকারে নিজেকে 'আল্লাহর পুত্র' বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং তাঁর ঐশীত্বের প্রমাণস্বরূপ নিজে আল্লাহর ন্যায় একই উপাসনা দাবী করেছিলেন তা 'ডিফেক্টস অব মডার্ন ক্রিশ্চিয়ানিটি' গ্রন্থে মেধাবী (?) লেখক তা বিচার করছেন। যেভাবে খ্রিস্টান ধর্মযাজক ও যুক্তিবাদীরা ব্যাখ্যা করেছেন যে যীশু নিজেকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে প্রতিপন্ন করেছেন, তা আমরা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করি। ম্যাথু আর্নল্ড চূড়ান্তভাবে দেখিয়েছেন যে নিউ টেস্টামেন্টের বিবরণ বহু দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য। যদি ধরে নেওয়া যায় যে তাঁর প্রতি যে গুণাবলী আরোপ করা হয়েছে তিনি তা ব্যবহার করেছিলেন, তাতে কি প্রমাণিত হয় যে তিনি 'পিতার একমাত্র জাত'? খ্রিস্টান যুক্তিবাদীরা কি শোনেননি যে প্রাচ্যের বিখ্যাত সাধক আল্ হাল্লাজ যিনি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবী করেছিলেন, বলেছিলেন 'আনাল্ হক'—'আমি সত্য' এবং ইহুদী সেনহেড্রিমের মতো মুসলমান শাস্ত্রজ্ঞগণ নিন্দনীয় বাক্যের জন্য তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল ও মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল? বেচারা সরলহৃদয় সাধককে সুগভীর মরমী

www.amarboi.org

উপলব্ধি ব্যক্ত করার জন্য এভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হল। বাবী সম্প্রদায়ের লোকেরা এখনও বিশ্বাস করে যে তাদের নেতা—অনন্ত জীবনের 'ফটক', নিহত হননি, তিনি অলৌকিক উপায়ে স্বর্গে স্থানান্তরিত হয়েছেন। একথা কি বলা যেতে পারে যে যখন আবু মুঘিস আল্ হাল্লাজ[৭] এবং বাব নিজেদের 'সত্য' ও 'স্বর্গের ফটক' বলেছিলেন, তখন তাঁরা কী বোঝাতে চেয়েছিলেন যে তাঁরা ঐশী-সত্তার অংশ, আর যদি তাঁরা তাই বোঝাতে চেয়েছিলেন তবে তাঁদের দাবী কি প্রমাণের সমকক্ষ? কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে যীশুর ধারণাসমূহকে তাঁর শিষ্যদের কুসংস্কার থেকে মুক্ত করলে তাঁর চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব এককভাবে অতিরঞ্জন দোষমুক্ত হয়। আমরা একথা স্বীকার করিনা যে তিনি এমন উক্তি করেছেন যা তাঁর প্রতি আরোপিত দাবী প্রতিপন্ন করতে পারে। আল্লাহর 'পিতৃত্ব' সম্পর্কীয় ধারণা সমগ্র মানবজাতিকে স্পর্শ করেছিল। সব মানুষই আল্লাহর সন্তান এবং তিনি সেই চিরন্তন পিতা[৮] কর্তৃক প্রেরিত তাদের শিক্ষক। সুতরাং খ্রিস্টানদের সম্মুখে মহত্তর দৃষ্টান্তই ছিল। নাজারাতের প্রেরিত পুরুষের শিক্ষা তাদেরকে উপাস্যের এক বিশুদ্ধতর ধারণায় উন্নীত করা উচিত ছিল। কিন্তু ছয়শ বছর ধরে তাঁর ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে তাঁর বাণীর বিরোধী পুরাণ (বানোয়াট গল্পকথা) গড়ে উঠেছে যা তাঁকে খোদাতে পর্যবসিত করেছে। জগতের উপাসনার ক্ষেত্রে 'দাস' প্রভুর স্থান দখল করেছে। অজ্ঞ সাধারণ নব্য পিথাগোরীয় মতবাদ, প্লেটোবাদ, জুডিয়ো-হেলেনীয় দর্শনের সঙ্গে যীশুর শিক্ষার এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ উপলব্ধি করতে অসমর্থ হয়ে যীশুকে খোদার অবতার বলে পূজা করত কিংবা স্মৃতিচিহ্ন ও ধাতুতে খোদিত দেবীর মূর্তি, যা যীশুর নির্ভেজাল মাতার প্রতিবেদন ছিল, সেই আদিম উপাসনায় ফিরে গিয়েছিল।[৯] কলিরিডিয়ানগণ কোন দিক দিয়েই গুরুত্বহীন গোত্র ছিল না; তারা এতদূর এগিয়ে গিয়েছিল যে খ্রিস্ট-ধর্মমন্দিরে কুমারী মেরীকে খোদা হিসেবে চালু করেছিল এবং তাকে ঈশ্বর বলে উপাসনা করত ও পাকানো পিঠা উৎসর্গ করত—এই পিঠার নাম ছিল 'কলিরিস', যা থেকে এই গোত্রের নামকরণ করা হয়েছে। নিসের পরামর্শ সভায় যীশুর স্বরূপ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছিল, সেখানে এমন লোক উপস্থিত ছিল যারা পিতা ঈশ্বর ছাড়া আরও দু'জন ঈশ্বর—খ্রিস্ট ও কুমারী মেরীর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল।[১০] কথিত আছে রোমান্টিকরা এখনও পর্যন্ত যীশুর মাতাকে ত্রিত্বের 'পরিপূরক' বলে অভিহিত করে।

কুসংস্কারের দীর্ঘ রজনীতে খ্রিস্টানগণ নাজারাতের পয়গাম্বরের শিক্ষার সরলতা থেকে দূরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। যীশুর ধর্মের সঙ্গে প্রতিমূর্তি, সাধুসন্ত ও স্মৃতিচিহ্নের উপাসনা অবিচ্ছেদভাবে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। যে সব রীতি-নীতি তিনি ত্যাগ করেছিলেন, যে সব ক্ষতিকর জিনিস তিনি নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন সেসব একে একে তাঁর ধর্মের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছিল। যে পবিত্র ভূমিতে মহামান্য শিক্ষক বাস করেছিলেন, বিচরণ করেছিলেন তা অলৌকিকতা ও কল্পনার মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। এবং 'জনগণের স্নায়ুমণ্ডলী বাধ্যবাধকতা ও বিশ্বাসের অভ্যাসের দ্বারা আড়ষ্ট ও অবশ হয়ে পড়েছিল"।[১১]

www.amarboi.org

উপরে বর্ণিত অবান্তর অযৌক্তিক বিষয়গুলির বিরুদ্ধে মুহম্মদের জীবন নিয়োজিত হয়েছিল। বিশ্বের অধিপতি আল্লাহর গভীর সান্নিধ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সত্যের বাণীতে এক দিকে মূর্তিপূজক আরব্য গোত্রসমূহকে এবং অন্যদিকে অধঃপতিত খ্রিস্টধর্ম ও ইহুদীধর্মের অনুসারীদেরকে মুহম্মদ আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি যথার্থই 'ভাষার নিপুণ প্রয়োগকারী' বলে অভিহিত হয়েছেন। তিনি কখনও প্রজ্ঞার সীমানা অতিক্রম করেননি এবং তাদের বিশ্বাসের ভয়ানক অসঙ্গতির দরুন তাদেরকে লজ্জা অনুভব করতে বাধ্য করেছেন। এরূপে আল্লাহর একত্ববাদের মহান প্রচারক মুহম্মদ বিশ্বের স্রষ্টার সাথে অন্যান্য বস্তু ও প্রাণীর শরীক স্থাপনের পশ্চাদমুখী প্রবণতার বিরুদ্ধে মহান সংগ্রামের অগ্রনায়ক হিসেবে ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছেন। কোরআন মজীদে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের মতো অনলবর্ষী আয়াতের প্রায়ই সাক্ষাৎ পাওয়া যায় ঃ "তোমাদের প্রভু তো একজনই, তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই; তিনিই পরম দাতা ও দয়াময়। নিশ্চয়ই গগনমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃজনে—আর দিন ও রাতের আবর্তন আর পানির উপর ভাসমান তরীসমূহ—যা মানুষের উপকারী জিনিসপত্র নিয়ে ভেসে বেড়ায়, আর আসমান থেকে আল্লাহ যে বারিধারা বর্ষণ করেন—তা-ই দিয়ে মরা মাটিকে বাঁচিয়ে তোলেন, আর তাতে যে সব চলমান জীবন ছড়িয়ে রেখেছেন, বায়ুর গতি পরিবর্তনে, আর মেঘমালা যা আসমান ও জমিনের মাঝখানে ভাসামান রাখা হয়েছে—এসব নির্দশন তো জ্ঞানচর্চাকারী কওমের জন্যই। মানুষের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ছাড়া আরও কাউকে শরীক করেছে, আর তাদেরকে আল্লাহর মতোই ভালবাসছে।"[১২] বিপথগামী লোকদের জন্য এই বাক্যসমূহ কতই না গভীর সহানুভূতির বাণী বহন করছে। পুনরায় দেখি ঃ "তিনিই তো তোমাদেরকে বিদ্যুচ্ছটা দেখিয়ে থাকেন ভীতি ও আশা সঞ্চারের জন্য। তিনিই তো ঘনঘোর মেঘমালা থরে থরে সাজিয়ে রাখেন। বজ্র তাঁর প্রশংসায় আর ফিরেশতাগণ তাঁর ভয়ে পবিত্রতা ঘোষণা করছে। তিনিই তো বজ্র পাঠিয়ে থাকেন আর যার উপরে ইচ্ছা হয় নিক্ষেপ করেন, অথচ তারা আল্লাহ সম্পর্কে ঝগড়াই করে যাচ্ছে।... সত্যের আহ্বান, সে তো তাঁরই জন্য। কিন্তু যারা তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডেকে থাকে তারা ওদের কোনও বিষয়ে মোটেই সাড়া দেয় না। কিন্তু তাদের অবস্থা ঠিক সেই লোকটির মতোই যে নাকি হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়েছে, আর ভাবছে ঃ এতেই পানি তার মুখ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। কিন্তু, তা যে কোনও দিন তার কাছে মোটেই পৌঁছাবে না।"[১৩] তিনিই তো গগনমণ্ডল আর এই পৃথিবী সঠিকভাবেই নির্মাণ করেছেন। তাঁর সুমহান সত্তা—ওরা যেগুলোকে শরীক ঠাওরাচ্ছে সে সবের তুলনায় অনেক মহান। মানুষকে তিনি শুক্র থেকে সৃষ্টি করেছেন, তবু সে প্রকাশ্যে ঝগড়া সৃষ্টি করল। আর চতুষ্পদ জন্তুদেরকে তোমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন।...আর তাতে তোমাদের জন্য শানসওকাত ও মানমর্যাদা নিহিত রয়েছে যখন তোমরা সেগুলোকে সন্ধ্যাবেলা ফিরিয়ে আন, আবার সকালবেলা যখন চরাতে নিয়ে যাও।... তিনিই ত তোমাদের জন্য নিয়ন্ত্রিত করেছেন রাতদিন, চন্দ্র ও সূর্যকে—তারকাসমূহকে কাজে লাগানো হয়েছে তাঁরই হুকুমে।... তিনিই তো সেই

www.amarboi.org

সুমহান সত্তা যিনি সাগরকে অনুগত করে রেখেছেন...আর তোমরা তো দেখতেই পাচ্ছ যে নৌকাগুলো পানির বুক চিরে কিভাবে এগিয়ে যায়।...যেন তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার।...তাহলে যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি, যে সৃষ্টি করতে পারেন না তার সমান? তোমরা কি চিন্তা কর না? তোমরা যদি আল্লাহর নিয়ামতসমূহ গুনতে চাও, তাহলে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। একথা সত্য সুনিশ্চিত যে আল্লাহ্ বড়ই ক্ষমাশীল দয়াময়। আল্লাহ্ বেশ জানেন তোমরা যা কিছু গোপন কিংবা প্রকাশ করছ। যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে ডেকে থাকে যারা কিছুই তো সৃষ্টি করতে পারেনি বরং ওদেরকেই তো তৈরি করা হয়েছে। তারা নিস্প্রাণ—জীবন্ত নয়।"[১৪]

"আল্লাহ—তিনি ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, রক্ষাকর্তা। তন্দ্রা ও ঘুম তাঁকে স্পর্শ করে না। আসমান-জমিনের সবকিছুই একমাত্র তাঁরই। এমন কে আছে—যে নাকি তাঁরই অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? যা কিছু প্রকাশ্য—আর যা কিছু এখনও জানা যায়নি—সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানভাণ্ডারে শামিল কোন বিষয়ের সবকিছু জানা সবার জন্য অসম্ভব। তবে তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন, সে কথা আলাদা। তাঁর আসন—আসমান-জমিনের সব জায়গাই ঘিরে রয়েছে। এ দুটোর হিফাজত করা তাঁর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়..."[১৫]"তিনি তো রাতকে দিনের পোশাক পরিয়েছেন যেন সে দৌড়ে চলে আসে। আর সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহতারকাসমূহ তাঁরই হুকুম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। সমগ্র বিশ্ব ও যাবতীয় বিধান কি শুধু তাঁরই জন্য নয়? সারা জাহানের পালনকর্তা আল্লাহতায়ালা বড়ই বরকতের মালিক।[১৬] "বলো, তিনিই একক আল্লাহ্—তিনি চিরন্তন, স্ব-নির্ভর। তিনি কারুর পিতাও নন, আর কারুর পুত্রও নন। আর কেউ তাঁর সমকক্ষও নয়।" "সমুদয় প্রশংসা সারা জাহানের পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ্র, যিনি পরম করুণাময় ও দয়াময়, যিনি বিচার দিনের মালিক। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি। তুমি আমাদেরকে সরল সহজ পথ দেখাও—তাঁদেরই পথ যাঁদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছ; তাদের পথ নয়—যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট"[১৭]..."বলো, আমি উষার পালনকর্তার কাছে আশ্রয় চাই তিনি যা কিছু তৈরি করেছেন সে সবের অনিষ্ট থেকে।" "তোমাদের উচ্চৈঃস্বরে বলার প্রয়োজন নেই, কেননা তিনি গোপন ফিস ফিস শব্দও এবং তার চেয়েও গোপন বিষয়ও জানতে পারেন। বলো—আকাশ-পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার মালিকানা কার? বলো—আল্লাহর যিনি নিজের উপর করুণা বর্ষণ করেছেন।"[১৮] "তাঁরই কাছে অদৃশ্যভাণ্ডারের চাবিসমূহ রয়েছে, যা তিনি ছাড়া আর কেউ মোটেই জানে না। আর তিনিই জানেন—পানিতে আর স্থলভাগে যা কিছু রয়েছে। তাঁর অজ্ঞাতে পাতাগুলোর মধ্যে একটিও যে ঝরছে না। ঘন অন্ধকার মাটির ভেতর যে দানবটি রয়েছে, সরস ও শুকনো এমন কোনও জিনিস নেই—সুস্পষ্ট কেতাবে যার উল্লেখ নেই। তিনিই তো রাতের বেলা তোমাদেরকে মরার মতো ফেলে রাখেন। দিনের বেলা তোমরা যা কিছু কর সে সবও তিনি ভাল করেই জানেন। তারপরে তিনি তোমাদেরকে জাগিয়ে তোলেন। এভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদ পুরা করছেন।

www.amarboi.org

তারপরে তাঁরই মহান দরবারে তোমাদেরকে ফিরতে হবে এবং তিনি তোমাদেরকে বিস্তারিতভাবেই দেখিয়ে দেবেন যা তোমরা করেছিলে।"[১৯] নিশ্চয়ই আল্লাহতায়ালাই যে বীজ ও কেন্দ্রীন ফুটিয়ে তোলেন, প্রাণহীন বস্তুর মধ্য হতে জীবন্ত বস্তুর বিকাশ ঘটান, আর জীবন্ত বস্তুর মধ্য হতে নিষ্প্রাণ বস্তু আলাদা করে ফেলেন। ইনি তো হচ্ছেন তোমাদের আল্লাহ্। এরপরেও তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় যাচ্ছ? তিনিই তো ভোরের আলো ফুটিয়ে তোলেন। রাতকে তিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের বিশ্রামের জন্য। সূর্য ও চাঁদকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের হিসাবের সুবিধার জন্য। এ হচ্ছে মহান প্রতাপশালী ও সুমহান জ্ঞানীর সুনির্ধারিত পরিমাণ।"[২০]

"ইনিই তো হচ্ছেন তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্। তিনি ছাড়া আর তো কোন মাবুদ নেই। সব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা যে তিনিই। সুতরাং তোমরা তাঁরই ইবাদত কর। তিনিই তো সব জিনিসের অধিকারী। তোমাদের চোখ দিয়ে তাঁকে অনুভব করা যায় না, কিন্তু তিনিই যে সব দৃষ্টি অনুভব করতে পারেন। তিনি তো সব রহস্যের খবর রাখেন।"[২১]

"বলো, আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু—সবই যে শুধু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যই।"[২২]

"তুমি কি দেখতে পাও না যে আকাশ ও পৃথিবীর সকল প্রাণী আল্লাহর প্রশংসা কীর্তন করে, আর পাখীও? প্রত্যেকেই তাদের উপাসনা প্রশংসা কীর্তনের পন্থা জানে। আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহর এখতিয়ারে এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন। আকাশ-পৃথিবীর রাজত্ব কার? তিনিই আল্লাহ! তিনি জীবিত করেন এবং তিনি মৃত্যু দান করেন।"[২৩] "তিনি চিরঞ্জীবন্ত। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। কাজেই তাঁকেই আহ্বান কর এবং তাঁরই নির্ভেজাল ইবাদত কর। সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রশংসা। ... আমার প্রার্থনা, আমার জীবন ও মৃত্যু বিশ্বজাহানের প্রভুর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই।"[২৪] "বলো—তিনিই তো সেই মহান সত্তা, যিনি তোমাদেরকে এই দুনিয়ার বুকে সৃষ্টি করেছেন, আর তোমাদের জন্য কান, চোখ ও মন তৈরি করেছেন। তোমরা যে খুব কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক! ... তিনিইতো সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে এই দুনিয়ার বুকে ছড়িয়ে রেখেছেন আর তোমাদেরকে তাঁরই দরবারে একত্র করা হবে।"[২৫] "হে আমার পালনকর্তা, আমাকে গোনাহগার অত্যাচারী কওমের শামিল করবেন না।"[২৬] "তিনিই তো সুমহান সত্তা—তিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়ে দিয়েছেন চাদর হিসেবে; নিদ্রা তৈরি করে দিয়েছেন বিশ্রামের জন্য, আর দিন তৈরি করেছেন উঠে চলাফেরা করার জন্য।"[২৭] "অসহায় অত্যাচারিত মানুষের ফরিয়াদে কে সাড়া দেন—যখন তাঁকে ডাকা হয় আর কষ্ট ক্লেশ দূর করে দেন এবং কেই বা তোমাদেরকে এই পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন?"[২৮] "যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ও পরমজ্ঞানী; গোনাহ মাফকারী, তওবা মঞ্জুরকারী ..."[২৯] "আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য গ্রহণ করব, যখন আল্লাহ সব কিছুর প্রভু?" আল্লাহ কাউকে সাধ্যশক্তির বেশি দায়িত্ব ন্যস্ত করেননি—যে যা অর্জন করেছে তাঁরই পুণ্য সে পাবে।"[৩০]

www.amarboi.org

"অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ফিরে যাবে এবং তোমরা যে বিষয়ে মতপার্থক্য পোষণ কর তিনি তা তোমাদের নিকট জ্ঞাত করাবেন। তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সব বিষয়ে অবগত, তিনি সুমহান, সুউচ্চ!...সবাই সমান তোমাদের মধ্যে যদি কেউ চুপিসারে কোনও কথা বলে কিংবা চিৎকার করে অথবা যদি কেউ রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কিংবা দিনের বেলায় কোথাও যায়।"[৩১]

"আল্লাহ—তিনিই তো আসমান জমিনের জ্যোতি। তাঁর এই নূরের উপমা হল—ঠিক যেমন একটা তাকের উপর একটি প্রদীপ জ্বলছে। আর সেই প্রদীপটি একটি কাঁচের চিমনীর মধ্যে রয়েছে। আর তা যেন একটি উজ্জ্বল তারকা। এই প্রদীপটি জ্বালা হয়েছে কল্যাণপূত জলপাই গাছের তেল থেকে—যে গাছ পূর্ব-পশ্চিম কোনমুখীই নয় আর তেল অগ্নিসংযোগ ছাড়াই উজ্জ্বল আভা বিকীর্ণ করে। এ হল আলোর আলো—জ্যোতির জ্যোতি। আল্লাহ্ যাকে খুশি তাকে নিজের জ্যোতির দিকে পথ দেখিয়ে থাকেন। মানুষের বুঝাবার সুবিধার জন্য আল্লাহ্ উপমা ও রূপক ব্যবহার করেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ।

যেসব গৃহের মধ্যে আল্লাহতায়ালা আদেশ জারি রেখেছেন—যেন তাতে বুলন্দ করা হয়, স্মরণ করা হয় তাঁরই নাম। সেখানে যেন সকাল সন্ধ্যায় তাঁরই পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়।

সেসব লোক—যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য, বেচাকেনার কাজ আল্লাহতায়ালার জিকর হতে গাফেল করতে পারে না, আর নামাজ কায়েম রাখা, জাকাত আদায়ের কাজেও বেখেয়াল করতে পারে না, তারা সেই দিন সম্পর্কে খুবই ভীত রয়েছে যেদিন মন ও চোখ উল্টে যাবে। যেন আল্লাহ্পাক তাদেরকে পারিশ্রমিক দান করতে পারেন সে সব উত্তম কাজের, যা তারা করেছে। আর তাঁরই সাহায্যে ভাণ্ডার থেকে আরও কিছু বাড়িয়ে দেবেন। আল্লাহ্ যাকে খুশি পর্যাপ্ত রুজি-রোজগার দান করেন।

আর যারা অবাধ্য হয়েছে—তাদের কাজ যেন মায়া মরীচিকা—যা দেখে পিপাসার্ত লোক পানি বলেই মনে করে, অথচ সে যদি তার কাছেও পৌঁছায়, তবুও সেখানে কিছুই পাবে না। অবশ্য আল্লাহকে সে নিজের কাছে পায়। আর তিনিই তার প্রাপ্য পুরোপুরি দেবেন। আসলে আল্লাহ শীঘ্রই হিসাব নিবেন।

কিংবা ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে গভীর সাগরের বুকে উত্তাল তরঙ্গমালা—একটার উপর দিয়ে আরেকটা তরঙ্গ ধেয়ে আসছে, তার উপরে ঘন কাল মেঘ একটার উপর দিয়ে আরেকটা ছুটে বেড়াচ্ছে। তখন যদি সে নিজের হাত বের করে তবে সে তাও দেখতে পাবে না। আসলে যে কেউ এমন হবে যার জন্য আল্লাহ্ পাক আলো দান করেননি—তার জন্য কোথাও যে কিছুমাত্র আলো নেই।

আপনি কি দেখেননি যে আল্লাহ্ পাকই সেই মহান সত্তা—যাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করেছে গগনমণ্ডল ও পৃথিবীর বুকে যা কিছু রয়েছে। আর ডানা মেলে উড়ন্ত অবস্থায় পাখীগুলো প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্দেগীর পথ ও জিকরের পন্থা সম্পর্কে অবহিত রয়েছে। আর আল্লাহতায়ালা যে বেশ জানেন তারা যা কিছু করছে।

www.amarboi.org

আপনি কি দেখেননি যে আল্লাহ কিভাবে মেঘমালাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে আসেন। তারপরে সেগুলোকে মিলিয়ে দেন, আবার সেগুলোকে তিনি থরে থরে সাজিয়ে রাখেন। তারপরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সেই মেঘমালার মধ্য থেকে বৃষ্টিধারা ঝরছে। আর তিনিই তো আসমান থেকে কুয়াশার পাহাড় বর্ষণ করেন। যাকে খুশি তিনি তাই দিয়ে তাকে ঘিরে ধরেন, আর যাকে খুশি তা থেকে রেহাই দেন। তাঁর বিদ্যুৎ ঝলক এমনই তীব্র ও উজ্জ্বল যাতে মনে হয় এই বুঝি চোখ ঝলসে যাবে।

আল্লাহতায়ালাই রাত ও দিনের পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই জ্ঞানীদের জন্য এতে চিন্তার বিষয় লুকিয়ে রয়েছে।"৩২

সুরা 'আর রহমান' (করুণাবিধান) যাকে ইসলামে 'আশীর্বচন' বলা হয়েছে, তা প্রকৃতির সাক্ষের প্রতি হযরতের আবেদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

সূর্য ও চাঁদ হিসাবের জন্য; তারকাসমূহ লতাপাতা ও গাছপালা সবই যে তার আনুগত্য প্রকাশ করছে। তিনিই তো আসমানকে উঁচুতে তুলে রেখেছেন। আর তিনিই তুলাদণ্ড স্থির করে দিয়েছেন যেন তোমরা ওজনের ব্যাপারে হেরফের না কর। তোমরা সঠিক ওজন কায়েম কর ন্যায়নীতি মোতাবিক—মাপে কিছু ঘাটতি কর না। তিনিই তো পশুপ্রাণীদের জন্যই পৃথিবীকে রেখে দিয়েছেন, তাতে ফল-পাকড়, খেজুর গাছ—যার খোসার উপরে আবরণ থাকে তাও রেখে দিয়েছেন। এমন শস্য যাতে ভূষি জন্মায়, আর সুন্দর সুগন্ধি ফুলও রেখে দিয়েছেন।...

তিনিই তো মানুষকে শুকনো ঠনঠনে মাটি দিয়ে তৈরি করেছেন আর জিনদেরকে পরস্পর মিলিয়ে রেখেছেন। এ দুয়ের মাঝখানে আবরণ রয়েছে যাতে দুয়ের মধ্যে একটিও সীমা ছেড়ে যেতে না পারে। এ দু'য়ের তলা থেকে মুক্তা ও মানিক বের হয়।...

আর এতে পাহাড়ের মতো উঁচু জাহাজ দাঁড়িয়ে রয়েছে—সে তো তাঁরই জন্য। তাতে যা কিছু আছে—সবই যে বিলুপ্ত হবে। আর আপনারই মহান পালনকর্তার সত্তাই যে বাকী থাকবে—যিনি পরম প্রতাপশালী ও মহান সুজন।...গগনমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবকিছুই যে তাঁর সান্নিধ্য পেতে চায় আর তিনি প্রতিটি মুহূর্ত ব্যস্ত রয়েছেন।

আপন পালনকর্তার নাম তো বড়ই বরকত মহিমাপূর্ণ যিনি প্রতাপশালী ও পরম অনুগ্রহশীল।"৩৩

"প্রত্যেকটি মানুষের গলায় তার কাজকর্ম ঝুলিয়ে দিয়েছি। আর কিয়ামতের দিন তা কিতাবের আকারে বের করব তারই জন্য। আর তাও যে সে খোলা অবস্থাতেই পাবে... ।"৩৪

"আর শপথ এই মানুষের—আর যিনি তার অঙ্গাদি সুষম করেছেন। তারপর অনাচার থেকে বাঁচার এবং পরহিজগার হওয়ার মতো বুদ্ধিবিবেচনা দান করেছেন। সেই তো নাজাত পেল— যে নিজেকে পাকপবিত্র করল। আর যে ধুলোমাটি লাগাল, সে তো ক্ষতিগ্রস্ত হল।"৩৫—পরম করুণাময় আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কিছুমাত্র অসঙ্গতি দেখতে

www.amarboi.org

পাবে না। একটু চোখ তুলে দেখই না— কোথাও কোন ত্রুটি তোমার নজরে পড়ছে না কি? তারপরে বারবার তোমার চোখ বুলিয়ে যাও, সে তোমার কাছে ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে আসবে।[৩৬] "যখন পৃথিবী নির্জীব ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে তিনি তাতে প্রাণসঞ্চার করেন; তেমনিভাবে তোমাদেরকেও পুনরুজ্জীবিত করা হবে।...আসমান ও জমিন তাঁরই হুকুমে সুস্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তারপরে তোমাদেরকে যখন একবার ডাকা হবে দুনিয়ার বুক থেকে তখন তোমরা বেরিয়ে আসবে।"[৩৭]

"যখন সূর্যকে গুটিয়ে ফেলা হবে; আর যখন তারকাগুলো নিভে যাবে। যখন পাহাড়-পর্বতগুলোকে ধূলিসাৎ করা হবে। আর যখন গর্ভবতী উটগুলো অকেজো হয়ে পড়বে; আর যখন বন্য জন্তুগুলোকে একত্র করা হবে। আর যখন সাগর আগুনে পরিণত হবে। আর যখন আত্মাগুলোকে আবার মিলানো হবে। আর যখন সেই কন্যাকে যাকে জীবিত মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কোন্ গোনাহের কারণে হত্যা করা হয়েছিল তোমাকে? আর যখন আমলনামার দফতর খোলা হবে। আর যখন আসমান অনাবৃত করা হবে। আর যখন জাহান্নামের আগুন তাজা করা হবে। আর যখন জান্নাত কাছে আনা হবে; তখন সে সবই জানতে পারবে যা সে নিয়ে এসেছে।"[৩৮] "...আপনি সেই (কিয়ামতের) মুহূর্ত সম্পর্কে জানেন কি? একমাত্র আল্লাহ সে বিষয়ে অবগত আছেন। যারা কিয়ামতকে ভয় করে তাদেরকে উপদেশ দেওয়াই আপনার দায়িত্ব।" "... সেই অবশ্যম্ভাবী কি তা কে আপনাকে শিক্ষা দেবে? সামুদ ও আদজাতি বিচার দিবসকে মিথ্যা জেনেছিল। তাদেরকে বিদ্যুৎ ও ভয়াবহ ঝটিকা ধ্বংস করেছিল।"

এত পরাক্রমশালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর করুণা সর্বব্যাপীঃ "দিনের আলোর শপথ আর রাতের কসম—যখন আবৃত করে। আপনার পালনকর্তা আপনাকে এমনি ফেলে রাখেননি, আর তিনি অসন্তুষ্টও হননি। আসলে আখিরাতই আপনার জন্য উত্তম—পার্থিব জীবনের তুলনায়। আর শিঘ্রই আপনার পালনকর্তা আপনাকে সে সব জিনিস দেবেন যাতে আপনি খুশি হবেন। তিনি কি আপনাকে এতীম অবস্থায় পাননি? তাই তিনি আপনাকে আশ্রয় দান করলেন। আচ্ছা! আপনাকে তিনি পথ সম্পর্কে অজ্ঞ দেখে পথ দেখিয়ে দিলেন, আপনাকে দুঃস্থ অবস্থায় দেখে আপনাকে সমৃদ্ধি দান করলেন। সুতরাং আপনিও কোনও এতীমকে নির্যাতন করবেন না। আর নিজ পালনকর্তার নিয়ামতসমূহের কথা আলোচনা করতে থাকুন।"[৩৯] "তাহলে কি তোমরা ভেবেছিলে ঃ আমি তোমাদেরকে অযথা পয়দা করেছিলাম, আর তোমরা আমার দরবারে কিছুতেই ফিরবে না।...হে পালনকর্তা মাবুদ আমার, যদি আমরা ভুল করি ও পাপে নিপতিত হই, আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদের ক্ষমা করুন, আপনি দয়া করুন। আপনি তো সকল দয়াময়ের চেয়ে সেরা দয়ালু।"[৪০] "একজনের বোঝা অন্যে বইবে না। কোন সতর্ককারী (রাসুল) প্রেরণ না করে কাউকে শাস্তি প্রদান করিনি।" দেখো, এই সুস্পষ্ট গ্রন্থ অবতরণ করেছি এক সৌভাগ্য রজনীতে মানুষকে সতর্ক করার জন্য।" "আপনাকে দুঃখভারাক্রান্ত করার জন্য এই গ্রন্থ আপনার নিকট নাযিল করিনি।"

www.amarboi.org

এভাবেই এই বিস্ময়কর গ্রন্থের বর্ণনা চলেছে—এই গ্রন্থ মানুষের মহৎ অনুভূতির কাছে, তার অন্তর চৈতন্য ও তার নৈতিক বোধের কাছে আবেদন রেখেছে এবং পৌত্তলিক বিশ্বাসসমূহের বিশালতার প্রমাণ ও প্রকাশ করেছে। এমন অধ্যায় নেই বললেই চলে যেখানে আল্লাহর শক্তিমত্তা, করুণা ও একত্বের বর্ণনা নেই। খ্রিস্টান গ্রন্থকারগণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ সম্পর্কে ইসলামের ধারণা বিষয়ে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি করেছেন। ইসলামে আল্লাহকে সাধারণত দেখানো হয়েছে "দয়ামায়াহীন শাসক হিসেবে যিনি মানুষকে নিয়ে দাবার ঘুঁটির মতো খেলছেন এবং টুকরো টুকরো অবদানের প্রতি তোয়াক্কা না করেই তাঁর খেলার পরিকল্পনা করছেন।" এবার আমরা দেখব যে এ মূল্যায়ন সঠিক কিনা। ইসলামের আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞাতা, ন্যায়বিচারক, বিশ্বজাহানের প্রভু, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, জীবন ও মৃত্যুর বিধায়ক, যাঁর হাতে রাজ্যসাম্রাজ্য ও অপ্রতিহত ক্ষমতা, গৌরবময় সিংহাসনের মহান, সর্বশক্তিধর প্রভু। তিনি অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী দৃঢ়, সর্বোচ্চ, উৎপন্নকারী, পরিকল্পক, জ্ঞানী, ন্যায়বান, সত্যপরায়ণ, গণনায় ক্ষিপ্র, যিনি মানুষের কাজের বিন্দুবিসর্গ ভাল ও মন্দ সম্পর্কে ওয়াকেবহাল এবং যিনি বিশ্বাসীর কোন পুরস্কারকে মুছে যেতে দেন না। কিন্তু সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ রাজাধিরাজ, পবিত্র, শান্তিকামী, বিশ্বস্ত, তাঁর বান্দাদের অভিভাবক, এতীমের আশ্রয়দাতা, বিপথগামীর পথ-নির্দেশক, যন্ত্রণা থেকে মুক্তিদাতা, পরিত্যক্তের বন্ধু, ব্যথিতের সান্ত্বনাদাতা; তিনি সকল কল্যাণের উৎস, তিনি দানশীল প্রভু; তিনি দয়ালু, শ্রবণকারী, তিনি সকল কল্যাণের উৎস, তিনি দানশীল প্রভু; তিনি দয়ালু, শ্রবণকারী, সন্নিকটবর্তী। অনুকম্পাশীল, পরম দয়াবান, পরম ক্ষমতাশীল, মানুষের প্রতি তাঁর ভালবাসা পাখীর ছানার প্রতি পাখীর ভালবাসার চেয়েও অধিকতর স্পর্শকাতর।

আল্লাহর করুণা প্রসঙ্গে কোরআন পাকে মহৎভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 'আররহমান'—দয়ালু, এই নামটি যা দিয়ে প্রতিটি সুরার শুরু এবং যা দিয়ে তাঁকে আহ্বান করা হয়, তা আল্লাহর সেই প্রেমের গভীর, সর্বব্যাপী বিশ্বাস প্রকাশ করছে, যা ঐশী করুণা সৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশ করছে।[৪১]

পূর্ববর্তী দুই পয়গাম্বরের অনুসারীগণের নৈতিক অবনতি মহানবীকে পীড়া দিয়েছিল এবং খ্রিস্টান ও ইহুদীরা তাদের নবীদের সতর্কবাণীগুলোকে উপেক্ষা করে যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতি-নীতির অনুশীলন করেছিল সেজন্য তিনি তাদেরকে প্রকাশ্যে নিন্দা জ্ঞাপন করেছিলেন। যে ধর্মীয় উন্মাদনা ইসারী ও জেরেমীয়দের হৃদয়ে জ্বলে উঠেছিল তা অপর এক মহত্তর মানুষের হৃদয়ে আলোকিত হয়েচিল। তিনি প্রত্যাখান করেন সে-সব রীতি-নীতি; কিন্তু মানবজাতির অধঃপতনে যে বিলাপ, যে যন্ত্রণার কান্নার শব্দের উপরেও থাকে আশার বাণী।

আল্ কোরআন ইহুদীদেরকে 'মিথ্যা দেবদেবী ও মূর্তিপূজা', যা পূর্বে উক্ত হয়েছে এবং এজরার স্মৃতির প্রতি অতিরঞ্জিত সম্মান দেখানোর জন্য খ্রিস্টানদেরকে যীশু ও তদীয়

www.amarboi.org

মাতার পূজা করার জন্য তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করেছে। "আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা কিতাবের কিছু অংশ পেয়েছে? তারাই তো গোমরাহীর সাথে তার বিনিময় করল। তারা চায়—আপনি যাতে সত্য পথ ছেড়ে বিপথেই এগিয়ে যান।"[৪২] "আবার ইহুদীরা বলে : উজায়ের নাকি আল্লাহর পুত্র। আর খ্রিস্টানরা বলে : মসীহ্ হচ্ছে আল্লাহর পুত্র। এসব হল ওদের উদ্ভট কথাবার্তা যা ওদের মুখেই শোনা যায়।...তারা তো আল্লাহ্‌কে বাদ দিয় নিজেদের পাদ্রী-পুরোহিতদেরকেই পালনকর্তা প্রভুর আসনে বসিয়ে রেখেছে।...ওরা তো চায় : নিজেদের মুখের ফুঁৎকারেই আল্লাহর আলো নিভিয়ে ফেলবে।"[৪৩] "ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ বলে : আমরা তো আল্লাহরই পুত্র ও তাঁরই বন্ধু।'[৪৪] "যাঁদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে[৪৫] তাদের অনেকেই তোমাদেরকে বিপথগামী করতে চান তোমরা ঈমান আনার পর...তোমরা নিয়মিত নামাজ কায়েম কর এবং জাকাত দাও। তোমরা তোমাদের কল্যাণের যা কিছু করেছ তা তোমরা আল্লাহর কাছেই পাবে...। "তারা বলে : নিশ্চয়ই ইহুদী ও খ্রিস্টান ছাড়া অন্য কেউই বেহেশতে প্রবেশ করবে না...বলুন, তোমরা যদি সত্য বলে থাকো তবে প্রমাণ হাজির কর। না, তারা সত্য বলেনি, বরং যাঁরা আল্লাহর পথে আহ্বান করে এবং সঠিক কাজ করে, তাঁরাই তাঁদের প্রভুর কাছে পুরস্কার পাবে।"[৪৬]

"শোন হে কিতাবধারিগণ! তোমরা নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে মোটেই বাড়াবাড়ি কর না। আর আল্লাহ্ সম্পর্কে সত্য ছাড়া আর কিছুই বল না। নিশ্চয়ই মসীহ্ মরিয়মের ছেলে ঈসা। তিনি আল্লাহর রাসুল ও তাঁর বাণী যা মরিয়মের কাছে পাঠানো হয়েছিল তাঁরই তরফ থেকে রুহ হিসেবে। সুতরাং তোমরা সবাই আল্লাহর উপর আস্থাবান হও আর তাঁর রাসুলের উপরেও। তোমরা একথা মোটেই বলো না তিনজন; এটাকে বাদ দাও...মসীহ তো একথায় কোনও রকম কুণ্ঠাবোধ করতেন না যে তিনি আল্লাহর বান্দা হিসেবে গণ্য হবেন।"[৪৭] "কারও পক্ষে এ কাজটা মোটেই সম্ভব নয়—আল্লাহ তাকে কিতাব, বিধান ও নবুয়্যত দান করবেন। আর সে মানব-সমাজকে বলবে : তোমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে আমার বান্দা রূপে গণ্য হও। বরং তারা বলবে : তোমরা আল্লাহতায়ালা বনে যাও। কারণ, তোমরা কিভাবে শেখাচ্ছ আর তা নিজেরাও যে পড়ছ।"[৪৮]

নিম্নোক্ত আয়াতে এই ধরনের ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে যে অনুভূতি বিদ্যমান তা দেখানো হয়েছে : "তারা বলছে : করুণাময় আল্লাহর নাকি সন্তান-সন্ততি আছে। নিশ্চয়ই তোমরা এভাবে গুরুতর বিষয়ে জড়িয়ে পড়লে। যে কারণে হয়তো এখুনি আসমান ভেঙ্গে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়বে, আর পাহাড়-পর্বত ধূলি-বিলুণ্ঠিত হবে। কারণ তারা করুনাময় আল্লাহর নামে সন্তান-সন্ততিকে ডাকছে। অথচ তাঁর জন্য কোন সন্তান-সন্ততি মোটেই শোভা পায় না। আসমান জমিনের কোথাও এমন কেউ নেই যে নাকি করুনাময় আল্লাহর বান্দা হিসেবেই আসবে না।"[৪৯]

কিন্তু প্রত্যাদিষ্ট প্রচারক, যাঁর মহৎ উদ্দেশ্য ছিল সত্যের প্রচার, অকল্যাণের সঙ্গে কল্যাণকে গুলিয়ে ফেলেননি। "কিতাবধারীদের মধ্যে সবাই সমান নয়; তাদের মধ্যে

www.amarboi.org

একদল রয়েছে—যাঁরা রাতের বেলায় সরল মনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে, তাঁরা সেজদা করে, আল্লাহর উপর ঈমান আনে, কিয়ামতে বিশ্বাস করে, সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎ কাজে বাধা দেয়, নেক কাজে তৎপর হয়—তাঁরাই তো সৎ লোক।"[৫০]

ইহুদী ও খ্রিস্টানদের পারস্পরিক ও পীড়াদায়ক হিংসা-বিদ্বেষ নেস্তোরীয় ও মনোফাইজাইটদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থহীন বিবাদ-বিসম্বাদ, বাইজানটাইন যাজকদের হৃদয়হীন ও হৃদয়-বিদারক তর্কবিতর্ক, প্রায়ই নিম্নরূপ আক্ষেপ নিয়ে আসত ঃ

"যীশু ও অন্যান্য নবীদের নিকট আমরা নিদর্শন প্রকাশ করেছিলাম; আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তবে তারা এই বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যে পড়ত না। কিন্তু আল্লাহ তাদের নিকট হুঁশিয়ারী ও সুসংবাদসহ রাসুল পাঠিয়েছেন, সব বিতর্কের মীমাংসার জন্য। তথাপি যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের মতো কেউই গোলমাল করে না, কারণ তারা পরস্পর ঈর্ষা-বিদ্বেষে জর্জরিত।" "হে আহলে কিতাবি, কেন ইবরাহিম সম্পর্কে তর্ক কর। তোমরা যা জান না সে সম্পর্কে কেন বিবাদ করছ?"

নতুন ধর্মব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল মানবজাতির হৃদয়ে জীবনের সাধারণ সম্পর্কের প্রেক্ষিতে সত্যের জীবন্ত শক্তি জাগিয়ে তোলা। একজন প্রখ্যাত লেখকের ভাষায় "নতুন ধর্মমতের নৈতিক আদর্শ কর্তব্যের সাধারণ ধারণা এবং প্রেমের পরিচিত দৃষ্টান্তসমূহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।" "নিশ্চয়ই এই সব জাতি[৫১] অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন—তাঁরা ছিলেন দূর অতীতের একটি দল —তাঁরা যা করেছেন তার ফল তাঁরাই পাবেন, আর তোমরাও নিজেদের কর্মফলেই ভুগবে। তাঁদের কাজ সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না।[৫২]..."প্রত্যেক মানুষ ভাল ও মন্দ যা করেছে তার জন্য পুরস্কার বা শাস্তি পাবে, আর আল্লাহ কাউকে তার শক্তির অতিরিক্ত বোঝা চাপাবেন না।" "যে নাকি পাকপবিত্র হওয়ার জন্য বিষয় সম্পদ দান করে। আর তার উপরে অন্য কারুর এমন কোনও অনুগ্রহ নেই—যার বিনিময়ে এ কাজ করবে বরং সে তো শুধু নিজের মহামহিম পালনকর্তার সন্তুষ্টিলাভের আশা নিয়েই দান করে।"[৫৩]

"তাঁরাই অনুগৃহীত যাঁরা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে গরীব, মিসকিন, এতীম ও কয়েদীদেরকে খাবার দিয়ে থাকে তাঁরই প্রেমে। আমরা তোমাদেরকে শুধু আল্লাহতায়ালার জন্যই খাবার দিচ্ছি। আমরা এজন্য তোমাদের কাছে মজুরি কিংবা কৃতজ্ঞতা কিছুই পেতে চাইনে।"[৫৪]

"একমাত্র আল্লাহর উপাসনা কর; আত্মীয়-স্বজন, দাসদাসী এতীম ও দীনদরিদ্র জনে দয়া করবে; মানুষের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গতভাবে কথাবার্তা বলবে, নামাজ কায়েম করবে এবং জাকাত দেবে।" "পিতামাতাদেরকে সম্মান করবে; বিনয়াবত চিত্তে প্রার্থনা কর : হে আমার প্রভু, তাদের প্রতি করুনা করো, যেভাবে তাঁরা আমাকে আমার অসহায় অবস্থায় প্রতিপালন করেছেন।" "বিগত দিনের নিষ্ঠুরতা, রক্তের প্রতিহিংসা ও শিশুহত্যা পরিত্যাগ কর এবং এক দেহের মতো একতাবদ্ধ হও।" "দান প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে

www.amarboi.org

যেভাবেই করো না কেন, উভয়ই উত্তম।" "তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে দান করো সেইদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন প্রহরী কোনবন্ধু থাকবে না কিংবা কেউ সুপারিশ করার মতো থাকবে না।" "আপনি কি জানেন, সেই ঘাঁটি কেমন বস্তুঃ বন্দীকে মুক্ত করা, আর ক্ষুধার্ত আত্মীয়-স্বজন, এতীমবালক-বালিকা এবং বিনীত ফকিরদেরকে আহার্য দান করা। তারপরে তাদের দলে শামিল হও যাঁরা ঈমানদার ও সদয় আচরণকারী।"[৫৫] "আফসোস তাদের জন্য যারা দয়া প্রদর্শনের ভান করে এবং অভাবগ্রস্তদেরকে সাহায্য করে।" "ভর্ৎসনা কিংবা ক্ষতিসাধন করে তোমার দানকে নিরর্থক করো না।" ক্ষমাশীলতা ও দয়ার্দ্র বচন বিরক্তির সঙ্গে দান করার চেয়ে উত্তম।" "সুদ পরিত্যাগ কর।" "যে ব্যক্তি অপরকে দেখানোর জন্য তার ধনসম্পদ ব্যয় করে, তার দানের উপমা এমন যে একটি ছোট পাহাড় যার উপর সামান্য মাটি পড়ে আছে যেখানে সামান্য বৃষ্টি হওয়ায় তা শক্ত হয়। কিন্তু যাঁরা আল্লাহকে তুষ্ট করার জন্য এবং নিজেদের আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যয় করে তাদের কাজ পাহাড়ের উপর একটি বাগানের মতো যেখানে বৃষ্টি পড়ায় দ্বিগুণ ফসল উৎপন্ন হয়; আর যদি বৃষ্টিপাত না হয় তবে সেখানে শিশির পড়ে।"

"লোকজনের মধ্যে ন্যায় বিচার অনুসারে মীমাংসা করুন। নিজের খেয়ালখুশি অনুযায়ী কোন কাজ করবেন না, তা আল্লাহর পথ থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে দেবে।"[৫৬] "আল্লাহ অন্যের প্রতি যা দান করেন তাতে লোভ করো না।" "পূর্ব কিংবা পশ্চিমে মুখ ফিরানোর মধ্যে ধর্মনিষ্ঠা নেই, বরং ধর্মনিষ্ঠা নিহিত রয়েছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং সৎ কাজ করায়।" "সকল জিনিসের সদ্ব্যবহার কর; ন্যায় বিচার অনুসরন কর এবং নির্বোধদের অনুসরন করো না; যদি শয়তান তোমাকে অনিষ্টকর কার্যে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা কর। "এতীমের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ কর না।...তোমরা নিজেদের ওয়াদা পূরণ কর এবং মাটির বুকে দর্পের সঙ্গে চলাফেরা কর না।"[৫৭] "কন্যা সন্তানের জন্য মানুষের মুখমণ্ডলে চিন্তার কালো রেখা ফুটিয়ে তোলে।...তোমরা নিজের সন্তান-সন্ততিকে মোটেই হত্যা কর না অভাবের তাড়নায়। আমি তো রুজি দান করি তাদেরকে আর তোমাদেরকেও। তাদেরকে হত্যা করা গুরুতর অপরাধ—একথা সত্য সুনিশ্চিত।"[৫৮] "তিনি তোমাদেরকে স্ত্রী দান করেছেন যাতে তোমরা প্রেম-প্রীতিতে বসবাস করতে পার।"

"গর্ভধারিণী মাতাকে সম্মান কর।" "তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যাবে না। কারণ সেটা তো বড়ই অশ্লীল ও খারাপ পথ।"[৫৯] "বিশ্বাসীদের উচিত তাদের চোখকে হিফাজত করা, আর মহিলাদের উচিত অন্য মহিলা ছাড়া অন্য কোন পুরুষের নিকট অলঙ্কারের প্রদর্শনী না করা।"

"জেনে রাখো যে পার্থিব জীবনে এটি প্রতারণা বিশেষ, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির বৃদ্ধি সেই চারাগাছের মতো যা বৃষ্টির পর বেড়ে উঠে এবং যা দেখে কৃষকের মনে আনন্দ হয়, তারপরে তা হলুদ হয়ে শুকিয়ে যায়। পরকালে হয় আল্লাহর থেকে ভর্ৎসনা ও শাস্তি

www.amarboi.org

কিংবা তাঁর থেকে ক্ষমা ও শাস্তি। দুষ্ট কার্য কিংবা তার অনুরূপ কার্য পরিত্যাগ কর। যাঁরা পাপ অর্জন করেছেন নিশ্চয়ই তারা তার ফল ভোগ করবে।"[৬০] "আর যাঁরা অনাবশ্যক কথাও কাজ এড়িয়ে চলে, আর যাকাত আদায়ের মারফতে পবিত্রতা অর্জনের চেষ্টা করে...আর যারা নিজেদের কাছে গচ্ছিত আমানত ও নিজেদের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে সতর্ক রয়েছে, আর যাঁরা তাদের নামাজ সম্পর্কে যত্নবান, তাঁরাই তো উত্তরাধিকারী হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের।"[৬১] "মা বাবার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাঁদের মধ্যে একজন কিংবা দু'জনই তোমাদের সামনে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন, তাহলে তাঁদের সাথে 'উহ' শব্দটিও বলবে না, তাঁদেরকে মোটেই ধমক দেবে না, আর তাঁদের সাথে অত্যন্ত বিনয় ও আদবের সাথেই কথা বলবে।"[৬২] "আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও। অসহায় মিসকিন, বিদেশী পথিকের হক আদায় করে দাও। অপচয় করে সব উড়িয়ে দিও না।"[৬৩]

"আর নিজের হাত তুমি কাঁধের সাথে গুটিয়ে বেঁধে রেখ না। আবার একেবারে ছড়িয়ে দিও না। পরিণামে যেন তুমি ধিকৃত অবস্থায় বসে থাকতে বাধ্য না হও।"[৬৪] "আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, যেন তারা এমন কথাই বলে যা নাকি খুব ভাল।"[৬৫] "গর্হিত কাজকর্ম ও কথাবার্তার জবাবে উত্তম কথাবার্তা বলুন।"[৬৬] "আমিই তো কিয়ামতের দিন তুলাদণ্ডে সবকিছু সঠিকভাবেই রাখব। কারও উপরে কিছুমাত্র জুলুম করা হবে না। যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয়, তবুও আমি তার হিসাব করব। হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে আমিই যথেষ্ট।"[৬৭] "তোমরা সবাই নিজেদের পালনকর্তার দরবারে তওবা কর। তারপরে তোমরা সবাই তাঁর মহান দরবারে রুজু হও। একথা সত্য সুনিশ্চিত যে আমার পালনকর্তা বড়ই দয়াময়, প্রেমময়।"[৬৮] তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করেছেন : তোমরা সবাই আমাকে ডাকো—আমি তোমাদের আবেদন মঞ্জুর করব।"[৬৯] "আপনি বলে দিন—হে আমার বান্দাগণ! তোমরা শোন! তোমরা যারা নিজেদের উপরে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছ—আল্লাহর রহমত অনুগ্রহ থেকে তোমরা নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব গোনাহ্ সম্পূর্ণরূপে মাফ করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।"[৭০] "পাকপবিত্র বাণী ও নেক রুজী তাঁরই দরবারে উপনীত হয়—সেখানে তাকে তুলে নিয়ে যায়।"[৭১]

"আমার পালনকর্তা অশ্লীল কাজকর্ম হারাম করেছেন—চাই তা প্রকাশ্য হোক কিংবা গোপন হোক, গোনাহের কাজ এবং অকারণ বাড়াবাড়ি।"[৭২]

"তোমরা সবাই নিজেদের পালনকর্তাকে বিনয়ের সাথেও চুপিসারে ডাকতে থাক। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না। তোমরা দুনিয়ার বুকে ফিৎনা ফ্যাসাদ মোটেই সৃষ্টি কর না—তাতে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করার পরে, তোমরা তাঁকে ভয় কর এবং আশা নিয়ে ডাকতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহর রহমত নেক্কার লোকদের কাছাকাছি রয়েছে।"[৭৩] "মানুষকে আমি আদেশ দিয়েছি যেন নিজেদের মা-বাবার সাথে অত্যন্ত ভদ্র ব্যবহার করে। তার মা তাকে বড় কষ্ট ক্লেশের সাথে পেটে ধারণ করেছে, আর বড় নিদারুণ যন্ত্রণার সাথেই তাকে প্রসব করেছে। তার এই পেটে

www.amarboi.org

ধারণ করা এবং দুধ ছাড়ান—ত্রিশ মাসে সম্পন্ন হয়েছে। এমন কি সে যৌবনে উপনীত হয়, তারপরে যখন বয়স চল্লিশ বছর হয় তখন বলে : হে পালনকর্তা আমার, আপনি আমাকে চিরদিন এভাবে রাখুন—যেন আমাকে আর আমার মা-বাবাকে আপনার দেওয়া নিয়ামতের জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আর আমি যেন নেক কাজ করতে পারি—যাতে আপনি খুশি হবেন। আর আমার সন্তানদেরকেও আমার জন্য সামর্থ্যবান করুন। আমি আপনার দরবারে তওবা করছি এবং আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করছি।"[৭৪] "তাঁদের জন্যই শান্তিপূর্ণ বাসগৃহ রয়েছে তাঁদেরই পালনকর্তার দরবারে। আসলে তাদের কাজকর্মে তিনিই তাঁদের সহযোগী।"[৭৫] "নির্বোধের মতোই যারা নিজেদের সন্তানগুলোকে হত্যা করেছে কিছুই না জেনে, আর আল্লাহ্ যে রুজী দান করেছেন তা যারা নিষিদ্ধ করে আল্লাহর উপর মিথ্যা চাপিয়ে যাচ্ছে তারা তো নিশ্চিত পথভ্রান্ত, আর তারা সত্য সনাতন পথে অনুগামীও নয়।"[৭৬]

"যাঁরা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের ধনসম্পত্তি খরচ করে—তা যেন একটি বীজ—যা থেকে সাতটি শীষ জন্মাল, আর প্রত্যেক শীষে একশ' করে দানা; আল্লাহ্ যাকে খুশি খুব বেশি বাড়িয়ে দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ বিরাট ব্যাপ্তির অধিকারী ও সর্বজ্ঞ। যাঁরা নিজেদের ধনসম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে, আর যা খরচ করেছে—পরে তা লোকের কাছে বলে বেড়ায় না, কিংবা পীড়া দেয় না। তাঁদের ন্যায্য পারিশ্রমিক তাঁদেরই পালনকর্তার কাছে রয়েছে। তাঁদের কোনও ভয় নেই, তাঁরা শোকার্ত হবে না। ন্যায্য কথা আর ক্ষমা—তেমন ছদকা খয়রাতের চেয়ে অনেক ভাল—যা নিয়ে পরে কষ্ট দেওয়া হয়।"[৭৭]

"আল্লাহ্ কাউকে সাধ্যশক্তির বেশি দায়িত্ব ন্যস্ত করেননি। যে যা অর্জন করেছে তারই ছওয়াব সে পাবে। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা যদি ভুলে গিয়ে থাকি, আমরা যদি ত্রুটি করে থাকি—সেজন্য আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! এমন ভারী কাজের হুকুম দেবেন না—যেমন আমাদের আগেকার লোকদের সাথে করা হয়েছিল। আমাদের উপরে এমন কোনও বোঝা চাপাবেন না, যা সামলানোর শক্তি আমাদের নেই। আমাদেরকে মাফ করুন, আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দয়া করুন।"[৭৮] "যাঁরা ধৈর্যশীল, সত্যসাধক, আদেশ পালনকারী, নেক কাজে খরচকারী, আর শেষ রাতে গোনাহ্ মাফ করিয়ে নেয়।"[৭৯]...যাঁরা দান করে সমৃদ্ধি ও সাফল্যের সময়ে এবং যাঁরা তাদের ক্রোধ সংবরণ করে এবং অন্যকে ক্ষমা করে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। [তাঁদের প্রভুর কাছে তাঁদের জন্য রয়েছে শান্তির আবাস][৮০] "হে আমাদের পালনকর্তা। এখন আপনি আমাদের গোনাহ্ মাফ করুন, আমাদের দোষ-ত্রুটি দূর করে দিন, আর নেক লোকদের সাথেই আমাদেরকে মৃত্যু দান করুন।"[৮১] "তারপরে তাঁদেরই পালনকর্তা তাঁদের ফরিয়াদ কবুল করলেন : আমি তোমাদের নারী-পুরুষের মধ্যে কারও কোন কাজ বরবাদ করি না, তোমরা একজন অন্য জনের সন্তান।"[৮২] "আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যাঁর বরাত দিয়ে নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করে থাক। আর নারীদেরকে সম্মান কর।"[৮৩]

"তোমাদের পিতা যাদেরকে বিয়ে করেছেন, তাদেরকে তোমরা বিয়ে কর না—তবে আগে যা হয়েছে সে কথা আলাদা। আসলে এ কাজটি নিশ্চয়ই বড় জঘন্য বেহায়াপনা, মারাত্মক ও বদস্বভাবের ঘৃণ্য পথ।"[৮৪]

www.amarboi.org

"তোমরা এমন কোনও বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা কর না—আল্লাহ্ যে ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে একে অন্যের তুলনায় উৎকর্ষ দান করেছেন।"[৮৫]

"মা-বাবার সাথে ভাল ব্যবহার কর, ঘনিষ্ট আত্মীয়দের সাথে, এতীম মিসকিনদের সাথেও, প্রতিবেশীদের মধ্যে যারা খুব কাছের তাদের সাথে, আর দূরের প্রতিবেশীদের সাথেও, মজলিসের সাথী যারা তাদের সাথেও, আর পর্যটনকারী ও যারা তোমাদের মালিকানা আমলদখলে রেখেছে তাদের সাথেও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ দাম্ভিক, অহঙ্কারী লোকদেরকে পছন্দ করেন না।"[৮৬] যে কেউ নেক কাজের সুপারিশ করবে সেজন্য তাতে তাঁর অংশ রয়েছে। আর যে কেউ খারাপ কাজের জন্য সুপারিশ করবে, সে জন্যেও তার একটা অংশ রয়েছে তাতে। আল্লাহ্ যে সব কিছুরই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী।"[৮৭] "তোমরা যারা ঈমান এনেছ, শোন! তোমরা সবাই ন্যায়বিচারের উপরেই কায়েম থেক আল্লাহতায়ালার তরফ থেকে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে, হোক না তা নিজেদের ব্যাপার কিংবা মা-বাবা অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপার—চাই সে গরীব কিংবা ধনী হোক, তাদের দু'জনার সাথে আল্লাহর যোগ-সম্পর্কই তো সবচেয়ে বেশি। তোমরা নিজেদের খেয়ালখুশির অনুগত হয়ো না, যাতে তোমরা ন্যায়বিচার থেকে দূরে সরে পড়বে।"[৮৮]

বৃহত্তর জগৎ ও অধিকতর অগ্রগতিসম্পন্ন মানবজাতির প্রেমের মহত্ত্ব, সত্য,পরিচ্ছন্নতা এবং পবিত্রতার জন্য প্রয়াস ও আকাঙ্ক্ষা-এ সবের প্রতি সম্বোধিত মরুভূমির মহানবীর শিক্ষা কি ঈসায়ীদেরে হুঁশিয়ারী কিংবা "যীশুর কোমল আবেদনের" পর্যায়ে উন্নীত হয় না?

পৃথিবীর দীনদরিদ্র, এতীম, অনাথ-আতুর জন, হতভাগ্য পিতামাতার স্নেহবঞ্চিত সন্তান তাঁর নির্জন চিন্তার সার্বক্ষণিক বিষয় ছিল। তিনি প্রায়ই ঘোষণা করতেন যে এতীমদেরকে সাহায্য করা, দরিদ্রদেরকে পরিচর্যা করা এবং বন্দীদেরকে মুক্ত করা মানুষকে আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়, শুধু মানুষেরই প্রতি তাঁর অনুকম্পা ও ভালবাসা সীমিত ছিল না, ইতর প্রাণীও তাঁর সহানুভূতি ও কোমল হৃদয়ের অনুভূতির ভাগ পেয়েছিল।

"একদা একজন লোক হযরতের নিকট আসল; তার হাতে একটি পাখির বাসা। সে বলল, "হে রাসুল, আমি বনের মধ্য দিয়ে যাবার সময় পাখির ছানার আওয়াজ শুনতে পেলাম, আমি সেগুলো ধরে আমার চাদরের মধ্যে নিলাম এবং ছানাগুলোর মা আমার মাথার চারপাশ দিয়ে ঘুরতে লাগল ও কিচিরমিচির করতে লাগল।" হযরত বললেন, "তাদেরকে ছেড়ে দাও।" লোকটি যখন ছানাগুলোকে ছেড়ে দিল, তখন মা পাখিটা ছানাগুলোর নিকট গেল। হযরত বললেন, "তোমরা কি ছোট ছানাগুলোর প্রতি পাখির মায়ের ভালবাসা দেখে বিস্মৃত হচ্ছ? যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁর নামেই শপথ করে বলছি : ছোটছানাগুলোর প্রতি মাতা যতটা স্নেহশীল, বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তার চেয়ে অধিক স্নেহশীল। যে জায়গা থেকে তাদেরকে নিয়ে এসেছ সেখানে তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে এসো আর তাদের মাকে তাদের সঙ্গে যেতে দাও।" হযরত বললেন, "ইতর প্রাণী সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় কর, যখন পশু আরোহণের উপযুক্ত তখনই তার উপর আরোহণ করবে, আর যখন তারা ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন আরোহণ করবে না। ভাষাহীন ইতর

www.amarboi.org

প্রাণীর মঙ্গল করার জন্য ও তাদেরকে পানি প্রদানের জন্য নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট থেকে পুরস্কার রয়েছে।"

আল্ কোরআনে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে প্রাণীর জীবন ও মনুষ্যজীবন একই ভিত্তির উপর স্থাপিত। কোরআন বলে, "পৃথিবীতে এমন প্রাণী কিংবা ডানার সাহায্যে উড্ডয়নশীল পাখি নেই যা তোমাদের কাছে একটি জাতির সদৃশ—তারা তাদের প্রভুর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে।" খ্রিস্টান জগৎকে মানুষের মনে পশুর প্রতি দায়িত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য শত শত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। খ্রিস্টান জাতিসমূহ পশুর প্রতি কোমলতা ও অনুকম্পা দেখানোর কথা ভাববার বহু পূর্বেই হযরত মুহম্মদ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় মানুষের সেবক ইতর প্রাণীর প্রতি মানুষের কর্তব্যের বিষয় ঘোষণা করেছিলেন। এই স্নেহশীলতা, কোমলতার উপদেশাবলী যা সুবাসিতভাবে ধর্মের মধ্যে স্থান পেয়েছিল তা ইসলাম জাহানে প্রাত্যহিক জীবনের সাধারন কর্তব্য হিসেবে বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়।

পাদটীকা

১. সু. ২ আ. ১— ৬
২. শাহরিস্তানী : টাইলি প্রাক্—ইসলামী আরবদের ধর্মকে "সর্বপ্রাণবাদী বহুদৈতবাদ" বলে অভিহিত করেছেন।
৩. ডলিংজার, 'দি জেন্টাইল এণ্ড দি জিউ' ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৮।
৪. জোসফাস, 'এন্টিকুইটিস' ১৭শ অধ্যায় ২৪। বলতে গেলে তারা ইহুদীদের ব্রাহ্মণ ছিলেন।
৫. এজরা ৭.১০।
৬. জাজেস ১৮.১৪।
৭. আবু মুঘিস ইবনে মনসুর, আল্ হাল্লাজ যৌবনকালেই মারা যান। তিনি ছিলেন নির্ভেজাল নৈতিকতা ও চরম সরলতার অনুশীলনকারী, দীনজনের বন্ধু, কিন্তু স্বপ্নবিলাসী ও অত্যুৎসাহী। 'বাব' ও বাববাদের জন্য গোবিনিউকৃত 'লা রিলিজিয়ান এটলা ফিরোসফিস ডান্স ল' 'এশিয়া সেন্ট্রাল' এবং প্রফেসর ই. জি. ব্রাউনকৃত 'দি হিস্ট্রী অব দি বাব' গ্রন্থ দুখানা দেখুন।
৮. তখনকার খ্রিস্টানদের মধ্যে পিতার ধারণা এমন বিকৃত হয়ে পড়েছিল যে ইসলামে খোদা সম্পর্কে 'পিতা' শব্দটির প্রয়োগ বর্জিত হয়।
৯. ইসাউরিয়ান নৃপতিগণ পরোক্ষভাবে ইসলামের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক শতাব্দীর অধিক কাল খ্রিস্টধর্মের ক্রম অধঃগতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, সর্বশক্তি নিয়োগ করে মহান শিক্ষক যে-পথ প্রদর্শন করেছিল সেই পথে তাকে পরিচালিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তাতে কোন লাভ হইনি।
১০. মোশেইম, ১মখণ্ড, পৃ. ৪৩২।
১১. মোশেইমের 'একলেসিয়াসটিক্যাল হিস্ট্রী' ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩২। তুঃ হাল্লামের 'কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রী অব ইংল্যান্ড' ২য় অধ্যায়, পৃ. ৭৫। এই গ্রন্থ থেকে দেখা যাবে যে ইসলামের 'যা কিছু ভাল' সবই ইহুদীধর্ম বা খ্রিস্টধর্ম থেকে গৃহীত—এই উক্তি কতখানি সত্য। ডিউটশ বলেন, "মুহম্মদের ধর্মের মধ্যে যা কিছু ভাল তা খ্রিষ্টধর্মের প্রতি

www.amarboi.org

আরোপ করার একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা আশংকা করি যে সৎ গবেষণার ফলাফলের সঙ্গে এই মতবাদের কোন মিল নেই। কারণ মুহম্মদের সময়ে আরবের খ্রিস্টধর্মের কথা যত কম বলা যায়। সম্ভবত ততই উত্তম...এর পাশাপাশি এমন কি আধুনিক আমহারিক খ্রিস্টধর্ম যার সম্পর্কে বিস্ময়কর বিবরণ আমরা রাখি তা বিশুদ্ধ ও সমুন্নত বলে প্রতীয়মান হয়।"—কোয়ার্টারলী রিভিউ, নং ৯৫৪, পৃ. ৩১৫।

১২. সু. ২ আ. ১৬০—১৬৫।
১৩. সু. ১৩ আ. ১২—১৪।
১৪. সু. ১৬ আ. ৩—২০।
১৫. সু. ২ আ. ২৫৫।
১৬. সু. ৭ আ. ৫৪।
১৭. সু. ১১২ এবং সু. ১।
১৮. সু. ১১৩।
১৯. সু. ৬ আ. ৫৯—৬০।
২০. সু. ৬ আ. ৯৬—৯৭।
২১. সু. ৬ আ. ১০৩—১০৪।
২২. সু. ৬ আ. ১৬৩।
২৩. সু. ৭ আ. ১৫৮।
২৪. সু.
২৫. সু. ৬৭ আ. ২৩—২৪।
২৬. সু. ২৩ আ. ৯৪।
২৭. সু. ২৫ আ. ৪৭।
২৮. সু. ২৭ আ. ৬২।
২৯. সু. ৪০ আ. ১—২।
৩০. সু. ২ আ. ২৮৬।
৩১. সু. ১৩ আ. ১০।
৩২. সু. ২৪ আ. ৩৫—৪৪।
৩৩. সু. ৫৫ আ. ৫—২৯, ৭৮।
৩৪. সু. ১৭ আ. ১৩।
৩৫. সু. ৯১ আ. ৭—১০।
৩৬. সু. ৬৭ আ. ৩—৪।
৩৭. সু. ৩০ আ. ২৪—২৫।
৩৮. সু. ৮১ আ. ১—১৪।
৩৯. সু. ৯৩।
৪০. সু. ২৩ আ. ১১৫, ১১৮।
৪১. সু. ৩ আ. ১২৪; সু. ২৫ আ. ৫০; সু. ২০ আ. ৭৪; সু. ৪২ আ. ৩ ইত্যাদি।
৪২. সু. ৪ আ. ৪৪।
৪৩. সু. ৯ আ. ৩০—৩২।
৪৪. সু. ৫ আ. ১৮।
৪৫. ইহুদী, খ্রিস্টান ও জরথুস্ত্রবাদী।
৪৬. সু. ৫ আ. ১০৫, ১০৬।
৪৭. সু. ৪ আ. ১৭১, ১৭২।
৪৮. সু. ৩ আ. ৭৯।

www.amarboi.org

৪৯. সু. ১৯ আ. ৮৮—৯৩।
৫০. সু. ৩ আ. ১১৩—১১৪।
৫১. ইবরাহিম, ইসমাইল ও ইসাহক এবং তাদের গোত্রসমূহ।
৫২. সু. ২ আ. ১৩৪।
৫৩. সু. ৯২ আ. ১৮—২০।
৫৪. সু. ৭৬।
৫৫. সু. ৯০ আ. ১২—১৭।
৫৬. সু. ৩৮ আ. ২৬।
৫৭. সু. ১৭ আ. ৩৪, ৩৬, ৩৭।
৫৮. সু. ১৭ আ. ৩১।
৫৯. সু. ১৭ আ. ৩২।
৬০. সু. ৬ আ. ১২১।
৬১. সু. ২৩ আ. ৩—১১।
৬২. সু. ১৭ আ. ২৩।
৬৩. সু. ১৭ আ. ২৬।
৬৪. সু. ১৭ আ. ২৯।
৬৫. সু. ১৭. আ. ৫৩।
৬৬. সু. ২৩ আ. ৯৬।
৬৭. সু. ২১ আ. ৪৭।
৬৮. সু. ১১ আ. ৯১।
৬৯. সু. ৪০. আ. ৬০।
৭০. সু. ৩৯. আ. ৫৩।
৭১. সু. ৩৫ আ. ১০।
৭২. সু. ৭ আ. ৩৩।
৭৩. সু. আ. ৫৫—৫৬।
৭৪. সু. ৪৬ আ. ১৫।
৭৫. সু. ৬ আ. ১২৮।
৭৬. সু. ৬ আ. ১৪১।
৭৭. সু. ২ আ. ২৬১—২৬৩।
৭৮. সু. ২ আ. ২৮৬।
৭৯. সু. ৩ আ. ১৬।
৮০. সু. ৩ আ. ১২৮।
৮১. সু. ৩ আ. ১৯৩।
৮২. সু. ৩ আ. ১৯৫।
৮৩. সু. ৪ আ. ১।
৮৪. সু. ৪ আ. ২২।
৮৫. সু. ৪ আ. ৩২।
৮৬. সু. ৪ আ. ৩৬।
৮৭. সু. ৮ আ. ৮৫।
৮৮. সু. ৪ আ. ১৩৫।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামের ধর্মীয় মর্মবাণী

"আপনি জিজ্ঞাসা করুন : গগনমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সে সব কার জন্য। আপনি ঘোষণা করুন আল্লাহ্‌তায়ালার জন্য। তিনি নিজেই তো রহমতের দায়িত্ব গ্রহন করেছেন।...(৬-১২)

"আপনি বলুন : এস তোমরা! আমি পড়ে শোনাচ্ছি যা তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন, যেন তোমরা তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। মা-বাবার সঙ্গে তোমরা অবশ্যই ভাল আচরণ করবে। অভাব-অনটনের আশঙ্কায় নিজেদের সন্তানসন্ততিকে হত্যা কর না। কারণ, আমি তো তোমাদেরকে রুজি দান করে থাকি, আর তাদেরকেও। তোমরা প্রকাশ্য কিংবা গোপন অশ্লীলতার কাছে যাবে না। তোমরা এমন কাউকে হত্যা কর না, আল্লাহ্ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তবে ন্যায় বিচারের কথা আলাদা...তোমরা এতীম অনাথদের সম্পত্তির কাছেও যাবে না। তবে কিনা সুন্দর মনোজ্ঞ পন্থার কথা আলাদা।...যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায়বিচার কায়েম রাখবে হোক না সে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আল্লাহর সাথে যে প্রতিজ্ঞা রয়েছে তা পূরণ কর। তোমাদেরকে এসব ব্যাপারে তাকীদ করছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার। আর এই তো হচ্ছে আমার পথ যা সহজ সরল, সুতরাং তোমরা তা-ই অনুসরণ কর।" (৬-১৫২-১৫৪)

প্রকৃত ধর্মীয় মর্মবাণীর সংরক্ষণের জন্য মুহম্মদ তদীয় নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে কতিপয় বাস্তব দায়িত্ব সংযুক্ত করেছেন তাদের মধ্যে (১) নামাজ, (২) রোজা, (৩) জাকাত ও (৪) হজ।

মানুষের এক সার্বভৌম সর্বব্যাপী শক্তির চেতনা, প্রকৃতির চিরন্তন বিরোধিতায় তার অসহায়তা, দানের অনুভূতি—সব মিলে সেই চিরজাগ্রত ও পরমকরুণাময় একের প্রতি তার হৃদয়প্লাবী কৃতজ্ঞতা ও প্রেমের, অনুতাপ ও অনুনয়ের রসধারা প্রবাহিত হয়। যে সব রসানুভূতি মানবহৃদয়ের দু'কূল ছাপিয়ে উঠে প্রার্থনা কেবল তারই প্রকাশ। এসব আবেগ এক উচ্চতর অগ্রগতির ফলশ্রুতি। যদি অনুনয়-বিনয়ে উদ্দেশ্য সাধিত না হয়

www.amarboi.org

তবে আদিম বর্বর লোকে তার মূর্তির সমালোচনার আশ্রয় নেয়। যে সব ধর্মের আঙ্গিক উপাদান রয়েছে সেসব ধর্মের প্রত্যেকটি যে-কোন রূপে প্রার্থনার উপকারিতা স্বীকার করেছে। তবে অধিকাংশ ধর্মে নৈতিকতার পরিবর্তে ঐশী অলৌকিকতার প্রাধান্য আবার কোন কোন ধর্মে নৈতিক ধারণা সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

আদিম হিন্দু-প্রার্থনার মধ্যে দু'ধরনের ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল—আহুতি এবং প্রার্থনাসহ বলি। ধর্মীয় চিন্তার শৈশবে দেবতারা মানুষের মতই প্রবৃত্তি ও আবেশের অধীন বলে অনুমিত হত। সুতরাং মানুষের পার্থিব প্রয়োজনের সময় দেবতাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য ও বলিদানের আবশ্যক হত। 'ঋক্‌বেদে'র প্রাচীন স্তোত্রে প্রায়ই এই ধারণা পাওয়া যায়। ধর্মীয় ধারণার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্ততঃ অধিকতর প্রগতিশীল বা চিন্তাশীল মানুষের মনে সম্ভবত আহুতি ও বলির তাৎপর্য সম্পর্কে অনেক রূপান্তর ঘটেছিল। কিন্তু পুরোহিত শ্রেণী যারা দাবী করত যে এক 'গুহ্য উৎকর্ষ' একমাত্র রক্তের মধ্য দিয়ে সংক্রমণযোগ্য, তাদের প্রভাব জনসাধারণের মনের উপর এত অধিক শক্তিশালী হয়েছিল যে ব্রাহ্মণ্যবাদ আক্ষরিকভাবে একটি যাগযজ্ঞসম্পন্ন ধর্মমতে পরিণতি লাভ করেছিল। কঠিন ও অপরিবর্তনীয় সূত্র অনুযায়ী একমাত্র পুরোহিত এই যজ্ঞ পরিচালনা করতে পারত; তিনি 'মন্ত্র' আবৃত্তি করতেন এবং ধর্মীয় অনুভূতি বা উন্মাদনা ছাড়াই যন্ত্রের মতো আচারাদি পালন করতেন, আর যার জন্য পূজা করা হত সে নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে নিরীক্ষণ করত। সামান্যতম ভুলভ্রান্তি পূজার সব উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে দিত। তবে ভক্তিমূলক ভাব সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত ছিল না; থাকলে ভগবতগীতা'র মতো ধর্মগ্রন্থ রচিত হতে পারত না। কিন্তু সমগ্র জনসাধারণের জন্য উপাসনা পরিণত হয়েছিল এক বিশাল যাগযজ্ঞে, যার মূল্য নির্ভরশীল ছিল যতটা পরিচালক পুরোহিতের বিশেষণের উপর ততটা পূজাদাতা ব্যক্তির নৈতিক আচরণের উপর নয়। পুরোহিত শুধু আচারবিধির উপকারিতায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং পূজা উদযাপনের সময় নিয়মানুগ বিশুদ্ধতার দিকে খেয়াল রাখতেন।

মাজো-জরথুস্ত্রবাদী ও সেরিয়ানগণ প্রার্থনার পরিবেশের মধ্যে বাস করতেন। জরথুস্ত্রবাদীরা নাক পরিষ্কার করার সময়ে, নখ কিংবা চুল কাটার সময়ে, দিন ও রাতের আহার্য প্রস্তুত করার সময়ে, প্রদীপ জ্বালাবার সময়ে প্রার্থনা করতেন। প্রথমে ওরমুজদের, পরে স্বর্গমর্ত্য, প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়, তারকা, বৃক্ষ, সোমা বৃক্ষ[১] এবং প্রাণিসমূহের পূজা অনুষ্ঠিত হত। এই সূত্রগুলো বারোশ' বার[২] আবৃত্তি করতে হত। নৈতিক ধারণা খুব কম লোকের মধ্যেই উপস্থিত ছিল; আর তা জনসাধারণের মন থেকে নিখুঁতভাবে মুছে ফেলা হয়েছিল। অসাধারণ মানসিক শক্তিসম্পন্ন লোকেরা যে ধরনের আধ্যাত্মিক জীবন উপভোগ করত তাও ধর্মের বিধায়কদের একচেটিয়া ছিল। বিশেষ পবিত্রতার সীমারেখা পুরোহিত শ্রেণীকে সাধারণ লোক থেকে পৃথক করেছিল, আর সাধারণ লোকদের জন্য মহৎ ধরনের আধ্যাত্মিক সুখ ভোগের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। অরফিসিদের মতো মাজীদের মধ্যে দু'রকমের উপাসনা প্রচলিত ছিল, বরং উপাস্য বস্তু সম্পর্কে দু'ধরনের

www.amarboi.org

বোধ ছিল : এক হল গোপন বোধ যা বিশেষভাবে পুরোহিত শ্রেণীর জন্য সংরক্ষিত ছিল, আর অন্যটি হল প্রকাশ্য বোধ যাতে একমাত্র সাধারন জনগণ অংশ গ্রহণ করতে পারত।[৩]

প্রার্থনা সম্পর্কে মূসার কানুনের কোন বিধান ছিল না। পুরোহিতদেরকে উৎপন্ন শস্যের দশভাগ প্রদান এবং পশুশাবক উপহার দেওয়ার পারিবারিক পবিত্রতার উপর প্রার্থনা ও স্বীকৃতি সম্পর্কিত নির্ধারিত সূত্র ছিল, যখন পরিবারের পিতা আনুগত্যের সঙ্গে আইনের নির্দেশ পালন করার বলে ইসরাইলদের জন্য জিহোভার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করতেন "যদিও তারা তাদের পিতার নিকটই শপথ নিতেন।"[৪] কিন্তু জনগণ ও ধর্মগুরুদের মধ্যে উপাস্য সম্পর্কে আধ্যাত্মিক ধারণার অগ্রগতি ও আপোষহীনভাবে প্রাকৃতিক বস্তুতে ঈশ্বরত্ব আরোপ মতবাদের অবনতিতে আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে উপাসনার প্রকৃতি অনুভূত হতে শুরু হল। আইনের সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতিতে ডলিঞ্জার বলেন যে, ঐতিহ্য ও প্রথাই শেষ পর্যন্ত ইহুদীদেরকে উপাসনার জাতিতে রূপান্তরিত করেছিল।[৫] প্রত্যহ তিন ঘণ্টা কাল ন'টা, বারোটা ও তিনটায় প্রার্থনার জন্য ব্যয়িত হত। যা'হোক, আইন নির্দেশকের নিকট থেকে কোনরূপ সদর্থক পূর্ব-দৃষ্টান্তের অনুপস্থিতিতে পুরোহিতদের পরিচালনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রার্থনাকে যান্ত্রিক করে তুলেছিল। যীশুর সময়ে ধর্মীয় কবজ বাঁধবার রীতি প্রচলিত ছিল, কোরআনে ইহুদীদেরকে তীব্র ভাষায় "খোদার প্রতীক বিক্রয়ের জন্য" নিন্দা করেছে।[৬]

যীশুর শিক্ষা মানুষের ধর্মীয় উপলব্ধির বিকাশের এক পরবর্তী পর্যায়ের প্রতিবেদন করেছিল, উপাসনার যথার্থ প্রকৃতি স্বীকার করেছিল। তিনি নিজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে প্রার্থনার অনুশীলন পবিত্র করেছিলেন।[৭] ধর্মগুরুর উপলব্ধির অনুসরণে প্রাথমিক পর্যায়ের শিষ্যগণ ধর্মনিষ্ঠা ও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অভ্যাসের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।[৮] কিন্তু জনসাধারণকে পরিচালনা করার জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়মের অনুপস্থিতি এবং উপাসনার সংখ্যা, স্থায়িত্ব ও নামকরণের ব্যাপারে পুরোহিতদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব কালক্রমে ধর্মনিষ্ঠার অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাদেরকে নিষ্কর্মা করে তুলেছিল। সুতরাং ধর্মের বিধান ও বিবেকের ব্যাপারসমূহ মীমাংসার জন্য উপাসনা-গ্রন্থ প্রণয়ন, আচার-অনুষ্ঠান নির্ধারণ, পরামর্শসভা ও জনসভা আহ্বানের প্রয়োজন হয়ে পড়ত; আর সে কারণেই দেখা দিয়েছিল পরভোজী সন্ন্যাসীদের যান্ত্রিক উপাসনা এবং সপ্তাহের ছ'দিনের আধ্যাত্মিক পরিপোষণের অভাব মিটাতে সপ্তাহে একদিন গির্জা ও ভজনালয়ে জনগণের ভিড় হত; অধিকন্তু সে কারণেই 'গির্জার উপাচার্য' যিনি প্রথমে ছিলেন শুধু জনগণের 'খাদেম'[৯] তিনিই যীশু কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রধান ব্যক্তিত্ব' হিসেবে বিবেচিত হতে থাকেন।

সপ্তম শতাব্দীতে এসব অনাচার ও অনিষ্ট এমন এক পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছিল যখন আরবের নবী এক সংশোধিত ধর্ম প্রচার শুরু করেছিলেন। উপাসনার প্রতিষ্ঠায়

www.amarboi.org

মুহম্মদ আল্লাহর প্রতি মনুষ্য হৃদয়ের প্রেম ও কৃতজ্ঞতা উজাড় করে দেয়ার বাসনাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, আর প্রার্থনার সময়সূচী নির্ধারণ করে উপাসনার ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতাকে জোরদার করেছিলেন যার ফলে চিন্তা পার্থিব জগতে বিচরণের সুযোগ থেকে মুক্তি পায়।[১০] ইসলামজাহানকে আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিযোগিতার অনিষ্ট থেকে মুক্ত করার সময়ে সূত্রাবলী নিজের দৃষ্টান্ত ও অনুশীলনের দ্বারা পবিত্র করেন এবং উপাসককের ব্যক্তিগতভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সমক্ষে সবচেয়ে হৃদয়-নিংড়ানো নিষ্ঠা ও বিনয় প্রকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান করেন।

নৈতিক সমুন্নতি ও হৃদয়ের বিশুদ্ধিকরণের উপায় হিসেবে উপাসনার মূল্য কোরআন মজীদে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে :

"আপনি পড়তে থাকুন—কিতাবের যে অংশ আপনার কাছে নাজিল করা হয়েছে। আর নামাজ কায়েম রাখুন। নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীল ও গর্হিত কাজকর্ম থেকে ফিরিয়ে রাখে। আর আল্লাহতায়ালার জিকিরই তো সবার সেরা।"[১১]

অনুনয়সূচক আয়াতসমূহের রূপ হযরতের দৃষ্টান্তের সাহায্যে পূতপবিত্র হয়ে ইসলামের শিক্ষায় নৈতিক উপাদানের সৌন্দর্য প্রদর্শন করেছে :

"হে প্রভু, আমি তোমার নিকট মিনতি করছি যে তুমি আমাকে ধর্মের পথে দৃঢ় থাকতে ও ন্যায়পরায়ণতার পথে চলতে, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে এবং প্রতিটি উত্তম পথে তোমার আরাধনা করতে সাহায্য কর; আমি তোমার নিকট নিষ্পাপ হৃদয়ের জন্য মিনতি করছি যে হৃদয় দুষ্টপথের দিকে ধাবিত না হয়। আমি তোমার নিকট সত্যবাদী হওয়ার জন্য এবং যে সদৃগুণ তুমি জান তা লাভ করার জন্য মিনতি করছি; আর প্রার্থনা করছি যে তুমি তোমার জ্ঞাত বদগুণ থেকে আমাকে রক্ষা কর এবং যে ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে তুমি ওয়াকিবহাল তা থেকে আমাকে ক্ষমা কর। হে আমার রক্ষাকারী, তোমাকে স্মরণ করতে, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে, আমার শক্তির আতিশয্য নিয়ে তোমার আরাধনা করতে তুমি আমাকে সাহায্য কর। হে আমার প্রতিপালক, আমি আমার উপর জুলুম করেছি, তুমি ছাড়া তোমার বান্দার বিচ্যুতি ক্ষমা করার কেউ নেই; তুমি তোমার প্রেম ও করুণার বলে আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর দয়া কর; নিশ্চয়ই তুমি ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষমাকারী এবং তোমার বান্দার উপর করুণাবর্ষণকারী।"[১২]

অন্য ঐতিহ্যবাহী প্রার্থনা যা দাউদের প্রার্থনা বলে অভিহিত তা নিম্নরূপ : হে আমার প্রভু আমাকে তোমার প্রেম দাও; আমি তোমাকে ভালবাসতে পারি আমাকে সেই শক্তিদান কর; আর তুমি আমাকে এমন কাজ করবার শক্তি দাও যার বলে আমি তোমার ভালবাসা লাভ করতে পারে এবং নিজ পরিবার কিংবা ধনসম্পদ থেকে তোমার ভালবাসাকে আমার কাছে প্রিয়তর করে তুলতে পারে।"[১৩]

খলিফা আলী (রাঃ)-র নিম্নোক্ত দু'টি মোনাজাত উচ্চতম ধর্মনিষ্ঠার নির্দেশক।

"আমার প্রভুর প্রতি যাবতীয় কৃতজ্ঞতা; তিনিই একমাত্র উপাসনার যোগ্য ও একমাত্র উপাস্য। আমার প্রভু শাশ্বত, নিত্য, প্রতিপালক, প্রকৃত অধিপতি যাঁর করুণা ও

www.amarboi.org

শক্তি সমগ্র বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে আছে; তিনি জগতের নিয়ন্তা, সৃষ্টির আলো। তাঁর জন্যই সব উপাসনা, তাঁর সমীপেই সব আরাধনা; তিনি সবকিছু সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন এবং সবকিছু ধ্বংসে হয়ে যাওয়ার পরও তিনি থাকবেন। হে আমার প্রতিপালক, তুমিই একমাত্র উপাস্য; তুমিই প্রেমময় ও ক্ষমাশীল প্রভু; তুমি যাকে খুশি তাকে ক্ষমতা দান কর; আর তুমি যাকে অবনমিত কর তাকে উন্নীত করার কেউ নেই। হে আমার প্রভু, তুমি শাশ্বত, সবকিছুর স্রষ্টা, সর্বজ্ঞাতা, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী; তুমি সবকিছু জানো, তোমার করুণা সর্বব্যাপী; তোমার ক্ষমাশীলতা ও দয়া সর্বব্যাপী। হে আমার প্রভু, তুমি নির্যাতিতের সাহায্যকারী, সব মুশকিলের আসানদাতা, ভগ্নহৃদয় ব্যক্তির সান্ত্বনাদাতা; তুমি তোমার বান্দাদের সাহায্য করার জন্য সর্বত্রবিরাজমান। তুমি সব গুপ্ত বিষয় অবগত আছ, সকল চিন্তার বিষয় জানো, সব সমাবেশে উপস্থিত থাক। তুমি আমাদের অভাব মোচনকারী, সব কিছুর প্রদাতা। তুমি দীনদরিদ্র ও অনাথ-আতুরের বন্ধু; হে আমার প্রভু, তুমি আমার আশ্রয় দুর্গ, তোমার আশ্রয় প্রার্থীদের তুমি আশ্রয়দাতা। তুমি দুর্বলের নির্ভরস্থল; পবিত্র আত্মা ও সত্যবাদীদের সাহায্যকারী। হে আমার প্রতিপালক, তুমি আমার অবলম্বন, আমার সাহায্যকারী; যারা তোমার সাহায্য চায় তুমি তাদের সহায়ক...হে আমার প্রভু, তুমি আমার সৃষ্টা, আমি তোমার সৃষ্ট; তুমি আমার রাজন, আমি তোমার ভৃত্য; তুমি আমার সাহায্যদাতা, আমি তোমার ভিক্ষাপ্রার্থী। হে আমার প্রভু, তুমি আমার আশ্রয়দাতা; তুমি আমার ক্ষমাকারী, আমি পাপী, গোনাহগার। হে আমার প্রভু, তুমি চিরদয়াল, সর্বজ্ঞাতা, মহাপ্রেমিক; আমি অন্ধকারে পথ হাতড়াচ্ছি, আমি তোমার কাছ থেকে জ্ঞান ও প্রেম কামনা করছি। হে আমার প্রভু, তোমার সব জ্ঞান, সব প্রেম, সব করুণা আমার উপর বর্ষণ কর; হে আমার প্রভু, আমার পাপ মাফ কারো, আর তোমার আশ্রয় নিতে দিন।"

"হে আমার প্রভু, তুমি চির-প্রশংসিত, চিরন্তন, তুমি চিরবিরাজমান, চিরস্থায়ী, চিরসন্নিকটবর্তী, সর্বজ্ঞাতা। তুমি আছ সকল হৃদয়ে, সকল আত্মায়, তুমি সর্বব্যাপ্ত; তোমার জ্ঞান সকলের মনে বীজকণা রূপে বিরাজিত।" "তাঁর সদৃশ কিছু নেই, তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই, তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তিনি চিরন্তন; প্রশংসা সেই প্রতিপালকের প্রতি যাঁর করুণা প্রত্যেক পাপীর প্রতিও সম্প্রসারিত, তিনি তাকেও প্রতিপালন করেন যে তাঁকে অস্বীকার করে। আদি ও অন্ত তাঁরই এখতিয়ারে, সব জ্ঞান ও হৃদয়ের নিভৃত গোপন কথাও তাঁর এখতিয়ারে। তিনি নিদ্রাহীন, তন্দ্রাহীন, তিনি চিরপরায়ণ, তিনি চিরজাগ্রত। তিনি তাঁর মহান করুণাময় আমাদের মারাত্মক পাপও ক্ষমা করেন—তিনি তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকে ভালবাসেন। আমি আমার প্রতিপালকের সদাশয়তার সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি, তাঁর রাসুলের নবুয়্যতের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছি, তাঁর উপর তাঁর বংশধর ও তাঁর সাহাবাদের উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক।"[১৪]

একজন ইংরেজ গ্রন্থকার বলেছেন, "এটা ইসলামের অন্যতম গৌরব যে এর প্রার্থনাঘর হাত দিয়ে তৈরি নয়, এর অনুষ্ঠানসমূহ আল্লাহর দুনিয়ার যে কোন জায়গায়

www.amarboi.org

আকাশের নিচে অনুষ্ঠিত হতে পারে।"[১৫] প্রত্যেক স্থান যেখানে আল্লাহর আরাধনা অনুষ্ঠিত হয় তা সমভাবে পবিত্র। যখন নামাজের সময় উপস্থিত হয় তখন মুসলমান বাড়িতে থাকুক কিংবা বাড়ির বাইরে থাকুক সংক্ষেপে হলেও সে আন্তরিক অনুনয়সূচক সম্ভাষণের মাধ্যমে তার হৃদয়কে উজাড় করে দেয়; নামাজের দৈর্ঘ্য দ্বারা তার মনোযোগ ক্লান্ত হয় না; সর্বদা তার প্রার্থনার বিষয় আত্মনিবেদন, সব কল্যাণপ্রদাতার মহিমা ঘোষণা ও তাঁর করুণার উপর নির্ভরতা।[১৬] মুহম্মদের ধর্মব্যবস্থায় ধর্মনিষ্ঠা যে তীব্রতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে খ্রিস্টান জগৎ তা আদৌ উপলব্ধি করতে পারেনি। হাদীস যা অতীতের বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক দলিল, তা শত শত প্রমাণকারী সাক্ষ্যসহ লিপিবদ্ধ করেছে। কিভাবে হযরত নামাজের মধ্যে আবেগের উন্মাদনা নিয়ে ক্রন্দন করতেন, কিভাবে তাঁর-মহৎ চাচাত ভাই ও জামাতা নামাজের মধ্যে এত অধিক নিমগ্ন হয়ে যেতেন যে তাঁর দেহ অবশ হয়ে পড়ত।

মুহম্মদ-প্রচারিত ইসলাম ধর্ম পুরোহিতবাদকে স্বীকৃতি দেয় না, মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা বিশেষ সাধুতার কোন একচেটিয়া কর্তৃত্ব অনুমোদন করে না। প্রত্যেক আত্মা তার স্রষ্টার নিকট পুরোহিতের মধ্যস্থতা ছাড়াই উন্নীত হয়। কায়েমী স্বার্থ কর্তৃক উদ্ভাবিত কোন উৎসর্গ, কোন আনুষ্ঠানিকতা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক মানুষ নিজেই তার পুরোহিত,[১৭] মুহম্মদের ইসলাম ধর্মে কোন মানুষই অন্য মানুষের চেয়ে উচ্চ নয়।

ইউরোপীয় যুক্তিবাদীগণ মুসলিম-প্রার্থনার জটিল চরিত্র সম্পর্কে অভিযোগ আনয়ন করেছেন, কিন্তু কোরআনের ধর্মাচরণ পদ্ধতি সরলতা ও মিতচারিতার ব্যাপারে বিস্ময়কর। এরমধ্যে ধর্মের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী, কলেমা, আবৃত্তি, নামাজ, জাকাত, রোজা ও হজ অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এতে এসব সম্পাদনার নিয়মাবলী কদাচিৎ নির্ধারিত আছে। "নামাজ কায়েম করুন, দুপুরের নামাজ পড়ুন, আল্লাহর সামনে অবিচল মন নিয়ে দাঁড়ান; আর ধৈর্য ও নামাজ থেকে সাহায্য গ্রহণ করুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন"; কিন্তু নামাজ কিভাবে পালন করতে হবে সে সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। কোরআনে বলা হয়েছে : "যখন তোমরা প্রবাসে থাকবে তখন তোমরা নামাজ সংক্ষিপ্ত করবে এতে কোন অপরাধ নেই যদি তোমরা মনে কর শত্রুরা তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছু শরীক করা ব্যতীত আর সবই তিনি ক্ষমা করে থাকেন।"

যা হোক, হযরত নামাজের যথার্থ অনুশীলনের ক্ষেত্রে কতিপয় নিয়ম ও পদ্ধতি আরোপ করেছিলেন। সেই সঙ্গে নির্ভুলভাবে একথাও নির্দেশিত হয়েছে যে, অন্তর্যামী মানুষের অন্তরের আকুলতার প্রতি নজর দিয়ে থাকেন : "তোমরা যে কোরবানী দাও তার গোশত কিংবা রক্ত আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না, বরং তোমাদের কাছ থেকে পরহেজগারি আল্লাহর দরবারে পৌঁছে থাকে।[১৮] কোরআনে আরও বলা হয়েছে : "পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরালেই তোমাদের ধর্মনিষ্ঠা হবে না, বরং ধর্মনিষ্ঠা হচ্ছে—যদি কেউ আল্লাহ,

www.amarboi.org

কিয়ামতের দিন, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীদের উপরে আস্থাবান হয়। আর তাঁরই প্রেমে আত্মীয়স্বজন, এতীম, মিসকীন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও মুক্তিলাভের জন্য লোকদেরকে টাকা-পয়সা দান করে আর নামাজ কায়েম রাখে, জাকাত আদায় করে, অঙ্গীকার ঠিকমত পালন করে—আর অভাব, রোগ ও যুদ্ধের সময় যারা ধৈর্য ধারণ করে—এরাই তো সেই দল যারা সত্যনিষ্ঠ—আর এরাই তো পরহেজগার।"[১৯]

ঘোষিত হয়েছিল যে, 'হৃদয়ের নিবেদন' ব্যতীত প্রার্থনার কোন মূল্য নেই, আর আল্লাহর বাণী যা বিশ্বমানবের নিকট প্রেরিত হয়েছে, কোন জাতি বিশেষের কাছে নয় তা হৃদয় ও কণ্ঠের সম্পূর্ণ সঙ্গতির মাধ্যমে অধ্যয়ন করা উচিত। খলিফা হযরত আলী বলেছেন যে, বোধ ব্যতীত ভক্তি নিরর্থক ও তা কোন আশিস বর্ষণ করে না।[২০] বিখ্যাত ইমাম আল্‌গাজ্জালী[২১] বলেছেন যে পবিত্র গ্রন্থ[২২] অধ্যয়নের সময় হৃদয় ও বুদ্ধি অবশ্যই একত্রে কাজ করা আবশ্যক; কণ্ঠ শুধু শব্দ উচ্চারণ করে; বুদ্ধি শব্দাবলীর অর্থ উপলব্ধি করে, আর হৃদয় কর্তব্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে সহায়তা করে।[২৩] হযরত বলেছেন, 'মানুষের ভক্তির এক ষষ্ঠমাংশ বা দশমাংশ আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না বরং তার মধ্যে যা সে বোধ ও প্রকৃত নিষ্ঠার মনোভাব নিয়ে নিবেদন করে একমাত্র তাই গৃহীত হয়।"[২৪]

খ্রিস্টানদের মধ্যে দীক্ষা দান, মিশরীয়, ইহুদীয় বা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পৌত্তলিক ধর্মসমূহের পুরোহিতদের বলিদানের মাধ্যমে নৈবেদ্য প্রদান ভক্তিমূলক বা ধর্মীয় অনুশীলনের জন্য প্রারম্ভিক হিসেবে প্রয়োজন হত। এ থেকে দেখা যায় যে বাইরের শুদ্ধিকরণের প্রতি বিশেষ ধরনের পবিত্রতা আরোপিত হত। মুহম্মদ নিজের দৃষ্টান্তে এই প্রাচীন ও হিতকর প্রথাকে পবিত্রতা দান করেন। আল্লাহর আরাধনার ক্ষেত্রে পবিত্রতা অপরিহার্য প্রারম্ভিক হিসেবে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।[২৫] সেই সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন যে বাহ্য বা দৈহিক পবিত্রতা সত্যিকার ভক্তি বুঝায় না। তিনি সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করেছিলেন যে, হৃদয়ের পরিশুদ্ধি ও আত্মনিবেদনের মাধ্যমেই কেবল আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ করা যায়।[২৬]

ইমাম আল্ গাজ্জালী পরিষ্কারভাবে অভিমত প্রকাশ করেছেন যে যারা কেবল বাইরের বিশুদ্ধির জন্য উৎকণ্ঠিত এবং যাদের হৃদয় অহঙ্কার ও কপটতায় পরিপূর্ণ তাদের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে আল্লাহর নবী বলেছেন যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিশুদ্ধকরণ হল হৃদয়কে সর্ববিধ নিন্দনীয় কামনা-বাসনা ও কপটতা থেকে, মনকে সর্ববিধ পাপাচার ও যে সব চিন্তা মানুষকে আল্লাহ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় তা থেকে পরিশুদ্ধ করা। (তুঃ কিতাবুল মুস্তাত্রাফ ১ম অধ্যায়, বিভাগ ১)

ইসলামের জন্মস্থানের স্মৃতিকে মুসলমানদের মনে জাগরূক রাখার জন্য মুহম্মদ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে নামাজের সময় মুসলমানদের উচিত গৌরবময় কেন্দ্র হিসেবে মক্কা অভিমুখে মুখ ফেরানো কেননা মক্কাই দেখেছিল পুনরুজ্জীবিত ধর্মের আলোকের প্রথম ঝলকানি।[২৭] পয়গাম্বরের সত্যিকার সহজাত প্রবৃত্তি নিয়ে তিনি একটি কেন্দ্রীয় স্থান নিরূপণের একত্রীকরণকারী ফলশ্রুতি দেখতে পেয়েছিলেন, যাকে কেন্দ্র করে তাঁর

www.amarboi.org

শিষ্যদের ধর্মীয় অনুভূতি জমায়েত হতে পারে এবং তদনুসারে নির্দেশ দান করেছিলেন যে বিশ্বের সকল মুসলমান কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ পড়বে। "ইহুদীদের নিকট জেরুজালেম যেমন মুসলমানদের নিকট মক্কা তেমনি। শত শত বৎসরব্যাপী অনুসঙ্গের প্রভাব এ বহন করে চলেছে। এ মুসলমানদেরকে তার ধর্মের জন্মস্থানের ও হযরতের শৈশবের স্মৃতির দিকে নীত করে, এ তাকে পুরাতন ধর্ম ও নতুন ধর্মের সংগ্রাম, মূর্তিসমূহের অপসারন ও এক আল্লাহর উপাসনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; সর্বোপরি এ তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়; যে তার মুসলমান ভাইয়েরা একই পবিত্র স্থানের দিকে ফিরে প্রার্থনা করছে, সে বিশ্বাসীদের এক বিরাট দলের একজন, একই বিশ্বাসের দ্বারা একত্রিত, একই আশা দ্বারা অনুপ্রাণিত, একই বিষয়ে প্রতি শ্রদ্ধাশীল, এই স্রষ্টার প্রতি প্রণিপাতকারী। মুহম্মদ যখন ইসলামের ভজনালয়ের পবিত্রতা সংরক্ষিত করেছিলেন তা থেকেই বুঝা গিয়েছিল যে মানুষের ধর্মীয় আবেগের জ্ঞান সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল।[২৮] কিন্তু এই নিয়ম ধর্মনিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য শর্ত নয় একথা পূর্বোক্ত কোরআনের আয়াত থেকেই সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।[২৯]

সকল জাতির মধ্যেই কমবেশি উপবাসের প্রথা প্রচলিত আছে। তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে প্রাচীন বিশ্বে এর সঙ্গে যে ধারণা জড়িত ছিল তা কোন ব্যতিক্রম ব্যতিরেকেই নিবৃত্তির চেয়ে নিগ্রহের। এমন কি ইহুদী ধর্মে আত্ম-ভর্ৎসনা বা আত্মত্যাগ হিসেবে উপবাসের ধারণা পরবর্তীকালের। এসেনসিয়ানরা (পিথাগোরীয়দের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ এবং সেই যোগাযোগের মাধ্যমে দূরপ্রাচ্যের কৃচ্ছ্রতাবাদের সঙ্গে তাদের পরিচয়) ইহুদীদের মধ্যে প্রথম, উপবাসের নীতির মধ্যে এই নৈতিক উপাদান উপলব্ধির ব্যাপারে অন্যান্য ধারণার মতো এই ধারণাও যীশু সম্ভবত তাদের কাছ থেকেই নিয়েছিলেন।

যীশুর দৃষ্টান্ত খ্রিষ্টধর্মের প্রথাকে পবিত্র করেছিল। কিন্তু উপবাস সম্পর্কে খ্রিস্টধর্মের যে ধারণা তা সাধারণভাবে অনুশোচনা বা প্রায়শ্চিত্তের[৩০] এবং আংশিকভাবে পূর্ববর্তী প্রথার।[৩১] অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মতো খ্রিস্টানদের মধ্যেও ইচ্ছাকৃত দৈহিক রিপুদমন প্রায়ই ঘটত কিন্তু সেই সংযম বা রিপুদমনের প্রবণতা ছিল নিশ্চিতভাবে মানসিক ও দৈহিক শক্তির ধ্বংস এবং এক অস্বাভাবিক সন্ন্যাসের লালন। পক্ষান্তরে, ইসলামে উপবাস বা রোজার সঙ্গত লক্ষ্য হল সীমিত ও সুনির্দিষ্টকালের জন্য দিবাভাগে সমুদয় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা থেকে নিবৃত্তি এবং মানুষের মধ্যে পশুশক্তির আতিশয্যকে এক স্বাস্থ্যকর পথে পরিচালনার মাধ্যমে প্রবৃত্তিসমূহের মধ্যে সংযম আনয়ন করা। নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় দৈহিক নিগ্রহ ইসলামে নিরুৎসাহিত, এমন কি নিন্দিত। সক্ষম ও শক্তিশালী লোকদের জন্য দৈহিক সংযম আরোপ করে আত্মিক সংশোধনের উপায় হিসেবে রোজা প্রবর্তিত হয়েছে। দুর্বল, পীড়িত, প্রবাসী, শিক্ষার্থী (যিনি জ্ঞান অন্বেষণের পথে ব্যাপৃত।—জিহাদুল্ আকবার), ধর্মের শত্রুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সৈনিক আর স্বাভাবিক দৈহিক পীড়ার অধীন নারীদের জন্য রোজা অপরিহার্য নয়। যারা স্মরণে

www.amarboi.org

রেখেছেন গ্রীক, রোমক, পারসিক ও ইসলাম পূর্ব আরবের পৌট্টকতার কথা, তাদের ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ও পাপাসক্তির আতিশয্যের কথা তারা এই উপবাস নিয়মের মূল্য অনুধাবন করবেন, আর উপলব্ধি করতে পারবেন যে কি বিস্ময়করভাবে মানুষের পশুপ্রবৃত্তিকে দর্শন করার জন্য বিশেষভাবে অর্ধসভ্য মানবগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে এ নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছে।

আল্ কোরআনে যেভাবে এই নিয়মের জ্ঞানবত্তা সম্পর্কে বলা হয়েছে তা লক্ষ্য করুন : "তোমরা যারা ঈমান এনেছ, শোন! তোমাদের জন্য 'ছিয়াম' (রোজা) ফরজ করা হয়েছে...যেন তোমরা পরহেজগার হতে পার। নির্দিষ্ট কয়েকটি দিন মাত্র। তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ থাকে, কিংবা বিদেশে সফরে থাকে, তবে পরে দিনের সংখ্যা পুরা করতে হবে, যার সঙ্গতি আছে তার জন্য ফিদ্য়া হচ্ছে—একজন গরীবের খোরাকী!...কিন্তু রোজা রাখাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।...আল্লাহ তোমাদের সুবিধাই চান।"[৩২]

আত্মসংযমের এই নিয়ম দিবাভাগে সীমাবদ্ধ; রাত্রিবেলায় প্রার্থনা আরাধনার বিরতির পর মুসলমানেরা পরিমিত পানাহারের ও আইনসঙ্গতভাবে অন্যান্য কাজের দ্বারা সুখভোগের মাধ্যমে দেহমনকে সঞ্জীবিত করতে পারেন। হযরতের মনোভাবের অনুসরণে ফকিরগণ নিশ্চিতভাবে নিয়ম লিপিবদ্ধ করেন যে রোজার সময়ে দৈহিক সংযম যেমন অপরিহার্য, মন থেকে সমুদয় নীচ চিন্তা বর্জন করাও তেমনি অপরিহার্য।[৩৩]

ইসলামের পূর্বে পৃথিবীর কোন ধর্মই ধর্মীয় ব্যবস্থার মধ্যে সরাসরি আইন প্রণয়ন করে জাকাত প্রদান, বিধবাদের রক্ষণাবেক্ষণ, এতীম ও নিঃসম্বলদের লালনকে পবিত্র করেনি।

প্রাথমিক পর্যায়ের খ্রিস্টানদের মধ্যে দানোৎসব ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করত; কাজেই তাদের প্রভাব কেবল অনিয়মিত আকস্মিক হতে পারত। এটা ইতিহাসের বিষয় যে 'দানোৎসব বা প্রেমোৎসব' প্রবর্তনের অল্পকাল পরেই এই অনিয়মিত কারণ তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[৩৪]

ইসলামের বিধান অনুসারে গরীব ও অসহায় প্রতিবেশীদের সাহায্যের জন্য প্রত্যেক মুসলমান তার সম্পদ থেকে এক নির্দিষ্ট পরিমাণ দান করতে বাধ্য। এই পরিমান সাধারণভাবে চল্লিশভাগের এক ভাগ কিংবা সমুদয় বস্তু, অস্থাবর সম্পত্তির মূল্যের ব্যবসায়ের লাভের আড়াই ভাগ। কিন্তু জাকাত তখনি দিতে হবে যখন সম্পদ এক বিশেষ মূল্যের হবে[৩৫] এবং তা সমগ্র এক বছর ধরে ব্যক্তির অধিকারে থাকবে, কৃষিকাজে কিংবা পরিবহনে ব্যবহৃত পশুর জন্য জাকাত দিতে হয়না। এছাড়া, রমজানের শেষে এবং ঈদুল্ ফিতরের দিনে যেদিন মুসলমানদের বাৎসরিক উপবাসের সমাপ্তি, নিজের পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের জন্য, যে মেহমান সারা রমজান মাসে রোজা থেকে ইফতার করে তার জন্য গম, বার্লি, খেজুর, মনক্কা, চাল কিংবা যে কোন শস্য অথবা তার মূল্য ফিতরা হিসেবে দিতে হয়।

www.amarboi.org

মুহম্মদ ও তাঁর অনুসারীদের ঐতিহ্য বা রেওয়াজ অনুযায়ী জাকাত ফিতরা পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি হল ঃ (১) দরিদ্র ও উপজীবিকাহীন, (২) যারা জাকাত আদায় ও বন্টনে সাহায্যে করে, (৩) যে সব দাস স্বাধীনতা পেতে চায় অথচ সেজন্য তার সঙ্গতি নেই, (৪) যে অধমর্ণ তার ঋণ শোধ করতে অক্ষম, (৫) সফরকারী ও আগন্তুক।[৩৬] জাকাতের কথা কোরআনে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে।[৩৭] কিন্তু ইসলামের গৌরব নিহিত রয়েছে, যীশু[৩৮] খ্রিস্টের সুন্দর অনুভূতিকে সুনির্দিষ্ট নিয়মে রূপান্তরিত করায়।

যে বুদ্ধিমত্তা ইসলামে মক্কা ও কাবাগৃহে বার্ষিক হজ্জব্রত পালনের কাল নন্দিত প্রথা প্রবর্তিত করেছিল তা মুহম্মদের ধর্মের মধ্যে গোষ্ঠীগত বিভাগ সত্ত্বেও পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ব ভাব সঞ্চারিত করেছিল। সমগ্র মুসলিম জাহানের দৃষ্টি সেই কেন্দ্রীয় স্থানে নিবদ্ধ হয়ে প্রত্যেকের হৃদয়ে স্বর্গীয় উদ্দীপনা জাগিয়ে রেখেছিল, যা অন্ধতমসার সেই শতাব্দীতে পৃথিবীকে আলোকিত করেছিল। এখানেও প্রত্যাদিষ্ট আইনবেত্তার বুদ্ধিমত্তা আইনের নেতিবাচক অংশ, অধ্যাদেশকে আবশ্যিক করার শর্তাবলীর ক্ষেত্রে চির উজ্জ্বল : (১) বুদ্ধি ও তীক্ষ্ণতার পরিপক্কতা, (২) নিখুঁত স্বাধীনতা, (৩) হজ্জব্রত উদযাপন উপলক্ষে পরিবহন ও আহার্যের খরচ বহনের ক্ষমতা, (৪) তীর্থযাত্রীর অনুপস্থিতিতে যথোপযুক্তভাবে তার পরিবারের ব্যয় সংকুলানের ক্ষমতা, (৫) যাত্রার সম্ভাব্যতা ও বাস্তবতা।[৩৯]

বিভিন্ন ধরনের আহার্যের বৈধ বা অবৈধ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে প্রায়শ ব্রাহ্মণ্যবাদের মতো কড়াকাড়ি খুঁটিনাটি বিধি প্রচলিত থাকায় ইসলামের মহান শিক্ষককে তাঁর শিষ্যদেরকে মাঝে-মাঝে উপদেশ দিতে হয়েছিল যে কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া সব খাদ্যই বৈধ। "আল্লাহ তোমাদেরকে যা কিছু হালাল ও উত্তম রুজী দান করেছেন তাই তোমরা ভক্ষণ কর। আর আল্লাহকে ভয় কর যার উপরে তোমরা ঈমান এনেছ।"[৪০] আল্ কোরআন আরও ঘোষণা করে যে "আমার প্রতি যা কিছু নাজিল করা হয়েছে তার মধ্যে ভক্ষণকারীদের জন্য নিষিদ্ধ দেখি না এছাড়া যা স্বাভাবিকভাবে মরে বা রক্তমোক্ষণে মারা যায়, শূকরের মাংস, কারণ তা ঘৃণ্য এবং যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে জবেহ করা হয়।" এ পঞ্চম সুরাতে বিশদভাবে বলা হয়েছে, এই সুরা মূর্তিপূজক আরবদের বিভিন্ন ধরনের বর্বর ও পৌত্তলিক প্রথার বিরুদ্ধেও বিঘোষিত হয়েছে।" স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ কিংবা রক্তক্ষরণের ফলে মৃত পশু, শূকরের মাংস এবং যা কিছু আল্লাহ ছাড়া অন্য নামে উৎসর্গ করা হয়[৪১], গলা টিপে মারা হয়, আঘাত দিয়ে হত্যা করা হয় কিংবা পড়ে যাওয়ার ফলে মারা যায়। অথবা শিং দিয়ে গুঁতা দেওয়ার ফলে মারা যায়, যেসব পশু হিংস্র প্রাণীর দ্বারা ভক্ষিত হয় যতক্ষণ না তোমরা মৃত্যুর জন্য আঘাত দাও, আর যা সেই পাথরের[৪২] উপর উৎসর্গ করা হয়,—এসব তোমাদের জন্য হারাম। আর নিহত জন্তু নিচয়কে তীরে ছিঁড়ে বাটোয়ারা করা তোমাদের জন্য গর্হিত।[৪৩] তোমাদেরকে যেসব পবিত্রবস্তু দেওয়া হয়েছে তা থেকে তোমরা ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।"[৪৪]

www.amarboi.org

খ্রিস্টান সমাজের অভিশাপ মদ্যপান ও জুয়া, যাবতীয় অমার্জিত ও নীচ স্বভাবের অনিষ্ট এবং সব ধরনের আতিশয্য কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

আরবের নবীর শিক্ষা সহজতর কিংবা মনুষ্য-প্রজ্ঞার অগ্রগতির সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি যে গুটিকয়েক ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন সমাজের বিশেষ স্তরসমূহে প্রধানত নিয়মশৃঙ্খলা ও একানুবর্তিতা সংরক্ষণ ছিল তার উদ্দেশ্য; তবে সেগুলো মোটেই অনমনীয় প্রকৃতির ছিল না। পীড়িত অবস্থায় কিংবা অন্যান্য কারণ উপস্থিত হলে তিনি নিয়ম-লঙ্ঘন অনুমোদন করেছিলেন। কোরানে বলা হয়েছে "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য বিভিন্ন জিনিস সহজ করতে চান, কারণ মানুষকে দুর্বল করেই সৃষ্টি করা হয়েছে।" তিনি যেসব আইন বলবৎ করেছিলেন সেগুলো হয় মদিনার প্রধান প্রশাসক হিসেবে তাঁর নিকটে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব হিসেবে প্রদত্ত হয়েছিল নতুবা সুস্পষ্ট অনিষ্টকর প্রথাকে দূরীভূত করা বা সংশোধন করার জন্য প্রদত্ত হয়েছিল। হযরত-প্রচারিত ইসলামে এমন কোন আচার স্বীকৃত হয়নি যা এক আল্লাহর চিন্তা থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে নিতে পারে; ইসলামে এমন কোন নিয়ম নেই যা অগ্রগতিশীল মানবজাতির বিবেককে শৃঙ্খলিত করতে পারে।

ইসলামের নৈতিক ব্যবস্থা কোরআনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্তভাবে প্রদত্ত হয়েছে : "আপনি বলুন : এস তোমরা। আমি পড়ে শোনাচ্ছি যা তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন যেন তোমরা তাঁর সাথে কাউকে শরীক না কর। মা-বাবার সঙ্গে তোমরা সদ্ব্যবহার অবশ্যই করবে। অভাব অনটনের আশঙ্কায় নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে হত্যা কর না। কারণ, আমি তো তোমাদেরকে রুজি দান করে থাকি, আর তাদেরকেও। তোমরা প্রকাশ্য কিংবা গোপন অশ্লীলতার কাছে যাবে না। তোমরা এমন কাউকে হত্যা কর না, আল্লাহ্ যাকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। তবে ন্যায়বিচারের কথা আলাদা...তোমরা এতীম-অনাথদের সম্পত্তির কাছেও যাবে না। তবে কিনা সুন্দর মনোজ্ঞ পন্থার কথা আলাদা।...যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায়বিচার কায়েম রাখবে হোক না সে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আল্লাহর সাথে যে প্রতিজ্ঞা রয়েছে তা পূরণ কর। তোমাদেরকে এ সব ব্যাপারে তাকীদ করছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ করতে পার। আর এই তো হচ্ছে আমার পথ যা সহজ সরল, সুতরাং তোমরা তাই অনুসরন কর।"[৪৫] পুনরায়, "তারাই অনুগৃহীত যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে আর তাদের প্রভুর প্রতি সানুনয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, যারা নিয়মিত জাকাত প্রদানকরে, যারা তাদের পবিত্রতা রক্ষা করে আর যারা তাদের আমানত ও চুক্তি রক্ষা করে চলে...নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে ন্যায়বিচার করতে ও কল্যাণকর কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, আত্মীয়-স্বজনদের প্রাপ্য অংশ দিতে নির্দেশ করেছেন। আর তিনি তোমাদেরকে পাপ, অন্যায় কাজ ও জুলুম করতে নিষেধ করেছেন।"

একজন খ্রিস্টান লেখকের ভাষায়, "ধর্ম ও জাকাত বাহ্য প্রথা ও সদর্থক অনুষ্ঠানের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়; এই ত্রুটিপূর্ণ পর্যায়ে জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব জাগিয়ে

www.amarboi.org

রাখার জন্য এসব অপরিহার্য।"[৪৬] সেই অনুযায়ী মুহম্মদ তাঁর শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে কতিপয় আচার সংযুক্ত করেছিলেন মানবজাতির সার্বজনীনতার ধারণাকে অধিকতর বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য। যীশু স্বয়ং দুটি প্রথার প্রবর্তন করেছিলেন : দীক্ষা ও পবিত্র নৈশ আহার"।[৪৭] যদি তিনি দীর্ঘজীবী হতেন তবে সম্ভবত তিনি আরও কয়েকটি প্রথা যোগ করতেন। একটি বিষয় সুনিশ্চিত যে তিনি দীর্ঘ জীবন লাভ করতেন তবে তাঁর শিক্ষাকে তিনি আরও সুসংহত করতেন। এই মৌল ত্রুটির জন্য ধর্মের বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা কল্পে যথার্থরূপে পরামর্শ সভা ও সমাবর্তন আহ্বানের মূল কারণ হয়েছে। যখন প্রজ্ঞা ও স্বাধীন চিন্তার ফলে ধর্মের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে সামান্য উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। যীশুর কর্মসূচি অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল। অপর একজন শিক্ষাগুরুর জন্য নৈতিকতার নিয়মাবলী প্রণালীবদ্ধ করার কাজ সংরক্ষিত ছিল।

আমাদের স্রষ্টার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিবেকের ব্যাপার; কিন্তু আমাদের সহকর্মীদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অবশ্যই সদর্থক নিয়মের ব্যাপার। আর আইনের ভাষায় বলা যায় মানুষের পারস্পরিক কর্তব্য বলবৎকরণের জন্য ধর্মের চেয়ে উচ্চতর নিয়ন্ত্রণ আর কি হতে পারে। ধর্ম 'মনোনীত প্রচারকগণ' কর্তৃক উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতার বিষয় হিসেবে শুধু বিবেচিত হবার নয়, কিংবা স্বাপ্নিক মনের বিশেষ চরিতার্থতা সম্পর্কে কোন অদ্ভুত মতবাদ হিসেবেও বিবেচিত হবার নয়। ধর্মকে জীবনের নীতি হিসেবে বুঝা উচিত; পূর্ণতা যা আমাদের অস্তিত্বের লক্ষ্য তার দিকে মনুষ্যত্বকে উন্নীত করা ধর্মের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। যে ধর্ম একটা সুনিয়মতান্ত্রিক ভিত্তির উপর নৈতিকতার মৌলিক নীতিসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করে, সামাজিক বাধ্যতাবোধ ও মানবিক কর্তব্যসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে, যা প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ বিকাশের সৎ সামঞ্জস্যবিধানের সাহায্যে আমাদেরকে সেই পরিপূর্ণ সত্তার সন্নিকটবর্তী করে—আমরা বলি এমন ধর্মই আমাদের সর্বোচ্চ বিবেচনা ও শ্রদ্ধার দাবী রাখে। মুহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত ইসলাম ধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই যে এর মধ্যে মানুষের প্রজ্ঞা ও নৈতিক উপলব্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সকল এক্ষণিক ও সার্বজনীন[৪৮] ধর্মসমূহের উজ্জ্বলতম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান। এ শুধু মানুষের অগ্রগতির সত্যকার ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত সদর্থক নৈতিক নীতিসমূহের সমষ্টি নয়, বরং "কতিপয় নীতির প্রতিষ্ঠা, কতিপয় প্রবণতার শক্তিশালীকরণ, কতিপয় মেজাজের কর্ষণ, যা দেশ-কালের চিরপ্রবহমান সংকটের ক্ষেত্রে বিবেককে প্রয়োগ করতে হয়।" ইসলামের মহান প্রচারক আল্লাহর প্রতি ভালবাসার প্রতীক হিসেবে হাজার উপায়ে বিশ্বজনীন প্রেম ও ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে প্রচার করেছেন। "তোমরা কিভাবে চিন্তা কর যে তোমরা যখন তাঁর সামনে থাকবে তখন তিনি তোমাদেরকে জানবেন, তোমাদের সন্তান-সন্ততি, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের প্রতিবেশী, তোমাদের সঙ্গী-সাথীদের প্রতি তোমাদের ভালবাসার মাধ্যমে?"[৪৯] "তোমরা কি তোমাদের স্রষ্টাকে ভালবাস? তবে প্রথমে তোমাদের সঙ্গী সাথীদেরকে ভালবাস।"[৫০] "তোমরা কি তোমাদের প্রভুর সান্নিধ্য আশা কর? তবে তাঁর সৃষ্ট জীবকে ভালবাস; তোমাদের জন্য

www.amarboi.org

যা ভালবাস, তা তাদের জন্যও ভালবাস; তোমাদের জন্য যা বর্জন কর, তাদের জন্য তা বর্জন কর; তোমরা নিজের জন্য যা করতে চাও তাদের জন্যও তা কর।" তিনি অপবিত্রতার জঞ্জাল, কপটতার নীচতা, আত্মপ্রবঞ্চনার অধার্মিকতাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। তিনি অভ্রান্ত ভাষায় সত্য, দানশীলতা ও ভ্রাতৃপ্রেমের মহার্ঘতা সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন।

সর্বকালের ও সকল জাতির ক্ষেত্রে ইসলামিক নীতিসমূহের বিস্ময়কর উপযোগিতা, প্রজ্ঞার আলোকের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ সঙ্গতি, আর মনুষ্যহৃদয়ের সহজাত মৌলিক সত্যকে ঘিরে আবেগময় অজ্ঞতার ছাপ ফেলে এমন রহস্যঘন মতবাদের অনুপস্থিতি—এ সব প্রমাণ করে যে ইসলাম আমাদের সত্তার ধর্মীয় বৃত্তির সাম্প্রতিক বিকাশের প্রতিবেদন। যারা এর কতিপয় নৈতিক শিক্ষার ঐতিহাসিক তাৎপর্য উপেক্ষা করেছেন তারা মনে করেছেন যে এসব নীতির আপাতদৃষ্ট কঠোরতা কিংবা চিন্তার বর্তমান পন্থার সঙ্গে অসামঞ্জস্যতা ইসলামের সার্বজনীনতার দাবীকে প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু এই সব নিয়ম ও শিক্ষার ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে সামান্য অনুসন্ধান করলে তথ্য-পরীক্ষায় একটু বেশি নিরপেক্ষতা অবলম্বন করলে এদের যে অস্থায়ী চরিত্র প্রতিপাদন করবে তা বর্তমান যুগের চাহিদা ও কুসংস্কারের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে না। প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মাবলম্বীদের অজ্ঞতার ফলে ইসলামের উদারতা, ব্যাপ্তি এবং যাবতীয় নৈতিক মতবাদের প্রতি সহনশীলতা নিতান্তই বিভ্রান্ত, বিকৃত হয়ে পড়েছে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে গোপন করা হয়েছে।

কোরআন ঘোষণা করেছে : "যারা ঈমান এনেছে, তারা মুসলমান, ছাবেয়ী কিংবা নাসারা হোক না কেন, যারা আল্লাহর উপরে ও কিয়ামতের দিন সম্পর্কে আস্থাবান আর যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্যে কোনও ভয় নেই, আর তারা শোকার্ত হবে না।"[৫১]

একই মনোভাব একই ভাষায় পঞ্চম সুরাতে পুনঃ উচ্চারিত হয়েছে; আর শত শত আয়াত প্রমাণ করে যে ইসলাম 'মুক্তি' শুধু মুহম্মদের অনুসারীদের প্রতি সীমিত রাখেনি;—"আমি তোমাদের সকলের জন্য একটা করে শরীয়ত ও ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়েছি। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকে একটিমাত্র উম্মতে পরিণত করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান, যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন তা দিয়ে। সুতরাং সবাই তোমরা নেক কাজে তৎপর হও। আল্লাহর কাছেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে। তোমাদের মধ্যে যা নিয়ে বিরোধ ছিল, এভাবেই তার বিবরণ তোমাদের কাছে বাতলে দেওয়া হল।"[৫২]

পৃথিবীর যে সব ধর্ম মানবজাতির বিবেককে শাসন করেছে তাদের মধ্যে একমাত্র মুহম্মদের ইসলাম সেই দুটি ধারণাকে সমন্বিত করেছে যা বিভিন্ন যুগে মানুষের আচরণের প্রধান উৎস প্রদান করেছে—মানুষের মর্যাদার চেতনা যা প্রাচীন দর্শনে অত্যধিক শ্রদ্ধেয় হয়েছিল, এবং মানবিক পাপের ধারণা যা খ্রিস্টান যুক্তিবাদীদের কাছে অতীব প্রিয় ছিল। মানুষকে একমাত্র তাঁর কাজের দ্বারা বিচার করা হবে—এই বিশ্বাস মুসলমানকে

www.amarboi.org

আত্মোৎসর্গ ও সার্বজনীন বদান্যতায়; আল্লাহর প্রভুত্ব, করুণা, প্রেম ও সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস তাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর সম্মুখে আত্মবিনম্রতায় এবং সেসব বীরোচিত গুণে পরিচালিত করে যা এই আপত্তি তুলেছে যে ইসলামের গুণাবলী স্টোয়িক্যাল[৫৩] জীবনের পরীক্ষায় ধৈর্য, আত্মনিবেদন ও দৃঢ়চিত্ততা। এই বিশ্বাস তাকে স্নায়বিক উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাঁর বিবেককে প্রশ্ন করতে যে সব উদ্দেশ্য তাকে প্ররোচিত করে[৫৪] সেগুলো সন্দেহের চোখে দেখতে, আর ইষ্ট-অনিষ্ট, ভালমন্দের বিরোধে নিজেকে অবিশ্বাস করতে, সর্বশক্তিমান ও মহাপ্রেমিক আল্লাহর উপর নির্ভর করতে বাধ্য করে।

কোন কোন ধর্মে কর্তব্য-নির্দেশক নৈতিক শিক্ষাসম্মত এত অধিক বাস্তবতাবর্জিত, এত অধিক মনুষ্য-প্রকৃতির জ্ঞানের অভাবসূচক এবং যা অত্যুৎসাহীদের স্বপ্নময় অস্পষ্টতায় এত অধিক ভরপুর যে তা বাস্তব জীবনের সংগ্রামে শুধু নিরর্থক।[৫৫] ধর্মের ব্যবহারিক চরিত্র, প্রাত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ডে মানুষের সাধারণ সম্পর্কের উপর তার স্থায়ী প্রভাব, জনসাধারণের উপর তার শক্তি ও ধর্মের সার্বজনীনতা বিচারের প্রকৃত মাপকাঠি। কোন ধর্মের প্রকৃতির স্বীকৃতির জন্য আমরা ব্যতিক্রমধর্মী মননের শরণাপন্ন হই না। আমরা জনসাধারণের মধ্যেই ধর্মের স্বরূপ খুঁজে পেতে চাই। আমরা যেসব প্রশ্ন স্বভাবত উত্থাপন করি সেগুলো হল : ধর্ম কি মানুষের মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে? তা কি তাকে উন্নত করে? তা কি তার অধিকার ও কর্তব্যের ধারণাকে নিয়ন্ত্রিত করে? ধর্মের বাণী দক্ষিণ সাগরদ্বীপের লোকদের কাছে নিয়ে গেলে কিংবা কাফরারীয়দের মধ্যে প্রচার করলে তা কি তাদের জীবনকে উন্নত অথবা অবনত করে? ইসলাম ধর্মে সর্বাধিক বুদ্ধিবাদী বাস্তবতার সঙ্গে উচ্চ ভাববাদের সমন্বয় ঘটেছে। ইসলাম মনুষ্য-স্বভাবকে উপেক্ষা করেনি, বাস্তব জীবনের সীমানার বাইরে সর্পিল পথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেনি। অন্যান্য ধর্মব্যবস্থার মতো এর লক্ষ্য ছিল পরিপূর্ণতার নিরঙ্কুশ আদর্শের দিকে মানবতার উন্নয়ন; মনুষ্য-স্বভাব তার এই অস্তিত্বে যে নিখুঁত নয়—এই সত্য উপলব্ধির মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন করেছিল বা অর্জন করার প্রয়াস পায়। যদিও ইসলাম বলে না যে, "যদি তোমার ভাই তোমার একগালে আঘাত করে অন্য গালটি তাকে এগিয়ে দাও", যদি এ স্বেচ্ছাকৃত অন্যায়কারীর অন্যায়ের সমপরিমাণ শাস্তি অনুমোদন করে,[৫৬] তবু এ আন্তরিকভাবেও বিভিন্ন মেজাজে ক্ষমা ও মহানুভবতার অনুশীলন, অনিষ্টের প্রতিদান হিসেবে কল্যাণ সাধনের শিক্ষা দিয়ে থাকে। কোরআনে বলা হয়েছে : "তার চাইতে আর কার কথা উত্তম হতে পারে যে আল্লাহর পথে আহ্বান করে ও নেক কাজ করে।...সৎ ও অসৎ কাজ, ভাল ও মন্দ কিছুতেই সমান নয়। আপনি সদ্ব্যবহারের মাধমেই তা এড়িয়ে চলুন।"[৫৭] আবার বেহেশত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন : "যারা সম্পদে ও বিপদে দানখয়রাত করে, যারা তাদের রাগ দমন করে ও মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহ দয়াশীলদের ভালবাসেন।"[৫৮]

এসব মহৎ নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন মিথ্যা ভাবাবেগের কারাগারে সযত্নে রক্ষিত নয়। হযরতের প্রকৃত অনুসারীদের নিকট এগুলো জীবনের সক্রিয় মৌল নীতি। বিস্মিত

www.amarboi.org

বংশধরদের বিমুগ্ধ প্রশংসার জন্য ইতিহাস অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে দুঃখকষ্টের ভেতর ধৈর্যশীলতার অনেক দৃষ্টান্ত সংরক্ষণ করেছে। দুর্দশার মধ্যে যখন অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই তখন সংযত ক্ষমার অনুশীলন সুদিনে ক্ষমা করার চেয়ে সহজতর। কারবালার মহান শহীদ হযরত হোসাইন সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একদিন যখন তিনি রাতের আহারে বসেছেন তখন ঝলসান উষ্ণ পাত্রের আধেয় একটি ভৃত্য তাঁর উপরে ফেলে দিয়েছিল ও তা তাঁর পায়ের উপরে পড়েছিল। এতে সে কোরআনের আয়াত 'বেহেশত তাদের জন্য যারা তাদের রাগ দমন করেছে" আবৃত্তি করল। হোসাইন উত্তর দিলেন "আমি রাগান্বিত হইনি।" ভৃত্যটি আবৃত্তি করে চলল, "আর যাঁরা মানুষকে ক্ষমা করে"। হোসাইন বললেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি।" তখন ভৃত্য এই বলে আয়াতটি শেষ করল "আল্লাহ দয়াশীল ব্যক্তিকে ভালবাসেন।" হোসাইন উত্তর দিলেন, "আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম আর চারশত দিনার তোমাকে দিলাম।"[৫৯]

'কাশ্শাফ' গ্রন্থের প্রণেতা এভাবে ইসলামী শিক্ষার সারবস্তুকে সংক্ষেপে প্রকাশ করেছেন : "যিনি তোমাদেরকে বিতাড়িত করেছেন তাঁকে পুনরায় অন্বেষণ কর; তাঁকেই দাও যিনি তোমাদের কাছ থেকে নিয়েছেন; তাঁকে ক্ষমা কর যিনি তোমাদের ক্ষতি করেছেন;[৬০] কারণ আল্লাহ ভালবাসেন যে তোমরা তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে তাঁর পূর্ণতার বীজ প্রোথিত কর।"[৬১]

আকাঙ্ক্ষার বিশুদ্ধতায় নিম্নবর্ণিত বিষয়ের চেয়ে অধিকতর সুন্দর কিছু হতে পারে কি : "আর তাঁরাই করুণাময় আল্লাহর বান্দা যাঁরা দুনিয়ার বুকে ধীর পায়ে চলাফেরা করে। আর মূর্খরা যখন তাঁদেরকে কিছু বলে তখন তাঁরা বলে : ছহি সালামতেই থাক। আর যারা রাত্রি অতিবাহিত করে নিজেদের পালনকর্তার জন্য সিজদায় দাঁড়িয়ে থেকে।...আর যাঁরা খরচপত্রের বেলায় অপব্যয় করে না মোটেই, আর কার্পণ্যও করে না, বরং তাঁরা মাঝামাঝি এক সহজ পথ বেছে নেয়। আর যাঁরা মাবুদ হিসেবে আল্লাহর সাথে আর কাউকে শরীক করে না। আর তাঁরা এমন কোন লোককে হত্যা করে না—যা নাকি আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছেন, তবে কিনা সংগত কারণ ব্যতীত। আর তাঁরা মোটেই ব্যভিচার করে না...যাঁরা মিথ্যা অপকর্মের শরীক হয় না, আর যদি খেলাধুলা বাজে কাজকর্মের মধ্যে এসে পড়ে তাহলে অত্যন্ত ভদ্রভাবে এড়িয়ে চলে যায়। ... আর যাঁরা দোওয়া করতে থাকে : "হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদের স্ত্রী ও পুত্র পরিজনদের দিয়ে আমাদের চোখের শান্তি দান করুন, আর আমাদেরকে পরহেজগারদের নেতা বানিয়ে দিন।" তাঁরাই তো সেই দল যাঁদেরকে পারিশ্রমিক হিসেবে বালাখানা দান করা হবে—কারন তাঁরা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর তাঁরা সেখানে সালাম ও সংবর্ধনা লাভ করবেন। সেইখানে তাঁরা চিরকাল বাস করবেন বিশ্রাম ও থাকবার জায়গা হিসেবে তা যে কতই না সুন্দর।"[৬২]

এই হল মুহম্মদের ইসলাম। এ "শুধু একটা ধর্মমত নয়, এ হল বর্তমানে নির্বাহীতব্য একটি জীবনচেতনা"—ঐশী প্রেম সার্বজনীন বদান্যতা ও আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের সাম্য

www.amarboi.org

ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত যতার্থ কর্মসম্পাদন, যথার্থ চিন্তন ও যথার্থ কথনের একটি ধর্ম। ইসলামের আধুনিক পণ্ডিতগণ তাদের রাসূলের মহিমা যতই নিষ্প্রভ করুন না কেন (এবং আধুনিক মুহম্মদীয় মতবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির উপর একখানা বিশালকায় গ্রন্থও রচিত হতে পারে), তবু যে ধর্মনিষ্ঠা (পরহেজগারি) এবং "কাজের মাধ্যমে যৌক্তিকতা প্রতিপাদন"৬৩ প্রমূর্ত করে তোলে তা মানবপ্রেমিকদের স্বীকৃতির উপযুক্ত।

"সান্নিধ্য কি পেতে চাও আল্লার
তবে হও নির্ভেজাল আর পরহেজগার।"

জালালউদ্দীন রুমী বলেন ঃ

তোমার মধ্যে খেলছে কেবল
দুই রকমের দুই-আমি
একটা চলে আঁধার পথে
অন্যটা যে উর্ধ্বগামী।
আঁধার পথের বন্যটারে
রেখে দাও ঐ এক পাশে
চালাও এবার স্বর্গ-শকট
উড়ুক তা আজ আকাশে।

বর্তমান জীবন ভবিষ্যত জীবনের শস্যক্ষেত্র। হৃদয়ের তদ্গতচিত্ততা নিয়ে মানুষের কল্যাণ সাধন করা, সমদুয় শক্তি নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তার পরিপূর্ণতার কাছাকাছি পৌঁছবার প্রয়াস ইসলামের মূলনীতি। প্রকৃত মুসলমান একজন প্রকৃত খ্রিস্টান, কেননা তিনি যীশুর নবুয়্যতকে স্বীকার করে এবং তিনি যে নৈতিক শিক্ষা দিয়েছেন তা কার্যে পরিণত করার জন্য প্রয়াস পান। তবে কেন একজন প্রকৃত খ্রিস্টান সেই প্রচারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন না যিনি তাঁর পূর্ববর্তী প্রচারকদের শিক্ষাকে পরিপূর্ণতা দান করেছেন? তিনি কি বিপথগামী শক্তিসমূহকে প্রগতির পথে পরিচালিত করেননি?

যীশুর পুত্রত্বের ধারণা ছাড়া খ্রিস্টধর্ম ও ইসলামের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। মূলের দিক দিয়ে উভয় ধর্মই এক ও অভিন্ন; উভয়ই মানবজাতির মধ্যে সক্রিয় একই আধ্যাত্মিক শক্তিসমূহের ফলশ্রুতি। একটি ছিল ইহুদী ও রোমকদের হৃদয়হীন জড়বাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অন্যটি হল আরবদের মর্যাদাহানিকর পৌত্তলিকতা, তাদের হিংস্র, বর্বর প্রথা ও নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। খ্রিস্টধর্ম একটি সুগঠিত সরকারের অধীনে একটি অধিকতর স্থিতিশীল ও সভ্যলোকদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল, কাজেই এই ধর্মকে তুলনামূলকভাবে মৃদু অনিষ্টের সহিত প্রতিযোগিতা করতে হয়েছিল। ইসলাম প্রচারিত হয়েছিল যুযুধান গোত্র ও বংশের লোকদের কাছে, ফলে তাকে স্বার্থপরতা ও প্রাচীন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। প্রাচ্যের দিকে খ্রিস্টধর্মের অগ্রগতি

www.amarboi.org

ব্যাহত করেছিলেন একজন কৃষ্টিবান অথচ অদ্ভুত চরিত্রের লোক, যদিও তিনি জন্মসূত্রে ইহুদী, শিক্ষার দিক দিয়ে আলেকজেন্দ্রিয় গ্রীক। তবে তিনি গ্রীস ও রোমে এই ধর্ম বহন করেছিলেন। সেখানে শত শত বছর ধরে পৌত্তলিক সভ্যতা দানা বেঁধেছিল, খ্রিস্টধর্ম সেখানে নতুন ধারণা ও মতবাদের জন্ম দিয়েছিল। যে মুহূর্তে খ্রিস্টধর্ম তার জন্মস্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছিল তখনি তা খ্রিস্টানত্ব হারিয়েছিল। এ ধর্ম পলের ধর্ম হয়ে দাঁড়াল, যীশুর ধর্ম হারিয়ে গেল। প্রাচীন পৌত্তলিকতার সর্বমন্দির ধসে পড়ছিল। গ্রীক ও আলেকজেন্দ্রিয় দর্শন রোমানজগতকে অবতাররূপী খোদা স্বীকৃতির জন্য প্রস্তুত করেছিল—সার্বভৌম স্রষ্টার অধীনস্থ খোদা, অনন্তের বুকে জাত কালপুরুষ; পলের খ্রিস্টধর্মে এই ধারণা আসন গেড়ে বসেছিল। আধুনিক ভাববাদী খ্রিস্টধর্ম যা সদর্থক ধর্মের চেয়ে দর্শনের বাহুল্য তা ছিল বহু শতাব্দী সঞ্চিত প্রাক্-খ্রিস্টান ও খ্রিস্টানোত্তর সভ্যতার ফল। ইসলাম এমন এক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে, এমন সামাজিক ও নৈতিক অবস্থাসমূহের মধ্যে প্রচারিত হয়েছিল যা ছিল সম্পূর্ণরূপে আলাদা। এর বিরুদ্ধে অধঃপতিত খ্রিস্টধর্ম যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল তা যদি এ ভাস্তত এবং পৃথিবীর উচ্চতর মানবগোষ্ঠীর মধ্যে এর পথ করে নিত তবে অপেক্ষাকৃত কম মার্জিত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এর যে অবস্থা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর অবস্থা পর্যবেক্ষকের কাছে হাজির হয়। বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে প্রবহমান নদীর মতো এই দুটি ধর্ম যে দেশের ভেতর প্রবেশ করেছিল সে দেশবাসীর প্রকৃতি অনুযায়ী সেখানে ফলোৎপাদন করেছে। মেক্সিকোবাসীরা, যারা ক্যাক্টাস পত্রের দ্বারা নিজেদের শরীরে আঘাত করে নিজেদের শাস্তি দেয়, পৌত্তলিক দক্ষিণ আমেরিকানগণ যারা খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে নিম্নস্তরের অন্তর্ভুক্ত—তারা কোন অর্থেই আদৌ খ্রিস্টান নয়। তাদের এবং আধুনিক খ্রিস্টান চিন্তাবিদদের মধ্যে এক বিরাট ফাঁক রয়েছে। ইসলাম যেখানে মার্জিত ও প্রগতিশীল জাতিসমূহের মধ্যে প্রবেশ করেছে, সেখানে সে প্রগতিশীল প্রবণতাসমূহের সহিত সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে, সভ্যতার অগ্রগতিকে সহায়তা করেছে, ধর্মকে আদর্শায়িত করেছে।[৬৪]

অশিক্ষিত ও অমার্জিত লোকদের উপর স্থায়ী হিতকর প্রভাব বিস্তার করার জন্য 'নির্দেশসমূহ ও নিষেধাজ্ঞাগুলোর' ক্ষেত্রে ধর্মটিকে মুখ্যত সদর্থক হওয়া চাই। উচ্চতর ও অধিকতর আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পক্ষে বাইরের কোন নির্দেশ ছাড়াই তাদের সঙ্গীসাথীদের প্রতি কর্তব্যের ধারা হৃদয়ঙ্গম করা প্রায়ই সম্ভব। তারা আল্লাহর সঙ্গে যোগযুক্ত এবং তাদের সত্তার সঙ্গে পরিণতপ্রাপ্ত ন্যায়-অন্যায়, সত্যতা-পবিত্রতার চেতনার দ্বারা পরিচালিত। প্লেটো ও এরিস্টটল কখনো সেমিটিক প্রত্যাদেশের আলোক পাননি, কিন্তু তাঁরা মহান পয়গাম্বরদের মতো সুস্পষ্ট ভাষায় জগতবাসীকে নৈতিকতার সর্বোচ্চ নীতিসমূহ শুনিয়েছেন। তাঁরা আল্লাহর বাণী শুনেছেন এবং তাঁদের চিন্তার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে উন্নীত হয়েছেন।

যদি সদর্থকরূপে সম্বোধিত না হয় এবং সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণসহ বিধিসমূহ প্রণীত না হয় তবে অজ্ঞতা বা বর্বরতায় নিমজ্জিত জনসাধারণের কাছে, অমার্জিত ও মাতাল লোকদের

www.amarboi.org

জন্য নৈতিক নির্দেশাবলী কোন অর্থ বহন করে না। কোন ধর্মের নৈতিক দিক তাদের অনুভূতি বা আবেগের কাছে আবেদন সৃষ্টি করে না; আর দার্শনিক ধারণাসমূহ তাদের মন, প্রাত্যহিক আচরন কিংবা জীবনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না।

তারা নৈর্ব্যক্তিক নীতিসমূহের উপর বক্তৃতার তুলনায় কর্তৃত্ব ও নজীরের দ্বারা অনেকবেশি পরিচালিত হয়। শুধু স্বশ্রেণীভুক্ত সঙ্গীসাথীদের প্রতি তাদের সম্পর্কের নিয়ন্ত্রণের জন্যই নয় বরং তাদের স্রষ্টার সহিত সর্ম্পকের নিয়ন্ত্রণের জন্যও, যে সম্পর্ক ঐসব নিয়মের অনুপস্থিতি বিস্মৃত হওয়া স্বাভাবিক, তাদের আবশ্যক সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপত্র।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের সাফল্য এবং বিশ্বে তার দ্রুত ও বিস্ময়কর বিস্তৃতির কারণ এই ছিল যে মনুষ্য-প্রকৃতির এই প্রয়োজনটি ইসলাম স্বীকার করে নিয়েছিল। যুযুধান গোত্র ও ধর্মমতসমূহের জগতে, যেখানে অনুশীলনের পরিবর্তে কথাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ইসলাম সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশের আকারে নির্দেশাবলী ঘোষণা করেছিল। যে নৈতিক ও সামাজিক ভরাডুবির মধ্যে ইসলামের জন্ম হয়েছিল তাতে তার লক্ষ্য ছিল এক সার্বভৌম ইচ্ছাশক্তির উপাসনার একত্রীকরণ এবং তার দ্বারা মানুষকে কর্তব্য পালনের প্রতি আহ্বান করা, একমাত্র যা আধ্যাত্মিক বিকাশের পথ দেখিয়েছিল। নিম্নস্তরের জাতিসমূহকে সামাজিক নৈতিকতার উচ্চস্তরে উন্নীত করে ইসলাম জগৎ সমক্ষে সদর্থক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছিল। আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে সে মানুষকে মিতাচারিতা, সংযম, বদান্যতা, ন্যায়বিচার ও সাম্য শিক্ষা দিয়েছিল। মানুষে মানুষে সাম্য-নীতির স্বীকৃতি ও তার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক প্রবণতা চিন্তার একই পর্যায় চিত্রিত করেছিল যা গ্যালিলির উপকূলে অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। এমন কি, সর্বোচ্চ তন্ময়তার মুহূর্তেও ইসলামের মহান শিক্ষক ব্যক্তিগত শক্তির উপর আরোপিত সীমাবদ্ধতার কথা বিস্মৃত হননি, যা অর্থনৈতিক বৈষম্য উৎপন্ন করে।

আফসোস! ইসলামের পরবর্তী দিনের প্রচারকদের জন্য দলগত অনিষ্ঠকর প্রভাব প্রকৃত ধর্মের পুষ্পমুকুল ও সত্যকার ভক্তিমূলক মনোভাবকে নস্যাৎ করে দিয়েছে।

একজন খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক খুব জোরের সঙ্গেই ধর্ম ও ধর্মতত্ত্বের পার্থক্যের কথা উল্লেখ করেছেন এবং দুয়ের পার্থক্যের মধ্যে বিভ্রান্তির[৬৫] ফলে যে অনিষ্টসমূহ দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কেও বলেছেন। যা খ্রিস্টধর্মে ঘটেছে তা ইসলামেও ঘটেছে। অনুশীলন প্রচারের প্রহসনে পর্যবসিত হয়েছে আনুষ্ঠানিকতা আন্তরিক ও বিশ্বস্ত কাজ—কল্যাণ করার জন্য ও আল্লাহর প্রেমের জন্য মানবজাতির কল্যাণ সাধনের স্থান দখল করেছে। উন্মাদনা নিঃশেষ হয়ে গেছে, আর আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভক্তি তাৎপর্যহীন বাক্যে পর্যবসিত হয়েছে। যে ঐকান্তিকতা ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব ইতর প্রাণীর চেয়ে কোন দিক দিয়েই উত্তম নয়—যথার্থ কর্ম ও যথার্থ চিন্তন অনুপস্থিত। বর্তমানের মুসলমানগণ অক্ষরের হতাশ প্রেমে প্রকৃত মনোভঙ্গী উপেক্ষা করছে। মহান শিক্ষক কর্তৃক প্রচারিত আদর্শ অনুসারে জীবননির্বাহ না করে, উত্তম কাজে শ্রেষ্ঠতা লাভ না করে, পরহেজগার

www.amarboi.org

না হয়ে আল্লাহকে ভাল না বেসে এবং তাঁর প্রেমে তাঁর সৃষ্টিকে ভাল না বেসে তারা সুবিধাবাদ ও বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের দাসে পরিণত হয়েছে। এটা স্বাভাবিক ছিল যে মহান শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসার কারণে তাঁর প্রাথমিক শিষ্যবৃন্দ তাঁর জীবনের সাধারণ পদ্ধতিকে অপরিবর্তনীয় করে তুলেছে, একটা সুখদুঃখময় জীবনের সাময়িক ঘটনাগুলোকে পরিশ্রুত করে তুলেছে, একটি শিশু সমাজে সেদিনের সাধারণ সংকটের জন্য প্রণীত শৃঙ্খলা নিয়ম-কানুনগুলোরকে হৃদয়পটে এঁকে নেবে। কিন্তু জগতের শ্রেষ্ঠসংস্কারক, প্রজ্ঞার সার্বভৌমত্বের মহত্তর সংস্করক, যে মানুষটি ঘোষণা করেছিলেন যে বিশ্বজগৎ নিয়ম-শৃঙ্খলার দ্বারা শাসিত ও চালিত, যে প্রাকৃতিক নিয়মের অর্থ প্রগতিশীল বিকাশ, তিনি কোনদিন ভেবেছিলেন যে, যে-অধ্যাদেশসমূহ এক অর্ধ-সভ্য গোষ্ঠীর অস্থায়ী প্রয়োজন মেটাতে প্রয়োগ করা হয়েছিল তা কিয়ামত পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় থাকবে—এ কথা অনুমান করা ইসলামের নবীর প্রতি অন্যায় করা।

বিরামহীন সামাজিক ও নৈতিক ঘটনাবলীসহ এই প্রগতিশীল জগতের প্রয়োজনসমূহ সম্পর্কে তাঁর চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ শক্তি কারও ছিল না কিংবা তাঁর নিকট মঞ্জুরীকৃত প্রত্যাদেশ সম্ভাব্য সকল ব্যাপারের সমাধান দিতে পারবে না—ঈদৃশ কথা তাঁর চেয়ে অধিক কেউ জানত না। যখন মোয়াজ ইয়েমেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন তখন হযরত তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কোন আইনের দ্বারা তিনি ঐ প্রদেশ শাসন করবেন। মোয়াজ উত্তর দিলেন, "কোরআনের আইনের সাহায্যে।" "কিন্তু যদি তুমি সেখানে কোন নির্দেশ না পাও?" তিনি উত্তর করলেন, "রাসুলের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আমি কাজ করব।" "কিন্তু সেখানেও যদি তুমি কিছু না পাও?" "তিনি উত্তর করলেন, "আমি আমার বিচারবুদ্ধি দিয়ে করব।" হযরত তাঁর শিষ্যের এই উত্তর সানন্দে অনুমোদন করলেন এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের জন্যও একই নীতি অনুমোদন করলেন।

মহান শিক্ষক তাঁর সময়ের সংকটাবলী সম্পর্কে, যে জাতির সহিত তাঁকে উঠা-বসা চলাফেরা করতে হয়েছিল তাদের প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন। এই জাতি সামাজিক ও নৈতিকতার চরম নৈরাশ্যের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়েছিল। তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তঃদৃষ্টি এবং উদার দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং কেউ বলতে পারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এমন এক সময় আসবে যখন আকস্মিক ও অস্থায়ী নিয়মসমূহ স্থায়ী ও সাধারণ নিয়মসমূহ পৃথকীকৃত হবে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, "তোমরা এমন একটা যুগে বাস করছ যখন, যদি তোমরা আদিষ্ট বিষয়ের এক-দশমাংশ ও বর্জন কর তবে তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এরপর, এমন সময় আসবে যখন, কেউ যদি এখনকার আদিষ্ট বিষয়ের এক-দশমাংশও পালন করে তবে নাজাত পাবে।"[৬৬]

আমরা পূর্বেই মন্তব্য করেছি যে, মুসলমান জাতির উপর যে অনিষ্টকর প্রভাব পড়েছে তা মহান শিক্ষকের শিক্ষাসমূহের ত্রুটির জন্য নয়। কোন ধর্মেই ইসলামের চেয়ে বিকাশের অধিকতর আশাবাদ নেই, কোন ধর্মমতই এর চেয়ে বিশুদ্ধতর নয় কিংবা মানবজাতির প্রগতিধর্মী দাবীসমূহের সঙ্গে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

www.amarboi.org

মুসলমান সম্প্রদায়গুলোর বর্তমান নিশ্চল অবস্থার মূলে রয়েছে প্রধানত একটি ধারণা যা সাধারণভাবে মুসলমানদের মনের উপর স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছে : ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অধিকার প্রাথমিক পর্যায়ের ফকিহ্ বা আইনবেত্তাদের সময়েই নিঃশেষ হয়েছে, আধুনিককালে তার অনুশীলন পাপ, মুহম্মদের গোঁড়া অনুসারী হিসেবে মুসলমানের পক্ষে উচিত ইসলামের চারটি মযহাবের যে কোন মযহাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং নবম শতাব্দীতে অধ্যুষিত ফকিহ্দের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিজেদের বিচারবুদ্ধি বর্জন করা এবং বিংশ শতাব্দীর প্রয়োজনের প্রতি দৃকপাত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব না করা।

সুন্নীদের মধ্যে এটা সাধারণ বিশ্বাস যে চারজন ইমাম[৬৭] থাকার পর হযরতের আইনকানুন ব্যাখ্যার জন্য অপর কোন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির প্রয়োজন নেই। মুসলমানগণ বর্তমানে যে পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্যে স্থাপিত হয়েছে সে সম্পর্কে খতিয়ে দেখা হয় না। এসব বিশেষজ্ঞ আইনবেত্তারা বহু শতাব্দী পূর্বে যে সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করেছিলেন তা আজও সমভাবে প্রযোজ্য বলে মনে করা হয়। শিয়াদের মধ্যে আকবরী সম্প্রদায়ের লোকেরা 'আইনের ব্যাখ্যাতাদের' নির্দেশের বাইরে তাদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করতে রাজী নয়। হযরত প্রজ্ঞাকে মানববুদ্ধির সর্বোচ্চ ও মহত্তম বৃত্তি হিসেবে পবিত্র বলে অভিহিত করেছেন। আমাদের মযহাবের নেতাগণ ও তাঁদের অন্ধ অনুসারীরা বিচারবুদ্ধির অনুশীলনকে পাপ ও অপরাধ বলে গণ্য করেছেন।

যেমনি খ্রিস্টানদের মধ্যে তেমনি তা মুসলমানদের মধ্যে উপস্থিত। বর্তমানে মুসলমান সমাজের এক বৃহদংশের জীবন ও আচরণ মহান শিক্ষাগুরুর শিক্ষাসমূহের দ্বারা কম নিয়ন্ত্রিত এবং 'মুযতাহিজ ও ইমামদের' মতবাদ ও মতামতের দ্বারা অধিক নিয়ন্ত্রিত, যারা প্রত্যেকে নিজেদের জ্ঞানানুসারে হযরতের নিকট প্রেরিত ওহীর মাধ্যমে মতামত গঠন করেছেন। যেমন জনতার অন্তর্গত লোকগুলো একজন প্রচারকের বক্তৃতা শ্রবণ করে থাকে যিনি সুউচ্চ স্থান থেকে বিশাল সমাবেশের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে থাকেন এবং তদীয় সুবিধাজনক অবস্থান থেকে বিরাট অংশ উপেক্ষা করে থাকেন, তেমনি তারা শুধু তাদের সাক্ষাৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তাঁর বাণীর ব্যাপকতর অর্থ এবং তিনি যে শ্রোতাদের সম্বোধন করেছিলেন তাদের স্বভাব হৃদয়ঙ্গম না করেই তাঁর বাণীসমূহ মানবিক সমস্যা ও মানবিক প্রগতি সম্পর্কে তাদের সীমাবদ্ধ ধারণার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। শিক্ষাগুরুর শিক্ষাসমূহের সার্বজনীনতা বিস্মৃত হয়ে, তাঁর প্রাণশক্তির সহায়তা ব্যতীত, তাঁর জীবনের প্রেরণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা বিস্মৃত হয়েছিলেন যে হযরত তাঁর প্রতিভার শীর্ষদেশ থেকে সমগ্র মানবতার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তারা অস্থায়ী বিষয়কে চিরস্থায়ী বিষয়ের সহিত, বিশেষকে নির্বিশেষের সহিত মিশিয়ে ফেলেছেন। খ্রিস্টানজগতের পুরোহিতদের মতো বহু মুসলিম আইনবেত্তা (দু'একজনের নয়) রাজাবাদশাহ ও অত্যাচারী শাসকদের ভৃত্য ছিলেন, আর তাদের দাবী শিক্ষাগুরুর শিক্ষার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। আইন-কানুন উদ্ভাবিত হয়েছিল, তত্ত্ব তৈরি করা

www.amarboi.org

হয়েছিল, ঐতিহ্য আবিষ্কৃত হয়েছিল এবং শিক্ষাগুরুর বাণীর উপর রং চড়ানো হয়েছিল, যাঁর বাণীর সহিত তাদের মনোভঙ্গীর মিল ছিল না। সুতরাং অধিকাংশ আইন-কানুন যা এখন ধর্মের বিশেষজ্ঞদের বিবেককে শাসন করছে কদাচিৎ তা কোরআনের সুস্পষ্ট ও সদর্থ ঘোষণাসমূহ থেকে অনুমিত বরং সেগুলোর অধিকাংশ যেসব আইন-ধর্ম সংক্রান্ত গ্রন্থে মুসলিম জাহান পরবর্তী শতাব্দীসমূহে প্লাবনের মতো হাবুডুবু খেয়েছিল তা থেকে অনুমিত। একজন ইংরেজ গ্রন্থকার যথার্থই মন্তব্য করেছেন, "হিব্রুরা যেমন তালমুদদের অনুকূলে পেন্টাটিউককে নির্বাসিত করেছিল, মুসলমানেরা তেমনি হাদিস ও বিশেষজ্ঞদের সিদ্ধান্তের অনুকূলে কোরআনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল।" তিনি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত করেছেন, "আমরা একথা বুঝাতে চাই না যে, কোন মুসলমানকে যদি জিজ্ঞাসা করা হত যে তাঁর ধর্মগ্রন্থ কি তবে সে 'কোরআন' ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থের নাম করত; কিন্তু আমরা বুঝাতে চাই যে বাস্তবে কোরআন তার বিশ্বাস বা অনুশীলনকে নিয়ন্ত্রিত করে না। খ্রিস্টানজগতের মধ্যযুগে 'নিউ টেস্টামেন্ট' নয়, টমাস একুইনাসের 'সাম্মাথিয়োলোজিয়া' ধর্মের বিশুদ্ধতার প্রশ্নের মীমাংসা করত না। বর্তমান সময়ে গোঁড়া ধর্মযাজকরা কি সাধারণভাবে সুসমাচারে, খ্রিস্টের শিক্ষা সম্পর্কে ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি হিসেবে তাদের ধর্মমত আহরণ করেন? সম্ভবত যদি তারা আদৌ কোন দলিল উল্লেখ করেন, তবে গির্জার 'প্রশ্নোত্তরিকা' তাদেরকে পরিতৃপ্ত করবে; যদি তারা বিশেষভাবে সন্ধানী প্রবণতার লোক হন তবে উনচল্লিশটি অনুচ্ছেদ তাদের যাবতীয় সংশয়ের নিরসন করবে। তথাপি তারা বলবেন যে তাদের ধর্ম সুসমাচার থেকে গৃহীত হয়েছে এবং যে মাধ্যমের সাহায্যে তা পরিশ্রুত হয়েছে তা প্রকাশ করবেন। ঠিক সেই একই পথে আধুনিক মুহম্মদীয় ধর্ম গঠিত হয়েছে এবং যা মুসলমানেরা বিশ্বাস ও অনুশীলন করেন তার এক বৃহদাংশ কোরআনের মধ্যে পাওয়া যায় না।"

এতদসত্ত্বেও প্রত্যেক সিস্‌টেম প্রত্যেক মযহাবের মধ্যে অগ্রগতির বীজ রয়েছে, এবং যদি এখন সেই অগ্রগতি বন্ধ হয় তবে তা আইনবেত্তাদের ত্রুটি নয়। এ শিক্ষাগুরুর শিক্ষার প্রাণশক্তির অনুধাবনের অভাবজ্ঞাপক, এমন কি মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমামদের মনোভাবেরও অজ্ঞতা নির্দেশক।[৬৮]

পাশ্চাত্য জগতে সংস্কার আন্দোলন রেনেসাঁর দ্বারা শুরু হয়েছিল এবং ইউরোপের উন্নতি শুরু হল যখন সে পাদরীদের শৃঙ্খল ছিঁড়ে ফেলল। ইসলামের ক্ষেত্রেও শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চা সংস্কারের পূর্বগামী হবে; ধর্মীয় জীবনের পুনরুজ্জীবন শুরু হওয়ার পূর্বে মননকে অবশ্যই প্রথম দাসত্বের শৃঙ্খলমুক্ত হতে হবে। যা বহু শতাব্দীব্যাপী আক্ষরিক ব্যাখ্যা ও 'সামঞ্জস্য' মতবাদের ফল। যে বাহ্যানুষ্ঠান উপাসকের হৃদয়ে আবেদন সৃষ্টি করে না তা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে; বাহ্যানুষ্ঠানকে অন্তরের অনুভূতির অধীন করতে হবে; আর নৈতিকতার শিক্ষা গঠনশীল মনের উপর মুদ্রিত করে দিতে হবে। একমাত্র তখনি আমরা ইসলামের নবীর কর্তব্যের নীতিসমূহের ক্ষেত্রে যে প্রেরণা ও শিক্ষা দিয়েছেন তা আশা করতে পারব। যখন একথা স্বীকার করে নেওয়া হবে যে, ঐশী

www.amarboi.org

বাণী যে কোন ভাষাতে ভাষান্তরিত করলে তার ঐশী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারায় না এবং যে কোন ভাষাতে আল্লাহকে আহ্বান করলে তা তাঁর কাছে গ্রহণীয় হয়, তখন ইসলামের সংস্কারের আরম্ভ। হযরত নিজে তাঁর বিদেশী শিষ্যদেরকে তাদের মাতৃভাষায় উপাসনার অনুমতি দিয়েছিলেন।[৬৯] তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় অন্যান্যদেরকে তাদের নিজস্ব উপভাষায় আবৃত্তি করবার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে কোরআন সাতটি ভাষায় নাজিল হয়েছিল।

ইসলামের আদিকালে এটা একটা সর্বসম্মত মত ছিল যে উপলব্ধি ছাড়া ভক্তি নিরর্থক। ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ) বিবেচনা করতেন যে 'নামাজ' ও 'খুতবা' যে কোন ভাষায় আবৃত্তি করা আইনসঙ্গত ও বৈধ।[৭০] আবু হানিফার শিষ্য, আবু ইউসুফ ও মুহম্মদ কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত তাঁদের গুরুর মতবাদ গ্রহণ করেছেন। তাঁরা মনে করেন যে, যদি কোন ব্যক্তি আরবী না জানে, তবে সে যেকোন ভাষাতে তার ভক্তি প্রকাশ করতে পারে।[৭১]

যাহোক, তবে যেখানে সম্ভব ও অনুশীলনক্ষম সেখানে আরবীতে নামাজের আবৃত্তি সংরক্ষণ করা উচিত—এর পশ্চাতে একটি বড় ও শক্তিশালী কারণ রয়েছে। তা হল একটি হযরতের ভাষা ছিল এজন্য নয়, বরং এ হল ইসলামের ভাষা এবং সারা জাহানের মুসলমানদের অনুভবের ঐক্য বিধায়ক এ ভাষা। এই ঐক্য ছাড়া আর কোথায় এর অধিকতর শক্তি নিহীত?

টীকা—১

মুহম্মদের ব্যয়নিয়ামক নিষেধাজ্ঞাসমূহ দু' শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে— গুণগত এবং পরিমাণগত। পানাহার ও এই ধরনের অন্যান্য বিষয়ে আতিশয্যের বিরুদ্ধে। নিষেধাজ্ঞা পরিমাণগত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আংশিকভাবে বিশেষ অর্ধ-বর্বর সুখবাদ যা নৈতিক দিক দিয়ে অধঃপতিত, সিরীয় ও পারসিকদের সংস্পর্শে আসার ফলে আরবদের মধ্যে প্রচলিত হচ্ছিল এবং আংশকিভাবে সেসব পরিস্থিতি যার আভাস আল্ কোরআনে প্রদত্ত হয়েছে—এই দুয়ের কারণে এসব নিষেধাজ্ঞা এসেছে। শূকরের মাংস সম্পর্কে শর্তহীন নিষেধাজ্ঞা, যা গুণগত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত তা স্বাস্থ্যগত কারণে উদ্ভূত হয়েছিল বলে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়। এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে যতদিন পর্যন্ত পশুটির প্রকৃতি না বদলায় এবং বর্তমানের মতো এই পশুর মাংস ভক্ষণের ফলে রোগ উৎপন্ন হওয়া অব্যাহত থাকে। নৃত্য সম্পর্কীয় নিষেধাজ্ঞা দেবদেবীর জন্য আরোপিত নৃত্য সর্ম্পকে প্রযুজ্য হয়েছিল, যা পৌত্তলিক আরবগণ অ্যাশটোরেথ মলচ ও বালের উদ্দেশ্যে সিরীয়-ফিনিসীয় উপাসনা উদ্যাপন করত।

www.amarboi.org

পাদটীকা

১. সংস্কৃত ভাষাভাষীরা 'সোমা' এবং জেন্দ বংশসমূহের লোকেরা 'হোমা বা হামা' বলত।
২. ডলিঞ্জার, 'দি জেনটাইল এণ্ড দি জু', ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯৮। 'জেন্দ আবেস্তা' বহু দেবদেবীর প্রতি প্রার্থনা, স্তোত্র ও আহ্বান ইত্যাদির এক জমকাল তথ্যভাণ্ডার। বাস্তবিকপক্ষে, এ সার্বজনীন পূজা অনুষ্ঠানাদির এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ তুঃ ক্লার্কের। 'টেন গ্রেট রিলিজিয়ান'।
৩. রোলাণ্ড, 'ডিসারটেকাসিস মিসেলেনি' ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯১, শাহরিস্তানী।
৪. ডিইট ২৬, ১২-১৫।
৫. ডলিঞ্জার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭২।
৬. সু. আ. ৪২।
৭. লুক, ৯, ১-৪।
৮. ইফিসিয়ান, ৫, ১৮; কল ১, ১২।
৯. মোশেইন ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৯।
১০. তুঃ ওলসনার, 'দ্যজ এফেক্টস দ্যলা রেলিগ্রিস দ্য মুহম্মদ', পৃ. ৬।
১১. সু. ২৯ আ. ৪৫।
১২. মিশকাত ৪র্থ খণ্ড, ১৮ অধ্যায়, বিভাগ, ২, ৩।
১৩. তফসীরে জালালাইন পৃ. ২৮৮।
১৪. সাহিফা-ই-কামিলা।
১৫. হান্টার, 'আউয়ার ইন্ডিয়ান; মুসলমানস;, পৃ. ১৭৯
১৬. সু-২ আঃ ১২৭ ২৩০ ইত্যাদি; সু. ৭ আ. ২০৪, ২০৫; সু. ১৭ আ. ৭৯; সু. ২০ আ. ১৩০; সু. ৩০ আ. ১৬, ১৭ ইত্যাদি।
১৭. কিতাবুল মুস্তাত্রাক। হজের সময় বার্ষিক কোরবানী ও বৈরাম শুধুমাত্র স্মারক অনুষ্ঠান।
১৮. সু. ২২ আ. ৩৭।
১৯. সা. ২ আ. ১৭৭।
২০. 'গুরুরার ওয়াদ্‌ দুরুরার।
২১. ১০ম অধ্যায় দেখুন।
২২. আল্‌ কোরআন।
২৩. দি কিতাবুল মুসৃত্রাত্‌ রাফ ১ম অধ্যায়।
২৪. 'আবু দাউদ' ও নিসায়ী' হাদীস শরীফের বিবরণ; মুয়াজ বিন্‌ জাবাল কর্তৃক বর্ণিত।
২৫. সু ৫ আ. ৬। কোরআন সার্বজনীনভাবে 'ওজুর' কথা বলেছে; কিন্তু যেখানে পানি পাওয়া সম্ভব নয় সেখানে স্নান বা ওজুর পরিবর্তে যে কোন ধরনের পরিচ্ছন্নতা অনুমোদন করেছে। স্বাভাবিকভাবেই স্নান বা ওজু সমাধার উপায় যা হযরতের অনুশীলন থেকে এসেছে তা নিয়ে ধর্ম তত্ত্ববিদদের মধ্যে অনেক আলোচনা ও মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হয়েছে।
২৬. সু. ৭ আ. ২০৪।
২৭. সু. ২ আ. ১৩৯, ১৪৪ ইত্যাদি।
২৮. স্টেনলী লেনপুল, 'সিলেকশানস ফ্রম দি কোরআন, ভূমিকা দ্রঃ।
২৯. সু. ২ আ. ১৭৭।

www.amarboi.org

৩০. মোশেম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১। মোশেম সুস্পষ্টভাবে বলেন যে উপবাস আদিতে "পশু শক্তি প্রতিরোধ করার, অনিষ্টকর শক্তির দুরভিসন্ধিকে নস্যাৎ করার ও বিক্ষুব্ধ উপাস্যের ক্রোধ প্রশমনের সর্বাপেক্ষা কার্যকর উপায় হিসেবে" বিবেচিত হয়ে আসছে—১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮।

৩১. নিয়েণ্ডার বলেন; "খ্রিস্টানদের সাপ্তাহিক ও বাৎসরিক উৎসব একই মৌলিক ধারণা থেকে জন্ম নিয়েছে...ক্রুশবিদ্ধ ও আবির্ভূত খ্রিস্টকে অনুকরণ করার ধারণা থেকে।" পুনরায়, "যে সব খ্রিস্টান তাদের কর্তব্যকর্মকে যুদ্ধে, মিলপিয়া খ্রিস্টের সঙ্গে তুলনা করতে আগ্রহী ছিল তাদের নিকট এই উপবাস প্রার্থনার সঙ্গে যুক্ত করে 'স্রেসনিজ' বলে অভিহিত হত যেন সেসব খ্রিস্টের সেনাবাহিনীর প্রহরীর দল।"—নিয়েণ্ডার, 'চার্চ হিস্ট্রী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০৮, ৪০৯।

৩২. সু. ২ আ. ১৮৩-১৮৫।

৩৩. কিতাবুল মুস্তাতাফ, ১ম অধ্যায়, ৪র্থ বিভাগ।

৩৪. নিয়েণ্ডার, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫০; মোশেম ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৬। আমি একথা বলতে চাই নে যে এটাই একমাত্র স্বপ কথার মধ্যে দিয়ে খ্রিস্টানদের দানশীলতা প্রকাশ পেয়েছিল। বিধবা, দরিদ্র ও এতীমদের লালন পালনের বিষয়টি ইসলামে যেমন জোর দেওয়া হয়েছে খ্রিস্টধর্মেও তেমনি জোর দেওয়া হয়েছে। এমন কি যীশু যে ঐশী দানশীলতা শিখিয়েছিলেন তা তাঁর শিষ্যদের কাছে থেকে বিশেষ পরিচর্যা লাভ করেছিল। যাদের হাতে তিনি আমানত রেখে গিয়েছিলেন। দানশীলতার উপকারিতা লাভের জন্য "তিন কুড়ি (অর্থাৎ ষাট বছর) পর্যন্ত এক ব্যক্তির স্ত্রী হিসেবে থাকবার ও সন্তান প্রতিপালনের অধিকার বিধবার ছিল। তুঃ ব্রান্টের 'হিস্ট্রী অব দি ক্রিশ্চিয়ান চার্চ, পৃ. ২৭।

৩৫. দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোন ব্যক্তির বিশটি উট না থাকে তবে তার জন্য জাকাত ফরজ নয়।

৩৬. জামাউল্ তিরমিজি 'জাকাত' অধ্যায়; জামাত আব্বাসী; কোয়েনী 'দ্রুম্নিট মুসলমান'। আরও তুঃ 'মাবসুত'।

৩৭. সু. ২ আ. ২৬৭, ২৭১ ইত্যাদি।

৩৮. ম্যাথু ২৫, ৩৫, ৩৬।

৩৯. 'রাদ্দুল মোহ্তার', 'হজ' অধ্যায়; কোয়েরী, 'দ্রুম্নিট মুসাল্মান' ১ম খণ্ড, 'মাবসুত'।

৪০. সু. ৫ আ. ৮৮।

৪১. পৌত্তলিক আরবগণ আহার্যের জন্য কোন জন্তু হত্যা করার সময় তাদের দেবীদের নামে উৎসর্গ করত।

৪২. উৎসর্গ-পাথর কাবা গৃহের চারিদিকে অথবা প্রবেশ পথে স্থাপিত উৎসর্গ পাথরের উপরে নৈবেদ্য মূর্তির জন্য প্রদত্ত হত।

৪৩. সু. ৫ আ. ৩।

৪৪. কোন কোন জিনিস গুণগতভাবে মানুষের নিকট ঘৃণ্য যেমন-মাংসাশী প্রাণী, শিকারী পাখী, সর্প ইত্যাদির মাংস ইত্যাদি। এসব ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন হত না। ভারতে প্রচলিত, হিন্দুদের নিকট থেকে ধার করা ধারণা হল যে মুসলমানদের উচিত নয় খ্রিস্টানদের খাদ্য গ্রহণ করা—এ ধারণা সম্পূর্ণভাবে ভ্রমাত্মক এবং কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতের (সু. ৫ আ. ৫) শিক্ষার বিপরীত : "আজকে তোমাদের জন্য উত্তম জিনিস হালাল করা হল, আর আহলে কিতাবদের খাবার তোমাদের জন্য, আর তোমাদের খাবারও তাদের জন্য হালাল করা হল।" খাদ্য সম্পর্কে মুহম্মদের নিয়মাবলী,

www.amarboi.org

নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞা, আমরা স্মরণ করতে পারি যে সেগুলো কাল ও জাতির অস্থায়ী পরিস্থিতির জন্য প্রযুক্ত্য হয়েছিল। সে পরিস্থিতি অন্তর্হিত হওয়ার ফলে এসব আইনের প্রয়োজনীয়তাও অন্তর্নিত হয়েছে। সুতরাং ইসলামের প্রত্যেকটি নিয়ম অপরিহার্যভাবে অপরিবর্তনীয় —এরূপ অনুমান করা মানব-প্রজ্ঞার ইতিহাস ও বিবর্তনের প্রতি অন্যায় করা। এ প্রসঙ্গে ইবনে খালদুনের বাণী আমাদের গভীর বিবেচনার দাবী রাখে, "কেবল মনোযোগী পর্যালোচনা ও বেশ স্থায়ী প্রয়োগের ফলেই আমরা সত্য আবিষ্কার করতে পারি, ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে নিজেদেরকে সতর্ক রাখতে পারি। ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তি থেকে নিজেদেরকে সর্তক রাখতে পারি। যথার্থপক্ষে, যদি আমরা অভিজ্ঞতাসহকারে মৌলিক নীতিসমূহ, বিশেষ সভ্যতার প্রকৃতি কিংবা মনুষ্য-সমাজের বৈশিষ্টজ্ঞাপক পরিস্থিতির তোয়াক্কা না করে শুধু ঐতিহ্যবাহী বিবরণীতে পরিতৃপ্ত হই; যদি সুদূর অতীতের লোকেরা আমাদের মতো যেসব অভাব বোধ করেছে তা বিচার না করি, যদি আমরা বর্তমানের সঙ্গে অতীতের তুলনা না করি, তবে আমরা আদৌ ভ্রান্তি থেকে নিস্তার পাব না এবং সত্যের পথ হারিয়ে ফেলব।"—'প্রলেগোমেনিস দ্য ইবনে খালদুন'; ম দ্য স্লেন 'প্রিমিয়ার পার্টি', পৃ. '১৩।

৪৫. সু. ৬ আ. ১৫২-১৫৪।

৪৬. মোশেম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৪।

৪৭. প্রাগুক্ত।

৪৮. এই শব্দগুলি ব্যবহারের ব্যাপারে 'টেন গ্রেট রেলিজিয়ান্স' ১ম অধ্যায় দেখুন।

৪৯. মিশকাত, খণ্ড ২২, ২৩; অধ্যায় ২৫, ২৬।

৫০. কাস্তালানীয় কমেন্টারী অন দি সহীহ বোখারী ১ম অংশ, পৃ. ৭০।

৫১. সু. ৫ আ. ৬০। এই শিক্ষাসমূহের মনোভাবকে আসালাসীয় ধর্মমতের মনোভাবের সঙ্গে তুলনা করুন।

৫২. সু. ৫ আ. ৪৮। তুঃ সু. ২৯ আ. ৪৬; সু. ৩২ আ. ২৩; সু. ৩৯ আ. ৪১; সু. ৪০ আ. ১৩ ইত্যাদি।

৫৩. ক্লার্ক, 'টেন গ্রেট রেলিজিয়ান্স' পৃ. ৪৮৪।

৫৪. 'হোসাইন ওয়িজ'-এর 'আখলাক' তুলনীয়।

৫৫. তুঃ এম. আর্নেষ্ট হ্যাভেটের 'লা ক্রিশ্চিয়ানিসিম এত্ স্য অরিজিনিস' নামক মূল্যবান ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থের মন্তব্য। ভূমিকা দ্রষ্টব্য পৃ. ৩৯।

৫৬. সু. আ. ৩৯, ৪০। থোনিসেন মন্তব্য করেছেন যে, মুহম্মদ প্রভৃত অন্যায়কে প্রতিহত করার জন্য স্বেচ্ছাকৃত অন্যায়কারীর শাস্তি অনুমোদন করেছেন, একথা সর্বদা অবশ্যই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। 'লা হিস্ট, দু ড্রয়িট ক্রিমিনেল দ্যজ পিউপলস এন্সিয়েন্স' ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭।

৫৭. সু. ৪১ আ. ৩৩, ৩৪।

৫৮. সু. ৪২ আ. ৩৭।

৫৯. সেল তাঁর কোরআনের অনুবাদের তৃতীয় অধ্যায়ের একটি টীকায় এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন এবং গিবসও ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তবে উভয়েই ভুলবশতঃ হোসাইনের ভ্রাতা হাসানের প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। তফসীরে হোসাইনী মিরাট সংস্করণ পৃ. ১৯৯।

৬০. আবু দারদ কর্তৃক বর্ণিত হযরতের উপদেশের সঙ্গে এর তুলনা করুন। 'মিশকাত', ৪র্থ খণ্ড' অধ্যায়—১, বিভাগ—২ 'মুস্তত্রাফ'-এর 'ক্ষমা'-র উপর সমগ্র অধ্যায়।

www.amarboi.org

৬১. জামাকশারী (কাশশাফ) মিশর সংস্করণ প্রথমাংশ, পৃ. ২৮০।

৬২. সু. ২৬ আ.৬৩-৭৬।

৬৩. মি. কটার মরিসন তাঁর 'সার্ভিস অব ম্যান' গ্রন্থে এই মতবাদ মানবতার পক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম।

৬৪. যে ধর্ম আলী (রাঃ)-র বীরোচিত ধর্মনিষ্ঠা, জাফর সাদিক (রাঃ)-র মৃদু শান্তভাব, মূসা (রাঃ)-এর পবিত্রতা ও ধৈর্য ফাতিমা (রাঃ)-এর ঐশী পবিত্রতা, রাবিয়া (রহঃ)-র সাধুতা জন্ম দিতে পেরেছে, যে ধর্ম ইবনে সিনা, আল্‌বেরুণী ইবনে খালদুন, সানায়ী, জালালউদ্‌দীন রুমী, ফরিদউদ্‌দীন আত্তার, ইব্‌রাহিম আদহাম এবং এ ধরনের শত শত লোক তৈরি করতে পেরেছে সে ধর্মের মধ্যে আশান্বিত হওয়ার প্রত্যেকটির উপাদান রয়েছে।

৬৫. প্রফেসর মমারি, 'ডিফেকটস অব মর্ডাণ ক্রিশ্চিয়ানিটি'।

৬৬. এই সহী হাদিসটি আবু হোরায়রা বর্ণিত এবং 'তিরমিজী শরীফে' সংরক্ষিত, এটি 'মিশকাত' শরীফের 'বাবোল্‌ এয় তো ছামে বিল্‌ কিতাবে ও ওয়াম্‌ সুন্নাত'-এ পাওয়া যাবে।

৬৭. আবু হানিফা, শাফেয়ী, মালিক ও ইবনে হাম্বল।

৬৮. সিরিয়ার মুহম্মদ আমিনের 'রাদ্‌দুল মুহতার' এবং শেখ যাদেহর 'মাজমুল আনহার' 'মুলতেকা' ও 'হেদায়ার মতো অগ্রগামী—'কোক' অথবা ব্লাকস্টেনের মতের উপর 'এল্ডন' বা 'ম্যান্সফিল্ড'-এর মত এরূপ। উদার ও উদারপন্থী প্রবণতার ক্ষেত্রে শেখ মূর্তাকার মতামত সংকীর্ণমনা আত্মকেন্দ্রিক মুহাকিকের মতামতের চেয়ে বহু উর্ধ্বে অবস্থিত। দাসত্ব মনোভাবসম্পন্ন আকবারী পূর্ববর্তীদের চেয়ে পরবর্তীদের অধিক পছন্দ করেছেন।

৬৯. সলমন ফার্সী, যাকে হযরত আলী সিংহের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন, ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যাঁকে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

৭০. 'জওয়াহিরুল আখলাতি', দুর্‌রুল্‌ মুখতার', বাবোস্‌ সালাত' ('নামাজ' অধ্যায়)। এই মতবাদ 'তাজনিসে'ও প্রদত্ত হয়েছে। তাহত্‌ওয়াই বর্ণনা করেছেন যে ইমামের মত প্রামাণ্য ও অনুস্মরণীয়। দুর্‌রুল্‌ মুখতারের ভাষ্যকার ফার্সীতে নামাজ পড়ার বৈধতা স্বীকার করেছেন।

৭১. বর্তমান যুগের উলেমাগণ এর এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, যখন কোন উপাসক আরবী উচ্চারণে অক্ষম তখন সে অন্য ভাষায় তা আবৃত্তি করতে পারে। এই ব্যাখ্যার অসঙ্গতি সুস্পষ্ট।

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামে পরকালের ধারণা

"শোন হে পরিতৃপ্ত আত্মা! নিজ পালনকর্তার দিকে চলো এবার। তুমি তাঁর উপরে সন্তুষ্ট, আর তিনিও তোমার উপরে খুশি রয়েছেন। তাই তো তুমি এবারে আমার বান্দাদের দলে শামিল হও, আর আমার জান্নাতেই তুমি প্রবেশ কর।" (সু. ৮৯ আ. ২৭-৩০)

অন্যান্য বিষয়ে পরস্পর সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মানবজাতির বিভিন্ন গোষ্ঠী এত সাধারণভাবে পরবর্তী অস্তিত্ব—আমাদের প্রকৃতির নশ্বর অংশ থেকে জীবন্ত নীতির বিচ্ছেদের পরবর্তী অস্তিত্বের ধারণা গ্রহণ করেছে যে তা এমন একটি বিশ্বাসে পর্যবসিত হয়েছে যে এ আমাদের অস্তিত্বের অন্যতম মৌল উপাদান। বিভিন্ন মানবপরিবার ও গোত্রসমূহের শৈশবের সাথে যুক্ত তথ্যাবলী অধিকতর সাবধানতার সঙ্গে পরীক্ষা করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে ভাবী জীবন বা অস্তিত্বের ধারণা মানবমনের স্বাভাবিক বিকাশের পরিণতি।

বন্য অসভ্য মানুষ পৃথিবীতে যে জীবন নির্বাহ করত তা থেকে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন ধারণা তার ছিল না। সে মৃত্যুকে জীবনের অবসান বলে মনে করত। তারপর এমন একটি স্তর এল যখন মানুষ সেই বর্বর অবস্থাকে অতিক্রম করল, তার কামনা-বাসনা আর জাগতিক মৃত্যুর রশিতে বাঁধা থাকল না। এখানকার অস্তিত্বের অবসানের পর আর এক অস্তিত্বের প্রত্যাশা করতে লাগল। কিন্তু এমন কি এই স্তরেও প্রাত্যহিক জীবনের কানন থেকে অমরতার ধারণা উদ্ভূত হয়নি। তখন মৃত্যু-পরবর্তী জীবন ছিল এই জাগতিক জীবনেরই শুধু বিস্তার। মৃত্যুর পরবর্তী ধারাবাহিক জীবনের এই ধারণা অধিকতর বিস্তৃত ক্ষেত্রের জন্য মানবআত্মার অধ্যাবধি নির্জ্ঞান কামনা-বাসনা থেকে বিকশিত করতে হয়েছিল, যেখানে প্রিয় বন্ধুর বিচ্ছেদ অসভ্য ও সভ্য সকলের নিকট সমান বেদনাদায়ক হলেও তা আবার পুনর্মিলনে পর্যবসিত হবে।

সত্বর মানুষ পরবর্তী স্তরে পৌঁছল, মানুষ বিশ্বাস করতে লাগল, বর্তমান জীবনের সুখ-দুঃখ জীবনের সব নয়, সব হতে পারে না; পরে অন্য জীবন আসবে কিংবা অন্য জীবন আছে যেখানে সে তার কার্যানুযায়ী সুখ-দুঃখ ভোগ করবে।

www.amarboi.org

এখন আমরা একটা নীতি, একটি নিয়মে পৌঁছলাম। পরবর্তী জীবনের ধারণাকে বিকশিত করতে মানুষের চিন্তা আর দূরে অগ্রসর হয়নি। নাস্তিক দার্শনিক কোন নতুন আবিষ্কার করেননি, কোন নতুন অবস্থার নির্দেশ করেননি। তিনি শুধু আমাদের অসভ্য পূর্বপুরুষদের কৃতকর্ম অনুসরণ করে চলেছেন, যাদের মন্দফল এই জীবনের প্রতি বাঁধা আছে।

এটা উত্তমরূপে প্রমাণিত তথ্য যে ঐ সব ধারণা যা ব্যক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন স্তরের নির্দেশ করে তা শুধু একই সঙ্গে বিভিন্ন জাতির মধ্যে উপস্থিত নয়, উপরন্তু একই জাতির মধ্যে ব্যক্তিগত বিকাশ অনুসারে বিভিন্ন সংযোগের মধ্যেও উপস্থিত।

কথিত আছে যে মিশরীয়গণ সর্বপ্রথম পরবর্তী জীবন সম্পর্কীয় মতবাদ স্বীকার করেছিলেন কিংবা অন্ততঃপক্ষে এরূপ মতবাদের উপরে মানুষের আচরণকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[১] পুনর্জন্মের ধারণার সাথে তারা পুরস্কার ও শাস্তির ধারণা যোগ করেছিলেন। মানুষ সমাধিতে গমন করে শুধু পুনর্জন্ম গ্রহণের জন্য। পুনরুজ্জীবন লাভের পর জননের নীতি, যাবতীয় জিনিসের নিজ অস্তিত্বের কারণ সূর্যের সাথে নতুনজীবনে প্রবেশ করে। সূর্যের মতো মানুষের আত্মা অমর বিবেচিত হয়েছিল এবং তা একই তীর্থভ্রমণ সমাপ্ত করত। যাবতীয় দেহ নিম্নতর হত না। মৃত ব্যক্তিদেরকে ওসিরিস ও তার চল্লিশজন পরামর্শদাতা বিচার করতেন। যারা দোষী বলে সাব্যস্ত হত তাদের ভাগ্যে জুটত বিনাশ। ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদেরকে তুচ্ছ ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে পরিশুদ্ধ করে চরম শান্তির নিলয়ে প্রবেশ করান হত; ওসিরিস তাদেরকে নিজের সঙ্গী হিসেবে সুস্বাদু খাবার খেতেন।[২]

আমরা স্বভাবত আশা করতে পারি যে মিশরে ইসরাইলদের দীর্ঘ অবস্থান তাদের মধ্যে পুরস্কার ও শাস্তির সহগামী ধারণাসহ পরবর্তী জীবন সম্পর্কে কিছু ধারণা দিয়েছিল। কিন্তু বিশুদ্ধ মোসাইজম (যে শিক্ষা এই নামে চলেছে) বর্তমান জীবন থেকে স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্বের অবস্থা স্বীকার করে না। যে কিলককে কেন্দ্র করে মুসায়ী আইনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা পরিচালিত তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জাগতিক পুরস্কার ও শাস্তি।[৩] এসব আইনের প্রাণশক্তি অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে সীমিত। পুনরুত্থান সম্পর্কীয় মতবাদ ও তৎসম্পর্কীয় ধারণাসমূহ যা পরবর্তী ইহুদীধর্মে দানিয়েল ও ইয়েকেলের লেখায় ব্যক্ত হয়েছে তা সুস্পষ্টরূপে জরথুস্ত্রবাদ থেকে উদ্ভূত বিজাতীয় সৃষ্টির ফসল। বিদেহী আত্মার বাসস্থানের বর্ণনা—পাপী ও পুণ্যবান সকলের বাসস্থান, যা তুলনামূলকভাবে প্রাথমিক পর্যায়ের লেখায় পাওয়া যায় তা হিব্রুজাত বলে প্রতীয়মান হয় না। পরলোকে মানুষ আল্লাহর প্রশংসা-কীর্তন করতে কিংবা তাঁর প্রেম ও করুণার কথা স্মরণ করতে পারে না।[৪] এটা ছায়ার জগৎ, পৌত্তলিকদের পরলোকে ইহুদীদের পরলোকের প্রতিলিপি, যাতে আত্মা বিষণ্ন, নিষ্ক্রিয়, আরামহীন অস্তিত্ব নির্বাহ করে—জগতে তাদের প্রিয়জনরা কেমন রয়েছে তা জানতে পারে না, শুধু তাদের নিজস্ব অবস্থার জন্য পরিতাপ করে।[৫]

কিন্তু পরবর্তী ইহুদীধর্ম পরজীবন সম্পর্কে প্রবল বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। ঐতিহ্য পূণ্যবানদের শান্তির নিলয় কিংবা অভিশপ্তদের ভীতির কারাগার হিসেবে বর্ণনায়

www.amarboi.org

পঞ্চমুখ।[৬] জরথুস্ত্রবাদ এভাবে হিব্রুজাতির উপর দু'ভাবে ক্রিয়া করেছিল। এই মতবাদ তাদের মধ্যে পরলোক সম্পর্কে বিশুদ্ধতর ও অধিকতর আধ্যাত্মিক ধারণা বিকশিত করে তুলেছিল, কিন্তু পরবর্তী মাজো-জরথুস্ত্রবাদ, যা চ্যাল্ডীয় মতবাদের সৃষ্টি, পরকালের পুরস্কার ও শাস্তির জড়াত্মক ধারণাসমূহের সঙ্গে ইহুদী পুরোহিতদের ধারণাসমূহকে প্রবলভাবে রঞ্জিত করেছিল।[৭] প্রাচ্যের আর্যজাতিসমূহের মধ্যে দৃশ্যমান মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কীয় মতবাদ সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। আর্যজাতির একটি শাখায় পরজীবন হয় চিরন্তন জন্মান্তরবাদ—জন্মমৃত্যুর বিরামহীন চক্র, অথবা দীর্ঘ নবিশির পর অসীমের মধ্যে সম্পূর্ণ বিলুপ্তি, অথবা সীমাহীন অতল দেশ অথবা অস্তিত্বহীনতায় পর্যবসিত হয়েছিল।[৮] অন্য একটি শাখায় এই মতবাদ পুরস্কার ও শাস্তির ক্রম-বিন্যস্ত স্তরের রূপে আবরিত, যে অর্থে একজন আধুনিক খ্রিস্টান বা মুসলমান বিচারকে বুঝে থাকেন। মাজো-জরথুস্ত্রবাদীরা প্রথম থেকেই দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতেন কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতগণ একমত নন। হার্গ-উফ ও অন্যান্যদের সঙ্গে ডলিঞ্জার বিশ্বাস করেন যে, এই ধারণা যথার্থরূপে জরথুস্ত্রীয় নয়; যদি এই ধারণা হিব্রুদের নিকট থেকে গৃহীত হয়ে না থাকে, তবে তা পরবর্তী বিকাশের ফল।[৯]

যাহোক, খ্রীষ্ট আরবের নবীর সময়ে পারসিকদের পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে প্রবল ও উন্নত ধারণা ছিল। জেন্দ-আবেস্তায় যতটুকু আমাদের কাছে পৌঁছেছে তা স্পষ্টভাবে পরকালের পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে বিশ্বাসকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভেন্দিদাদ ও বান্দেশের জরথুস্ত্রবাদ আবেস্তার বিশ্বাসসমূহের উপর ধারণা সম্প্রসারিত করেছে এবং এই ধর্মমত অনুসারে, মানুষের মৃত্যুর পর দৈত্যরা তার দেহের অধিকার গ্রহণ করে, তা সত্ত্বেও তৃতীয় দিনে তার চেতনা ফেরে। যে সব আত্মা জীবদ্দশায় মন্দশক্তির কুমন্ত্রণায় চলেছে তারা মৃত্যুর পর তৃতীয় রাতের পরের দিন যে চাইনবাদের বিভীষিকাপূর্ণ সেতু পার হওয়ার জন্য পরিচালিত হবে তা পার হতে পারবে না। সৎ লোকেরা সহজে সে সেতু পার হয়ে যাবে, তারা ইয়াজাতাস (আধুনিক ফার্সীতে ইজাদ) কর্তৃক পরিচালিত হবে; তারা বেহেশতে প্রবেশ করে ওরমুজদ ও আমশাসপান্দের আলয়ে প্রবেশ করবে যেখানে তারা স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে হুর-ই-বেহেশত বা স্বর্গের অপ্সরীদের সঙ্গসুখ ও অন্যান্য সব ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করবে। দুষ্টগণ সেতুর উপরে নিপতিত হবে কিংবা দোজখে নীত হবে, সেখানে দেবাজরা তাদের উপর নির্যাতন করবে। শাস্তির ভোগকাল নির্ধারণ করবেন ওরমুজদ, কিছু কিছু পাপীকে তাদের বন্ধুদের প্রার্থনা ও সুপারিশের ফলে ক্ষমা করা হবে। জগতের ধ্বংসের প্রাক্কালে একজন প্রেরিত পুরুষের আবির্ভাব ঘটবে, যিনি জগৎবাসীকে অন্যায় ও পাপাচার থেকে পরিত্রাণ করবেন, শাস্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবেন—জরথুস্ত্র মিলেনিয়াম, স্বর্গের ওরমুজদ রাজত্ব কায়েম হবে।[১০] অতঃপর এক সার্বজনীন পুনরুত্থান ঘটবে, যখন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়দের পুনর্মিলন ঘটবে। মিলনের আনন্দের পর ভাল ও মন্দের মধ্যে ঘটবে বিচ্ছেদ। পাপীদের যাতনা হবে ভয়াবহ। নিদারুণ দৈহিক যন্ত্রণা ও মনস্তাপে কাতর হয়ে আহরিমান চাইনবাদের

www.amarboi.org

উপর-নিচে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে। একটি ধূমকেতু নিপতিত হয়ে পৃথিবীটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেবে। পাহাড় গলে যাবে এবং তরল পদার্থের মতো প্রবাহিত হতে থাকবে। সকল মানুষ এই ভীষণ প্লাবনের মধ্যে প্রবাহিত হবে এবং পূতপবিত্র হয়ে উঠবে। এমন কি আহরিমান পর্যন্ত পরিবর্তিত হবে এবং দোজখ পূতপবিত্র হবে। তখন থেকে মন্দের চির অবসান ঘটবে এবং সকল মানুষ চিরস্থায়ী আনন্দের মধ্যে বসবাস করবে।

এ হল সেই ধর্মটির সার-সংক্ষেপ যা সেমিটিক ধর্মসমূহকে বিশেষ করে মুহম্মদের উদারপন্থী ধর্মকে অভ্রান্তভাবে প্রভাবিত করেছে।

যখন নাজারাতের যীশুর আবির্ভাব ঘটেছিল প্রায় সেই সময়ে ফিনীশীয় ও অ্যাসিরীয়দের কর্তৃত্বের অবসান ঘটেছে। হেলেনীয় রোমকরা তখন জগৎ শাসন করছিল, তবে বিজয়ী ও পুনরুজ্জীবিত মাজো-জরথুস্ত্রবাদ প্রাচ্যে তাদেরকে প্রতিরোধ করেছিল।

ইহুদীরা চিরতরে তাদের স্বাধীনতা হারিয়েছিল। এক ঘৃণ্য চাটুকার ডেভিডের সিংহাসনে বসেছিল। সেলুসিডের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী শাসক তার অবাধ্যতার মনোভাব দমন করে রেখেছিল। দেশ, ধর্মমত ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রত্যেক জাতির মতো ইহুদীরাও তাদের ভাগ্য যতই বিড়ম্বিত হতে লাগল তারা ততই এই আশায় অনুপ্রাণিত হতে লাগল যে গাইডিওন বা ম্যাকাবিয়াসের মতো কোন স্বর্গপ্রেরিত পয়গাম্বর তাদের পূর্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবেন এবং তাদের বহু অত্যাচারীকে পদাঘাত করতে তাদেরকে সমর্থ করবেন।[১১] তাদের দেশপ্রেমিক জ্ঞানীরা যে মসিহের আবির্ভাবের কথা উজ্জ্বল রঙরেখায় এঁকেছিলেন তা এক সুউচ্চ আকাঙ্ক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল— ইসরাইলদের রাজত্বের পুনরুদ্ধার, প্রাচ্যে মাজো-জরথুস্ত্রবাদী ও চ্যাল্ডীয় এবং প্রতীচ্যে গ্রীক দর্শনের প্রভাবে, সমাজের কতিপয় শ্রেণীর মধ্যে (বিশেষ করে তাদের মধ্যে যাদের মধ্যে হেরোডের হেলেনীয় প্রবণতাসমূহ ইসরাইলীদের বক্ষ থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে) ব্যক্তিগত মসিহে প্রতিধ্বনি ছিল। কিন্তু মিলম্যান সুন্দরভাবে মন্তব্য করেছেন যে, এই সময়ে প্যালেস্টাইনের ইহুদীরা বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে মসিহের আবির্ভাবের জমকাল অথচ বিভ্রান্তিকর রূপ দিয়েছিল, যাবতীয় জিনিসের যুগপৎ পুনরুত্থান, মৃতের পুনরুত্থান এবং মসিহের রাজত্ব সম্পর্কে ধারণা গঠন করেছিল। এসব হঠাৎ ঘটে যাবে কিংবা ঘনিষ্ঠভাবে একটার পর একটা ঘটবে।[১২] ডেভিডের বংশ থেকে মসিহের আবির্ভাব হবে, তিনি গোত্রসমূহের বিক্ষিপ্ত বংশধরদেরকে একত্রিত করবেন, তাদের ঘৃণ্য বিদেশী শত্রুদের তাড়াবেন ও ধ্বংস করবেন। মসিহের অধীনে একটা পুনরুত্থান ঘটবে, তবে সেই গোত্রের পুণ্যবানদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকবে।[১৩]

এসব উন্মাদনা ও অস্পষ্ট আকিঞ্চনের মধ্যে চিরস্থায়ী জীবন ও পরকালের শান্তির আশা বিস্ময়করভাবে মিশ্রিত হয়েছিল। বাহ্যত্রাণ বিষয়ক চরম নৈরাশ্য ও উৎসাহব্যঞ্জক প্রত্যাশা জনগণের মধ্যে এমন অবস্থা বিকাশের দিকে সবসময়ে ঝোঁক দেয়। একদল লোক পশুশক্তির তিক্ত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিস্বরূপ অপার্থিব রাজত্ব, ঐশী কর্তৃপক্ষের

www.amarboi.org

অধীনে শান্তি ও নিয়মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আশা করত, অপর দল বিদেশী ও পৌত্তলিকদের রক্তে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য একই বা এক জাতীয় উপায় আশা করত।[১৪]

যে ঐতিহ্য-বিবরণীতে যীশুর বাণীসমূহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা এত বর্জন ও নির্বাচনের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়েছে যে বর্তমানে আদৌ বলা সম্ভব নয় কোনটা তাঁর বাণী কোনটা তাঁর বাণী নয়।[১৫] যদি আমরা ঐতিহ্যগুলো যেভাবে পাওয়া গেছে সে ভাবেই গ্রহন করি আর অন্যান্য ধর্মীয় দলিলসমূহ আমরা যে ভিত্তির উপর বিবেচনা করি সেই ভিত্তির উপর গ্রহণ করি (তাদের প্রকৃত মনোভঙ্গী উপেক্ষা না করে অথচ নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসীদের মতো অলৌকিক অর্থ না খুঁজে), তবে আমরা দেখতে পাই যে এইসব ঐতিহ্য বিবরণীতে সর্বত্র নতুন ব্যবস্থার অব্যবহিত আবির্ভাব, 'স্বর্গরাজ্যের আবির্ভাব' যীশুর মনে এতই প্রাধান্য পেয়েছিল যে অন্যান্য বিষয় সেই ধারণার আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। মানব-পুত্রের আবির্ভাব ঘটেছে, আল্লাহর রাজত্ব সন্নিকটবর্তী; প্রত্যেকটি আশাব্যঞ্জক শব্দের প্রধান প্রসঙ্গ এরূপ।[১৬] যে সমাজ ও সরকারকে নাজারাতে প্রেরিতপুরুষ ত্রুটিপূর্ণ ও অনিষ্টকর দেখতে পেয়েছিলেন তা পরিবর্তন করা এই স্বর্গরাজ্যের উদ্দেশ্য ছিল। কোন কোন সময় তাঁর বাণী শিষ্যদেরকে এই সিদ্ধান্তে পরিচালিত করত যে, নতুন শিক্ষাগুরু দরিদ্র ও অভুক্তদেরকে গৌরব ও সুখৈশ্বর্যে পরিচালিত করার জন্য জন্মেছেন। কাঙ্ক্ষিত খোদায়ী রাজত্বে লোকদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত ভয়ানক ভাষায় নিন্দাবাদ আরোপিত হয়েছে।[১৭] কখনো কখনো খোদায়ী রাজত্ব বলতে বুঝানো হয় মসিহের আবির্ভাবের সঙ্গে সংযুক্ত দিব্যদৃষ্টি বা দৈব স্বপ্ন। কোন কোন সময় আল্লাহর রাজত্ব বলতে বুঝায় আত্মার জগৎ এবং আসন্ন পরিত্রাণ হল এই পার্থিব অস্তিত্বের বন্ধন থেকে কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তি। এসব ধারণা একই কালে যীশুর মনে যুগপৎভাবে হাজির হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।[১৮] শক্তিশালী দলের প্রচণ্ডতা ও ধর্মান্ধতা এবং রোমান শকুনি দলের শক্তি যে কোন অব্যবহিত সামাজিক পরিবর্তন অসম্ভব করে তুলেছিল। বর্তমান উন্নতির সব আশা তিরোহিত হয়েছিল, এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা সবাইকে পেয়ে বসেছিল। যীশু অনুভব করেছিলেন যে বর্তমান অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে না এবং মানবজাতির পুনরুত্থান আসন্ন,[১৯] যখন তিনি ঐশী পোশাকে সজ্জিত হয়ে, ফেরেশতা ও নির্বাচিত শিষ্য পরিবৃত হয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় স্বর্গের মেঘের মধ্যে আবির্ভূত হবেন।[২০] মৃতেরা তাদের সমাধি থেকে উঠবে এবং মসিহ বিচারে বসবেন। ফেরেশতাগণ বিচারের রায় কার্যকরী করবেন। তিনি নির্বাচিতদেরকে জগতের সূচনা থেকে প্রস্তুত আনন্দদায়ক আবাসে পাঠাবেন। এবং পাপীদেরকে চিরস্থায়ী দোজখে প্রেরণ করবেন যেখানে শয়তান চিরস্থায়ী দোজখে ও তার দূতগণ,[২১] ক্রন্দন ও দন্তঘর্ষণ করবে। নির্বাচিত ব্যক্তিরা সংখ্যায় কম হবে,[২২] তাদের আলোকিত প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হবে, যেখানে তারা ইসরাইল জাতির পিতা দলপতি ও প্রেরিত পুরুষগণ[২৩] কর্তৃক আয়োজিত সান্ধ্যভোজে যোগদান করবেন এবং তাতে যীশুও অংশগ্রহণ করবেন।[২৪]

www.amarboi.org

যীশুর দ্বিতীয় আগমন ও মানবজাতির পুনরুত্থানসহ নতুন রাজত্বের অভিষেক বেশি দূরে নয়—একথা শিক্ষাগুরুর নিজের কথা থেকেই প্রতীয়মান হয়েছিল, যখন তিনি তাঁর শ্রোতাদেরকে আল্লাহর রাজত্বের আগমন এবং বর্তমান জীবনের কর্ম ও জরুরী বিষয়সমূহের প্রত্যেকটি ব্যবস্থার নিতান্ত অসারতার কথা প্রতিপন্ন করেছিলেন।[২৫]

যুগের পরিস্থিতিজাত মানসিকতার[২৬] সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাগুরুর বাণী তাঁর শিষ্যদের মনমগজে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল এবং সকলেই সুস্পষ্ট প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা করেছিল সেই স্বর্ণোজ্জ্বল শতাব্দী সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীর আক্ষরিক সংঘটনে যা মানবজাতির ইতিহাসে আদৌ সমকক্ষ নয়।

"যদি খ্রিস্টানদের প্রথম যুগের লোকদের গভীর ও অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস ছিল। তবে সে বিশ্বাস এই ছিল যে জগতের ধ্বংস আসন্ন এবং যীশুর মহান প্রত্যাদেশ সত্বর সংঘটিত হচ্ছে।[২৭] একমাত্র যখন ক্রিশ্চিয়ান ধর্মব্যবস্থা নিয়মিত সংগঠনে পরিণত হয়, যীশুর শিষ্যরা ইহুদি জগতের সীমানা অতিক্রম করে তাদের ধর্মমত প্রচার করতে শুরু করেন এবং স্বর্ণোজ্জ্বল যুগের কথা বিস্মৃত হন, তখন তারা গ্রীক ও রোমানদের জীবন ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং তাদের ধর্মমতের সীমানা অরণ্য থেকে আগত অগণিত বর্বরদের মধ্যে সম্প্রসারিত করেন। তারা যীশু ও তাঁর মাতাকে তাদের আদি বাসস্থানের উপাস্য ওদিন ও ফ্রেয়ারের অন্য অংশ বলে মনে করত।

কিন্তু খ্রিস্টান-জগৎ স্বর্ণোজ্জ্বল যুগের আগমনের উত্তেজনায় এবং নাজারাতের মহান প্রেরিত পুরুষের বাইবেলীয় আবির্ভাব সম্পর্কীয় প্রচণ্ড প্রত্যাশার জোয়ার-ভাঁটায় প্রায়ই আন্দোলিত হত। যা হোক, খোদায়ী রাজত্বের ধারণা কালপ্রবাহে ও চিন্তার অগ্রগতির ফলে হয় আধ্যাত্মিক রূপ নিয়েছে নয় তো মন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুছে গিয়েছে কিংবা যেখানে এই ধারণা আছে সেখানে তা বিশ্বাসীরা ব্যক্তি-মনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করেছে। ইহুদী, মাজো-জরথুস্ত্রবাদী ও খ্রিস্টানগণ সকলেই দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতেন। আদিম মুসাইজম সম্পর্কীয় অমার্জিত ধারণা প্রধানত চ্যাল্ডীয়-জরথুস্ত্রবাদী মতবাদসমূহ থেকে অনুমিত অধিকতর সুনির্দিষ্ট ধারণাসমূহকে পথ করে দিয়েছিল। আমরা জানি কিভাবে পারসিকদের মধ্যে প্রাচীন পাহাড়-পূজা, প্রাথমিক শিক্ষকদের সরল সহজ শিক্ষা ব্যাবিলনীয় যাদুকরদের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে স্তরভিত্তিক পুরস্কার ও শাস্তির জটিল ব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়েছিল—কিভাবে চ্যাল্ডীয় দর্শন মাজো-জরথুস্ত্রবাদের অন্তঃস্থলে প্রবেশ লাভ করেছিল। খ্রিস্টের পার্থিব রাজত্বের অব্যবহিত আগমনের সুস্পষ্ট বিশ্বাসসহ আদিম খ্রিস্টধর্ম চ্যাল্ডীয়, মাজো-জরথুস্ত্রবাদী ও আলেকজেন্দ্রিয় উৎস থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছিল। আর এসব প্রাচীন ধারণাসমূহের মধ্যে বিপুল রদবদল ঘটিয়েছিল। ইহুদী, খ্রিস্টান ও জরথুস্ত্রবাদী সকলেই কমবেশি ভাবী অস্তিত্বের পার্থিব পুরস্কার ও শাস্তির প্রতি নিবিষ্ট ছিল।

পুরোহিততন্ত্র পরিপুষ্ট লৌকিক খ্রিস্টীয় ধারণা—মুহম্মদ নারীজাতির আত্মা অস্বীকার করেছেন—এ ধারণা এ পর্যন্ত যা আলোচনা হয়েছে তা থেকে নস্যাৎ হয়ে যায়।

www.amarboi.org

ইসলামের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা সৃষ্টির জন্য এ ধরনের কলঙ্ক উদ্ভাবিত হয়েছিল। কিন্তু পয়গাম্বর ইবরাহিম (আঃ) তাঁর শিষ্যদেরকে হুরীসহ যে জৈবিক বেহেশতের ও স্তরভিত্তিক আনন্দের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সে ধারণা এখনও বিদ্যমান। এ অজ্ঞতা ও পুরাতন ধর্মান্ধতার নির্দশন। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে মধ্যবর্তীকালের সুরাসমূহে, শিক্ষাগুরুর ধর্মীয় চেতনার পরিপূর্ণভাবে লাভ হওয়ার পূর্বে, যে সময়ে মরুভূমির সাধারণ লোকদের বোধগম্য ক'রে নীতি-নির্ধারণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল তখন জরথুস্ত্রবাদী, সেবীয় ও তালমুদীয় ইহুদীদের মধ্যে ভাসমান কল্পনা থেকে অনুকৃত স্বর্গ ও নরকের বাস্তবধর্মী বর্ণনা পার্শ্বচিত্র হিসেবে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল—তারপর আসল সত্যকার বস্তু-বিনয়াবনত প্রেমপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ। হুরীদের ধারণা জরথুস্ত্রদের থেকে প্রাপ্ত, বেহেশতের ধারণাও।[২৮] কিন্তু দোজখে শাস্তির তীব্রতা সম্পর্কীয় ধারণা তালমুদীয় বর্ণনা নিঃসন্দেহে বাস্তবধর্মী, কোন কোন জায়গায় প্রায়শ ইন্দ্রিয়জ; তবে এসব বর্ণনা কামুকাতপূর্ণ কিংবা মুহম্মদ বা তাঁর কোন অনুসারী কিংবা অতি উগ্র আক্ষরিক অর্থকারী শিষ্যগণ এটা এভাবে গ্রহণ করেছেন বললে তা নিন্দার্হ হয়ে দাঁড়ায়। যে মদিরা কাউকে 'নেশাগ্রস্ত করে না' এবং যে সব 'পরিচারিকা নিকটবর্তী হয় না' তা ইন্দ্রিয়সুখ প্রতিবেদন করে বলে আদৌ বলা চলে না।

পরলোক সম্পর্কে ইসলামের প্রধান ধারণা এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত যে, পরলোকের জীবনে প্রত্যেক মানুষকে তার ইহ-জীবনের কাজের হিসাব দিতে হবে এবং স্রষ্টার নির্দেশ অনুযায়ী জীবন-নির্বাহের উপর নির্ভর করবে তাদের ব্যক্তিগত সুখ বা দুঃখ। তথাপি তাঁর করুণা ও অনুকম্পা অপরিসীম এবং সমভাবে সকলের উপর বর্ষিত হয়। এটা হল কেন্দ্রীয় স্তম্ভ যাকে কেন্দ্র করে ইসলামের পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধীয় বিষয় যা সকলকে বিশ্বাস করতে হয়, মেনে নিতে হয়। অন্যান্য উপাদান যা যুগের বিভিন্ন বংশ ও জাতির ভাসমান ঐতিহ্য থেকে বিধৃত ও সমন্বিত তা শুধু অতিরিক্ত। আমাদের বিচার-বিবেচনা থেকে পরলোকের পুরস্কার ও শাস্তির ধারণার মধ্যে যে আত্মগত জিজ্ঞাসা সম্পৃক্ত হয়ে আছে তা বাদ দিলে আমরা বলতে পারি যে, পারলৌকিক জীবনের যাবতীয় ধারণার মধ্যে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এসব ধারণা পৃথিবীর মানবশিক্ষাগুরুদেরকে ব্যক্তি ও জাতির আচরণ-নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হাতিয়ার প্রদান করেছে। যদিও প্রত্যেক ধর্মে কমবেশী পরবর্তী জীবনের হিসাব-নিকাশের এই মৌল নীতির বীজ রয়েছে, তথাপি সব ধর্মই জনসাধারণের উন্নয়নের নিরবচ্ছিন্ন মাধ্যম হিসেবে এর স্বরূপ অনুধাবনে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। সুকৃতির জন্য সুকৃতি একমাত্র উচ্চতর বিকাশসম্পন্ন মনের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, আর সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও অশিক্ষিত লোকদের জন্য কমবেশী বোধগম্য নিয়ন্ত্রণ সবসময়েই প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এ-সব নিয়ন্ত্রণের স্বরূপের দিকে দৃষ্টিপাত করলে অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, মূর্তিমান ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছদে ভূষিত না করে কিংবা পারলৌকিক সুখ-দুঃখের বর্ণনায়

www.amarboi.org

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সূচিত না করে মানবজাতির সাধারণ বোধের ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিক সুখ কিংবা আধ্যাত্মিক দুঃখের ধারণা দেওয়া প্রায়শ সম্ভব নয়। দর্শন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাষায় ব্যক্ত নয়, এমন বিমূর্ত ধারণা নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে। এ ধরনের উক্তি ও ধারণাসমূহ এক সময়ে খুবই প্রতিপত্তি পেয়েছিল তবে স্বপ্নবিলাসীদের একটা সীমাবদ্ধ পরিবৃত্তের বাইরে কোন প্রভাব বিস্তার না করেই তা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আর এসব স্বপ্নবিলাসীরা তাদের চিন্তার অস্পষ্টতার জগতে বাস করত।

মুহম্মদ সে-যুগ অধ্যুষিত শুধু কতিপয় ভাববাদী চিন্তাবিদদের প্রতি তাঁর আবেদন রাখেননি, পরন্তু প্রত্যেক ধরনের জড়বাদের মধ্যে নিমজ্জিত তাঁর চতুষ্পার্শ্বের বিশ্ববাসীর প্রতি আবেদন রেখেছিলেন। সকলের বোধের সঙ্গেই তিনি খাপ খাইয়েছিলেন। বর্বর বুভুক্ষু আরবদের কাছে নদীর পরিশ্রুত বিশুদ্ধ পানি, কিংবা দুগ্ধ ও মধুপূর্ণ বেহেশতের চেয়ে আর কি অধিকতর মনোরম বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে অথবা বেশুমার ফল, পর্যাপ্ত গাছপালা, ফুল, অফুরন্ত প্রাচুর্যের স্বর্গের চেয়ে অধিকতর গ্রহণযোগ্য আর কি হতে পারে? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখবর্জিত স্বর্গসুখ তিনি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। এটা সেই বাদানুবাদের বিষয় যা মুসলিম জাহান সানায়ী ও গাজ্জালীর মতো অভিমত পোষণ করে যে, বৃক্ষ, নদী, সুন্দরী অপ্সরাসহ সুন্দর অট্টালিকার উল্লেখের মাধ্যমে পার্থিব সুখের বর্ণনার মূলে গভীরতর তাৎপর্য রয়েছে এবং আল্লাহর সন্নিধানে আত্মার আধ্যাত্মিক সন্দর্শনেই প্রকৃত আনন্দ নিহিত রয়েছে, যখন মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে যে অন্তরাল রয়েছে তা বিদীর্ণ হবে এবং যখন আত্মায় স্বর্গীয় মহিমা প্রকাশের সময় দৈহিক, পার্থিব আবরণ বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এ ব্যাপারে তারা কোরআন ও সহীহ্ হাদিসের বর্ণনা সমর্থন করেন। মুহম্মদ বলেছেন, "আল্লাহর সবচেয়ে অনুগৃহীত বান্দা হবেন সেই ব্যক্তি যিনি সকাল-সন্ধ্যায় তাঁরপ্রভুর সন্দর্শন লাভ করবেন—এমন আনন্দ যা দেহের সর্বাবিধ আনন্দকে অতিক্রম করবে যেমন করে সমুদ্রের জলরাশি এক বিন্দু ঘর্মকে অতিক্রম করে।" একদা বন্ধু আবু হোরায়রার সঙ্গে আলোচনা কালে হযরত বলেছেন, "আল্লাহ তাঁর উত্তম বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস বানিয়েছেন যা কেউ দেখেনি, যা কেউ শোনেনি, যা কেউ কোনদিন কল্পনা করেনি।" তারপর তিনি কোরআনের নিম্নবর্ণিত আয়াত আবৃত্তি করলেন "কেউ জানে না—এসব লোকের চোখ জুড়ানোর জন্য যা কিছু অদৃশ্য ভাণ্ডারে মওজুদ রয়েছে তারা যে কাজ করছে তারই পারিশ্রমিক হিসেবে।"[২৯] অন্য একটি হাদিসে[৩০] উল্লিখিত আছে যে, উত্তম লোকেরা আল্লাহর মহানন্দময় সন্দর্শন লাভ করবে, যে বিষয়ে কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াতে উল্লেখ আছে বলে হযরত বলেছেন : "আল্লাহ যে শান্তির নিকেতনের দিকেই আহ্বান করছেন।" ... যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্যই তো কল্যাণ—তাছাড়া আরও পর্যাপ্ত সব রয়েছে।"[৩১]

কোরআনের উক্তিসমূহের উপদেশমূলক প্রকৃতির বিষয়ে এই চিন্তাগোষ্ঠী প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের উপর তাঁদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করেছেন : "তিনিই তো আপনার কাছে কিতাব নাজিল করেছেন, যার একাংশ আদেশসূচক আয়াতের অন্তর্ভুক্ত, তা হচ্ছে কিতাবের মূল অংশ। অপর অংশ হচ্ছে রূপক ও বিবিধ অর্থপূর্ণ আয়াত।"[৩২]

www.amarboi.org

অপরদল পরলোকের আনন্দবেদনাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মগত বলে মনে করেন। তারা বলেছেন যে, অতিমাত্রায় মানসিক যাতনা যেমন দৈহিক যাতনার চেয়েও যন্ত্রণাদায়ক, তেমনি উচ্চতর মানসিক আনন্দও যে কোন ইন্দ্রিয় সুখের চেয়ে অনেক অনেক বেশি আনন্দদায়ক। কোরআনের বর্ণনায়, দৈহিক মৃত্যুর পর ব্যক্তি-আত্মা বিশ্ব আত্মায় 'প্রত্যাবর্তন করে', যে আনন্দ-বেদনার চিত্র সুস্পষ্ট ভাষায়, প্রত্যাদিষ্ট শিক্ষক এঁকেছেন জনগণের সত্যোপলব্ধির জন্য তাহ বে মানসিক ও আত্মগত। এই গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে মুসলিম জাহানের বেশ কয়েকজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও মরমীবাদী চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটছে।

অপরদল—এই দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দল—কোরআনের সব বর্ণনার আক্ষরিক সমাপ্তিতে বিশ্বাস করে।

এসব বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশে চেষ্টা না করে পারলৌকিক পুরস্কার ও শাস্তি বিষয়ক কোরআনিক ধারণা সম্পর্কে এবার আমাদের বিশ্বাসের বর্ণনা দিতে পারি।

কোরআনকে সতর্কতার সঙ্গে অধ্যায়ন করলে আমাদের নিকট এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে যীশুর ধর্মীয় চেতনার বিকাশ যেরূপ হয়েছিল মুহম্মদের মানসিক বিকাশও একই প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হয়েছিল। মুহম্মদ ও যীশুখ্রিষ্ট দু'জনই শুধু জগতের ঐতিহাসিক যুগ-অধ্যুষিত শিক্ষক এবং সে কারণে আমরা দু'জনের সম্পর্কে একসঙ্গে আলোচনা করছি। এই বিকাশ যীশুর মধ্যে কত বিরাট রূপ ধারণ করেছিল তা তাঁর পার্থিব জীবনের শেষ প্রান্তে স্বর্গরাজ্যের আদর্শীকৃত ধারণা থেকেই শুধু সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় না, বরং অ-ইসরাইলদের প্রতি তাঁর ধারণার পরিবর্তন থেকেও প্রতীত হয়। প্রথমে[৩৩] তিনি সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ছিলেন; পরে ধর্মীয় চেতনা অধিকতর বিকশিত স্তরে তাঁর মনে বিশ্বজনের জন্য ব্যাপকতর সহানুভূতি জাগরিত হয়েছিল।[৩৪]

যেমন ঘটেছিল যীশুর ক্ষেত্রে তেমনি ঘটেছিল মুহম্মদের ক্ষেত্রে।

কোরআনের যে সব অধ্যায় বেহেশতের জমকাল বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তা রূপক বা আক্ষরিক হোক, সে অধ্যায়গুলো সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে মক্কায় নাজিল হয়েছিল। সম্ভবত ধর্মীয় চেতনার শৈশবে মুহম্মদ তাঁর চারপাশে ভাসমান ঐতিহ্যের কিছু কিছু বিশ্বাস করতেন। কিন্তু আত্মার ব্যাপক জাগরণে, বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে গভীরতর যোগ স্থাপনের ফলে তাঁর চিন্তাধারার যা কিছু পার্থিব ভঙ্গী ধারণ করেছিল তা আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত হল। শুধু কালপ্রবাহে ও তাঁর ধর্মীয় চেতনার বিকাশের ফলেই নয় বরং তাঁর শিষ্যদের আধ্যাত্মিক ধারণার অগ্রগতির ফলশ্রুতিতেও শিক্ষাগুরুর মনের অগ্রগতির সাধিত হয়েছিল। সুতরাং পরবর্তী সুরাসমূহে আমরা জানবো পার্থিব ও অপার্থিব, দৈহিক ও আত্মিক বিষয়ের সংমিশ্রণ কিভাবে ঘটেছিল। 'নদীর জলসিক্ত' উদ্যানসমূহ, চিরস্থায়ী আবাস,[৩৫] প্রাচুর্য ও মিল, বিশুষ্ক, ছায়াহীন ও জলহীন মরুভূমির বুভুক্ষু সন্তানদের কাছে খুবই মনোরম লেগেছিল যারা নিজেদের সঙ্গে ও নিজেদের চারপাশের পরিবেশের সঙ্গে

www.amarboi.org

নিরন্তর সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল।—এসব এখনও সুন্দর সুন্দর উপমার ভিত্তিভূমি। কিন্তু অনুগৃহীদের আনন্দ তাঁদের স্রষ্টার সম্মুখে চিরন্তন শান্তি ও সদিচ্ছার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বলে দেখান হয়েছে। কোরআনে বলা হয়েছে : "আর পরহেজগার মুত্তালিকগণকে বাগিচা ও নহরধারায় ঘিরে থাকবে। তোমরা এখানে প্রবেশ কর। এখানে সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে বসবাস কর। তাদের মনে যে সব আবিলতা থাকবে, সেসব আমিই দূর করে দেব। আর তারা ভাই ভাই রূপে একে অন্যের সামনা-সামনি[৩৬] আসনে বসে থাকবে। সেখানে তাদের কোন ক্লেশ হবে না, আর সেখান থেকে তাদেরকে বের করাও হবে না।"[৩৭]

নিম্নবর্ণিত অনুচ্ছেদের চেয়ে ধারণা বা উপমার ক্ষেত্রে মহত্তর বা অধিকতর মহিমাব্যঞ্জক আর কি হতে পারে কিংবা ইহজীবনও পরজীবনের স্বরূপ সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রত্যাদেশ বহনকালে হযরতের মনে বিশ্বাসের উত্তম ধারণার এর চেয়ে আর কি হতে পারে : "তিনিই তো তোমাদেরকে জলেস্থলে পরিভ্রমণ করিয়ে থাকেন। এমন কি তোমরা যখন নৌযানে আরোহন করে থাক, তখন মন্দমধুর হাওয়ায় ভর করে যাত্রীদেরকে নিয়ে এগোতে থাকে, আর তোমরা তাতে খুশী হও। কিন্তু যখনই দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে, আর চারদিক থেকেই উত্তাল তরঙ্গমালা ধেয়ে আসতে থাকে; এবারে তারা দুর্যোগে পড়েছে। তাই তারা একান্ত মনে নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহ্কে ডাকে, আর তাঁরই ইবাদত করতে থাকে। আর বলে, ইয়া আল্লাহ! আপনি যদি এই বিপদ থেকে রেহাই দান করেন, তাহলে আমরা আপনার কাছে বড়ই কৃতজ্ঞ হব। কিন্তু তিনি যখন তাদেরকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন, তখন তারা দুনিয়ার বুকে অযথা গোলমাল সৃষ্টি করে থাকে; শোন, হে মানবজাতি! তোমাদের দুষ্কৃতির পরিণাম তোমাদের উপরই বর্তাবে। পার্থিব জীবনের সম্পদ তোমরাই ভোগ করে নাও। তারপরে আমার কাছেই তোমরা ফিরে আসতে বাধ্য হবে। তখন আমি তোমাদেরকে জানাব, তোমরা যা কিছু করছিলে। এই পর্থিব জীবন, তো সেই পানির মতই, যা আমি আসমান থেকে ঝরিয়ে থাকি; তারপরে দুনিয়ার লতাপাতা, গাছপালা তার সাথে মিশল। যা মানুষ আর জীবজন্তুগুলো খেয়ে থাকে। এমন কি দুনিয়ার বুক তাতে সুন্দর শ্যামলিমায় সুশোভিত হয়ে উঠল আর দুনিয়ার বাসিন্দারা ভাবতে লাগল ঃ তারাই তো এসবের মালিক। এসবের উপরে তাদেরই কর্তৃত্ব রয়েছে। কিন্তু আমার নির্দেশ যখন দিনে কিংবা রাতে এসে পৌছায়, তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে সে জায়গা দেখে কেউ বলতে পারবে না, যে গতকালও এখানে কি ছিল। যারা চিন্তাশীল, জ্ঞানী তাদের জন্যই তো এমন বিস্তারিতভাবে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করেছি। আল্লাহতায়ালাই যে শান্তির আবাসঘরের দিকেই ডাকছেন। আর যাকে খুশী সরল সত্য সনাতন পথ দেখিয়ে থাকেন।[৩৮] যারা নেক কাজ করেছে তাঁদের জন্যই তো কল্যাণ—তাছাড়া আরও কিছু রয়েছে। তাঁদের চেহারায় কালিমা থাকবে না। তাঁরাই তো জান্নাতের বাসিন্দা—সেখানেই তারা চিরকাল বাস করবে। আর যারা অন্যায় অমঙ্গল অর্জন করেছে, তাদের

www.amarboi.org

পারিশ্রমিক হচ্ছে ঠিক কাজের পরিমাণ মোতাবিক।[৩৯] তাদের চেহারায় অপমানের কালিমা ছেয়ে থাকবে। আল্লাহতায়ালার কবল থেকে তাদেরকে রক্ষা করার মতো কেউ থাকবে না। তাদের চেহারার কালিমা—যেন ঘনঘোর রাতের এক টুকরো আঁধার দিয়ে জড়িয়ে রাখা হয়েছে।"[৪০]

নিম্নের আয়াতসমূহের চেয়ে আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতর আর কি আছে ঃ যাঁরা আল্লাহ্তায়ালার ওয়াদা সঠিকভাবে পালন করেন, আর কোন ওয়াদা মোটেই ভঙ্গ করেন না। আল্লাহ্ যাঁদেরকে মিলিয়ে রাখার জন্য আদেশ দিয়েছেন তা যাঁরা মিলিয়ে রাখেন আর নিজেদের পালনকর্তাকে ভয় করে চলেন, আর খারাপ হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে যাঁরা সন্ত্রস্ত। আর যাঁরা ধৈর্যধারণ করেছেন নিজেদের পালনকর্তার সন্তুষ্টি লাভের আশা নিয়ে, আর নামাজ কায়েম রেখেছেন, আর নেক কাজ দ্বারা অন্যায় অসৎ কাজ দূর করেন—এঁরাই তো হচ্ছে সেই দল—যাঁদের জন্য আখিরাতে বাসগৃহ নির্দিষ্ট রয়েছে—বসবাসের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাতসমূহ যেখানে তাঁরা প্রবেশ করবেন আর তাঁদের বাপ দাদা স্ত্রী-পুত্রদের মধ্যে যাঁরা নেককার হবেন তাঁরাও। আর ফেরেশতাগণ প্রত্যেকটি দরজা দিয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হবেন আর বলবেন, "তোমাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হোক, যা নিয়ে তোমরা ধৈর্যধারণ করেছিলে—তাই তো আখিরাতের এই উত্তম গৃহ।"[৪১]

মুহম্মদের পারলৌকিক জীবনের চিত্র ইন্দ্রিয়জ—এই মতবাদ যে নিতান্তই অসত্য তা যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ইসলামের আধ্যাত্মিকতার গভীরতা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার যে বিশুদ্ধতার উপর তাঁর জীবন-নীতির ভিত্তি তা দেখানোর জন্য কোরআনের নিম্নলিখিত আয়াত উদ্ধৃত করে আমরা এই অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টানব : "শোন, হে পরিতৃপ্ত আত্মা, নিজ পালনকর্তার দিকেই চলো এবারে। তুমি তাঁর উপরে সন্তুষ্ট, আর তিনিও তোমার উপরে খুশী রয়েছেন। তাই তো তুমি এবারে আমার বান্দাদের দলে শামিল হও। আর আমার জান্নাতেই তুমি প্রবেশ কর।"[৪২]

পাদটীকা

১. রলিনসন, 'হিস্ট্রী অব এনসিয়েন্ট ইজিপট' ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৩।
২. তুঃ লেনরমেন্ট, 'এনসিয়েন্ট হিস্ট্রী অব দি ইস্ট' ১মখণ্ড, পৃ. ৩১০-৩২২; এবং আলজার, 'হিস্ট্রী অব দি ডকট্রিন অব এ ফিউচার লাইফ' পৃ. ১০২।
৩. তুঃ আলজার, 'হিস্ট্রী অব দি ডকট্রিন অব এ ফিউচার লাইফ', পৃ. ১৬৭, মিলম্যান, 'ক্রিশ্চিয়ানিটি' ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫১, ১৫২।
৪. 'সাম' ৬, ৫।
৫. 'জব' ১৪, ২২; তুঃ ডালিনজার ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৯; আলজার 'হিস্ট্রী অব দি ডকট্রিন অব ফিউচার লাইফ' পৃ. ১৫১, ১৫২।
৬. মিলম্যান; 'হিস্ট্রী অব ক্রিশ্চিয়ানিটি' ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪২।
৭. আলজার যে অধ্যায়ে পরবর্তী ইহুদীধর্মের উপর পারসিক ধর্মব্যবস্থার প্রভাব বিশ্লেষণ করেছে তা দেখুন।

www.amarboi.org

৮. এতদসত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যসমাজের পুরোহিতরা সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক কল্পনার স্পষ্টতা নিয়ে নরকের বিভীষিকা ও স্বর্গের সুখবৈভবের চিত্র এঁকেছেন। শাহ্ রিস্তানীর গ্রন্থে আরব্য পণ্ডিতের বৌদ্ধ মতবাদসমূহের মূল্যায়ন নির্দেশক বিবরণের উল্লেখ আছে।—পৃ. ৪৪০।

৯. আলজার প্রাথমিক পর্যায়ের জরথুস্ত্রবাদীরা যে দৈহিক পুনরুত্থানে বিশ্বাস করত, সে বিষয়ে অনুমান করার শক্তিশালী কারণসমূহ প্রদান করেছেন। যে চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে মাজো-জরথুস্ত্রবাদীরা মৃতদেহকে বিবেচনা করত তা থেকে এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করার কোন যুক্তি নেই। খুব সম্ভব এই বিতৃষ্ণা ম্যানিকীয়দের প্রভাবজাত; দেখুন আলজার, পৃ. ১৩৮। মুহম্মদের সময়ে পারসিকগণ যে বিতৃষ্ণা নিয়ে মৃতদেহকে বিবেচনা করত তা ডলিঞ্জারকে স্মরণ করিয়ে দেয়।—২য় খণ্ড, পৃ. ৪০৯।

১০. শাহরিস্তানী এই প্রেরিত পুরুষের নাম দিয়েছেন উশিযারবেক (কিউরটন সং পৃ. ১৮৮); কিন্তু পাশ্চাত্য গ্রন্থকারদের মতে তাঁর নাম মোসিয়োশ, যাঁর পূর্বে আরও দু'জন প্রেরিত পুরুষ এসেছেন যাঁদের নাম ওমচেদার বামী ও ওমচেদারমাহ্। (ডলিঞ্জার, ৫ম, ২, পৃ. ৪০১।) দ্য ম্যাসী তাঁর নাম দিয়েছেন পাওতান (মুর ডিভ্ এন্ট দ্য লা পার্সি, পৃ. ৯৫।)

১১. এটা অপরিহার্য নয়, যেমন আলজার অনুমান করেছেন যে, যেহেতু ইহুদীগণ এসব জাতীয় উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য তাদের মধ্যে এলিজা বা অন্য কোন প্রেরিত পুরুষের পুনরাবির্ভাবের প্রতীক্ষা করেছিল, কাজেই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব যে তারা আত্মার দেহান্তরে বিশ্বাস করত।

১২. মিলম্যান, 'হিস্ট্রি অব ক্রিশ্চিয়ানিটি' ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৬।

১৩. জগতে ধর্ম ও আইনশৃঙ্খলার পরিত্রাণকারী ও সংস্কারক সম্পর্কে জরথুস্ত্রবাদী ধারণা এবং ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত 'মসিহ' বা ত্রাণকর্তার ধারণার মধ্যে সাদৃশ্যের বিষয়ে সামান্য বলতে গেলেও তা বিস্ময়কর। এটা নিশ্চিত যে ইহুদীরা জরথুস্ত্রবাদীদের কাছ থেকে এই ধারণা করেছিল; আর তাদের দুদিনে তারা স্পষ্ট ভাষায় তার বিকাশ সাধন করেছিল। কিন্তু আমি প্রবলভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হচ্ছি যে মোসিওয়ের ধারণা, তাঁর প্রেরিত তত্ত্বের ধারণা যাই হোক না কেন, পারসিকদের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল যখন তারা বিদেশী শাসনের অধীনে দুর্দশা ভোগ করছিল, তবে সেই বিদেশী শাসকরা সেমিটিক অ্যাসিরীয় বা গ্রীক ম্যাসিডোনিয় তা বলা শক্ত। যে দেশে তাঁর আবির্ভাবের দৃশ্য পরিকল্পিত হয়েছিল দ্য ম্যাসলি মতে খোরাসানের কাঙ্গুদেজ, ডলিঞ্জারের মতে কানসোয়া—এ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে পারসিকগণ তাদের দুর্দিনের দিনে সাহায্য ও পরিত্রাণের জন্য প্রাচ্য, বিশেষ করে 'সূর্যের দেশে'র দিকে নজর দিয়েছিল।

১৪. দুর্বোধ্য হলেও আধুনিকদের মতো ক্রীষ্টাডেলফিয়ান সম্প্রদায়।

১৫. মিলম্যান স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে যীশুর কার্যাবলী ও বাণীসমূহ সম্পর্কে ঐতিহ্য খ্রিস্টান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল, দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের শেষ দিকের আগে তা বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে নি। (হিস্ট্রী অব্ ক্রিশ্চিয়ানিটি' ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৬) কাজেই অনিবার্যভাবে খ্রিস্টান সুসমাচারের প্রাচীন সংগ্রাহক ও রূপদাতাগণ কিংবা মিলম্যানের বিবেচনায়, অমার্জিত ও সরল ঐতিহাসিকগণ, ঐতিহ্যের গ্রহণের ব্যাপারে অবশ্যই স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকটা বিষয় নির্বিচারবাদী ভিত্তিতে গ্রহণ করেছিলেন। "যদি কোন বর্ণনা বা পুঁথি সুর ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তাঁদের পূর্ব-নির্ধারিত ধারণার সঙ্গে মিলত, তবে তাঁরা বাহ্য প্রমাণাদিকে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক বলে মনে

www.amarboi.org

করতেন; আর যদি তা তাঁদের কাছে সন্তোষজনক মনে না হত তবে তার মূলে যতই প্রমাণ থাক না কেন তা ভ্রমাত্মক বলে বর্জিত হত।" কাজেই যীশুর বাণী ও কর্মের সঙ্গে বিপুল বিষয়বস্তু অবচেতনভাবে সংযুক্ত হয়েছিল। এ বিষয়ে অতিরঞ্জনের প্রত্যেক বর্জনসহ সেলসাসের সাক্ষ্য চূড়ান্তভাবে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে—তিনি বলেন যে খ্রিস্টানগণ তাদের ঐতিহ্যবিবরণী প্রণয়ন ও পুনর্বিন্যাসে অভ্যস্ত ছিলেন। (অরিজিন সি. সেলসাস, ii. ২৭). স্যার উইলিয়ম মুয়ির কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী কানুন ৩, পৃ. ৬১, ১মখণ্ড (লাইফ অব মোহমেট)।

১৬. ম্যাথু, ৪, ১৭, ১০, ৭ ইত্যাদি।

১৭. লুক ,৬ ২০। ম্যাথুতে 'দুর্বলচেতা' উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু লুকের সরলতর বিবৃত যাবতীয় পরিস্থিতি বিচারে অধিকতর সত্য বলে মনে হয়।

১৮. রেনান, 'ভাই দ্য জেসাস' পৃ. ২৮২।

১৯. ম্যাথু ১৯, ১৮। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে যীশু স্বয়ং দৈহিক পুনরুত্থান এবং পরকালের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করতেন। তিনি প্রায়ই তাঁর রাজ্যের 'অনুগৃহীত'দের কথা বলতেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে পানাহার করতেন। চারজন শিষ্যের নামে প্রচলিত প্রাথমিক ঐতিহ্য সতর্কতামূলক নির্বাচনের ফলে খুবই সীমিত; পরবর্তী ঐতিহ্যবাদীরা স্বর্গ ও নরকের বর্ণনাকে প্রলম্বিত করেছেন, জমকাল কল্পনায় উল্লাস প্রকাশ করেছেন, যা প্রত্যাদেশ হিসেবে চলেছে। (রেভ্‌ ২১, ৮-২১, ২২, ১, ২)। ছেলেমানুষিতে খ্রিস্টান ঐতিহ্যবাদীরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে কম যান না। জনের পোষকতায় ইরেনিয়াস কর্তৃক সরবরাহকৃত ঐতিহ্যে যীশু বলেছেন বলে ঘোষিত হয়েছে: "এমন দিন আসবে যখন এমন সব দ্রাক্ষাবৃক্ষ থাকবে, যার প্রত্যেকটি বৃক্ষে দশহাজার ডাল থাকবে, আর তার প্রত্যেকটি ডালে আবার দশহাজার মগডাল থাকবে, আর এসব ডালের প্রত্যেকটিতে দশহাজার পল্লব থাকবে এবং প্রত্যেকটি পল্লবে দশহাজার থোকা আঙুর থাকবে এবং প্রত্যেকটি ট্রিপলে ২৭৫ গ্যালন মদ পাওয়া যাবে, যখন মানুষ এসব পবিত্র ডালার একটি ধরবে তখন অন্য একটি ডালা চেঁচিয়ে বলবে, 'আমি উত্তম ডালা আমাকে নিন, আমার দ্বারা প্রভুর আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন ইত্যাদি।

২০. ম্যাথু, ১৬, ২৭; ২৪, ৩০, ৩১; ২৫, ৩১ ইত্যাদি।

২১. রেভ্‌, ২০, ১২, ১৩। তুঃ জরথুস্ত্রবাদীদের সঙ্গে তুলনীয়।

২২. ম্যাথু, ২৫, ৪১।

২৩. ম্যাথু, ৮, ১১; লুক ১৩, ২৮; ২২, ৩০।

২৪. ম্যাথু, ২৬, ২৯।

২৫. ম্যাথু. ১০, ২৩; মার্ক ১৩, ৩০; লুক ১৩, ৩৫; ম্যাথু ৬, ২৫-৩৪; ৭, ২২।

২৬. যে কঠোর শব্দ যীশু তাঁর বংশের লোকদের প্রতি প্রয়োগ করেছেন তা লক্ষ্য করুন।

২৭. রেনান, 'ভাই দ্য জেসাস', পৃ. ২৮৭। তুঃ মিলম্যান, 'হিস্ট্রী অব ক্রিশ্চিয়ানিটি' ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৮।

২৮. ফারসীতে 'ফিরদাউস' মানে স্বর্গ।

২৯. সু. ৩২ আ. ১৭; মিশকাত ২৩ তম খণ্ড, ১৩শ অধ্যায়, বিভাগ ১।

৩০. সোয়াহিব থেকে।

www.amarboi.org

৩১. সু.১০ আ. ২৬। এখানে জামাকশারী (কাশ্‌শাফ) মিশর সং ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৪ দেখুন। তিনি বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ববিদ ও চিন্তাগোষ্ঠীর মতামত আলোচনা করেছেন, বিশেষ করে মুশ্‌হাব্বাহাম ও জাবরিয়াদের মতবাদ উল্লেখ করেছেন।

৩২. সু. ৩ আ. ৫।

৩৩. ম্যাথু. ১০, ৫, ১৫, ২২-২৬।

৩৪. ম্যাথু. ২৮, ১৯ ইত্যাদি; ষ্ট্রসের 'নিউ লাইফ অব্ জেসাস্' (১৮৬৫), ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৬।

৩৫. সু. ১৩ আ. ৩৪; সু. ৪৭ আ. ১৬, ১৭।

৩৬. শান্তি ও সদিচ্ছাপূর্ণ হৃদয়ে।

৩৭. সুরা ১৫ আ. ৪৫-৪৮।

৩৮. বায়যাবী 'যাকে খুশী' বাক্যাংশটিকে 'যারা অনুতপ্ত' অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। (পৃ. ৬৭ টীকা ১, অধ্যায়-৪)। তুঃ জামাক্‌শারী (কাশ্‌শাফ)।

৩৯. লক্ষ্য করুন, পুণ্যের পুরস্কার মানুষের কাজে ঠিক অনুপাতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং তার প্রাপ্য পুরস্কারের অনেক বেশি হবে। কিন্তু পাপের শাস্তি সম্পূর্ণরূপে আনুপাতিক হবে।

৪০. সুরা ১০, আ. ২৩-২৭।

৪১. সু. ৮ আ. ২০-২৪। আগাগোড়া জামাকশারীর (কাশ্‌শাফ) আলোচনা করুন।

৪২. সু. ৮৯ আ. ২৭-৩০।

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

"ইসলামী জীবনব্যবস্থায় কোন বাধ্য বাধকতা নেই।" সু. ২ আ. ২৫৬

"যারা ঈমান এনেছে, তারা মুসলমান, ইহুদী, ছাবেয়ী কিংবা নাসারা হোক না কেন, যারা আল্লাহর উপরে ও কিয়ামতের দিন সম্পর্কে আস্থাবান আর যারা নেক কাজ করেছে, তাদের জন্যে কোনও ভয় নেই, আর, তারা শোকার্ত হবে না।"—সু. ৫ আ. ৬৯

যে অসাধারণ দ্রুততার সঙ্গে আরবের নবীর প্রচারিত ধর্ম বিশ্বে বিস্তার লাভ করেছিল তা ধর্মের ইতিহাসে এক পরম বিস্ময়কর ঘটনা। বহু শতাব্দী ধরে খ্রীষ্টধর্ম এখানে সেখানে সুপ্ত ছিল, যতদিন পর্যন্ত এ ধর্ম বহুলাংশে পৌত্তলিকতাকে গ্রহণ ও পরিপাক করেনি, যতদিন পর্যন্ত একজন অর্ধ—পৌত্তলিক নৃপতি রাজাজ্ঞা নিয়ে এর সাহায্যে এগিয়ে আসেননি ততদিন পর্যন্ত এ ধর্ম পৃথিবীর ধর্মসমূহের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। ইসলাম ধর্মের প্রচারকের মৃত্যুর ত্রিশ বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের হৃদয়ে ইসলাম আসন গেড়ে বসেছিল। এক শতাব্দী যেতে না যেতে হেরা পর্বতের গুহায় উচ্চারিত বাণী তি[illegible] মহাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়েছিল। সম্রাট সিজার ও খসরু আরবে প্রচারিত নব্য গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা রোধ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু মরুভূমির সন্তানগণ তাঁদের সাম্রাজ্য ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছিল। ইসলামের উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও জনসাধারণের মনের উপর তাঁর বিস্ময়কর প্রভাব এই অভিযোগের জন্ম দিয়েছিল যে তরবারীর ধর্ম হিসেবে ইসলাম তরবারীর দ্বারা প্রচারিত ও সমর্থিত হয়েছিল। এই বিবৃতির মধ্যে কোন সত্যতা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য আমরা ইসলামের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সম্পর্কিত পরিস্থিতি ও তথ্যসমূহ পরীক্ষা করে দেখার প্রস্তাব দিচ্ছি।

হযরতের মদিনায় আগমনের সময় আস ও খাজরাজ গোত্রদুটি বহু বছর ধরে মারাত্মক সংঘর্ষের পর কেবল এক অন্তঃসারশূন্য শান্তিচুক্তিতে উপনীত হয়েছে। যে কোন মুহূর্তে পূর্বের চেয়ে প্রবলতর শত্রুতাসহ পুনরায় যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার প্রত্যেকটি সম্ভাবনা

www.amarboi.org

উপস্থিত ছিল। ইহুদীরা জাবালার হত্যাকাণ্ডের পর মদিনায় আরবদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। তারা দ্রুততার সঙ্গে তাদের শক্তির পুনরুদ্ধার ঘটাচ্ছিল এবং প্রকাশ্যে তাদের পৌত্তলিক স্বদেশবাসীদেরকে তাদের মসীহের প্রতিশোধের কথা বলে শাসাচ্ছিল, আর নির্ধারিত সময়ে মসীহের আবির্ভাব প্রত্যাশা করছিল। যেসব পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের মধ্যে কোরাইশদের প্রভাব ছিল সর্বাধিক তাদেরকে মদিনার বিরুদ্ধে সকল হিংস্রতা দিয়ে সুগঠিত করা হল। যে মূহূর্তে হযরত মদিনাবাসীদের মধ্যে আবির্ভূত হলেন সে সময়ে যেসব উপাদান নতুন ধর্মের সমূহ বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা শাণিয়ে উঠল। মক্কার যেসব শিষ্য সাহসিকতার সাথে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং যাঁরা শিক্ষাগুরুর জন্য ও তাঁদের কাছে আনীত আলোকের জন্য সর্বহারা হয়েছিলেন আর নির্বাসন ভোগ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন সংখ্যায় স্বল্প ও শক্তিতে দুর্বল। তাঁর মদিনার শিষ্য সংখ্যাও অধিক ছিল না; আর তারা গোত্রগত হিংসা-বিদ্বেষের ফলে পরস্পর বহুধা বিভক্ত ছিল। একটি গুরুত্বপূর্ণ গোত্র মদিনার সিংহাসনের অভিলাষী একজন প্রভাবশালী দলপতির নেতৃত্বে মদিনার অভ্যন্তরে পৌত্তলিকদের সঙ্গে কাজ করছিল।[১] ইহুদীরা সম্মিলিতভাবে বিদ্বেষ ও প্রচণ্ডতার সহিত, অনিষ্টকর-নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে সকদিক দিয়ে হযরতকে বাধা দিচ্ছিল। কোরাইশরা তাঁকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল, কিন্তু তাতে তাঁর হৃদয় দমেনি, যখন অন্যান্যদের অস্তিত্ব তাঁর উপর নির্ভরশীল ছিল। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি সেই মুহূর্তে তাঁর পার্শ্বে সম্মিলিত বিভিন্ন উপাদানকে একটা সামাজিক সংগঠনে পরিণত করার কাজে লেগে গেলেন। প্রাচীন গোত্রগত বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য তিনি সালিশ নিযুক্ত করলেন; আস ও খাজরাজ গোত্র দুটির পার্থক্য দূর করলেন। তিনি ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে তাঁর ক্ষুদ্র গণপ্রজাতন্ত্রের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন এবং সব বিশ্বাসীর মধ্যে আন্তরিক সম্পর্কের বীজ বপন করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে একজন ইহুদী, সেবীয় কিংবা খ্রিস্টান যখন আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং ন্যায়নিষ্ঠভাবে কাজ করে, তখন তার জন্য কোন ভয়-ভীতি থাকবে না। যে জাতি নিকৃষ্টতম পৌত্তলিকতার গ্রন্থিতে বাঁধা পড়েছিল যে জাতির ছিল রক্তের ভীষণ রক্তমোক্ষণে তিনি সেই জাতিকে শিখিয়েছিলেন পবিত্রতা ও সত্যনিষ্ঠা, আত্মসংযম, উদারতা ও দেশপ্রেম। তিনি বলেছিলেন, "যখন কোন ব্যক্তি তার অধিকারের প্রতিদান দেয় আল্লাহ তার দোষ স্খলন করেন।" "যে ব্যক্তি ভাল কাজে মানুষের মধ্যস্থতা করেন তিনি তা দিয়ে লাভবান হন, আর যে মন্দ কাজে মধ্যস্থতা করে তার কৃতকর্মের জন্য তাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে।"[২]

যখন তিনি তাঁর জাতিকে মানবতাবাদী করার এই ঐশী দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন, তাদেরকে অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে উন্নীত করছিলেন, হীনমন্যতা থেকে পরিশুদ্ধ করছিলেন, তখন তিনি নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসা পরায়ণ শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তারা তাঁর জীবননাশ ও ধর্মের উচ্ছেদ সাধনের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল। কোরাইশদের ভাষায় পূর্বপুরুষদের ধর্মপরিত্যাগকারী, মুহম্মদ ও তাঁর অনুসারীরা বৈপ্লবিক

www.amarboi.org

ভ্রষ্টাচারসমূহের বীজ বপন করার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। সম্মিলিত আরব অবশ্যই এসব বিকৃত মস্তিষ্ক অত্যোৎসাহীদের নিশ্চিহ্ন করত যাঁরা অদৃশ্য আল্লাহর জন্য ঘরবাড়ি ও ধনসম্পদ জলাঞ্জলি দিয়েছিলেন, যাঁরা তাঁর উপাসনায় অত্যন্ত নিয়মানুগ ছিলেন, প্রেম, দানশীলতা ও মহানুভবতার সাধারণ কর্তব্যে, চিন্তা ও কার্যের পবিত্রতায় খুবই কঠোর ছিলেন। মদিনায় আগমনের পর থেকেই মুহম্মদের ভাগ্য তাঁর জ্ঞাতি, যাঁরা তাঁকে তাদের মধ্যে আহ্বান করেছিলেন ও বরণ করে নিয়েছিলেন তাঁদের সবার ভাগ্যের সাথে একত্রে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিনাশের অর্থ ছিল তাঁর পাশে যাঁরা এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের সকলেরই বিনাশ। দুর্দমন ও বিশ্বাসঘাতক পরিবেষ্টিত সমগ্র আরবদেশ জাতীয় দেবদেবীর সংরক্ষক কোরাইশদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সব মুসলিমদেরকে ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হল, মুসলমানেরা অস্ত্রধারণ না করলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। শত্রুতা তাদের উপর নিপতিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একথা মুসলমানদের নিকট বিঘোষিত হয়নি : "কাফিররা বিশ্বাসীদের রক্তের সম্পর্ক কিংবা চুক্তিকে শ্রদ্ধা করে না; যখন তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং তোমাদেরকে আক্রমণ করে। তোমরা তোমাদেরকে রক্ষা বা হিফাজত করবে; আবার আল্লাহর পথে তাদের সাথে লড়াই কর যারা তোমাদের সাথে লড়াই করছে, কিন্তু তাদেরকে প্রথমে আক্রমণ কর না নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।"[৩] মুসলমানদের কাছে প্রতিরোধ আত্মসংরক্ষণের প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছিল। আক্রান্ত হলে হয় আত্মধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য নতি স্বীকার করবে নতুবা যুদ্ধ করবে। তারা দ্বিতীয় বিকল্পটি পছন্দ করেছিল এবং দীর্ঘদিন যুদ্ধের পর শত্রুদের বশীভূত করতে সমর্থ হয়েছিল।

ইহুদীদের তীব্র শত্রুতা, পবিত্রতম অঙ্গীকারের পুনঃ পুনঃ লঙ্ঘন, অবিরাম রাজদ্রোহিতা, পৌত্তলিকদের নিকট মুসলমানদেরকে বার বার প্রতারিত করা স্বভাবত কঠিন শাস্তিতে পর্যবসিত হয়েছিল। দুর্বল ও ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার জন্য এটা অত্যাবশ্যক ছিল প্রতিহিংসামূলক শাস্তির চেয়ে প্রতিরোধাত্মক হুঁশিয়ারী হিসেবে।

অন্যথা অনুমান করবার অধিকার আমাদের নেই যে, যেহেতু জগতের কিছু সংখ্যক মহান শিক্ষক যাঁরা বিভিন্ন যুগে আবির্ভূত হয়েছেন, বিরোধী অবস্থার চাপে নতি স্বীকার করেছেন ও শাহাদৎ বরণ করেছেন, যেহেতু অন্যান্য শিক্ষক তাঁদের চিন্তায় অবাস্তব কল্পলোকের সৃষ্টি করেছেন, যেহেতু স্বপ্নবিলাসীরা জন্মেছেন, আশাবাদীরা দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করেছেন, কাজেই মুহম্মদ তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে এবং তার দায়িত্ব—ভার সম্পাদনের পূর্বেই জগৎ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে ও যে সমাজের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য এসেছিলেন তাকে বলির শিকার হতে দিতে রাজী হননি, বর্তমান যুগে যাকে 'ধারণা' বলা হয় তার বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য।

আসুন আমরা মুসলমানদের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের সঙ্গে নিজ নিজ ধর্ম প্রচারার্থে ইহুদী, খ্রীষ্টানদের এমনকি মৃদুস্বভাব পারসিকদের ভয়াবহ যুদ্ধের আলোচনা করি।

www.amarboi.org

ইহুদীদের ক্ষেত্রে আক্রমন ও উচ্ছেদ সাধন ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছিল। বরং কাউকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য তাদেরকে অভিসম্পাত দেওয়া হত।

প্রাথমিক পর্যায়ের খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে নাজারাতের প্রেরিত পুরুষ কর্তৃক প্রচারিত আত্মসমর্পণের তত্ত্ব ক্ষমতার অহমিকার মধ্যে সত্বর বিস্মৃত হল। সেদিন থেকে যেদিন থেকে খ্রিস্টধর্ম একটি স্বীকৃত শক্তি, একটি সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্ম হিসেবে পর্যবসিত হয়েছে সেদিন থেকেই তা আক্রামণাত্মক ও নির্যাতনমূলক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থকার যীশুখ্রিস্ট মুহম্মদের মধ্যে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য অঙ্কন করেছেন। যাঁরা যীশুর ঈশ্বরত্বের বিশ্বাস দ্বারা সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত তাঁরা হযরত কর্তৃক ব্যবহৃত তদীয় জাতির পুনরুত্থানের 'পার্থিব' উপায়—কথাটির মধ্যে "শয়তানি অনুভাবনা" স্বীকার করেছেন, পক্ষান্তরে অনুরূপ উপায়ের অ-প্রয়োগ (সম্ভবত ব্যবহারের জন্য সুযোগের অভাবজনিত)-কে নাজারাতের প্রেরিত পুরুষের ঐশ্বীত্বের নির্দেশক হিসেবে দেখেছেন। আমরা যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপাদন করব যে, এধরনের তুলনা অশোভন, কারণ তা এমন কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত যা শুধু ইতিহাসেই মিথ্যা নয়, বরং মনুষ্যচরিত্রের ক্ষেত্রেও মিথ্যা।

যীশু খ্রিস্ট ও মুহম্মদের জীবনের পরিস্থিতিসমূহ সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। নবুয়্যতের স্বল্পকালের পরিসরে যীশুর প্রভাব প্রধানত নিম্নস্তর ও অশিক্ষিত শ্রেণী থেকে আগত অল্পসংখ্যক শিষ্যদের মধ্যেই মাত্র সীমিত ছিল। তাদের পথ-নির্দেশের জন্য ব্যবহারিক নিয়মাবলী তাঁর প্রয়োজন হওয়ার মতো তাঁদের শিষ্যগণ সংখ্যায় বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হওয়ার বা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবশালী হওয়ার আগে, অথবা আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য নয় কোন শক্তিশালী ধর্মমতে নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ হিসেবে তারা কোন সংগঠন গড়ে তোলার পূর্বে, তিনি পুরোহিত শ্রেণীর নিষ্প্রাণ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাবাদের মাধ্যমে যে ভাবাবেগ সৃষ্টি করেছিলেন তারই শিকারে[৪] পরিণত হয়েছিলেন—এক দুর্ধর্ষ জাতির চিরস্থায়ী বিদ্বেষের খপ্পরে পড়েছিলেন। স্থায়ী আইন-কানুন শাসিত একটি জাতির মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা দ্বারা নিশ্চিত যে অবস্থা তা যীশুর শিষ্যদের ছিল না; তাঁর অনুসারীদের পক্ষে একটি সুগঠিত দলে শৃঙ্খলিত হওয়ার সুযোগ আসেনি; শিক্ষাগুরুও ব্যবহারিক গঠনমূলক নৈতিকতার নিয়মাবলী প্রণয়নের প্রয়োজন বোধ করেননি। যখন সম্প্রদায় সম্প্রসারিত হয়েছিল যখন নব্যপ্লেটোনিক জ্ঞানে সুশিক্ষিত একজন পণ্ডিত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ও সরলতা ধ্বংস করেছিল, তখনি কেবল আইন-প্রণয়নের অভাব অনুভূত হয়েছিল।

যীশুর মতো মুহম্মদও তাঁর প্রচারক ও সংস্কারক জীবনের শুরু থেকেই তাঁর জাতির শত্রুতা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সূচনাতে তাঁর অনুসারীদের সংখ্যাও ছিল নিতান্ত নগণ্য। তাঁর পূর্বেও বহু লোক পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল ধরে নাড়া দিয়েছিলেন এবং অন্তরাত্মার বাণী শুনেছিলেন। তিনিও করুণা, দানশীলতা ও প্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন।

মুহম্মদ এমন এক জাতির মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন যারা বর্বর প্রথার মধ্যে নিমজ্জিত ছিল, যারা যুদ্ধকে জীবনের অভীষ্ট মনে করত—এমন একটি জাতি যারা গ্রীক

www.amarboi.org

ও রোমকদের জড়াত্মক ও অবমাননাকর প্রভাব থেকে যেমন বহুদূরে ছিল, তাদের মানসিক প্রভাব থেকেও তেমনি বহুদূরে ছিল। তাঁর ঘোষণাসমূহ প্রথমে ঘৃণা, পরে প্রতিহিংসা গ্রহণের মনোভাব আনয়ন করেছিল, যা'হোক তাঁর শিষ্য সংখ্যায় ও শক্তিতে বৃদ্ধি পেয়েছিল; সর্বশেষে মদিনাবাসীদের আমন্ত্রণ তাঁর মহান কার্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করল। যে মুহূর্ত থেকে তিনি মহত্ত্বতার সঙ্গে প্রদত্ত আশ্রয় গ্রহণ করলেন, যে মুহূর্ত থেকে তিনি তাদের প্রশাসক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষক হওয়ার জন্য আহুত হলেন, সেই মুহূর্ত থেকে তাদের ভাগ্যের সঙ্গে তাঁর ভাগ্য একসূত্রে বাঁধা হয়ে গেল; তখন থেকে পৌত্তলিক ও তাদের মিত্রশক্তির শত্রুতা মুসলমানদের অতন্দ্র প্রহরার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। একটিমাত্র শহরকে আরবদেশের অগণিত গোত্রের সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়েছিল। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মুসলিম প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব সংরক্ষণের জন্য শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রায়ই অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ত।

আত্মসংরক্ষণের প্রবৃত্তি যা নাজারাতের মহান প্রেরিত পুরুষের[৫] হৃদয়ে কথা হয়ে উঠেছিল যখন তিনি তাঁর শিষ্যদের সংরক্ষণের হাতিয়ারের দিকে লক্ষ্য রাখতে বলেছিলেন, সেই একই প্রবৃত্তি, প্রচণ্ড শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে মজলুম মুসলমানদেরকে অস্ত্র ধারণে বাধ্য করেছিল।

মৃদু করুণা ও শক্তির মাধ্যমে ক্রমশঃ আরব্য গোত্রসমূহের সমস্ত বিচ্ছিন্নদলসমূহ এক আল্লাহর উপাসনার দিকে আনীত হল। তারপরে দেশে শান্তি স্থাপিত হল। এমন এক জাতির মধ্য থেকে তিনি উদ্ভূত হয়েছিলেন, যারা পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে উগ্রতম, যারা পূর্বের মতো এখনও প্রচণ্ড ও আবেগপ্রবণ, যারা তাদের মরুভূমির সূর্যের মতো উত্তপ্ত স্বভাবসম্পন্ন। মুহম্মদ এমন জাতির মধ্যে আত্মসংযম ও আত্মোৎসর্গের অভ্যাসে গড়ে তুলেছিলেন, যা পূর্বে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায়নি।

মুহম্মদের আবির্ভাবকালে আন্তর্জাতিক বাধ্যতাবোধ ছিল অপরিজ্ঞাত। যখন এক জাতি বা এক গোত্র অন্য জাতি বা গোত্রের উপর আক্রমণ চালাত তখন সামর্থ্যবান লোক নিধন হত, নির্দোষ লোক বন্দীত্ব প্রাপ্ত হত, গৃহদেবতা চুরি যেত।

রোমকদের আইনব্যবস্থা প্রণয়নের ক্ষেত্রে তের শত বছর সময় লেগেছিল; তাদের আইন যথেষ্ট ব্যাপক ও ধারণার[৬] দিক থেকে উন্নত হওয়া সত্ত্বেও তারা আন্তর্জাতিক নৈতিকতা বা মানবতার প্রতি কর্তব্য কুত্রাপি উপলব্ধি করতে পারেনি। পার্শ্ববর্তী জাতিসমূহকে পর্যুদস্ত করার জন্যই তারা যুদ্ধ ঘোষণা করত। যেখানে তারা সফলকাম হত সেখানে তারা জনগণের উপর তাদের ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে চাপিয়ে দিত। সন্ধির পবিত্রতা ছিল অজ্ঞাত; সুবিধামত চুক্তি সম্পাদিত ও লঙ্ঘিত হত। তাদের দৃষ্টিতে অন্য জাতির স্বাধীনতার সামান্যতম গুরুত্বও ছিল না।[৭] খ্রিস্টধর্ম প্রবর্তনে এর প্রচারক ও ব্যাখ্যাতাদের মতবাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাধ্যতাবোধ সম্পর্কে কোন পরিবর্তনই দেখা যায়নি। যুদ্ধ পূর্বের মতো বর্বরোচিত ও ধ্বংসাত্মক ছিল; বন্দীকারীরা নির্দয়ভাবে জনগণকে দাসত্বে আবদ্ধ করত। কোন দলের সর্দারের লক্ষ্যের উপযোগী হলেই চুক্তি

www.amarboi.org

সম্পাদিত কিংবা লঙ্ঘিত হত। খ্রিস্টধর্ম কখনো আন্তর্জাতিক নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করার দাবী করত না এবং তার অনুসারীদেরকে অন্ধকারে রেখে দিয়েছিল।

আধুনিক চিন্তাবিদেরা এটাকে খ্রিস্টান জীবনব্যবস্থার বাস্তব ত্রুটি, যে অসম্পূর্ণ অবস্থার মধ্যে এই ধর্ম পরিত্যক্ত হয়েছিল সে অবস্থা স্বাভাবিক মনে করার পরিবর্তে তা সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। মানব-প্রজ্ঞার এ এক অদ্ভুত বিকৃতি। কাজেই, যা ব্যক্তির ক্ষেত্রে যথোচিত বলে বিবেচিত তা জাতির ক্ষেত্রে অনুচিত বলে বিবেচিত এবং বিপরীতক্রমেও তা সত্য। ধর্ম ও নৈতিকতা, দুটি রূপান্তরযোগ্য পদ আইনের জগৎ থেকে দূরে রাখা হয়েছে। ধর্মব্যষ্টি মানুষের বন্ধন নিয়ন্ত্রণের দাবী রাখে, বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ক উপেক্ষা করে। এরূপে ধর্ম স্রেফ ভাবাবেগ, উচ্ছ্বাস প্রবণতার বিষয় কিংবা বিতর্ক সভায় পারস্পরিক গুনকীর্তনে পর্যবসিত হয়, অবশ্য কোন কোন সময় তা দার্শনিক নৈতিকতার মর্যাদায় উন্নীত হয়।

জাতিকে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যে এবং জাতির জন্য এক মানদণ্ড, আর ব্যক্তির জন্য অন্য মানদণ্ড নেই—এই সত্যের স্বীকৃতির মধ্যে নিহিত রয়েছে আন্তর্জাতিক বাধ্যতাবোধের ভিত্তি। কেননা ব্যষ্টি নিয়ে যেমন জাতি, জাতি নিয়ে তেমনি মানবতা; কাজেই জাতিসমূহ ও তাদের পারস্পরিক কর্তব্যবোধ কোনভাবেই ব্যক্তি-মানুষের পারস্পরিক কর্তব্যবোধ থেকে পৃথক নয়।[৮]

একথা সত্য যে, পাশ্চাত্যে লাতিন গির্জার অভ্যুদয় এবং রোমের বিশপের ক্ষমতার অপরিহার্য সম্প্রসারণ ল্যাতিন খ্রিস্টান জগতে কিছু পরিমাণে আন্তর্জাতিক দায়িত্ববোধের সূচনা করেছিল। কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে রোমের গির্জার সমর্থকদের প্রতি সীমাবদ্ধ ছিল; তা কোন বিশেষ উপলক্ষে গ্রীক খ্রিস্টানদের প্রতি অনুগ্রহ হিসেবে মঞ্জুর হত। অবশিষ্ট বিশ্ব শর্তহীনভাবে এরূপ দায়িত্বের হিতকারিতা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। "ধর্মের নামে দুর্বল জাতিসমূহের উপর আক্রমণের ভিত্তিও যথার্থ প্রতিপাদন করা হত ধর্ম তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন ও দাসত্ব বরণে বাধ্য করত।" প্রত্যেকটি নীতি লঙ্ঘন গির্জা কর্তৃক শুদ্ধিকৃত হত; চরম পাপের ক্ষেত্রে পোপ কর্তৃক পাপস্খলন অপরাধীর স্বর্গের পথ পরিষ্কার করে দিত। গির্জার পরিপূর্ণ অনুমোদনে শার্লামেঙ্গের প্রথম বলিসমূহ থেকে শুরু করে আমেরিকার নিরাপরাধ বংশসমূহের ধ্বংস ও দাসত্বে পরিণত করণের মধ্যে মানবজাতির আন্তর্জাতিক কর্তব্য ও দাবীর এক অবিরাম লঙ্ঘন কাজ করে এসেছে। দানশীলতার মৌল নীতিসমূহের প্রতি নিতান্ত অবমাননা যীশুর সেই সব শিষ্যের প্রতি নির্যাতন নিয়ে এসেছিল, যারা গির্জা থেকে স্বতন্ত্রভাবে চিন্তাভাবনার সাহস করত।[৯]

প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমত উদ্ভবের ফলেও অবস্থার কোন হেরফের ঘটেনি। বিভিন্ন-ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ ও পারস্পরিক নির্যাতন একটা ইতিহাসের সৃষ্টি করেছে। হাল্লাম বলেছেন, "সংশোধিত গির্জার মারাত্মক মৌলিক পাপ হল নির্যাতন, যা একজন সৎ লোকের ধর্মের প্রতি আগ্রহ ততটা কমিয়ে দেয় যতটা তার অধ্যয়ন অগ্রসর হয়।"[১০]

কিন্তু যত বেশি হোক না বিভিন্ন নবজাত গির্জা পরস্পর ভিন্ন মতাবলম্বী ছিল অথবা রোমের গির্জা থেকে ভিন্ন মতাবলম্বী ছিল ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ে, তবে খ্রিস্টান-জগতের

www.amarboi.org

বহির্ভূত সকল জাতির স্বার্থ ও অধিকারের প্রশ্নে সম্পূর্ণ অভিন্ন মতাবলম্বী ছিল।[১১]

পক্ষান্তরে, ইসলামের প্রাণধর্ম বিচ্ছিন্নতার বিরোধী। তুলনামূলকভাবে এক সংকৃত যুগে যখন জগৎ নৈতিক ও সামাজিক তমসায় আচ্ছন্ন ছিল। তখন মুহম্মদ সাম্যের যে সব নীতি প্রচার করেছিলেন তা অন্যান্য মতে শুধু অর্ধ-উপলব্ধ হয়েছে, এবং তিনি যে সব আইন জারি করেছিলেন তা বিস্তৃতি ও মহত্ত্বের দিক দিয়ে যে কোন ধর্মের আইনের সঙ্গে তুলিত হতে পারে। একজন সমর্থ লেখক বলেছেন, "ইসলাম তার ধর্ম পেশ করেছিল, জোরপূর্বক বলবৎ করেনি; আর সে—ধর্ম গ্রহণের ফলে বিজেতা ও বিজিত একই অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল; বিজিত রাজ্যসমূহ সে সব অবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছিল যা মুহম্মদের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে প্রত্যেক বিজেতা বিজিতদের উপরে আরোপ করত।"

ইসলামের আইনে বিবেকের স্বাধীনতা ও উপাসনার স্বাধীনতা মুসলিম রাষ্ট্রে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদেরকে দেওয়া হয়েছিল। "ধর্মে কোন জোরজুলুম নেই"[১২] কোরআনের এই আয়াত ইসলামে অনুসৃত সহনশীলতা ও উদারতার নীতির সাক্ষ্য দেয় "যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করতেন তবে সবাই একসঙ্গে বিশ্বাসী হত।" "তোমরা কি তাদেরকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করবে যেখানে বিশ্বাস শুধু আল্লাহর নিকট থেকে আসে?" "যারা তোমাদেরকে পরিত্যাগ করে তাদের সঙ্গে লেগে থাক; তোমার হৃদয়ের কাছে তুমি সত্য হও, যারা তোমার প্রতি মন্দ করে তাদের প্রতি কল্যান কর"—যে শিক্ষকের জীবন-নীতি এগুলো, সেই শিক্ষককে ধর্মান্ধতা ও অসহিষ্ণুতার দোষে অভিযুক্ত করা হয়েছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে এই উক্তিগুলো শক্তিহীন অত্যোৎসাহীর কিংবা বিরোধী শক্তির চাপে আড়ষ্ট কোন দার্শনিক স্বপ্নবিলাসীর নয়। এই বাক্যাবলী এমন এক ব্যক্তির মুখনিঃসৃত যিনি তখন শক্তির শীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করছেন, যিনি যথেষ্ট শক্তিশালী ও সুগঠিত রাষ্ট্রের প্রধান, যিনি তাঁর বিখ্যাত তরবারীর সাহায্যে তাঁর মতবাদ বলবৎ করতে সমর্থ।

রাজনীতির মতো ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী সহনশীলতার বাণী প্রচার করেছে যতদিন পর্যন্ত তারা শক্তিহীন ও দুর্বল রয়েছে। যে মুহূর্তে তারা যথেষ্ট শক্তি অর্জন করেছে, এমন শক্তি যার সাহায্যে তারা যাদের অতিক্রম করতে চায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে, তখন সহনশীলতা জুলুমের কাছে নতি স্বীকার করেছে। সিজারের সিংহাসনে কনস্ট্যানটাইনের আরোহণের ফলে খ্রিস্টধর্ম নিগ্রহের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু সেই সময় থেকে এমন রীতির ধর্মীয় নির্যাতন শুরু হয়, নিষ্ঠুরতার দিক দিয়ে যা একমাত্র ইহুদীদের নির্যাতন-পদ্ধতির অনুরূপ। লেকি বলেছেন, "যে মুহূর্ত থেকে কনস্ট্যানটাইনের অধীনে গির্জা দেওয়ানী ক্ষমতার অধিকারী হয় তখন থেকেই ইহুদী, ধর্মত্যাগী ও পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে নির্যাতনের সাধারণ নীতি অনুমোদিত ও কার্যকরী করা হয়।"[১৩] তাদেরকে নির্মমতার কারুকার্যসহ নির্যাতন করা হত। তাদেরকে ধীর-প্রজ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ করা হত যাতে তারা চিন্তা করতে পারে যীশুর ধর্মে উদারতা ও মানবতা কম। প্রত্যেক 'ফাদার' নির্যাতনের পবিত্রতা সম্পর্কে লিখেছেন। গির্জার অন্যতম

www.amarboi.org

প্রধানতম সেন্ট, "কোমলতম ও অতুলনীয় ধর্মনিষ্ঠার অধিকারী" নিষ্ঠুরতম নির্যাতনের স্বপক্ষে যুক্তি সরবরাহ করেছেন। ইউরোপে উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে আসুরিক যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময়ে ধর্মসংস্কারক নেতাদের কাছ থেকে কর্তৃত্ব লাভ করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে উৎসাহিত করার ব্যাপারে ইতস্ততঃ করেনি[১৪]—ধর্মের নামেও "যীশুর মহিমা কীর্তনের" জন্য ধর্মত্যাগী ও পৌত্তলিকদের নির্মূল করণের ব্যাপারে অনুমোদন দিতে ইতস্ততঃ করেনি। এ সবের খ্রিস্টানী মানবতা অথবা জাতিসমূহের আইন কিংবা এখনকার কালা আদমীদের উপর কোন দাবী ছিল না। পঞ্চদশ শতকে পোপ একটি বিশেষ সনদ প্রদান করেন যার ফলে সার্বভৌম ক্ষমতাসহ পর্তুগীজ ও স্পেনিশদেরকে অ—খ্রিস্টান জগৎ প্রদান করা হল, অধিবাসীদেরকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে যেভাবেই তারা তা করুক না কেন। ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করছে কিরূপ উদারতার সাথে এই অনুমতি পরিকল্পিত হয়েছে। নির্যাতন ও অ-খ্রিস্টানদের প্রতি আচরণ সম্পর্কে সমুদয় নির্মম মতবাদগুলো অন্যায়ভাবে যীশুর বাণীর উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রভু কি বলেননি "খ্রিস্টধর্মের ছায়াতলে আসতে তাদেরকে বাধ্য কর"?

তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম বিজয়ের মুহূর্তে, যখন আরবের নবী মক্কার প্রাচীন উপাসনালয়ে প্রবেশ করলেন ও মূর্তিসমূহ ধ্বংস করলেন, তখন তিনি ক্রোধে বা ধর্মীয় উন্মত্ততায় নয়, বরং করুণায় বলেছিলেন, "সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত"। তিনি দরিদ্র ও দুর্বলদেরকে আশ্রয় প্রদান ও পলাতক দাসদেরকে মুক্তিদানসহ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন।

মুহম্মদ সহনশীলতার কথা শুধু প্রচারই করেননি তিনি তা আইনের মধ্যে রূপ দিয়েছিলেন। সব বিজিত জাতিকে তিনি উপাসনার স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাদেরকে তাদের ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের জন্য নামমাত্র কর প্রদান করা হত।[১৫] কর দেওয়া একবার সাব্যস্ত হলে তাদের ধর্মের কিংবা বিবেকের স্বাধীনতার সঙ্গে যে কোন প্রতিবন্ধকতা ইসলামী আইন-এর সরাসরি লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হত।[১৬] এতখানি কি অন্যান্য ধর্মমত সম্পর্কে বলা যায়? তরবারির সাহায্যে ধর্মান্তরিতকরণ মুহম্মদের মানস-প্রবণতার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল এবং ধর্মমত সম্পর্কে ঝগড়া ফ্যাসাদ করা তাঁর কাছে ঘৃণার ছিল। পুনঃ পুনঃ তিনি স্বোচ্ছাসে বলেছেন, "তোমরা যে বিষয় জান না তা নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ কর কেন? উত্তম কাজে পরিপূর্ণতা লাভ করার চেষ্টা কর; তোমরা যখন আল্লাহর সকাশে ফিরে যাবে তখন তিনি তোমাদের বলে দেবেন যাতে তোমরা মতপার্থক্য প্রকাশ করেছিলে।"

এখন আমরা হযরতের যুদ্ধগুলোর পরীক্ষায় ফিরে যাব। আমরা দেখেছি যে মুহম্মদের নেতৃত্বে পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহের সঙ্গে মুসলমানদের সংঘর্ষ পৌত্তলিকদের আক্রমণাত্মক ও প্রচণ্ড শত্রুতার ফলে সৃষ্ট, এবং মুসলমানদের আত্মরক্ষার জন্য তা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

মুতার যুদ্ধ ও তবুক-অভিযান—বিদেশি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আদিম প্রতিবাদ—এর মূলে ছিল গ্রীকরা একজন মুসলমান দূতকে হত্যা করেছিল। সম্ভবতঃ আমরা শুনতে পারতাম

www.amarboi.org

না যে ইসলাম তরবারির দ্বারা প্রচারিত, যদি মুসলমানেরা প্রাচ্যের খ্রিস্টানদেরকে এই হত্যার জন্য শাস্তি প্রদান না করত। মুতার যুদ্ধ অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছিল; তবুকের অভিযান সম্পূর্ণরূপে রক্ষণাত্মক ছিল (হিরাক্লাইটাসের বাহিনীসমূহকে প্রতিরোধ করার জন্য এই যুদ্ধ আয়োজিত হয়েছিল), হযরতের জীবদ্দশায় এই আন্তর্জাতিক অপরাধের শাস্তি হয়নি; কিন্তু তাঁর অনুসারীরা একথা বিস্মৃত হননি, এবং তারা এর সমুচিত শাস্তি দিয়েছিল।

গ্রীক সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি খ্রিস্টান জগতের এক বৃহদাংশের সঙ্গে মুসলমানদেরকে যুদ্ধাবস্থার মধ্যে টেনে এনেছিল। এছাড়া, বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের ক্ষয়িষ্ণু সার্বভৌমত্বের অধীনে প্রদেশ-সমূহের গর্ভণরদের অস্বাভাবিক অবস্থায় মুসলিম প্রধানদের পক্ষে তাদের কোনও একজনের সঙ্গে শান্তি-সন্ধি স্থাপন করে এ ধরনের অবস্থার অবসান ঘটানো অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। একজনকে পর্যুদস্ত করে তার সঙ্গে আপোষে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার পূর্বেই আরেকজন এমন শত্রুতামূলক কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ল যার ফলে তার শাস্তি প্রদানের জন্য মুসলমানেরা বাধ্য হল। কাজেই একবার তারা যে কার্যক্রমে প্রবেশ করেছিল তার পরিণতিতে প্রায় সমগ্র খ্রিস্টান-জগতের সঙ্গে তারা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল।[১৭]

যেমন খ্রিস্টানদের মধ্যে তেমনি মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম প্রায়ই উচ্চ অভিলাষী প্রধানদেরকে তাদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার ওজর হিসেবে কাজ করেছে। খ্রিস্টান আইনজ্ঞ ও পাদরীদের ন্যায় মুসলমান যুক্তিবিদেরা জগতকে দু'টি এলাকায় ভাগ করেছেন—'দারুল হার্ব' এবং 'দারুস্ সালাম'—পৌত্তলিক জগৎ ও খ্রিস্টান জগতের অনুরূপ। যেমন মৌল-নীতির উপর অ-মুসলিম দেশের সঙ্গে মুসলিম রাষ্ট্রের সম্পর্ক নির্ভরশীল তা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, খ্রিস্টান লেখকগণ আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে যে উদারতা দেখিয়েছেন তার চেয়ে অনেক, অনেক গুণ উদারতা মুসলমানেরা দেখিয়েছেন। একমাত্র সাম্প্রতিককালেও অবস্থার চাপে অ-খ্রিস্টান রাষ্ট্র "জাতিসঙ্ঘে" যোগদানের অনুমতি পেয়েছে। পক্ষান্তরে, মুসলিম আইনবিজ্ঞানীরা যুদ্ধাবস্থা ও শান্তি-অবস্থার মধ্যে তফাত করেছেন। কাজেই 'দারুল হার্ব'[১৮] বলতে সেইসব দেশকে বুঝাচ্ছে, যার সঙ্গে মুসলমানেরা যুদ্ধরত রয়েছে, আর যেসব দেশের সঙ্গে তারা শান্তি চুক্তিতে অবস্থান করছে তা হল 'দারুল আমান'[১৯]। 'হার্ব', দারুল হার্বের অধিবাসী, তারা সহজ ও স্বাভাবিক অর্থে বিদেশী। সুস্পষ্ট অনুমতি ছাড়া কোন হার্বীর ইসলামী রাষ্ট্রে প্রবেশের অধিকার নেই। কিন্তু একবার সে যখন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা (আমান) প্রাপ্ত হয় তা কোন দীনতম মুসলমানের কাছ থেকে হোক না কেন,তখন সে এক বৎসরের জন্য অবমাননার হাত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে। নির্ধারিত সময় শেষ হলে সে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য। 'দারুল আমানে'র অধিবাসী 'মুস্তামিন' নামে পরিচিত। নিরাপত্তা চিরকালের জন্য বা কোন নির্দিষ্ট কালের জন্য হতে পারে। যতদিন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বলবৎ থাকবে, ততদিন মুস্তামিনের আচরণ তার দেশের চুক্তির শর্তানুযায়ী

www.amarboi.org

নিয়ন্ত্রিত হবে।[২০] মুস্তামিনরা তাদের নিজেদের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তারা কর প্রদান থেকে মুক্ত ছিল এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত।

আক্রমণাত্মক মনোভাব কখনও সেই বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত হয় না যা আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মসহ জাতির আইনের মধ্যে স্থান লাভ করে। মুহম্মদের শিষ্যগণ তাদের শক্তির প্রাচুর্যের মধ্যেও তাদের শত্রুদের বলতে সদা প্রস্তুত ছিল ঃ "আমাদের সঙ্গে সব শত্রুতা বন্ধ কর এবং আমাদের মিত্র হয়ে যাও, আমরা তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব; কিংবা আমাদেরকে কর দাও আমরা তোমাদের যাবতীয় অধিকার নিশ্চিত করব ও রক্ষা করব; কিংবা আমাদের ধর্ম গ্রহণ কর। আমরা যে সব অধিকার ভোগ করি তোমরাও তাই ভোগ করবে।"

মুহম্মদের যে প্রধান প্রধান নির্দেশের উপর মুসলমানদের যুদ্ধ-নীতির ভিত্তি স্থাপিত তা জ্ঞানবত্তা ও মানবতার নির্দেশক, তা ইসলামের জীবন ব্যবস্থাকে প্রাণবন্ত করেছে। "যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের সঙ্গে আল্লাহর ধর্মের জন্য লড়াই কর; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না (প্রথমে আক্রমণ করে), কারণ আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না ... যদি তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করে তবে তাদেরকে হত্যা কর। যদি তারা বিরত হয় তাহলে একমাত্র শিরক ছাড়া তাদের সঙ্গে কোন ব্যাপারে শত্রুতা নেই।"[২১]

পারস্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারনের ক্ষেত্রেও মুসলমানেরা পরিস্থিতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। মুনাজির—অর্ধ-আরব রাজবংশ—যারা পারস্যের সম্রাটের ছত্রছায়ায় রাজত্ব করত, তারা রাজনৈতিক দিক দিয়ে বিরোধী হলেও ধর্ম ও স্বার্থের বন্ধনে বাইজানটাইনদের মিত্র ছিল। গ্রীকদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রথম বিরোধ স্বাভাবিকভাবে মুনাজিরদের প্রজা, হিরাবাসীদের উপর প্রতিক্রিয়া করেছিল। হিরাইতিদের রাজ্যসমূহ এক বিশাল অংশে বিস্তৃত ছিল—পশ্চিমে ইউফ্রেতিসের তীর থেকে, ইরাকের মরুভূমি নিয়ে ঘাসানিয়া আরবদের পশুচারণভূমি পর্যন্ত; এই ঘাসানিয়াগণ বাইজানটাইনদের বশ্যতা স্বীকার করত।

পারসিকদের অধীনে হিরার অবস্থা অগাস্তাস বা তাইবেরিয়াসের অধীনে জুডিয়ার অবস্থার অনুরূপ। মুসলিম অভিযানের উপক্রমকালে একজন মনোনীত পারসিক শাসনকর্তা এই অঞ্চল শাসন করতেন। কিন্তু খসরুর বিদ্বেষের ফলে একজন মার্জবান। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে মুনজিরদের উত্তরাধিকারীর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল, যে মার্জবানদের প্রজাগণ আজকের তাদের বংশধরদের মতোই নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত ছিল। তারা প্রতিবেশী গোত্রসমূহের মধ্যে লুণ্ঠন কার্য চালাত এবং এইভাবে তারা মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতায় জড়িয়ে পড়ল। একজন শাসকের অধীনে এক শক্তিশালী সরকার, হযরতের মৃত্যুর পর যাযাবরদের বিদ্রোহ দমন করে যা দ্বিগুণ সংহত ও দৃঢ়ীভূত হয়েছিল, তার পক্ষে এক ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের এক ক্ষুদ্র অধীন রাজ্যের অপমান নীরবে সহ্য করার কোন ইচ্ছাই ছিল না। মুসলিম বাহিনী হিরা আক্রমণ করল; 'মার্জবান', পারস্য সাম্রাজ্যের

www.amarboi.org

রাজধানী মাদাইনে পালিয়ে গেল এবং আরব প্রধান এক প্রকার যুদ্ধ ছাড়াই খালিদবিন ওয়ালিদের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করল।

হিরা অভিযান মুসলমানদেরকে খসরুর সাম্রাজ্যের দ্বার-প্রান্তে নিয়ে এল। বিদ্রোহাত্মক হত্যা ও নির্মমতা চিহ্নিত দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের যুগ পার হয়ে পারস্য ইয়েজদেজার্দের মধ্যে একজন শক্তিশালী শাসক পেয়েছিল। এই নৃপতির নির্দেশক্রমে পারস্যের সেনাপতি মুসলমানদের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য এক বিপুল বাহিনী আনয়ন করল। মহান ওমর তখন মদিনার খলিফা; ইয়েজদেজার্দের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের পূর্বে তিনি তাঁর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে তাকে কতকগুলো স্বাভাবিক শর্ত জানালেন যার মাধ্যমে যুদ্ধ এড়ান যেতে পারত। এসব শর্ত হল ইসলাম গ্রহণ যার মাধ্যমে শাসানিয়া সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক পঙ্কিলতার ফলে যে নিম্নস্তরে নেমে গেছে তার থেকে সংশোধন হওয়া; যাবতীয় করের গুরুভার ও উপরি পাওনা[২২] হ্রাস বা জাতির জীবনীশক্তি শুষে নিয়েছিল; আর মুহম্মদের পদমর্যাদা নির্বিশেষে আইনের দৃষ্টিতে সমান। বিকল্প প্রস্তাব হল সংরক্ষণের জন্য রাজস্ব প্রদান। পারস্য সম্রাট অবজ্ঞাভরে এ সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং কাদেসিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হল। মাদাইন বিজয়ের পর খলিফা নির্দেশ জারী করলেন যে কোন অবস্থাতেই মুসলমানেরা পূর্বদিকে তাইগ্রিস নদী অতিক্রম করতে পারবে না এবং এই নদী চিরতরে পারস্য সাম্রাজ্য ও আরব সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা হিসেবে কাজ করবে। এই ভিত্তির উপর সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল। ইরান মেসোপটেমিয়া হারানোর জন্য উত্তেজিত হয়েছিল এবং পারসিকদের বারংবার বিশ্বাস-ভঙ্গের জন্য নেহাবন্দের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কেসরার ক্ষমতা অপূরণীয়ভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল; তার অনেক পারিষদ ও পুরোহিতদের একমাত্র স্বার্থ ছিল বিশৃঙ্খলা ও জুলুমের রাজত্ব চালু রাখা—তারা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল—তিনি অপর দারিউসের মতো আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিলেন। জাতি স্বাধীনভাবে মুসলমানদেরকে তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বাগতম জানিয়েছিল।[২৩] তাইগ্রিস থেকে এলবুর্জ এবং এলবুর্জ থেকে ট্রান-সোকসিয়ানা পর্যন্ত মুসলমানদের অগ্রগমন ভারতে ব্রিটিশের অগ্রগমন থেকে স্বতন্ত্র ছিল না এবং মূলীভূত কারণও একরূপ ছিল।

মুহম্মদের ধর্মে পারসিকদের সাধারণ ধর্মান্তকরণ প্রায়শ ইসলাম ধর্মের অসহিষ্ণু চরিত্রের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু ধর্মান্ধতায় এমন কি বিশেষজ্ঞরাও ভুলে যান যে পরিস্থিতির মধ্যে মুসলমানেরা ঐ দেশে প্রবেশ করছিলেন। জনগণের ভেতর থেকে ধর্মীয় জীবনের যাবতীয় নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল; জনসাধারণ উৎসন্ন পুরোহিততন্ত্র ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ অভিজাততন্ত্র নিকৃষ্ট মন্দের দ্বারা নিস্পেষিত হয়েছিল। মাজদাকীয় ও ম্যানীকীয় বিরুদ্ধ মতবাদ সমাজ-সংগঠনের প্রত্যেকটি স্তম্ভকে শ্লথ করে দিয়েছিল। কেসরা আনওশিরওয়ান কিছুকালের জন্য সমাজের সর্বপ্লাবী ভাঙন রোধ করেছিলেন মাত্র।

ফল হল এই যে যখনি মুসলমানেরা আইন-শৃঙ্খলার পূর্বদূত হিসেবে সে দেশে প্রবেশ লাভ করেছে তখনি জনসাধারণ এক যোগে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং পারস্য ইসলামের প্রতি চির অনুরক্ত হয়েছে।[২৪]

www.amarboi.org

একজন নিরপেক্ষ তথ্য বিশ্লেষণকারী এখন মূয়িরের নিম্নোক্ত মন্তব্যের মধ্যে কি পরিমাণ সত্য নিহিত আছে তা নিজেই বিচার করতে সমর্থ হবেন : "ইসলামের স্থায়িত্বের জন্য তার আক্রমণাত্মক পন্থা নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসৃত হওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল, সার্বজনীন স্বীকৃতির দাবী অন্ততঃপক্ষে সার্বজনীন প্রভুত্বের দাবী তরবারির সাহায্যে বলবৎ হয়েছিল।"[২৫] প্রত্যেক ধর্ম বিশেষ স্তরে তার প্রচারকদের প্রবণতার দিক দিয়ে আক্রমণাত্মক হয়েছে। ইসলামের ক্ষেত্রেও এরূপ হয়েছে, তবে বলপূর্বক কোন সময় এ ধর্ম ধর্মান্তরিতকরণে অগ্রসর হয়েছে অথবা অন্যান্য ধর্মের চেয়ে অধিকতর আক্রমণাত্মক হয়েছে—এ কথা অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতে হবে।[২৬]

ইসলাম আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করেছিল এবং ভবিষ্যতেও একই কারণে অস্ত্র ধারণ করবে। কিন্তু ইসলাম কোনদিনই কোন নৈতিক বিশ্বাস সংক্রান্ত মতবাদের সঙ্গে বিরোধিতায় লিপ্ত হয়নি; কখনও জুলুম করেনি, কখনও সরকারি তদন্ত স্থাপন করেনি। এ কখনও মতানৈক্যকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারবার কোন উপায় উদ্ভাবন করেনি, মানুষের বিবেককেও গলাটিপে মারবার বা বিরুদ্ধ মতবাদকে নির্মূল করবার কখনও কোন চেষ্টা পায়নি। ইতিহাসের প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তিই একথা অস্বীকার করতে পারেন না যে খ্রিস্টের গির্জা যখন সর্বাপেক্ষা অভ্রান্ত হিসেবে ভাণ করেছে তখন সে "নির্দোষ মানুষের যতটা রক্তপাত করেছে জগতের কোন প্রতিষ্ঠান ততটা করেনি"; যে সব নরনারী খ্রিস্টের গীর্জা পরিত্যাগ করেছিল কিংবা যারা শুধু অন্য ধর্মমতের স্বপক্ষে তাদের অগ্রাধিকার ব্যক্ত করেছিল তাদের ভাগ্য কম নিষ্ঠুর ছিল না।[২৭] ১৫২১ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চম চার্লস্ আইন করে সব ধর্মত্যাগীর জীবন ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। অগ্নিদগ্ধ করা ও ফাঁসী দেওয়া, জিহ্বা তুলে ফেলে দেওয়া ও বিকৃত করা ছিল গোঁড়া খ্রিস্টধর্ম পরিত্যাগ করার স্বাভাবিক শাস্তি। ইংল্যান্ডে প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টধর্ম গৃহীত হওয়ার পর প্রেজবিটেরিয়ান পুরোহিতদেরকে দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন রাজার অধীনে বন্দীদশা ভোগ করতে হত, তাদের গায়ে উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা দিয়ে দাগ দেওয়া হত, তাদের অঙ্গচ্ছেদন করা হত, তাদেরকে কষাঘাত করা হত এবং পিলোরিতে[২৮] শাস্তি দেওয়া হত। স্কটল্যান্ডে তাদেরকে পর্বতের উপরে অপরাধীদের মত্যো শিকার করা হত; মূল থেকে কান উপড়িয়ে ফেলা হত; উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে তাদের গায়ে ছাপ দেওয়া হত; হেচকা টানে বৃদ্ধাঙ্গুলি থেকে তাদের আঙ্গুলগুলো ছিঁড়ে ফেলা হত; এক প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে তাদের পায়ের হাড়গোড় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেলা হত। মেয়েলোকদেরকে প্রকাশ্যে রাস্তায় বেত্রাঘাত করা হত। ক্যাথলিকদের উপর নির্যাতন চালান হত, তাদের ফাঁসীতে ঝুলান হত। অ্যানাব্যাপটিস্ট ও অ্যারিয়ানদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত। কিন্তু অ-খ্রিস্টানদের সম্পর্কে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট, গোঁড়া ও অ-গোঁড়া সকলেই সম্পূর্ণরূপে একমত ছিল। মুসলমান ও ইহুদীরা খ্রিস্টান জগৎ বহির্ভূত ছিল। ইংল্যান্ডে ইহুদীদের উপর জুলুম করা হত, তাদেরকে ফাঁসী দেওয়া হত। স্পেনে মুসলমানদেরকে পুড়িয়ে মারা হত। খ্রিস্টান ও ইহুদী, খ্রিস্টান ও "বিধর্মীদের" মধ্যে বিবাহ হলে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়ে যেত; বাস্তবিক ভয়ানক

www.amarboi.org

ও ভীতিব্যঞ্জক শাস্তির অজুহাতে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি এখনও খ্রিস্টান আমেরিকায় খ্রিস্টান শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে বিবাহ করলে নিগ্রো যুবককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। খ্রিস্টধর্মের প্রভাব এমনি হয়েছে।

অদ্যাবধি যেখানে বৈজ্ঞানিক চিন্তা নতুন আত্মিক চেতনার সঞ্চার করেনি, যেখানে প্রকৃত সংস্কৃতি দানা বাঁধতে পারেনি, সেখানে বিচ্ছিন্নতা ও অসহিষ্ণুতার মনোভাব, ইসলামের প্রতি যাজকীয় বিদ্বেষ গ্রন্থে, সংবাদপত্রের আক্রমণে, ব্যক্তিগত কথোপকথনে, জাতীয় বক্তৃতার মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। নির্যাতনের মনোভঙ্গী, খ্রিস্টধর্মে কোনদিনই মরেনি; এটা সবসময়ে সুপ্ত থেকেছে প্রথম ধর্মান্ধের স্পর্শমাত্রই জ্বলে উঠেছে।

এই ছবি থেকে এবার ইসলামী জগতের দিকে ফিরে তাকানো যাক। গোঁড়া খ্রিস্টধর্ম সমান দুর্বর্ষতার সঙ্গে ইহুদী ও নেস্তোরীয়দের উপর জুলুম করেছিল—যেসব মানুষের বংশধর খোদার অবতারকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল, এবং যেসব লোক তার মায়ের আরাধনা প্রত্যাখ্যান করেছিল—ইসলাম উভয় দলকেই আশ্রয় দান করেছিল। যখন খ্রিস্টান ইউরোপ ডাইনি ও ধর্মত্যাগীদের পুড়িয়ে মারছিল এবং ইহুদী ও "বিধর্মীদের" হত্যা করছিল তখন মুসলিম নৃপতিরা তাদের অ-মুসলিম প্রজাদের সাথে বিবেচনা ও সহনশীলতার সঙ্গে আচরণ করছিলেন। তাঁরা ছিলেন রাষ্ট্রের বিশ্বস্ত নাগরিক সাম্রাজ্যের পরামর্শদাতা। প্রত্যেক ধর্মনিরপেক্ষ কার্যালয় মুসলমান এবং তাদের জন্য সমানভাবে খোলা ছিল। ইসলামের নবী নিজেই খ্রিস্টান, হিব্রু কিংবা জরথুস্ত্র নারীর সঙ্গে মুসলমান পুরুষের বিবাহ বৈধ বলে ঘোষণা করেছিলেন। সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কারণে বিপরীতক্রমে অনুমোদিত হয়নি; মুসলিম তুর্কী ও পারস্য তাদের খ্রিস্টান প্রজাদের প্রতি তাদের বৈদেশিক দায়িত্ব অর্পণ করত। খ্রিস্টান-জগতে ধর্মের পার্থক্য অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, ইসলাম জাহানে ও তা হয়েছে দৈবাৎ। উর্কুহার্ট বলেন, "খ্রিস্টানদের কাছে ধর্মের পার্থক্য যথার্থই যুদ্ধের ভিত্তি হিসেবে দাঁড়িয়েছিল এবং তা শুধু দুঃসময়ে ও ধর্মান্ধদের মধ্যেই নয়।" ধর্মের নামে শার্লামাঙ্গ কর্তৃক স্যাকসন, ফ্রিজীয় ও অন্যান্য জার্মানীয় গোত্রসমূহের লোকনিধন। হাজার হাজার নির্দোষ নারী-পুরুষকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা, এরিয়ান, পলিসিয়নি আলবিজিনিশ ও হুগনটদের বীভৎস হত্যাকাণ্ড, মাজাদিবার্গ ও রোম-লুণ্ঠনের ভীতি, তিরিশ বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ থেকে শুরু করে ক্যালভিনিষ্টদের স্কটল্যান্ড ও লুথারিয়ান ইংল্যান্ড অবধি অসহিষ্ণুতা ও ধর্মান্ধতার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ বিদ্যমান ছিল। যীশুর নামে আমেরিকার নির্দোষ বংশসমূহের সর্বাত্মক নির্মূলকরণের চেয়ে অধিকতর হৃদয়বিদারক ঘটনা আর কিছু হতে পারে কি?

বলা হয়েছে যে, আক্রমণাত্মক ইসলামই মধ্যযুগীয় খ্রিস্টধর্মের মধ্যে যুদ্ধের মনোভাব অনুপ্রবিষ্ট করেছে। ধর্মের নামেই জাতিনির্মানের হত্যাকাণ্ড এবং খ্রিস্টান ক্রোন্তিসের বিভীষিকাপূর্ণ যুদ্ধসমূহ মুহম্মদের আবির্ভাবের বহুপূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল।

পুনরায় খ্রিস্টান ধর্মযোদ্ধা ও মুসলমান ধর্মযোদ্ধাদের আচরণের তুলনা করুন। যখন খলিফা ওমর ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেম জয় করেন, তখন তিনি প্যাট্রিয়ার্ক

www.amarboi.org

সোফরোনিয়াসের সঙ্গে একই গাড়িতে পাশাপাশি বসে শহরের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে শহর প্রদক্ষিণ করেছিলেন। নামাজের সময় যখন উপস্থিত হল তখন ঘটনাক্রমে তিনি রিসারেকশান গির্জায় ছিলেন, কিন্তু সেখানে নামাজ আদায় করতে অসম্মতি জানান এবং কনস্ট্যানটাইনের গির্জার সিঁড়ির উপরে নামাজ সমাধান করেন। আর এ বিষয়ে তিনি প্যাট্রিয়ার্ককে বলেছিলেন, "যদি আমি ওখানে নামাজ পড়তাম তবে পরবর্তীকালে মুসলমানেরা আমার দৃষ্টান্তের অনুকরণের আভায় সন্ধি-চুক্তি ভঙ্গ করতে পারত।' কিন্তু খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের অবরোধকালে ছোট ছোট ছেলেদের মস্তক দেওয়ালের সঙ্গে আঘাত করে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হত; শিশুদেরকে অট্টালিকার ফোকরের উপর নিক্ষেপ করা হত; মানুষকে আগুনে ঝলসানো হত; কোন কোন লোকের পেট চিরে দেখা হত তারা সোনা গিলতে পেরেছে কিনা; ইহুদীদেরকে তাদের ধর্মমন্দিরে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হত এবং সেখানে তাদেরকে পুড়িয়ে মারা হত। প্রায় ৭০,০০০ লোককে হত্যা করা হয়েছিল এবং পোপের প্রতিনিধিকে এই বিজয়োৎসবে অংশ গ্রহণ করতে দেখা গিয়েছিল।"[২৯] যখন সালাদীন এই শহর পুনর্দখল করেছিলেন, তখন তিনি খ্রিস্টানদের সকলকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন, তাদেরকে টাকা পয়সা ও আহার্য দিয়েছিলেন এবং নিরাপদে প্রস্থান করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[৩০]

ইসলাম আত্মরক্ষার তাগিদে অস্ত্রধারণ করেছিল; খ্রিস্টধর্ম চিন্তার স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার টুঁটি টিপে মারার জন্য অস্ত্রধারণ করেছিল। কনস্ট্যানটাইনের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ফলে এই ধর্ম পাশ্চাত্য জগতের প্রধান ধর্মে পরিণত হয়েছিল। তখন থেকে এই ধর্মের পক্ষে শত্রুদের থেকে ভয় পাওয়ার কিছুই ছিল না। যে মুহূর্ত থেকে এই ধর্ম প্রভুত্ব অর্জন করল সেই মুহূর্ত থেকেই এই ধর্মের প্রকৃত বিচ্ছিন্নতাবাদী চরিত্র বিকশিত হল। যেখানে খ্রিস্টধর্ম জয়ী হয়েছে সেখানে অন্য কোন ধর্ম নির্যাতন ব্যতিরেকে অনুসৃত হতে পারেনি। পক্ষান্তরে, মুসলমানেরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছ থেকে চেয়েছে শান্তি ও সৌহার্দ্যের অকপট নিশ্চয়তা, রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সামান্য কর, আর পরিপূর্ণ সমতা—সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগের জন্য ইসলাম গ্রহণ।

পাদটীকা

১. এ বিষয়ে প্রথম পর্বে আলোচনা হয়েছে।
দ্য স্পিরিট অব্ ইসলাম-১৯

২. সু. ৪ আ. ৮৫।

৩. সু. ২ আ. ১৯০

৪. আমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে সাধারণভাবে গৃহীত মতামত অনুসারে লিখেছি—তাঁর যুগে প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে মুহম্মদ বিশ্বাস করতেন যে যীশু অলৌকিক উপায়ে অন্তর্হিত হয়েছিলেন,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। খ্রিস্টানদের সাধারণ ঐতিহ্যের দরবারে তথাকথিত বাইবেলীয় নষ্টিক ঐতিহ্য বিরোধী হলেও উভয় দিকেই সমান ঐতিহাসিক সম্ভাব্যতা রয়েছে।

www.amarboi.org

৫. লুক ২২, ২৫৬ :
৬. সেমিটিক মানবগোষ্ঠীর সঙ্গত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমি অবশ্যই বলব যে রোমের অধিকাংশ বড় আইনবিজ্ঞানী সেমিটিক বংশোদ্ভূত—ফিনিসীয়, সিরীয় বা কার্থেজীয়।
৭. তুঃ ডলিঞ্জার 'দি জেনটাইল এণ্ড দি জিউ'।
৮. তুঃ ডেভিড উর্কুহাট-এর প্রবন্ধ : 'এফেক্টস অব দি কনটেম্পট অব ইন্টারন্যাশনাল ল' "দি ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট", ফেব্রুয়ারি, ১৮৬৭ থেকে পুনর্মুদ্রিত।
৯. তুঃ মিলম্যানের "লাতিন ক্রিশ্চিয়ানিটি, '১ম খণ্ড, পৃ. ৩২২ এবং লেকির 'হিস্ট্রী অব র্যাশন্যালজম ইন্ ইউরোপ', অধ্যায়—"পার্সেকিউশান"।
১০. হাল্লামের 'কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রী অব ইংল্যাণ্ড' ১ম খণ্ড, অধ্যায়—২, পৃ. ৬২। লেকি বলেছেন যে, যখন কার্লভিন 'ত্রিত্ব' সম্পর্কে তাঁর মতামতের জন্য সারভিটাসকে পুড়িয়ে মেরেছিল, তখন তার কাজ সব প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখিয়েছেন মেলাঙ্কথন, বলিঞ্জার ও ফ্যারেল এই অপরাধ উন্মাদনার সঙ্গে অনুমোদন করে লিখেছেন; বেজা একটি বিস্তৃত গ্রন্থে একে সমর্থন করেছেন। লেকির 'হিস্ট্রী অব র্যাশনালিজম' ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৯। ক্যাথলিক ডিসেন্টার ও নন-কনফরমিষ্টদের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের ফৌজদারী আইন পড়লে যে কোন পক্ষপাতহীন ব্যক্তি মর্মাহত হবেন।
১১. গ্রোটিয়াস, সম্ভবত ইউরোপের আন্তর্জাতিক আইনের প্রবর্তক, আদর্শগতভাবে মুসলমানদেরকে ইউরোপীয় জাতিসমূহের সঙ্গে অধিকার মঞ্জুর করেননি।
১২. সু. ২ আ. ২৫৭ (মদনী সুরা)।
১৩. তুঃ হাল্লামের 'কনস্টি টিউশনাল হিস্ট্রী অব ইংল্যাণ্ড, ১ম খণ্ড, অধ্যায়—৩, পৃ. ৯৮।
১৪. বিংশ শতকের সুবৃহৎ ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধে, যাতে খ্রিস্টজগতের বড় বড় জাতি নিয়োজিত ছিল, ধর্মীয় নেতাগণ উভয়দিকে প্রবলভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল যুদ্ধোন্মাদনা সৃষ্টির জন্য।
১৫. এই কর জিজিয়া কর নামে পরিচিত।—অনুবাদ।
১৬. "ইসলামের রাজনৈতিক আদর্শ" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
১৭. উর্কুহার্টের 'ইসলাম এজ এ পলিটিক্যাল সিস্টেম' দেখুন। আমি একথা বোঝাতে চাই না যে মুসলমানেরা কখনো আক্রমণাত্মক মনোভাব বা অর্থলিপ্সা দ্বারা প্ররোচিত হয়নি। এ ধরনের বিবৃতি দেওয়া মনুষ্যস্বভাবের চরম অজ্ঞতার নির্দেশক হবে। এটা কদাচিৎ সম্ভব যে, তাদের শত্রু ও আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধনের পর ও পার্শ্ববর্তী জাতিসমূহের দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পরও তারা মধ্যে পন্থা অবলম্বন করেছিল এবং আইনের আওতার মধ্যে ছিল। আমি এ বিষয়ে আমার চক্ষু বন্ধ করছি না যে খ্রিস্টানদের মধ্যে যেরূপ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে মুহম্মদের শিষ্যদের মধ্যেও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে। তবে এসব যুদ্ধ ছিল অবশ্যম্ভাবীরূপে বংশগত। কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতি যে নির্যাতন চালান হয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই কারণোদ্ভূত। মুহম্মদের বংশধর আলী ও ফাতিমার সন্তানদের প্রতি উমাইয়া বংশের যে নির্যাতন তা মুহম্মদ ও হাশেমীদের প্রতি কোরাইশদের পুরাতন বিদ্বেষজাত।—এ আমি পরে দেখাচ্ছি।
১৮. আক্ষরিক অর্থে—যুদ্ধের দেশ।
১৯. আক্ষরিক অর্থে—শান্তির দেশ।
২০. এই নিরাপত্তার নিশ্চয়তা (আমান) শর্তাধীনে আত্মসমর্পণের জন্য দিয়েছিল যা শেষ পর্যন্ত তুর্কীয় সম্পদসমূহের ধ্বংস সাধন করেছিল।

www.amarboi.org

২১. সু. ২ আ. ১৮৬ তুঃ ২৬৭।

২২. জমির আয়ের এক দশমাংশ, এবং গরীবের জন্য প্রত্যেক মানুষের সঙ্গতির শতকরা আড়াই ভাগ সঞ্চিত করতে হবে যার বন্টনের ভাব নৃপতি ও তার অফিসারদের এখতিয়ারে থাকবে।

২৩. দারিউসের মতো ইয়াজদেজার্দ তার নিজের লোক কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন। 'দি শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন (ম্যাকমিলান ১৯২১) দেখুন।

২৪. মুসলমানেরা যে মনোভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন তার সাক্ষ্য হিসেবে গিবন থেকে নিম্নোক্ত উদ্বৃতি আমরা পেশ করছি : "পারস্যের শাসনব্যবস্থা জনশক্তি, যা খলিফার সতর্কতার সাক্ষ্য বহন করে, প্রত্যেক যুগের দার্শনিকদের উপদেশ দান করে থাকবে।"— 'ডিক্লাইন এণ্ড ফল্ অব রোমান এম্পায়ার' ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৭। আরও দেখুন সুয়ুতির 'তারিখুল খোলাফা' (খলিফাদের ইতিহাস)।

২৫. মুয়ির, 'লাইফ অব মুহমেট', ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫১।

২৬. তুঃ নেবুরের ও ডেস্ক্রিপশান দ্য লা অ্যারাবিয়া'।

২৭. সপ্তদশ শতকে একজন তরুণ বলেছিলেন যে তার মতে মুহম্মদ মন্দ লোক ছিলেন না, এ কথার জন্য তার ফাঁসী হয়েছিল।

২৮. এক প্রকার কাঠের তৈরি যন্ত্র—যাতে মাথা ও হাত প্রবেশ করানোর জন্য গর্ত থাকত।— অনুবাদক

২৯. ড্রেপার, 'হিস্ট্রী অব্ দি ইনটেলেকচুয়াল ডেভলোপমেন্ট অব্ ইউরোপ', ২য় খণ্ড, পৃ. ২২।

৩০. পূর্ণ বিবরণের জন্য 'দি শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসিনস' পৃ. ৩৫৬, দেখুন।

www.amarboi.org

পঞ্চম অধ্যায়
ইসলামে নারীর মর্যাদা

"মায়ের পদতলে বেহেশত।" —আল্ হাদিস।

সামাজিক বিবর্তনের বিশেষ স্তরসমূহে বহু বিবাহ, অধিকতর যথার্থভাবে বললে, কতিপয় নারীর সঙ্গে একটি পুরুষের মিলন ছিল এক অনিবার্য অবস্থা। প্রায়ই সংঘটিত গোত্রীয় যুদ্ধ ও তার ফলস্বরূপ পুরুষ জনশক্তির বহুল হ্রাস, নারী-জনসংখ্যার পরিমাণগত প্রবৃদ্ধি, এতদসঙ্গে দলপতির সার্বভৌম ক্ষমতা এমন প্রথার জন্ম দিয়েছিল যা আমাদের প্রগতিশীল যুগে সঠিকভাবেই একটি অসহনীয় অনিষ্ট হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

প্রাচীনকালে সকল প্রাচ্য জাতিসমূহের মধ্যে বহু বিবাহ একটি স্বীকৃত বিধি। রাজকীয় লোকদের দ্বারা এই বিধির অনুশীলন সর্বত্র ঐশী মর্যাদায় অভিষিক্ত হত এবং জনগণের কাছে তার অনুসরণ পূতপবিত্র বলে পরিগণিত হত। হিন্দুদের মধ্যে বহু বিবাহ উভয় দিক থেকে অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। প্রাচীন মিডীয়, ব্যাবিলনীয়, অ্যাসিরীয় ও পারসিকদের মধ্যেও আপাতদৃষ্টিতে একজন পুরুষ কয়জন নারীকে বিবাহ করতে পারবে সে বিষয়ে কোন বাধা-বন্ধকতা ছিল না। এমন কি আধুনিক যুগেও একজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ যে কয়টি স্ত্রী গ্রহণ করতে চায় তার অধিকার তার রয়েছে। মুসার আবির্ভাবের পূর্বে ইসরাইলীদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, তারা একজন হিব্রু স্বামী কয়টি স্ত্রীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে সে বিষয়ে কোন সীমা-নির্ধারণ না করেই এই প্রথা অনুসরণ করত। পরবর্তীকালে জেরুজালেমের তালমুদগণ স্বামীর পক্ষে যথাযথভাবে স্ত্রীর ভরণপোষণের শক্তির উপর স্ত্রী-গ্রহণের সংখ্যা নির্ধারিত করেছিল। যদিও ইহুদি পুরোহিতকরা উপদেশ দিতেন যে চারটির অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে না, তবু কেরাতিগণ তাদের সঙ্গে একমত ছিলেন না এবং তারা সীমা-নির্ধারণের বৈধতা স্বীকার করতেন না। ধর্ম পারসিকদেরকে বহু বিবাহের জন্য উৎসাহিত করত।[১]

সিরীয়-ফিনিসীয় জাতিসমূহের মধ্যে, যাদেরকে ইসরাইলরা দেশান্তরিত, পর্যুদস্ত বা ধ্বংস করেছিল, বহু বিবাহ পশুত্বে পরিণত হয়েছিল।[২]

www.amarboi.org

গ্রেসীয়, লিডীয় ও পেলসাগীয় জাতিসমূহ যারা ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিল তাদের বহুবিবাহ প্রথা অত্যন্ত অতিরিক্ত মাত্রায় চালু ছিল এবং অন্যান্য স্থানের অনুশীলনকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছিল।[৩]

প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সভ্য ও সংস্কৃতিমনা এথেন্সবাসীদের ভেতরে স্ত্রী পণ্যবিশেষ, যা অন্যের কাছে বিক্রয়যোগ্য ও হস্তান্তরযোগ্য এবং উইলযোগ্য। নারীকে অনিষ্ট হিসেবে বিবেচনা করা হত; তবে গৃহের পারিপাট্য ও সন্তান উৎপাদনের জন্য নারী ছিল অপরিহার্য। একজন এথেন্সবাসী যে কোন সংখ্যক স্ত্রী রাখতে পারত। ডেমোসথিনিস তার জনগণের তিন শ্রেণীর স্ত্রীর বিদ্যমানতায় গৌরব বোধ করত, যাদের মধ্যে দু'শ্রেণীর হল আইনগত এবং অর্ধ-আইনগত স্ত্রী।[৪]

স্পার্টার অধিবাসীদের মধ্যে পুরুষরা বিশেষ পরিস্থিতি ব্যতীত একাধিক স্ত্রী রাখতে যদিও অনুমতি প্রাপ্ত হত না; কিন্তু স্ত্রীলোকেরা একাধিক স্বামী রাখার অনুমতি পেত, প্রায় সর্বদাই পেত।[৫]

যে বিশেষ অবস্থাসমূহের ভেতর দিয়ে রোমান রাষ্ট্র মূলতঃ কায়েম হয়েছিল সে কারণেই সম্ভবতঃ এই রাষ্ট্রের সূচনাকালে আইনসঙ্গতভাবে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত হতে পারেনি। সেবাইনদের লাম্পট্যের ঐতিহাসিক সত্যতা যাই হোক না কেন, এই ঐতিহ্যের অস্তিত্বই সেসব কারণের সত্যতা প্রতিপন্ন করে যা রোমানদের আদিম আইন প্রণয়নে সাহায্য করেছিল। সাধারণভাবে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে এবং বিশেষভাবে এট্রাসক্যানদের মধ্যে বহু বিবাহ একটি বিশেষ অধিকারমূলক প্রথা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইতালীর বিভিন্ন জাতির সংস্পর্শে আসার ফলে বহু যুদ্ধবিগ্রহ ও অভিযান এবং তার সাফল্যের পরিণতি হিসেবে বিলাসপূর্ণ অভ্যাস রোমানদের মধ্যে বৈবাহিক পবিত্রতাকে একটি কুখ্যাত বস্তুতে পরিণত করেছিল। বাস্তবিক বহু বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়নি কিন্তু "কার্থেজ-বিজয়ের পর রোমের তত্ত্বাবধায়কগণ একটা স্বাধীন ঐশ্বর্যশালী প্রজাতন্ত্রের সাধারণ সুযোগ-সুবিধাসমূহ প্রত্যাশা করত, আর তাদের কামনা বাসনা পিতা ও প্রেমিকদের আবদারের মাধ্যমে চরিতার্থ হত।"[৬] বিবাহ সত্ত্বর বিশৃঙ্খল উপপত্নী সংরক্ষণের অজটিল ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছিল। রাষ্ট্র অনুমোদিত উপপত্নী সংরক্ষণ প্রথা স্বীকৃত অনুষ্ঠানের শক্তি অর্জন করেছিল। নারী স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের মধ্যকার শ্লথ বন্ধন, বারংবার স্ত্রী পরিবর্তন বা হস্তান্তর প্রকৃতপক্ষে অন্য নামে বহু বিবাহ প্রথার প্রচলনকে সূচিত করে।

ইতিমধ্যে গ্যালিলির তীরে প্রচারিত আদি খ্রিস্টধর্মের মতবাদসমূহ সমগ্র রোমান জগতে বিচ্ছুরিত হতেশুরু করেছিল 'এসেনিসে'র প্রভাব যীশুর শিক্ষার মধ্যে স্পষ্টতঃ প্রতিফলিত হয়েছিল এবং তার সঙ্গে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার ঐকান্তিক ইচ্ছা যুক্ত হয়ে তা নাজারাতের প্রেরিত পুরুষকে সাধারণভাবে বিবাহপ্রথা নিরুৎসাহিত করতে চালিত করেছিল, যদিও তিনি কোনভাবে কখনও বিবাহের অনুশীলনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেননি।

জাস্টিনিয়ানের আইন দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বহুবিবাহ প্রথা কম বেশি সুস্পষ্টভাবেই জমজমাট ছিল। কিন্তু দেওয়ানী আইনের মধ্যে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা

www.amarboi.org

জনগণের নৈতিক ধারণার মধ্যে কোন রূপান্তর ঘটাতে পারেনি এবং আধুনিক সমাজ কর্তৃক নিন্দিত হওয়া পর্যন্ত বহু বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল। প্রথম বিবাহিত স্ত্রী ছাড়া অন্যান্যরা মারাত্মক আইনগত অযোগ্যতার অধীনে ভুগত। অধিকার ব্যতিরেকে, প্রথম স্ত্রীকে আইন যে রক্ষাকবচ দান করত তা ছাড়া, তারা তাদের স্বামীদের খেয়ালখুশির দাসে পরিণত হয়েছিল। তাদের সন্তান-সন্ততি জারজ হিসেবে অভিহিত হত, তাদের পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হত এবং সমাজচ্যুত হিসেবে পরিগণিত হত।

অসম পদমর্যাদাসম্পন্ন ও নেস্তা বিবাহ অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেই সীমিত ছিল না। যাজক সম্প্রদায় ও তাদের চিরকৌমার্য পালনের অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়ে একাধিক বৈধ বা অবৈধ মিলনে লিপ্ত হত। ইতিহাস চূড়ান্তভাবে প্রমাণ দেয় যে সম্প্রতিকালের পূর্বে বহু বিবাহ প্রথা বর্তমান কালের মতো নিন্দনীয় ছিল না। সেন্ট অগাস্টাইন[৭] স্বয়ং এর মধ্যে যথার্থ অনৈতিকতা বা পাপ দেখতে পাননি বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, যে দেশে বহুবিবাহ একটি আইনানুমোদিত অনুষ্ঠান সেখানেও এ কোন অপরাধ নয়। হাল্লাম বলেছেন যে জার্মান সংস্কারকগণ সেদিন ষোড়শ শতাব্দীতেও সন্তান না হওয়া ও অনুরূপ অন্যান্য কারণে প্রথমা স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয় বা তৃতীয় বিবাহের বৈধতা স্বীকার করেছিলেন।

বহু বিবাহের মধ্যে কোন অন্তর্নিহিত অনৈতিকতা নেই এবং যীশু সম্পূর্ণরূপে বা স্পষ্টভাবে প্রথাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেননি—কোন কোন পণ্ডিত একথা স্বীকার করে বলেন যে এক অর্থে বর্তমান একবিবাহ প্রথা সমগ্র ইউরোপ মহাদেশে খ্রিস্টধর্মের উপর হয় জার্মানিক নয় হেলেনিক—রোমান ধারণার প্রভাবজাত।[৮] পরবর্তী মতবাদ বাস্তবতা ও ইতিহাসের বিরোধী এবং তা প্রশংসার যোগ্য নয়। জার্মানদের সম্পর্কে তাদের এক বিবাহ বিষয়ক অভ্যাস ও প্রথা এক বা দুই জন রোমানদের অসমর্থিত সাক্ষ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, মানুষের মধ্যে যারা সবচেয়ে বিশ্বাসহীন সাক্ষী যারা তাদের নিজেদের স্বার্থে তথ্য চাপা দিত। এতদ্ব্যতীত আমরা অবশ্যই স্মরণ রাখব যে উদ্দেশ্যে ট্যাসিটাস তাঁর 'ম্যানারস অব দি জার্মানস' (জার্মানদের আচরণ) লিখেছিলেন। নিজ জাতির লোকদের স্বেচ্ছাচারিতার উপর এটা ছিল তার স্পষ্ট আক্রমণ, রোমানদের শৈথিল্যের সঙ্গে বর্বরদের কাল্পনিক গুণাবলীর বৈসাদৃশ্য দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল রোমে উত্তম ধারণার জন্ম দান করা। আবার যদি আমরা অনুমান করি যে ট্যাসিটাস সঠিক, তবে একবিংশ শতক পর্যন্ত জার্মানদের উঁচু শ্রেণীর মধ্যে বহু বিবাহের অভ্যাসের দরুন কি কারণ নির্দেশ করতে পারি?[৯]

আদিতে রোমানদের মধ্যে যে প্রথাই বিদ্যমান থাক না কেন এটা সুস্পষ্ট যে প্রজাতন্ত্রের পরবর্তী সময়ে ও সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার আরম্ভকালে বহু বিবাহ প্রথা অবশ্যই একটি প্রথা হিসেবে স্বীকৃত হয় অথবা অন্ততঃপক্ষে অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হয়নি। রাজাজ্ঞা দ্বারা এর অস্তিত্ব অনুমিত, এর অনুশীলন স্বীকৃত, ফলে এর সার্বজনীনতার সঙ্গে এর বিরোধ বেধেছিল। প্রিটোরিয়ান রাজাজ্ঞা অনিষ্টের প্রতিকারে কিংবা জনমতের প্রবাহ

www.amarboi.org

পরিবর্তনে কতদূর সফল হয়েছিল তা চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে সম্রাট হনোরিয়াস ও আর্কেডিয়াসের অনুশাসন থেকে এবং কনস্ট্যানটাইন ও তাঁর পুত্র যাদের বহু স্ত্রী ছিল তাঁদের অনুশীলন থেকে প্রতীয়মান হয়। সম্রাট দ্বিতীয় ভ্যালেন্টিনিয়ান নির্দেশ দিলেন যে, ইচ্ছা করলে তাঁর সাম্রাজ্যের সব প্রজা বহু স্ত্রী বিবাহ করতে পারে; সে যুগের যাজকতন্ত্রের ইতিহাস থেকে এটা প্রতীয়মান হয় না যে বিশপ ও খ্রিস্টীয়ান গির্জার প্রধানেরা এই আইনের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি জানিয়ে ছিলেন।[১০] এছাড়াও পরবর্তী সকল সম্রাট বহুবিবাহ প্রথার অনুশীলন করেছিলেন এবং জনগণ তাঁদের অনুসরণ করার ব্যাপারে উদ্যমহীন ছিল না।

আইনের এই অবস্থা জাস্টিনিয়ানের শাসনকালের পূর্ব পর্যন্ত চলেছিল। তখন জীবনধারণের শৈল্পিক অগ্রগতি ও বিবর্তনের তের শত বৎসরের নিবিষ্ট প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতা এমন আইনসমূহের ঘোষণায় পর্যবসিত হয়েছিল যা তাঁর খ্যাতিহীন রাজত্বের উপর কৃত্রিম আলোকপাত করেছিল। কিন্তু অন্ততঃ সরাসরিভাবে এই আইনসমূহের খ্রিস্টধর্মের কাছে কোন ঋণ ছিল না। জাস্টিনিয়ানের শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা ছিলেন একজন নিরীশ্বরবাদী ও পৌত্তলিক। এমন কি জাস্টিনিয়ানের জারিকৃত বহু বিবাহের প্রতি নিষেধাজ্ঞা; যুগ-প্রবণতা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়নি। আইনটি চিন্তার অগ্রগতি নির্দেশ করেছিল; কতিপয় চিন্তাবিদের কাছে এর প্রভাব সীমিত ছিল; জনগণের নিকট এ ছিল সম্পূর্ণরূপে নির্লক্ষ্য পত্র।

ইউরোপের পশ্চিমাংশে বর্বরদের বিরাট অভ্যুত্থান এবং যেসব লোকের মধ্যে তারাবসতি স্থাপন করেছিল তাদের সঙ্গে নৈতিক ধারণাসমূহের সংমিশ্রণ নর ও নারীর সম্পর্ক নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়েছিল। বর্বরদের কিছু কিছু আইন বহু বিবাহের প্রতিকারের উদ্দেশ্য প্রণীত হয়েছিল।[১১] কিন্তু নীতির চেয়ে দৃষ্টান্ত উত্তম। নৃপতিগণ বহু বিবাহ প্রথার যে উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন তা সত্বর জনগণ অনুকরণ করেছিল।[১২] এমন কি যাজক সম্প্রদায় গির্জা কর্তৃক চিরকৌমার্যের অনুমোদন সত্ত্বেও বিশপ কিংবা তাদের জেলা-প্রধানের সরল অনুমতি নিয়ে বহু সংখ্যক নেস্তা স্ত্রী রাখার প্রথার সুযোগ গ্রহণ করত।[১৩]

খ্রিস্টান লেখকগণ সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে নিন্দনীয় যে ভুলভ্রান্তি করেছেন তা হল এই যে তারা অনুমান করেন যে মুহম্মদ হয় বহু বিবাহ প্রথা গ্রহণ করেছেন নয় তা বৈধ করেছেন। তিনি একে পরিচিত করেছেন—এই পুরাতন ধারণা যেসব লোক পোষণ করেছিল তাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক এবং এ ব্যাপারটি এতদিনে বাতিল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তিনি এই প্রথা গ্রহণ করেছিলেন ও বৈধ করেছিলেন—এই অভিমত সাধারণ লোকে ও খ্রিস্টান-জাহানের বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি এখনও পোষণ করে থাকে। এর চেয়ে অধিকতর কোন মিথ্যা বিশ্বাসই হতে পারে না।

মুহম্মদ শুধু তাঁর নিজের লোকদের মধ্যেই নয় প্রতিবেশী দেশসমূহের লোকদের মধ্যেও বিবাহ প্রথা প্রচলিত রয়েছে দেখতে পেয়েছিলেন, যেখানে এই প্রথার সর্বাপেক্ষা অধঃপতিত দিকের কতিপয় নজির ফুটে উঠেছিল, খ্রিস্টান সাম্রাজ্যের বিধিসমূহ বাস্তবিক

www.amarboi.org

এই অমঙ্গলসূচক অবস্থার প্রতিকারের চেষ্টা করেছিল কিন্তু সফল হয়নি। বহু বিবাহ প্রথা অপ্রতিহত গতিতে চলেছিল এবং হতভাগ্য নারীরা, প্রথমা স্ত্রী যে সময়ের অগ্রাধিকার অনুসারে মনোনীত সেছাড়া, সকলেই মারাত্মক আইনগত অযোগ্যতার অধীনে দুর্দশা ভোগ করেছিল।

মহাপুরুষ হযরত মুহম্মদের সময়ে পারস্যে নৈতিক অধঃপতন শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। বিবাহ সম্পর্কে কোন স্বীকৃত বিধি ছিল না অথবা কোন বিধি থাকলেও তা সম্পূর্ণরূপে অবহেলিত হত। কোন পুরুষ কয়জন স্ত্রী রাখতে পারবে জেন্দ-আবিস্তায় কোন নির্দিষ্ট বিধি না থাকায় পারসিকগণ অনেকগুলি উপপত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও বহুসংখ্যক নিয়মিত বিবাহিত স্ত্রী রাখত।[১৪]

প্রাচীন আরব ও ইহুদীদের মধ্যে বহু বিবাহের প্রচলন ছাড়া শর্তসাপেক্ষ ও অস্থায়ী বিবাহ প্রচলিত ছিল। নৈতিকতার এসব শ্লথ ধারণাসমূহ উপদ্বীপের সমাজব্যবস্থার উপর নিদারুণ ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মুহাম্মদ যেসব সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তা নারীজাতির মর্যাদার ক্ষেত্রে বিপুল ও নির্দিষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছিল। ইহুদী ও অ-যাযাবর আরবদের মধ্যে নারীর অবস্থা অধঃপতনের চরম সীমায় পৌঁছেছিল। হিব্রু-কুমারীগণ তাদের পিতৃগৃহেও ভৃত্যের অধিকতর মর্যাদা পেত না; নাবালিকা অবস্থায় তাদের পিতা তাদেরকে বিক্রি করতে পারত। পিতার মৃত্যু ঘটলে পুত্রসন্তানেরা তাদের ইচ্ছানুসারে কন্যাদেরকে হস্তান্তর করতে পারত। কন্যা পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হত না; তবে কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকলেই তার উপর উত্তরাধিকার বর্তাত।[১৫] স্থায়ী বাসিন্দা পৌত্তলিক আরবগণ প্রতিবেশী সাম্রাজ্যের পঙ্কিল দূষিত সভ্যতার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে নারী শুধু অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হত; সে তার স্বামী কিংবা পিতার সম্পত্তির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে নারী শুধু অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত হত; সে তার স্বামী কিংবা পিতার সম্পত্তির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল এবং কোন ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী অন্যান্য স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মতো উত্তরাধিকারসূত্রে তার পুত্রসন্তানদের নিকট হস্তান্তরিত হত। সুতরাং বৈমাত্রেয় পুত্রের সঙ্গে বিমাতার প্রায়শঃ মিলন ঘটত, যা পরবর্তীকালে ইসলামে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এটা 'নিকাহ্ উল মেক্ত' (লজ্জাজনক বা ঘৃণিত বিবাহ) বলে চিহ্নিত হত। ইয়েমেনের অর্ধ ইহুদী, অর্ধ-সেবীয় গোত্রসমূহের মধ্যে স্ত্রীলোকদের বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।[১৬]

প্রাক্-ইসলামী যুগে নারীজাতির প্রতি আরবদের বিতৃষ্ণা ছিল। তারা কন্যা সন্তানদের অনেককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারত। এই ভয়াবহ প্রথাটি কোরাইশ ও কিন্দাহ গোত্রের লোকদের মধ্যেই অধিক প্রচলিত ছিল। মুহম্মদ অনলবর্ষী ভাষায় এই প্রথার বর্জন করেন এবং প্রাচীন যুগের অন্যান্য জাতির মতো তাদের দেবতাদের কাছে সন্তান বলিদানের প্রথাকে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করেন। এই অপরাধের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

www.amarboi.org

পারস্য ও বাইজান্টাইন উভয় সাম্রাজ্যে নারীজাতি অত্যন্ত নীচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। যে ধর্মান্ধ অত্যোৎসাহী ব্যক্তিরা, পরবর্তীকালে খ্রিস্টান জগতে সেন্ট হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন তারা নারীদের বিরুদ্ধে প্রচার করেছেন। নিজেদের অপরাধসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা একথা বিস্মৃত হয়েছেন যে নারীজাতির মধ্যে তারা যে অনিষ্ট প্রত্যক্ষ করেছেন তা তাদের নিজেদের পক্ষপাতদুষ্ট মনেরই প্রতিফলন, এ এমন একটা সময়ের কথা যখন সর্বত্র সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ছিল, যখন আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল যে অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে পূর্বতন ব্যবস্থা ন্যুজ হয়ে পড়েছে এবং তা অচল। এমন সময় হযরত মুহম্মদ তাঁর সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করেছিলেন।

ইসলামের নবী তাঁর ধর্মের অন্যতম অপরিহার্য শিক্ষা হিসেবে বলবৎ করেছিলেন "নারীর প্রতি সম্মান"। আর তাঁর শিষ্যবৃন্দ তদীয় বিখ্যাত কন্যার প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে তাঁর জাতির প্রতিনিধিরূপে আহ্বান করতেন "খাতুনে জান্নাত" বলে। "ফাতিমাতুজ্ জোহরা"[১৭] নারীজাতির মধ্যে যা কিছু ঐশী তারই রূপায়ণ, যা বিশুদ্ধ, যা সত্য এবং যা পবিত্র তারই প্রমূর্তরূপ—মনুষ্য ধারণার মহত্তম ধারণা। বহু নারী তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে তাদের গুণাবলীর উৎকর্ষের মাধ্যমে তাদের নারীত্বের পবিত্রতা সাধন করেছেন। কে তাপসী রাবেয়া ও তাঁর সমমর্যাদার হাজার হাজার মুসলিম নারীর কথা শোনেনি?

আরবের নবী যে বিধি-বিধান ঘোষণা করেছিলেন তার মধ্যে তিনি শর্তসাপেক্ষ বিবাহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেন; অস্থায়ী বিবাহ যা প্রথমে মৌন সম্মতি লাভ করেছিল তৃতীয় হিজরীতে এমন কি তাও নিষিদ্ধ ঘোষিত হল।[১৮] মুহম্মদ তাঁর জীবনব্যবস্থায় নারীদেরকে এমন সব অধিকার প্রদান করেছিলেন যা তারা এর পূর্বে কোনদিন পায়নি; তিনি তাদেরকে এমন সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন যা কালের অগ্রগতির সঙ্গে অধিকতর পরিপূর্ণতার সঙ্গে মূল্যায়িত হবে। সমুদয় আইন-সংক্রান্ত ক্ষমতা ও ভূমিকা পালনে তিনি নারীদেরকে পুরুষের সঙ্গে নিখুঁতভাবে সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি একই সঙ্গে সর্বোচ্চ সংখ্যার সীমা নিরূপণ ক'রে এবং সকলের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ আচরণ অপরিহার্য ক'রে বহুবিবাহ প্রথার মধ্যে সংযম আনয়ন করেছেন। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে কোরআনের মধ্যে যে অনুচ্ছেদে একই সময়ে সর্বোচ্চ চারটি বিবাহের অনুমতি প্রদত্ত হয়েছে তার অব্যবহিত পরে এমন একটি আয়াত এসেছে যা পূর্ববর্তী আয়াতের তাৎপর্যকে তার স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত সীমায় এনে দিয়েছে। "তোমরা দুটো, তিনটা কিংবা চারটা বিবাহ করতে পার, কিন্তু তার অধিক নয়।" এর পরবর্তী আয়াত ঘোষণা করে "কিন্তু তোমরা যদি তাদের সকলের সঙ্গে সমভাবে ও ন্যায়পরায়নতার সাথে আচরণ করতে না পার, তবে তোমরা একটি মাত্র বিবাহ করবে।" কোরআনের শিক্ষায় 'আদল' (ন্যায়বিচার) শব্দটিতে যে অর্থ আরোপিত হয়েছে তার অর্থবাহী এই অনুবিধির আত্যন্তিক গুরুত্ব মুসলিম জাহানের মহান চিন্তাবিদেরা বিস্মৃত হননি। 'আদল' শুধু আহার, বাসস্থান বস্ত্র ও অন্যান্য পারিবারিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সমান আচরণ

www.amarboi.org

বুঝায় না, পরন্তু প্রেম প্রীতি ও সমীহের ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণ সমান আচরণ বুঝায়। যেহেতু অনুভূতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ন্যায়পরায়ণতা অসম্ভব। কাজেই কোরআনিক ব্যবস্থা যথার্থই নিষেধাজ্ঞার পর্যায়ে পর্যবসিত হয়েছিল। হিজরী তৃতীয় শতকে সর্বপ্রথম এই মতবাদ প্রস্তাবিত হয়েছিল।[১৯] আল্ মামুনের রাজত্বকালে প্রথম মুতাজিলা পণ্ডিতেরা শিক্ষা দিয়েছিলেন যে বিকাশপ্রাপ্ত কোরআনিক আইনাবলী এক বিবাহের অনুশীলনের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে। যদিও উম্মাদ ধর্মান্ধ মোতাওয়াক্কিল তাদের শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তারে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন তথাপি সর্বত্র, সব অগ্রগামী মুসলিম সমাজে এই বিশ্বাস জোরদার হয়ে উঠছিল যে বহু বিবাহ প্রথা যেমন মুহম্মদের শিক্ষার বিরোধী তেমনি তা সভ্য সমাজ ও যথার্থ কৃষ্টির সাধারণ অগ্রগতির বিরোধী।

এই তথ্য অবশ্যই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে পরিস্থিতির উপর বহুবিবাহ প্রথা নির্ভরশীল। বিশেষকালে, সমাজের বিশেষ পরিস্থিতিতে বহু বিবাহ প্রথার অনুশীলন সম্পূর্ণরূপে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল—অনাহার বা নিতান্ত নিঃস্বতা থেকে নারীজাতির সংরক্ষণ করার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছিল। যদি বিবরণী ও পরিসংখ্যান সত্য হয় তবে পাশ্চাত্য জগতে সভ্যতার কেন্দ্রসমূহে বিরাজমান নীতিহীনতার বিরাট অংশ পরিপূর্ণ দারিদ্র্য থেকে উদ্ভূত হয়। আব্বি হুক ও লেডী ডাফ গর্ডন উভয়েই মন্তব্য করেছেন যে সাধারণভাবে পরিস্থিতির চাপেই প্রাচ্যে জনগণ বহুবিবাহ প্রথা অনুশীলনে বাধ্য হয়।

চিন্তার অগ্রগতি, জগতের চিরপরিবর্তনশীল অবস্থার ফলে বহু বিবাহের প্রয়োজনীয়তা অন্তর্হিত হয়। বহু বিবাহের অনুশীলন হয় ভেতরে ভেতরে প্রত্যাখ্যাত হয়, নয় তো স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। কাজেই মুসলিম দেশসমূহে যেখানে প্রথমে বহুবিবাহ প্রথার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল সেখানে তা অন্তর্হিত হচ্ছে, বহু স্ত্রী সংরক্ষণের রীতি অনিষ্ট হিসেবে গণ্য হয়েছে, এবং একটি প্রথা হিসেবে হযরতের শিক্ষার পরিপন্থীরূপে দেখা দিয়েছে। আর যেসব দেশে সামাজিক অবস্থা স্বতন্ত্র, উন্নত সমাজের মতো নারী জাতির নিজেদের সাহায্যে যেখানে নিজেরা করতে অক্ষম সেখানে বহু জাতির প্রথা অবশ্যই চালু থাকতে বাধ্য। সম্ভবত এই আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, যেহেতু সংগঠনের স্বাধীনতা কূটতার্কিক পাথর্ক্যের অবকাশ প্রদান করে, কাজেই বহু বিবাহ প্রথার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি এক অসম্ভব ব্যাপার। এই আপত্তির জোর আছে। একথা আমরা স্বীকার করি। যেসব মুসলিম ইসলামী শিক্ষা থেকে এর প্রতি আরোপিত দোষ স্খলন করতে ও অগ্রসরমান সভ্যতার সঙ্গে পা ফেলে চলতে ইচ্ছুক এ আপত্তি তাদের গভীর বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু একথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে আইনের স্থিতিস্থাপকতা এর উদারতা ও উপকারিতার মাপকাঠি। কোরআনের আইনের উৎকর্ষ এটাই। এ সবচেয়ে কৃষ্টিবান সমাজ ও সবচেয়ে স্বল্প সভ্য সমাজের চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। এ প্রগতিশীল মানবসমাজের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে না, আর একথাও বিস্মৃত হয় না যে পৃথিবীর বুকে এমন জাতি ও সম্প্রদায় রয়েছে যাদের মধ্যে এক-বিবাহ একটা সাংঘাতিক অনিষ্ট বলে প্রমাণিত হতে পারে। যা' হোক, বহু বিবাহের বিলোপ যতটা কঠিন কাজ বলে কল্পিত হয় ততটা কঠিন নয়। মুসলিম সমাজের উপর

www.amarboi.org

যে অনিষ্টকর প্রভাব পড়েছে তা সেই যাজকীয় মতবাদের জন্য যা ইজতিহাদ বা ব্যক্তিগত রায়ের অনুশীলনকে নিষিদ্ধ করেছে। সেদিন সুদূর নয় যেদিন মহানবীর বাণীর প্রতি আবেদন মীমাংসা করে দেবে যে মুসলমান সমাজ মুহম্মদ (দঃ)-কে অনুসরণ করবে না সেই সব যাজকদেরকে অনুসরণ করবে; যারা নিজেদের খামখেয়ালী চরিতার্থ করার জন্য কিংবা খলিফা ও সুলতান যারা তাঁর অনুগত সেবক তাদের, স্বেচ্ছাচারমূলক নির্দেশ পালন করার জন্য শিক্ষাগুরুর নামের অপব্যবহার করেছে ইউরোপ সেই একই প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হয়েছে। মুহম্মদের ধর্মের প্রতি যাজকীয় অভিসম্পাত উচ্চারিত না করে ধৈর্য ও সহানভূতির সঙ্গে পুনরুজ্জীবিত ইসলাম কিভাবে যাজকতান্ত্রিক বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে তা লক্ষ্য করা ইউরোপের উচিত ছিল। একবার যখন পুরাতন ধারণার দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ ঘটে তখন প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের আইনবিজ্ঞানীদের পক্ষে সে দেশের মধ্যে প্রামাণ্য নীতির বলে বহুবিবাহ প্রথা নিরসন করা সহজ হয়। কিন্তু এরূপ পরিণত অবস্থার ধারণা সম্পর্কে সাধারণ প্রগতি এবং হযরতের শিক্ষার সম্যক উপলব্ধি থেকেই শুধু আসতে পারে। বহুবিবাহ প্রথা অন্তর্হিত হচ্ছে কিংবা শীঘ্রই অন্তর্হিত হবে নতুন আলোকে যার প্রেক্ষাপটে তাঁর বাণী অধীত হচ্ছে।

পূর্বেই মন্তব্য করা হয়েছে যে প্রত্যেক স্তরেই মুহম্মদের জীবন ব্যবস্থার সংগতি ধর্মপ্রবর্তকের জ্ঞানবত্তার পরিচয় বহন করে। অনুন্নত সমাজে বহুবিবাহের ক্ষেত্রে হযরত কর্তৃক আরোপিত রক্ষাকবচ কোনক্রমেই অনিষ্ট হিসেবে নিন্দিত হওয়ার নয়। অন্ততঃপক্ষে এ নারীর বহু বিবাহের প্রথা, অভ্যাস ও জীবন প্রণালীর চেয়ে অধিকতর বাঞ্ছিত। এই প্রথা যাবতীয় নৈতিক সংযমের সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যানের নজীর। কৃষ্টির যতই অগ্রগতি হচ্ছে বহুবিবাহ প্রথা থেকে উদ্ভূত কুফল ততই উপলব্ধ হচ্ছে এবং এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা ততই বোধগম্য হচ্ছে। আমরা একথা বলতে মোটেই প্রস্তুত নই যে ভারতে মুসলমানেরা ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে বড় একটা উপকৃত হয়েছে, যাদের মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি একটা আইন অনুমোদিত প্রথা। তাদের নৈতিক ধারণা শিথিল হয়েছে; মানবিক মর্যাদা ও অধ্যাত্ম বিশুদ্ধতা অধঃপতিত হয়েছে; 'হেতারায়' শ্রেণী মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে সমভাবে জনপ্রিয় হয়েছে। তথাপি কিছু দৃশ্যমান সংকেত রয়েছে যা আমাদের মনে আশার সঞ্চার করে যে, আল্লাহর আলোক বা সপ্তম শতাব্দীতে আরবদেশকে জাগ্রত করেছিল তা তাদের হৃদয়ের উপর পতিত হবে এবং তারা বর্তমানে যে অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে তা থেকে তাদেরকে উদ্ধার করবে। মুতাজিলা চিন্তাবিদেরা তাদের বিশ্বাস অনুসারে কঠোরভাবে এক-বিবাহের পক্ষপাতী;তাদের মতে পূর্ববর্তী চুক্তি বহাল থাকাকালে দ্বিতীয় মিলন আইন নিষিদ্ধ করে। অন্য কথায়, মুতাজিলা বিবাহ প্রত্যেক দিক দিয়ে এক-বিবাহ প্রথার শর্তাবলী পূরণ করে "একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সারা জীবনের জন্য স্বেচ্ছাকৃত মিলন হিসেবে"।

এমনকি প্রাচীন সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে একটা বড় দল বহুবিবাহ প্রথাকে আইন-বিগর্হিত বলে বিবেচনা করত। যে অবস্থাসমূহের প্রেক্ষিতে প্রাচীনকালে এই প্রথা অনুমোদিত হত তা হয় অন্তর্হিত হয়েছে নতুবা তা বর্তমানে উপস্থিত নেই।

www.amarboi.org

বাস্তবিকপক্ষে বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে মানুষের অনুভূতি নৈতিক বিশ্বাস হিসেবে না হলেও সামাজিক বিশ্বাস হিসেবে দৃঢ়তর হচ্ছে এবং এই অনুভূতির সঙ্গে মিলে অনেক বাইরের পরিস্থিতি ভারতীয় মুসলমানদের ভেতর থেকে এই প্রথা নির্মূল করার কাজে এগিয়ে চলেছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহের রেজিস্ট্রী দলিলে এই মর্মে একটি শর্ত সংযুক্তি প্রথা হিসেবে চালু হয়েছে যে প্রথম বিবাহচুক্তি বলবৎ থাকাকালে বিবাহ-ইচ্ছুক স্বামী তার দ্বিতীয় বিবাহ করার কথিত অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জন করেন। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শতকরা পঁচানব্বই জন লোক বর্তমানে বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হোক কিংবা প্রয়োজনের তাগিদে হোক একপত্নীক। শিক্ষিত শ্রেণী যারা তাদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত এবং অন্যান্য জাতির বিবরণের সঙ্গে তাদের ইতিহাসের তুলনা করতে সমর্থ তাদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা অননুমোদিত। পারস্যে জনগণের একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র বহু বিবাহের বিতর্কমূলক বিলাসিতা উপভোগ করে।[২০] এটা আন্তরিকভাবে আশা করা যায় যে বহুপূর্বে মুসলমান আইনজ্ঞদের সাধারণ বিতর্ক সভা প্রামাণ্য কর্তৃত্বের সঙ্গে ঘোষণা করবেন যে দাসপ্রথার মতো বহুবিবাহ প্রথা ইসলামী আইনে অপ্রীতিকর।

এবার আমরা মুহম্মদের বিবাহের বিষয়ে আলোকপাত করব। পরিস্থিতির অজ্ঞতার দরুন ও মূল্যায়নের জন্য পর্যাপ্ত সততার অভাবে অনেকে ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের একটি ভিত্তি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর খ্রিস্টান আক্রমণকারীরা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বহুবিবাহ করে আইন সমর্থন করে না এমন সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং প্রেরিতপুরুষের পক্ষে উপযুক্ত নয় এমন চারিত্রিক দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাসের প্রকৃত জ্ঞান এবং পরিস্থিতির অধিকতর সঠিক মূল্যায়ন তাঁকে আত্মতুষ্ট একজন কামুক প্রমাণ না করে চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করে যে যখন তিনি পুরাতন গোষ্ঠীপতি—প্রথানুসারে বিবাহিত স্ত্রীদের ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করেছিলেন অথচ নিজে দরিদ্র ও সম্বলহীন ছিলেন, তখন তিনি চটুল নয় এমন চরিত্রের আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিলেন। আমরা বিশ্বাস করি যে মানবিকতার দিক থেকে তাঁর উদ্দেশ্যসমূহের পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ "মহান আরব্য পুরুষের" বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগসমূহের অসত্যতা ও অনুদারতা প্রতিপন্ন করবে। যখন মুহম্মদের বয়স মাত্র পঁচিশ, যখন তিনি যৌবনের প্রারম্ভে, তখন তিনি খাদিজাকে বিবাহ করেন যিনি বয়সে তাঁর চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। বিবাহের পর থেকে পঁচিশ বৎসর কাল পর্যন্ত খাদিজার সঙ্গে তাঁর বৈবাহিক জীবন অখণ্ড, বিশ্বস্ততা ও শান্তির সূর্যকরোজ্জ্বল আভায় অতিবাহিত হয়েছিল। পৌত্তলিকগণ যে সব নিন্দাবাদ ও নির্যাতন তাঁর উপর স্তূপীকৃত করেছিল তাতে খাদিজা ছিলেন তাঁর একমাত্র সাথী, সমব্যথী ও সাহায্যকারী। খাদিজার মৃত্যুকালে মুহম্মদের বয়স হয়েছিল একান্ন বৎসর। তাঁর দুশমনগণ একথা অস্বীকার করতে পারেন না বরং তারা স্বীকার করতে বাধ্য যে এই দীর্ঘকালের মধ্যে তারা তাঁর চরিত্রে একটিমাত্র কলঙ্কও দেখতে পাননা। খাদিজার জীবদ্দশায় তিনি কোন বিবাহ করেননি যদিও তিনি পছন্দ করলে জনমত তা অনুমোদন করত।

www.amarboi.org

খাদিজার মৃত্যুর কয়েক মাস পর এবং তায়েফ থেকে অসহায় ও নির্যাতীত হয়ে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সাকরানের বিধবা পত্নী সওদাকে বিবাহ করেন। সাকরান ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং পৌত্তলিকদের নির্যাতন এড়ানোর জন্য আবিসিনিয়ায় পলায়ন করতে বাধ্য হন। সাকরান নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এবং তার স্ত্রী সহায়সম্বলহীন অবস্থায় নিপতিত হন। দেশের প্রথানুসারে বিবাহই ছিল একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে ধর্মগুরু তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারীর বিধবা স্ত্রীকে নিরাপত্তা ও সাহায্য দিতে পারতেন। উদারতা ও মানবিকতার প্রত্যেকটি মূলনীতি মুহম্মদকে এ ব্যাপারে তাঁর হস্ত প্রসারিত করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। নতুন ধর্মের জন্য তার স্বামী জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, ধর্মের জন্য তিনি গৃহ ও দেশ ত্যাগ করেছিলেন; তার স্ত্রী নির্বাসনে সাথী ছিলেন এবং নিঃসম্বল অবস্থায় মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। দীনহীনা স্ত্রীলোকের একমাত্র সাহায্য করার উপায় বিবাহ হওয়া, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহের সম্বল অত্যন্ত সঙ্কুচিত হওয়া সত্ত্বেও মুহম্মদ সওদাকে বিবাহ করেন।

ওসমান আবু কুহাফার পুত্র আব্দুল্লাহ পরবর্তীকালে ইতিহাসে আবু বকর নামে পরিচিত হন। তিনি ছিলেন মুহম্মদের সবচেয়ে একজন অনুগত অনুসারী। হযরতের ধর্মে প্রথম দীক্ষিতদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। মুহম্মদের প্রতি নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও অবিচল অনুরাগের দিক দিয়ে তিনি প্রায় আলীর সঙ্গে তুলিত হতে পারেন।

আবু বকরের (যাকে আমরা এই নামে যথাযথভাবে অভিহিত করতে পারি) আয়েশা নাম্নী অল্পবয়স্কা একটি কন্যা ছিল। তাঁর জীবনের একমাত্র বাসনা ছিল, যিনি তাকে অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে মুক্ত করেছেন সেই হযরত ও তাঁর মধ্যে যে অনুরাগ বিদ্যমান, সেই অনুরাগকে তিনি চিরস্থায়ী বন্ধনে বেঁধে দেবেন মুহম্মদের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়ে। তখন কন্যার বয়স মাত্র সাতবৎসর; তবে দেশের প্রথা অনুসারে এই ধরনের বিবাহ বন্ধন স্বীকৃত ছিল। ভক্তের ঐকান্তিক অনুরোধের ফলে নাবালিকা কুমারী হযরতের স্ত্রীত্বে বরিত হয়।

হিজরতকারীদের মদিনায় উপস্থিত হওয়ার কিছুকাল পরে এমন একটি ঘটনা ঘটল বা সেকালের আরবদের জীবনযাত্রার উপর প্রভূত আলোকপাত করে। যারা আরবদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য—"অহঙ্কার, যুদ্ধপ্রিয়তা, বিশেষ সম্মানবোধ এবং অদ্ভুত ক্ষমতার প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও ধৈর্য সম্পর্কে অবহিত আছেন যাঁরা অদ্ভুত ক্ষমতার প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও ধৈর্য সম্পর্কে অবহিত আছেন তাঁরা ঘটনাটির পূর্ণ তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবেন। বার্টন বলেছেন, এমন কি এখনও "ব্যক্তির মধ্যে কথা কাটাকাটি বেদুঈনদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।" ওমর ইবনুল খাত্তাব, যিনি পরবর্তীকালে দ্বিতীয় খলিফার পদে বরিত হয়েছিলেন তাঁর একটি কন্যা ছিল নাম হাফসা। এই সদাশয়া মহিলা বদরের যুদ্ধে তাঁর স্বামীকে হারান। তাঁর মেজাজ ছিল তাঁর পিতার মতই উগ্র। এ কারণে তাঁর আর বিবাহ হয়নি। বিবাহ-ইচ্ছুক হযরতের অনুসারীবৃন্দ তাঁকে এড়িয়ে চলতেন। এটা কন্যার পিতার উপর কটাক্ষের সামিল ছিল।

www.amarboi.org

এই নিন্দার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তিনি আবু বকরকে তাঁর কন্যার পানিগ্রহণের প্রস্তাব দেন এবং আবু বকর রাজী না হওয়ায় ওসমানকে তিনি প্রস্তাব দেন। ওসমানও এ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। এটা একটা প্রত্যক্ষ অবমাননার সামিল ছিল। ওমর ক্রোধান্বিত হয়ে অভিযোগ করার জন্য মুহম্মদের সমীপে অগ্রসর হন। যে কোন প্রকারে হোক তাঁর সম্মানের অনুকূলে একটা মীমাংসা হওয়া চাই। কিন্তু আবু বকর ও ওসমান কেউই হাফসার মেজাজ সহ্য করতে রাজী ছিলেন না। এ বিবাদ আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে যতই হাস্যকর মনে হোক না কেন, তখন তা বিশ্বাসীদের এই ক্ষুদ্র দলটিকে বিভ্রান্তির আবর্তে টেনে আনার জন্য যথেষ্ট ছিল। হযরত এই সংকটাবস্থায় মুসলমান জাতির প্রধান কন্যাটিকে বিবাহ করে পিতার ক্রোধ প্রশমিত করেন। আর জনগণ এটা শুধু অনুমোদনই করেনি, এতে তারা উৎফুল্লও হয়েছিল।[২১]

হিন্দ উম্মে সালমা, উম্মে হাবিবা ও জয়নব উম্মুল মাসাকিন[২২] হযরতের এই তিন স্ত্রীও বিধবা ছিলেন; তারা পৌত্তলিকদের শত্রুতার ফলে তাদের স্বাভাবিক সংরক্ষকদের হারিয়েছিলেন এবং তাদের আত্মীয়-স্বজন হয় তাদের তত্ত্বাবধানে অক্ষম ছিলেন নয় অনিচ্ছুক ছিলেন।

মুহম্মদ তাঁর অনুরক্ত বন্ধু ও মুক্ত-দাস জায়েদকে বিবাহ দিয়েছিলেন আরবের দুটি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত উচ্চ শ্রেণীর জয়নবের সঙ্গে। উচ্চ বংশে জন্ম ও খুব সম্ভব সৌন্দর্যের জন্য মুক্তদাসের সঙ্গে তার বিয়েতে তিনি খুশি হতে পারেননি। পারস্পরিক বিতৃষ্ণা শেষ অবধি ঘৃণায় পর্যবসিত হয়। সম্ভবত স্বামীর দিক থেকে এই বিতৃষ্ণা বৃদ্ধি পেয়েছিল জয়নবকে একবার দেখে মুহম্মদের মুখ থেকে নিঃসৃত কয়েকটি কথা বারবার উচ্চারণের ফলে, যা নারীদেরই জানা আছে কিভাবে তা করতে হয়।

তিনি কয়েকবার জায়েদের বাড়িতে গিয়েছিলেন এবং জয়নবের অনাবৃত মুখ-দর্শন করে আজকের মুসলমানেরা কোন সুন্দর ছবি ও প্রস্তর মূর্তি দেখে যেরূপ বলে থাকে তেমনি স্বোচ্ছাসে বলেছিলেন "হৃদয়ের অধিপতি আল্লাহর জন্য সর্ববিধ প্রশংসা।"

যে শব্দগুলি স্বাভাবিক প্রশংসার খাতিরে বলা হয়েছে তা জয়নব তার স্বামীর কাছে প্রায়ই উচ্চারণ করেছে এটা প্রতিপন্ন করার জন্য যে এমন কি হযরতও তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছেন এবং স্বাভাবিকভাবে তা তার মনস্তাপ বৃদ্ধি করেছে। অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে তিনি আর তার স্ত্রীর সঙ্গে বসবাস করবেন না; আর এই দৃঢ়-সংকল্প নিয়ে তিনি হযরতের সমীপে গমন করলেন এবং তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করার সংকল্পের কথা জানালেন। হযরত তাকে প্রশ্ন করলেন : "তুমি কি তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখতে পেয়েছ?" জায়েদ উত্তর করলেন, "না। কিন্তু আমি আর তার সঙ্গে বসবাস করতে পারবনা।" হযরত তাকে আদেশের সুরে বললেন, "বাড়িতে ফিরে গিয়ে তোমার স্ত্রীকে দেখাশোনা কর, তার সঙ্গে ভাল আচরণ কর এবং আল্লাহকে ভয় কর কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের' প্রতি সদাচরণ কর আর আল্লাহকে ভয় কর।" কিন্তু জায়েদ তার সংকল্পে অবিচল এবং হযরতের আদেশ সত্ত্বেও তিনি জয়নবকে পরিত্যাগ

www.amarboi.org

করলেন, জায়েদের আচরণে মুহম্মদ দুঃখিত হয়েছিলেন, বিশেষ করে তিনিই এ দুটি প্রতিকূল আত্মার মধ্যে বিবাহ-বন্ধনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

জয়নব জায়েদের নিকট থেকে তালাক সংগ্রহের পরে থেকে তাকে বিবাহ করার জন্য মুহম্মদকে সানুনয় অনুরোধ চালিয়ে যেতে লাগল, আর যতদিন পর্যন্ত সে হযরতের অন্যতম মহিষীতে পরিণত না হল ততদিন পর্যন্ত শান্ত হল না।[২৩]

হযরতের অপর এক স্ত্রীর নাম ছিল জুয়াইরিয়া। সে বণী মুস্তালিক গোত্রের প্রধান হারিসের কন্যা এবং তাদের বিদ্রোহ দমন করার জন্য পরিচালিত অভিযানকালে তাকে বন্দী অবস্থায় আনয়ন করা হয়। সে তার গ্রেফতারকারীর সঙ্গে একটি চুক্তি করল নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে তার স্বাধীনতা কিনে নেওয়ার জন্যে। সে মুহম্মদকে তার নির্দিষ্ট অর্থ হিসেবে আবেদন করল ও তৎক্ষণাৎ তার আবেদন মঞ্জুর হয়ে গেল। এই করুণার স্বীকৃতি ও তার স্বাধীনতা দানের জন্য কৃতজ্ঞতার প্রকাশ হিসেবে সে মুহম্মদকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিল এবং বিবাহ হয়ে গেল। যখন মুসলমানেরা এই সম্বন্ধের খবর শুনতে পেল তখন তারা তাদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল যে বণী মুস্তালিক এখন হযরতের আত্মীয় এবং তাদের সঙ্গে আমরা তদ্রূপ আচরণ করব। প্রত্যেক বিজয়ী তাদের বন্দীদের মুক্তি প্রদান করল, এরূপে শত শত পরিবার তাদের স্বাধীনতা ফিরে পেল এবং মুহম্মদের সঙ্গে জুয়াইরিয়ার বিবাহকে মুবারকবাদ জানাল।[২৪]

ইহুদী রমণী সফিয়াকে খয়বারের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় মুসলিমেরা বন্দী হিসেবে এনেছিল। তাকেও মুহম্মদ উদারতার সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং তার সনির্বন্ধ অনুরোধের জন্য তাকে স্ত্রীত্বে বরণ করেছিলেন।

মায়মুনাকে মুহম্মদ মক্কায় বিবাহ করেছিলেন। তিনি ছিলেন তার আত্মীয়া ও পঞ্চাশের উর্ধ্বে ছিল তার বয়স। এই বিবাহ দীন আত্মীয়ার অবলম্বন হিসেবেই শুধু কাজ করেনি, অধিকন্তু ইসলামের জন্য লাভ করেছিল দু'জন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব—ইবনে আব্বাস এবং ওহোদের দুর্ভাগ্যজনক যুদ্ধে কোরাইশ অশ্বারোহী দলের সেনাপতি ও পরবর্তীকালে গ্রীক-বিজেতা খালিদ বিন ওয়ালিদ।

এরূপ ছিল মুহম্মদের বিবাহের বৈশিষ্ট্য। কতিপয় বিবাহের সম্ভবতঃ পুত্র-সন্তান লাভের ইচ্ছা থেকে জন্ম লাভ করে থাকবে, কেননা তিনি দেবতা ছিলেন না এবং স্বাভাবিকভাবে পুত্র উত্তরাধিকারী রেখে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে থাকবেন। তিনি শত্রুদের আরোপিত অবজ্ঞাসূচক ডাকনাম এড়িয়ে যাওয়ার কামনাও পোষণ করে থাকবেন।[২৫]

কিন্তু ঘটনা যেরূপ তাকে সেভাবে নিলেও আমরা দেখতে পাই যে এইসব বিবাহ যুযুধান গোত্রসমূহকে একত্র করতেও তাদের মধ্যে অনেকটা সামঞ্জস্য বিধানে সহায়ক হয়েছিল।

বংশবিরোধের রেওয়াজ আরব পৌত্তলিকদের মধ্যে জোরদার ছিল; রক্তক্ষয়ী বিবাদ গোত্রের ভাগ্য নির্ধারণ করত। এমন পরিবার ছিলনা যারা রক্তক্ষয়ী কলহে লিপ্ত ছিল না,

www.amarboi.org

এবং প্রায়ই পুরুষ সদস্যরা নিহত হত। ফলে নারী ও শিশুরা দাসত্বে পর্যবসিত হত। মুসা তাঁর লোকদের মধ্যে এই বংশবিরোধ বিদ্যমান দেখতে পেয়েছিলেন (সব জাতির মধ্যে ক্রমবিকাশের বিশেষ স্তরে এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল); তিনি এ রেওয়াজ দূর করতে অসমর্থ হয়ে একে পবিত্র অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৈধ করেন। প্রয়োগিতব্য প্রতিকারসমূহের গভীরতর ধারণা নিয়ে মুহম্মদ বিভিন্ন বিরোধী পরিবার ও শক্তিশালী গোত্রসমূহকে পরস্পর এবং তাঁর নিজের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করেন। তাঁর নবুয়্যতের কার্যকলাপের শেষের দিকে আরাফাতের ময়দানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে আজ থেকে সব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান ঘটল।

প্রাচীনকালের মহান ধর্মগুরুদের নিয়ন্ত্রণাধীনে যে উদ্দেশ্য মুহম্মদকে বহুস্ত্রী রক্ষণাবেক্ষণে পরিচালিত করেছিল এবং যা অসহায় বা বিধবা নারীদেরকে অন্য কোন উপায়ের অনুপস্থিতিতে বেঁচে থাকবার সুযোগ প্রদান করেছিল তা পক্ষপাতমূলক ও কপটশত্রুদের ঈর্ষাপরায়ণতা বিকৃত করেছে। তাদেরকে নিজ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে মুহম্মদ একমাত্র উপায়ে, যা সে যুগ ও জনগণ সম্ভব করেছিল, তাদের পুনর্বাসন করেছিলেন।

পাশ্চাত্যে লোকে বহুবিবাহকে স্বতঃভাবেই অনিষ্ট হিসেবে বিবেচনা করে; আর তার অনুশীলনকে অবৈধই মনে করে না। বরং স্বেচ্ছাচারিতা ও নীতিহীনতার ফল বলে মনে করে। তাঁরা ভুলে যায় যে এসব প্রথা কালের অবস্থা ও প্রয়োজনের সৃষ্টি। তারা ভুলে যায় যে হিব্রুজাতির মহান ধর্মগুরুগণ, যাদেরকে সমুদয় সেমিটিক ধর্মমতের অনুসারীরা নৈতিক শানশওকতের দৃষ্টান্ত বলে মনে করেন, তাঁরা এত বেশি পরিমাণে বহুবিবাহ প্রথার অনুশীলন করেছেন যা আমাদের আধুনিক যুগে বৈধকৃত নীতিহীনতার পরিণতি বলে মনে হয়। আমরা তাদের রেওয়াজ বা আচরণকে সম্ভবত অজিজ্ঞাসিত যেতে দিতে পারি না, যদিও কালনন্দিত পুরাণ তাকে পবিত্র আভায় রঞ্জিত করেছে। কিন্তু আরবের নবীর বেলায় আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে তাঁর বৈবাহিক ক্রিয়াগুলির ঐতিহাসিক মূল্য ও গুরুত্ব রয়েছে।

সম্ভবতঃ একথা বলা যেতে পারে যে কোন প্রয়োজন হযরতকে প্ররোচিত করেনি বহুবিবাহের মতো একটি অনিষ্টকর প্রথাকে অনুশীলন করতে বা অনুমোদন করতে, আর তার পক্ষে এটা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা উচিত ছিল। যীশুখ্রিস্ট এটা উপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু এই প্রথা অন্যান্য অনেক প্রথার মতো সম্পূর্ণ অনিষ্টকর নয়। অনিষ্ট একটি আপেক্ষিক পদ। একটি কাজ বা একটি প্রথা মুখ্যতঃ ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক ধারণার সঙ্গে নিতান্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে, কিন্তুজাতির ধারণার অগ্রগতি ও অবস্থার পরিবর্তনের ফলে অনিষ্টকর প্রবণতায় পর্যবসিত হতে পারে এবং কালক্রমে তা সরকার কর্তৃক অবৈধ ঘোষিত হতে পারে। ধারণা যে প্রগতিশীল তা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু রীতি-নীতি প্রথা ধারণার অগ্রগতির উপর নির্ভরশীল এবং এসব অবস্থানুযায়ী ভাল বা মন্দ, মঙ্গল বা অমঙ্গল হিসেবে চিহ্নিত হয় কিংবা এ সব বিবেক—"কালের মনোভঙ্গী" অনুসারে ভাল

www.amarboi.org

বা মন্দ, মঙ্গল বা অমঙ্গল চিহ্নিত হয়—এই সত্য ভাসাভাসা চিন্তাবিদেরা প্রায়ই উপেক্ষা করেছেন।

আদিম খ্রিস্টধর্মের ইতিহাসের একটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বিবাহের প্রতি তার নিন্দা বা বীতরাগ। বিবাহ নিকৃষ্টতার শর্ত হিসেবে আর শিশুর জন্ম অমঙ্গল হিসেবে বিবেচিত হত। সন্ন্যাস জগৎ থেকে সর্বাপেক্ষা উৎসাহী মনকে তুলে নিয়েছিল; অপেশাদার যাজককে হয় বিবাহ করতে দেওয়া হত না নতুবা একবারের অধিক বিবাহ করতে দেওয়া হত না। এই অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য আংশিকভাবে ধর্মগুরুর দৃষ্টান্তর ফল এবং আংশিকভাবে বিভিন্ন অবস্থা যা আদিম খ্রিস্টীয় সংগঠনের উপর চেপে বসেছিল তার ফল।

নাজারাতের প্রেরিত পুরুষের এসেন সম্প্রদায়ের সাধুপুরুষদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্রব, খোদার রাজত্বের অব্যবহিত আবির্ভাব সম্পর্কীয় জীবন্ত প্রত্যাশা যেখানে সব সম্পর্কের অবসান ঘটবে এবং তাঁর নবুয়্যতের কার্যকালের সত্বর পরিসমাপ্তি—এসব বিবাহ সম্পর্কীয় তাঁর নিন্দার ব্যাখ্যা দেয়, আমরা আরও যোগ করতে পারি তিনি কখনও বিবাহ অবস্থায় প্রবেশ করেননি তা সুস্পষ্ট করে তোলে। ব্যাপটিষ্টদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ এবং তিনি নিজে একজন এসেন, এ তাঁর স্বল্পস্থায়ী ও সর্বাপেক্ষা করুন জীবনেতিহাসের উপর আলোকপাত করে। নারীজাতির প্রতি পলের প্রবল অথচ দুর্বোধ্য বিতৃষ্ণা ধর্মগুরুর বাণীর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, আর নর-নারীর পবিত্রতম বিবাহ-বন্ধন একটি পাপাচার এবং এই অমঙ্গলকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হবে—এই এসেনিক ধারণা ধর্মের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। সন্তান উৎপাদন ও মানুষের "জৈব ক্ষুধার" পরিতৃপ্তি একমাত্র লক্ষ্য বলে বিবাহকে মনে করা হত। আর অদ্যাবধি অধিকাংশ খ্রিস্টান গির্জার বিবাহ পরিচালনা এই আদিম ধারণার পোষকতা করে। এই ধারণা খ্রিস্টধর্মের ললাটে খোদিত হয়ে গেছে এবং এখনও এই প্রভাব স্থায়ী হয়ে রয়েছে যেখানে মানবকল্যাণমুখী বিজ্ঞানের প্রভাবে তা স্থানচ্যুত হয়নি। ধারণাটি এই : যে ব্যক্তি কোন দিন বিবাহ করেনি সে ব্যক্তি যে বিবাহ করে কলুষিত হয়েছে তার চেয়ে অনেক অনেক উৎকৃষ্ট। ভারতের ভস্মমাখা যোগীপুরুষ, ও বৌদ্ধপুরোহিতগণ ছিলেন অবিবাহিত। তাদের মতে, "গৃহ ও পরিবারের সমুদয় প্রেমবন্ধন ছিন্ন করতে না পারলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয় এবং একক জীবনযাপন না করতে পারলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয় এবং একক জীবনযাপন না করতে পারলে অনন্তের উপলব্ধি সম্ভব নয়।" প্রাচ্য নষ্টিকবাদ ও কৃচ্ছ তাবাদের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মের মধ্যে কৌমার্য-প্রথা প্রবেশ লাভ করে। যীশুর "অবিবাহিত অবস্থাকে" কেউ কেউ তাঁর ঐশীত্বের প্রমাণ বলে মনে করেন, আবার কেউ কেউ জগতের সমুদয় ধর্মগুরুর উপর তাঁর অপরিমেয় শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন বলে মনে করেন। আমাদের মতে, যীশু ও মুহম্মদের মধ্যে তুলনা বা বৈসাদৃশ্য যেভাবে খাড়া করা হয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে অমূলক এবং নৈতিক আদর্শের ভ্রান্ত মূল্যায়নের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিখুঁত জীবন সেক্ষেত্রে সমুদয় পারিবারিক সম্পর্কের সম্পূর্ণ নির্বাসনকে বুঝাত। নিশ্চয়ই এই মতবাদ স্বভাবের বিকৃতি

—১৮

www.amarboi.org

এবং তা মানবজাতির ক্ষেত্রে মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনে। তা যদি না হবে তবে হযরতের প্রতি কেন এই কুৎসা, যিনি যীশুর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করেছিলেন? এটা কি তিনি একাধিক বিবাহ করেছিলেন সে জন্য? আমরা এসব বিবাহের তাৎপর্য প্রতিপন্ন করেছি, আমরা অন্ততঃ দেখাবার চেষ্টা করেছি যে এসব কাজের মধ্যে তিনি ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যা তাঁর বিরুদ্ধে অপবাদ হিসেবে দাড় করানো হয়েছে।

এবার অমূর্ত দিক থেকে তাঁর বিবাহের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। কেন মুসা একাধিক বিবাহ করেছিলেন।তিনি কি এরূপ করার জন্য নৈতিক ছিলেন কিংবা কামুক হয়ে গিয়েছিলেন? কেন দাউদ নবী, "যিনি ছিলেন খোদার পছন্দসই বান্দা" অগণিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন? এর উত্তর অত্যন্ত সহজ—প্রত্যেক যুগের নিজস্ব মানদণ্ড রয়েছে। এক সময়ে যা উপযোগী অন্য সময়ে তা উপযোগী নয় এবং আমাদের উচিত নয় বর্তমানের মাপকাঠি দিয়ে অতীতের মূল্যায়ন করা। আমাদের আদর্শ তার কাল-সীমার মধ্যে নিজ মানদণ্ড অনুযায়ী সত্যনিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে কাজ করে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব হারায়নি। আমরা কি যীশুকে ব্যর্থ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অবাস্তববাদী বলে কিংবা মুসা ও দাউদকে নিষ্ঠুর ইন্দ্রিয়বাদী অভিহিত করে ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিতে পারব, কেননা একজনের মন প্রত্যাশিত স্বর্গরাজ্যের অস্পষ্ট চিন্তায় ভরপুর ছিল এবং অন্যদের জীবন বিংশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত আপত্তিকর ছিল? উভয় ক্ষেত্রেই আমরা ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হব; একজনের উচ্চাশা, অন্যান্যদের কৃতকার্যতা—সবই ঐতিহাসিক তথ্য এবং তা তাদের কালোপযোগী। এটা একজন প্রেরিত পুরুষের সত্যতম বৈশিষ্ট্য যে তিনি তাঁর সর্বোচ্চ মেজাজে উন্নীত হলেও অনাগতের প্রত্যাশায় জীবনধারণের ব্যাপারে দৃষ্টি হারান না। তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যেই মানবজাতির ক্রমবিকাশকে প্রতিবেদন করে থাকেন। যীশু কিংবা মুহম্মদ কেউই অস্তিত্বশীল সমাজকে তাৎক্ষণিকভাবে মুছে ফেলতে পারতেন না কিংবা সমুদয় জাতীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিলোপসাধন করতে পারতেন না।। যীশুর মতো মুহম্মদ যেখানে আদেশ জারী করা আবশ্যক নয় সেখানে যুগের চাহিদা মেটানোর জন্য "তাঁর অনুসারীদের হৃদয়ে নীতি প্রোথিত করে দিয়েছিলেন, যা সময় আসলে দূরীকরণের ভূমিকা পালন করবে"।

মুহম্মদ যে সুযোগ-সবিধা নিয়েছিলেন তা তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রতি অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন—এই উক্তি সম্পর্কে এইটুকুই বলা যেতে পারে যে, এ কথা অজ্ঞতাপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। হিযরতের কয়েক বছর পরে মদিনায় বহুবিবাহের উপর সীমা আরোপিত হয়েছিল। তাঁর সম্পর্কে যে ব্যবস্থা তা একজন কামুকের সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে একজন আত্মসচেতন আত্মসমীক্ষকের সচেতনভাবে আরোপিত ভার ছির। তাঁর সমদুয় বিবাহচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল বহুবিবাহের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে প্রত্যাদেশ নাজিল হওয়ার পূর্বে এবং এই প্রত্যাদেশের সঙ্গে অন্য একটি প্রত্যাদেশ নাজিল হল যার ফলে তাঁর থেকে সব সুবিধা কেড়ে নেওয়া হল। যখন তাঁর অনুসারীরা চারটা পর্যন্ত বিবাহ করার অনুমতি প্রাপ্ত হল (আইনের শর্তাধীন) এবং হযরতের প্রকাশ্য নিন্দা সত্ত্বেও

www.amarboi.org

অদ্যাবধি তারা যে সুবিধা এখনও ভোগ করে আসছে—তালাকের পর নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারত; কিন্তু তাঁর বেলায় তিনি যে সব স্ত্রীদেরকে ভরণপোষণের জন্য গ্রহণ করেছিলেন তাদের কাউকে তালাক দিতে পারতেন না কিংবা অন্য কোন বিবাহ করতে পারতেন না। এটা কি "সুযোগ" গ্রহণ ছিল কিংবা তাঁর সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল তাদের জন্য এটা কি অনুকম্পাসম্মত ব্যবস্থা ছিল না—আর তাঁর প্রত্যাদিষ্ট কার্যে তাঁর নিজের ক্ষেত্রে এটা কি পূর্ণাঙ্গ আত্মত্যাগের প্রত্যাদেশ ছিল না?

তালাকের বিষয়টি ভ্রান্তধারণা ও বিতর্কের ফলপ্রসূ উৎস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে আর এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন হতে পারে না যে তালাকের ক্ষেত্রে নারীদের ব্যাপারে কোরআনিক আচরণ-বিধি "অন্যান্য কিতাবের বিধির তুলনায় অধিকতর মানবিক মর্যাদাসম্পন্ন ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রসূত"।

পুরাকালের জাতিসমূহের মধ্যে তালাকের ক্ষমতা বিবাহ আইনের অপরিহার্য অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচিত হয়েছে; এই অধিকার কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া সম্পূর্ণরূপে শক্তিশালী লিঙ্গের অর্থাৎ পুরুষের জন্য সংরক্ষিত ছিল; কোন অবস্থাতেই স্ত্রীর তালাক দেওয়ার অধিকার ছিল না।

সভ্যতার অগ্রগতি ও ধারণার ক্রমবিকাশের ফলে নারীজাতির অবস্থার আংশিক উন্নতি সাধিত হয়েছিল। ফলে তারা তালাকের সীমাবদ্ধ অধিকার লাভ করেছিল যা স্বাধীনভাবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে ছিল না, রোমক সম্রাটদের অধীনের যে সুবিধার ভেতর দিয়ে বিবাহচুক্তি সম্পাদিত ও বাতিল হত তা পর্যন্ত প্রবাদে পরিণত হয়েছিল।

প্রাচীন হিব্রু আইনের অধীনে যে কোন কারণে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত এবং তার ক্ষমতার স্বেচ্ছাচারমূলক ও খাম-খেয়ালী ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কোন কারণেই স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রী তালাক দাবী করতে পারত না।[২৬]

পরবর্তীকালে শামামাইতরা তালাকের পরিচালনার উপর কতিপয় শর্ত আরোপ করে কিছু পরিমাণে তালাক-প্রথার সংস্কার সাধন করেছিল। কিন্তু হিলেল সম্প্রদায় আদিম কঠোরতার সঙ্গে আইনটির পোষকতা করেছিল।

হযরতের আবির্ভাব কালে আরবের ইহুদী গোত্রসমূহের মধ্যে হিলেলাইত মতবাদ প্রধানত সক্রিয় ছিল এবং স্বামী কর্তৃক স্ত্রী পরিত্যাগ পৌত্তলিকদের মতো তাদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

এথেন্সবাসীদের মধ্যেও প্রাচীন ইসরাইলীদের মতো স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রত্যাখান করার অধিকার ছিল অবাধ।

রোমকদের মধ্যে আদিকাল থেকেই তালাক প্রথার আইনগত বৈধতা স্বীকৃত হয়েছিল। 'দ্বাদশ টেবিলে'র আইনসমূহ তালাক অনুমোদন করেছিল। রোমান জাতির প্রশংসাকারীরা যেরূপ বর্ণনা করেছেন তাদের মহানগরী প্রতিষ্ঠার পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত তারা এই আইনের সুযোগ-সুবিধা নেয়নি, এর কারণ এই ছিল না যে তারা অন্যান্য

www.amarboi.org

জাতির চেয়ে অধিকতর দৃষ্টান্তমূলক ছিল, বরং এই কারণে যে বিষপ্রদান, মদ্যপান ও জারজ সন্তান বিনিময় করার জন্য স্বামী-স্ত্রীকে সরাসরি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে পারত। কিন্তু তালাকের জন্য স্ত্রীর আবেদনপত্র পেশ করার ক্ষমতা ছিল না;[২৭] যদি সে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য প্রার্থনা করত তবে তার এই দুঃসাহসের জন্য তাকে সাজা পেতে হত। কিন্তু গণপ্রজাতান্ত্রিক রোমে প্রায়ই বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটত; এটা ছিল নৈতিকতার দ্রুত অবক্ষয়ের ফলশ্রুতি।

আমরা পুরাকালের সবচেয়ে বিখ্যাত দুটো জাতিকে নির্বাচিত করেছি যাদের চিন্তাধারা আধুনিক চিন্তাধারা, আধুনিক জীবন ও আধুনিক কর্ম-ধারার উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছে। বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কে রোমানদের আইন নারী জাতির অবস্থার উন্নতি ও পুরুষের সমপর্যায়ে উন্নীত করার প্রগতিশীল মনোভাব-নির্দেশক। এ যতখানি মানব-চিন্তার অগ্রগতির ফল ততখানি বাহ্য কারণের অগ্রগতিরও ফল।

"যীশুর উপদেশের মধ্যে যে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ রয়েছে তা আইন-প্রণেতাদের জ্ঞানবত্তার দাবীর কাছে যে কোন ভাষ্যের ক্ষেত্রে নমনীয়।"[২৮] আমরা বেশ অনুমান করতে পারি যে, যে সময়ে যীশু উচ্চারণ করেছিলেন আল্লাহ্ যা সংযুক্ত করেছেন কোন মানুষ যেন তা বিচ্ছিন্ন না করেন", তখন তাঁর পক্ষে নৈতিক অবক্ষয়ের স্রোতকে ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য কোন ধারণা ছিল না এবং তিনি তাঁর বাণীর মূল প্রবণতা অনুধাবনের জন্য থামেননি। পরবর্তী আইন যা অবৈধ যৌনসংগমকে[২৯] (অনূদিত শব্দ ব্যবহার করে) বৈধ বিবাহ-বিচ্ছেদের একমাত্র শর্ত হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন তা থেকে একথা পর্যাপ্তরূপেই নির্দেশিত হয় যে পরিস্থিতির গুরুত্ব তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন।[৩০] কিন্তু পরবর্তী আইন প্রণেতাদের "বুদ্ধিমত্তা" একটি নিয়মের প্রতি অন্ধভাবে সীমিত থাকেনি যা সম্ভবতঃ একটি উদ্ভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের নিরিখে বিধিবদ্ধ হয়েছিল ও মৌখিকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। নিয়মটিকে একটি মহৎ মনোভাবের পোষণ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে, তবে একে তালাকের নমুনামূলক আইন হিসেবে বিবেচনা করা উচিত এবং খ্রীষ্টান দেশসমূহে বিভিন্ন যুগের অগণিত শর্তাবলী এর বিরুদ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে আপত্তি তোলে।

আরবদের মধ্যে স্বামীর বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম। তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে আচরণে তারা মানবতা বা ন্যায়বিচারের কোন তোওয়াক্কা করত না। মুহম্মদ বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রথাকে চরম অননুমোদনের দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং প্রথার অনুশীলনকে সমাজের ভিত্তি ধ্বংসকারী বলে বিবেচনা করেছেন।[৩১] তিনি বারংবার ঘোষণা করেছেন যে, দাসকে মুক্ত করার চেয়ে অন্য কিছুই আল্লাহকে অধিক পরিতৃপ্ত করে না, আর বিবাহ-বিচ্ছেদের চেয়ে অন্য কিছুই তাঁকে অধিক অসন্তুষ্ট করে না। যা'হোক সমাজের তৎকালীন অবস্থায় প্রথাটি সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করা সম্ভব ছিল না। তাঁকে একটি অসংস্কৃত ও অর্ধ-বর্বর জাতির মানসিকতাকে উচ্চতর বিকাশের পথে চালিত করতে হয়েছিল যাতে যথাসময়ে তাঁর আধ্যাত্মিক শিক্ষা মানুষের হৃদয়ে প্রস্ফুটিত হতে পারে।

www.amarboi.org

প্রথাটি একটি অবিমিশ্র অমঙ্গল ছিল না; তিনি সেই অনুযায়ী স্বামীকে কতিপয় শর্তাধীনে বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদকারী দু'টি দলকে নির্দিষ্ট সময় দান করেছিলেন যার মধ্যে তারা একটা সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পেতে পারে ও বৈবাহিক সম্পর্ক পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যদি সমন্বয়ের সব প্রয়াস ব্যর্থ হয় একমাত্র তখনই তৃতীয় বা চূড়ান্ত পর্যায়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ কার্যকর হল বলে ঘোষিত হবে। দাম্পত্য বিরোধের ক্ষেত্রে দুই বিরোধী দলের মনোনীত সালিশদের মাধ্যমে তিনি মীমাংসায় পৌছানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

যার চেয়ে পাশ্চাত্যের কোন লেখকই মুহম্মদের আইনসমূহের উত্তম ব্যাখ্যা প্রদান করেননি সেই এম. সেডিলটের নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদ রয়েছে বর্তমান বিষয়ের উপর :

"বিবাহ-বিচ্ছেদ (তালাক) অনুমোদিত হত কতিপয় আনুষ্ঠানিকতার অধীন যা অনুমতি দিত দ্রুত গৃহীত বা সুচিন্তিত নয় এমন সিদ্ধান্ত বাতিল করতে। এক এক মাসের ব্যবধানে পর পর তিনটি ঘোষণা একে অপরিবর্তনীয় করতে অপরিহার্য ছিল।"৩২

প্রাচ্য আইনের ইতিহাসে মুহম্মদের সংস্কারসমূহ এক অভিনব পথ পরিবর্তন। তিনি স্বামীর বিবাহ-বিচ্ছেদ ক্ষমতার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ আনয়ন করেন; তিনি সঙ্গত কারণের ভিত্তিতে নারীদেরকে বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতা দান করেন এবং তাঁর জীবনের শেষের দিকে তিনি সালিশ বা বিচারকের মধ্যস্থতা ছাড়া স্বামীর বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতার অনুশীলন বস্তুতঃ নিষিদ্ধ পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন "সমুদয়, অনুমোদিত বস্তুর মধ্যে আল্লাহর কাছে 'তালাক' বিবাহ-বিচ্ছেদ সর্বাপেক্ষা ঘৃণ্য", কারণ এটা দাম্পত্য জীবনের সুখশান্তির প্রতিবন্ধক এবং সন্তান-সন্ততির উপযুক্ত লালন-পালনের পথে বাধাস্বরূপ। প্রাচীন প্রথার প্রতি কোরআনের সামান্য সম্মতি থাকলেও তা আইনবেত্তার ঘোষণার আলোকেই প্রনিধানযোগ্য। যখন একথা আমরা মনে রাখি যে ইসলামী জীবনব্যবস্থায় আইন ও ধর্ম কত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট তখন বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে তাঁর বাণীর প্রভাব অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়ায়।

স্বাভাবিকভাবেই, স্বামী কর্তৃক আনীত প্রস্তাব ও বিচারকের মধ্যস্থতা ছাড়া বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতার ব্যবহার সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। বিচারকদের এক বৃহৎ প্রভাবশালী দলের মতে স্ত্রীর ব্যভিচারের মতো অনিবার্য অপরাধ ছাড়া স্বামী দ্বারা আনীত তালাক যথার্থই নিষিদ্ধ বলে বিবেচিত হয়। অপর দল, প্রধানতঃ মুতাজিলারা 'হিফামুশ শারা'র অনুমোদন ব্যতিরেকে তালাক অনুমোদনযোগ্য বা আইনসঙ্গত বলে বিবেচনা করেন না। তাঁরা অভিমত পোষণ করেন যে, যে ধরনের দৃষ্টান্ত বিবাহ-বিচ্ছেদকে যৌক্তিক প্রতিপন্ন করতে পারে এবং তালাককে নিষিদ্ধ শ্রেণী থেকে দূরীভূত করতে পারে শুধু তা-ই নিরপেক্ষ বিচারক কর্তৃক পরীক্ষিত হওয়া উচিত। তাদের মতের সমর্থনে তারা হযরতের পূর্বোদ্ধৃত বাণী ও নির্দেশের বরাত দেন যে বিবাহিত দু' পক্ষের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে তাদের মতপার্থক্যের মীমাংসার জন্য সালিশ নিযুক্ত হওয়া উচিত।

www.amarboi.org

হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী মযহাবসমূহ এবং শিয়াদের এক সংখ্যাগরিষ্ঠদল 'তালাক' অনুমোদিত বলে অভিমত পোষণ করেন, যদিও তাঁরা কারণ ব্যতীত বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষমতার ব্যবহারকে অবৈধ বলে বিবেচনা করেন।

'তালাক বেআইনী' এই বাক্যের বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ বর্ণনার পর 'রাদ্দুল মাহ্‌তার' বলেন, "নিঃসন্দেহে তালাক নিষিদ্ধ, তবে কতকগুলি বাইরের কারণে এ 'মুবাহ' (অনুমোদিত) হয় এবং যেসব বিচারক একে যথার্থই নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন এটা তাদের মত-সমর্থিত অর্থ।"

যদিও "ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতারা" অস্থায়ী অনুমতিকে সদর্থক নিয়ম বলে গ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষাগুরুর আরোপিত অনেক সমতা নীতিসমূহ উপেক্ষা করেছেন, তথাপি আইনবেত্তাদের লিপিবদ্ধ নিয়মসমূহ গির্জার প্রাঙ্গণে বিকশিত সর্বাপেক্ষা নিখুঁত রোমান আইনের নিয়মসমূহের তুলনায় নারীদের প্রতি অধিকতর মানবিক ও ন্যায়সঙ্গত।[৩৩] আইনপ্রণেতাদের মতে স্ত্রীও মন্দ আচরণ, যথোপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন ও অন্যান্য অনেক কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদ দাবী করতে পারে; কিন্তু যদি সে বিবাহ-বিচ্ছেদের সমর্থনে অত্যন্ত ভাল ও শক্ত কারণ না দেখাতে পারে, তবে সে তার ফায়সালা বা যৌতুক হারাবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে যখন বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বামীর তরফ থেকে উদ্ভূত হয় (পরিষ্কার অবিশ্বাস ব্যতিরেকে), তখন তাকে বিবাহের সময় স্থিরীকৃত সমুদয় দেনা শোধ করতে হয়।[৩৪]

কোরআনে বিবাহ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ উপদেশ, ব্যক্তিগত সমন্বয়ের মাধ্যমে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার বারবার সুপারিশ আরবের আইনপ্রণেতার দৃষ্টিতে বিবাহের চরম পবিত্রতার নির্দেশক :

"যখন কোন স্ত্রীর মনে এমন আশঙ্কা দেখা দেবে যে তার স্বামী হয়ত খারাপ ব্যবহার করবে কিংবা অবহেলা করবে। তাহলে তাদের দু'জনার মধ্যে আপোষরফা করায় মোটেই গোনাহ নেই।[৩৫] মিটমাট করে ফেলাই তো ভাল। মনের কাছে লোভটাইতো হাজির রয়েছে। তোমরা যদি ভাল ব্যবহার কর, সংযত হও, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সব খবরই রাখেন। তোমরা কখনও সব স্ত্রীর সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে পারবে না। মন তোমাদের যাই চায় না কেন[৩৬] কোনও দিকে তোমরা একেবারে ঝুঁকে পড়ো না, যাতে কাউকে এমন অবস্থায় ফেলে রাখবে যেন সে একদিকে ঝুলে রয়েছে। তোমরা যদি সংশোধন করো ও সংযত হও—তাহলে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।[৩৭]

আর এই সূরার একটি পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষিত হয়েছে : "তোমাদের যদি আশঙ্কা হয় যে তাদের মধ্যে বিরোধ মনোভাব রয়েছে, তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিশ, আর স্ত্রীর পরিবার থেকে আর একজন সালিশ নিযুক্ত কর। তারা যদি দু'জনার মধ্যে আপোষরফা করে দিতে চায়, তাহলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মিটমাট করার তওফীক দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুই জানেন, তিনি সব খবরই রাখেন।"[৩৮]

www.amarboi.org

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রতি যে পবিত্রতা সংশ্লিষ্ট হয়েছে তা অমুসলিমরা হয় অনুধাবন করেনি, নয় যথোপযুক্তভাবে মূল্যায়ন করেনি। আসবাহ্ উন্ নাজায়ের বলেন, "বিবাহ্ সমাজ সংরক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি অনুষ্ঠান; মানুষকে মন্দ কার্য ও যৌন অসুচিতা থেকে রক্ষা করার জন্য এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে।" "বিবাহ্ একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান যতখানি এ এই জগতে 'ইবাদত' বা উপাসনা, কেননা এ মানবজাতিকে পঙ্কিলতা থেকে রক্ষা করে।" ..."মানবসন্তানদের মধ্যে ঐশী আদেশে এই অনুষ্ঠানের জন্য।" "চুক্তি হিসেবে যখন বিবেচিত হয় তখন বিবাহ্ একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত চিরস্থায়ী সম্পর্ক। তাদের মধ্যে বৈধ মিলনে কোন বাধা নেই।"

একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে চারটি বৈধ স্ত্রী ছাড়াও মুহম্মদ তাঁর শিষ্যদেরকে যত খুশি মহিলা ভৃত্য রাখতে অনুমতি দিয়েছেন। এ বিষয় সম্পর্কীয় বিধির উপর একটি সরল বিবৃতি সরাসরি দেখাবে যে এই ধারণা ইসলামের প্রকৃত নীতিসমূহের সঙ্গে কতখানি বিরোধ-পূর্ণ।

এই ক্ষীণ সূত্র ধরে এবং মুসলিম প্রজাতন্ত্রের আদি উত্থানের সঙ্গে সম্পৃক্ত কতিপয় অস্থায়ী ও আকস্মিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে আমাদের আইন প্রণেতারা দাসী রাখার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এটা ধর্ম-গুরুর শিক্ষার পরিপন্থী ছিল, তা বিরোধী ধর্মতাত্ত্বিকদের প্রবল সমালোচনা তুলেছিল।

প্রভু ও দাসের মধ্যে অবৈধ যৌন মিলন আরব, ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অন্যান্য প্রতিবেশী জাতিসূহের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। প্রথমে হযরত এই প্রথা বর্জন করেননি কিন্তু তাঁর কার্যকালের শেষের দিকে তিনি সুস্পষ্টভাবে এই প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন।

"পবিত্র স্বভাবের মুসলিম নারী ও পবিত্র স্বভাবের যে সব মহিলা, যাদের কাছে তোমাদের আগে কিতাব দান করা হয়েছে, তাদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করা হল। তবে যখন তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করবে। ঘর সংসার করার উদ্দেশ্যে— দেহের ক্ষুধা মেটানোর জন্য প্রকাশ্য অপকর্ম কিংবা গোপন অভিসারের জন্য নয়।"[৩৯]

এই নির্দেশের প্রথমাংশের সঙ্গে খ্রিস্টান যাজকতন্ত্রে সংরক্ষণের সঙ্গে তুলনা করুন; এ একজন খ্রিস্টানের সঙ্গে একজন অ—খ্রিস্টানের বিবাহকে বৈধ কিংবা আইনসঙ্গত বলে স্বীকার করত না। কোন খ্রিস্টানকে বিবাহ্ করার দুঃসাহসের জন্য "কাফির" (অবিশ্বাসী)-কে প্রায়ই জীবন্ত দগ্ধ করা হত। মানবসভ্যতায় মুহম্মদের নিয়ম একটি সুস্পষ্ট অগ্রগতি ছিল।

মুসলিম নারীর পক্ষে অ-মুসলিম পুরুষকে বিবাহ্ করার উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল তা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণের মধ্যবিন্দু হিসেবে দেখা দিয়েছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞা নীতির যৌক্তিকতা ও আদি প্রজাতন্ত্রের প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে মুসলমানেরা প্রাক্-ইসলামী যুগ—'আইয়্যামে জাহেলিয়াত' থেকে যেসব প্রথা গ্রহণ করেছিল যেগুলি বহু প্রাচীন প্রথার মতো টিকেছিল

www.amarboi.org

সেগুলি মুসলমান জাতির অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। সেগুলির মধ্যে নারীজাতির অবরোধ ব্যবস্থা অন্যতম। আদি কাল থেকেই অধিকাংশ জাতির মধ্যে এই ব্যবস্থা চালু ছিল। অবরোধ প্রথা এথেন্সবাসীদের মধ্যে সুপরিচিত প্রথা ছিল; এথেনীয় 'হারেমে'র অধিবাসীদেরকে তখনকার পারসিক হারেমের অধিবাসীদের মতো কিংবা বর্তমান ভারতীয় পরিবারের মতো সন্দিগ্ধ চিত্তে সতর্কতার সঙ্গে প্রহারাধীন রাখা হত। প্রাচ্যের অংশের মতো নপুংসকরা নারীদের গোপনীয়তার প্রতি বিশ্বস্ত প্রহরার কাজ করত এবং এথেন্সের মহিলাদের প্রতি কড়া নজর রাখত। নারীদের অবরোধ স্বাভাবিকভাবেই 'হেতাইরায়' গোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিল এবং তারা এথেন্সের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত, এটা বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। আধুনিক ইউরোপ ও আমেরিকা কর্তৃক উপস্থাপিত অসাধারণ ও প্রায় দুর্বোধ্য চিত্রের জন্য না হলে আমরা বলতাম যে, সভ্য জীবনের পথে অগ্রগতিসম্পন্ন প্রত্যেক সমাজে অপরিতৃপ্ত শ্রেণীর বিকাশ, যাদের অস্তিত্ব মানবতার প্রতি নিন্দা ও সভ্যতার প্রতি অবমাননার সমান, পুরুষের মনের উপর স্ত্রী-জাতির সমুন্নতকারী, শুচিশুদ্ধকারী ও মানবতার প্রতি করুণার উদ্রেককারী প্রভাবের অপসারণের জন্য। মানব-মন যখন নির্ভেজাল পরিচ্ছন্ন কোন কিছু দেখতে পায় না তখন সে ভেজাল বা অপরিচ্ছন্ন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ব্যাবিলোনীয়, এটরাসক্যান, এথেনীয়গণ এবং প্রাক-ইসলামী মক্কার অধিবাসীরা প্রাচীনকালে এই মতবাদের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত। আধুনিক কালে যে সামাজিক দুষ্টক্ষত জাতিসমূহের হৃদপিণ্ড ব্যাপকভাবে কুরে কুরে খাচ্ছে ও তাদের রক্ত দূষিত করছে তার কারণ ধর্মের ক্ষীন ছদ্মবেশসহ খোদা-বিহীন জড়বাদের প্রসার, সে ধর্ম খ্রিস্টধর্ম হোক, ইসলামধর্ম হোক কিংবা অন্য কোন ধর্ম হোক। মুহম্মদ তাঁর প্রথম জীবনে দুঃখবেদনার সঙ্গে মক্কাবাসীদের নীতিভ্রষ্টতা লক্ষ্য করেছিলেন এবং তা নির্মূল করার জন্য যুগ ও জাতির উপযোগী সবচেয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। মি. বসওয়ার্থ স্মিথের বর্ণনাত্মক ভাষা প্রয়োগ করে বলা যায় "প্রথমে এই কঠোর আইনের সাহায্যে এবং পরে এই আইন কর্তৃক উদ্দীপিত প্রবল নৈতিক আবেগের বলে তিনি আজকের দিন পর্যন্ত এবং অনেকাংশে যা কোথাও হয়নি, মুসলমান দেশসমূহকে মুক্ত করতে সফলকাম হয়েছেন"—যেখানে বিদেশি প্রভাবের বাড়াবাড়ি অত্যাধিক নয়—"সেসব পেশাদার সমাজভ্রষ্টদের থেকে যারা তাদের দুঃখময় জীবন নির্বাহ করে এবং একটি স্বীকৃত শ্রেণী হিসেবে তাদের অস্তিত্ব, তারা যে শ্রেণীর অংশ সেই শ্রেণীর প্রত্যেকের কাছেই স্থায়ী গ্লানির বিষয়।"

নারীজাতির অবরোধমূলক ব্যবস্থা অস্থির ও অমার্জিত সম্প্রদায়সমূহের সামাজিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা বহন করে। আর যে দেশে সংস্কৃতি ও নৈতিক ধারণার বৈচিত্র্য অনেক, সেখানে মোলায়েম ধরনের অবরোধ প্রথা সম্পূর্ণ নিন্দনীয় নয়। বর্তমানে এই প্রথা কম-বেশি কটোরভাবে মুসলিমপ্রভাব থেকে দূরবর্তী জাতিসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষ ও প্রাচ্য দেশসমূহে বিদ্যমান রয়েছে। কোরিয়ায় নারী অবরোধ অসঙ্গত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। চীন এবং দক্ষিণ আমেরিকার স্পেনিশ উপনিবেশ যা ইউরোপীয়

www.amarboi.org

সামাজিক বিধানের অধীন নয়। সেখানে 'পর্দা' প্রথা এখন প্রচলিত রয়েছে। ইসলামের নবী পারসিক ও প্রাচ্যের সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে এই প্রথার প্রচলন দেখতে পেয়েছিলেন; তিনি এর সুবিধাগুলি লক্ষ্য করেছিলেন এবং সম্ভবত জাতির বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান ব্যাপক নৈতিক শৈথিল্যের দরুন তিনি নারীজাতির প্রতি পর্দাব্যবস্থা অনুমোদন করেছিলেন। তিনি নারীজাতির জন্য পর্দাপ্রথার বর্তমান অনমনীয়রূপ অনুমোদন করেছিলেন কিংবা তিনি নারীজাতির অবরোধের অনুমতি দিয়েছিলেন এরূপ অনুমান করা তদীয় সংস্কারসমূহের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। নারীজাতির অবরোধ নতুন ধর্মমতের অংশ কোরআন এই মর্মে কোন হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে না।

"হে নবী! আপনি শুনুন : আপনি আপনার স্ত্রী কন্যা আর মোমিন মুসলমানদের স্ত্রীদেরকে বলে দিন যেন নিজেদের ঘোমটা টেনে নিচু করে নেয় যাতে তাদেরকে চিনতে পারা যায়, তাহলে তাদেরকে আর পীড়া দেওয়া হবে না। আল্লাহ্ তো বড় ক্ষমাশীল ও করুণাময়।"[৪০]

"আপনি মুমিন স্ত্রীলোকদের বলে দিন—তারা যেন নিজেদের চোখ নীচের দিকে ঝুকিয়ে রাখে ও গোপন অঙ্গের হিফাজত করতে থাকে আর নিজেদের সাজসজ্জা যেন প্রকাশ না করে—তবে কিনা যতটুকু প্রকাশ্য অবস্থায় থাকে তা ব্যতীত। আর নিজেদের গলায় ওড়না ব্যবহার করবে।"[৪১]

যে সামাজিক ও নৈতিক বিশৃঙ্খলা থেকে তিনি আল্লাহর নির্দেশে শৃঙ্খলা আনয়নের চেষ্টা করেছিলেন—প্রজ্ঞাসম্মত ও করুণাব্যঞ্জক আইনসমূহ যার উদ্দেশ্য ছিল নারীজাতির মধ্যে শোভনতার বিকাশ সাধন তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও আচরণের অগ্রগতি, অবমাননা থেকে নিষ্কৃতি[৪২] সেই নির্দেশনা সহজেই অনুধাবন করা যায়।[৪৩] কাজেই এটা অনুমান করা ভ্রমাত্মক যে আইনের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা প্রথাটি চিরস্থায়িত্বের দিকে টানে। নারীদের গোপনীয়তার প্রতি আইনদাতার অনুমোদনের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করা হয়েছে, তাঁর পরিবারের সদস্যরা প্রতিবন্ধকতা বা অবরোধ থেকে উল্লেখযোগ্য মুক্তি সর্বদা উপভোগ করত। আবু বকরের কন্যা আয়েশা, খাদিজার মৃত্যুর পর মুহম্মদের সঙ্গে যাঁর বিবাহ হয়েছিল, আলীর বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহীদের আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিখ্যাত উটের যুদ্ধে তিনি তাঁর নিজের সেনাদলের পরিচালনা করেছিলেন। হযরতের কন্যা ফাতিমা খেলাফতের উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় আলোচনায় প্রায়ই অংশ গ্রহন করতেন। মুহম্মদের পৌত্রী, হোসাইনের কন্যা জয়নব কারবালার হত্যাকাণ্ডের পরে উমাইয়াদের কবল থেকে তাঁর তরুণ ভ্রাতুষ্পুত্রকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁর অপ্রতিরোধ্য মনোভাব নরপিশাচ আব্দুল্লাহ বিন জিয়াদ ও নির্দয় ইয়াজিদকে সমভাবে হতবাক করেছিল।

নৈতিকতার অধঃপতন প্রাক্ইসলামী আরবদের এবং ইহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সমাজের ভিত্তিকে সমূলে বিনাশ করেছিল এবং তার আশু সংশোধনে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। নারীদের গোপনীয়তা সম্পর্কীয় হযরতের পরামর্শ নিঃসন্দেহে নীতিহীনতার

www.amarboi.org

জোয়ার প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিল এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে এক স্ত্রীর বহু স্বামীত্বের ছদ্মবেশী প্রথা যা তখন পর্যন্ত পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

ভন হ্যামারের মতো "হারেম হল পবিত্র স্থান; অপরিচিতদের সেখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ, এজন্য নয় যে রমনী জাতি অবিশ্বাস্য, বরং প্রথা ও সমাজব্যবস্থা যে পবিত্রতা তাদের প্রতি আরোপ করেছে সেজন্য। সমগ্র উচ্চ এশিয়া ও ইউরোপে (মুসলিম সমাজে) যে মাত্রায় নারীজাতির প্রতি সম্মান দেখানো হয়েছে তা এমন একটি ব্যাপার যা বিশদভাবে প্রমাণসক্ষম।"

নারীত্বের আদর্শীকরণ যাবতীয় উচ্চতম স্বভাবের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু জাতীয় অহঙ্কার ও ধর্মান্ধতা আধুনিক খ্রিস্টান জাহানে সংস্কৃতিবান শ্রেণীর মধ্যে নারীজাতির সামাজিক সমুন্নতি সম্পর্কে দু'টি ভিন্ন মতবাদের জন্ম দিয়েছে। একটি মতবাদ কুমারী মেরীর পূজায়, অপর মতবাদ মধ্যযুগীয় শৌর্য প্রদর্শনে একে আরোপিত করে—টিউটনিক প্রথা এই মতবাদদ্বয়ের প্রসূতি বলে প্রতিপন্ন। খ্রিস্টধর্মে নারীজাতি সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল। প্রথম যুগে যখন উঁচু-নীচু, শিক্ষিত-মূর্খ, সকল মানুষের ধর্ম ছিল যীশু-মাতার পূজা, তখন ধর্মাযাজকেরা লিঙ্গের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। ধর্মযাজকেরা সবাই নারীজাতির অপরাধ, তাদের মন্দ প্রবণতা, তাদের অবোধ্য বিদ্বেষ সম্পর্কে পর্যাপ্ত লিখেছেন। টারটুলিন তাঁর লিখিত একখানি গ্রন্থে জনসাধারণের অনুভূতিকে রূপ দিয়েছেন যেখানে তিনি নারীজাতিকে "শয়তানের দ্বার, নিষিদ্ধ বৃক্ষের মোহন উন্মুক্তকারী ঐশী আইনের প্রত্যাখ্যানকারী, খোদার প্রতিবিম্ব—মানুষের ধ্বংসকারী" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অপর একজন বিশেষজ্ঞ বিদ্রোহাত্মক ঔদাসীন্য নিয়ে ঘোষণা করেছেন "তিনি নারীদের মধ্যে সতীত্বের অনুসন্ধান করেছেন কিন্তু পাননি।" ক্রাইসস্টম উচ্চ মার্গের একজন সাধুপুরুষ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন। লেকী বলেছেন" তিনি ধর্মযাজকদের সাধারণ অভিমতের ব্যাখা করেছেন—তিনি নারীজাতিকে একটি অনিবার্য অমঙ্গল, একটি স্বাভাবিক প্রলোভন, একটি কাম্য অনর্থ, একটি পারিবারিক বিপদ, একটি মারাত্মক আকর্ষণ, একটি চিত্রিত পাপ বলে ঘোষণা করেছেন।" গোঁড়া ধর্মমত একেবারে নীচতম কাজ ছাড়া সর্ববিধ ধর্মীয় অনুশীলন থেকে নারীদেরকে বাদ দিয়েছিল। তারা সম্পূর্ণরূপে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল; জনসাধারণের মধ্যে, ভোজসভায় কিংবা সান্ধ্য আমন্ত্রণ সভায় তাদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ হয়েছিল। তাদেরকে "বিভিন্নভাবে থাকতে" নীরবতা পালন করতে তাদের স্বামীর প্রতি আনুগত্য দেখাতে, সূতা কাটা, বয়ন ও রান্নার কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। যদি তারা কোন সময়ে বাড়ির বাইরে বের হত তবে তাদেরকে আপাদমস্তক আবৃত হয়ে বের হতে হত। যখন মেরীর উপাসনা সর্বশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল তখন খ্রিস্টধর্মে এ-ই ছিল নারীর অবস্থা। পরবর্তীকালে এবং পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যের উৎখাত এবং ইউরোপে আধুনিক সমাজের উদ্ভবের মধ্যবর্তী সময়ে, যে যুগকে "লুণ্ঠন, মিথ্যা, জলুম, লালসা ও নির্যাতনের যুগ বলে বর্ণনা করা হয়েছে", খ্রিস্টধর্ম সন্ন্যাসিনীদের জন্য মঠ স্থাপন করে কোন কোন

www.amarboi.org

দিক দিয়ে নারীজাতির অবস্থার উন্নতি বিধানে যত্নবান হয়েছিল। এই বিতর্কমূলক উন্নতি এমন একটি যুগের উপযোগী ছিল যখন নারীহরণ একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পর্যবসিত হয়েছিল, এবং লাম্পট্য এক বর্ণনাতীত অবস্থায় পৌছেছিল; কিন্তু মঠ যে সর্বদা সদাচরণের স্থান ছিল কিংবা কৌমার্যের অনুশীলন যৌনশূচিতার নিশ্চয়াত্মক রক্ষাকবচ ছিল এমন নয়। আর্চবিশপ রিগড়ের যাজকীয় পরিদর্শন বই বিশ্বাসের যুগের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় কালের নৈতিকতা ও নারী-পুরুষ সম্পর্কের উপর আলোকপাত করে। প্রটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টধর্মের আবির্ভাব সামাজিক অবস্থার মধ্যে কিংবা নারীজাতির মর্যাদা সম্পর্কে আইনজীবীদের ধারণার মধ্যে কোনরূপ রদবদল ঘটাতে সমর্থ হয়নি। যীশুখ্রিস্ট নারীজাতির সঙ্গে মানুষের মতো আচরণ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর অনুসারীরা তাদেরকে ন্যায়বিচার মঞ্জুর করেননি।

যে অপর মতবাদটির প্রতি আমরা মনোযোগী হয়েছি তা ইউরোপের ক্যাথলিকদের মধ্যে প্রচলিত। তারা মধ্যযুগের প্রত্যেক ঐতিহাসিক পুরুষকে এক একজন বেয়ার্ড বা ক্রিচটন হিসেবে প্রতিবেদিত করে। মধ্যযুগের শৌর্যবীর্যের যুগ অষ্টম শতাব্দীর সূচনা থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত বলে সাধারণত মনে করা হয়—এমন একটি কাল, যা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, স্পেনে মুসলমানদের রাজত্বের প্রায় সমকালীন এই সময়ে কবিতা ও কল্পনাধর্মী উপন্যাস সামাজিক অবস্থাকে আলোকোজ্জ্বল আভায় রঞ্জিত করলেও নারীজাতি প্রায়ই নির্যাতনের শিকার হত। বল প্রয়োগ ও প্রতারণা ছিল খ্রিস্টান মধ্যযুগীয় শৌর্যের সোনালী যুগের প্রভেদাত্মক বৈশিষ্ট্য। প্রতীচ্য প্রাচ্যের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসার পূর্ব পর্যন্ত রোনাল্ড ও আর্থার ছিল পৌরাণিক কথা। মধ্যযুগীয় শৌর্যবীর্যের ব্যাপারটি স্ক্যান্দিনেভিয়ার জঙ্গল বা জার্মানির অন্ধকারাচ্ছন্ন অরণ্যের ফল নয়;—প্রেরিতত্ত্ব ও মধ্যযুগীয় শৌর্য বা শিভালরি সমভাবে মরুভূমির সন্ততি। মরুভূমি থেকেই উদ্ভূত হয়েছেন মুসা, যীশু ও মুহম্মদ; আন্তার, হামজা ও আলী।

শহর ও পল্লীতে বসবাসকারী আরবদের মধ্যে যারা সিরীয়, পারসিক ও রোমানদের মধ্যে প্রচলিত শিথিল নৈতিকতা গ্রহণ করেছিল নারীজাতির অবস্থা আমরা যেভাবে বর্ণনা করেছি তেমনি চরম অধঃপতিত অবস্থায় পৌছেছিল। যাযাবর আরবদের মধ্যে কিছু কিছু লোক বহুল পরিমাণে স্বাধীনতা উপভোগ করত এবং তাদের গোত্রসমূহের সৌভাগ্যের উপর অত্যাধিক প্রভাব প্রয়োগ করত। পেরন বলেছেন, "গ্রীকদের মধ্যে যেমন ছিল তারা তেমনি দুর্দশার অধীন ছিল না।" তারা যোদ্ধাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করত এবং বীরত্বের পথে তাদের অনুপ্রাণিত করত; অশ্বারোহী সৈন্যরা ভগিনী, স্ত্রী বা তাদের প্রেমিকাদের গান গাইতে গাইতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হত। তাদের ভালবাসার পুরস্কার ছিল তাদের পরাক্রমের সর্বোচ্চ মূল্য। সাহসিকতা ও উদারতা ছিল পুরুষের মহোত্তম গুণ এবং যৌনশূচিতা ছিল নারীর মহোত্তম গুণ। কোন গোত্রের একজন মহিলাকে অবমাননা করলে উপদ্বীপের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠত। যে "অবমাননাজাত যুদ্ধ" চল্লিশ বছর পর্যন্ত চলেছিল এবং যে যুদ্ধ হযরত বন্ধ করেছিলেন তা শুরু হয়েছিল ওকাজ মেলায় এক তরুণীর অপমানকে কেন্দ্র করে।

www.amarboi.org

মুহম্মদ এই অনিয়মিত প্রথাকে একটি চিরস্থায়ী ধর্মমতে রূপ দিয়েছিলেন এবং তাঁর প্রত্যাদেশের মধ্যে তা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। যুগের রুক্ষ ও যাজকীয় সরলতা প্রতিফলিত হয়েছে এমন বহু নির্দেশ সহ তার নিয়মাবলী এমন বীর্যবান মনোভাবের সূচনা করেছে যা পূর্ববর্তী ধর্মগুরুদের শিক্ষার মধ্যে মেলে না। খ্রিস্টধর্মের মতো ইসলাম বিভিন্ন ব্যক্তি ও বিভিন্ন যুগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন; সর্বোপরি সত্যকার শৌর্য প্রকৃত ইসলামের সঙ্গে যত অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত গঠনমূলক ধর্মের অন্য কোন রূপ বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ততখানি নয়।

ইসলামে বীর, 'হিলফুল ফুজুল'—এর প্রতিষ্ঠাতার প্রকৃত শিষ্য খোদার শত্রুর বিরুদ্ধে বল্লম ও তরবারী নিয়ে যেমন যুদ্ধ করার জন্য সদা প্রস্তুত সে দুর্বল ও মজলুমের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অন্যায়ের প্রতিকারের জন্যও তেমনি যুদ্ধ করার জন্য সদা প্রস্তুত। ইরাকের প্রান্তরে হোক নতুবা দেশের নিকটবর্তী কোন স্থানে হোক দুঃখ-দুর্দশার ক্রন্দনরব কোনদিন অন্যায়-ত্রাস বীরকে অসহায় ও দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের সাহায্যে উপস্থিত হতে বিফল করেনি। তার কার্যাবলী পৌরাণিক কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল এবং তাবু থেকে প্রাসাদে বাহিত হয়েছিল—এসব পরবর্তী যুগসমূহের পরাক্রমকে প্রভাবিত করেছে। খলিফা তাঁর সান্ধ্যভোজের সভায় যখন শুনলেন যে একজন আরব কুমারীকে রোমানরা অপহরণ করে নিয়ে গেছে তখনি তিনি তাঁর ভোজনপাত্র রেখে চেঁচিয়ে উঠলেন "কেন আবদুল মালিক আমার সাহায্যে এগিয়ে আসে না?"—তিনি শপথ নিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত কুমারীকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে না পারবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি মদ্য বা পানি কিছুই স্পর্শ করবেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি রোমান বন্দীশালার দিকে সৈন্য পরিচালনা করলেন এবং কুমারীকে উদ্ধার করে তিনি প্রতিজ্ঞা থেকে মুক্ত হলেন। একজন মুগল সম্রাট[৪৪] অপ্রতিরোধ্য শত্রুর চাপের মুখে সীমান্তে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন, এমন সময়ে একজন বিদেশী রাণীর ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হস্তের বলয় পেয়ে এবং তার বিপদে সাহায্যের আহ্বানে তিনি পশ্চাদদিকে সৈন্য পরিচালনা করলেন, তার শত্রুকে পরাজিত করলেন। অতঃপর তাঁর অভিযান পুনরায় শুরু করলেন।

এলনার আন্তারকে "শৌর্যের পিতা" বলেছেন। আলী তার চরম উৎকর্ষের সর্বোচ্চ আদর্শ—তিনি বীরত্ব, সাহসিকতা ও উদারতার প্রমূর্ত দৃষ্টান্ত। তিনি নির্ভেজাল, শান্ত ও সুশিক্ষিত, নির্ভীক ও অনিন্দনীয়—তিনি চরিত্রের বীরোচিত গাম্ভীর্য-ব্যাঞ্জক মহোত্তম উদাহরণ জগতসমক্ষে স্থাপন করেছেন। তাঁর মনোভঙ্গী নেতার মনোভঙ্গীর নির্ভেজাল প্রতিফলন। এঁর মনোভঙ্গী সমগ্র মুসলিম জাহানকে আচ্ছন্ন করেছিল এবং পরবর্তী যুগসমূহের প্রাণবন্তকারী বৈশিষ্ট্যের জন্ম দিয়েছিল। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ বর্বর ইউরোপকে মুসলিম প্রাচ্যের সংস্পর্শে এনেছিল এবং মুসলমানদের জাঁকজমক ও শিষ্টাচারের প্রতি তার দৃষ্টি উন্মোচিত করেছিল; বিশেষ করে মুসলিম আন্দালুসিয়ার যে প্রভাব প্রতিবেশী খ্রিস্টীয় প্রদেশসমূহে পড়েছিল তা-ই ইউরোপে শিভালরীর/মধ্যযুগীয় শৌর্যের জন্ম দিয়েছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সের গীতিকবিরা ও জার্মানীর গায়করা যারা যুদ্ধ চলাকালে প্রেম ও

www.amarboi.org

সম্মানের গীত গাইত তারাই কর্দোভা, গ্রানাদা ও মালাগার রোমান্স-লেখকদের অব্যবহিত শিষ্য। পেট্রার্ক ও বুক্কাকিও, এমন কি ট্যাসো ও চশার ইসলামী উৎস মূল থেকে তাঁদের প্রেরণা লাভ করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপের বর্বর তাতারদের অভ্যাস ও চিন্তা বিশুদ্ধ শৌর্যের মধ্যে একটা স্থূল চরিত্র এনেছিল।

ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলিতে প্রাচ্যে আরবজাতির সাম্রাজ্য নিশ্চিহ্ন হওয়ার প্রায় পূর্ব পর্যন্ত নারীরা আজকের আধুনিক সমাজের মতোই সমুন্নত মর্যাদা লাভ করত। হারুণ-অর-রশীদের স্ত্রী জোবাইদা সে যুগের ইতিহাসে এক সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেছিলেন; তিনি তাঁর গুণাবলী ও কার্যাবলীর মাধ্যমে পরবর্তী বংশধরদের জন্য একটি সম্মানিত নাম রেখে গেছেন। একজন মদিনাবাসী—ফারুকের স্ত্রী হুমাইদা—যিনি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর নাবালক পুত্রের একমাত্র অভিভাবিকা ছিলেন—তাঁর পুত্রকে এমনভাবে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন যে, ছেলেটি সে যুগের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ আইনজীবী হয়েছিল।[৪৫] সুখাইনা বা সখিনা হোসাইনের[৪৬] কন্যা ও হযরত আলীর পৌত্রী—তিনি সে যুগের সর্বাপেক্ষা মেধাসম্পন্না, সর্বাপেক্ষা গুণান্বিতা ও সর্বাপেক্ষা বিদুষী রমণী ছিলেন—পেরন তাঁকে "রমণীকুল শিরোমণি, অনন্যা সুন্দরী, অপরিসীম দয়াময়ী ও সর্বগুণসম্পন্না" বলে অভিহিত করেছেন। তিনি নিজে উচ্চ পর্যায়ের পণ্ডিত ছিলেন, আর পণ্ডিত ও সৎ ব্যক্তিদের আলাপ-আলোচনার প্রতি মূল্য আরোপ করতেন। হযরতের পরিবারের মহিলারা তাদের বিদ্যাবত্তা, গুণাবলী ও চরিত্রবলের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। খলিফা মামুনের স্ত্রী বুরান, উম্মুল ফজল—মামুনের ভগিনী যিনি আলী পরিবারের অষ্টম ইমামকে বিবাহ করেছিলেন, উম্মুল হাবিব—মামুনের কন্যা—সকলেই তাদের পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। হিযরী পঞ্চম শতাব্দীতে শয়খা শুহ্দা, যিনি 'ফখরুন্নেসা' (নারীকুলের গৌরব) উপাধি পেয়েছিলেন, বাগদাদের কেন্দ্রীয় মসজিদে বিশাল জনসমাবেশে সাহিত্য, অলঙ্কারশাস্ত্র ও কাব্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত পণ্ডিতদের (উলেমা) সমপর্যায়ে আসীন হয়েছিলেন। এই বিদুষী মহিলা যদি সেন্ট সিরিলের সহধর্মমতাবলম্বীদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করতেন তবে তাঁর ভাগ্যে কি ঘটত তা হিপাটিয়ার দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা থেকে বিচার করা যায়। সম্ভবতঃ অত্যোৎসাহী খ্রিস্টানরা তাঁকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করত না। তবে নিশ্চিতরূপে তাঁকে ডাইনি হিসেবে পুড়িয়ে মারত। 'জাত-উল-হেম্মা—যার বিকৃত রূপ জেম্মা—"সিংহ-হৃদয়"—বহু যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সাহসী নাইটদের পাশাপাশি যুদ্ধ করেছেন।[৪৭]

আরবের নবী নারীজাতির পদমর্যাদার উন্নতি বিধান করেছিলেন একথা সব পক্ষপাতহীন লেখকই তা স্বীকার করেছেন, যদিও ধর্মান্ধ তার্কিকরা বলে থাকেন যে ইসলামী ব্যবস্থা নারীজাতির অবস্থাকে অবনমিত করেছে। এর চেয়ে অধিকতর মিথ্যা অপবাদ হযরতের বিরুদ্ধে আরোপিত হয়নি। পূর্ববর্তী সভ্যতার ঐতিহ্য নিয়ে সর্বাপেক্ষা অনুকূল, বংশীয় ও জলবায়ুর অবস্থার অধীনে উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল পরিবেশ খ্রিস্টান জগতের অধিকাংশ দেশে পুরুষদের চেয়ে নারীদেরকে উচ্চতর সামাজিক আসনে

www.amarboi.org

অধিষ্ঠিত করেছে, জন্ম দিয়েছে শালীনতার নীতি যা অন্ততঃপক্ষে দৃশ্যতঃ নারীদেরকে উচ্চতর সামাজিক সম্মান দিয়েছে। কিন্তু খ্রিস্টান জগতের সর্বাপেক্ষা অগ্রগতিসম্পন্ন সমাজেও তাদের আইনগত মর্যাদা কি? সাম্প্রতিক কালের পূর্বেও এমন কি ইংল্যাণ্ডেও কোন বিবাহিত স্ত্রী তার স্বামীর থেকে স্বতন্ত্রভাবে কোন অধিকার লাভ করত না। যদি মুসলিম ভগিনীরা আর এক শত বছরের মধ্যে তাদের ইউরোপীয় ভগিনীদের সামাজিক মর্যাদা লাভ না করে তখনি জীবনব্যবস্থা ও জীবন বিধান হিসাবে ইসলামের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখা যেতে পারে। কিন্তু হযরত এমন এক দেশে, যেখানে কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করা একটা অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হত, এমন এক যুগে নারীদের অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন যখন কোন দেশ, কোন ব্যবস্থা, কোন গোষ্ঠী, কুমারী বা বিবাহিত মাতা বা সহধর্মিনী—কোন নারীকেই কোন অধিকার প্রদান করেনি। এই অধিকার সেদিন বিংশ শতাব্দীতে মাত্র সভ্য জাতিসমূহ অনিচ্ছাসত্ত্বে ও চাপের মুখে অনুমোদন করেছে, হযরতের এই পদক্ষেপ গ্রহণ মানবজাতির কৃতজ্ঞতার দাবী রাখে। যদি মুহম্মদ অধিক কিছু নাও করতেন তবুও মানবজাতির কল্যাণকামী হিসেবে তাঁর দাবী অবিসংবাদিত থাকত। বর্তমানে আইন প্রণেতাদের গ্রন্থে এই আইন যেভাবে রয়েছে তার অধীনেও মুসলিম মহিলাদের আইনগত মর্যাদা ইউরোপীয় মহিলাদের আইনগত মর্যাদার সঙ্গে অনুকূলভাবে তুলিত হতে পারে। আমরা এই বিষয়ে অন্যত্র বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা নারী সম্পর্কীয় মুসলিম জীবনবিধির শর্তাবলীর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেব। যতদিন পর্যন্ত নারী অবিবাহিত থাকে সে তার পিতৃগৃহে বাস করে; যতদিন পর্যন্ত সে সাবালিকা না হয় ততদিন পর্যন্ত সে কিছুটা তার পিতা কিংবা তার প্রতিনিধির অধীন। সে যখন সাবালিকা হয় তখন আইন তাকে একজন স্বাধীন ব্যক্তি হিসেবে তার প্রতিসব অধিকার আরোপ করে। সে তখন তার ভাইয়ের সঙ্গে পিতামাতার সম্পত্তির অধিকারী হয়। যদিও উত্তরাধিকারের অনুপাত ভিন্ন, তবে এই পার্থক্য ভ্রাতা ও ভগিনীর আপেক্ষিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। যে নারী আইনের অধিকারপ্রাপ্তা তার নিজের স্পষ্ট স্বীকৃতি ছাড়া তার বিবাহ হতে পারে না, "এমন কি সুলতানও তাকে বিবাহ দিতে পারেন না"[৪৮] বিবাহের পর তার ব্যক্তিগত সত্তা বিনষ্ট হয় না, সমাজের সদস্য হিসেবে তার অস্তিত্ব নষ্ট হয় না।

স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর অনুকূলে বিবাহ পূর্ববর্তী ব্যবস্থা একটি অপরিহার্য শর্ত। সে যদি তা করতে অপারগ হয় তবে আইন স্ত্রীর সামাজিক অবস্থা অনুসারে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। মুসলিম বিবাহ একটি দেওয়ানী আইন, এতে কোন পুরোহিত, কোন উৎসবের প্রয়োজন হয় না। বিবাহচুক্তি পুরুষকে নারীর উপর আইন অনুমোদন করে না এমন কোন কর্তৃত্ব দেয় না কিংবা তার দ্রব্যসম্ভার ও বিষয়-সম্পত্তির উপর কোন অধিকার দেয় না। মাতা হিসেবে তার অধিকার বিচারকের ব্যক্তিগত খামখেয়ালীর উপর নির্ভর করে না। তার নিজের পরিশ্রমলব্ধ উপার্জন বিনষ্ট করার অধিকার কোন অমিতব্যয়ী স্বামীর নেই কিংবা কোন ইতর ব্যক্তির তাকে অসম্মান করারও কোন অধিকার নেই। আইনের

www.amarboi.org

অধিকার বলে সে তার স্বামী বা পিতার মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে তার ব্যক্তিগত অধিকারের সীমানায় তার নিজের ও সম্পত্তির যাবতীয় ব্যাপার পরিচালনা করে। কোন বন্ধুর সাহায্য ব্যতিরেকে, স্বামীর নামের ছত্রছায়া ছাড়া সে তার অধমর্ণের বিরুদ্ধে আদালতে বিচারপ্রার্থী হতে পারে। পিতৃগৃহ থেকে স্বামীগৃহে গমনের পরও সে আইন মোতাবিক তার অধিকার প্রয়োগ করে থাকে। একজন মহিলা ও স্ত্রী হিসেবে সে যে সুযোগ-সুবিধা লাভ করে তা "পরিবর্তনশীল" সৌজন্যের বলে নয়, আইনগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আইনের বলে নিশ্চিত। সামগ্রিকভাবে বিচার করলে মুসলিম মহিলার পদমর্যাদা অনেক ইউরোপীয় মহিলার পদমর্যাদার তুলনায় অধিকতর প্রতিকূল নয়, বরং অনেক দিক দিয়ে সে নিশ্চিত উত্তম পদমর্যাদার অধিকারিণী। তুলনামূলকভাবে তার স্থবিরত্ব সাধারণভাবে যে সমাজে সে বাস করে সেই সমাজের সংস্কৃতির অভাবের ফলশ্রুতি, আইনবেত্তাদের আইনের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ফল নয়।

পাদটীকা

১. ডলিঙ্গার 'দি জেন্টাইল এণ্ড দি জিউ', পৃ. ৪০৫, ৪০৬।
২. লেভি. ১৮, ২৪।
৩. 'এনসাইক্লোপিডিয়া ইউনিভার্সিলি', প্রবন্ধ "ম্যারেজ", ডলিঙ্গার, 'দি জেন্টাইল এণ্ড দি জিউ', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৩।
৪. ডলিঙ্গার, 'দি জেন্টাইল এণ্ড জিউ', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩৩—২৩৮।
৫. গ্রোটে, 'হিস্ট্রী অব গ্রীস' ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৩৬।
৬. গিবন, 'ডিক্লাইন এণ্ড ফল অব দি রোমান এমপায়ার', ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৬।
৭. সেন্ট অগাস্টাইন, লিব, ২ কন্ট 'ফাউস্ট' অধ্যায় ৪৭।
৮. এম, বার্থেলিমি সেন্ট হিলেয়ার এরূপ মত পোষণ করেন যে এক-বিবাহ প্রথা হেলেনীয় ও রোমান উৎস থেকে খ্রিস্টধর্মের উপর আগত।
৯. তুঃ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ইউনিভার্সিলি' 'ম্যারেজ (বিবাহ) অধ্যায়।
১০. তুঃ 'এনসাইক্লোপিডিয়া ইউনিভার্সিলি' 'ম্যারেজ' অধ্যায় এবং 'ডেভেনপোর্ট', অ্যাপোলজী ফর মহমেট'।
১১. থিয়োডোরিকদের আইনের মতো। কিন্তু সে আইন বাইজান্টাইনদের প্রগতিশীল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।
১২. মারোভিনজিয়ান ও কালোভিনজিয়ান নৃপতিদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রসঙ্গে 'দি শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন্স' পৃ. ৬২৬ দেখুন।
১৩. তুঃ হাল্লামের 'কনস্টিটিউশনাল হিস্ট্রী অব ইংলণ্ড, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭ এবং টীকা 'মধ্যযুগ' পৃ ৩৫৩।
১৪. ডলিঙ্গার, 'দি জেন্টাইল এণ্ড দি জিউ' ১ম খণ্ড, পৃ ৪০৬।
১৫. নাম. ৩. ১৭।
১৬. লেনরম্যান্ট, এনসিয়েন্ট হিস্ট্রী অব দি ইষ্ট, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮।

www.amarboi.org

১৭. 'খাতুনে জান্নাত'—স্বর্গের সম্ভ্রান্ত মহিলা, 'ফাতিমাতুজ্ জোহরা'—আলোর মহিলা।

১৮. শিয়া মুসলিমদের একটি অংশ অস্থায়ী বিবাহকে আইনসঙ্গত মনে করেন। যে সব মুজতাহিদ এই মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন তাদের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা পোষণ করেও আমি একথা বিবেচনা করতে পারি না যে কালোত্তীর্ণ করে এ ব্যবস্থা প্রণীত হয়েছে কিংবা যে নৃপতিদের অধীনে এসব আইনজীবী প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন তাঁদের উপযোগী হয়েছেন এসব আইনজীবীদের প্রণীত অনেক মতবাদের মধ্যে যে তাদের ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার প্রতিফলন ঘটেছে তা প্রত্যক্ষ করতে কেউ ব্যর্থ হবে না।

১৯. 'দি রাদ্দ-উল্ মুহতার সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, "কোন কোন বিশেষজ্ঞ (মুতাজিলা) অভিমত পোষণ করেন যে 'আদল' প্রেম-প্রীতির ক্ষেত্রে সাম্য বুঝায়, কিন্তু আমাদের বিশেষজ্ঞরা এই অভিমত থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন, তাঁরা নাফ্কাহ্র ক্ষেত্রেই সমান আচরণকে সীমাবদ্ধ করেছেন, যা আইনের ভাষায় খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের কথা বুঝায়।"

২০. কর্ণেল ম্যাকগ্রেগরের মতানুসারে শতকরা মাত্র দু'জন বহু বিবাহ প্রথার অধীন।

২১. হযরতের পরিবারে নেগ্রাস কর্তৃক উপহার হিসেবে প্রদত্ত কপটিক মহিলা সম্পর্কে হাফসা ও মুহম্মদের মধ্যে পারিবারিক কলহকে কেন্দ্র করে মুয়ির, স্পেঙ্গার ও ওসবোর্ণ কিছুটা লোলুপতার প্রলেপ দিয়ে যে গল্প বলেছেন তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ও বিদ্বেষপ্রসূত। যে হাদিসটি কোরআনের সকল সম্মানিত ভাষ্যকার প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং যা কোন উমাইয়া বা আব্বাসিয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণ নৃপতির সময় উদ্ভাবিত ও দুর্বলতম প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত তা-ই এসব সমালোচক হযরতকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য লুব্ধভাবে আঁকড়ে ধরেছেন। কোরআনের যে আয়াত এই কাহিনীর উদ্দিষ্ট বলে অনুমিত হয়েছে বাস্তবিক তা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিস্থিতির নির্দেশ করেছে। শৈশবে মুহম্মদ যখন তাঁর চাচার মেষ চরাতেন তখন মধুপানের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মেছিল। জয়নব প্রায়ই এই মধু সরবরাহ করতেন। হাফসা ও আয়েশা তাঁকে মধুপান থেকে বিরত করার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন, এবং তিনি আরো মধুপান করবেন এই মর্মে তাঁকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন। তাদের কাছে এই অঙ্গীকার করার পর তাঁর মনে এই চিন্তা উদয় হল যে তিনি এমন কিছু অবৈধ করেছেন যার মধ্যে অবৈধ কিছুই নেই, শুধু স্ত্রীদেরকে তুষ্ট করার জন্য এরূপ করছেন। এই দুর্বলতার জন্য তাঁর বিবেক তাঁকে পীড়া দিল। তখন কোরআনের এই আয়াত নাজিল হল : "হে নবী, আপনার স্ত্রীদেরকে তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ যা বৈধ করেছেন তা নিষিদ্ধ বলছেন কেন?"

২২. "দরিদ্রের মাতা", বদান্যতা ও দানশীলতার জন্য তিনি এরূপ কথিত হতেন।

২৩. তাবারি (জোটেনবার্গের অনুবাদ) ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৮। এই বিবাহ পৌত্তলিকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। তারা বিমাতা ও শাশুড়ীকে বিবাহ করত। তারা দত্তক পিতা কর্তৃক দত্তক পুত্রের (জায়েদ এক সময় মুহম্মদের ধর্মপুত্র হিসেবে বিবেচিত হত) বিবর্জিত স্ত্রীকে বিবাহ করাকে নিন্দনীয় কাজ হিসেবে দেখত। দত্তক সন্তান গ্রহণ প্রকৃত রক্তের সম্পর্ক স্থাপন করে বলে, যে ধারণা জনগণের ছিল সেই ভ্রম নিরসন করে কোরআনের ৩৩তম অধ্যায়ে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। এই আয়াতগুলি আদিম সমাজে প্রচলিত নিয়ম—কাউকে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী বলে ডাকলে তৎ সঙ্গে বিবাহ হতে পারে না বা নাকচ হয়ে যায়—দত্তক পুত্র বা কন্যার সঙ্গে বিবাহ হতে পারে এই ভ্রম নিরসন করে। হযরতের পবিত্রতার শ্রেষ্ঠ কষ্টিপাথর হল জায়েদ কোনদিন তার গুরুর প্রতি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি।

www.amarboi.org

২৪. ইবনে হিশাম, পৃ. ৭২৯।

২৫. বর্বরোচিত তিক্ততার কারণে হযরতের শত্রুরা তাঁর প্রতি তাঁর শেষ পুত্রের মৃত্যুর পর 'আবতার'—এই ডাক নাম আরোপ করেছিল। এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল "যার লেজ কাটা গেছে" হিন্দুদের মতো প্রাচীন আরবদের মধ্যেও পুত্রসন্তানকে দেবতাদের করুণার ধারাবাহিকতা হিসেবে বিবেচনা করা হত এবং যে ব্যক্তি পুত্রসন্তান রেখে না যেত তাকে বিশেষভাবে অভাগা বলা হত। অতএব হযরতের প্রতি এই তিক্ত শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছিল। কোরআন, সু. ১০৮ (তফসীরে কাশ্‌শাফ দেখুন)। এছাড়া পৌত্তলিক আরবগণ তাদের কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কবর দিত। মুহম্মদ এই প্রথাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ও জ্বলন্ত ভাষায় নিন্দা করেন, তুঃ কোরআন সু. ১৭ আ. ৩৪ ইত্যাদি।

২৬. একম. ২১, ২; ডিউট. ২১, ১৪, ২৪, ১; তুঃ ডলিঞ্জারের 'দি জেনটাইল এণ্ড দি জিউস; ২য় খণ্ড পৃ. ৩৩৯-৩৪০, আর সেগুনের 'উক্‌জোর হিব্রুইকা'।

২৭. ডলিঞ্জার—'দি জেন্টাইল এণ্ড দি জিউ', ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৫।

২৮. গিবন—ডিক্লাইন এণ্ড ফল অব দি রোমান এম্পায়ার, ৪র্থ খণ্ড (২য় সং) পৃ. ২০৯।

২৯. ম্যাথু. ২৯, ৯।

৩০. খ্রিস্টানদের দু'টি সুসমাচার কারণ উল্লেখ করেনি কেন যীশু তাঁর অনুসারীদেরকে স্ত্রী-"প্রত্যাখ্যান করতে" অনুমতি প্রদান করেছেন (মার্ক ১০, ১১ এবং লুক ১৬; ১৮)। যদি এই দুটি সুসমাচারের বিবরণকে ম্যাথুর নামে প্রচারিত সুসমাচারের চেয়ে উচ্চতর কর্তৃপক্ষ বলে বিচেনা করা হয় তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, যীশু মহৎ আবেগ প্রচার করেছেন এবং নৈতিকতার উচ্চনীতি মুদ্রিত করেছেন, কিন্তু তাঁর বাণীকে অপরিবর্তনীয় ও সদর্থক আইন হিসেবে বিবেচনা করা হোক এটা ইচ্ছে করেনি কিংবা নীতিহীনতা ও অধর্মে বর্ধমান জোয়ারকে প্রতিরোধ করা ব্যতীত অন্য কোন ধারণাও তাঁর ছিল না। সেগুেন মনে করেন যে, একটি চাতুরীপূর্ণ উত্তর দিয়ে যীশু চেয়েছিলেন "শামাই" বা "হিশাম" সম্প্রদায়ের কাউকেই দোষারোপ না করে এড়িয়ে যেতে। উজোর হেব্রাইকা, ১, ৩, সি. ১৮-২২, ২৮,৩১। তুঃ গিবনের গ্রীক শব্দ 'পোরনেইয়া' যার ইংরেজি ভাষান্তর "অবৈধ যৌন সংযোগে' তার উপর মূল্যবান টীকা।

৩১. কোরআন : সু. ২ আ. ২২৬।

৩২. সেডিলট, 'হিস্টোয়ার দ্যজ অ্যারাবশ' ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৫।

৩৩. মিলম্যান, 'ল্যাটিন ক্রিশ্চিয়ানিটি' ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৮, ৩৬৯।

৩৪. মি. সেডিলট আরও বিশেষ শর্ত সম্পর্কে বলেছেন যা (সুন্নী মজহাব অনুযায়ী) পূর্ণাঙ্গ বিচ্ছেদের জন্য প্রয়োজন। এরূপ ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী একসঙ্গে পুনর্মিলিত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ দিয়ে আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে হয়—এ এমন একটি অত্যন্ত জ্ঞানপূর্ণ পদক্ষেপ যা বিচ্ছেদকে অধিকতর বিরল করে তোলে। মুয়ির এমন একটি শর্তকে অপরিহার্য করায় মুহম্মদকে নিন্দা করেছেন (৩য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬)। তিনি উপেক্ষা করেছেন যে আরবদের মতো একটি গর্বিত, বিদ্বেষপরায়ণ ও অনুভূতিশীল জাতির জন্য এরূপ একটি শর্ত একটি প্রবলতম প্রতিষেধকের কাজ করেছিল। তিনি যে প্রবাদ বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন তা সেই ব্যক্তির দুর্নাম দেখানো উচিত ছিল যার সঙ্গে তা জড়িত ছিল, যে তা স্ত্রীকে এমন একটি "অবমাননাকর পরীক্ষার" মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করে। আমার ভয় হয়, মুহম্মদের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণার জন্য মুয়ির বিস্মৃত হয়েছেন যে এই শর্ত ইহুদী ও

www.amarboi.org

পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে প্রচলিত ন্যক্কারজনক প্রথাকে দমন করার এবং দৃষ্টান্তের মাধ্যমে খ্রিস্টানদের মধ্যে সামান্য কারণে বিবেচনাহীন প্রবৃত্তি ও খামখেয়ালীর বশে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিরুৎসাহীত করার জন্য উদ্দিষ্ট হয়েছিল। এই প্রতিবন্ধকতার উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর একটি সবচেয়ে সংবেদনশীল জাতিকে তাদের স্বভাবের সবচেয়ে শক্তিশালী অনুভূতি সম্মানবোধের উপর কাজ করে পৃথিবীর একটি সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীল জাতিকে নিয়ন্ত্রিত করা (তুঃ সেল—'প্রিলিমিনারী' ডিসকোর্স পৃ. ১৩৪)। স্যার ডবল্. মুয়ির আরও বিস্মৃত হয়েছেন যে শিয়া পণ্ডিতদের অনেকেই স্ত্রী পুনঃ গ্রহণের পূর্বে তার তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহের বাধ্যবাধকতা বা যাথার্থ্য স্বীকার করেন না। (তুঃ ম্যালকম—'হিস্ট্রী অব পারসিয়া' ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪১ এবং 'মাবসুত')। আমার দিক থেকে আমি বিশ্বাস করি যে "যখন তোমরা কোন স্ত্রীলোককে তালাক দাও এবং তাকে বিদায় দেওয়ার সময় আসে, বদান্যতার সঙ্গে তাকে বিদায় কর, জোর করে তাকে রেখো না যার ফলে তাদের প্রতি অসঙ্গত আচরণ হবে" পূর্ববর্তী আয়াতকে নাকচ করে যাতে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যবর্তিতা প্রয়োজন।

৩৫. আরবীতে এই শব্দটি "এটা হবে প্রশংসনীয়" ইত্যাদি।

৩৬. এ যেসব মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপিত করে যাঁরা বলেন ইসলামের পরিণতি আইন বহুবিবাহ সমর্থন করে। এটা ঘোষিত হয়েছে যে সমব্যবহার মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই আমরা স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করব যে আইনপ্রণেতার দৃষ্টিতে ছিল উচ্চতর নীতির মধ্যে নিম্নতর নীতিকে সংমিশ্রিত করা এবং যে প্রথা সমাজের বিকাশের এক পর্যায়ে অপরিহার্য ছিল তা চিন্তা ও নৈতিকতার পরবর্তী বিকাশে বিরোধী হ'য়ে দেখা দিয়েছিল তার অপসারণ।

৩৭. সু. ৪ আ. ১২৮, ১২৯।

৩৮. সু. ৪ আ. ৩৫।

৩৯. সু. ৫ আ. ৫।

৪০. সু ৩৩ আ ৫৯।

৪১. সু. ২৪ আ. ৩১।

৪২. 'হেদায়া'র অনুবাদক হ্যামিল্টন "অবমাননা অধ্যায়ে'র প্রাথমিক আলোচনায় বলেছেন, "বিষয়টি বহু চটুল ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করে এবং অবশ্যই তা 'স্বামীত্ব ও শালিনতা' আলোচ্য সূচীর আলোকে বিবেচিত হওয়া চাই, এতে নারীর সতীত্বের প্রতি বিবেচনা প্রসূত মনোযোগ প্রদর্শিত হয়েছে, এমন কি চিন্তার ক্ষেত্রেও যাতে তা এড়িয়ে যাওয়া না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। যা হোক এটা উল্লেখযোগ্য যে, কতিপয় লেখক সেভাবে দাবী করেছেন, এটা তেমনি সম্পূর্ণ অবরোধ। বিচ্ছিন্নতার দিকে যায় না। বাস্তবিক অবরোধ। বিচ্ছিন্নতা 'ঈর্ষা বা অহঙ্কারের ফল এবং আইন অধ্যাদেশের পরিণতি নয়—হেদায়ার এই অংশে ও অন্যান্য অংশে যেরূপ বর্তমান। মুসলিম দেশসমূহে এই প্রথা সার্বজনীনভাবে অনুসৃত হয় না। মাসডেন্ তাঁর 'ট্র্যাভেলস' গ্রন্থে বলেছেন, "জাভাতে যেসব মুসলমান বসতি স্থাপন করেছে তারা এই প্রথা পালন করেনি; জাভার মুসলিম নারীরা তাদের ডাচ ভগিনীদের মতোই স্বাধীনতা ভোগ করে।

৪৩. যারা ইউরোপভাবসমৃদ্ধ মিশরে ও লেভান্টে ভ্রমণ করেছেন তাঁরা বুঝবেন যে সে সময়ে এই ধরনের নির্দেশ কতই না অপরিহার্য ছিল।

www.amarboi.org

৪৪. সম্রাট হুমায়ুন আফগানদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে কাবুলের পথে যাত্রা করেন। তখন তিনি যোধপুরের রাণীর 'রাখী' পান এবং তৎক্ষণাৎ তার সাহায্যে অগ্রসর হন। আমি মুসলমানদের শিভালরীর মাত্র দুটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি এর শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

৪৫. ফারুক সাতাশ বছর ধরে খোরাসানে যুদ্ধরত ছিলেন। তাঁর পুত্রের পুত্রের নাম রাবিব অর রাস।

৪৬. হোসাইন পারস্যের শেষ সাসানীয় নৃপতি ইয়াজদের্জাদের অন্যতম কণ্যাকে বিবাহ করেছিলেন।

৪৭. ইসলামে যেসব বিখ্যাত রমনী জন্মেছিলেন তাদের বিষয়ে পূর্ণ বিবরণের জন্য 'নাইনটিনৃথ্ সেঞ্চুরী' মে সংখ্যা, ১৮৯৯ এবং দি শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন্স (ম্যাকমিলান) দেখুন।

৪৮. অনেক শতাব্দীর পর মুসলিম আইনবেত্তারা মূল-নীতিটি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, খ্রিস্টান জগতের নৃপতি ও প্রধানগণ তাদের প্রজাদের সঙ্গে জোর করে মেয়েদের বিবাহ দিতে অভ্যস্ত ছিলেন।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ অধ্যায়
ইসলাম ও দাসপ্রথা

"আর তোমাদের দাস সম্পর্কে নির্দেশ এই যে তোমরা যা খাবে তাদেরকেও তাই খেতে দেবে এবং তোমরা যা পরবে তাদেরকেও তাই পরতে দেবে।"—হযরত মুহম্মদ (দঃ)।

কোন কোন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে দাসপ্রথাকে যথার্থই বহুবিবাহ প্রথার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বহুবিবাহের মতো দাসপ্রথা সব জাতির মধ্যেই বিদ্যমান ছিল এবং মনুষ্য-চিন্তার অগ্রগতি ও মানবজাতির মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা বোধের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা অন্তর্হিত হয়েছে। বহুবিবাহের মতো এই প্রথা ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত ক্রমবিকাশের বিশেষ পর্যায়ে প্রবলভাবে চিহ্নিত আবেগ ও অহঙ্কারের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। প্রথম থেকেই এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে অন্তর্নিহিত অবিচার।

প্রাথমিক স্তরসমূহে যখন মানবজাতি মানুষের পারস্পরিক অধিকার ও কর্তব্যের পূর্ণ উপলব্ধিতে পৌঁছায়নি, যখন আইন বহুর জন্য ব্যক্তি বিশেষ বা কয়েকজন ব্যক্তির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যখন শক্তিশালী ব্যক্তির ইচ্ছাই ছিল জীবনের নীতি ও আচরণের নির্দেশিকা, তখন মানবজাতির মধ্যে স্বভাবজাত অনিবার্য সামাজিক, দৈহিক বা মানসিক অসাম্য অবিচ্ছেদ্যভাবে দাসপ্রথার রূপ নিয়েছে এবং একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যা উৎকৃষ্ট ব্যক্তিদেরকে নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের উপর কর্তৃত্ব দিয়েছে।[১] শক্তিবানদের নিকট দুর্বলদের এই পরিপূর্ণ অধীনতা মানুষের উপর স্থাপিত পৌরাণিক অভিসম্পাত এড়াতে সাহায্য করেছে—"কবরে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তোরা তোদের ঘর্মসিক্ত পরিশ্রমলব্ধ আহার্য গ্রহণ করবি" এবং মনোমত পেশায় এরূপে অর্জিত বিরতিকে কাজে লাগাতে সাহায্য করেছে। "এনসিয়েন্ট ল'—এর গ্রন্থকার বলেছেন, "নিজের আরাম আয়াসের জন্য অন্য ব্যক্তির দৈহিক শক্তির ব্যবহারের সরল ইচ্ছা নিঃসন্দেহে দাসপ্রথার ভিত্তি এবং তা মনুষ্যস্বভাবের মতোই পুরাতন।"[২]

দাসপ্রথার প্রচলন মানুষের অস্তিত্বের সমকালীন। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক জাতির মধ্যে এর নিদর্শন মেলে। সমাজের বর্বর অবস্থায় এর বীজ বিকশিত হয়েছিল এবং যখন জড়বাদীয় সভ্যতার অগ্রগতিতে এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল তখনও এর সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল।

www.amarboi.org

যাদের আইন-সংক্রান্ত ও সামাজিক প্রথাসমূহ আধুনিক জীবনচর্চা ও সামাজিক প্রথাকে সর্বাধিক প্রভাবিত করেছে সেই ইহুদী, গ্রীক, রোমান ও প্রাচীন জার্মান জাতি[৩] ভূমিদাস ও গৃহ-ভৃত্য উভয় ধরনের দাস প্রথাকে স্বীকার করেছিল ও চালু করেছিল।

জাতি হিসেবে প্রারম্ভকাল থেকেই হিব্রুদের মধ্যে দু'ধরনের দাসপ্রথা চালু ছিল। অপরাধের শাস্তিস্বরূপ কিংবা ঋণ পরিশোধের জন্য যেসব ইসরাইলীদেরকে দাসে পরিণত করা হত তাদের অবস্থা বিদেশী দাসদের অবস্থার চেয়ে উত্তম ছিল। ইসরাইলী বংশোদ্ভূত দাসগণ ছয় বছর সেবার পর ইচ্ছা করলে মুক্তি নিতে পারত। কিন্তু যাদেরকে ইসরাইলীরা কঠিন যুদ্ধের মাধ্যমে কিংবা লুণ্ঠনের জন্য অতর্কিত আক্রমণ করে বা ক্রয় করে সম্পূর্ণরূপে দাসে পরিণত করেছে সেই বিদেশি দাসগণ সম্পূর্ণরূপে এই ব্যবস্থার আওতা-বহির্ভূত ছিল-এই ব্যবস্থা জাতীয় পক্ষপাতিত্ব ও বিশিষ্ট বিচ্ছিন্নতার মনোভাবসম্পন্ন।[৪] এসব দাস-দাসীদের ভাগ্য ছিল অপ্রশমিত দুঃখ-কষ্টের। ভূমিদাস বা গৃহভৃত্য ছিল যুগপৎ ঘৃণিত ও অবহেলিত। তারা তাদের হৃদয়হীন—মনিবদের চিরস্থায়ী একঘেয়েমির জীবন নির্বাহ করত।

জীবনব্যবস্থা ও ধর্মমত হিসেবে খ্রিস্টধর্ম দাসপ্রথার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ তোলেনি, কোন নিয়ম বলবৎ করেনি, অনিষ্ট প্রশমনের জন্য কোন নীতি জনমনে মুদ্রিত করেনি। দাসদের অবাধ্যতা[৫] সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য এবং মনিবদের প্রতি তাদের ভৃত্যদেরকে ন্যায্য পাওনা প্রদানের সাধারণ উপদেশ ছাড়া খ্রিস্টানদের ঐতিহ্যের বর্ণিত যীশুর শিক্ষার মধ্যে দাসপ্রথার নিন্দা সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন উক্তি নেই। পক্ষান্তরে খ্রিস্টধর্ম মালিকের ইচ্ছার প্রতি ভৃত্যের পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের নির্দেশ করে। এ দাসপ্রথাকে সাম্রাজ্যের স্বীকৃত প্রথা হিসেবে পেয়েছিল এবং এর অনিষ্টকর প্রভাবের নিরসন ক্রমিক অপসারণ কিংবা দাসদের ভাগ্যের উন্নয়নের চেষ্টা না করেই একে অবলম্বন করেছিল। দেওয়ানী আইনের আওতায় দাসরা ছিল অস্থাবর সম্পত্তি। খ্রিস্টান রাজত্বে তাদের ভাগ্যের কোন উন্নতি সাধিত হয়নি। আদিকাল থেকে দাসপ্রথা রোমানদের মধ্যে জমজমাট ছিল। কিন্তু যে ক্রমিক বিবর্তন দ্বাদশ টেবিলের প্রাচীন আইনসমূহকে হার্ডিয়ানের ব্যাপক সংহিতায় উন্নীত করেছিল তা দাসদের অবস্থার উন্নয়নে কয়েকটি পদক্ষেপ চালু করতে ব্যর্থ হয়নি। সম্রাটদের মানবতা বা জ্ঞানবত্তা পুরাতন আইনসমূহের মধ্যে পরিবর্তনের সূচনা করা সত্ত্বেও দাসগণ সম্পূর্ণরূপে প্রভুর ইচ্ছার অধীন ছিল। সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হাজার হাজার দাস থাকত এবং সামান্য কারণে তাদের উপর অত্যাচার ও বেত্রাঘাত করা হত।

ইউরোপে যীশুর ধর্মের প্রবর্তন শুধু পুরোহিততন্ত্রের প্রেক্ষিতেই দাসত্বকে প্রভাবিত করেছিল। কেবল সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করলেই একজন দাস মুক্ত হতে পারত, তবে সে তিন বছরের পূর্বে মুক্তি দাবী করতে পারত না। কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়ে দাসপ্রথা পৌত্তলিক রাজত্বে যেমন অধিক পরিমাণেও বিভিন্নভাবে প্রচলিত ছিল তেমনি চালু ছিল। একজন খ্রিস্টান সম্রাজের অধীনে সংগৃহীত 'দি ডাইজেস্ট' দাস প্রথাকে প্রাকৃতিক নিয়মের

www.amarboi.org

একটি উপাদান বলে ঘোষণা করেছিল এবং বিধি পেশা অনুযায়ী দাসদের বেতন বেধে দিয়েছিল। দাসদের মধ্যে বিবাহ আইনসম্মত ছিল না এবং দাস ও স্বাধীন ব্যক্তির মধ্যে বিবাহ মারাত্মক অপরাধ বলে গণ্য হত।[৬] এর ফল ছিল উপপত্নী প্রথার অবাধ প্রচলন, আর যাজকসম্প্রদায় এটা স্বীকার করত ও এর অনুশীলন করত।[৭]

প্রাচীন জগতের সর্বাপেক্ষা অগ্রগতিসম্পন্ন আইনব্যবস্থায় এরূপ ছিল দাসদের অবস্থা। এই আইনসমূহে চোদ্দ শ' বছরের জ্ঞানবত্তা প্রতিফলিত হয়েছে এবং তাদের বিকাশের শেষের দিকে পৃথিবীর একজন মহান নৈতিক শিক্ষকের শিক্ষার কতিপয় প্রশাখা তাতে গজিয়েছে মাত্র।

রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর পাশ্চাত্য ও উত্তর বর্বর জাতির প্রতিষ্ঠার পর ব্যক্তিগত দাসপ্রথা ছাড়াও রোমানদের নিকট অজ্ঞাত রাষ্ট্রীয় দাসপ্রথা এই নতুন ঔপনিবেশিক রাজ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত হয়েছিল। প্রজা ও ভৃত্যদের উপর প্রভুদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার নৈতিক অধঃপতন ও অধোগতির বীভৎস চিত্র হাজির করেছিল।[৮] রোমানদের মতো বর্বরদের সংহিতা দাসপ্রথাকে মানবজাতির সাধারণ অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করত; যদি দাসদেরকে কোন আশ্রয় প্রদান করা হত তবে তা প্রধানত প্রভুর সম্পত্তি হিসেবেই করা হত। রাষ্ট্র-ছাড়া প্রভুই তাদের জীবনমরণের উপর ক্ষমতাশীল ছিল।

খ্রিস্টধর্ম দাসপ্রথা দূরীকরণে কিংবা এই প্রথার অনিষ্টকর প্রভাব প্রশমিত করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। গির্জা স্বয়ং দাস রাখত এবং পরিষ্কার ভাষায় এই অনিষ্টকর প্রথার বৈধ্যতা স্বীকার করত। গির্জার প্রভাবে ইউরোপের উচ্চরাজকর্মচারীরা দাসপ্রথার সমর্থন করত এবং দারিদ্র্য ও চৌর্যবৃত্তির বৃদ্ধি রোধের ক্ষেত্রে এর উপকারিতার উপর জোর প্রদান করত।[৯] একই প্রভাবাধীনে উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ রাজ্যসমূহের উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন খ্রিস্টানগণ তাদের রক্ষিত হতভাগ্য জীব দাসদের উপর নিষ্ঠুরতম অমানুষিক অত্যাচার করত—দাসদের মধ্যে অনেকে তাদের আত্মীয়-স্বজন। তারা তাদের মধ্যে দাসপ্রথা চালু রাখার জন্য রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। একটি নিকৃষ্ট জাতির রক্তে সামান্যতম নিদর্শন যতই অদৃশ্য হোক না কেন তা তাদেরকে দাসপ্রথার তীব্র শাস্তির অধীনে আনয়ন করেছিল। শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টান তার নিগ্রো-দাসীর গর্ভজাত সন্তানকে বৈধ বলে স্বীকার করত না। তার সঙ্গে সে কখনও বৈধ যৌনমিলন উপভোগ করত না। তার অবৈধ সন্তানের মাতা ও তার বংশধরগণ, তার যত দূরের হোক না কেন, যে কোন সময়ে তার বৈধ সন্তান তাদেরকে বিক্রি করতে পারত। আল্লাহর সম্মুখে মানুষ যে সমান, সে বিষয়ে শিক্ষাগুরুর শিক্ষার মনোভঙ্গী খ্রিস্টানগণ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ইসলাম বংশ বা বর্ণের পার্থক্য স্বীকার করে না। শ্বেতাঙ্গ বা কৃষ্ণাঙ্গ, নাগরিক বা সেনানী, শাসক বা শাসিত সবাই পরিপূর্ণভাবে সমান শুধু নীতিগতভাবে নয়, বাস্তব আচরণেও। মাঠে ময়দানে বা অতিথি আপ্যায়নের কক্ষে, তাবুতে কিংবা প্রাসাদে,

www.amarboi.org

মসজিদে কিংবা বাজারে সকলে শর্তবিহীনভাবে ও কোন বিদ্বেষ না রেখেই মেলামেলা করে থাকে। ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন, একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী ও একজন শ্রদ্ধেয় সাহাবী ছিলেন একজন নিগ্রো দাস। একজন শ্বেতাঙ্গ খ্রিস্টানের কাছে তার একজন কৃষ্ণাঙ্গ সমধর্মী স্বর্গরাজ্যে তার সমকক্ষ হতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই এই দুনিয়ায় নয়—সম্ভবত যীশুর রাজত্বে সে সমকক্ষ হতে পারে তবে খ্রিস্টধর্মের রাজত্বে নয়। আইন তাকে বাধ্য করতে পারে, বৃহত্তর মানবসমাজ রক্তস্রোতের ভেতর দিয়ে তার কৃষ্ণাঙ্গ ভাইকে সামাজিক অধিকার দিতে বাধ্য করতে পারে, কিন্তু বংশ ও বর্ণের অহঙ্কার কোন সাম্যের স্বীকৃতি দেয় না, এমন কি আল্লাহর গৃহেও কঠোর ব্যবধান পালিত হয়ে থাকে।

ইসলামের শিক্ষা দাসপ্রথার বিরুদ্ধে কঠিন আঘাত হানল। যদি এই প্রথা পার্শ্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে ও মানবমনের সহজাত ভ্রান্তির মধ্যে গভীর শিকড় বিস্তার না করত, তবে যেসব লোক এর অনুশীলন করত তাদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রথা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

এটা ন্যায় সঙ্গতভাবেই বিতর্কিত হয়েছে যে ইসলামের আইন, নীতি ও শিক্ষাসমূহ বিশ বছরের অধিককাল ধরে ঘোষিত হয়েছে, কাজেই স্বাভাবিকভাবেই এটা প্রত্যাশিত যে বহু প্রাক্-ইসলামী প্রথা, যা শেষপর্যন্ত অপসারিত হয়েছে তা প্রথমে হয় মৌনভাবে অনুমোদিত হয়েছে নতুবা স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হয়েছে।[১০] এর একটি শ্রেণীতে রয়েছে দাসপ্রথার প্রচলন। মুহম্মদ যেসব লোকদের মধ্যে জন্মেছিলেন তাদের সম্পর্কের অন্তঃস্থলে অনিষ্ট মিশে গিয়েছিল। এর দূরীকরণ সুবিবেচিত ও করুণাসিক্ত আইনের বিরামবিহীন প্রয়োগের মাধ্যমেই অর্জিত হওয়া সম্ভব ছিল, সকল দাসের আকস্মিক ও পরিপূর্ণ মুক্তির ভেতর দিয়ে সম্ভব ছিল না। এটা নৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ছিল অসম্ভব। তদনুসারে দাসদের ক্রমিক মুক্তির উন্নয়ন ও তা সম্পাদনার্থে অসংখ্য নঞর্থক ও সদর্থক শর্ত প্রবর্তিত হয়েছিল। এর বিপরীত কোন নীতি অনুসরণ করলে তা ডেকে আনত শিশু প্রজাতন্ত্রের সমূহ অধঃপতন।

আল্লাহর নামে দাসদেরকে মুক্তিদানের জন্য হযরত পুনঃ পুনঃ তাঁর শিষ্যদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, "আল্লাহর নিকট এর চেয়ে অধিকতর গ্রহণীয় কোন কাজ নেই।" তিনি আইন করলেন যে কর্তব্যকর্মে অবহেলা ও কতিপয় অপরাধের শাস্তি হল দাসের মুক্তি। তিনি আদেশ করলেন যে দাস তার মজুরীর অর্থ দিয়ে তার স্বাধীনতা ক্রয় করতে পারবে। যদি এই হতভাগ্য জীবের বর্তমান নিয়োগের ক্ষেত্রে তেমন কোন উপার্জন না থাকে এবং মুক্তির পণ অর্জন করার জন্য সে যদি অন্য কোন নিয়োগকারীর অধীনে যেতে চায়, তবে সেই মর্মে চুক্তির ভিত্তিতে তাকে অনুমতি দিতে হবে।[১১] তিনি আরও আইন করলেন যে বায়তুল মাল থেকে মুক্তির জন্য দাসকে অর্থ আগাম দিতে হবে। কতিপয় আকস্মিক ঘটনার ক্ষেত্রে আইন জারি হল যে কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়া, এমন কি প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তাকে মুক্তি দিতে হবে। যে চুক্তি বা ঐক্যমতের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র সন্দেহ আবিষ্কৃত হত সেখানে দাসের সর্বাধিক অনুকূলে তা লিপিবদ্ধ হত। প্রভুর দিক থেকে

www.amarboi.org

সামান্যতম প্রতিজ্ঞাকেও দাসের মুক্তির জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। তিনি "স্বজন প্রতিবেশী, সাথী ভ্রমণকারী ও যাত্রীদের" দাবীর সঙ্গে দাসদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের কর্তব্যকে একই পর্যায়ভুক্ত করেছিলেন। তিনি দাসদের অবাধ মুক্তির এবং সেই সঙ্গে "খোদা তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তার কিয়দংশ" তাদেরকে দান করার জন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং দাসদেরকে যৌন সম্ভোগের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করাকে নিষিদ্ধ করেছিলেন আর ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি ঐশী করুণার আশ্বাস দিয়েছিলেন। একজন দাসকে মুক্ত করা একজন বিশ্বাসীকে অজ্ঞাতবশত হত্যা করার প্রায়শ্চিত্ত, কতিপয় অসত্যকে অবলম্বন করারও প্রায়শ্চিত্ত। মুহম্মদের শিক্ষার অভিপ্রায় "চিরস্থায়ী দাসত্ব" বা বর্ণবিভাগকে অসম্ভব করেছিল; ইংরেজদের জীবনব্যবস্থায় দাসপ্রথা যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা ইসলামের আইন প্রণয়নে কোন পদমর্যাদার ক্ষেত্রে ব্যবহার "ভাষার অপপ্রয়োগ" মাত্র।

হযরত আদেশ করেছেন যে একজন পলাতক ইসলামী রাষ্ট্রে পালিয়ে আসলে তাকে তৎক্ষণাৎ নাগরিক অধিকার প্রদান করতে হবে; কোন দাসীর সন্তান হলে সে তার পিতার অবস্থা অনুসরণ করবে এবং প্রভুর মৃত্যুর পর সে স্বাধীনতা লাভ করবে; দাসগণ তাদের মুক্তির জন্য প্রভুর সমীপে চুক্তি করতে সমর্থ আর জাকাতের একাংশ তাদের জন্য ব্যয়িত হবে। সঙ্গত ও উপযুক্ত কাজের অতিরিক্ত কাজ করানো থেকে প্রভুর প্রতি নিষিদ্ধ। দাস ও দাসীদেরকে অপমানজনক নামে কখনও না ডাকতে প্রভুদেরকে তিনি আদেশ দিয়েছেন—"ওগো আমার তরুণ" কিংবা " ওগো আমার তরুণী" এরূপ অধিকতর স্নেহসিক্ত নামে তাদেরকে আহ্বান করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইহাও নির্দেশিত হয়েছে যে সব দাসদাসীকে প্রভু ও প্রভুপত্নী যা আহার করবে ও পরিধান করবে তা-ই আহার করতে দিতে হবে ও পরিধান করতে দিতে হবে। সর্বোপরি, ইহাও নির্দেশিত হয়েছে কোন ক্রমেই মাতাকে তার সন্তান থেকে, ভ্রাতাকে অন্য ভ্রাতা থেকে, পিতাকে পুত্র থেকে, স্বামীকে স্ত্রী থেকে, একজন আত্মীয়কে অপর আত্মীয় থেকে পৃথক করা চলবে না।[১২]

তখন যারা দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল তাদের জন্য নির্ধারিত নৈতিক নিয়মসমূহে আরব্য শিক্ষাগুরু অন্যান্য ধর্মমতে[১৩] প্রায়ই যে ধরনের একপেশে পন্থায় দাস ও প্রভুর পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত হত সেরূপ কোন নির্দেশ করেননি।[১৪] মনুষ্য স্বভাবের গভীরতর ও অধিকতর সত্য জ্ঞান ছিল বলে তিনি দেখেছিলেন যে সবলের প্রতি দুর্বলের, আর দুর্বলের প্রতি সবলের কর্তব্যবিধি লিপিবদ্ধ করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। ইসলামে দাসদের প্রতি কোন কলঙ্ক আরোপিত হয় না। এটা একটা আকস্মিক ব্যাপার, দেওয়ানী আইন ও যাজকীয় খ্রিস্টধর্মে যেমন "প্রকৃতির উপাদান" হিসেবে চিহ্নিত তেমন নয়। জায়েদ দাস ছিলেন ও হযরত তাকে মুক্ত করেছিলেন। তাকে প্রায়ই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করা হত, নির্দ্বিধায় অনেক মহান কাপ্তেন তার অধীনে যুদ্ধ করেছেন। তার পুত্র ওসামা আবু বকর কর্তৃক গ্রীকদের বিরুদ্ধে প্রেরিত অভিযানের নেতৃত্বের সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন। কুতুবউদ্দীন দিল্লীর প্রথম সুলতান, কাজেই

www.amarboi.org

ভারতবর্ষের মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন একজন দাস। ইসলামে যে দাসত্ব অনুমোদিত তার সঙ্গে খ্রিস্টান-জগতে প্রচলিত দাসত্বের কোন মিল নেই, অবশ্যি বর্তমান সময়ের পূর্ব পর্যন্ত কিংবা আমেরিকায় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের পবিত্র যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত, যখন এই প্রথার অবসান ঘটে।

ইসলামে আজ যে দাস কাল সে প্রধান উজির। সে কোন দুর্নাম ছাড়াই সে তার প্রভুর কন্যার পানিগ্রহন করতে পারে এবং পরিবারের প্রধান হতে পারে। দাস রাজ্য শাসন করেছে। গজনীর মাহমুদের পিতা ছিলেন একজন দাস। খ্রিস্টধর্ম কি এ ধরনের কোন রেকর্ড দেখাতে পারে? দাসদের প্রতি আচরণের এ ধরনের কোন স্পষ্ট ও মানবিক বিবরণ কি খ্রিস্টধর্ম তার সমগ্র ইতিহাসের পাতায় দেখাতে পারে?

আমরা যা বলেছি তা থেকে এটা খুবই সুস্পষ্ট যে আইনপ্রণেতা এই প্রথা স্বভাবত অচিরস্থায়ী এবং তিনি এই অভিমত পোষণ করতেন যে ধারণার অগ্রগতি ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিতভাবে এর বিলুপ্তি ঘটবে। কোরআন দাস সম্পর্কে সর্বদা বলে যে "যাদেরকে তোমাদের দক্ষিণ হস্ত অর্জন করেছে" এতে নির্দেশিত হয় যে দাসদাসী উপার্জনের উপায়মাত্র। বাস্তবিক কোরআন এক দাসত্ব মাত্র স্বীকার করে—'জিহাদে শারাই'—বৈধ যুদ্ধের মাধ্যমে বন্দীদের দাসত্ব। সকল বর্বর জাতির মধ্যে একমাত্র স্বার্থপর উদ্দেশ্যের জন্য[১৫] বন্দীদের রক্ষা করা হত, তাদের বিক্রীত অর্থে বা তাদের পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যক্তি বা জাতির সম্পদ বৃদ্ধির জন্য।[১৬] প্রাচীনকালের অন্যান্য জাতির মতো প্রাক্-ইসলামী যুগের আরবগণ যুদ্ধবন্দীদের বাঁচিয়ে রাখত তাদের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনের জন্য। মুহম্মদ তাঁর জাতির মধ্যে এই প্রথা বিরাজমান দেখতে পেয়েছিলেন। কোন মতবাদ খাড়া না করে কিংবা অস্পষ্ট মামুলী মন্তব্য না করে তিনি তাদের নির্দেশনার জন্য কঠোর নিয়ম নির্ধারিত করেন, তিনি বার বার নির্দেশ করেছিলেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত বন্দীগন প্রদানের মাধ্যমে কিংবা পরিশ্রমের মজুরীর সাহায্যে মুক্তিলাভের পূর্ব পর্যন্ত বৈধ যুদ্ধে প্রাপ্ত বন্দীদেরকে দাসদাসী হিসেবে রাখা যেতে পারে। কিন্তু যখন এসব ব্যবস্থা ব্যর্থ হত তখন দাসদাসীদের রক্ষণাবেক্ষণের কঠিন দায়িত্বসহ মুসলমানদের পবিত্র অনুভূতির প্রতি আবেদন করা হত। দাসত্বের চূড়ান্ত মুক্তি অর্জনে এ প্রায়ই যথেষ্ট পরিমাণে সফল হত। যে দাস-চুরি ও দাসব্যবসা পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল শক্তিশালী খ্রিস্টধর্ম[১৭] ও যাকে ইহুদীধর্ম পবিত্রকরণ করেছিল ইসলাম তাকে সম্পূর্ণরূপে গর্হিত ও নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছিল। যে দাস-মুক্তি[১৮] ধর্মের একটি মহৎ কাজ বলে বিঘোষিত হয়েছিল। কোন মুসলমানকে দাসে পরিণত করার বিরুদ্ধে কঠোরতম ভাষায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। বহু সংখ্যক তথাকথিত মুসলমানের স্থায়ী দুর্নামের কলঙ্ক নিয়ে অবশ্যই বলতে হবে যে আক্ষরিক নির্দেশ পালন করতে গিয়ে কিংবা পালনের চেষ্টা করতে গিয়ে তারা শিক্ষাগুরুর নির্দেশের মনোভঙ্গীই হারিয়ে ফেলেছে এবং প্রত্যক্ষভাব হযরতের নির্দেশ লঙ্ঘন করে ক্রয় ও অন্য উপায়ের বলে দাসপ্রথা চালু রাখতে অনুমোদন দিয়েছিল। কোরআনিক আইন অনুসারে দাস সংরক্ষণ অবিশ্বাসী ও পৌত্তলিকদের

www.amarboi.org

বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে যে বৈধ যুদ্ধ তার উপর নির্ভরশীল। আর এর অনুমতি ছিল বন্দীদের নিরাপত্তা ও রক্ষার নিশ্চয়তা। পার্শ্ববর্তী গোত্র ও জাতিসমূহ থেকে যে যুদ্ধ-বিরতির মধ্যে মুসলমানেরা নিয়োজিত হয়েছিল তার ফলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় দাসপ্রথার অবলুপ্তি ঘটত—ভাবী দাস-সংগ্রহের সমাপ্তি এবং যারা দাস অবস্থায় রয়েছে তাদের মুক্তি আসত। যা'হোক, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নৈতিকতাবর্জিত জাতিসমূহ ও উত্তরের দুর্ধর্ষ জাতিসমূহের সংস্পর্শে আসার ফলে অথবা অনিষ্টকর প্রথাটি সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে গভীর শিকড় গেড়েছিল বলে খ্রিস্টান ও ইহুদীদের মতো বহু মুসলমান দাসপ্রথাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং এখনও কিছুটা দিয়ে থাকে। কিন্তু দুর্ধর্ষ টার্কম্যান যারা দাস চুরিতে গৌরববোধ করত তারা আর বর্বর গুয়াকোদের চেয়ে কোনরূপে ইসলামের প্রতিনিধি নয়, যারা দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে বেড়াত।[১৯] বহু-বিবাহ প্রথার মতো দাসপ্রথা মানবজাতির বিকাশের কোন-না কোন স্তরে, অন্ততঃ যে জাতি সভ্য বলে নিজেদেরকে দাবী করে তাদের মধ্যে, যে প্রয়োজন তাদেরকে এই প্রথা চালু করতে প্ররোচিত করেছিল তা দাসপ্রথা অতিক্রম করে গিয়েছে এবং তা শীঘ্রই হোক কিংবা বিলম্বেই হোক অবশ্যই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কাজেই দেখা যাবে যে, যেভাবে বিদ্বেষপ্রসূত মনোভাব নিয়ে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে ইসলাম দাসপ্রথাকে "পবিত্র করেনি", বরং সংকীর্ণতম সীমার মধ্যে তার অর্জনের উপায়কে সীমাবদ্ধ করে প্রত্যেক দিক দিয়ে তার বিলোপ ও অপসারণের আয়োজন করেছে। ইসলাম খামখেয়ালীর সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধানের প্রয়াস পাইনি। ইসলাম সর্বাপেক্ষা জোরালো ভাষায় মানবজাতির স্বাভাবিক সাম্যের কথা ঘোষণা করেছিল, কিন্তু ফলাফলের দিকে তাকিয়ে সমুদয় দাসদাসীদের মুক্ত করেনি। যদি করত তবে তা অনিষ্টের কারণ হত, কারণ জগৎ তখন মানুষের নৈতিক ও বুদ্ধিমূলক স্বাধীনতার জন্য পূর্ণতা লাভ করেনি।

মুহম্মদ স্পষ্টভাবে মনুষ্যদেহের অঙ্গহানি করা নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং পারসিক ও বাইজান্টাইনের মধ্যে যে প্রথা জমজমাট হয়ে উঠেছিল তা কঠোর ভাষায় তার সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে দাস ক্রয়-বিক্রয় অজ্ঞাত ছিল। তাঁদের আমলে কোন দাসদাসী ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে বলে কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বলপূর্বক ক্ষমতাদখলকারী উমাইয়া রাজবংশের সিংহাসন অধিকার করার পর মুসলমানদের ভেতর একটা পরিবর্তন আসল। মোয়াবিয়া মুসলমান নৃপতিদের মধ্যে প্রথম যিনি মুসলিম জগতে ক্রয়ের মাধ্যমে দাস-অর্জন চালু করেন। আর তিনিই প্রথম যিনি তাঁর স্ত্রীদের প্রহরার জন্য বাইজানটাইনদের মতো খোজা (নপুংসক) নিয়োগ করেন। আব্বাসিয়া আমলের প্রথমদিকে শিয়া ইমাম জাফর আসসাদিক দাস প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার করেন।

এখন সময় এসেছে যখন মনুষ্যসমাজ সাধারণভাবে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তাদের বুলন্দ আওয়াজ তুলতে পারেন, সে যে আকারে বা যে ছদ্মবেশেই হাজির হোক না কেন। তাদের মহান নবীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে মুসলমানদের নিজের ইতিহাস থেকে মসীলিপ্ত

www.amarboi.org

পত্রটি মুছে দেওয়া উচিত—যে পত্রটি তাঁর নিয়মসমূহের মনোভাব লঙ্ঘন না করলে কখনো লিখিত হত না, যদিও বিরোধী ধর্মমতসমূহের বিশেষজ্ঞদের বীভৎস নির্ঘণ্টের পাশাপাশি তা যতই উজ্জ্বল দেখাক না কেন। যে কণ্ঠস্বর একদিন সমগ্র মানবজাতির মধ্যে স্বাধীনতা, সাম্য ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের ঘোষণা দিয়েছিল আজ চৌদ্দশ বছরের আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব ও বিস্তার থেকে অর্জিত সতেজ ও সবল কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হওয়ার দিন এসেছে। দাসপ্রথা তাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী নিন্দিত ও তাদের আইন কর্তৃক অননুমোদিত—একথা ঘোষণা করে মুসলমানদের প্রতিপন্ন করতে হবে যে তাদের মহানবীর স্মৃতির উপর নিক্ষিপ্ত কলঙ্ক মিথ্যা।

পাদটীকা

১. তুঃ 'ম্যাকিসম দ্য চয়িমুল দ্যজ ক্রইসয়িড্স সুর ল্য এটাট দ্যজ পিউপলস দ্য লা ইউরোপ' প্যারিস, ১৮০৯।
২. মেইন, 'এনসিয়েন্ট ল' পৃ. ১০৪।
৩. সিজার ('দ্য বেল গল', লিব ৬), ট্যাসিটাস ('দ্য মরিবাস জার্মান', ক্যাপ, ২৫.২৫) এবং ক্যাথিয়ার (দ্য স্ট্যার্ট সারভর অ্যাপুড জার্ম, লিব ১)—সবই জার্মান-দাস-প্রথার চরম কঠোরতার প্রমাণ দেয়।
৪. লেভ ২৫, ৪৪, ৪৬।
৫. তুঃ মিল্কম্যান, 'ল্যাটিন ক্রিশ্চিয়ানিটি' ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৮।
৬. একটি শাস্তি এই ছিল : যদি কোন স্বাধীন নারী কোন দাসকে বিবাহ করত তবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত এবং দাসটিকে পুড়িয়ে মারা হত। তুঃ মিল্কম্যানের এ বিষয়ের উপর তাঁর গ্রন্থ "ল্যাটিন ক্রিশ্চিয়ানিটি"।
৭. তুঃ মিল্কম্যান, 'ল্যাটিন ক্রিশ্চিয়ানিটি', ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬৯; আরও কেঞ্জ কনকুবিনা।
৮. তুঃ দ্য চয়িসুল, এবং স্টিফেনের 'কমেন্টারিজ অন দি লজ অব ইংলণ্ড' বুক ২, অংশ ১, অধ্যায় ২—এই বিস্তৃত অধ্যায়টি এই বিষয়ের উপর দেখুন। একটি বেদনাদায়ক ও বিরক্তিকর সুবিধা যা প্রভুদের ছিল তা ব্রিটেনের 'কুলিয়েজ' প্রথা নামে অভিহিত ছিল। পরে এটা জরিমানায় রূপান্তরিত হয়। সঠিকভাবে অনুমিত হয়েছে যে এই প্রথা উত্তরাধিকার আইনের জন্ম দেয় যা ইংলণ্ডের কতিপয় জেলায় প্রচলিত ছিল এবং স্বায়ত্তশাসিত ইংরেজ নামে পরিচিত ছিল।
৯. পুফেনডর্ফ, 'ল অব নেচার এণ্ড নেশান্‌স' বুক, ৬, সি. ৩, এস. ১০; উলরিকাস পুবেরাস, প্রিলেক্ট জুর সিভিটাস, ১.১, টিট্. ৪, এস. ৬; পথিয়ার 'দ্য স্ট্যাট্যার ভরাম' এবং গ্রটিরাস, 'দ্য জুর বেল. ১.১, সি. ৫, এস. ২৭।
১০. 'তাহজীবুল্ আহলাক', (১৫ই রজব, ১২৮৮) পৃ. ১১৮।
১১. কোরআন, সু. ২৪, আ, ৩৩ ইত্যাদি।
১২. এই বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞের উদ্ধৃতি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি না কারণ এইসব বিষয় স্বীকৃত সত্য। তবে আমি কৌতূহলী পাঠকদেরকে 'মিশকাত', 'সহীহ বোখারী' ও

www.amarboi.org

'বিহারুল আনওয়ার'—এই গ্রন্থ তিনটি দেখতে অনুরোধ করি। শেষ গ্রন্থখানিতে হযরতের অব্যবহিত বংশধরদের অনুশীলিত উদারতা ও বদান্যতার মহত্তম কীর্তিস্তম্ভ বিধৃত।

১৩. কল, ৩.২২; ১টিম ৬.১।

১৪. কল. ৩২২; ১টিম ৬.১।

১৫. তুলনীয় মিলম্যান, 'ল্যাটিন ক্রিশ্চিয়ান' ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৭। প্রাচীন বিচারকেরা বন্দীদের হত্যা করার পূর্ববর্তী অধিকারের উপর তাদেরকে দাসে পরিণত করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এতে তারা আলবারিকাস জেন্টিলিস, (দ্য জুর. ক্যাপ. দ্য সার্ভিচিউড). গ্রটিয়াস ও পুফেনডর্ফকে অনুসরণ করেন। বাস্তবিক মনটেস্কু সর্বপ্রথম যুদ্ধবন্দীকে হত্যা করার পৌরাণিক অধিকার অস্বীকার করেন যতক্ষণ না কোন অপরিহার্য প্রয়োজন উপস্থিত হয় কিংবা আত্মরক্ষার কারণ দেখা দেয়। 'দি স্পিরিট অব লজ' গ্রন্থের রচয়িতা এটা অস্বীকার করেন, কেননা গির্জার দাসত্ব থেকে সে মুক্ত।

১৬. তুলনীয় মিলম্যানের 'হিস্ট্রী অব্ দি জিউপ', ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮।

১৭. ক্রমওয়েল কর্তৃক ড্রয়েডা ধ্বংসের পর এবং আয়ারল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দমন করার পর ইংরেজ প্রোটেস্ট্যান্ট আইরিশ নরনারীদেরকে ভার্জিনিয়া, পেনস্যালভিনিয়া ও অন্যান্য স্থানের ঔপনিবেশিকদের নিকট বিক্রি করেছিল। মনমাউথের বিদ্রোহের পরও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল।

১৮. ইমাম জাফর আস্ সাদিক (বিহারুল আনোয়ার) থেকে একটি সহীহ্ ও পরিচিত হাদিস অনুসারে।

১৯. হযরতের আদেশসমূহের আক্ষরিক অর্থ লঙ্ঘন না করার জন্য টার্কম্যান (স্বয়ং অন্ধ সুন্নী) তাদের বন্দীদেরকে (সে সুন্নী বা শিয়া যাই হোক না কেন) বিরুদ্ধবাদী হিসেবে স্বীকার করতে বাধ্য করত। আর আফ্রিকার আরবরা তাদের হত্যাকারী 'রাজ্জিয়াস'দেরকে পৌত্তলিক নিগ্রোদের উপর 'জিহাদ, বলত। একজন সুপরিচিত আফ্রিকান পরিব্রাজক, মি. টমসন 'দি লণ্ডন টাইমস' ১৮৮৯-র ১৪ই নভেম্বরের একটি চিঠিতে পূর্ব আফ্রিকায় দাস প্রথার উপর লেখেন : "আমি নির্দ্বিধায় জোরের সঙ্গে সত্য ঘোষণা করছি আপনার সংবাদদাতাদের চেয়ে পূর্ব মধ্য আফ্রিকার ব্যাপকতর অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে, যদি দাস ব্যবসায় এখানে সমৃদ্ধিশালী হয়ে থাকে তবে তা এই কারণে যে এসব অঞ্চলে ইসলাম প্রবর্তিত হয়নি এবং সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কারণ এই যে ইসলামধর্মের বিস্তার মানে দাসব্যবসার সহগামী নির্বাসন। "শান্তিপূর্ণ ও নিরহঙ্কার কর্মকর্তাদের" সম্পর্কে তাঁর বিবরণ, যার মাধ্যমে ইসলাম পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্যসুদানে বিস্তার লাভ করেছিল তা প্রত্যেক পাঠকের মনোযোগ দাবী করে। তিনি বলেন, "আমরা এখানে ইসলামকে একটা জীবন্ত সক্রিয় শক্তি, হিসেবে দেখতে পাই, তার আদিম উত্তাপ ও শক্তি নিয়ে উপস্থিত দেখতে পাই, তা প্রাথমিক পর্যায়ের বিশিষ্টতাজ্ঞাপক বিস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে ধর্মান্তরিতকরণের কাজ করেছিল।"

www.amarboi.org

সপ্তম অধ্যায়
ইসলামের রাজনৈতিক মর্মবাণী

"আশ্রিত জিম্মিদের রক্ত মুসলমানদের রক্তের সদৃশ।" —হযরত আলী (কঃ)

অদ্যাবধি আমরা আরবের নবীর শিক্ষাকে মাত্র একটি দৃষ্টিভঙ্গী—মানুষের আচরণ-বিধি এবং মানুষের স্রষ্টার প্রতি ও তার স্ব-শ্রেণীর জীবের প্রতি তার কর্তব্যের নির্দেশনা থেকে আলোচনা করেছি। এখন আমরা সমষ্টিগত মানুষের উপর, জাতিসমূহের উপর, শুধু ব্যষ্টির উপর নয়, সংক্ষেপে মানুষজাতির সমষ্টিগত নিয়তির উপর ইসলামের প্রভাব পরীক্ষা করতে চাই।

দীনহীনদের কাছে স্বর্গরাজ্যের সুসংবাদ নিয়ে নাজারাতের পয়গাম্বরের আগমনকাল থেকে সাতশ বছর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তাঁর কার্যকাল আরম্ভ হতে না হতে একটি সুন্দর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এখন এক অনির্বচনীয় নিঃসঙ্গতা জগতের সব সাম্রাজ্য ও রাজ্যের উপর চেপে বসেছে এবং দুঃখ-দুর্দশায় নিপতিত খোদার বান্দারা অঙ্গীকৃত মুক্তির আশায় সাগ্রহে অপেক্ষা করছে।

প্রাচ্যের মতো প্রতীচ্যের জনগণের অবস্থাও ছিল বর্ণনাতীত। তাদের কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ছিল না। এসব ধনী ও শক্তিশালী কিংবা যাজকশ্রেণীর লোকদের একচেটিয়া ছিল। সবল ও দুর্বল, ধনী ও দরিদ্র, উঁচু ও নীচু সকলের জন্য একই আইন বলবৎ ছিল না। সাসানিয়াদের আমলে পুরোহিত ও জমিদার শ্রেণীর লোকেরা—দেহকান'রা—সব ক্ষমতা ও প্রভাব উপভোগ করত, আর দেশের সম্পদ তাদের কুক্ষিগত হয়েছিল। কৃষক ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা আইনহীন জুলুমের ফলে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে ধর্মযাজক ও খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি, বারাঙ্গনা এবং সিজার ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পাপের অন্যান্য নামহীন সাহায্যকারীরা ধনসম্পত্তি ও প্রতিপত্তির সুখী মালিক ছিল। জনগণ চরম দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে কালাতিপাত করত। বর্বরদের রাজত্বে বাস্তবিক সামন্তবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে বেশীর ভাগ লোক ছিল দাস।

www.amarboi.org

ভূমিদাসত্ব বা গোলামি ছিল কৃষকদের সাধারণ পদমর্যাদা। প্রথমে ভূমিদাস ও গৃহভৃতের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। পরিবার এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিসহ উভয় শ্রেণীর দাস ভূস্বামীর অন্তর্ভুক্ত ছিল; মালিক স্বাধীন ইচ্ছা ও খেয়ালখুশি অনুযায়ী তাদের সঙ্গে আচরণ করতে পারতেন।[১] পরবর্তীকালে ভূমিদাস বা দাস হয় জমিদারের খাসখামারের সঙ্গে যুক্ত হত এবং যে জমির অন্তর্ভুক্ত থাকত তার সঙ্গেই ক্রীত-বিক্রিত হত নতুবা ভূস্বামীর সঙ্গে যুক্ত হত এবং একজন মালিকের নিকট থেকে অপর একজন মালিকের নিকট হস্তান্তরযোগ্য ছিল। প্রভুর বিনা অনুমতিতে তারা তাকে পরিত্যাগ করতে পারত না; যদি তারা পলায়ন করত কিংবা অপহৃত হত তবে তার স্বত্ব দাবী করা যেত এবং পশু ও স্থাবর সম্পত্তির মতো তাদেরকে পুনরায় লাভ করা যেত। বাস্তবিকপক্ষে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবারের পরিপোষণের জন্য জমির সামান্য অংশই তারা রাখতে পারত এবং তাও তাদের প্রভুর মর্জির উপর নির্ভর করত, যখন ইচ্ছা তিনি তাদেরকে জমিচ্যুত করতে পারতেন। ভৃত্য জমি বা অস্থাবর কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারত না; যদি সে তেমন কোন সম্পত্তি ক্রয় করত তবে তার প্রভু তার সম্পত্তি উচ্ছেদ করে নিজের সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত করে নিতেন।

ভূমিদাস ও গৃহভৃত্য উভয় শ্রেণীর দাসদের গলায় লোহার বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হত—এটাই ছিল তাদের প্রতীক। দাসদেরকে দলে দলে এক স্থান হতে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হত, শূকরের পালের মতো খাওয়ান হত, এবং শূকরের পালের চেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্যে শয়নের ব্যবস্থা করা হত–হাতকড়া ও পায়ে বেড়ী দিয়ে এবং গলার বেড়ীর ভিতর দিয়ে একটি মাত্র শৃঙ্খল পরিয়ে দিয়ে বহু দাসকে একসঙ্গে শুতে দেওয়া হত। এই দাসব্যসায়ীরা হাতে ভারী বহুল গ্রন্থিযুক্ত চাবুক নিয়ে ঘুরে বেড়াত আর অবসন্ন ও ক্লান্ত দাসদের "উৎসাহিত করত"। এই চাবুক প্রায়ই সপাং-সপাং চলত এবং তার ফলে দাসদের শরীর থেকে মাংস খসে পড়ত। নরনারী-শিশুদের, দেশের বিভিন্ন স্থানে টেনে-হেচ্‌ড়ে নিয়ে বেড়ানো হত, তাদের গায়ে থাকত ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, গোড়ালিতে ঘা হয়ে যেত এবং পদতল যেত ফেটে। কোন হতভাগ্য বেচারা যদি অবসন্ন হয়ে ভূতলশায়ী হত তবে তার উপর চলত চাবুক যতক্ষণ না তার গায়ের চামড়া উঠে যেত এবং তারা মৃতবৎ হয়ে পড়ত। মিডল প্যাসেজের বিভীষিকা, দাসমুক্তির যুদ্ধের পূর্বে উত্তর আমেরিকার দক্ষিণ রাজ্যসমূহের হতভাগ্য নিগ্রোদের দুর্দশা, সৌদানি দাস অপহরণকারীদের নির্মম নির্যাতন খ্রিস্টান জগতে দাসদের উপর অনুষ্ঠিত নির্মম অত্যাচার সম্পর্কে কিছু ধারণা দেয়। যখন ইসলাম প্রথম প্রচারিত হয়েছিল তখন এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এই অবস্থা চলেছিল।[২] এমন কি খ্রিস্টধর্মের প্রায় দু'হাজার বছরের শাসনাধীনে খ্রিস্টানগণ অসহায় নারীদেরকে পিটিয়ে মারত এবং সভ্যজগতের একটি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্য বাস্তব বা কাল্পনিক রাজনৈতিক অপরাধের জন্য তাদেরকে জেলখানায় শাস্তি দিত।[৩]

তথাকথিত স্বাধীন লোকদের অবস্থা কোন দিক দিয়েই সাধারণ দাসদের অবস্থার চেয়ে উত্তম ছিল না। যদি তারা তাদের জমি পরিত্যাগ করতে চাইত তবে তাদেরকে

www.amarboi.org

অনুরূপভাবে জরিমানা দিতে হত। আবার যদি তারা কোন জমি ক্রয় করতে চাইত তবে তাদেরকে অনুরূপভাবে জরিমানা দিতে হতে। বড় ধরনের শুল্ক না দিলে তারা উত্তরাধিকারসূত্রে কোন সম্পত্তি লাভ করতে পারতনা। তাদের প্রভুদেরকে অংশ প্রদান না করলে তারা তাদের শস্য ভাঙ্গাতে কিংবা রুটি তৈরি করতে পারত না। গির্জা তার দশমাংশ, রাজা তার বিংশতিতম অংশ, পারিষদবর্গ তাদের ক্ষুদ্রাংশ নেওয়ার পূর্বে তারা তাদের শস্য সংগ্রহ করতে পারত না। প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে তারা তাদের গৃহ থেকে নিক্রান্ত হতে পারত এবং তারা চিরস্থায়ীভাবে তাদের প্রভুর অবৈতনিক কাজ সম্পাদন করতে চুক্তিবদ্ধ ছিল। যদি প্রভুর পুত্র বা কন্যার বিবাহ হত তবে তাদেরকে ব্যয়ের অংশে বহন করতে হত। কিন্তু যখন কোন স্বাধীন ব্যক্তির কন্যার বিবাহ হত তবে প্রথমে তাকে কুখ্যাত প্রকাশ্য বলাৎকারের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হত; এমন কি খ্রিস্টের খাদেম বিশপ যদি জমিদারির মালিক হত তবে সেও এই বর্বরতার নির্মম সুযোগ মওকুফ করত না। বর্বরতার হতভাগ্য শিকার এসব বেচারাদের পক্ষে মৃত্যুও সান্ত্বনা বিষয় ছিল না। জীবন্ত অবস্থায় তারা মানুষের অমানুষিকতার অধীন ছিল, মৃত্যুর পর অনন্ত নরকবাসের জন্য নির্ধারিত ছিল। আর আত্মহত্যাকারী ছিল অপরাধীদের মধ্যে অপবিত্রতম; পবিত্র জমিতে তার দেহ সমাহিত হতে পারত না। গভীর রাত্রিতে তার দেহ পাচার করে অপবিত্র জমিনে অন্যের জন্য হুঁশিয়ারী সংকেত হিসেবে খোঁটাবিদ্ধ অবস্থায় কবর দেওয়া হত।

জনগণের উপর এই ধরনের ভয়াবহ দুর্দশা বিরাজমান ছিল। কিন্তু ব্যারনরা তাদের সভাকক্ষে, বিশপরা তাদের প্রাসাদে, পুরোহিতরা তাদের গির্জায় জনগণের দুদর্শার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করত না। ইউরোপ, আফ্রিকার উজ্জ্বলতম এলাকাতেও রাত্রির ঘোর অন্ধকার জমাট বেঁধেছিল। প্রত্যেক জায়গায় সবলের ইচ্ছাই ছিল আইন ও অধিকারের মানদণ্ড। অবহেলিত ও অত্যাচারিতদের প্রতি ধর্মযাজকরা কোন সাহায্য করত না। পশু শক্তির আইন থেকে মানবজাতির মুক্তি ছিল গির্জার শিক্ষার পরিপন্থী। সুগঠিত কর্তৃপক্ষের কাজে কোন ধরনের প্রতিরোধকে প্রথম যুগের খ্রিস্টান পুরোহিতগণ মারাত্মক পাপ বলে গণ্য করত। শাসকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে শোষিতদেরকে সবলে রক্ষা করার জন্য মানবতার উপর কোন নির্যাতন, কোন জুলুম, কোন বলাৎকার অনুষ্ঠিত হয়নি। যীশুর শিষ্যরা তাদের সঙ্গেই রাখী বেঁধেছিল সেই ধনী ও বলশালী অত্যাচারীদের সঙ্গে, যাদেরকে তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। তারা সামান্ততন্ত্রের সঙ্গে সংস্রব রক্ষা করত এবং জমিদার, ব্যারন ও যুবরাজদের মতো সকল সুযোগ সুবিধা উপভোগ করত।

ইহুদী, ধর্মত্যাগী কিংবা পৌত্তলিক—অ-খ্রিস্টানগণ খ্রিস্টান-শাসনাধীনে আতঙ্কিত জীবন নির্বাহ করত। এটা শুধু সুযোগের ব্যাপার ছিল যে কখন তাদেরকে হত্যা করা হবে কিংবা তাদেরকে দাসে পরিণত করা হবে। তাদের কোনই অধিকার ছিল না; তারা শুধু দুঃখ-দুর্দশা ভোগের জন্যই জন্মেছিল। যদি একজন খ্রিস্টান একজন অ-খ্রিস্টানের সঙ্গে অবৈধ যৌন মিলনে মিলিত হত—তবে সেখানে আইনগত মিলন ছিল অসম্ভব—

www.amarboi.org

তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। ইহুদীরা খ্রিস্টানদের সঙ্গে একই টেবিলে পানাহার করতে পারত না কিংবা খ্রিস্টানদের মতো পোশাক পরিধান করতে পারত না। তাদের সন্তানদের দেহ থেকে বাহু বিচ্ছিন্ন করা হত; ব্যারন, বিশপ বা উন্মত্ত জনতার ইচ্ছাক্রমে তাদের দ্রব্যসম্ভার লুঠ হত। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অবস্থা চলেছিল।

যতদিন না হিরা পর্বতের গুহা থেকে স্বাধীনতার আহ্বান ধ্বনিত হয়েছিল, যত্দিন না তিনি মানবজাতির বাস্তব সাম্য ঘোষণা করেছিলেন, যতদিন না তিনি শ্রেণীগত প্রত্যেকটি সুবিধা দূরীভূত করেছিলেন, শ্রমকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, ততদিন পর্যন্ত যে শৃঙ্খল পৃথিবীর বিভিন্নজাতিকে বেঁধে রেখেছিল তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েনি। তাঁর পূর্বসূরিগণ যে বাণী নিয়ে এসেছিলেন তিনি সেই একই মহান শিক্ষা নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনিই তা কার্যকরী করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মদিনায় আগমনের পর ইহুদীদেরকে তিনি যে সনদ মঞ্জুর করেছিলেন এবং ইসলাম পরিপূর্ণভাবে আরব উপদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নজরানের খ্রিস্টানদেরকে ও প্রতিবেশী রাজ্যসমূহকে যে উল্লেখযোগ্য বাণী তিনি প্রেরণা করেছিলেন তার মধ্যে ইসলামের রাজনৈতিক চরিত্রের মর্মবাণী দেখতে পাওয়া যাবে। এই দ্বিতীয় দলিলটি অ-মুসলিম প্রজাদের সঙ্গে আচরণের নিয়ামক নীতি প্রদান করে সব মুসলিম শাসকদেরকে। যদি কোন ক্ষেত্রে কোন শাসক এই নীতি থেকে দূরে সরে যেয়ে থাকেন তবে সেটা সেই শাসকের স্বভাবের জন্যই। যদি আমরা রাজনৈতিক প্রয়োজনকে পৃথকভাবে বিচার করি যা প্রায়ই ধর্মের নামে কথিত ও সম্পাদিত হয় তবে একথা বলতে হয় যে অন্য ধর্মের অনুসারীদের কাছে ইসলামের চেয়ে অধিকতর সহনশীল ধর্ম আর নেই।[৪] "রাষ্ট্রের প্রজ্ঞা" এখানে-ওখানে কিছুটা অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করলেও কিংবা কিছুটা বিশ্বাসের সমানুবর্তিতার উপর জোর দিলেও ইসলামের জীবনব্যবস্থা সর্বদা পরিপূর্ণ সহনশীলতা রক্ষা করেছে। খ্রিস্টান ও ইহুদীদের উপর তাদের ধর্মপালনের ব্যাপারে আইনগতভাবে কখনও উৎপীড়ন করা হয়নি কিংবা ধর্ম পরিবর্তনের জন্য কোনরূপ জুলুম করা হয়নি। তাদেরকে যে বিশেষ কর দিতে হত সেটা সামরিক অবদানের পরিবর্তে এবং এটা যথোচিত যে যারা রাষ্ট্রের নিরাপত্তামূলক আশ্রয় উপভোগ করবে তারা জনগণের ব্যয়ভারের ক্ষেত্রে কোন না কোনভাবে কিছু অবদান রাখবে। পৌত্তলিকদের ব্যাপারে আইন তত্ত্বগতভাবে শক্ত হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা সমভাবে উদার ছিল। যদি কোন সময়ে কঠোরভাবে তাদের সঙ্গে আচরণ করা হয়ে থাকে তবে তার কারণ নিহিত ছিল শাসক কিংবা জনগণের মনোভাবের মধ্যে সেক্ষেত্রে ধর্মীয় উপাদান শুধু ছল হিসেবে ব্যবহৃত হত।

ইসলামী রাষ্ট্রে অ-মুসলিম প্রজাগণ মারাত্মক সীমাবদ্ধতার অধীনে বসবাস করে—এই কালসিদ্ধিত ধারণার সমর্থনে শুধু ইসলামের পরবর্তী আইনবেত্তা বা আইনজীবীদের সংকীর্ণ মতবাদেরই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয় না। বরং কোরআনের কতিপয় আয়াতের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়, এটা দেখানোর জন্য যে হযরত অ-মুসলিমদেরকে[৫] ভাল চোখে

www.amarboi.org

দেখেননি এবং তাদেরও তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক উৎসাহিত করেননি।[৬] এ বিষয়ে আলোচনাকালে আমরা অবশ্যই ভুলব না যে ঐ আয়াতগুলির অবতরণকালে ইসলাম জীবনমৃত্যু সংগ্রামের মধ্যে নিপতিত হয়েছিল এবং মুসলমানদেরকে তাদের নতুন ধর্মমত থেকে ভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করার জন্য পৌত্তলিক, ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ বিশ্বাসঘাতকতামূলক উপায় অবলম্বন করেছিল। এমন সময়ে শিক্ষাগুরুর পক্ষে বিরোধী ধর্মমতসমূহের প্রতারণামূলক ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে শিষ্যদেরকে সাবধান করে দেওয়া অবশ্য করণীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুলনামূলক ইতিহাসের ছাত্র শত্রু ও বিরোধীদের বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। কিন্তু যখন আমরা অ-মুসলিম প্রজাদের প্রতি তাঁর সাধারণ আচরণের প্রতি দৃকপাত করি তখন আমরা দেখতে পাই যে তিনি উদার হৃদয়ে সহনশীলতা ও সহানুভূতি নিয়ে তাদের সঙ্গে আচরণ করেছেন।

কোন বিজেতা জাতি বা ধর্ম কি তার প্রজাদের জাতীয়তার ক্ষেত্রে হযরতের নিম্নোক্ত বিবৃতিতে যে নিশ্চয়তা দৃষ্ট হয় তদপেক্ষা অধিকতর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছে? নজরানের খ্রিস্টান ও প্রতিবেশী রাজ্যসমূহে আল্লাহর নিশ্চয়তা ও হযরতের অঙ্গীকার তাদের জীবন, তাদের ধর্ম ও তাদের সম্পত্তির প্রতি সম্প্রসারিত হল—যারা উপস্থিত আছে, যারা অনুপস্থিত রয়েছে সকলের জন্য, তাদের ধর্মপালন কিংবা তাদের উৎসবসমূহের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না; আর তাদের অধিকার বা সুযোগ-সুবিধার মধ্যে কোন পরিবর্তন সাধিত হবে না; কোন বিশপ তার যাজকীয় অবস্থান থেকে বহিষ্কৃত হবে না; কোন সন্ন্যাসী তার মঠ থেকে, কোন পুরোহিত তার গির্জা থেকে বিতাড়িত হবে না; পূর্বের মতো তারা ছোটবড় সকল অধিকার ভোগ করতে থাকবে; কোন মূর্তি বা ক্রুশ ধ্বংস করা যাবেনা; তারা অত্যাচার করতে পারবে না কিংবা অত্যাচারিত হবে না; আইয়্যামে জাহেলিয়াতের ন্যায় তারা রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার নেবে না; জমির আয়ের দশমাংশ তাদের নিকট থেকে আদায় করা হবেনা কিংবা সেনাবাহিনীর সংরক্ষণের জন্য তাদের কোন ব্যয়ভার বহন করতে হবে না।"[৭]

হিরা অধিগত হওয়ার পর এবং জনগণের আনুগত্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে খালিদ বিন ওয়ালিদ একটি ঘোষণা দিলেন যার বলে খ্রিস্টানদের জান, মাল ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হল। তিনি ঘোষণা করলেন যে "তাদেরকে তাদের 'নাকা'[৮] বাজানো থেকে এবং উৎসবে 'ক্রুশ' ব্যবহার থেকে বিরত করা যাবে না। ইমাম আবু ইউসুফ[৯] বলেন, আর এই ঘোষণা খলিফা[১০] ও তাঁর পারিষদ[১১] কর্তৃক অনুমোদিত ও মঞ্জুর হয়েছিল।"

নতুন গির্জা বা মন্দির নির্মাণের ব্যাপারে অ-মুসলিম প্রজাদের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। যেখানে শুধু মুসলমানেরা বাস করত সেইসব এলাকাতে নীতিগতভাবে এই ধরনের নিয়ম চালু ছিল। আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস[১২] বলেন, এতে যে শহর বা এলাকাতে শুধুই মুসলমানের বাস সেখানে কোন গির্জা বা মন্দির তৈরি করা যেত না, কিন্তু যেসব জায়গায় পূর্ব থেকেই 'জিম্মীদের' বাস ছিল সেখানে আমরা তাদের সঙ্গে আমাদের যে নিরাপত্তার চুক্তি তা অবশ্যই মেনে চলতাম।"[১৩] বাস্তবে এই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য হত।

—২০

www.amarboi.org

মামুনের সময়ে মুসলিম-সাম্রাজ্যে ইহুদীদের ও অগ্নি-উপাসকদের শত শত ধর্মমন্দির ছাড়াও খ্রিস্টানদের এগার হাজার মন্দিরের কথা জানতে পারি। এই সুশিক্ষিত নৃপতিকে খ্রিস্টানদের "চরম শত্রু" বলে অভিহিত করা হলেও তাঁর শাসনাধীনে সকল সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে, মুসলমান, ইহুদী, খ্রিস্টান সেবীয় ও জরথুস্ত্রবাদীদের থেকে লোক নিয়ে এই পরামর্শ সভা গঠিত হত এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পদমর্যাদার স্তর অনুসারে খ্রিস্টানদের অধিকার ও সুবিধাগুলি নিয়ন্ত্রিত ও নিশ্চিত হত।

ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে মিশর বিজয়ের পর খলিফা ওমর বিবেকানুমোদিত ভাবে খ্রিস্টানদের গির্জায় উৎসর্গীত সমুদয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি পুরাপুরি সংরক্ষিত রেখেছিলেন এবং পূর্ববর্তী সরকার কর্তৃক পুরোহিতদের ভরণপোষণের জন্য প্রদত্ত ভাতা চালু রেখেছিলেন।[১৪]

আদিম মুসলমান সরকারের সহনশীলতার সর্বোত্তম স্বাক্ষর খ্রিস্টানেরা স্বয়ং প্রদান করেছেন। তৃতীয় খলিফা ওসমানের শাসনামলে সার্ভের খ্রিস্টান পেট্রিয়ার্ক ফার্সের বিশপ সিমীয়নকে নিম্নোক্ত ভাষায় আহ্বান করেছিলেন, "যে আরবদেরকে আল্লাহ্ দুনিয়ার রাজত্ব দান করেছেন তারা খ্রিস্টধর্মের উপর আক্রমণ করে না, বরং তারা আমাদের ধর্মের ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে থাকেন, তাঁরা আমাদের ঈশ্বর ও সাধুপুরুষদের সম্মান প্রদানকরেন এবং আমাদের গির্জা ও মঠের প্রতি বদান্যতা প্রদর্শন করেন।"

স্বেচ্ছাচারিতার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য এড়ানোর জন্য কোন মুসলমানকেই এমন কি ক্রয়ের মাধ্যমেও জিম্মীর সম্পত্তির মালিকানা অর্জন করতে দেওয়া হত না। "ইমাম বা সুলতান কেউই 'জিম্মী'কে তার সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত করতে পারে না।"

আইনের দৃষ্টিতে মুসলমান ও 'জিম্মী' সম্পূর্ণরূপে সমান। খলিফা আলী বলেন, "তাদের রক্ত আমাদের রক্তের ন্যায়।" কোন কোন সুসভ্য দেশসহ, বহু আধুনিক সরকার তাদের নমুনা হিসেবে মুসলমানদের প্রশাসন ও ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে পারেন। অপরাধের শাস্তির ক্ষেত্রে শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। ইসলামের আইনে, যদি কোন মুসলমান কোন 'জিম্মী'কে হত্যা করে তবে সেও অনুরূপ শাস্তির অধীন।[১৫]

অ-মুসলিম প্রজাদের কল্যাণসাধনের উৎকণ্ঠার কারণে কর্দোভার প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফাদের ন্যায় বাগদাদের খলিফাগণ জিম্মীদের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাদের সম্পত্তির সংরক্ষণের জন্য একটি বিশেষ বিভাগ চালু করেছিলেন। বাগদাদে এই বিভাগের নাম 'কাতিবুল যিবাজেহ্' এবং স্পেনে এর নাম 'কাতিবজু জিমাম'।[১৬]

মুতাওয়াক্কল হুসাইনের স্মৃতিসৌধ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন এবং সেখানে তীর্থযাত্রীদের যাতায়াত নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি যেভাবে মুসলমান বুদ্ধিবাদীদেরকে রাষ্ট্রীয় কার্য থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন এবং তাদেরকে নানান ধরনের অযোগ্যতার শিকারে পরিণত করেছিলেন তেমনিভাবে তিনি অ-মুসলিম প্রজাদেরকেও বঞ্চিত করেছিলেন। পরবর্তী আইন গ্রন্থসমূহে যা রচিত হয়েছিল যখন ইসলাম ও

www.amarboi.org

খ্রিস্টানজগতের মধ্যে একদিকে জীবনের জন্য এবং অপরদিকে পাশবিক প্রভুত্বের জন্য লড়াই চলছিল তখন তাতে এ ধরনের দু'একটি অনুচ্ছেদ এসেছে যার কদর্থ করা হয়েছে যে ইসলামে জিম্মীরা অবহেলিত। কিন্তু শিক্ষাগুরু কিংবা অব্যবহিত অনুসারী অথবা উত্তরাধিকারিগণের প্রণীত বলবৎকৃত আইনসমূহের মধ্যে এরূপ কোন বর্ণনা মেলে না। অবশ্য এর সঙ্গে এটা অবশ্যই সংযোজিত করতে হবে যে পরবর্তী আইন প্রণেতাদের ধর্মান্ধ মতবাদ কখনো বাস্তবে অনুশীলিত হয়নি; জিম্মীগণ মুসলমানের উইলের তত্ত্বাবধায়ক হতে পারত—এই ঘটনা যে উদারতা ও সহনশীলতা নিয়ে অ-মুসলিমদের সঙ্গে আচরণ করা হত তার সাক্ষ্য বহন করে; তারা প্রায়ই মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের রেক্টর নিযুক্ত হত, এবং যতদিন তারা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন না করত, ততদিন তারা মুসলমানদের ওয়াকফ সম্পত্তির রক্ষক হিসাবে কাজ করত। যখন একজন সম্মানিত ও গুণবান অ-মুসলিম মারা যেত তখন মুসলমানেরা দলবদ্ধভাবে তার শেষকৃত্যে যোগদান করত।

মুসলিম রাষ্ট্রের সূচনায় সুস্পষ্ট কারণে সামরিক নেতৃত্ব অ-মুসলিমদের হস্তে ন্যস্ত করা হয়নি, কিন্তু উচ্চবেতন ও বিশ্বস্ততার অন্যান্য চাকুরিতে মুসলমানদের মতো তাদেরও সমান প্রবেশাধিকার ছিল। এই সমতা শুধু নীতিগতভাবেই বিদ্যমান ছিল না, বরং হিযরী প্রথম শতাব্দী থেকে আমরা খ্রিস্টান, ইহুদী ও মাজীদেরকে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করতে দেখি। আব্বাসীয় নৃপতিগণকে বিরল ব্যতিক্রম ছাড়াই ধর্মের ভিত্তিতে প্রজাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে দেখি না। পরবর্তী রাজবংশ যারা আব্বাসীয়দের স্থলে ক্ষমতা লাভ করেছিল তারাও বিবেকানুমোদিত ভাবে তাদের অনুসরণ করেছিলেন।

যদি ইসলামী দেশসমূহে অ-মুসলিমদের প্রতি আচরণের সঙ্গে ইউরোপীয় সরকারসমূহের অধীনে অ-খ্রিস্টানদের তুলনা করা যায় তবে দেখা যাবে যে মানবতা ও উদারতার পাল্লা ইসলামের অনুকূলে যাবে। দিল্লীর মুঘল বাদশাহদের অধীনে হিন্দুরা সেনাধক্ষ্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, প্রদেশসমূহের শাসনকর্তা হিসেবে কাজ করতেন এবং বাদশাহর উপদেষ্টা সভার সদস্য হিসেবে আসন অলঙ্কৃত করতেন। এমন কি বর্তমানকালে একথা কি বলা যেতে পারে যে মিশ্রজাতি ও ধর্মশাসিত ইউরোপীয় সাম্রাজ্যে ধর্মমত, বর্ণ বা বংশের পার্থক্য বিদূরিত হয়েছে?

ইসলাম প্রায় পরিপূর্ণভাবেই মানবজাতির মধ্যে ঐশী একত্ব ও মানবীয় সমতার নীতি যা হযরত প্রচার করেছিলেন তা প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছে। যতদিন পর্যন্ত আল্লাহর একত্বের কেন্দ্রীয় নীতি ও হযরতের পয়গাম স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে ততদিন ইসলাম মনুষ্য-বিবেকের বিস্তৃততম স্বাধীনতা প্রদান করেছে। ফলস্বরূপ যেখানে মুসলিম বীরেরা ইসলামের একত্ব ও সাম্যের বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে সেখানে অবহেলিত জনগণ ও নির্যাতিত ধর্মচ্যুত ব্যক্তিবর্গ ভয়াবহ দাসত্বের অক্টোপাশ থেকে স্বাধীনতা ও মুক্তির দূত হিসেবে ইসলামকে গণ্য করেছে। ইসলাম তাদের নিকট আইনের দৃষ্টিতে ব্যবহারিক সমতা এনে দিয়েছে এবং রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত করে দিয়েছে।

www.amarboi.org

কাদেসিয়ার যুদ্ধের ফলে পারস্য মুসলমানদের করতলগত হয়। এই যুদ্ধ অগণিত পারসিকদের মুক্তির সংকেত হিসেবে এসেছিল যেমন ইয়ারমুক ও আজনাদাইনের যুদ্ধ সিরীয়, গ্রীক ও মিশরীয়দের মুক্তির প্রতীক হিসেবে এসেছিল। জরথুস্ত্রবাদীরা ইহুদীদেরকে মাঝে মাঝে নৃশংসভাবে হত্যা করত এবং খ্রিস্টানদেরকে একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিতাড়িত করত; এ সব ভাগ্যহত মানুষেরা হযরতের কর্তৃত্বাধীনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল। হযরতের ধর্মনীতি ছিল বিশ্বভ্রাতৃত্ব। বিশ্বমানব মুসলমানদেরকে মুক্তিদাতা হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল। যেখানে ইসলাম কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে সেখানে স্বার্থপর পুরোহিত ও অভিজাত শ্রেণীকে বাধা দিতে দেখা গিয়েছে। জনগণ ও শ্রমিক শ্রেণী জরথুস্ত্রবাদীদের দ্বারা চিরনিগৃহীত হয়ে বিজেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এক চিরন্তন সত্যের স্বীকৃতি মাত্র মুসলিম বিজেতাদের সঙ্গে তাদেরকে এক কাতারে সন্নিবিষ্ট করেছে।

বিভিন্ন গোত্র ও জনপদের সামন্ত প্রধানেরা সুযোগ-সুবিধা, সম্মান ও আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার করেছে—গোবিনিউ বলেছেন, "মুসলমানদের অত্যাচার ও নির্যাতন বহুলাংশে অতিরঞ্জিত হয়েছে বলেই আমরা বিশ্বাস করি।"

আফ্রিকা ও স্পেন বিজয় একই ফলোৎপাদন করেছিল। এরিয়ান, পেলাজিয়ান এবং অন্যান্য ধর্মচ্যুত ব্যক্তিগণ অদ্যাবধি ধর্মান্ধতার ক্রোধ ও বিদ্বেষের শিকারে পরিণত হয়েছিল— তারা আইনবর্জিত সেনাপত্য দ্বারা এবং ততোধিক আইনবর্জিত পৌরহিত্য দ্বারা নিদারুণভাবে নির্যাতিত হয়েছিল—এসব লোক ইসলামের ছায়াতলে এসে শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করেছিল। ভাগ্যের পরিহাস প্রাচীনদের মধ্যে নিয়তির প্রতি বিশ্বাসের জন্ম দিয়েছিল; সেই ভাগ্যের পরিহাসক্রমে যে ইহুদীরা হযরতের প্রজাতন্ত্রের ধ্বংসের উপক্রম করেছিল তারাই মুসলমানদেরকে তাদের উত্তম রক্ষাকারী হিসেবে পেয়েছিল। "সমুদয় খ্রিস্টান জাতি দ্বারা অপমাণিত, লুণ্ঠিত ও ঘৃণিত হয়ে" তারা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করেছিল, অমানবিক আচরণ থেকে রক্ষা পেয়েছিল, যা থেকে সমগ্র খ্রিস্টানজাহান তাদেরকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করেছিল।

ইসলাম জাতিকে দিয়েছিল একটি জীবন বিধান বা সরলতার দিক দিয়ে প্রাচীন হলেও পার্থিব সভ্যতার অগ্রগতি অনুসারে সর্বোচ্চ বিকাশে সক্ষম ছিল। এ রাষ্ট্রকে দিয়েছিল একটি নমনীয় সংবিধান যা মানবীয় অধিকার ও দায়িত্বের সঠিক মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল ছিল। এ রাজস্বকে সীমিত করেছিল, মানুষকে আইনের দৃষ্টিতে সমান মর্যাদা দান করেছিল, এ স্বায়ত্তশাসনের মূলনীতিসমূহকে পরিশুদ্ধ করেছিল। এ কার্যনির্বাহী কর্তৃপক্ষকে আইনের অধীন করে শাসকের সার্বভৌম ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছিল—এই আইন ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ ও নৈতিক বাধ্যতাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উর্কুহার্ট বলেন, "এসব নীতির প্রত্যেকটির উৎকর্ষ ও কর্মক্ষমতা (প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠাতাকে অমর করতে সক্ষম) সবকিছুকে মূল্যবান করে তুলেছিল, আর সবগুলি নীতি মিলিত হয়ে এই জীবন ব্যবস্থাকে এমন শক্তিশালী ও প্রাণবন্ত করে তুলেছিল যা

www.amarboi.org

অন্যান্য রাজনৈতিক জীবনব্যবস্থাকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। একজন মানুষের জীবনকালের মধ্যেই একটা বন্য, মূর্খ অকিঞ্চিৎকর জাতির হাতেই এই ব্যবস্থা রোমের রাজ্যসমূহের চেয়েও অধিক বিস্তৃত হয়েছিল। এ তার আদি বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখলেও এ ছিল অপ্রতিরোধ্য।"[১৭]

আবু বকরের স্বল্প শাসনকাল প্রদেশের রীতি-সম্মত নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য মরুসন্তানের শান্ত করার কাজে সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু ওমরের শাসনভার গ্রহণের সঙ্গে—যিনি ছিলেন এক মহান ব্যক্তিত্ব—আদি মুসলিম শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক প্রজাহিতৈষী কার্যক্রমের বিনিদ্র তৎপরতা শুরু হয়েছিল।

প্রথম খলিফাদের আমলে মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, সরকার ছিল জনগণের সরকার, জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রধান সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে দেশশাসন করতেন। রাষ্ট্রপ্রধানের অধিকার সীমিত ছিল প্রশাসনিক ও কার্যনিবাহী বিষয়সমূহে; যেমন; পুলিশ নিয়ন্ত্রণ, সৈন্যবাহিনী পরিচালনা, বৈদেশিক বিষয়সমূহের সম্পাদন, অর্থব্যবস্থার বণ্টন ইত্যাদি। কিন্তু স্বীকৃত আইন লঙ্ঘন করে তিনি কিছুই করতে পারতেন না।

বিচারবিভাগ সরকারের উপর নির্ভরশীল ছিল না। বিচারকদের সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত; নিয়মিত বিচারসংস্থা কোন ব্যক্তিকে কঠোর দণ্ড দিলে প্রথম খলিফাগণ তা মওকুফ করতে পারতেন না। ধনী ও দরিদ্র, ক্ষমতাশালী ও দিনমজুর—সকলেই আইনের দৃষ্টিতে ছিল সমান।

যতই সময় এগিয়ে যায় জীবনব্যবস্থার কঠোরতাও শিথিল হয়ে আসে। কিন্তু তার রূপ সর্বদা সংরক্ষিত থাকে। এমন কি অন্যায়ভাবে সিংহাসন-দখলকারী উমাইয়াগণ বিনা অধিকারে, বিশ্বাসঘাতকতা ও হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সরকার দখল করেছিল এবং ইসলামী শিক্ষা যে পৌত্তলিক অভিজাততন্ত্রের বিলোপ ঘটিয়েছিল তারা ব্যক্তিগতভাবে তার প্রতিনিধিত্ব করত। তবে প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের আইনানুগ কার্যনির্বাহী প্রধানের ন্যায় তারা কমবেশী বাহ্যত আচরণ করত। পরবর্তী বংশসমূহের শাসকবৃন্দ যখন তাদের স্বেচ্ছাচারিতার সীমা অতিক্রম করত তখন বিচারকমণ্ডলীর রায় তাদেরকে সংযত করত। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে এ ছিল নৃপতিদের উপর সাংবিধানিক নিয়ন্ত্রণ। প্রাথমিক পর্যায়ে হযরতের সাহাবীগণ রাষ্ট্রের পরামর্শ সভার প্রভাবশালী সদস্য হিসেবে কাজ করতেন। "হযরতের সাহাবী" উপাধির প্রতি গুরুত্ব যেমন শহরে তেমনি তাবুতে ছিল প্রচণ্ড। যে শক্তিশালী প্রভাব তাঁরা বিস্তার করেছিলেন তা মুসলমানদের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেয়েছিল। 'আসহাবে'র গুণ এর সঙ্গে পবিত্রতা ও মহত্ত্বের চরিত্র বহন করত। যখন এই উপাধিকারী কোন ব্যক্তি কর্মরত হতেন তখন জনগণ তাঁর পাশে এসে সমবেত হত এবং তাঁর নেতৃত্ব অনুসরণ করত। প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা হযরতের সঙ্গে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন এবং আনসারগণ যাঁরা আনুগত্যের সাথে তাঁকে মদিনায় গ্রহণ করেছিলেন, আর বদর ও ওহোদে ধর্মের সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধ করেছিলেন;

www.amarboi.org

আর যাঁরা তাঁর দ্বারা কোন কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, দেখেছেন, কিংবা তাঁর কথা শুনেছেন। সর্বশেষ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা যে কোন "সাহাবা"র অধীনে কাজ করেছেন এবং পরোক্ষভাবে হযরতের অত্যাশ্চর্য প্রভাবের মধ্যে এসেছেন।

ওমরের খেলাফতের সময়ে একটি ঘটনা ঘটেছিল যা ইসলামে সকল মানুষের পরিপূর্ণ সাম্যভাব প্রদর্শন করে। ঘাসানিয়াদের নৃপতি জবালা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি বিশ্বাসীদের নেতা আমিরুল মুমেনিনকে সম্মান প্রদর্শন করতে মদিনার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। যখন তিনি কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ কবছিলেন তখন একজন সাধারণ মুসলমান পবিত্র কাবাগৃহ প্রদক্ষিণ করছিল। অকস্মাৎ তার একখানি হজ্জের বস্ত্র নৃপতির স্কন্ধদেশে নিপতিত হয়েছিল। জাবালা ক্রোধান্বিত হয়ে পিছন ফিরে তাকে এমন ঘুষি মারেন যাতে তার দাঁত গুলি পড়ে যায়। এই ঘটনার বাকী অংশ সিরিয়ার প্রেরিত মুসলিম সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ আবু উবাইদার প্রতি হযরত ওমরের অবিস্মরণীয় বিবৃতির মধ্যে পাওয়া যায়। খলিফা তাঁকে লিখেন, "বেচারা আমার নিকট আসেন এবং প্রতিকার চান। আমি জবালাকে ডেকে পাঠাই; যখন তিনি আমার সম্মুখে হাজির হন তখন আমি তাকে প্রশ্ন করি কেন তিনি একজন মুসলিম-ভাইকে অপমান করেছেন। তিনি উত্তর দেন যে লোকটি তাকে অপমান করেছে, আর যদি এই পবিত্র স্থানে না হয়ে অন্য কোথায় হত তবে তিনি তাকে ঐ স্থানেই হত্যা করতেন। আমি উত্তর করলাম যে, তার কথা অপরাধের গুরুত্বকে আরও বৃদ্ধি করেছে; যদি তিনি আহত লোকটির কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে না নেন তবে তাকে আইনের স্বাভাবিক শাস্তি পেতে হবে। জবালা জবাব দিল, 'আমি একজন নৃপতি এবং অপর ব্যক্তি একজন সাধারণ লোক।' 'নৃপতি বা সাধারণ লোক আপনি যাই হোন না কেন, উভয়েই মুসলমান এবং আইনের দৃষ্টিতে উভয়ই সমান।' তিনি পরদিন পর্যন্ত শাস্তি মুলতবী রাখতে অনুরোধ করলেন এবং আহত লোকটির সম্মতিক্রমে আমি বিলম্বে সম্মতি দান করলাম। রাত্রিতে জবালা পলায়ন করলেন এবং এখন খ্রিস্টান কুকুরের[১৮] সঙ্গে যোগদান করেছেন। কিন্তু আল্লাহ আপনাকে তার উপর এবং তার মতো অন্যান্যদের উপর বিজয়ী করবেন ...।"

ওমরের এই পত্রখানা আবু উবাইদা সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে পাঠ করলেন। এরূপ যোগাযোগ প্রথম খলিফাদের সময়ে প্রায়ই ঘটত। কোন ব্যক্তি শিবিরে কিংবা শহরে জনসাধারণের কাজ সম্পর্কে অপরিজ্ঞাত থাকত না। প্রত্যেক শুক্রবারে জামাতের নামাজের পর আমিরুল মুমেনিন সমবেত জনতার নিকট দিনের গুরুত্বপূর্ণ মনোনয়ন ও ঘটনাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করতেন। প্রদেশসমূহের শাসনকর্তারাও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন। কেউই সাধারণ সভায় যোগদান থেকে বঞ্চিত হত না। এই ছিল গণতান্ত্রিক শাসনের সর্বোত্তম রূপ। ইসলামের নেতা বা আমিরুল মু'মেনিন কোন অলৌকিকতার অস্পষ্টতায় বিজড়িত থাকতেন না। তিনি রাষ্ট্রের শাসনের ব্যাপারে জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকতেন। জনগণের কল্যাণে প্রাথমিক খলিফাদের কঠোর নিষ্ঠা এবং তাদের

www.amarboi.org

জীবনের কৃচ্ছ্র সরলতা ছিল হযরতের দৃষ্টান্তের কঠিন অনুসরণ। তারা হযরতের মতো মসজিদে ধর্মপ্রচার ও নামাজ আদায় করতেন; গৃহে তারা দরিদ্র ও মজলুমদের আপ্যায়ন করতেন এবং নীচতম ব্যক্তিদের কথাও মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। পারিষদ ব্যতিরেকে, আড়ম্বর বা অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে তাঁরা তাঁদের চরিত্রবলে জনগণের হৃদয় শাসন করতেন। একজন মাত্র ভৃত্য সমভিব্যহারে খলিফা ওমর জেরুজালেমের আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগদান করতে গমন করেছিলেন। আবু বকর তাঁর মৃত্যুকালে মাত্র এক প্রস্থ পোশাক, একটি উট ও একজন ভৃত্য তাঁর উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে গিয়েছিলেন। প্রত্যেক শুক্রবারে আলী বায়তুল মাল থেকে যে ভাতা পেতেন তা বিপন্ন মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন এবং জাতির সমক্ষে সাধারণ বিচারসভার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাবোধের নজীর স্থাপন করেছিলেন। যতদিন ইসলামিক প্রজাতন্ত্র টিকেছিল কোন খলিফাই ন্যায়বিচারের জন্য গঠিত আদালতের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারতেন না কিংবা তার বিপরীতে কাজ করতে পারতেন না।[১৯]

স্বাভাবিকভাবেই বাহুবলে স্থাপিত কোন নতুন সরকারের পক্ষে অনতিবিলম্বে জাতির ভাবাবেগ সমন্বিত করা কঠিন। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে আরবজাতি বিজিত জাতিসমূহকে সর্বাধিক প্রত্যয় ও অনুরাগ দান করেছিলেন। আবু উবাইদার সংযম ও শান্ত ভাবের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, সৈন্যধ্যক্ষ ও প্রধানগণ খালিদের মতো দুর্ধর্ষ সৈন্যদের মার্জিত ও শান্ত করেছিলেন, এবং জনগণের দেওয়ানী অধিকারসমূহকে অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। তাঁরা বিজিত জাতিসমূহকে পরিপূর্ণ ধর্মীয় সহনশীলতা দান করেছিলেন। তাদের আচরণ আধুনিক কালের বহু সভ্য সরকারকে দেওয়ানী ও ধর্মীয় স্বাধীনতার মহত্তম দৃষ্টান্ত দান করতে পেরেছেন। তাঁরা কোন স্ত্রীলোককে প্রহার করে হত্যা করেননি। তাঁরা নির্দোষ মহিলাদেরকে সাইবেরিয়ার খনিতে নিক্ষিপ্ত করেননি এবং তাদের প্রহরীদের নিকট বলাৎকারের জন্য ছুঁড়ে দেননি। যেসব হিতকর সামাজিক প্রথা তাদের ধর্মের সঙ্গে সংঘর্ষে আসেনি সেগুলোর ক্ষেত্রে বিরোধিতা না করার দূরদর্শিতা তাদের ছিল।

জনগণের কৃষিবিষয়ক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য ওমর যেসব ব্যবস্থা নিয়েছিলেন তা তাদের কল্যাণ ও স্বার্থের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর সতত উপস্থিত উৎকণ্ঠার নির্দেশক। জমির রাজস্ব, সমতা ও মধ্যপন্থার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যের সর্বত্র পয়ঃপ্রণালী ও খাল কাটবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল। সামন্তব্যবস্থা যা কৃষকদের ন্যুব্জ করছিল তা সম্পূর্ণরূপে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং শতাব্দী সঞ্চিত অধীনতা থেকে কৃষককুলকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। আততায়ীর হাতে এই স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের মৃত্যু নিঃসন্দেহে সরকারের বিরাট ক্ষতি। তাঁর কঠোর অথচ ন্যায়পরায়ণ চরিত্রশক্তি, তাঁর সাধারণবুদ্ধি ও মনুষ্যস্বভাবের জ্ঞান উমাইয়া সন্তানদের উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা দমনে ও রাখতে তাঁকে উল্লেখ যোগ্যভাবে উপযোগী করেছিল। মৃত্যুশয্যায় ওমর ছয়জন নির্বাচকের উপর খেলাফতের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আবু তালিবের পুত্রকে খলিফা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছিল কিন্তু উমাইয়াদের ষড়যন্ত্র এই

www.amarboi.org

প্রস্তাবের সঙ্গে এমন একটি শর্ত যোগ করেছিল যা তারা জানত আলী সমর্থন করবেন না। তাঁকে শুধু হযরতের আইন ও নজির অনুসারে সরকার পরিচালনা করলে চলবে না, অধিকন্তু তাঁর পূর্ববর্তী দু'জন খলিফার প্রতিষ্ঠিত নজির অনুসারেও সরকার পরিচালনা করতে হবে। স্বাধীনচেতা আলী তাঁর বিচারবুদ্ধিকে কোনরূপে শৃঙ্খলিত করতে রাজী ছিলেন না। কাজেই উমাইয়াগণ যেভাবে প্রত্যাশা করেছিল তেমনি তাদের জ্ঞাতি ওসমানকেই খেলাফত প্রদান করা হল। হযরতের উত্তরাধিকারত্বে এই শ্রদ্ধাস্পদ প্রধানের অভিষেক শেষ পর্যন্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পক্ষে শর্তবিহীন অমঙ্গলের কারণ হয়েছিল। তিনি সেই বংশের সদস্য ছিলেন যে বংশ সর্বদা হাশেমের বংশধরদের প্রতি বদ্ধমূল শত্রুতা পোষণ করত। তারা বিদ্বেষপূর্ণ শত্রুতার সঙ্গে হযরতের উপর নির্যাতন চালিয়েছিল এবং তাঁকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছিল। তারা শৈশবেই ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য জোর প্রয়াস চালিয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। নিজেদেরকে সম্মিলিত করে, মোজার বংশের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে যে বংশের তারা ছিল প্রধান সদস্য, উমাইয়াগণ বিদ্বেষের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল যে তাদের পূর্ব শক্তি ও আভিজাত্য বিলীন হয়ে যাচ্ছে। মক্কা-বিজয়ের পর তারা নির্বন্ধকে গ্রহণ করেছিল সত্য, কিন্তু আবদুল্লাহর পুত্র তাদের জন্য যে বিপর্যয় এনেছিলেন সেজন্য তারা হাশিম বংশকে বা ইসলামকে কখনো ক্ষমা করেনি। হযরত যতদিন পর্যন্ত বেঁচেছিলেন ততদিন তাঁর প্রভুত্বব্যঞ্জক ব্যক্তিত্বের সামনে এসব বিশ্বাসঘাতকের দল স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তাদের অনেকেই স্বার্থের তাগিদে[২০] এবং মুসলমানদের পার্থিব বিজয় ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ক্ষেত্রে যে কল্যাণ বহন করে এনেছিল তার আংশিক ভাগীদার হওয়ার লোভে নামমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তারা কোনদিন মুহম্মদ-ঘোষিত গণতন্ত্রের প্রতি শত্রুতা থেকে বিরত হয়নি। লম্পট, অবিবেকী ও নির্মম এবং অন্তরে পৌত্তলিক, তারা সাম্যের ধর্মের প্রতি বিরক্ত বোধ করত—যে ধর্মনৈতিক কর্তব্য ও ব্যক্তিগত শালীনতার পালন পুরোপুরি দাবী করত। যে সরকারের প্রতি তারা আনুগত্য প্রকাশ করেছিল তাকে ধ্বংস করার জন্য এবং যেসব লোকের উপর প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য উদ্যত হয়েছিল। হযরতের প্রথম দু'জন, উত্তরাধিকারী তাদের উচ্চাশাকে সীমার মধ্যে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং তাদের ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক অভিপ্রায় দমন করতে পেরেছিলেন। ওসমানের নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে শকুনি যেমন শিকারের গন্ধ পায় তেমনি তারা মদিনায় এসে জুটেছিল। তাঁর খেলাফত লাভ উমাইয়াদের সেই বিদ্বেষ প্রকাশের এবং সেই বদ্ধমূল লাম্পট্যের সংকেত ছিল যা ইসলাম জাহানের অন্তঃস্থলকে কাঁপিয়ে তুলেছিল এবং তার মহত্তম ও সর্বাপেক্ষা মূল্যবান জীবনগুলি ধ্বংস করেছিল।

ওসমানের শাসনামলে তাঁর দু'জন পূর্বসূরীর নীতি ও প্রশাসনের সম্পূর্ণ ওলটপালট হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের সিদ্ধান্তসমূহ অনুসরণের জন্য তিনি অঙ্গীকৃত ছিলেন। হযরতের সাক্ষাৎ শিষ্য ও সঙ্গীদের মধ্য থেকে নিযুক্ত সকল পূর্ববর্তী শাসনকর্তা ও

www.amarboi.org

সেনাধ্যক্ষদেরকে অপসারিত করা হল। গুণ ও বিশ্বস্ত খেদমত সম্পূর্ণরূপে পদদলিত হল। বিশ্বাস ও বৈতনিক সব বিভাগ উমাইয়া দখল করল। যেসব লোক ইসলামের চরম শত্রুতা করেছিল তাদেরকে প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করা হল এবং তাদের অনুকূলে বায়তুলমাল বা টাকশাল উজাড় করা হল। আমরা মুহম্মদের ধর্মাবলম্বীদের বিভেদ আলোচনা কালে পরবর্তী ঘটনাসমূহ কিছুটা সবিস্তারে বর্ণনা করব। এখানে এটুকু বলাই যথেষ্ট হবে যে, প্রশাসনের দুর্নীতি, সব পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তের প্রতি সম্পূর্ণ অবমাননা, নিজ জ্ঞাতি-কুটম্বদের প্রতি বৃদ্ধ খলিফার স্বজনপোষণ এবং কোন অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত না-করা হযরতের বৃদ্ধ সাহাবা ও জনসাধারণের মধ্যে মারাত্মক অসন্তোষ সঞ্চার করেছিল। এসব বিদ্রোহে পর্যবসিত হয়েছিল, যার ফলে ওসমান প্রাণ হারান। ওসমানের মর্মান্তিক মৃত্যুতে জনগণ সর্বসম্মতিক্রমে আলীকে খলিফার শূন্য আসনে নির্বাচিত করল। যে বিদ্রোহ পরে দেখা দিয়েছিল তা ইতিহাসের বিষয়। ওল্‌সনার বলেন, "যদি আলীকে শান্তিতে শাসন পরিচালনা করতে দেওয়া হত তবে তাঁর গুণাবলী, তাঁর দৃঢ়তা এবং চরিত্রের বলিষ্ঠতা পুরাতন প্রজাতন্ত্র ও তার সরল কার্যপদ্ধতিকে চিরস্থায়ী করতে পারত।"[২১] আততায়ীর খঞ্জর ইসলামের আশা নির্মূল করে দিল। মেজর অসবর্ণ বলেন, "তাঁর নিধনের সঙ্গে সঙ্গে সত্যদীপ্ত হৃদয় ও সর্বোত্তম মুসলমান, যার বিবরণ ইসলামের ইতিহাসে শ্রদ্ধাভরে স্মরিত, বিশ্ব থেকে তিরোহিত হন।" সাত শ' বছর পূর্বে এই বিস্ময়কর ব্যক্তির প্রতি ঐশীত্ব আরোপ করা যেত; তেরশ' বছর পরেও তাঁর প্রতিভা ও মেধা, তাঁর গুণাবলী ও সাহসিকতা সভ্য জগতের প্রশংসা দাবী করে। শাসক হিসেবে তিনি তাঁর যুগের অগ্রগামী ছিলেন। সত্যের জন্য আপোষহীন অনুরাগ, কোমল ও দয়ার্দ্রহৃদয় আলী উমাইয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাসক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে ছিলেন প্রায় অনুপযোগী।

উমাইয়া রাজবংশের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামের রাজনৈতিক মর্মবাণীর মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। রাষ্ট্রপ্রধান তখন জনগণের সাধারণ ভোটে নির্বাচিত প্রজাতন্ত্রের প্রধান নন, যিনি জনগণের কল্যাণের জন্য ও ধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার জন্য শাসন করবেন, উমাইয়াদের সময় থেকে খলিফা তার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করতেন : তার উপস্থিতিতে কিংবা তার থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে জনগণের আনুগত্য প্রকাশ তার নির্বাচনের বৈধতা প্রতিপন্ন করত। এই ব্যবস্থা গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের সুবিধা ব্যতিরেকে তাদের সম্মিলিত কুফল উৎপন্ন করত। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শুধু খলিফাগণ হযরতের সাহাবাদের সমন্বয়ে গঠিত পরামর্শ সভার সাহায্য লাভ করতেন না, এমন কি প্রাদেশিক গভর্ণরগণেরও উপদেষ্টা পরিষদ থাকত। উমাইয়া শাসন আমলে সরকার ছিল নির্ভেজাল স্বৈরতন্ত্র; মরুসন্তান আরবদের ও বিদ্বান বা পবিত্রাত্মা ব্যক্তিদের বাক্‌স্বাধীনতা ছিল এ ধরনের যে, প্রায়ই তারা কোরআনের একটি বাক্যাংশের কিংবা একটি আয়াতের সাহায্যে কিংবা কবির কবিতার মাধ্যমে সুলতানের মেজাজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে পারতেন। আব্বাসিয়া রাজবংশ প্রথম পাঁচজন খলিফার আমলেও

www.amarboi.org

সরকার ছিল কমবেশী স্বৈরতান্ত্রিক, যদিও বিভাগীয় মন্ত্রিগণ ও রাজবংশের প্রধান সদস্যগণকে নিয়ে অননুমত উপদেষ্টাদের পরিষদ গঠিত হত। সমাজের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত নিয়মিত উপদেষ্টা পরিষদ যা সুলতানের আনুগত্য লাভ করত তা মহান সুলতান মামুনের আমলেই প্রথম গঠিত হয়েছিল। বুয়াইদ, সামানিয়া, সেলজুক ও আইয়ুবিয়া সুলতানদের সকলেরই উপদেষ্টা পরিষদ ছিল যাতে কমবেশী জনগণের প্রতিনিধিত্ব থাকত।

প্রাথমিক পর্যায়ের আব্বাসীয় খলিফাদের একাধিপত্য ইসলামী জাতিসমূহের বুদ্ধিগত বিকাশ ও পার্থিব সমৃদ্ধিকে সহায়তা করেছিল। তাদের শাসনের প্রাণবন্ততা ও যে দৃঢ়তার সঙ্গে তারা সরকার পরিচালনা করেছিলেন তাতে ইংল্যান্ডের টিউডর নৃপতিদের সঙ্গেই তাদের তুলনা করা চলে। আব্বাসিয়া খলিফাদের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরবর্তী রাজবংশগুলি গ্রহণ করেছিল। আর এই ব্যবস্থা বাগদাদের স্থপতি বাদশাহ্ মনসুরের প্রতিভার ফলশ্রুতি। কার্যকর কর্মবণ্টন ব্যবস্থা ও তার খুঁটিনাটি নিয়ন্ত্রণের দিক দিয়ে আধুনিক কালের সর্বাপেক্ষা নিখুঁত সুগঠিত রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে আব্বাসিয়াদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সমপর্যায়ভুক্ত।

কয়েক শতাব্দীব্যাপী তাদের যে রাজত্বের স্থায়ী হয়েছিল তার শুরু থেকে তারা চেম্বর অব ফিন্যান্স এবং চ্যান্সেলরী অব স্টেট—দু'টি বিভাগ স্থাপন করেন—প্রথমটির উপর রাজ্যের কর আদায় ও ব্যয়বণ্টনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল আর দ্বিতীয়টির উপর ন্যস্ত ছিল নৃপতিদের আদেশসমূহের যথার্থতা প্রতিপন্ন করার দায়িত্ব, আরও অধিকতর কর্মবণ্টনব্যবস্থার নিরিখে রাষ্ট্রের অন্যান্য বিভাগ খোলা হয় যার মধ্যে নিম্নোক্ত বিভাগগুলি প্রধান 'দিওয়ানুল খারাজ' (রাজস্বের কেন্দ্রীয় অফিস) বা অর্থবিভাগ, 'দিওয়ানুদ্ দিয়া' (রাজকীয় সম্পত্তির অফিস), দিওয়ানুয্ যিমাম' (হিসাব-নিরীক্ষার অফিস), 'দিওয়ানুয্ যুন্দ' (সমর অফিস), 'দিওয়ানুল মাওয়ালী ওয়াল গিলমান' (মক্কেল ও দাসদের সংরক্ষণ অফিস)—এখানে খলিফার মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও দাসদের তালিকা রক্ষিত হত এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হত; 'দিওনুল বারিদ' (ডাক বিভাগ), 'দিওয়ানুয যিমাম আন্ নাফাকাত' (পরিবার সংক্রান্ত ব্যয়বরাদ্দ অফিস), 'দিওয়ানুর রাসায়েল' (পররাষ্ট্র দপ্তর), 'দিওয়ানুত্ তাওকিয়া' (আবেদন দপ্তর), 'দিওয়ানুন্ নজর ফিল মাজালিম' (অভিযোগ তদন্ত দপ্তর), 'দিওয়ানুয্ আহদাস ওয়াশ্‌শুর্তা (মিলিশিয়া ও পুলিশি দপ্তর) এবং 'দিওয়ানুল আতা' (চাঁদা দপ্তর), নিয়মিত সেনবাহিনীসহ অন্যান্য কর্মচারীর বেতনপ্রদানকারী বিভাগের সদৃশ দপ্তর। অ-মুসলিম প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের কাজ বিশেষ বিভাগের হাতে নিয়োজিত হয়েছিল—এই বিভাগের প্রধানকে বলা হত 'কাতিবুয্ যিহবাজে'।

প্রত্যেকটি সরকারী দপ্তর একজন পরিচালকের নেতৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হত যাকে 'রইস' বা 'সদর' বলা হত এবং নিয়ন্ত্রণ ও তদারক যাঁরা করতেন তাঁদের বলা হত 'মুশরিক' বা 'নাজির'।[২২]

www.amarboi.org

এই সংগঠনের সঙ্গে আব্বাসীয় খলিফাগণ 'হাযিব' উপাধিধারী একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি বিদেশের দূতদের পরিচয় করিয়ে দিতেন এবং কাজীর বিচারের বিরুদ্ধে আবেদন শুনানির জন্য আদালত গঠন করতেন। আব্বাসীয় খলিফাগণ প্রধানমন্ত্রী বা উজিরে আযমের দপ্তরও স্থাপন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর কাজ ছিল সুলতানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ তার সম্মুখে উপস্থাপিত করা। তারা প্রাদেশিক শাসনকার্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রবর্তন করতেন এবং প্রদেশের দেয় রাজস্ব নির্ধারিত করতেন। তারা বাগদাদ থেকে মক্কাপর্যন্ত পথপার্শ্বে সরাইখানা, চৌবাচ্চা ও পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করেছিলেন, বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন এবং প্রত্যেক স্থানে ভ্রমণকারী ও তীর্থযাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার তৈরি করেছিলেন। হিজাজ ও ইয়েমেনের মধ্যে যাতায়াত সুগম করার জন্য ঘোড়া ও উট বদল করার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য প্রত্যেক শহরে সংবাদবাহক নিযুক্ত করা হয়েছিল। সাম্রাজ্যের নথিপত্র দলিলদস্তাবেজ সংরক্ষণ করার জন্য তাঁরা রাজধানীতে একটি কেন্দ্রীয় অফিস স্থাপন করেছিলেন এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র দক্ষ পুলিশবাহিনী ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁরা একটি বণিকসভা বা সিন্ডিকেট অব্ মার্চেন্টস স্থাপন করেছিলেন, উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক লেনদেনের নির্দেশনা, বণিকদের মধ্যে বিবাদ নিষ্পত্তি এবং প্রতারক দমন প্রত্যেক বাণিজ্যকেন্দ্রে একটি করে বণিক করপোরেশন ছিল এবং অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ শহরের জন্য বনিক পরামর্শ সভা ছিল। তাঁরা বাজার তত্ত্বাবধায়কের অফিস—'মুহ্তেসিব' এর দপ্তর স্থাপন করেছিলেন। বণিকদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য মুহ্তেসিবরা প্রত্যেকদিন বাজার পরিদর্শন করতেন। তাঁরা স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতেন এবং মিউনিসিপ্যাল প্রতিষ্ঠানগুলির সংরক্ষণ ও উৎসাহ প্রদান করতেন। কৃষিকার্যের উন্নয়নের জন্য কৃষককুলকে অগ্রিম প্রদান করা হত এবং জনগণের সমৃদ্ধি ও দেশের অবস্থা সম্পর্কে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সাময়িক বিবরণ দেওয়ার প্রয়োজন হত। অনেক সুলতান তাদের জাকজমকের মধ্যেও গণপ্রজাতান্ত্রিক গুণের সাদৃশ্য রক্ষা করার প্রয়াস পেতেন। তাদের লিখিতগ্রন্থ, তাদের তৈরি ঝুড়ি বাজারে বিক্রি করে যে অর্থ পাওয়া যেত তা থেকে খলিফাদের ব্যক্তিগত খরচ বহন করা হত। আলীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে তাদের নিষ্ঠুর আচরণের পাশে তাদের প্রজাদের কল্যাণ সাধনের উৎসাহকে সম্ভবত মহত্ত্বের নজির হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। মামুন ও তাঁর দু'জন অব্যবহিত উত্তরাধিকারীর শাসনামলে আব্বাসীয় সাম্রাজ্য সমৃদ্ধির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল।

স্পেন ইসলামের রাজনৈতিক চরিত্র ও সমাজের সব রূপ ও অবস্থায় তার উপযোগিতা সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা অন্যতম দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে। এই ভূখণ্ড বর্বর বাহিনীর অধীনে ভয়ানকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল। এই দুর্ধর্ষ বাহিনী যখন দেশের উপর অভিযান চালিয়েছিল তখন যেখানে যে প্রতিষ্ঠান বর্তমান ছিল তা নির্মূল করে দিয়েছিল। রোমান শাসনের ধ্বংসাবশেষের উপর তারা যে রাজ্য স্থাপন করেছিল তা রাজনৈতিক বিকাশের সকল মূল নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। তাদের প্রজাবৃন্দ সামন্তশাসনের ভারে ও তার ভয়াবহ ফলশ্রুতিতে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছিল। বিরাট এলাকা জনশূন্য হয়ে পড়েছিল।

www.amarboi.org

ইসলামিক বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর সামন্ত বন্দীদশা থেকে জাতি ও দেশ মুক্তি লাভ করল। মরুভূমি ফলভারে আনত হল, সমৃদ্ধশালী নগর চারদিকে গড়ে উঠল এবং নৈরাজ্যের স্থলে আইন শৃঙ্খলা ফিরে এল। সেখানের মাটিতে পদার্পনের অব্যবহিত পরে জাতি ও ধর্ম-নির্বিশেষে অধীন প্রজাদের জন্য সর্বাধিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করে আরবগণ নির্দেশ জারি করলেন। সুভী, গথ, ভ্যাণ্ডাল, রোমান ও ইহুদী সকলেই মুসলমানদের সঙ্গে একই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল। খ্রিস্টান ও ইহুদীরা তাদের ধর্মের পরিপূর্ণ অনুশীলন এবং তাদের ভজনালয়ের স্বাধীন ব্যবহার এবং জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করল। বিশেষ সীমার মধ্যে তাদেরকে নিজেদের আইন দ্বারা শাসিত হওয়ার জন্য অনুমতি দেওয়া হল। বেসামরিক অফিসে চাকুরি গ্রহণ ও সৈন্য বিভাগে কাজ করার জন্য তারা অনুমতি পেল। তাদের নারীদেরকে বিজয়ীদের সঙ্গে আন্তর্বিবাহের জন্য আমন্ত্রণ জানান হল। স্পেনে আরবদের আচরণ কি বিজিত জাতিসমূহের প্রতি বহু ইউরোপীয় জাতির, এমন কি আধুনিক কালের ইউরোপীয় জাতিসমূহের সঙ্গে বিস্ময়কর বৈসাদৃশ্যে দণ্ডায়মান নয়? আরবদের শাসনকে ইংল্যান্ডের নরম্যানদের শাসনের সঙ্গে কিংবা ধর্মযুদ্ধকালে সিরিয়ায় খ্রিস্টানদের শাসনের সঙ্গে তুলনা করলে সাধারণ বুদ্ধি ও মানবতার প্রতি অবমাননা করা হয়। কোন পার্থক্য ব্যতিরেকে সকল শ্রেণীর প্রতি সমান বিচারে অঙ্গীকার সংরক্ষণে আরবদের বিশ্বস্ততা তাদের জন্য জনগণের বিশ্বাস নিশ্চিত করেছিল। শুধু এসব বিশেষ ক্ষেত্রে নয় বরং মানসিক উদারতা ও আচরণের মনোজ্ঞতা এবং আতিথেয়তার সামাজিক অনুশীলনে সেকালের অন্যান্য জাতি থেকে তারা বিশিষ্টতা লাভ করেছিল।[২৩] ইহুদীরা খ্রিস্টান পুরোহিতদের প্রভাবে বর্বরদের অধীনে চরম দুর্দশা ভোগ করেছিল এবং সরকার পরিবর্তনের ফলে তারা সর্বাধিক লাভবান হয়েছিল। উচ্চতম শ্রেণীর স্পেনিশ মহিলাগণ, তাদের মধ্যে ছিলেন পেলাগিয়াসের ভগিনী ও রজবিকের কন্যা মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, যে মুসলমানদেরকে গোড়া জীন ম্যারিয়ানাগণ "ধর্মদ্রোহী" বলেছেন। বিচার-বিবেচনার স্বাধীনতাসহ পদমর্যাদানুযায়ী তারা যাবতীয় অধিকার ও সুবিধা ভোগ করত। যেসব জমির মালিককে রজবিকের নির্যাতন পর্বতে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল মুসলমানেরা তাদেরকে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। দুঃখের বিষয় জনশূন্যতা এতই অধিক হয়েছিল যে এই পদক্ষেপ দেশে বাসিন্দা সরবরাহে কোন কাজে আসেনি। তদনুযায়ী তাঁরা উপদ্বীপটিতে বসবাস ইচ্ছুক বিদেশী কৃষকদেরকে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এই প্রস্তাবে আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশ থেকে বহু পরিশ্রমী বসবাসকারী সমবেত হল। একসঙ্গে স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ পঞ্চাশ হাজার ইহুদী আন্দালুসিয়ায় বসতি স্থাপন করল।

সাত শ' বছর ধরে মুসলমানেরা স্পেন শাসন করেছিলেন এবং আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও বংশগত বিবাদ-বিসম্বাদ সত্ত্বেও তাদের শাসনের হিতকারিতা সম্পর্কে তাদের শত্রুরা পর্যন্ত সাক্ষ্য দেন ও স্বীকার করেন। স্পেনে আরবদের অদিগত উচ্চসংস্কৃতির কারণ হিসেবে কোন কোন সময়ে প্রধানত মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রায়শ অনুষ্ঠিত

www.amarboi.org

বৈবাহিক সম্পর্ককে বিবেচনা করা হয়। এই পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে স্পেনিশ মুসলমানদের বিকাশে ও যে বিস্ময়কর সভ্যতার তাঁরা জন্ম দিয়েছিলেন তার উদ্ভবে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল, যে সভ্যতার কাছে আধুনিক ইউরোপ শান্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে সর্বাধিক ঋণী।[২৪] যা স্পেনে ঘটেছিল তা অন্যত্রও ঘটেছিল। যেসব দেশে মুসলমানেরা গিয়েছেন সেখানেই পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে; স্বেচ্ছাচারিতার স্থলে আইনশৃঙ্খলা প্রত্যাবর্তন করেছে। আর শান্তি ও প্রাচুর্যে দেশ ভরে গেছে। যুদ্ধ যেমন কোন শ্রেণীর লোকদের বিশেষ অধিকার নয় মেহনতও তেমনি কোন শ্রেণীর লোকদের নিম্ন মর্যাদার লক্ষণ নয়। কৃষিকার্যের অনুশীলন অস্ত্রের অনুশীলনের মতোই সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে জনপ্রিয় ছিল।[২৫]

ইসলাম প্রজাদের প্রতি সুলতানের দায়িত্বের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করে আর যেভাবে এ মানুষের স্বাধীনতা ও সাম্যে উন্নীত সাধন করে, যেভাবে শাসকের জুলুম থেকে তাদেরকে রক্ষা করে তা সুলতান ও প্রজাদের পারস্পরিক অধিকারের উপর 'সাফীউদ্দীন' মুহম্মদ বিন আলী বিন তাবা তাবা যিনি সাধারণত ইবনুত্ তিকতাকা নামে পরিচিত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে[২৬] দেখানো হয়েছে। এই গ্রন্থখানি ৭০১ হিজরীতে (১৩০১-২ খ্রি.) রচিত এবং মসুলের আমির 'ফখ্‌র উদ্‌দীন' ইসা বিন ইবরাহিমের নামে উৎসর্গীত।

এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রজাদের প্রতি নৃপতির কর্তব্যসমূহ, সরকারি কার্যাবলী ও অর্থশাস্ত্রের পরিচালনা বিধি সম্পর্কে আলোচনা করে। একজন নৃপতির যে যে গুণ থাকা দরকার সে বিষয়ে লেখক বর্ণনা করেছেন—জ্ঞানবত্তা, ন্যায়বিচার, জনগণের অভাব ও কামনাবাসনার জ্ঞান এবং আল্লাহ ভীতি; এবং তিনি জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে, এই শেষোক্ত গুণটি যাবতীয় কল্যাণের উৎস এবং সকল করুণার কুঞ্জী; "কেননা যখন নৃপতি আল্লাহর উপস্থিতির বিষয়ে সচেতন হন, তখন আল্লাহর বান্দারা শান্তি ও নিরাপত্তার সুখ উপভোগ করে"। নৃপতির অবশ্যই করুণা গুণটি থাকা চাই এবং "এটি সব উত্তম গুণাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ"। তাকে অবশ্যই তার প্রজাদের কল্যাণ সাধন করার চিরজাগ্রত বাসনা থাকতে হবে এবং প্রজাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অবশ্যই তাকে আলোচনা করতে হবে; কারণ হযরত তাঁর সাহাবাদের সঙ্গে প্রায়ই আলোচনা করতেন। আল্লাহ বলেছেন "প্রত্যেক বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করুন"[২৭] জনসাধারণের কার্যাবলী পরিচালনায় নৃপতির দায়িত্ব জনগণের আয়-তত্ত্বাবধান, প্রজাদের জীবন ও সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, শান্তিশৃঙ্খলা সংরক্ষণ, দুষ্টের দমন, ক্ষয়ক্ষতি নিবারণ; আর তিনি সর্বদা কথা রক্ষা করবেন। তারপর লেখক তাৎপর্যসহকারে বলেছেন, "প্রজাদের কর্তব্য আনুগত্য, কিন্তু কোন প্রজাই একজন অত্যাচারীর প্রতি আনুগত্য দেখাতে বাধ্য নয়"। ইবনে রুশদ (মহান অ্যাভেরোজ) বলেছেন, "সেই হল অত্যাচারী যে নিজের জন্য শাসন করে। তার জনগণের জন্য নয়।"

মুসলিম আইন ন্যায়বিচারের মৌল-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সরলতা ও যাথার্থ্যের জন্য বিশিষ্ট। কাজেই এই আইন যে আনুগত্যের দাবী করে তা কার্যকরী করা

www.amarboi.org

যেমন কঠিন নয় তেমনি তা মানবজাতির বুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন নয়। যেসব দেশে মুসলমানেরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেসব দেশ সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা এবং সামন্তবাদী বিধির মারাত্মক কুফল থেকে মুক্ত।"[২৮] কোন বিশেষ সুবিধা, কোন শ্রেণীকে স্বীকার না করে তাদের আইনসমূহ দু'টি মহৎ ফল উৎপাদন করেছিল—বর্বরদের আইনসমূহের কৃত্রিম ভার থেকে দেশটিকে মুক্ত করেছিল এবং নাগরিকদের প্রতি অধিকারের পরিপূর্ণ সমতা নিশ্চিত করেছিল।"[২৯]

পাদটীকা

১. গির্জা তার দাসদেরকে দীর্ঘকাল রাখত। স্যার টমাস স্মিথ তাঁর. 'কমনওয়েলথ' গ্রন্থে যাজক সম্প্রদায়ের কপটতার কথা বলছেন।
২. সংসদীয় যুদ্ধে উভয় পক্ষ ঔপনিবেশিকদের নিকট তাদের প্রতিপক্ষের লোকজনদেরকে বিক্রি করেছিল। ডিউক অব মনমাউথের বিদ্রোহ দমনের পর তাঁর শিষ্যদেরকে দাস হিসেবে বিক্রি করা হয়েছিল। উপনিবেশসমূহের "যাত্রী ফাদারদের" হাতে দাসদের এবং তাদের বংশধরদের প্রতি আচরণ অবর্ণনীয়।
৩. এটা লেখা হয়েছিল রোলানফসের পতনের পূর্বে।
৪. তুলনীয় গোবিনিউ, "ল্যজ রেলিজিয়নস এত লাজ ফিলোসফিজ দ্যনস ল' এসিয়া সেন্ট্রালিস"।
৫. ইসলামী জীবনব্যবস্থায় মুসলিম রাষ্ট্রে অ-মুসলিম প্রজাদেরকে আহলুজ্ জিম্মা' কিংবা 'জিম্মী' বলা হয়। জিম্মী অর্থাৎ নিরাপত্তার শর্তের অধীনে বসবাসকারী।
৬. সেলের 'এসেজ অন ইসলাম' দেখুন।
৭. কিংবা সেনাছাউনির কোন দায়িত্বও তাদের উপর বর্তাবে না; 'ফতুহুল বুলদান' (বালাজুরী) পৃ. ৬৩; ইমাম আবু ইউসুফ কর্তৃক 'কিতাবুল খারাজ'। মুয়ির হযরতের এই নিরাপত্তার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন।—২য় খণ্ড, পৃ. ২৯৯; পরিশিষ্ট দেখুন।
৮. প্রাচ্য খ্রিস্টান গির্জাসমূহে ঘণ্টার পরিবর্তে এক খণ্ড কাঠ ব্যবহৃত হয়।
৯. খলিফা হারুন অর রশীদের প্রধান কাজী বা বিচারক।
১০. আবু বকর।
১. ওমর, ওসমান, আলী ও হযরতের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সাহাবাগণ কর্তৃক গঠিত। 'কিতাবুল খারাজ' দেখুন, পৃ. ৮৪।
১২. হযরতের চাচাত ভাই এবং একজন স্বীকৃত আইনজ্ঞ।
১৩. 'কিতাবুল খারাজ' পৃ. ৮৮।
১৪. 'মাকরিজী', পৃ. ৪৯২, ৪৯৯।
১৫. যৈলী তাঁর 'তাখ্‌রিখুল হেদায়া'তে দ্বিতীয় খলিফা ওমরের শাসনামলের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। বকর বিন ওয়ালী নামক একজন মুসলমান হেরুত নামীয় একজন খ্রিস্টানকে হত্যা করেছিল। খলিফা আদেশ করলেন "হত্যাকারীকে নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের নিকট সোপর্দ কর"। হেরুতের উত্তরাধিকারী হুনাইনের নিকট অপরাধীকে সোপর্দ করা হল। হুনাইন তাকে হত্যা করল। তাখ্‌রিকুল হেদায়া, দিল্লী সংস্করণ, পৃ. ৩৩৮। অনুরূপ অপর একটি ঘটনা ওমর বিন আব্দুল আজিজের খেলাফত কালে বিবৃত হয়েছে।

www.amarboi.org

১৬. জাল (j) সহযোগে 'দি শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসিন', পৃ. ৫৭৩।

১৭. উর্কুহার্ট, 'স্পিরিট অব দি ইস্ট' ১ম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ২৮।

১৮. প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানেরা বাইজান্টাইন সম্রাটদেরকে সাধারণতঃ এই উপাধিতে অভিহিত করত।

১৯. আদালতের প্রথম রায় বা কার্যকর করা হয়নি তা হল মুয়াবিয়ার শাসন আমলে। তিনি সিংহাসন দখলকারী উমাইয়াদের প্রশংসায় কবিতা পাঠের জন্য যাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল তাকে ক্ষমা করেছিলেন।

২০. সুতরাং তারা 'মুয়াল্লাফাতুল কুলব' নামে অভিহিত হত।

২১. ওল্‌সনার, 'দ্যাজ এফেক্টস দ্য লা রিলিজিয়ান দ্য মুহম্মদ'।

২২. আব্বাসীয়া বংশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণের জন্য 'দি শর্ট হিস্ট্রী অব দি' স্যারাসিন' পৃ. ৪০২-৪৪৩ দেখুন।

২৩. কণ্ডি, 'হিস্ট্রী অব দি স্পেনিশ মুর্‌স'।

২৪. রেনান, 'অ্যাভেররোজ এণ্ড্ অ্যাভেররোইজম।

২৫. ওল্‌সনার।

২৬. এই গ্রন্থখানি সাধারণত 'কিতাবই তারিখ উদ্ দুওয়াল'—বংশসমূহের ইতিহাস নামে পরিচিত কিন্তু এর পুরা নাম 'কিতাবুল ফখ্‌রি ফিল আদাব উল সুলতানিয়াত্ ওয়াদ্ দুওয়াল উল্ ইসলামিয়া'—"সুলতান ও ইসলামী রাজবংশসমূহের সম্পর্কীয় ফখ্‌রির গ্রন্থ" ডিরেনবুর্গ সং।

২৭. আল্ কোরআন।

২৮. কর্সিকা, সার্ডেনিয়া, সিসিলি ও নিম্ন ইতালীতে আরবদের বিতাড়নের পর সামন্তবাদী ব্যবস্থা চালু করা হয়।

২৯. ওলসনার।

www.amarboi.org

অষ্টম অধ্যায়
ইসলামে রাজনৈতিক দল ও উপদলসমূহ

বাহাত্তর দলে ভাগ হয়ে সব
ছড়িয়ে পড়ল দশ দিশে
সত্য তারা দেখল না যে—
কল্পনায় সব রইল মিশে।
—হাফিজ।

ধর্মের ইতিহাসের প্রত্যেক দর্শন-মনা ছাত্রদের কাছে এই অধ্যায়ের শিরোনাম দুঃখ না দিলেও বিস্মিত করবে; আর ধর্মের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি নিবেদিত চিত্ত প্রত্যেক ইসলামপন্থীর কাছে তা দুঃখ লজ্জা উৎপন্ন করবে, আফসোস। মানবতা ও বিশ্বভাতৃত্বের ধর্ম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও বিসম্বাদের অভিশাপ এড়াতে পারেনি, যে ধর্ম বিচ্ছিন্নতাবাদী দুনিয়ায় শান্তি ও স্থৈর্য আনার জন্য এসেছিল তা ক্রুদ্ধ উম্মাদনা ও শক্তির লালসার আবর্তে পড়ে নিজেই টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে পড়েছে। খ্রীষ্টধর্মে যে অমঙ্গলের জন্যে আমরা বিলাপ করি তা এসেছিল জীবনব্যবস্থার অপূর্ণতা, মানুষের প্রয়োজনের সঙ্গে অসামঞ্জস্যতা থেকে; আর ইসলামে যে অমঙ্গলের বর্ণনা আমরা করব তা এসেছে পার্থিব অগ্রগতির লোভ, নৈতিক নিয়ম ও শৃঙ্খলার প্রতি অসহিষ্ণু ব্যক্তি ও শ্রেণীর বৈপ্লবাত্মক প্রবৃত্তি থেকে।

যে পার্থিব আন্দোলনের তিনি কারণ এবং যা আভ্যন্তরীণ বংশগত যুদ্ধ সত্ত্বেও তাঁর লোকদেরকে অভিযানের জোয়ারে জগতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল তার চেয়ে কোন কিছুই আরবের নবীর অসাধারণ প্রতিভা, বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মীয় ঐক্য ও বিশ্বনাগরিকতার প্রতি তাঁর আহ্বানের হৃদয়গ্রাহিতাকে অধিকতর বিশদভাবে প্রদর্শন করতে পারে না। যে আরব অদ্যাবধি যুযুধান গোত্র ও বংশসমূহের আবাসস্থল, যেখানে প্রত্যেক গোত্র শত বছর ধরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত, সেই দেশ সহসা একটা সাধারণ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। এ পর্যন্ত আরবদের যুদ্ধবিগ্রহ ও

www.amarboi.org

মৈত্রীবন্ধন, তাদের দোষগুণ, তাদের স্বাধীনতা-প্রীতি ও গোত্রীয় অনুভূতি যৌথ ক্রিয়ার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ মেষপালক জাতি বাদশাহর জাতিতে পরিণত হল, অর্ধ-যাযাবর জাতি "বিশ্বজনীন ধর্ম ও আইনের"র প্রভুতে রূপান্তরিত হল। অভূতপূর্ব শক্তি ও স্বনিয়ন্ত্রিত নিষ্ঠা সহকারে তিনটি মহাদেশে স্থাপিত যাযাবর গোত্রসমূহের সমাবেশ ধর্মের পতাকা ধারণ করে তাকে প্রত্যেক জায়গায় সমুন্নত করেছে। "তোমাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে মানব-জাতির কাছে করুণার বাণী পৌছে দেওয়ার জন্য, ঐশী একত্ব ঘোষণা করার জন্য"—এই আহ্বান তাদের কাছে এসেছিল এবং তারা সব বাধা উপেক্ষা করে করে এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। বিশ্বাসের তীব্রতা, যা বিরোধী ধর্মমত ও বিরোধী গোষ্ঠীসমূহের প্রতিবন্ধকতার ভেতর দিয়েও তাদের সফল করেছিল, এই বিপ্লবের রহস্যকে ব্যাখ্যা করে।

সত্য চিরন্তন; মুহম্মদের পয়গাম নতুন ছিল না। এই পয়গাম আগেও এসেছিল, কিন্তু তা মানুষের হৃদয়ে পৌছেনি। তাঁর কণ্ঠস্বর মৃতকে জীবত করে তুলেছিল, মুমূর্ষুকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল এবং মানবজাতির প্রাণস্পন্দনকে যুগ যুগ সঞ্চিত শক্তির সঙ্গে স্পন্দমান করে তুলেছিল। এই শক্তিশালী আবেগের তাড়নায় আরবদের নিষ্ক্রমণ, এর বিশালতা ও সুদূরপ্রসারী ফল আধুনিক কালের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ঘটনায় রূপ লাভ করেছে। তাঁরা মানবজাতির শিক্ষাগুরু হিসেবে তাদের মরু-দুর্গ থেকে বের হয়েছিলেন। ত্রিশ বছরের মধ্যে—খোলাফায়ে রাশেদীনের জন্য সময়কালটির ভবিষ্যদ্বাণী হয়েছিল—তাঁরা হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে আটলান্টিকের তীরভূমি পর্যন্ত তাদের পয়গাম পৌছে দেওয়ার জন্য প্রত্যেক জাতির দ্বারপ্রান্তে হাজির হয়েছেন। হযরতের মৃত্যু থেকে প্রজাতন্ত্রের ভরাডুবি পর্যন্ত, এই স্বল্পকালের মধ্যে তাঁরা এমন একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন যা তের শত বছরের বিস্তার লাভের পরে রোমান সাম্রাজ্য যত বড় হয়েছিল তাকেও হার মানিয়েছিল। ইবনুল আছির, তাবারী কিংবা আবুল ফেদার ইতিহাসের পাতা উল্টালে আপনারা এই প্রবাহের অগ্রগমনের ধারাবাহিক বিবরণ দেখতে পাবেন, দেখতে পাবেন যে, যে-দেশে তাঁরা গিয়েছেন সেই দেশকে তাঁরা সমৃদ্ধিশালী করেছেন এবং সেখানে যা কিছু কল্যাণকর পেয়েছেন তা সমন্বিত করেছেন।

যে কারণসমূহ হযরতের আগমণের পূর্ব পর্যন্ত আরবদের একটি জাতিতে পরিণত হতে দেয়নি—সেই গোত্রীয় বিদ্বেষ, গোত্রে-গোত্রে বিভেদ—যার লক্ষণসমূহ এখনও মুসলিম-জাহানে দৃশ্যমান—শেষ পর্যন্ত শুধু প্রজাতন্ত্রেরই ধ্বংস সাধন করেনি, আরব সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটিয়েছে। দ্য ওহ্সন বলেছেন, "মুহম্মদের অনুসারীবৃন্দ যদি গুরুর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হতেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অবলম্বন করতেন তবে তাদের সাম্রাজ্য রোমানদের সাম্রাজ্যের চেয়ে বিশালতর ও অধিকতর স্থায়ী হত।" কিন্তু উমাইয়াদের লোভ, আরবদের অবাধ্যতা ও ব্যক্তি স্বতন্ত্রের মনোভাব, যা একটা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে নিয়োজিত হলে প্রকাশ পায়, প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমানেরা তাদের শৌর্যবীর্য ও নিষ্ঠা সহকারে যে বিশাল সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ গড়ে তুলেছিলেন তার ধ্বংস

—২১

www.amarboi.org

ডেকে এনেছিল। এ কারণে বিজয় নাগালের ভেতর এলেও তারা অভিযানে ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে; তারা স্পেন থেকে বিতাড়িত হয়েছিল কেননা তারা মরুভূমির পুরাতন বিদ্বেষ ভুলতে পারেনি এবং শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি।

যদিও প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটেছিল, রাজমুকুট আরবদের থেকে হস্তান্তরিত হয়েছিল, তবুও ধর্ম মরেনি। এ ছিল যুগ যুগ সিঞ্চিত বিবর্তনের পরিণতি। এ মানুষের ধর্মীয় বিবর্তনের চূড়ান্ত পর্যায়ের নির্দেশক; সাম্রাজ্য কিংবা মানুষের জীবনের উপর এর অস্তিত্ব বা বিকাশ নির্ভরশীল নয়। ধর্মের বিস্তার লাভ ও ফলবান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্ম প্রয়োজন ও বুদ্ধিবৃত্তিক বোধশক্তি অনুসারে প্রত্যেক গোষ্ঠী ও প্রত্যেক যুগ তার শিক্ষা থেকে লাভবান হয়ে থাকে।

যীশুখ্রিস্টের ধর্মানুসারীদের মতো মুহম্মদের অনুসারীরাও আভ্যন্তরীণ বিভেদ ও সংঘর্ষের ফলে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। নৈর্ব্যক্তিক বিষয়সমূহের উপর মতানৈক্য সসীম অস্তিত্বে যার কোন নিশ্চয়তা মিলতে পারে না এমন বিষয়ই সর্বদা মানুষের জ্ঞান-সীমার অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলীর সাধারণ বিভেদ অপেক্ষা তীব্রতর তিক্ততা ও প্রচণ্ডতর শত্রুতার জন্ম দিয়েছে। যীশুখ্রিস্টের প্রকৃতি সম্পর্কীয় বিবাদ লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে প্লাবিত করেছে; তেমনি ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কীয় প্রশ্নটিও সমপরিমাণ রক্তে প্লাবিত করেছে; তেমনি ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কীয় প্রশ্নটিও সমপরিমাণ রক্তক্ষরণ না করলেও ইসলাম-জগতে একই পরিমাণ গোলযোগ সৃষ্টি করেছে। রোমের ধর্মীয় নেতাদের অভ্রান্ততা যেমন খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি নাড়া দিয়েছিল, ইসলামে জাতি ও ধর্মনেতাদের ভ্রান্ততা তেমনি বহু মূল্যবান প্রাণের ধ্বংসের কারণ হয়েছিল।

মুহম্মদের উম্মতদের মধ্যে অধিকাংশ বিভেদ ঘটেছে প্রধানতঃ রাজনৈতিক ও বংশগত কারণে—পুরাতন গোত্রগত কলহ এবং প্রবল হিংসা-বিদ্বেষ যা হাশেমের বংশধরদের বিরুদ্ধে অন্যান্য কোরাইশদেরকে উদ্দীপিত করেছিল। সাধারণতঃ অনুমান করা হয়ে থাকে যে ইসলামের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ব্যবস্থাপনায় হযরত কাউকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে যাননি; কিন্তু এ ঘটনার ভ্রমাত্মক উপলব্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত, কেননা পর্যাপ্ত সাক্ষ্য রয়েছে যে হযরত বহুবার তাঁর প্রতিনিধিত্বের জন্য আলীর প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য হল "বিদায় হজ্ব" সমাপ্তির পর মদিনায় প্রত্যাবর্তনকালে খুম নামক স্থানে বিশ্রাম করার সময় সমবেত সঙ্গীসাথীদের উদ্দেশে যে কথা বলেছিলেন তাতে তাঁর উত্তরাধিকারী সম্পর্কিত অভিপ্রায় সম্বন্ধে কোন সন্দেহই ছিল না। তিনি বলেছিলেন, "মুসার নিকট হারুন যেমন আমার নিকট আলীও তেমন। হে সর্বশক্তিমান আল্লাহ, তুমি তার বন্ধুদের বন্ধু হও ও শত্রুদের শত্রু হও; যারা তার সাহায্যকারী হয় তুমি তাকে সাহায্য কর এবং যারা তার সঙ্গে প্রতারণা করে তাদেরকে তুমি নিরাশ কর।'[১] অপরপক্ষে হযরতের অসুস্থতাকালে নামাজে ইমামতি করার জন্য মনোনয়ন ভিন্ন নির্বাচনের ইঙ্গিতে করতে পারে। তাঁর মৃত্যুর পরই নির্বাচনের প্রশ্নটি আলোচনা ও মীমাংসার জন্য উঠল, যখন ইসলামে নেতা নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে

www.amarboi.org

পড়েছিল। হাশেমীয়রা দাবী করেছিল যে আলীর ওপরই খেলাফতের দায়িত্ব নিয়োগ উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তায়। অন্যান্য কোরাইশরা নির্বাচনের মাধ্যমে মীমাংসার জন্য জিদ ধরল। যখন মুহম্মদের আত্মীয়-স্বজনরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নিয়োজিত ছিলেন তখন কোরাইশ ও কিছু সংখ্যক আনসারদের ভোটে আবু বকর খলিফা নির্বাচিত হন। অবিলম্বে রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা এই দ্রুত পদক্ষেপের ব্যাখ্যা করতে পারে। স্বাভাবিকভাবে উদার এবং ধর্মানুরাগী, ধর্মগুরুর শিষ্যদের মধ্যে সামান্যতম বিবাদ এড়ানোর ব্যাপারে বিবেকবান ও উৎকণ্ঠিত আলী তৎক্ষণাৎ আবু বকরের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করলেন। তিন-তিন বার তিনি প্রত্যাখ্যাত হলেন, কিন্তু প্রত্যেক বারই তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে নির্বাচকমণ্ডলীর রায় গ্রহণ করলেন। তিনি নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের জন্য কখনও দাঁড়াননি, আর তাঁর সমর্থকদের অনুভূতি যাই হোক না কেন, তিনি প্রথম দুই খলিফাকে প্রজাতন্ত্রের শাসন ব্যাপারে তাঁর সাহায্য ও পরামর্শ প্রভাব থেকে কখনও বিরত থাকেননি এবং তাঁরাও তাঁদের দিক থেকে ধর্মগুরু শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ ও ব্যাখ্যাকে সম্মান দিয়েছেন। আমরা পূর্বেই খেলাফত পদে ওসমানের উন্নীত হওয়ার সঙ্গে জড়িত অবস্থার উল্লেখ করেছি। এখানে আমরা ধর্মানুসারীদের মধ্যে শোচনীয় বিভেদ—যা এতদিন পর্যন্ত মুসলিম জাহানকে দুই সম্প্রদায়ের বিভক্তি করে রেখেছে তার ইতিহাস ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁর খেলাফতে সমাসীন হওয়ার পর যেসব ঘটনা ঘটেছিল তার সন্ধান করব। আবু বকরের বুদ্ধিমত্তা কিংবা ওমরের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণশক্তি বা নৈতিক যোগসূত্রিতা কোনটাই ওসমানের ছিল না। অমায়িকতা ও সহজ-ভালমানুষী স্বভাব তাঁকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের হাতের খেলার সামগ্রীতে পরিণত করেছিল। সম্মানিত খলিফা তাঁর লোভাতুর আত্মীয়-স্বজনের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন, প্রদেশসমূহ অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আর্তনাদ করত, মুসলিম জনসাধারণ বিষণ্নভাবে রাষ্ট্র প্রধানের সিদ্ধান্তের জন্য প্রতীক্ষরত ছিল—এইসব ছিল সে সময়ের শিক্ষাপ্রদ অথচ করুণ চিত্র। ভোজী প্রতারিত রাষ্ট্রপ্রধানের চরিত্র সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। "ওসমানের চরিত্র খলিফা-পদে তাঁর নির্বাচনকে সমর্থন করে না। এটা সত্য যে তিনি সম্পদশালী ও দানশীল ছিলেন, আর্থিক সাহায্যের দ্বারা তিনি মুহম্মদ ও ইসলাম ধর্মকে সাহায্য করেছিলেন, তিনি উপাসনা করতেন আর প্রায়ই রোজা রাখতেন এবং তিনি একজন সদাশয় ও কোমল স্বভাবের লোক ছিলেন। যা'হোক তিনি প্রাণবন্ত লোক ছিলেন না, এবং বার্ধক্য দ্বারা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি এতই ভীরু ছিলেন যে মিম্বরে উঠলে ভাষণ কোথেকে আরম্ভ করতে হবে তা বুঝতে পারতেন না। বৃদ্ধ লোকটির পক্ষে এটা দুঃখের কারণ ছিল যে তাঁর মধ্যে স্বজন-প্রীতি ছিল প্রবল; যে স্বজনেরা মক্কার অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বিশ বছর ধরে মুহম্মদের প্রতি অপমান ও নির্যাতন চালিয়েছিল এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। তাঁর চাচা হিশাম, বিশেষ করে হিশামের পুত্র মারওয়ান, ওসমানকে নামমাত্র খলিফা স্বীকার করে এবং সর্বাপেক্ষা আপোষমূলক যাবতীয় পদক্ষেপের দায়িত্ব তাঁর সম্বন্ধে চাপিয়ে যে বিষয়ে তিনি প্রায়ই অনবহিত

www.amarboi.org

থাকতেন না, বস্তুত দেশশাসন করত। এই দুটি লোকের ধর্মনিষ্ঠা, বিশেষ করে পিতা হিশামের ধর্মনিষ্ঠা সম্পর্কে প্রবল সন্দেহ ছিল। যখন মক্কা বিজিত হয়েছিল তখনি হিশাম ইসলাম গ্রহণ করেছিল। রাষ্ট্রের গোপন তথ্য ফাঁস করার জন্য তাকে হীন-পদস্থ করা হয়েছিল ও নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। আবু বকর ও ওমর (হযরত কর্তৃক) জারিকৃত আদেশ অটুট রেখেছিলেন। পক্ষান্তরে, ওসমান তাকে শুধু নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনেননি বরং তার উপস্থিতির পর তাকে বায়তুল মাল থেকে একশত হাজার রৌপ্যমুদ্রা এবং একখণ্ড খাস জমি প্রদান করেছিলেন। তিনি মারওয়ানকে তাঁর সচিব ও উজির বানিয়েছিলেন, আর তার সঙ্গে নিজের একটি কন্যাকে বিবাহ দিয়ে এবং আফ্রিকার বিজয়লব্ধ সম্পদ দিয়ে তাকে সম্পদশালী করেছিলেন।"... যে আবু সুফিয়ান ও হিন্দা ওহোদের যুদ্ধে দুর্ধর্ষতার[২] সঙ্গে মুহম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তাদের পুত্র মোয়াবিয়াকে সিরিয়ার শাসনকর্তা পদে পাকাপোক্তভাবে নিয়োজিত করেছিলেন; তাঁর দুধ-ভাই আব্দুল্লাহ ইবনে সাদ বিন সুররাহকে মিশরের শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়েছিল। এক সময় এই আব্দুল্লাহ হযরতের সচিব ছিলেন। যখন হযরত প্রত্যাদেশ লিপিবদ্ধ করার জন্য বলতেন তখন তিনি শব্দ পরিবর্তন করে তার অর্থ অস্বাভাবিক করে তুলতেন। যখন তাঁর জালিয়াতি ধরা পড়ল তখন তিনি পলায়ন করলেন এবং পুনঃপৌত্তলিকতায় প্রত্যাবর্তন করলেন। বৃদ্ধ খলিফার সহোদর ভাই অলিদকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করা হল। তার পিতা প্রায়ই হযরতের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত এবং এক সময় গলা ফাঁস দিয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। এক সমাজভ্রষ্ট পাপিষ্ঠ, এক পাঁড় মদ্যপ তার জীবন ছিল মুসলমানদের কাছে গ্লানির বিষয়। সে ফজরের নামাজের সময় মদ্যপান জনিত উন্মত্ততা নিয়ে অসহায় অবস্থায় মসজিদে উপস্থিত হত, নামাজের ইমামতি করার সময় মাটিতে পড়ে যেত; পাশের লোকেরা তাকে দাঁড় করিয়ে দিলে সে মদ্যপের অসংলগ্ন ও তোতলা কণ্ঠে আরও মদ চেয়ে সবাইকে মর্মাহত করত। এসব লোকই খলিফার অনুগ্রহভাজন হয়েছিল। বুভুক্ষু জোঁকের মতো তারা প্রদেশের উপর চেপে বসেছিল এবং নির্দয় জুলুমের মাধ্যমে অর্থসম্পদ স্তূপীকৃত করত। সাম্রাজ্যের সকল স্থান থেকে মদিনায় অভিযোগ রাশিকৃত হতে লাগল। অভিযোগসমূহ নিন্দা ও কঠোর হুঁশিয়ারীর মাধ্যমে নাকচ করা হত।[৩] খলিফা আবু বকরের পুত্র মুহম্মদের নেতৃত্বে বার হাজার লোকের একটি প্রতিনিধিদল ওসমানের কাছে জনগণের অভিযোগ পেশ করে তার প্রতিকার কামনায় মদিনায় প্রবেশ করল। ন্যায় বিচারের জন্য জোর দাবীর মুখে খলিফা হযরতের দৌহিত্রের মধ্যস্থতার আশ্রয় নিলেন, যাঁর পরামর্শ তিনি এ পর্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে আসছিলেন। তাদের অভিযোগ প্রতিকৃত হবে এই অঙ্গীকার প্রদান করে আলী প্রতিনিধিদলকে তাদের গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে রাজি করলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে এবং মদিনার থেকে একদিনের কাছাকাছি পথে ওসমানের সচিবের লেখা একটা চিঠি তাদের হস্তগত হল, যে চিঠিতে খলিফার নিজের মোহরসহ বিবেকহীন মো'য়াবিয়ার প্রতি এই নির্দেশ ছিল যে প্রতিনিধিদলকে যেন সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। এই বিশ্বাসঘাতকতায়

www.amarboi.org

ক্রুদ্ধ হয়ে তারা মদিনায় ফিরে এল, বৃদ্ধ খলিফার গৃহে প্রবেশ করল ও তাঁকে হত্যা করল। উমাইয়াগণ দীর্ঘদিন ধরে যার প্রত্যাশা করছিল, ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার একটা সুযোগ—এর গণতন্ত্র, সমান অধিকার এবং এর নৈতিকতার কঠোর নিয়মসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সুযোগ, তাঁর মৃত্যু সেই সুযোগ করে দিল। যে মদনী প্রভুত্বকে তারা তীব্রভাবে ঘৃণা করত তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ওজর এই ঘটনা মক্কাবাসী ও তাদের মিত্রদের দিল। প্রথমে বিবেকবর্জিত স্বজনদের হাতের ক্রীড়নক না হওয়ার জন্য জ্ঞানগর্ভ পরামর্শ দিয়ে এবং চূড়ান্ত সংকটের সময়ে নিজেকে ক্রোধান্বিত যোদ্ধাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করে, সম্মানিত অথচ বিভ্রান্ত খলিফার জন্য বিবেচনার আবেদন জানিয়ে তিনি ওসমানকে রক্ষা করার প্রভূত প্রয়াস চালিয়েছিলেন। ওসমানকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি তাঁর দুটি পুত্রকে প্রায় উৎসর্গ করতে বসেছিলেন। ওসমানের মৃত্যর পর জনগণের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। হযরতের ওফাতের পর থেকে যদিও তিনি রাষ্ট্রীয় পরামর্শ সভায় যোগদান করতে ব্যর্থ হননি, তথাপি তিনি সবসময়ে শ্রদ্ধান্বিত, গাম্ভীর্য ও মহৎ স্বাধীন মনোভাব বজায় রেখেছিলেন। তাঁর অবসর সময়ে তিনি অধ্যয়ন ও পারিবারিক জীবনের শান্তিপূর্ণ কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। খলিফার পদে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি অনাড়ম্বরভাবে শপথ গ্রহণ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, তাঁর চেয়ে উত্তম যে কোন ব্যক্তির অনুকূলে তিনি রাষ্ট্র প্রধানের পদে ইস্তফা দিতে প্রস্তুত আছেন।

সেডিলট বলেছেন, "যদি প্রথম থেকেই (আলীর অনকূলে) বংশগত উত্তরাধিকারের নীতি স্বীকৃত হত তবে যে মারাত্মক বিপর্যয় মুসলমানের রক্তে ইসলামকে আচ্ছন্ন করেছিল তা হয়ত প্রতিরোধ করা সম্ভব হত।... ফাতিমার স্বামী হযরতের আইনানুগ উত্তরাধিকারী হিসেবে এবং নির্বাচনের মাধ্যমেও, উত্তরাধিকারত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন। এটা ভাবা যেতে পারে যে, তাঁর নির্ভেজাল ও মহত্ত্বব্যঞ্জক গৌরবের সামনে সবাই অবনমিত হত। কিন্তু তা হওয়ার ছিল না। জুবায়ের ও তালহা আশা করেছিলেন যে জনগণ তাদের মধ্যে একজনকে খলিফার পদে নির্বাচিত করবে, কিন্তু তাদের উচ্চাশার ক্ষেত্রে নিরাশ হল, এবং নতুন খলিফার অধীনে বসরা ও কুফার গভর্ণর পদে অধিষ্ঠিত হওয়া থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তারাই প্রথমে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। আবু বকরের কন্যা আয়েশা প্রথম নির্বাচনগুলিকে চূড়ান্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি জুবায়ের ও তালহাকে সাহায্য করেছিলেন। এই সম্মানিত মহিলা সর্বদা খাদিজার জামাতার প্রতি বদ্ধমূল বিরাগ পোষণ করতেন এবং এখন এই অনুভূতি চূড়ান্ত বিদ্বেষে পরিণত হল। তিনি ছিলেন এই বিদ্রোহের আত্মা এবং তিনি নিজেই উটের পিঠে চড়ে বিদ্রোহী সেনাদলের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন। রক্তপাতের প্রতি বীতরাগ খলিফা তাঁর চাচাত ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসকে পাঠালেন ধর্মীয় আনুগত্যের মাধ্যমে যুদ্ধের সালিশ বর্জন করার জন্য বিদ্রোহীদের অনুরোধ করতে। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না। জোবায়ের এবং তালহা খোরাইবা নামক স্থানে যুদ্ধ করল, পরাস্ত ও নিহত হল।[৪] আয়েশা বন্দী হলেন। ভদ্রতা ও বিবেচনার সঙ্গে তাঁর সঙ্গে আচরণ করা হল এবং

www.amarboi.org

সসম্মানে তাঁকে মদিনায় পাঠিয়ে দেওয়া হল। এই বিদ্রোহ দমন করতে-না-করতে আলী জানতে পারলেন যে সিরিয়ায় মোয়াবিয়া বিদ্রোহী হয়েছে। আবু সুফিয়ানের পুত্র, তার অনেক জ্ঞাতির মতো যাদেরকে ওসমান প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন, খলিফা কর্তৃক স্বর্ণমুদ্রা ও সিরিয়ার সম্পদ প্রাপ্ত হয়ে এক বৃহৎ অশ্বারোহী সেনাদল গড়ে তুললেন। আলীর অনেক পরামর্শদাতা তাঁকে শত্রুদের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত হওয়ার পূর্ব অবধি পরলোকগত খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত গভর্ণরদের বরখাস্ত না করতে উপদেশ দিলেন। "ইসলামের বেয়ার্ড—নির্ভীক ও নিন্দাতীত বীর"[৫] কোন ধরনের কপটতার আশ্রয় গ্রহণ বা অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করতে অস্বীকার করলেন। ওসমান যাদেরকে নিযুক্ত করেছিলেন এবং যারা নগ্নভাবে জনস্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তাদেরকে অফিস থেকে বরখাস্তের রাজাজ্ঞা প্রচারিত হল। মোয়াবিয়া অবিলম্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সিফ্‌ফিনের ময়দানে পরপর কয়েকটি যুদ্ধে সে হেরে গেল। শেষ দিন মালিক আল্ আশ্তারের অপ্রতিরোধ্য চাপের মুখে যখন তার সৈন্যবাহিনী খড়কুটার মতো ভেসে যাচ্ছিল তখন সে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে সৈন্যদের বাঁচানোর জন্য একটা কৌশল অবলম্বন করল। সে তার কতিপয় সেন্যকে বল্লমের মাথায় কোরআন ঝুলিয়ে মুসলমান বাহিনীর সামনে চীৎকার করতে করতে এগিয়ে যেতে আদেশ করল। "বিশ্বাসীদের রক্তপাত বন্ধ হোক; যদি সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তবে কে গ্রীকদের বিরুদ্ধে সীমান্ত রক্ষা করবে, যদি ইরাকের সেন্যবাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তবে কে তুর্কী ও পারসিকদের বিরুদ্ধে সীমান্ত রক্ষা করবে? আল্লাহর পাক্ কালাম আমাদের বিবাদের মীমাংসা করে দিক।" খলিফা এই পরম শত্রু ও তার সঙ্গী ষড়যন্ত্রকারী আমর বিন আসের চরিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তিনি তাদের কৌশল বুঝতে পারলেন এবং এই প্রতারণার প্রতি তাঁর লোকদের উন্মোচিত করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁর সেনাবাহিনীর বৃহদাংশ আর যুদ্ধ করতে রাজি হল না এবং সালিশের মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তি করার জন্য দাবী জানাল। আবু সুফিয়ানের পুত্র কোরআনকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচবার কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেছে—খলিফার এই আশ্বাস বানীর উত্তরে এই অবাধ্য একগুঁয়ে মনোভাব খোলা স্বপক্ষ ত্যাগের হুমকি দিল।[৬] মালিক আল্ আশ্তারকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ডেকে পাঠান হল, যুদ্ধ থামল এবং বিজয়ের ফল যা অর্জিত হয়েছিল তার অপূরণীয় ক্ষতি হল।[৭] সালিসের ব্যবস্থা করা হল। বিজয়ের মুহূর্তে যেসব ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা তাঁকে তরবারী কোষবদ্ধ করতে বাধ্য করেছিল তারাই তাঁর বিচার-বিবেচনা-ইচ্ছার বিরুদ্ধে আবু মুসা আল্ আশারীকে মুহম্মদ পরিবারের সালিশ নিযুক্ত করতে বাধ্য করেছিল। এই লোকটি গোপনে আলী বিরোধী ছিল। সে তার দাম্ভিকতা ও ধর্মীয় অহমিকার জন্য একাজের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিল এবং মোয়াবিয়ার প্রতিনিধি, ধূর্ত ও অবিবেকী আমর বিন আসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো বুদ্ধি তার ছিল না। শীঘ্রই সে আমর বিন আসের খপ্পরে পড়ে গেল। আমর আবু মুসাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করল যে মুসলমানদের কল্যাণার্থে (খলিফার পদ থেকে) আলীকে এবং (গভর্ণরের পদ

www.amarboi.org

থেকে) মোয়াবিয়াকে অপসারণ এবং রাষ্ট্র প্রধানের পদে অন্য ব্যক্তির মনোনয়ন অপরিহার্য। প্রতারণা সফল হল; আবু মুসা মিম্বরে উঠে ভাব-গম্ভীরভাবে আলীর অপসারণের কথা ঘোষণা করল। এই ঘোষণার পর সে মিম্বর থেকে এই ভাব নিয়ে অবতরণ করল যে সে একটা বড় ভাল কাজ করে ফেলেছে। অতঃপর আলীর প্রতিনিধি আবু মুসার শূন্য মিম্বরে সহাস্য বন্দনে আরোহণ করল এবং ঘোষণা করল যে সে আলীর অপসারণ অনুমোদন করল আর সেখানে মোয়াবিয়াকে নিযুক্ত করল। বেচারা আবু মুসা বজ্রাহতের মতো বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়ল। এই বিশ্বাসঘাতকতা খুবই সুস্পষ্ট ছিল এবং ফাতেমীয় গণ এই সিদ্ধান্ত বৈধ বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল।[৮] এটা ঘটেছিল 'দুমাতুল্ যানদালে'। উমাইয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা ফাতেমীয়দের অতিশয় ক্রোধান্বিত করে তুলল এবং পরস্পরের প্রতি চির-বিদ্বেষের অঙ্গীকার নিয়ে উভয়দল পৃথক হয়ে পড়ল। অল্পকাল পরেই কুফার মসজিদে নামাজরত অবস্থায় আলী আততায়ীর হাতে নিহত হন।[৯] তাঁর শাহাদৎ আবু সুফিয়ানের পুত্রকে সিরিয়া ও হিষাযে ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিল। আলীর মৃত্যুর পর, তাঁর জ্যৈষ্ঠ পুত্র হাসান খলিফার পদে সমাসীন হন। আয়াস ও শান্তিপ্রিয় হাসান দ্রুত তাঁর বংশের শত্রুদের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে নিবদ্ধ হন। কিন্তু উমাইয়াদের শত্রুতা সেখানেও তাঁকে অনুসরণ করল, এবং কয়েক মাস যেতে না যেতেই তিনি বিষপ্রয়োগে নিহত হন। হিন্দার পুত্রের ভাগ্য এখন ঊর্ধ্বগামী, আর আবু সুফিয়ানের মক্কার সুলতান হওয়ার উচ্চাশা মোয়াবিয়া দ্বারা ব্যাপকতর পরিধিতে পরিপূর্ণ হল। এরূপে হযরতের সর্বাপেক্ষা দুই ক্ষমাহীন শত্রুর পুত্র ইতিহাসে লিপিবদ্ধ, নিয়তির সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর খেয়ালে খলিফার পদে উপবিষ্ট হল। পাছে মোয়াবিয়ার চরিত্র সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন পক্ষপাত-প্রসূত বলে বিবেচিত হয়, কাজেই আমরা একজন ঐতিহাসিকের উদ্ধৃতি দেব, যাকে কোনদিকে পক্ষপাতিত্বের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। ওসবোর্ণ বলেন, "বিচক্ষণ, বিবেকবর্জিত ও নির্মম উমাইয়া বংশের প্রথম খলিফা তার নিজের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য এমন অপরাধ নেই যা করতে সঙ্কোচ বোধ করতেন। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারণ করার জন্য হত্যাই ছিল তার চিরাচরিত রীতি। হযরতের দৌহিত্রকে তিনি বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। আলীর বীর সহকারী মালিক আল্ আশতারকে অনুরূপভাবে হত্যা করেছিল। তার পুত্র ইয়াযিদের উত্তরাধিকারত্ব নিরাপদ করার জন্য মোয়াবিয়া আলীর একমাত্র জীবিত পুত্র হুসাইনের সঙ্গে তার প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করতে দ্বিধা করেননি। তথাপি এই ধীর মস্তিষ্ক, হিসেবী নাস্তিক, ইসলামী এলাকার উপর রাজত্ব করেছিলেন এবং প্রায় ১২০ বছর কাল তাঁর বংশধরদের হাতে রাজদণ্ড অক্ষুণ্ন ছিল। এই ব্যতিক্রমের ব্যাখ্যা যে দু'টি অবস্থার মধ্যে পাওয়া যায় তা আমি একাধিকবার উল্লেখ করেছি। একটি হল যে প্রকৃত ও নিষ্ঠাবান মুসলমান মনে করেন যে তিনি সমুদয় পার্থিব ব্যাপার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে তার ধর্মকে প্রকাশ করেছেন, অপরটি হল আরবদের গোত্রগত মনোভাব। এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন বিজেতা আরবগণ

www.amarboi.org

তাদের মর্যাদায় স্তর পর্যন্ত উন্নীত হতে পারেনি। মহত্ত্বও তাদের উপর চেপে বসেছিল, কিন্তু তাদের জাঁকজমকের মধ্যে, তাদের পূর্ববর্তী শক্তি ও তীব্রতার মধ্যে তারা মরুভূমির উন্মাদনা, বিরোধ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈর্ষাবিদ্বেষ জিইয়ে রেখেছিল। তারা শুধু পুনরায় ব্যাপকতর পরিসরে সংগ্রাম করছিল 'ইসলামের সম্মুখে আরবদের যুদ্ধসমূহ'।"

মোয়াবিয়ার অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পৌত্তলিক যুগের অভিজাততন্ত্র ইসলামের গণতান্ত্রিক নিয়মের পরিবর্তন ঘটাল। সহগামী নীতিহীনতাসহ পৌত্তলিকবাদ পুনরুজ্জীবিত হল এবং উমাইয়া গভর্নর ও সিরীয় সেনা-বাহিনীর পিছু পিছু পাপ ও অ-নৈতিকতা সর্বত্র অনুসরণ করল। হিযায ও ইরাক অন্যায় দখলকারী শাসনাধীনে আর্তনাদ করতে লাগল, কিন্তু বজ্রমুষ্টিতে তিনি ইসলামের টুটি চেপে ধরেছিলেন যে সে অব্যাহতি কোন পথ পেল না। যে অর্থসম্পদ তিনি নির্মমভাবে প্রজাদের নিকট থেকে আদায় করেছিলেন তা তিনি অশ্বারোহী সৈন্যের পিছনে মুক্ত হস্তে ব্যয় করতে লাগলেন, যারা এর বিনিময়ে তাকে জনগণের বিরক্তি দমন করতে সাহায্য করেছিল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীর প্রধান কর্মকর্তাদের ডাকলেন এবং তার পুত্র ইয়াজিদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য করলেন, যাকে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নিয়োগ করেছিলেন। এভাবেই ইয়াজিদ খলিফার পদে বরিত হন। মোয়াবিয়ার মৃত্যুর পর উমাইয়া পরিবারের লম্পট পুত্র পিতা কর্তৃক প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সিংহাসনে আরোহন করলেন। তিনি মোয়াবিয়ার মতো নির্মম ও বিশ্বাসঘাতক ছিলেন, কিন্তু তার পিতার ন্যায় নির্মমতন্ত্রকে আইনের ছদ্মবেশে চালানোর ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাঁর অধঃপতিত চরিত্র করুণা বা ন্যায়পরায়নতা জানত না। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা থেকে তিনি আনন্দ আহরণ করতেন সেজন্য তিনি হত্যা ও নির্যাতনের আশ্রয় নিতেন। তিনি সবচেয়ে অশ্লীল পাপে আসক্ত ছিলেন। তাঁর প্রিয় সঙ্গীসাথীরা ছিল সর্বাপেক্ষা নষ্ট নরনারী। এ হেন ব্যক্তি ছিলেন খলিফা—বিশ্বাসীদের নেতা। আলীর দ্বিতীয় পুত্র হুসাইন বংশগতভাবে তাঁর পিতার বীরধর্মী প্রকৃতি ও গুণাবলী লাভ করেছিলেন। কনস্তানতিনোপল অবরোধে তিনি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে সসম্মানে কাজ করেছিলেন। তাঁর চরিত্রের মধ্যে আলীর বংশগতির অধিকার এবং হযরতের দৌহিত্রের পবিত্র চারিত্রিক গুণের সমন্বয় ঘটেছিল। মোয়াবিয়া ও হাসানের মধ্যে যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তাতে তাঁর খেলাফতের অধিকার সংরক্ষিত হয়। হুসাইন কোনদিনই দামেস্কের অত্যাচারী বাদশাহকে খলিফা বলে স্বীকার করেননি, যার চারিত্রিক দোষসমূহকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। যখন কুফার মুসলমানেরা উমাইয়া শাসনের অভিশাপ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, তখন তিনি ইরাকীদের মুক্তির আবেদনে সাড়া দেওয়া কর্তব্য মনে করেছিলেন। তিনি নিশ্চয়তা লাভ করলেন যে সমস্ত ইরাকী জনগণ অত্যাচারী শাসককে সিংহাসন থেকে অপসারণ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যখন তিনি হাজির হবেন তখনি তারা তাঁর পাশে এসে দণ্ডায়মান হবে। তিন সপরিবারে কুফা গমনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ভ্রাতা আব্বাস কতিপয়

www.amarboi.org

অনুগত অনুসারী এবং সাহসহীন নারী ও শিশু অনুচরবর্গ সমভিব্যহারে তিনি আরবের মরুভূমি নিরুপদ্রবে অতিক্রম করলেন। কিন্তু যখন তিনি ইরাকের সীমান্তে উপনীত হলেন তিনি দেশের নিঃসঙ্গ ও বিরোধী দৃশ্য দেখে আতঙ্কিত হলেন। উমাইয়াদের বিশ্বাসঘাতকতা ও সামরিক প্রস্তুত আঁচ করে তিনি ইফ্রেতিস নদীর পশ্চিম তীরের নিকটবর্তী কারবালা নামক স্থানে তাঁর ক্ষুদ্র দলটি নিয়ে তাঁবু গাড়লেন। এই স্থানে যে নাটক অভিনীত হয়েছিল তা করুণ রসের দিক দিয়ে অনতিক্রম্য। বিশ্বাস-ঘাতকতা সম্পর্কে হুসাইনের ধারণা সত্য প্রমাণিত হল। পাশবিক ও হিংস্র ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের অধীনে উমাইয়া সেনাবাহিনী তাঁর পথ রোধ করল। অনেক দিন ধরে তারা তাঁর তাঁবু ঘিরে রাখল, তারা আলীর পুত্রের তরবারীর আওতার মধ্যে আসবার সাহস করল না, ফলে তারা তাইগ্রিস নদীর জল অবরোধ করল। অভাগা শহীদদলের দুঃখ-দুর্দশা ছিল ভয়ানক দুর্বিষহ। শত্রু-প্রধানের সঙ্গে আলোচনায় হুসাইন তিনটি সম্মানজনক শর্তের মনোনয়ন দেন : তিনি মদিনায় ফিরে যাওয়ার অনুমতি পাবেন, কিংবা তুর্কীদের বিরুদ্ধে সামনের ব্যূহতে স্থাপিত হবেন কিংবা নিরাপদে এজিদের সমীপে নীত হবেন।[১০] কিন্তু অত্যাচারী উমাইয়া বাদশাহর নির্দেশাবলী ছিল কঠোর ও অনমনীয় হুসাইন বা তাঁর দল-বলকে কোন দয়া দেখানো হবে না, উমাইয়াদের ন্যায়বিচারের নীতি অনুযায়ী তাদেরকে বিচারের জন্য অপরাধী হিসেবে 'খলিফা'র সামনে নীত হবে। শেষ সম্বল হিসেবে হুসাইন নারী ও শিশুদের উপলক্ষ যুদ্ধ না করতে অত্যাচারীদের প্রতি আহ্বান জানালেন, এবং তাঁকে হত্যা করে এর পরিসমাপ্তি ঘটাতে বললেন, কিন্তু তাদের মনে করুণার উদ্রেক হল না। তিনি তাঁর বন্ধুদেরকে সুযোগ মতো পালিয়ে যেতে অনুরোধ করলেন; তারা সর্বসম্মতিক্রমে তাদের প্রিয় নেতাকে পরিত্যাগ করতে কিংবা দীর্ঘায়ু হতে অস্বীকার করল। শত্রু-প্রধানদের একজন হযরতের দৌহিত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পাপভীতি দ্বারা আতঙ্কিত হয়ে তার ত্রিশজন সঙ্গীসহ "অনিবার্য মৃত্যুর অংশদারীত্বের দাবী"তে এজিদের দল পরিত্যাগ করলেন। প্রত্যেকটি একক যুদ্ধে ফাতেমীয়দের শৌর্যবীর্য ছিল অজেয়। কিন্তু শত্রুদের তীর নিরাপদ দুরত্ব থেকে তাদেরকে ঘায়েল করতে লাগল। হযরতের দৌহিত্র ব্যতীত প্রতিরোধকারীদের সকলেই একে একে শত্রুর হাতে প্রাণ উৎসর্গ করলেন। আহত ও মুমূর্ষ অবস্থায় তিনি শেষবারের ন্যায় পানি পান করার জন্য নদীতীরে গমন করলেন; তারা তীরের সাহায্যে সেখান থেকে বিতাড়িত করল। যেই তিনি পুনরায় তাঁবুতে প্রবেশ করে তাঁর শিশুপুত্রকে কোলে তুলে নিয়েছেন অমনি তীর গিয়ে লাগল তাঁর গায়ে। আহত পিতা আল্লাহর উদ্দেশে প্রণতি জানালেন। একাকী ও অবসন্ন শরীর নিয়ে তাঁর নির্মম শত্রুদের বিরুদ্ধে টিকে থাকতে না পেরে তাঁবুর দরোজায় বসে পড়লেন। একজন স্ত্রীলোক তাঁকে এক পেয়ালা পানি দিলেন তাঁর প্রচণ্ড পিপাসা নিবারণের জন্য; যেই তিনি পান করার জন্য পানি ওষ্ঠের কাছে তুলেছেন অমনি একটি তীর এসে লাগল তাঁর মুখে এবং তাঁর কোলেই তাঁর পুত্র ও ভ্রাতুস্পুত্র মৃত্যুবরণ করল। তিনি আকাশের দিকে তাঁর হস্ত উত্তোলন করলেন—হাত দিয়ে দর দর করে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল। তিনি

www.amarboi.org

জীবিত ও মৃত সকলের জন্য অন্তিম প্রার্থনা করলেন। তারপর শেষবারের মতো তিনি উমাইয়াদের মধ্যে গিয়ে আক্রমণ শুরু করলেন এবং উমাইয়াগণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে লাগল। রক্তক্ষরণ জনিত মূর্ছার ফলে তিনি ভূতলশায়ী হলেন এবং খুনি শকুনির দল মুমূর্ষ বীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা তাঁর শিরোচ্ছেদন করল, দেহের উপর দিয়ে মাড়িয়ে গেল এবং হিন্দার পুরাতন বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব নিয়ে মৃতদেহটির ওপর নির্যাতন চালাল। তারা কুফার দুর্গে শহীদের শির নিয়ে গেল এবং পাশবিক উবাইদুল্লাহ ছিন্ন শিরের মুখে বেত্রাঘাত করল। একজন বৃদ্ধ মুসলমান আবেগভরে বলেছিলেন, "হায়! এই মুখে আমি আল্লাহর রসূলকে চুম্বন করতে দেখেছি। গিবন বলেন, "সেই সুদূর যুগে ও আবহাওয়ায় হুসাইনের মৃত্যু বিয়োগান্ত দৃশ্য কঠিনতম পাঠকদের অন্তরেও সমবেদনা সঞ্চার করবে।" হুসাইনের শাহাদৎ-বার্ষিকী উপলক্ষে আলী ও তাঁর সন্তানদের জন্য তাঁর সমর্থকবৃন্দ প্রতি বছর যে বেদনা ও ক্রোধের উন্মত্ততা প্রকাশ করে তার প্রতি সমবেদনা দেখাতে না পারলেও তা এখন আমাদের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা সহজ।

এভাবেই পতন ঘটল সে যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পরিসমাপ্তি ঘটল—বেঁচে রইল রুগ্ন শিশুপুত্র যাকে হুসাইনের ভগিনী যয়নব (যোনোবিয়া) পাইকারী হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাঁরও নাম ছিল আলী এবং পরবর্তী জীবনে তিনি মহান জয়নুল আবেদীন "ধার্মিকদের অলঙ্কার" নাম ধারণ করেছিলেন। তিনি হুসাইনের ঔরসে ও পারস্যের শেষ সাসানিয়া নৃপতির ইয়াজদাজার্দের কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মুহম্মদের বংশধারা তার মাধ্যমে চিরস্থায়ী হয়েছিল। মায়ের দিক দিয়ে তিনি ইরানের সিংহাসনে সাসানিয়া বংশের প্রতিনিধিত্বের দাবীদার ছিলেন।

হুসাইন ও তাঁর সন্তান-সন্ততিদের বিয়োগান্ত ভাগ্য ইসলামে ত্রাসের শিহরণ জাগিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে অনুভূতির যে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটেছিল তা ঘটনাক্রমে ধর্মের মুক্তির কারণ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। দামেস্কের উমাইয়া রাজদরবার থেকে প্রবাহিত নীতিহীনতার স্রোতও বন্ধ করেছিল। এ মুসলিম জনতাকে অবহিত করেছিল যে শিক্ষাগুরু কি করেছিলেন এবং তাঁর শত্রুদের সন্তান-সন্ততি ইসলামের কি ক্ষতি সাধন করছে। একশ বছর ধরে উমাইয়াগণ তরবারী ও বিষ-প্রয়োগের অবাধ ব্যবহারের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিল। তারা মদিনা লুণ্ঠন করেছিল এবং দূরদেশে আনসারদের সন্তান-সন্ততিদেরকে নির্বাসিত করেছিল। যে শহর পৌত্তলিকদের নির্যাতন থেকে হযরতকে আশ্রয় দিয়েছিল। যে শহরকে তিনি অত্যধিক ভালবাসতেন, যার পবিত্র মাটিতে তিনি পদচারণা করেছিলেন এবং যার প্রতি ইঞ্চি মৃত্তিকা পবিত্র কার্যক্রমের দ্বারা পূত পবিত্র হয়েছিল, তাকে অন্যায়ভাবে অপবিত্র করা হয়েছিল, যে সব লোক প্রয়োজনের সময়ে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল এবং ধর্মের তোরণ নির্মাণে সাহায্য করেছিল তাদেরকে সর্বাধিক বীভৎস ও নাক্কারজনক নির্যাতনের শিকারে পরিণত করা হয়েছিল যার জুড়ি মেলে শুধু রোম লুণ্ঠনে ফ্রান্সের কনস্টবলের সৈন্যদের ও জর্জ ফ্রাণ্ডসবার্গের একইরূপ হিংস্র লুথারানদের নির্যাতনে। পুরুষদেরকে পাইকারীভাবে হত্যা করা

www.amarboi.org

হয়েছিল, নারীদের সতীত্ব নষ্ট করা হয়েছিল এবং শিশুদেরকে দাসে পরিণত করা হয়েছিল। মসজিদকে আস্তাবলে রূপান্তরিত করা হয়েছিল; মন্দির ও পবিত্র স্থানসমূহ স্বর্ণলঙ্কারের জন্য ধ্বংস করা হয়েছিল। সমগ্র উমাইয়া শাসনকালে পবিত্র নগরী বন্য প্রাণীর চারণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।[১১] আর একবার মক্কার পৌত্তলিকতা বিজয়ী হল। ডোজী বলেন, "ইসলামের পক্ষে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল নির্মম, ভয়ানক ও বীভৎস।" ইসলামের বিজয়কালে যে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা দেখানো হয়েছিল মক্কাবাসী ও উমাইয়ারা এমনিভাবেই তার প্রতিদান দিয়েছিল। উমাইয়াগণ অনেক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির জন্ম দিয়েছিল যাঁরা তাঁদের ধর্মনিষ্ঠা ও গুণের জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ওমর বিন আব্দুল আযিয। আরবদের মার্কাস অরেলিয়াস—একজন ধর্মপরায়ন নৃপতি, একজন সদাশয় শাসক ও একজন ধর্মভীরু মুসলমান যিনি দ্বিতীয় খলিফা মহান ওমরের আদর্শে তাঁর জীবন গড়ে তুলেছিলেন। বাদ-বাকীদের মধ্যে ছিল নির্লজ্জ পৌত্তলিকতা, যারা তাদের স্বীকৃত ধর্মের নিয়মাবলী ও আচরণের অবহেলায় আনন্দ উপভোগ করত।

উমাইয়ারা খেলাফত জবরদখল না করলে 'আহলুল্ বাইয়াত'[১২] খেলাফতে আলীর উত্তরাধিকারের সমর্থকগণ এবং জনগণের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব নেতা নির্বাচনের অধিকারের সমর্থকগণের মধ্যে মতপার্থক্য কখনও ধর্মানুসারীদের মধ্যে দলীয় বিভেদ সৃষ্টি করত না এবং আলীর খেলাফত লাভের পর একটা আপোষমীমাংসা বা সমন্বয় ঘটত। উমাইয়াদের জুলুম ও বিশ্বাসঘাতকতা এটাকে অসম্ভব করে তুলেছিল। তারা বহুবিধ অপরাধ ও অপরিসীম রক্তের স্রোতের উপর দিয়ে সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েছিল। খেলাফতের কার্যকালের বৈধতার সাদৃশ্য দেখানো তাদের পক্ষে ছিল অপরিহার্য। নির্বাচনের বলে—তাদের অশ্বারোহী সৈন্য ও পৌত্তলিক সমর্থকদের নির্বাচনের বলে তারা নিজেদেরকে 'আমিরুল মু'মনীন' বলে দাবী করত। মদিনা লুণ্ঠন এবং মুহম্মদের পরিবারের লোকজন ও মুহাজির ও আনসারদের ধ্বংস ও বিতাড়নের পর খোলাফায়ে রাশেদীন থেকে নজীর আওড়ানো এবং সেটা ব্যর্থ হলে, হাদিস বানানো তাদের পক্ষে ছিল সহজ। তাছাড়া উপাধি ধারণ করা ও তাদের পক্ষে কঠিন ছিল, কঠিন ছিল তাদের জন্য যারা জনগণের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে তাদের খলিফা নির্বাচন সমর্থন করত। যেসব শক্তিমান মনীষীরা প্রজাতন্ত্রের সৌধ রচনা করেছিলেন হয় তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন নতুবা তাঁদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল; তাদের সন্তান-সন্ততিগণ হয় পলাতক নয় দাস; তাঁদেরই অধিকার ছিল কৌশলে অধিকৃত উপাধি গ্রহণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার। যারা উমাইয়াদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল তারাও উমাইয়াদের নীতি অবলম্বন করেছিল। যে প্রচণ্ড বিদ্বেষ নিয়ে বনী উমাইয়ারা বণী ফাতিমীয়দের প্রতি আচরণ করেছিল সেই একই মনোভাব নিয়ে বনী আব্বাসীয়রা মুহম্মদের বংশধরদের প্রতি আচরণ করেছিল। খেলাফতের উত্তরাধিকারত্বে তাদের কোন দাবী ছিল না; ফাতিমার বংশধরদের প্রতি জনগণের ভালবাসাকে তারা উচ্চাসনে ওঠার উপায় হিসাবে গ্রহণ

www.amarboi.org

করেছিল; যখন তারা তাদের ইঙ্গিত লক্ষ্য অর্জন করল, তখন তারা ফাতেমীয়দেরকে তীব্রতর নির্যাতনের মাধ্যমে পুরস্কৃত করল। তাদের খলিফা উপাধি ধারণ ও আধা-নির্বাচনের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা স্বাভাবিকভাবেই উমাইয়াদের মতো যারা তাদের দাবীর আইনানুগতার প্রশ্ন তুলেছিল কিংবা পরিষ্কার ভাষায় মুহম্মদের অনুসরণে ইমামতের যথোপযুক্ত নির্বাচনের নীতি তুলে ধরে তাদেরকে অনুসন্ধান করেছিল। প্রতিটি মত পার্থক্য কঠোরভাবে অবদমিত হয়েছিল, এমনকি বাদশাহদের প্রতিকূল কোন মতামত প্রকাশ করলে বিচারকদের শাস্তি দেওয়া হত।[১৩] যে পরিস্থিতি আব্বাসিয়াদের আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত উদ্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল তা যদি আমরা মনে না রাখি তবে আমরা এই অভ্যুত্থানকে অসাধারণ বলে বিবেচনা করার প্রবণতা দেখাতে পারি। উমাইয়াগণ ফাতেমীয়দের উপর বীভৎস নির্যাতন চালিয়েছিল এবং তারা যে সুমহান ধৈর্যসহকারে তাদের দুঃখ-দুর্দশা ও অন্যায় সহ্য করেছিল তা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সার্বজনীন ভীতির জন্ম দিয়েছিল এবং তাদের অনুসারী ও শিষ্যদের দৃষ্টিতে নির্যাতীতদেরকে অলৌকিক জ্যোতিতে ভূষিত করেছিল। নির্যাতন যতই প্রচণ্ড হোক না কেন তা সব সময়েই তার লক্ষ্যার্জনে ব্যর্থ হয়ে থাকে; বা কোন সম্প্রদায়ে বা সমষ্টিকে মুছে দেওয়ার পরিবর্তে তা এক নতুন খাতে প্রবাহিত করে এবং অধিকতর প্রাণশক্তি দান করে। খ্রীষ্টধর্মের মতো ইসলাম ধর্মেও যুদ্ধক্ষেত্রের বিপদ ও নির্যাতনের বেদনা "যে বস্তুর জন্য সহ্য করা হয়েছিল তাকে অধিকতর পার্থিব ঔজ্জ্বল্যে ভূষিত করেছে। ফাতিমার সন্তান-সন্ততি—সেই সব সিদ্ধপুরুষ যারা মানুষের নির্যাতনের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন এবং যারা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রজ্ঞা ও ধর্মের অনুশীলন করেছিলেন—যাদের হাতে ছিল না অস্ত্র, ধনসম্পদ ও জনবল—তাদের অনুসারীদের মনের উপর অধিকতর দৃঢ়তার সঙ্গে শাসন চালিয়েছিলেন এবং সেনাবাহিনীর প্রভু, প্রাসাদবাসী খলিফার চেয়ে জনগণের অধিকতর শ্রদ্ধা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। উমাইয়াদের পাপের পেয়ালা পূর্ণ হয়েছিল এবং জনগণ তাদের মনোবেদনায় চীৎকার করে বলেছিল : হায় খোদা! আর কতদিন? দিকে দিকে ভুয়া-খলিফাদের পাপাচার ও দুঃশাসনের ফলে জনমনে আকুল বাসনা জেগেছে যে মুহম্মদের বংশধরদেরকে তাদের অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারা সতৃষ্ণ নয়নে ইমামের জন্য প্রতীক্ষা করেছিল, কিন্তু এসব সাধু-সজ্জনেরা জগৎ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলেন, এ জগৎ যেন তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল না। একের পর এক অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণকারী[১৪] সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল এবং তাদের সিরীয় শত্রুবাহিনীর সম্মুখে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিল। জনগণ বিশ্বাসীদের ঐশী-নিযুক্ত ইমামের জন্য অপেক্ষা করছিল, কিন্তু তারা বলপ্রয়োগকে নিন্দা করত। কি করতে হবে? পরিবারের প্রধানের পরামর্শের অনুমোদনের বিপরীতে মুহম্মদ-পরিবারের বেশ কয়েকজন তরুণ উমাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং নিজেদের উচ্চাকাঙ্খা বা ধর্মীয় উদ্দীপনার জন্য আত্মত্যাগ করেছিল। এই সংকটময় মুহূর্তে, এই অস্থিরতার সময়ে জনগণ মুহম্মদের পরিবার থেকে কোন সংকেতের জন্য অপেক্ষা করছিল, ঠিক সেই

www.amarboi.org

সময়ে বনী আব্বাস রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। বনী আব্বাসগণ হযরতের চাচা আব্বাসের বংশধর। আব্বাস ইসলামের অগ্রগতির গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতেন; তিনি মুহাম্মদের সঙ্গে ছিলেন যখন মদিনাবাসীদের নিকট থেকে "নারীদের অঙ্গীকার" গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু চরিত্রের বা নীতির দুর্বলতার জন্য মক্কা বিজয়ের কিছু পূর্বে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। যাহোক হযরত সর্বদা তাঁর সাথে সর্বাধিক মমতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আচরণ করতেন। আবু বকর, ওমর ও ওসমানও হযরতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতেন। তাঁকে ভ্রমণ করতে দেখলে তাঁরা দণ্ডায়মান হতেন এবং প্রায়ই তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত যেতেন।[১৫] তিনি ৩২ হিজরীতে ইনতেকাল করেন—কারো কারো মতে আরও দুই বছর পর—তিনি চার পুত্র রেখে যান—আব্দুল্লাহ (আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস), ফজল, ওবায়দুল্লাহ ও কায়সান। আব্দুল্লাহ ইতিহাসে ও হাদীসে ইবনে আব্বাস নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি হিযরী সালের তিন বছর পূর্বে ৬১৯ খ্রিস্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আলী তাঁকে কোরআন ও আইনবিজ্ঞান সম্পর্কে শিক্ষা দেন। জ্ঞানী হিসেবে এবং কোরআন ও খলিফাদের সিদ্ধান্তসমূহের ব্যাখ্যাতা হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি এতই উচ্চাঙ্গের হয়েছিল যে দেশের সব জায়গা থেকে জনগণ তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য ভিড় জমাত। তিনি সপ্তাহে একদিন কোরআনের ব্যাখ্যা সম্পর্কে, এক দিন আইন সম্পর্কে, একদিন ব্যাকরণ সম্পর্কে একদিন আরবদের ইতিহাস সম্পর্কে এবং একদিন কবিতা সম্পর্কে বক্তৃতা দান করতেন। তিনি প্রাক্-ইসলামী আরবী সাহিত্য ও আরবদের ইতিহাসের পঠন-পাঠন ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে উদ্দীপনা সঞ্চার করার জন্য কোরআনের কঠিন ও দুর্বোধ্য অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে প্রাচীন কবিদের থেকে উদ্ধৃতি দিতেন, তিনি একথা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন : "যদি তোমরা কোরআনের অনুধাবনে কোন জটিলতার সম্মুখীন হও, তবে আরব্য কবিতার মধ্যে তার সমাধান অনুসন্ধান করো, কেননা এগুলো আরবজাতির লিখিত বিবরণ।"[১৬] আলীর প্রতি ইবনে আব্বাস ও তাঁর ভাইদের দৃঢ় ও অপরিবর্তনীয় ভক্তি-শ্রদ্ধা সুবিদিত। চার ভা-ই "উষ্ট্রের যুদ্ধে" ও সিফ্ফিনের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। ইবনে আব্বাস পণ্ডিতের তুলনায় কম দক্ষ সেনানী ছিলেন না। তিনি আলীর অশ্বারোহী সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন। তিনি প্রায়ই খলিফার দূত হিসেবে কাজ করেছিলেন। যখন বিচ্ছিন্নতাবাদী সৈন্যরা তাঁর ও মোয়াবিয়ার মধ্যে বিবাধ মীমাংসার জন্য সালিশ নিয়োগের জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল তখন মুহম্মদের পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আলী তাঁকেই মনোনীত করতে ইচ্ছা করেছিলেন।[১৭] ইবনে আব্বাস সত্তর বছর বয়সে ৬৭ হিযরীতে হুসাইনের মৃত্যুর পর ভগ্নহৃদয়ে তায়েফে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর পুত্র, আলী—যাঁর নাম মহান খলিফার নামানুসারে রাখা হয়েছিল—ফাতিমার সন্তান-সন্ততিদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগের ক্ষেত্রে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। তিনি ১১৭ হিযরীতে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর পুত্র মুহম্মদ পরিবারের প্রধান হন।

এসময়ে পারস্য, ইরাক ও হিযায বনী উমাইয়াদের হাতে চরম নির্যাতন ভোগ করেছিল এবং সেই ঘৃণিত বংশকে নির্মূল করার জন্য গোপন সংস্থার মাধ্যমে প্রস্তুতি

www.amarboi.org

নিচ্ছিল। বনী আব্বাসগণ উমাইয়া শাসন খতম করার জন্য সর্বাপেক্ষা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল—তারা প্রথমে ফাতেমীয়দেরকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার অকপট আগ্রহে, পরে তাদের নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করেছিল। আলী ইবনে আব্দুল্লাহর পুত্র মুহম্মদ সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি নিজেই খেলাফতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি খুব শক্তিমান ও অপরিসীম উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি প্রথমে ফাতেমীয়দের জন্য কাজ করেছিলেন, পরে ধীরে ধীরে নিজের বংশের প্রতিষ্ঠার জন্য কৌশলে কাজ করছিলেন। তিনি তাঁর পরিবারের ইমাম হওয়ার দাবী প্রতিপন্ন করার জন্য একটি নতুন মতবাদ প্রচার শুরু করলেন যে কারবালায় হুসাইনের হত্যাকাণ্ডের পর ইসলামের আধ্যাত্মিক প্রধানের পদ তাঁর জীবিত পুত্র আলীর (জয়নুল আবেদীনের) উপর বর্তায়নি, বর্তাল মুহম্মদ ইবনে আল্ হানাফিয়ার ওপর—অন্য মায়ের গর্ভের আলীর ঔরসে এই পুত্রের জন্ম—ফাতিমার মৃত্যুর পর আলী হানিফা গোত্রের এই রমণীকে বিবাহ করেছিলেন; আর তার মৃত্যুর পর খেলাফত তার পুত্র হাশিমের ওপর বর্তে ছিল। যিনি আব্বাসিয়া বংশের মুহম্মদকে তা আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরিত করেন। কোন কোন মহলে এই গল্প বিশ্বাস অর্জন করেছিল, কিন্তু জনসাধারণের দৃষ্টি হযরতের বংশধরদের প্রতি নিবদ্ধ ছিল এবং আব্বাসিয়াদের মিশনারীগণ বা রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা স্বীকার করত যে তারা 'আহলে বাইয়াতে'র জন্য কাজ করেছেন। অদ্যাবধি আব্বাসিয়াগণ ফাতেমীয়দের প্রতি গভীর আনুগত্য স্বীকার করত এবং মুহম্মদের বংশধরদের প্রতি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য তাদের সব আন্দোলন ও পরিকল্পনা, একথা প্রচার করত। 'আহলে বাইয়াতে'র প্রতিনিধি ও সমর্থকগণ তাদের স্বীকৃতির পশ্চাতে যে প্রতারণা রয়েছে তাতে সন্দেহ না করে মুহম্মদ বিন আলী ও তাঁর দলের প্রতি অনুগ্রহ ও আশ্রয় বিস্তৃত করেছিল যা তাঁর কাজকে স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন হিসেবে জনমনে মুদ্রিত করেছিল। ফাতেমীয়দের প্রতি পারসিকদের অনুরাগের কারণ ঐতিহাসিক ও জাতীয় যোগাযোগ। ইয়াযদেজার্দের কন্যার মাধ্যমে ফাতেমীয়রা ইরানের সিংহাসনের দাবীদার ছিলেন। ইসলামের প্রচারের প্রারম্ভে আলী পারস্যের মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি ও সৌহার্দ পোষণ করতেন, হযরতের একজন প্রখ্যাত সাহাবী সলমন ফার্সী দীর্ঘকাল ধরে খলিফা আলীর সঙ্গী ও বন্ধু ছিলেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধের পর আলী তাঁর পুরস্কারের অর্থ বন্দীদের মুক্তির জন্য ব্যয় করতেন এবং তাঁর পরামর্শের সাহায্যে পুনঃপুনঃ প্রজাদের ভার লাঘব করার জন্য খলিফা ওমরকে উৎসাহিত করতেন। তাঁর বংশধরদের প্রতি পারসিকদের অনুরাগ সুস্পষ্ট। মুহম্মদ বিন আলী আরব জুলুমকারীদের ঘৃণ্য শাসন থেকে পারসিকদের আসন্ন মুক্তির কথা তাদের নিকট প্রচার করে তাদেরকে প্রতারিত করেছিল। খোরাসান, ফার্স ও ইরানের অন্যান্য প্রদেশে বসবাসকারী ইয়েমেনী যারা আহলে বাইয়াতের প্রতি সমভাবে অনুরক্ত ছিল এবং যাদের পুরাতন শত্রু মোযারের বংশধরদের প্রতি শত্রুতা সম্প্রতি অনেক ক্ষতির মাধ্যমে প্রজ্বলিত হয়েছিল তাদের নিকট তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, মুহম্মদের বংশের ইমামদের অনুকূলেই তিনি কাজ

www.amarboi.org

করছেন। তিনি সে যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সেনাপতি এবং অদ্যাবধি আলীর বংশধরদের অনুগত পক্ষভুক্ত আবু মুসলিমকে স্বপক্ষে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন। ১২৫ হিযরীতে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর পুত্র ইবরাহিম, আব্দুল্লাহ আবুল আব্বাস (উপনাম 'সাফ্ফাহ্') আব্দুল্লাহ আবু জাফর (উপনাম 'আল মনসুর')-কে একের পর অন্যকে তার উত্তরাধিকারী নিয়োগ করে যান।

খোরাসানে ইয়েমেনী ও মোযারীয়দের মধ্যে অষ্টম শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে যে মারাত্মক সংঘর্ষ বেধেছিল তা একটা সুপ্রতিষ্ঠিত খনিতে আলোকসম্পাতের সংকেত হিসেবে কাজ করেছিল। আবু মুসলিম প্রদেশের প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে তার দলভুক্ত লোকদেরকে অবিলম্বে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়ানোর নির্দেশ দিল। বিঘোষিত কারণ হল অন্যায় দখলকারী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে "আহলুল বাইয়াতে"র অধিকার প্রতিষ্ঠা, অল্পকাল পূর্বে ইমাম আলী জয়নুল আবেদীনের পৌত্র ইয়াহ্হিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন; তিনি নিহত হন এবং মারওয়ানের আদেশে তার দেহ ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আবু মুসলিম তরুণ প্রধানের দেহাবশেষ সসম্মানে সমাহিত করার আদেশ দেন। তার অনুসারীবৃন্দ তাদের শোক ও ইয়াহ্হিয়া হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্পের প্রতীক হিসেবে কালো বস্ত্র ধারণ করেন। সেদিন থেকে কালো রং আব্বাসিয়াদের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক প্রতীকে পরিণত হয়। যখন অন্যায় দখলকারীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য জনগণকে আহ্বান করা হয়েছিল তখন জনতা কালো বস্ত্র পরিধান করে মিলন-স্থানে দলে দলে সমবেত হতে লাগল—এই ঘটনা বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও শক্তির নির্দেশ করেছিল। ১২৭ হিযরীতে ২৫শে রমযান রাত্রিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং পর্বত সমূহের উপর বহ্ন্যুৎসবের মাধ্যমে জনগণকে আহ্বান করা হয়েছিল। বিশাল জনতা চতুর্দিক হতে মার্ভে এসে ভেঙ্গে পড়ল যেখানে আবু মুসলিম তখন অবস্থান করছিলেন। আব্বাসিয়াদের প্রধান হিসেবে ইবরাহিম মুহম্মদবিন আলীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন—মারওয়ান কর্তৃক বন্দী হয়ে তিনি নিহত হয়েছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি কৌশলে তার দ্বিতীয় ভ্রাতা আবুল আব্বাসকে তার পিতার উইল অনুযায়ী কর্তৃত্ব হস্তান্তরের দলিলটি পৌছে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। আবু মুসলিম সত্বর নিজেকে সমগ্র খোরাসানের অধিকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ইরাকের দিকে তার বিজয়ী বাহিনীর অভিযান পরিচালিত করেছিলেন। আন্দোলনের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সম্পর্কে তখনও কিছুই প্রকাশিত হয়নি। 'আহলুল্ বাইয়াত' হল সংক্ষিপ্ত বাক্য যা সকল শ্রেণীর মানুষকে কালো পতাকার তলে সমবেত করেছিল। কুফা তখনি আত্মসমর্পণ করেছিল। আবু মুসলিমের সহকারী, হাসান ইবনে কাহতাবা তার সেনাবাহিনীর পুরোভাগে শহরে প্রবেশ করেছিলেন এবং অবিলম্বে তার সঙ্গে যোগদান করলেন আবু সালমা যার ইবনে সোলায়মান আল্ খাল্লাল "যিনি" 'রৌজাতুস্ সাফা'র লেখক বলেছেন, "মুহম্মদের বংশধরদের প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হয়েছিলেন।" দৃশতঃ এই লোকটি পরিবারের প্রধানের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছিলেন। আব্বাসীয়া সেনাধ্যক্ষ খুব সহানুভূতির সঙ্গে তাকে

www.amarboi.org

গ্রহণ করেছিলেন। "তিনি তাকে চুম্বন করে সম্মানিত আসনে বসিয়েছিলেন,"[১৮] এবং বলেছিলেন যে আবু মুসলিমের আদেশেই তাকে সব ব্যাপারে মেনে চলতে হবে। আবু সালমার দাম্ভিকতা মিথ্যা আশায় তুষ্ট করা হয়েছিল; এ পর্যন্ত তিনি আব্বাসিয়াদের অভিসন্ধি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অনবহিত ছিলেন, আবুসালমা ও হাসান ইবনে কাহ্‌তাবার যুগ্মনামে পরের দিন কুফাবাসীদেরকে জামে মসজিদে সম্মিলিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে ঘোষণা প্রচার করলেন। জনগণ নতুন ঘোষণা শোনার আশায় মসজিদে এসে হাজির হল। তখন ও চক্রান্ত ঘনীভূত হয়ে উঠেনি, হাসান অন্যান্য আব্বাসিয়া সমর্থকগণ বিবেচনা করলেন যে এখনও তাদের অভিপ্রায় সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়ার সময় আসেনি। ইত্যবসরে আবুল আব্বাস তার ভ্রাতা আবু জাফরসহ উমাইয়া-প্রহরা এড়িয়ে কুফায় এসে হাজির হয়েছেন এবং নাটকের পরবর্তী অঙ্কের জন্য অপেক্ষা করছেন। আবু সালমা তখনও তাঁর প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত রয়ে গেছেন। তিনি গোপনে ইমাম জাফর আস্‌সাদিকের নিকট সংবাদ পাঠালেন এবং এসে তার অধিকার দখল করতে অনুরোধ জানালেন। ইরাকী বার্তার প্রকৃতি ইমামের জানা ছিল তাই পত্রখানা বন্ধ অবস্থায় পুড়িয়ে ফেললেন। কিন্তু আবু সালমা পত্রের কোন উত্তর পৌছানোর পূর্বেই আবুল আব্বাসকে খলিফা হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন, তখনও তিনি বাহ্যত 'আহলুল বাইয়াতে'র নামে কাজ করলেও সেখানকার বাসিন্দাদের সকলকেই পরদিন শুক্রবারে খলিফা নির্বাচনের জন্য সমবেত হতে আদেশ দিলেন। সেদিন কুফা অদ্ভুত দৃশ্য ধারণ করল। বিশাল জনতা বণী আব্বাস কৃষ্ণবর্ণ শোকবস্ত্র পরিধান করে বহু-প্রতীক্ষিত ঘোষণা শোনার জন্য 'মাসজিদুল জামে' গিয়ে হাজির হতে লাগল। যথাসময়ে আবু সালমা অদ্ভুত জমকাল পোশাকে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হলেন। আব্বাসের দলভুক্ত কিছু সংখ্যক লোক ছাড়া আর কেউই জানত না যে, কিভাবে তিনি আব্বসীয়দের উদ্দেশ্যে নিজেকে বিক্রি করতে এসেছেন। তিনি তাঁর প্রভুদের স্বার্থের চেয়ে তাঁর প্রধানকেই অধিক পছন্দ করতেন। নামাজে ইমামতি করার পর তিনি সমবেত জনতাকে সম্মেলনের লক্ষ্য বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন—আবু মুসলিম ধর্মের সংরক্ষক এবং বংশের অধিকারের সমর্থক, তিনি উমাইয়াদেরকে তাদের অবিচারের শীর্ষদেশ থেকে নামিয়ে দিয়েছেন; এখন প্রয়োজন একজন ইমাম ও খলিফা নির্বাচন করা। আবুল আব্বাসের মতো ধর্মনিষ্ঠা ও ক্ষমতা এবং খলিফার জন্য অপরিহার্য যাবতীয় গুণের অধিকারী বিখ্যাত ব্যক্তি আর কেউ নেই; তিনি নির্বাচনের জন্য বিশ্বাসীদের নিকট নিজেকে প্রার্থী হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। এ পর্যন্ত আবু সালমা আব্বাসীয়গণ জনগণের মনোভাব সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ছিলেন। তারা এ ব্যাপারে সঙ্কিত ছিল যে কুফার অধিবাসীগণও আলীর বংশধরদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকে সম্মতির সঙ্গে নাও দেখতে পারে, কিন্তু ইরাকীদের সুবিদিত চপলতা এবার প্রমাণিত হল। তারা বার বার ফাতেমীয়দের জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং যাদের সাহায্য করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে কিংবা যাদের সাহায্যের জন্য আহবান জানিয়েছে তাদের সঙ্গে প্রায়ই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ক্ষণিকের

www.amarboi.org

পরিবর্তনশীল খেয়ালের বশীভূত হয়ে প্রায়ই সত্যের সংরক্ষক সেজেছে তেমনি বিশ্বাসঘাতক বনেছে। কারবালার হত্যাকাণ্ডের পর তারা এতই মর্মাহত হয়েছিল যে বিশ হাজার ইরাকী হুসাইনের মাজারে এক বিনিদ্র রজনী যাপন করে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং ইয়াযিদের বিশাল অশ্বারোহী সৈন্যদলের বিরুদ্ধে সবলে রুখে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাদের অনুশোচনা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এসব চপলমতি ও দাঙ্গাবাজ, 'অবিশ্বাসী ও অ-নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদেরকে বাস্তবিক "আল্লাহর অভিশাপ", একমাত্র হাজ্জাজ বিন ইউসুফই ঠিক রেখেছিলেন। এখন আবুল আব্বাসকে খলিফা হিসাবে প্রস্তাব সম্পর্কে আবু সালমার কথা উচ্চারিত হতে না হতেই সম্মতিসূচক উচ্চনাদী 'আল্লাহু আকবর'[১৯] ধ্বনিতে তারা ফেটে পড়ল, আবুল আব্বাসকে গুপ্ত অবস্থান থেকে আনার জন্য একজন দূতকে দ্রুত প্রেরণ করা হল। যখন তিনি উপস্থিত হলেন তখন জনতার মধ্যে তাঁর সঙ্গে করমর্দন ও আনুগত্য প্রকাশের জন্য উন্মত্ত জনতা সামনের দিকে ধাবিত হতে লাগল। নির্বাচন সমাপ্ত হল। তিনি মিম্বরে আরোহণ করে খোতবা (ভাষণ) দিলেন। এভাবেই তিনি মুসলমানদের ইমাম ও খলিফা হয়ে গেলেন।[২০] এরূপে ফাতেমীয়দের জনপ্রিয়তার উপর ভিত্তি করে আব্বাসীয়গণ খেলাফত দখল করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁরা ফাতেমীয়দেরকে উল্টো প্রতিদান দিয়েছিলেন। পার্থিব ক্ষমতার লোভ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট উচ্চাশা। মানুষের ভাবাবেগের অন্যান্য প্রকাশের তুলনায় এ মানবজাতির অনেক বেশি ক্ষতি সাধন করেছে। অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে যে কোন উপায় অবলম্বনের জন্য দ্বিধা করে না; এলোমেলোভাবে অপরাধ ও পূণ্যের প্রয়োগ করে—একটি নিজের অভিপ্রায়ের ছদ্মবেশ ধারণের জন্য অপরটি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য। এ এমনকি ধর্মকে নিজের সেবায় ব্যবহার করে। ধর্মের ছদ্মবেশে উচ্চাকাঙ্ক্ষা মানব-জাতির জন্য বিভীষিকাময় অনর্থ ঘটিয়েছে। রোমের পোপ তাদের পার্থিব ক্ষমতা নিরন্তর অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সভ্যজগৎকে রক্তের বন্যায় প্লাবিত করেছে। ইসলামের খলিফাগণ—আব্বাসীয়, মিশরীয় ফাতেমীয় ও উমাইয়াগণ তাদের চাটুকারদের তৈরি দাবীর উপর ভিত্তি করে লোভের বশবর্তী হয়ে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক ও পার্থিব শাসন ক্ষমতা দখল করেছিলেন এবং প্রজাদের অবিভক্ত আনুগত্য সংরক্ষণের কামনায় ইসলামের বুকে সমপরিমাণ রক্তপাত ঘটিয়েছে ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছে।

প্রাথমিক পর্যায়ের আব্বাসীয় খলিফাগণ অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক ছিলেন; তারা গভীর অন্তঃদৃষ্টি ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অধিকারী ছিলেন। যে মুহূর্ত থেকে কুফাবাসীদের উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের ভেতর দিয়ে তাঁরা খেলাফতে সমাসীন হয়েছিলেন তখন থেকেই তাঁরা তাঁদের হাতে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য ও জনগণের নির্বাচনের ঐশী অনুমোদন সম্পর্কীয় মতবাদের রূপ ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এ থেকে বংশগতভাবে খেলাফতের উত্তরাধিকার নীতি অস্বীকার করা এবং জনগণের মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রায় ধর্মীয় ব্যাপার করে তোলা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হল।

www.amarboi.org

সাফ্ফার[২১] রাজত্বকালে আবু মুসলিম কিছুটা সহানুভূতি লাভ করেছিলেন, কিন্তু ফাতেমীয়দের প্রতি তার গোপন আকর্ষণ থাকার জন্য তাকে ঘৃণা ও সন্দেহ করা হত। সাফ্ফার উত্তরাধিকারীর অধীনে তাকে ধর্মত্যাগী বলে অভিযুক্ত করা হয় এবং অপমানকর উপাধি 'জিন্দিক' হিসেবে কলঙ্কিত করা হয়[২২] এবং হত্যা করা হয়। মুহম্মদ পরিবারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পূত পবিত্র জীবন, যে আত্যন্তিক সম্মানের সঙ্গে জনগণ তাদের দেখতেন তা প্রায়ই আব্বাসীয়দের ঈর্ষার উদ্রেক করত এবং ফাতেমীয়দের সাময়িক নির্যাতনের শিকারে পরিণত করত। হারুন অর রশীদ তাঁর সাম্রাজ্যের দুর্গ বার্মেকীদের ধ্বংস করেছিলেন এবং ফাতেমীয়দের শুধু ষড়যন্ত্রের সন্দেহের ভিত্তির উপর নির্ভর করেই এই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই অবস্থা চলেছিল আব্বাসীয় বংশের শ্রেষ্ঠ মহান খলিফা আবদুল্লাহ আল্ মামুনের পূর্বাবধি। তিনি খেলাফত লাভ করেই ফাতেমীয়দের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন। তদনুযায়ী তিনি ফাতেমীয়দের অষ্টম ইমাম, আলী ইবনে মুসা, উপনাম রিজাকে তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন এবং তদীয় ভগিনী উম্মুল ফযলকে তার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন। তিনি আব্বসীয়দের কালো রং বর্জন করে ফাতেমীয়দের নির্ধারিত রং সবুজ গ্রহণ করেছিলেন।[২৩] ক্রোধান্বিত আব্বাসীয়গণ আলী ইবনে মুসা আর রিজাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছিল। ফাতেমীয়দের প্রতি তিনি যে সহনশীলতা দেখিয়েছিলেন তা তাঁর দু'জন অব্যবহিত উত্তরাধিকারী (মুতাসিম ও ওয়াসিক)[২৪] বজায় রেখেছিলেন। মুত্ওয়াক্কিলের সিংহাসন আরোহণ অভিনব ও প্রচণ্ড নির্যাতনের সংকেত দিয়েছিল, চরম নিষ্ঠুরতা ও পাপ-আচরণের বৎসরব্যাপী তার সমগ্র রাজত্বকাল চিহ্নিত করেছিল। মুন্তাসির তাঁর পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেন। সিংহাসনে বসে প্রথমেই তিনি তাঁর পিতা কর্তৃক আলী ও হুসাইনের বিধ্বস্ত সমাধিস্থান প্রত্যর্পণে এবং তাঁদের লাঞ্ছিত স্মৃতিসমূহকে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। এই খলিফার বিচক্ষণতা তার উত্তরাধিকারীরা অনুসরণ করেছিলেন এবং তারপর থেকে শিয়াদের প্রতি কিছুটা সহিষ্ণুতা সম্প্রসারিত হয়েছিল। ৩৩৪ হিযরীতে (৯৪৫ খ্রী.) বুয়াইয়া বংশের মুয়িয উদ্দৌল্লা বাগদাদের প্রাসাদের মেয়র নিযুক্ত হয়েছিলেন। ফাতেমীয়দের একজন উৎসাহী সাথী হিসেবে তিনি এক সময়ে আব্বাসীয় খলিফা মতিউল্লাহকে পদচ্যুত করতে পরিকল্পনা করেছিলেন এবং আলী পরিবারের একজন অল্পবয়স্ক বংশধরকে স্থলাভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নীতির খাতিরে তা কার্যকরী করা হয়নি। মুয়িযউদ্দৌলা কারবালার প্রান্তরে হুসাইন ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের শাহাদৎ বরণের স্মরণে 'ইয়াওম-ই-আশুরা'—শোক দিবস পালন আরম্ভ করেন। ৬৪৫ হিযরীতে (১২৪৭ খ্রী.) মুতাসিম বিল্লাহর অধীনে শিয়াদের ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন শুরু হয়। তার ফলে আরবজাতির সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং তার পশ্চিম এশিয়াবাসীদেরকেও একই সঙ্গে গ্রাস করে। যেসব ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা তাকে ঘিরে রেখেছিল তাদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ পরামর্শের দ্বারা উদ্বেলিত হয়ে সুন্নী মযহাবের এই নির্জীব খলিফা শিয়া সম্প্রদায়ের সকল পুরুষ

www.amarboi.org

সদস্যদেরকে হত্যা করেন। এক বিভীষিকাপূর্ণ আদেশ বলে যা আমাদের আলবীজেন ও হুগোনটদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তিনি গোঁড়াদেরকে শিয়াদের দ্রব্যসম্ভার লুণ্ঠন করতে বাড়িঘর ধ্বংস করতে শস্যক্ষেত্র নষ্ট করতে এবং তাদের নারী-শিশুদেরকে দাসে পরিণত করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এই বর্বরোচিত আচরণ বাগদাদের ভাগ্যহত নগরীর উপর চেঙ্গিসের পৌত্র প্রতিশোধ গ্রহণকারী হালাকুর আক্রমণ ডেকে এনেছিল। তিনদিন ধরে তার্তার-প্রধান নগরটিকে লুটপাট ও হত্যার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। তৃতীয় দিবসে আব্বাসীয় বংশের ৩৭তম খলিফাকে চরম অবমানিত অবস্থায় হত্যা করা হয়। এরূপে আব্বাসীয় বংশের পতন ঘটে।[২৫]

মোয়াবিয়ার পূর্ব পর্যন্ত 'আহলুল বাইয়াতে'র[২৬] সমর্থকগণ কোন বিশেষ নামকরণ গ্রহণ করেননি। তারা বণী কেবল বণী হাশিম হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বণী ফাতিমা ও বণী আব্বাসের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না; তারা পরস্পর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলেন, মোয়াবিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পর মুহম্মদের বংশের অনুসারীরা নিজেদেরকে শিয়া বলে অভিহিত করতে শুরু করেছিল এবং তাদের শত্রুরা হয় 'নওয়াসিব' (বিদ্রোহী) নয় 'খাওয়ারিজী' (দলত্যাগকারী) অভিহিত হতে থাকে।[২৭] উমাইয়াগণ তাদেরকে 'আমওয়াই' (উমাইয়াদের সন্তান) বলে অভিহিত করত। তখন পর্যন্ত 'আহলুস্ সুন্নাত ওয়াল্ জামাত' সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত ছিল। মনসুর ও হারুনের শাসনাধীনে এই উপাধি প্রথম চালু হয়েছিল। দশম শতাব্দিতে আলী-পরিবারের একজন সদস্য আব্বাসীয়দের নিকট থেকে বলপূর্বক মিশর অধিকার করে এবং রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই রাজবংশ মিশর ও সিরিয়ার উপর সালাদিনের পূর্ব পর্যন্ত সময়াবধি শাসন করেছিল। যে অভিসম্পাত বাগদাদ ও কায়রোর খলিফা পরস্পরের প্রতি নিক্ষেপ করতেন, যে অসংখ্য জনশ্রুতি পরস্পরের দাবীকে নস্যাৎ করার জন্য আবিষ্কৃত হয়েছে এবং উভয় খলিফার মুফতিদের নিকট থেকে যেসব "ফাতওয়া' এসেছে তাতে উভয় দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘাত ও তিক্ততা বাড়িয়ে তুলত। সালাদিন মিশরের ফাতেমীয় বংশের মূলোৎপাটন করে প্রাচ্য আফ্রিকার সুন্নী মযহাবের প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। যা'হোক, বণী ফাতিমা গোত্রের বিভিন্ন শাখা দুটি মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বংশের প্রাধান্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।[২৮] সধিক ইমামদের অনুসারী 'ইসনা আশারিয়াগণ'[২৯] বল-প্রায়োগকে নিন্দা করতেন। মহান সাফায়ী নৃপতি 'ইসনা আশারিয়া মতবাদকে পারস্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করার পূর্ব পর্যন্ত তারা শুধু আধ্যাত্ম কর্তৃত্ব দাবী করতেন এবং পার্থিব আসক্তি থেকে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিলেন। মুহম্মদের বংশধর একজন দার্শনিক ও সুফী তিনি মুহম্মদের বংশধরদের প্রতি সহানুভূতি ও ভক্তির মধ্যে জাতীয় জাগরণ ও সংহতি দেখতে পেতেন। তখন থেকে ইসনা আশারিয়া মতবাদ পারস্যের জাতীয় ধর্মে পরিণত হয়।

দক্ষিণ ভারতের বাহমনী ও আদিলশাহী বংশ যাদেরকে আওরঙ্গজেব মূলোৎপাটন করেছিলেন এবং মারাঠা দস্যুদের অভ্যুত্থানের পথ করে দিয়েছিলেন যাদের বাহমনী

www.amarboi.org

নৃপতিগণ কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন, ইমামদের মতবাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ হল ফাতেমীয়দের রাজনৈতিক নিয়তি যা তাদের মতবাদসমূহের উপর প্রভাব মুদ্রিত করে দিয়েছে।

ইসলামের আধ্যাত্ম ও পার্থিব কর্তৃত্বে বণী আব্বাসদের অধিকার। বাইয়াৎ বা নামমাত্র নির্বাচনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাফ্‌ফার সিংহাসনারোহণের সময় থেকেই আব্বাসীয়দের খলিফাগণ তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁদের অভিপ্রেত উত্তরাধিকারীদের প্রতি রাজ্যের প্রধানদের আনুগত্য লাভের ব্যাপারে স্বাধীনতা অবলম্বন করতেন। আর নির্বাচন-নীতির ক্ষেত্রে নজীর ও প্রাচীন দৃষ্টান্ত থেকে বৈধতা ও পবিত্রতা ও মুদ্রিত করা অপরিহার্য হয়েছিল। মিশরে ফাতেমীয়দের অভ্যুত্থান এবং বাগদাদের খলিফার কাছ থেকে প্রাচ্যের রাজ্য বলপূর্বক অধিকারের নিরন্তর প্রয়াস, ফাতিমার বংশধরদের দাবী খণ্ডন করা এবং ইসলামের আধ্যাত্ম প্রধান হিসেবে আব্বাসীয় খলিফাদের স্বীকৃতিবিষয়ক গোঁড়া মতবাদের রূপ ও সামঞ্জস্য বিধান করা দ্বিগুণভাবে অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।[২৯]

আব্বাসীয় রাজবংশের অধিকারের সমর্থনে হাদিসের অনুসন্ধানে ইরাক ও হিজাজের প্রত্যেক জায়গা তছনছ করা হল। আইনের বিশেষজ্ঞদেরকে পরিষ্কার ভাষায় গোঁড়া মতবাদের মূল-নীতিসমূহ প্রণয়ন করতে হয়েছিল; আর ধীরে ধীরে আব্বাসীয় স্বার্থের সংকীর্ণ ভিত্তির উপর সুন্নী মযহাবের বৃহৎ সৌধ গড়ে উঠেছিল। যেসব পণ্ডিত ও আইনজ্ঞ সুন্নী মযহাবের জন্ম ও বিবর্তনে সাহায্য করেছিলেন তাদের সাফল্য এসেছিল বহুলাংশে। মিশরের ফাতেমীয়দের ম্যানেকীয় মতবাদের জন্য। তাদের মতবাদসমূহের প্রকৃতি শিয়া ও সুন্নী মুফতিদের শিক্ষার সঙ্গে প্রভেদাত্মক ছিল; হাসান সাব্বাহর ("পর্বতের বৃদ্ধ লোকটি") দৃষ্টান্তের অনুসরণে সেরা লোকদের নিধন, বেদাতের বিচ্ছিন্নতামূলক বৈশিষ্ট্য, যা প্রাচীন চ্যাল্ডীয়-মাজীবাদের প্রভাবে বিভিন্ন পন্থীদের মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল এবং যারা সব শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা বিরোধী ছিল—জনসাধারণের মতে এসব এমন একটি ব্যবস্থাকে শক্তি দিয়েছিল যা ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় দুর্গ গড়ে তুলেছিল। শিয়া ইমামগণ মানী ও মাজদাকদের নমুনাবিরোধী অপবিত্র বা কমিউনিষ্টিক মতবাদসমূহকে প্রবলভাবে নিন্দা করেছিলেন; ইচ্ছা থাকলেও বেদাত দমনের কিংবা একানুবর্তিতা প্রচলনের ক্ষমতা তাদের ছিল না। আব্বাসীয় খলিফাদের পার্থিব ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত সুন্নী বাদের যে উপায় ছিল এবং তা প্রয়োগ করেছিল। ফলে তারা জনগণের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করেছিল। এ সব লোক খেলাফতের উত্তরাধিকার সম্পর্কীয় বিমূর্ত প্রশ্নের বিরোধ নিয়ে কোনরূপ মাথা ঘামাত না।

আব্বাসিয়া বংশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বঅবধি 'আহলুল বাইয়াতে'র অধিকারের সমর্থক এবং জনগণের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব নেতা-নির্বাচনের অধিকারের সমর্থকদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য ছিল না। হিজাজ ও মদিনার অধিবাসীগণ যখন নির্বাচন-নীতির উপর জেদ ধরেছিল তখন উমাইয়াগণ তাদেরকে নির্মমভাবে ধ্বংস করেছিল। তারা ফাতিমার বংশধরদের প্রতি কৃত অন্যায়কে ঘৃণা করত। হুসাইনের শাহাদত বরণের পর

www.amarboi.org

ইসলামের অন্তর থেকে ভীতির চিৎকার নির্গত হয়েছিল এবং পবিত্র মক্কা ও মদিনার জনগণ অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল, আর সে কারণে তারা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। 'আহলুল বাইয়াতে'র সমর্থকগণ ও প্রথম তিনজন খলিফার অনুসারীবৃন্দ ধর্মের জন্য ভীতিপ্রদ নিষ্ঠুর অত্যাচারের শিকারে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু যখন দু'দলের বংশগত কারণে পার্থক্য অনিবার্য হয়ে পড়েছিল তখন উভয় দিকে পার্থক্যের উপাদানসমূহ হাতের কাছে এসে পড়েছিল। বর্তমানে তারা যে নমুনা ও পরিমাণগতভাবে পার্থক্য সংরক্ষণ করে চলেছে তার মতবাদগত ও আইনগত পার্থক্যসমূহ এই সময় থেকেই শুরু হয়েছিল।

মামুন ও তাঁর দু'জন অব্যবহিত উত্তরাধিকারীর সংস্কৃতিসম্পন্ন শাসনকালে মানবিক বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুশীলন সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের ধারণা প্রভাবিত করেছিল। তখন সুন্নী মযহাবের বিকাশে ছেদ পড়েছিল। এই সময় ছাড়া সমগ্র আব্বাসীয় খেলাফত[৩১] সুন্নী মযহাবের মতবাদসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্র একসঙ্গে যুক্ত হয়েছিল; খলিফা ছিলেন ইমাম—পার্থিব প্রধান ও আধ্যাত্মিক প্রধান। আইন ও ধর্মের বিশেষজ্ঞগণ ছিলেন তাঁর ভৃত্য। তিনি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতেন এবং তাদের সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রিত করতেন। এ কারণে সুন্নী মযহাব সংহত হয়েছিল। যে সব সম্প্রদায়ে[৩২] এই মযহাব প্রথমত বিভক্তি হয়েছিল তা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানেও এ চারটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত এবং বহু মত ও অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরস্পর পৃথক। তাদের এই পার্থক্য রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক, আর্মেনীয় ও সিরীয় গোঁড়া সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

পক্ষান্তরে শিয়াবাদ নির্দেশ করে কিভাবে ধর্ম ও রাষ্ট্র পরস্পর পৃথক হয়ে পড়েছে এবং কিভাবে "আইন ব্যাখ্যাতাগণ" কমপক্ষে একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে খ্রিস্টান জাহানের ধর্ম যাজকের কর্তৃত্ব ও মর্যাদা লাভ করেছে। যে বিচারবুদ্ধির স্বাধীনতা প্রোটেষ্ট্যান্টদের মধ্যে এক শত আশিটি সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছে তা শিয়াদের মধ্যে প্রায়ই একইরূপ ফলোৎপাদন করেছে। শিয়াবাদের মধ্যে মতপার্থক্য পার্থিব নিয়ামক শক্তি তরবারীর সাহায্যে একানুবর্তিতা-নীতি বলবৎকারী শক্তির অনুপস্থিতির জন্য।

এই সময় থেকে মুসলিম প্রজাতন্ত্রের ইমামত[৩৩] বা আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের প্রশ্নই দু'টি সম্প্রদায়ের প্রধান সমর-ক্ষেত্রে রূপ লাভ করে।[৩৪] শিয়ারা এই অভিমত পোষন করেন যে মুহম্মদ যে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার দিয়ে গিয়েছেন তা আলী ও তাঁর বংশধরদের উপর বর্তেছিল। তারা স্বাভাবিকভাবেই জনগণের নেতা নির্বাচনের অধিকার প্রত্যাখ্যান করেন, যারা হযরতের বংশধরদের ন্যায্য দাবীকে বাতিল করে। সুতরাং শিয়াদের মতে ইমামত ঐশী নিয়োগের মাধ্যমে হযরতের বংশধরদের মধ্য থেকে হয়ে থাকে। হযরতের বংশধর হওয়া ছাড়াও ইমামের আরও কতকগুলো গুণ অবশ্যই থাকতে হবে—তাকে অবশ্যই নিস্পাপ ও নির্ভেজাল চরিত্রের অধিকারী হতে হবে, আর সত্যনিষ্ঠা ও পবিত্রতার

www.amarboi.org

দিক দিয়ে তাকে সকলের চেয়ে বিশিষ্ট হতে হবে। তাঁরা যুক্তি দেখান যে এটা সঙ্গত নয় কিংবা এ আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়ও হতে পারে না যে, যে ব্যক্তির চরিত্র সন্দেহাতীত নয় তার পক্ষে মানুষের বিবেককে পরিচালিত করার ক্ষমতা নেই। মানুষের নির্বাচন যে অভ্রান্ত নয় তা মানবজাতির ইতিহাস প্রমাণ করেছে। মানুষ প্রায়ই মন্দতম ব্যক্তিকে তাদের নেতা মনোনীত করেছে। আল্লাহ্ মানুষের ধর্মীয় প্রয়োজনকে তার নিঃসহায় শক্তির কাছে কখনও ছেড়ে দিতে পারতেন না। যদি ইমামের প্রয়োজন হত তবে তিনি এমন ব্যক্তি হতেন যিনি অবশ্যই বিবেকের অনুমোদন লাভ করতেন। তদনুসারে তারা ঘোষণা করেন যে যদি ইমামের মনোনয়ন সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে তা যাবতীয় নৈতিক মূল্যবোধের বিপর্যয় ডেকে আনে। ফলে মানবজাতির আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শন ঐশীনিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রতি ন্যস্ত হয়েছে।[৩৫]

সুন্নীদের মতে ইমামত মুহম্মদের পরিবারেই সীমিত নয়। ইমামকে ন্যায়পরায়ন, ধার্মিক, নিষ্পাপ হতে হবে কিংবা তার কালের সর্বোৎকৃষ্ট বা প্রখ্যাত লোক হতে হবে এমন কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি স্বাধীন, বয়োপ্রাপ্ত, সুস্থ মস্তিষ্ক এবং রাষ্ট্রের সাধারণত কার্যাবলী পরিচালনায় সমর্থ, ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য। অন্য একটি মতবাদের বেলায় রোম ক্যাথলিকদের সঙ্গে তাদের মিল রয়েছে যা ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলে বহন করেছে। তারা এই অভিমত পোষণ করেন যে, পাপ বা অত্যাচার ইমামের পদচ্যুতি[৩৬] প্রতিপন্ন করে না, ইমামের দুর্নীতিপরায়ণতা বা মন্দ আচরণ কিংবা যারা ঐশী গণপ্রার্থনা পরিচালনা করেন তাদের দুর্নীতিপরায়ণতা বা মন্দ আচরণ বিশ্বাসীদের উপাসনা বাতিল করে না।[৩৭] তারা এই অভিমত পোষণ করেন যে ইমামত অবিভাজ্য এবং একই সময়ে দু'জন ইমামের অস্তিত্ব অবৈধ। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা যেমন একজন মাত্র পোপের আনুগত্য স্বীকার করতে পারে তেমনি মুসলিম জাহানও একজন বৈধ আইনানুগ খলিফার আনুগত্য স্বীকার করতে পারে। তিনজন পোপ যেমন প্রায়ই ত্রয়ী সম্রাট বলে প্রতারণা করেছে তেমনি তিন জন আমিরুল মু'মেনীন সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রতারণা করেছে। এশিয়ায় উমাইয়া রাজবংশের পতনের পর এই বংশের একজন সদস্য স্পেনে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সফলতা লাভ করেছিল, আর আব্বাসীয় বংশ তাইগ্রিস নদীর উভয় তীরে তাদের শাসন কায়েম রেখেছিল; ফাতেমীয়গণ নীলনদ-অধ্যুষিত এলাকায় সুলতান তা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। দুই বা তিন জন সুলতান একই সঙ্গে ইসলামের প্রধান হিসেবে ক্ষমতাসীন হয়েছেন—এই ঘটনা একটি মতের জন্ম দিয়েছে যে অবিভাজ্যতার নীতি একটি মাত্র দেশ এবং সেই একই দেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য, কিংবা পরস্পর সংলগ্ন দুটি দেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য; কিন্তু যখন দেশসমূহ এত দূরে অবস্থিত যে একেকজন ইমামের ক্ষমতা সম্প্রসারিত হতে পারে না, তখন দ্বিতীয় ইমাম নির্বাচন বৈধ। ইমাম সকল মুসলমানের পৃষ্ঠপোষক ও শাসক; এবং জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরও তাদের স্বার্থসংরক্ষণের অভিভাবক। মুসলমানদের অনুমোদনসাপেক্ষে তার উত্তরাধিকারী নির্বাচনের ক্ষমতা তার উপর ন্যস্ত। যেহেতু এই

www.amarboi.org

ক্ষমতা সমাজের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য, কাজেই মনোনয়ন জনগণের পছন্দের উপর নির্ভর করে।[৩৮]

এটা প্রত্যাশা করা গিয়েছিল যে নির্যাতন শিয়াদেরকে একতাবদ্ধ করবে। যদিও সকলে এই প্রশ্নে একমত যে ইসলামের সর্বোচ্চ ধর্মীয় ক্ষমতা খেলাফত হযরতের বংশধরদের মধ্যে সীমিত, অনেকেই পরিবারের স্বীকৃত প্রধানদেরকে পরিত্যাগ করে দুরভিসন্ধি বা পক্ষপাতবশত বংশের অন্যান্যদের প্রতি, যুক্ত হয়ে পড়েছে। যখন স্বীকৃত ইমামগণ ও তাদের শিষ্যবৃন্দ পবিত্র নির্জনতার জীবন যাপন করতেন তখন অন্যান্যরা বৈদেশিক কলহবিবাদের সুযোগ লাভ করত। তাঁরা প্রচার করতেন, বিচারবিতর্কে লিপ্ত হতেন, দুর্দশা ভোগ করতেন।

শাহ্‌রিস্তানী শিয়াদের পাঁচটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছেন; যেমন 'জায়েদিয়া', 'ইসমাইলিয়া', 'ইসনা আশারিয়া বা ইমামিয়া'। কায়সানিয়া এবং 'গালিয়া বা গুল্লাত'। বাস্তবিকপক্ষে, আমরা পরে দেখতে পাব যে কতিপয় সম্প্রদায় বিশেষভাবে তারা যে সব শাখায় বিভক্ত সেগুলির আলীর প্রতি অনুরাগের কমবেশী ছাড়া প্রকৃত শিয়া মতবাদের সঙ্গে কোন ঐক্য নেই। পক্ষান্তরে, এসব সম্প্রদায় ইসলামী উৎস ছাড়া অন্য উৎস থেকে জাত।

শাহ্‌রিস্তানী বলেন যে জায়েদিয়ারা হুসাইনের পুত্র জয়নুল আবেদীন বা দ্বিতীয় আলীর পুত্র জায়েদের অনুসারী। তারা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে ইমামত আলী থেকে প্রথম হাসানে পরে হুসাইনে বর্তেছিল, হুসাইন থেকে এ দ্বিতীয় আলী (জয়নুল আবেদীনে) এবং তাঁর থেকে এ জায়েদে বর্তেছিল—মুহম্মদ আল্ বকিরে নয়, যেমন 'ইসনা আশারিয়া' সম্প্রদায় ও অধিকাংশ মুসলমানেরা মনে করেন। তাদের মতামত 'আহ্‌লে সুন্নাত' জামাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। তারা এই অভিমত পোষণ করেন যে হযরতের বংশধরদের ভেতর থেকে আধ্যাত্মিক প্রধান নির্বাচনের ক্ষমতা জনগণের আছে। তারা নির্বাচন নীতির সঙ্গে ইমামত হযরতের বংশধরদের মধ্যে সীমিত—এই নীতির সংমিশ্রণ ঘটান। তারা আরও জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে সর্বোৎকৃষ্ট লোক থাকতেও অপেক্ষাকৃত কম উৎকৃষ্ট লোক নির্বাচন করা বৈধ। এই মতের ফলশ্রুতি হিসেবে তারা প্রথম তিন খলিফার বৈধতা স্বীকার করেছিলেন, যাদের খেলাফতের ব্যাপারটি অন্যান্য শিয়ারা অস্বীকার করেছিল তাদের মতে, যদিও আলী হযরতের সাহাবাদের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ছিলেন। হযরতের বংশধর হিসেবে ও গুণাবলীর অধিকারী হিসেবে ইমামতের উপযুক্ত ছিলেন, তথাপি নীতির খাতিরে এবং হযরতের ওফাতের পর যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তা প্রশমিত করতে, জনগণের মনের স্থৈর্য্য আনতে এবং গোত্র-সমূহের বিভেদসমূহ নিরসনে একজন পরিণত বয়সের লোককে খলিফার পদে বরণ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এছাড়া, ধর্মের সংরক্ষণে আলী যে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন তাতে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল তাদের মধ্যে প্রতিহিংসা গ্রহণের ইচ্ছা প্রবল ছিল এবং যারা সম্প্রতি অধীনতাপাশে আবদ্ধ

www.amarboi.org

হয়ে পড়েছিল; এসব লোক আলীর মহত্ত্বের নিকট স্বেচ্ছায় নতি স্বীকার করেনি। তারা মনে করেন যে একই নীতি ওমরের নির্বাচনের ক্ষেত্রেও কার্যকরী হয়েছে।[৩৯] প্রথম দু'জন খলিফার ইমামতের স্বীকৃতির জন্য অন্যান্য শিয়ারা তাদেরকে 'রওয়াফিয' বা ভিন্নপন্থী নামে অভিহিত করেন। তাদের আর একটি মতবাদ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। তারা যৌক্তিকতা দেখান যে ধর্মনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, জ্ঞান ও পাপশূন্যতা—যে গুণগুলি শিয়ারা খলিফা পদের জন্য সঙ্গত মনে করেন—এ গুণগুলি ছাড়া ইমামের সাহসিকতা ও অস্ত্রবলে ইমামতে তার অধিকার ঘোষণার শক্তি থাকা চাই। ইমাম মুহম্মদ আলী বকির, যিনি তাঁর পিতা দ্বিতীয় আলীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে প্রতিপন্ন করেছিলেন যে বলপ্রয়োগ নিন্দনীয়। এ ব্যাপারে জায়েদ তার ভাই থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তিনি উমাইয়া খলিফা হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের রাজত্বকালে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিলেন এবং কুফার নিকটবর্তী স্থানে নিহত হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ইয়াহ্ইয়া তাঁর উত্তরাধিকারী হন এবং তদীয় পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। তিনি ইমাম জাফর আস্ সাদিকের পরামর্শ সত্ত্বেও অস্ত্রের সাহায্যে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রসর হন। তিনি খোরাসানে তাঁর সমর্থকদেরকে একত্রিত করেছিলেন। কিন্তু হিশামের একজন সেনাধ্যক্ষ কর্তৃক তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

জায়েদিয়ারা বলেন, ইয়াহিয়ার মৃত্যুর পর ইমামত পরিবারের অপর সদস্য মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্, উপনাম 'আন্‌নাফস-উস্ জাকিয়া' ("পবিত্র আত্মা)-এর উপর বর্তেছিল। মুহম্মদ 'মাহদী' উপাধি ধারণ করে আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের বিরুদ্ধে হিযাযে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি মনসুরের ভাগিনেয় ঈশা কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। ইবরাহিম তাঁর ভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হন এবং আব্বাসীয় খলিফাদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ সংগ্রামে একইভাবে প্রাণ হারান। তাঁর উপর এক ভাই ঈসা বলপ্রয়োগে তাঁর অধিকার দাবী করলে মনসুর তাঁকে বন্দী করেন ও আজীবন কারারুদ্ধ করে রাখেন। এসব ঘটনা বর্ণনা করার পর শাহ্‌রিস্তানী আরও বলেন,"তাঁদের ভাগ্যে যা যা ঘটেছিল সে সম্পর্কে জাফর আস্ সাদিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে পার্থিব রাজত্ব তাঁদের পরিবারের জন্য নয়, ইমামত আব্বাসীয়দের হাতের ক্রীড়নক হবে।"

জায়েদিয়া সম্প্রদায়ের একটি শাখার মতে ইমামত ইবরাহিম থেকে ইদরিসে বর্তেছিল। ইদরিস মাওরিতানিয়ার ইদরিসীয় বংশের এবং ফেজ শহরের প্রতিষ্ঠাতা ইদরিসীয়দের পতনের পর জায়েদিয়া সম্প্রদায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তবে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও এই সম্প্রদায়ের লোক দেখতে পাওয়া যায়। জায়েদিয়াদের একটি শাখা দীর্ঘকাল ধরে তাবারিস্তানে শাসন কাজ চালিয়েছিল। এখনও উত্তর ইয়েমেনে জায়েদীয় ইমাম বর্তমান। শাহ্‌রিস্তানীর মতে জায়েদিয়া সম্প্রদায় চারটি শাখায় বিভক্ত; যেমন, জারুদিয়া, সোলায়মানিয়া, তাবারিয়া ও সালেহিয়া জায়েদের পৌত্র থেকে ইমামতের সংক্রমণ সম্পর্কে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। জারুদিয়াগণ ঈশার ব্যাপারটি চেপে রেখে মুহম্মদ নাফসুস্ জাকিয়া'র দাবী সমর্থন ক'রেছিলেন। তারা

www.amarboi.org

মনসুরের শাসনাধীনে নিদারুণভাবে দুদর্শা ভোগ করেছিলেন। সোলায়মানিয়া শাখা, প্রতিষ্ঠাতা সোলায়মান ইবনে জরিসের নামানুসারে অভিহিত। তিনি ঘোষণা করেন যে ইমামত জনগণের রায়ের উপর নির্ভরশীল। ধর্মপরিচালনা, উপাস্য ও তাঁর একত্বের জ্ঞান এবং যেসব নিয়ম তিনি সরকার পরিচালনার জন্য তৈরী করেছেন সেসব ইমামতের জন্য অভিপ্রেত নয়। কারণ এসব প্রজ্ঞার মাধ্যমে অর্জিত। ইমামত অন্যায়কারীর উপর শাস্তিবিধানকারী, ন্যায়বিচার নিশ্চিতকারী ও রাষ্ট্রের সংরক্ষক পার্থিব সরকারের জন্য অভিপ্রেত। ইমামকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হতে হবে এমন নয়।..." "আহলুস্ সুন্নাতে'র একটি শাখা অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন, কারণ তারা বলেন যে ইমামের পক্ষে বিদ্বান বা গবেষক—'মজতাহিজ' হতে হবে, তার প্রয়োজনীয়তা নেই, যখন তিনি জ্ঞানী এবং তার সঙ্গে এমন ব্যক্তি আছেন যিনি আইন ব্যাখ্যা করতে পারেন।[৪০] 'সোলায়মানিয়া' ও সালেহিয়া' শাখাদ্বয় প্রথম দু'জন খলিফার স্বীকৃতির ব্যাপারে একমত; সালেহিয়া শাখাভুক্ত লোকেরা এই মত পোষণ করেন যে আলী আবু বকর ওমরের অনুকূলে তাঁর নিজস্ব দাবী প্রত্যাহার করায় জনগণের পক্ষে তাঁদের ইমামত সম্পর্কে প্রশ্ন করার কিছুই ছিল না। কিন্তু ওসমান সম্পর্কে তারা সন্দিগ্ধ ছিল; তাঁরা বলেন, "যখন আমরা দেখি কিভাবে বণী উমাইয়াদের সমর্থনে তিনি প্রাণান্ত পরিশ্রম করছেন তখন বুঝি তাঁর চরিত্র অন্যান্য সাহাবাদের থেকে স্বতন্ত্র"।

'ইসমাইলিয়া' (কোন কোন সময় 'সাবিয়ুন'[৪১] বলে কথিত) ইমাম জাফর আস্ সাদিকের এক পুত্র, ইসমাইল থেকে উদ্ভুত। তিনি তাঁর পিতার পূর্বে ইহলীলা সংবরণ করেন। তারা মনে করেন যে ইমাম জাফর আস্ সাদিকের মৃত্যুর পর ইমামত ইসমাইলের পুত্র, মুহম্মদ (উপনাম আল্ মাকতুম[৪২] গুপ্ত অপ্রকাশিত)-র উপর বর্তায়, জাফরের পুত্র মুসা আল্ কাজিমের উপর নয়, যেমন ইমনা আশারিয়া এবং সাধারণভাবে অন্যান্য মুসলমানেরা বিশ্বাস করেন। ইসমাইলিয়াদের মতে, জাফর আল মুসাদ্দিক মুহম্মদ 'আল্ মাখতুমের' স্থলাভিষিক্ত হন, তাঁর পুত্র মুহম্মদ 'আল্হাবিব' গুপ্ত ইমামদের শেষ সদস্য।

তদীয় পুত্র আবু মুহম্মদ আব্দুল্লাহ্ ফাতেমীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা এই বংশ তিন শ' বছর ধরে উত্তর আফ্রিকা শাসন করেন। আব্বাসীয় খলিফা, মুতাজিদ বিল্লাহ সাফফাহ-২ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। সেগেলমেসের কারাগার থেকে পালিয়ে তিনি বারবেরিতে উপস্থিত হয়ে "ওবায়দুল্লাহ"ও "মাহদী" (অঙ্গীকৃত পদপ্রদর্শক) উপাধি ধারণ করেন সর্বদিক থেকে শিষ্যগণ তাঁর চারপাশে সমবেত হয়েছিল এবং একজন সুফীর সহায়তায় তিনি আগলাবাইদদের উৎখাত করেন, যারা তখন বাগদাদের খলিফা নামে আফ্রিকার প্রদেশসমূহ শাসন করছিল। তিনি মৌরতানিয়া থেকে মিশরের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর একজন উত্তরাধিকারী (মাদ আবু তেসিম), আল্ মুয়িযলি দীন-ইল্লাহ (আল্লাহর দীনের সমুন্নতকারী) আব্বাসীয়দের থেকে মিশর ও সিরিয়ার একাংশ বলপূর্বক দখল করে নিয়েছিল। মুয়িয শত্রুদের উপর তাঁর বংশের

www.amarboi.org

বিজয়ের প্রতীক হিসেবে কায়রো নগরীর (কাহিরা, বিজয়ী শহর) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ওবায়দুল্লাহ্ আল্ মাহদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কায়রোর নিকটবর্তী মাহদিয়ে থেকে নতুন নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। এই সময়ে সমগ্র উত্তর আফিকা ছাড়াও সারদিনিয়া ও সিসিলি দ্বীপগুলি তাঁর রাজ্যসীমার অন্তর্ভূক্ত হয়েছিল। তিনি কায়রো নগরীতে 'আল আযহার' মসজিদ (অত্যুজ্জ্বল মসজিদ), একটি বিরাট সাধারণ গ্রন্থাগার, বেশ কয়েকটি কলেজ নির্মাণ করে সুসজ্জিত করেছিলেন। এসব কলেজে শিক্ষার্থীগণ ব্যাকরণ, সাহিত্য, কোরআনের ব্যাখ্যা, আইনবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত ও ইতিহাসে পাঠ গ্রহণ করত। ঐতিহাসিক বলেন, "তাঁর রাজত্বের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল ন্যায়-বিচার ও সংযম।"[৪৩]

মিশরীয় ফাতেমীয়দের সম্পর্কে আমরা যে সব বিবরণ পেয়েছি তাদের প্রত্যেকটি বিরোধী উৎস থেকে পাওয়া গেছে। মুয়িযের সেনাধ্যক্ষ, জৌহর বাগদাদের খলিফার নিকট থেকে মিশর ও সিরিয়া অধিকার করার পর থেকেই দুই খলিফার মধ্যে উপাধির বৈধতা নিয়ে নিরন্তর সংঘর্ষ চলেছিল। মুহম্মদের বংশধর হিসেবে ফাতেমীয়দের দাবী জনগণের সমর্থন অর্জনে সক্ষম হয়েছিল, আর এই ব্যাপারটি আব্বাসীয়দের তাদের প্রতিপক্ষের বংশলতিকার যাথার্থ বিনাশের জন্য উদ্দীপিত করেছিল এবং তাদের গৃহীত মতবাদসমূহকে ইসলাম-বিরোধী বলে জগৎ সমক্ষে তুলে ধরেছিল। কাদির বিল্লাহর রাজত্বকালে সন্ত্রস্ত খলিফার অনুরোধে বাগদাদে আইন বিশারদদের একটি গোপন সম্মেলন বসেছিল ফাতেমীয়দের নিন্দনীয় করার জন্য যে তারা ফাতিমার প্রকৃত বংশধর নয়। ফাতেমীয়গণও প্রতিপক্ষের শক্তিশালী প্রতি-উত্তর দিয়েছিলেন কায়রোর নেতৃস্থানীয় আইনবিদদের, যাদের মধ্যে বহু মালেকী ও শাফেয়ী ছিলেন, স্বাক্ষরিত অভিসম্পাত পত্র পাঠিয়ে। যাহোক আব্বাসীয় বিশেষজ্ঞ কর্তৃক তাদের বৈধতার উপর আরোপিত সত্ত্বেও মাকরিজী, ইবনে খালদুন ও আবুল ফেদার মত বড় বড় ঐতিহাসিকও ফাতেমীয়দের দাবী সমর্থন করেছেন।

মাকরিজী বিষয়টির উপর অত্যন্ত খোলাখুলি মন্তব্য করেছেন এবং বণী আব্বাসদের সমর্থকদের মিথ্যাভাষন ও জালিয়াতির অভিযোগ করেছেন ওবায়দুল্লাহ আল্ মাহদী মুহম্মদের বংশধর নয়— আব্বাসীয়দের এই উক্তি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "তথ্যের কিছুটা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে উক্তিটি বানোয়াট। সে সময়ে আবুতালিবের পুত্র আলীর বংশধরগণ অসংখ্য এবং শিয়াগণ তাদের অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। তাহলে সেটা কি যা তাদের সমর্থকদেরকে বংশধরদের পরিত্যাগ করে তাদের পরিবর্তে ইহুদী বংশোদ্ভূত মাজী-সন্তানকে ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দিতে প্ররোচিত করত? সম্পূর্ণরূপে কাণ্ডজ্ঞান ছাড়া কোন ব্যক্তি এরূপ করত না, ওবায়দুল্লাহ আল্ মাহদী বংশগতভাবে ইহুদী বা মাজী—এই বিবরণ দুর্বলচেতা, আব্বাসীয় যুবরাজদের কৌশল। তারা জানত না কিভাবে ফাতেমীয় প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। তাদের রাজত্ব অবাধে ২৭০ বছর কাল স্থায়ী হয়েছিল এবং তারা আফ্রিকা, মিশর, সিরিয়া দিয়ারবকত,

www.amarboi.org

(মক্কা ও মদিনার) পবিত্র শহরদ্বয় এবং ইয়েমেনের আব্বাসীয় রাজ্যসমূহ লুণ্ঠন করত। চল্লিশ সপ্তাহ ধরে বাগদাদে তাদের নামে 'খুতবা' পাঠও করা হত। আব্বাসীয় সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হতে পারত না। জনগণের মনে ফাতেমীয়দের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা জন্মাতে পারত না বলেই তারা ফাতেমীয়দের বংশগতি সম্পর্কে নিন্দাবাদ প্রচার করত। আব্বাসীয় কর্মচারী ও আমিরগণ ফাতেমীয়দের সঙ্গে সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারত না তাই প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য ব্যঙ্গবিদ্রূপের আশ্রয় গ্রহণ করত। কাযীগণ কাদির বিল্লার অধীনে সম্মেলনের কার্যসূচীর প্রত্যায়ন করতেন। তারা খলিফার হুকুমে এবং জনশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করতেন। তখন থেকে ঐতিহাসিকগণ উদাসীন ভাবে ও নির্বিচারে আব্বাসীয়দের উদ্ভাসিত নিন্দাবাদের প্রচার চালাতেন "প্রাচ্যবিদদের মধ্যে সমালোচনাধর্মী ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট আইনজীবী হিসেবে প্রখ্যাত মনীষীর উক্তির চেয়ে স্পষ্টতর কিছুই হতে পারে না।[৪৪]

সম্ভবতঃ মিশরীয় ফাতেমীয়দের স্বীকৃত মতবাদসমূহ একইভাবে মিথ্যা প্রতিবেদনের অধীন। এতদসত্ত্বেও এ বিষয়ে সন্দেহ নেই বললে চলে যে, তারা বহুলাংশে আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুনের (উপনাম 'কাদ্দা') গুহ্য মতবাদসমূহ গ্রহণ করেছিলেন। আর রাজনৈতিক প্রচারের জন্য তাঁর দীক্ষার মাত্রার সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

খ্রিস্টান-জগতের সার্বভৌম ক্ষমতার জন্য পোপ ও সম্রাটদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম, আনুষঙ্গিক দুর্দশাসহ ত্রিশ বছরের যুদ্ধ, হুগ নটদের ওপর নির্যাতন যাতে বংশগত উচ্চাভিলাষ ও ধর্মান্ধতা সমান গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছিল—এসব পার্থিব ক্ষমতার লোভ থেকে যেসব অনিষ্ট উৎসারিত হয়েছিল সে সম্পর্কে আমাদের কিছু কিছু ধারণা দান করে। ইসলামেও একই ঘটনা ঘটেছে। আব্বাসীয় ও উমাইয়াদের মধ্যে এবং আব্বাসীয় ও ফাতেমীয়দের মধ্যে যেসব যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল, সে সবও একইরূপ দুর্ভাগ্যজনক ফলোৎপাদন করেছিল।

প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের প্রাচ্য প্রদেশসমূহ এ সময়ে বিভিন্ন ধরনের হিতকর মনোভাবের আবাসভূমি ছিল। এখানে ইসলামী জীবন-প্রবাহের পূর্বে শুধু মাজো-জরথুস্ত্রবাদেরই আগমন ঘটেনি, জন্মান্তরবাদ বিষ্ণুর অবতারত্ব এবং স্বর্গ থেকে শ্রীকৃষ্ণের অবতরণ ও 'গোপীদের' সঙ্গে তাঁর সহজ ও অবাধ মেলামেশার ধারনাসহ বিভিন্ন ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের আগমন ঘটেছে। পরবর্তীসাসানিয়া সম্রাটদের আমলে বিপ্লবাত্মক অভিমত ও ধর্মবিপ্লব মন্দির ও প্রাসাদ উভয়কে কম্পিত করেছিল; তরবারী ও অগ্নিসংযোগের সাহায্যে কেসূরা আনাওশিরওয়ান যা নির্মূল করবার প্রয়াস পেয়েছিলেন তা সব নির্যাতন সত্ত্বেও টিকে ছিল। অন্ততঃপক্ষে বিভিন্ন আকারে ও আকৃতিতে ইসলামে পুনরার্বিভাবের জন্য তারা যথেষ্ট প্রাণশক্তি বজায় রেখেছিল।

আত্মার দেহান্তরবাদের সমর্থক, একটি ইন্দো-মাজী সম্প্রদায় 'রায়েন দি' ও কুখ্যাত মুকান্না[৪৫] হাকিম বিন হাশিম প্রতিষ্ঠিত 'সাফিদযামাগণ'[৪৬], এরা খোরাসানে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল এবং খলিফা মাহদী তাদের দমন করেন। মুকান্না শিক্ষা দিতেন যে

www.amarboi.org

আল্লাহ্ মানুষের আকার ধারণ করেছেন যখন তিনি প্রথম মানুষকে সেজদা করার জন্য ফিরিশতাদেরকে হুকুম করেছিলেন। তখন থেকে ঐশী প্রকৃতি একজন প্রেরিতপুরুষ থেকে অন্য একজন প্রেরিত পুরুষের বর্তাতে বর্তাতে তার মধ্যে এসে হাজির হয়েছে।[৪৭]

একই সময়ে, মাযদাকবাদ সাধারণ অগ্নিসংযোগে খসরুর সাম্রাজ্যকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল এবং মহান আনওশিরওয়ান কর্তৃক নির্মমভাবে পদদলিত হয়েছিল তাই আবার খলিফাদের শাসনামলে মাথা চাড়া দিয়েছিল। সর্প শুধু অর্ধমৃত হয়েছিল। বাবেক, উপনাম খুর্রামি (তার জন্মস্থান খুর্রাম থেকে) তার আদর্শ মাযদাকের মতো একইরূপ ধ্বংসাত্মক মতবাদসমূহ প্রচার করেছিলেন—নারী সমাজ ও দ্রব্যসম্ভার, এবং যাবতীয় মনুষ্য কর্মের প্রতি ঔদাসীন্য। মাত্র বিশ বছরের সময়সীমার মধ্যে তিনি সমগ্র খেলাফতকে হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংস দ্বারা পরিপূর্ণ করেন এবং অবশেষে মুতাসিম বিল্লাহর শাসনকালে তিনি উৎখাত হন ও খলিফার সম্মুখে নিহত হন। এটা পুরাতন গল্পের পুনরাবৃত্তি। ইসলামকেও খ্রিস্টধর্মের মতো একই নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের শুরু থেকে নবম শতাব্দীর শেষ অবধি খ্রিস্টধর্মের সঙ্গে প্রাচীন ধর্মমতের সংঘাত চলেছিল, যা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক বিশাল জনপদে আবির্ভূত হচ্ছিল যেখানে যীশুর ধর্ম প্রকাশ্যে ব্যক্ত হয়েছিল। এই সংগ্রাম শেষ হওয়ার পর খ্রিস্টান-জগতে নেমে এসেছিল এক সাংঘাতিক কালো যবনিকা ; গোঁড়া মতবাদ শুধু বিপ্লবী মোনাটনিষ্টদের ম্যানিকীয় পলিশিয়ানদেরকে ধ্বংস করতে সমর্থ হয়নি পরন্তু বুদ্ধিবাদী এরিয়ানদেরকেও ধ্বংস করতে সফল হয়েছিল। পুরোহিততন্ত্র ও গোঁড়া মতবাদ—পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য শব্দ—সংস্কার আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত মানুষের চিন্তাকে বন্দী করে রেখেছিল। ইসলামকে একই পরীক্ষার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। কিন্তু তার সংস্কার আন্দোলন সবে মাত্র শুরু হচ্ছে।

ইসলাম তার অনুসারীদের কাছ থেকে এক চিরন্তন সত্যের সহজ স্বীকৃতি এবং কতিপয় নৈতিক কর্তব্যের অনুশীলন দাবী করেছিল। অন্যান্য দিক দিয়ে ইসলাম তাদেরকে দিয়েছিল বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের ব্যাপকতম স্বাধীনতা। ঐশী একত্ববাদের নামে এই ধর্ম সকল ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের কাছে তুলে ধরেছিল গণতান্ত্রিক সাম্যের অঙ্গীকার। স্বাভাবিকভাবেই প্রত্যেক ধর্মের নির্যাতীত বিরুদ্ধবাদীরা হযরতের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন, যিনি পুরোহিততন্ত্রের অক্টোপাশ থেকে মানুষের বিচারবুদ্ধির মুক্তি দিয়েছিলেন। "আবেস্তা ধর্মশাস্ত্রবিদ", জরথুস্ত্রবাদী স্বাধীন চিন্তাবিদ, ম্যানিকিয়াস, খ্রিস্টান, ইহুদী ও মাজী—সকলেই নতুন জীবনব্যবস্থার আবির্ভাবকে খোশ আমদেদ জানিয়েছিল, যা ধর্মীয় ঐক্যের স্বপ্ন সার্থক করে তুলেছিল। যে সব নষ্টিক সম্প্রদায় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত যীশুর ধর্মকে বিপর্যস্ত করে রেখেছিল, তারা হয় মুহম্মদের ধর্মের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, না হয় তারা খলিফার বিশাল সহিষ্ণু শাসনের অধীনে গোঁড়া গ্রীক বা ক্যাথলিকদের দ্বারা উৎপীড়িত না হয়ে শান্তিতে বসবাস করেছিল। প্রথমোক্ত দল, যারা মুহম্মদের ধর্ম অবলম্বন করেছিল তারা তাদের আদিম ধারণাসমূহ

www.amarboi.org

সংরক্ষণ করেছিল এবং ইসলামে ডোমেটিক সম্প্রদায়ের (যারা যীশুর দৈহিক রূপকে সাদৃশ্য মনে করত) জন্ম দিয়েছিল। তাদের সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

কোন জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ, তারা যে জলবায়ুর মধ্যে অস্তিত্ব বজায় রাখে, দেশটির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যার মধ্যে তারা বাস করে, প্রাচীন ধর্মমতসমূহের প্রভাব—এসব তাদের ধর্মবিশ্বাস ও মতবাদসমূহকে রূপ দেয় ও রঞ্জিত করে তোলে। খ্রিস্টান জগৎ ও ইসলাম জাহান উভয় সম্পর্কে এটা প্রযোজ্য। ইরান অজ্ঞেয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল; সেখান থেকে জেসেটিক ধারণা উৎসারিত হয়ে রোমান-জগতে প্রবেশ করেছিল এবং তা ইহুদীয় খ্রিস্টানদের আদিম বিশ্বাসের উপর ঐশীত্বের ধারণা মুদ্রিত করে দিয়েছিল যা খ্রিস্টানরা বিশ্বমানবের নিকট প্রচার করেছিল। ম্যানিকীয়বাদ কল্পনা ও দর্শনের বিস্ময়কর সংমিশ্রণ এখানে খ্রিস্টধর্মের ঋণ প্রভূত, কিন্তু স্বীকৃতি নেই বললেই চলে; এই মতবাদ জরথুস্ত্রবাদী ও খ্রীস্টানদের নির্যাতন সত্ত্বেও টিকে ছিল, মরেনি। অদ্ভুত প্রতিভার সন্ততি, একটি জাতির চরিত্রের অভিব্যক্তি তা কি কখনও মরে যেতে পারে? ধর্মতত্ত্ব বিদেরা চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু তাকে কখনো নিধন করতে পারেন না। সুন্নী মযহাবের জনকদের রুগ্নতা ইরানে কল্পনাবিলাসী দর্শনের জন্ম দিয়েছিল। হযরত আলীর ব্যক্তিত্ব ম্যানিকীয়বাদের কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। জনগণের মধ্যে এ জেসেটিক যীশুর স্থান দখল করেছিল। ঐশীত্বের প্রক্রিয়া আলীতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর সঙ্গে তাঁর উত্তরাধিকারীদের প্রতিও ঐশীত্ব আরোপিত হয়েছিল। সুন্নীদের ন্যায় শিয়াবাদেরও দুটি দিক রয়েছে। একটি ছিল মুহম্মদের অব্যবহিত বংশধরদের বিশুদ্ধ, সরল শিয়াবাদ—এ সম্পর্কে আমরা শীঘ্রই আলোচনা করব। অপরটি হল ডসেটিক শিয়াবাদ যা যে জনগণের মধ্যে এ প্রচারিত হয়েছিল তাদের আদিম বিশ্বাস অনুযায়ী কল্পিত ও সংক্রমিত। চরমভাবাপন্ন শিয়াবাদ ডসেটিক শিয়াবাদ থেকে পৃথক যেমন চরমভাবাপন্ন সুন্নীবাদ বা 'নওয়া সিববাদ' ডসেটিক শিয়াবাদ থেকে পৃথক। সংকীর্ণমনা একচেটিয়া ভাব কোন কোন ধর্মবিশ্বাস বা ধর্মমতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয় কিংবা আথানাস্টীয় ধর্মমতের ভীতিপ্রদর্শন শুধু খ্রিস্টধর্মের মধ্যেই সীমিত নয়। ইসলামেও (কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া বলা যেতে পারে) প্রত্যেক সম্প্রদায় নিন্দা করে যে পরলোকে অন্য সম্প্রদায়ের শাস্তি হবে তবে তা চিরকালের জন্য নয় (যেমন গোঁড়া খ্রিস্টধর্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে থাকেন)—তা পর্যাপ্ত পরিমাণে দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে যাতে তারা তাদের বিভিন্ন ধর্মভাবের কুফল অনুভব করতে পারবে। বিরোধী দলসমূহের মধ্যে পরস্পর একের বিরুদ্ধে অন্যের নরকাগ্নি ও গন্ধক নিক্ষেপের অভিসম্পাত সত্ত্বেও দার্শনিক শিক্ষার্থী ইসলামের সার্বজনীনতা নিরীক্ষণ করতে অসমর্থ হবে না।

সপ্তম শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে কনস্টানটাইন সিলভ্যানাস পল সমর্থকদের ম্যানিকীয় সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; তারা সেন্ট পলের নামানুসারে তাদের সম্প্রদায়ের নামকরণ করেছিলেন এবং পলের শিষ্য হিসেবে নিজেদের প্রচার করতেন। পলসমর্থকরা ম্যানিকীয় উপাধি অস্বীকার করেন, কিন্তু তাদের মতবাদসমূহ ম্যানীর

www.amarboi.org

শিক্ষাসমূহের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ছিল। মিলনার ব্যতীত সমুদয় খ্রিস্টান লেখকগণ ম্যানিকীয়বাদ থেকে তাদের উৎপত্তি বলে মনে করেন। পল-সমর্থকগণ ইউরোপের সংস্কারমূলক ধর্মের প্রকৃত জন্মদাতা। প্রতিমূর্তি ও ধ্বংসাবশেষের প্রতি তাদের ঘৃণা সম্ভবত ইসলামী প্রভাবের প্রতিফলন। কুমারী মেরীর অসংযত উপাসনা ও সাধু-আরাধনার প্রতি বিতৃষ্ণার এবং উপাসনার যাবতীয় দৃশ্যমান বস্তু পরিত্যাগের ক্ষেত্রে মুসলমানদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। তারা ম্যানীর মতো বিশ্বাস করতেন যে, যীশুখ্রিস্ট বিশুদ্ধ আত্মা—পৃথিবীতে যা শুধু দেহের সাদৃশ্য ধারণ করেছিল এবং তাঁর ক্রুশে বিদ্ধ হওয়া একটা ভ্রান্তিমাত্র। তারা জড়ের নিত্যতা সমর্থন করতেন—এক সক্রিয় সত্তার দ্বিতীয় নীতির উৎস, যিনি দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করেছেন এবং পাপ ও মৃত্যুর চূড়ান্ত পরিণতি অবধি পার্থিব রাজত্ব শাসন করবেন। খ্রিস্টানদের সুসমাচার ব্যাখ্যায় তারা উপমা-রূপকের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং ম্যানীর ন্যায় শব্দার্থের নিগূঢ় অর্থের অন্তঃদৃষ্টি দাবী করেছিলেন। অন্য একটি ধর্মমতের বাহ্য ও সুবিধাজনক স্বীকৃতি, যে মতবাদ আধুনিক পারস্যে 'কেত্‌মান' বা 'তাকিয়ে'[৪৮] হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তা প্রশংসাই বলে বিবেচনা করা হত।

গ্রীক গির্জা বাইজান্টাইন আদালত পলের অনুসারীদের উপর চরম নির্যাতন চালিয়েছিল। প্রায় দু'শ বছর ধরে তারা উত্তর আর্মেনিয়া ও কাপ্পাডোসিয়ায় ধর্মান্ধ ও বাইজান্টিয়ামের অত্যাচারী শাসকদের সঙ্গে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছিল; উভয় পক্ষই সর্বাপেক্ষা বিভীষিকাপূর্ণ জুলুম চালিয়েছিল।[৪৯] অবশেষে তারা উচ্চতর শক্তির নিকট পরাভূত হয়। যদিও তাদের দুর্গ ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছিল, এবং তাদের শহরসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়েছিল, তথাপি একটি সম্প্রদায় হিসেবে তারা টিকে ছিল। তারা মতবাদসমূহ বুলগেরীয়দের কাছে সংক্রমিত করেছিল, আর বুলগেরীয়গণ সব সময়ের গোঁড়া ধর্মমতের অসন্তুষ্টি অর্জন করেছিল। পলের অনুসারীরা এশিয়াতে নির্মূল হওয়ার পর চতুর্দশ শতকে সাউথ প্রভেন্স ও সেভয়তে আবির্ভূত হয়েছিল। ঐসব দেশে তাদের যে নির্মম পরিণতি হয়েছিল তা ইউরোপীয় ইতিহাসের পাঠকের নিকট জ্ঞাত। অগ্নিদগ্ধ করে ও তরবারীর সাহায্যে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল—এমন কি স্ত্রীলোক ও শিশু ধ্বংসের হাত থেকে নিস্তার পায়নি, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা নির্মম নিয়তি এড়াতে সমর্থ হয়েছিল তাদেরকে দাসে পরিণত করা হয়েছিল। কিন্তু পলের অনুসারীরা মরেনি; ইংল্যান্ডেও একই ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে লোলার্ড নামে পলের শিষ্যগণ এশিয়া, সেভয় ও প্রভেন্সে তাদের পূর্বসূরীদের মতো দুর্দশা ভোগ করেছিল, হাসের নেতৃত্বে তারা আবার বোহেমিয়ায় পুনরাবির্ভূত হয়েছিল; পরিশেষে তারা লুথার ও কেলভিনের নেতৃত্বে তাদের গোঁড়া নির্যাতনকারীদের উপর বিজয়ী হয়েছিল। এ পর্যন্ত আমরা এই বিশেষ সম্প্রদায়ের নিয়তির অনুসরণ করেছি; যে ধর্মীয়-রাজনৈতিক আন্দোলন এ সময়ে ইসলাম জাহানে অগ্রসর হচ্ছিল তার উপর তাদের আদিম আবাসভূমিতে কম বিস্তার করেনি।

www.amarboi.org

প্রচন্ড উম্মাদনার যুগে যখন পলের অনুসারী চাইরোসার বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের পূর্বাংশ ধ্বংস করছিলেন এবং এশিয়া মাইনরের শহরগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করছিলেন তখন ফার্সের আহ্ওয়াজে একজন লোক বাস করতেন যিনি প্রতিভার বিশালতায়, অবগতির বৈচিত্রে ও জ্ঞানের গভীরতায় ম্যানীর সমকক্ষ ছিলেন এবং যিনি ধর্মের ইতিহাসে প্রায় সমান ভূমিকা পালন করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন আল্ কাদ্দাহকে তাঁর শত্রুরা জন্মসূত্রে মাজী বলে অভিহিত করেছে, আর তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে আলীর বংশধর বলে ঘোষণা করেছেন।[৫০] যাই হোক না কেন, এটা সুস্পষ্ট যে মুহম্মদের বংশধরদের অনুগত সমর্থক ছিলেন। তাঁর শিক্ষা থেকে দুর্ভাগ্যজনক ফলাফল প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রবাহিত হয়েছিল তা বিবেচনা করে ইবনে খালদুনের[৫১] মতো ঐতিহাসিকের পক্ষেও লোকটি ও তাঁর মতবাদসমূহকে প্রতিকূল পূর্বধারণা ব্যাতিরেকে দেখতে পারেননি। তারা মনে করেন আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন প্রতারণামূলক উপায়ে ইসলামের সাম্রাজ্য ধ্বংস করার ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যেভাবে তাঁর আদর্শ ব্যক্তি খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে করেছিলেন। যতদিন জনগণের বিবেক ও পার্থিব শক্তি রাষ্ট্রের স্বপক্ষে রয়েছে ততদিন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তিনি ম্যানীর মতো গোপনে কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন (তারা বলেন)। তদনুসারে রহস্যের আচরণে তাঁর ধর্মীয় ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন; আর সব সদর্থক ধর্ম ও কর্তৃত্বকে ধ্বংস করার জন্য তাঁর শিষ্যদেরকে পিথাগোরীয়দের মতো সাতটি দলে বিভক্ত করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। শেষ স্তর যাবতীয় ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতার উপর জোর দিয়েছিল—ক্রিয়ার প্রতি ঔদাসীন্য যা তাঁর মনে ইহজগতে কিংবা পরজগতে পুরস্কৃত বা তিরস্কৃত হবে না। তিনি শিষ্য তালিকাভূক্ত করার জন্য এবং সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে কয়েকটি বা সব কয়টি স্তরে বাইয়াত করার জন্য দূত নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। ইসমাইলের পুত্রের প্রতারণা তাদের জন্য রাজনৈতিক মুখোস হিসেবে কাজ করেছিল। তারা প্রকাশ্যে তাঁর জন্য কাজ করেছিল, আর গোপনে ও প্রকৃতপক্ষে ছিল অধর্মের প্রচারক।[৫২]

এই সম্প্রদায়ের মূল বাণীসমূহের যে বিবরণ[৫৩] শাহরিস্তানী প্রদান করেছেন তা দার্শনিকসুলভ মনোভাবসম্পন্ন, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত 'দাবিস্তানে' প্রদত্ত মহসীন ফ্যানীর বিবরণ ঈষৎ গোলাপী বর্ণে রঞ্জিত। সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করলে এটা বুঝা যায় যে, তারা এই মতকে সম্ভাব্যতার ঊর্ধ্বে তুলেছেন যে আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন জড়বাদী খোদাবিশ্বাসী ছিলেন এবং ম্যানীর ন্যায় তিনি সারগ্রাহী নিসর্গবাদ সৃষ্টি করার উচ্চাশা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন—এই নিসর্গবাদ দর্শন ও সদর্থক ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছিল এবং তাঁর দীক্ষাদান সুফীদের মরমী স্তরসমূহের সদৃশ ছিল। মিরখণ্ড যা বলেছেন তা থেকে একথা স্পষ্ট যে মিশরীয় ফাতেমীয়গণ আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন থেকে তাদের অধিকাংশ মরমী মতবাদগুলি গ্রহণ করেছিলেন।[৫৪]

www.amarboi.org

আব্দুল্লাহ আহ্ওয়াজ থেকে বসরায় যান, আর বসরা থেকে সিরিয়ায় এবং সালেমিতে বসতি স্থাপন করেন। ভ্রমণ ব্যপদেশে তিনি পলের অনুসারীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের অনেক মতবাদ গ্রহণ করেন। বাইজানটাইনদের সঙ্গে পলের অনুসারীদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম এবং ধর্মান্তরিতকরণে তাদের সাফল্য তাঁকে তাঁর ধর্ম-পরিকল্পনায় নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছে, তিনি আংশিকভাবে ম্যানী কর্তৃক প্রচারিত মতবাদ ও মুসলিম মিষ্টিকদের মতবাদের উপর তাঁর মতবাদ রূপায়িত করেন। ম্যানিকীয় মতবাদ মূলতঃ পিথাগোরীয় দর্শন, জারভানবাদ ও খ্রিস্টধর্মের সারবস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত সর্বখোদাবাদী মতবাদ। আব্দুল্লাহর অনুসারীগণ বাতেনী বা নিগূঢ়বাদী উপাধি লাভ করেছেন, কেননা তারা সদর্থক ধর্মের আদেশসমূহের ভেতর অন্তঃদৃষ্টি লাভ করেছেন বলে দাবী করেন—ম্যানিকীয়গণ ও পলের অনুসারীবৃন্দ যে দাবী করেছেন তার অনুরূপ।

আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন জড়ের নিত্যতা স্বীকার করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে "আল্লাহ্ তাঁর প্রকাশ থেকে স্বতন্ত্র নন; তাঁর সম্পর্কে এটা নিরপেক্ষ বিশেষিত হতে পারে না যে, তিনি অস্তিত্বশীল বা অস্তিত্বহীন, সর্বশক্তিমান বা সর্বশক্তিশূন্য, কেননা তাঁর সম্পর্কে কোন গুণ আরোপ করা মানেই তাঁর এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে সাদৃশ্য ধারণা করা; 'আমরই-ই ওয়াহিদ' (আদি সরল আদেশ) বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া কর্তৃক উদ্ভূত আদি কারণ যা অনন্তের মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং যাকে 'আকল' বা প্রজ্ঞা বলে অভিহিত করা হয়। এই নীতি 'নফস' বা আত্মা নামক একটি অধীনস্থ নীতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল মূলনীতির সঙ্গে যার সম্পর্ক সন্তান সম্পর্ক; এই নীতির আবশ্যকীয় গুণ হল 'জীবন' যেমন প্রজ্ঞার গুণ হল 'জ্ঞান'। এই দ্বিতীয় নীতিটি পূর্বাবস্থিত জড়কে রূপ দিয়েছিল যার বৈশিষ্ট্য নিষ্ক্রিয়তা, আর পরে দেশ, কাল, উপাদানসমূহ, গ্রহ, নক্ষত্র ও বিশ্বের অন্যান্য বস্তু সৃষ্টি করেছিল। আদি সৃষ্ট নীতির স্তরে উন্নীত হওয়ার নিরন্তর ইচ্ছার ফলে দ্বিতীয় নীতি জড়ের মধ্যে নিজেকে মনুষ্যজীবের আকারে প্রকাশিত করল; মানুষের সব আত্মার লক্ষ্য সংগ্রামের ভেতর দিয়ে সৃষ্টিশীল নীতি বা জ্ঞানবত্তায় উন্নীত হওয়া; জড়ের সঙ্গে সংগ্রাম করার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য প্রেরিত পুরুষগণ সেই নীতির অভিব্যক্তি বা প্রমূর্ত প্রকাশ; প্রেরিত পুরুষগণকে তাই 'নাতিক' (প্রচারক) বলা হয়; তাঁরা গ্রহের মতো সপ্তসংখ্যক; আর জগতের অগ্রগতি চক্রবৎ এবং পরিশেষে পুনরুত্থান (কিয়ামতে কোবরা) সংঘটিত হবে। তখন সদর্থক ধর্ম ও আইনের নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়া হবে, কেননা আকাশের গতি এবং ধর্মের নীতি-অবলম্বন মানবত্মার পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য; আত্মার পরিপূর্ণতা হল প্রজ্ঞার বিভিন্ন স্তরে উন্নীত হওয়া তার সঙ্গে সংযুক্তি বা সমন্বয়। এটা হল মহাপুনরুত্থান (কিয়ামতে কোবরা) যখন সমুদয় বস্তু, আকাশ, উপাদান ও জীব ধ্বংস প্রাপ্ত হবে; পৃথিবী পরিবর্তিত হবে, আকাশসমূহ লিখিত গ্রন্থের ন্যায় বন্ধ থাকবে; অমঙ্গল থেকে মঙ্গল বিচ্ছিন্ন হবে, অবাধ্য জন থেকে অনুগত জন আলাদা হয়ে পড়বে; মঙ্গল বিশ্বআত্মার মধ্যে মিশে যাবে, অমঙ্গল অমঙ্গলের নীতির সঙ্গে সংযুক্ত হবে। (আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুনের মতে) গতির আরম্ভ থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত

www.amarboi.org

প্রাথমিক স্তর, আর গতি বা ক্রিয়ার সমাপ্তি থেকে অনন্তের সঙ্গে মিলিত হওয়া পর্যন্ত পরিপূর্ণতার স্তর;[৫৫] আর ধর্ম ও আইনের যাবতীয় নীতির পরিসীমা আছে"..."প্রত্যেক অক্ষর ও শব্দের দু'টি করে অর্থ রয়েছে, কেননা প্রত্যেক প্রত্যাদেশের ব্যাখ্যা রয়েছে, প্রত্যেক দৃশ্যমান বস্তুর অদৃশ্য জগতে প্রতিলিপি রয়েছে আর জ্ঞান প্রজ্ঞার মাধ্যমে অর্জন করা যায় না, যায় পরামর্শের মাধ্যমে।" আব্দুল্লাহ্ ইবনে মায়মুনের শিষ্যগণ তাঁর মতবাদসমূহের আরও বিকাশ সাধন করেছিলেন—তারা ঘোষণা করেছিলেন যে পুনরুত্থান মানে ইমামের আবির্ভাব ও স্বর্গ রাজ্যের প্রকাশ যখন সদর্থক ধর্মের ও ঐতিহ্যের অপসারণ ঘটবে; ধর্মে প্রতারণা অনুমোদনীয়; কোরআনের বাক্যসমূহের নিগূঢ় অর্থ রয়েছে, ধর্ম বাহ্য অনুষ্ঠানের ভেতর নিহিত নয়, নিহিত রয়েছে অন্তরের উপলব্ধি ও অনুভূতিতে; যে বস্তু বা ক্রিয়া ক্ষতিকর নয় তা আইনসঙ্গত; উপবাস বা রোজা মানে ইমামের গোপন-রহস্য সংরক্ষণ ছাড়া অন্য কিছু নয়; ব্যভিচারের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার অর্থ এই যে শিষ্য ধর্মের রহস্য প্রকাশ করবে না; যাকাত অর্থ নিষ্পাপ ইমামকে দশমাংশ প্রদান করা—এসব বহু ধর্মমত ও দর্শনের অদ্ভুত ও কাল্পনিক সংমিশ্রণ এবং প্রবণতার দিক দিয়ে আইন ও নৈতিকতার ধ্বংসকারক।

খ্রিস্টান নষ্টিকবাদের আবাসভূমি সিরিয়ায় আব্দুল্লাহ্ ইবনে মায়মুন বসতি স্থাপন করেছিলেন; সেখানে তিনি তাঁর মতবাদের আরও বিকাশ সাধন করেছিলেন। এখানে তিনি ইসলামের ইতিহাসের কুখ্যাত ব্যক্তি হামাদানকে, কারমাস বলেও অভিহিত, ধর্মান্তরিত করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে মায়মুনের অনুসারীরা দীক্ষাদানের যে পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন তা পুরাতন ম্যানিকীয় পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে নব-দীক্ষিতকে প্রতারণামূলক প্রশ্ন ও দ্ব্যর্থবোধক উত্তর সহ সংশয়ের সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়, মোহ্‌সিন ফ্যানীর সংবাদদাতা বলেন "অনিষ্টকর বস্তুর মধ্যে তাকে নিক্ষেপ করা হয় না, এটা শুধু সত্যের অন্বেষণকারীকে পূর্ণতার লক্ষ্যে চালিত করার জন্য।"[৫৬] দীক্ষার প্রক্রিয়ার ইতরবিশেষ ঘটত শুধু যে ব্যক্তিকে তারা ধর্মান্তরিত করতে চাইত তার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে। আহ্বায়ক (দায়ী)[৫৭] প্রথমে ইচ্ছুক দীক্ষাগ্রহণকারীর ধর্মের মৌন স্বীকৃতির পর তার মধ্যে সন্দেহ ও জটিলতা প্রবেশ করিয়ে ধীরে ধীরে তার মনের অব্যবস্থা সৃষ্টি করেন এবং পরিশেষে 'বাতেনী' ব্যবস্থা একমাত্র সমাধান হিসেবে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আহবায়ককে একজন শিয়াকে দীক্ষা দিতে হয় তাকে মুহম্মদের বংশধরদের অনুগত সমর্থক হিসেবে নিজেকে প্রতিবেদন করতে হবে। যে নিষ্ঠুরতা ও অন্যান্য আচরণ তাদের ওপর করা হয়েছে—হুসাইনের শাহাদৎ ও কারবালার হত্যাকাণ্ড সে সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত বিবরণ দেবেন। এভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করার পর তিনি নতুন গ্রহণক্ষম মনে বাতেনীদের গুহ্য মতবাদসমূহ ধীরে ধীরে অনুপ্রবিষ্ট করান। যদি একজন ইহুদীকে দীক্ষা দিতে হয় তবে তিনি খ্রিস্টান ও মুসলমানদের উপর নিন্দাবাদ বর্ষণ করবেন, পরে তার দীক্ষাগ্রহণেচ্ছুর সঙ্গে মসীহের আগমন সম্পর্কে একমত হয়ে ধীরে ধীরে তার মনে এই

www.amarboi.org

বিশ্বাস জন্মাবেন যে তার অঙ্গীকৃত মসীহ। 'ইসমাইলিয়া' ইমাম ছাড়া অন্য কেউ নয়। যদি সেই দীক্ষা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি একজন খ্রিস্টধর্মাবলম্বী হন তবে তিনি ইহুদীদের একগুয়েমি ও মুসলমানদের অজ্ঞতা সম্পর্কে বাড়িয়ে বলবেন এবং খ্রিস্টধর্মের প্রধান বিষয়বস্তুর সঙ্গে একমত হবেন এবং সেই সঙ্গে ইঙ্গিত করবেন যে এসব প্রতীকধর্মী এবং এসব এমন অর্থের দ্যোতনা করে যা একমাত্র বাতেনী ব্যবস্থাই সমাধান করতে পারে। শিক্ষানবিশের মন এ পর্যন্ত রূপান্তরিত হওয়ার পর এই অভিভাবনা দেবেন যে খ্রিস্টানগণ ত্রাণকর্তার ধারণার অপব্যাখ্যা করছে এবং ইসমাইলিয়া ইমাম প্রকৃত ত্রাণকর্তা[৫৮] আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন সুস্পষ্ট ভাষায় 'তাকিয়ী' মতবাদ প্রণয়ন করেছিলেন—কোন বিদেশী ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশীলনের সঙ্গে বাহ্য সামঞ্জস্যবিধান। সমুদয় ম্যানেকীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এটা প্রচলিত ছিল, পলের অনুসারীগণ এর ব্যতিক্রম ছিল না। আব্দুল্লাহ আবনে মায়মুন আংশিকভাবে নির্যাতন এড়াতে এবং আংশিকভাবে দীক্ষার কাজ সহজ করার জন্য এর পুনরায় চালু করেছিলেন। 'তাকিয়ী' বলীর বিরুদ্ধে শক্তিহীন ও দুর্দশাভোগকারী স্বাভাবিক সংরক্ষণ। সব মানুষের শাহাদৎ বরণের শক্তি নেই এবং অধিকাংশ মানুষ যেখানে বাধা প্রদান করতে পারে না সেখানে নতি স্বীকার করে। আদি খ্রিস্টানেরা 'তাকিয়ী' অনুশীলন করত। আব্বাসীয় খলিফাদের সাম্রাজ্যের সব দেশেই 'ইসমাইলিয়াগন' বিশেষ কারণে তাদের ধর্মীয় মতামত গোপন রাখত, আর এই দীর্ঘ অনুশীলিত অভ্যাস তাদের দ্বিতীয় স্বজন স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাদের থেকে প্রকৃত শিয়ারা 'তাকিয়ী'র অনুশীলন ধার করেছিলেন। পারস্য ও তুরস্কের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপিত হওয়ার পূর্বে একজন শিয়ার পক্ষে হজ্ব সমাপন করতে হলে সুন্নী মযহাব অনুযায়ী কৃত্য সম্পাদন করতে হত। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে ধর্মনিষ্ঠ শিয়ার পক্ষে পবিত্র ভজনালয় কাবা-সন্দর্শনের জন্য 'তাকিয়ী' অপরিহার্য ছিল। কিন্তু 'তাকিয়ী' যা 'নির্যাতন ও ভয়ের স্বাভাবিক সন্ততি" তা পারসিকদের এমনকি অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা প্রয়োজন নেই এ ধরণের পরিস্থিতিতেও 'তাকিয়ী' অনুশীলন করত। যেমন আধুনিক প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানরা ক্যাথলিক দেশসমূহেও রোমকদের প্রথার প্রতি কিছুটা সম্মান দেখান তেমন তারা কারও মনে অসন্তোষ না আসে বা কারও অনুভূতি আহত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এর অনুশীলন করতেন।

হামাদান, কারমাস বলেও অভিহিত, তার গুরুর দল পরিত্যাগ করে নিজে একটি সম্প্রদায় গঠন করেন। দীক্ষা দানের ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন বলপ্রয়োগ অনুমোদন করেননি, কিন্তু কারমাস বল-প্রয়োগকে তাঁর সম্প্রদায়ের প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর বলে অভিহিত করেন। সম্ভবত চাইরোসারের মতো ধর্মান্ধদের নির্যাতনের ফলে তিনি এই পরিকল্পনার চালিত হন। আল--আহসা ও আল-বাহরাইনে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। খলিফার সেনাবাহিনীর দুর্বলতার জন্য তিনি বিজয়ী হন। এক বিশাল সমর্থকদল সংগ্রহ করে তিনি আল্-বাহরাইন থেকে বাহির হন, এবং পলের অনুসারী চাইরোসারের মতো ধ্বংস ও হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তার অগ্রগতি চিহ্নিত করেন। কারামাসের সমর্থকগণ

www.amarboi.org

আল্-বাহরাইন ও আল্-আশার দুর্গ থেকে বাগদাদের খলিফার সঙ্গে প্রায় এক শ' বছর ধরে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চালিয়েছিলেন। তারা এমন কি মক্কা লুণ্ঠন করেন, এবং ইবরাহিমের প্রাচীন নিদর্শন 'হয্রে আসওয়াদ' সরিয়ে নিয়ে যান। এই অপবিত্রকরণে তারা তাদের পূর্বসূরী দলের অনুসারীদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন, যারা এফিসাস লুণ্ঠন করেন, সেন্ট জনের সমাধি-সৌধ ধ্বংস করেন ও তাঁর প্রধান গির্জাকে ঘোড়া ও খচ্চরের আস্তাবলে পরিণত করেন। পরিশেষে মুতাজিদ বিল্লাহ তাদের ধ্বংস সাধন করেন।

কারমাসের অনুসারীদের ধ্বংসের পর 'ইসমাইলিয়া মতবাদ' নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়; এর সমর্থকদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয় এবং কীট-পতঙ্গের মতো তাদেরকে শিকার করা হয়। ওবায়দুল্লাহ আল-মাহদী কর্তৃক আফ্রিকা থেকে আব্বাসীয়দের বিতাড়িত করার পূর্ব পর্যন্ত ইসমাইলিয়া মতবাদ সবদিক দিয়ে আত্মগোপন করে।

মিশরের ফাতেমীয়গণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মহান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাদের প্রজাদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ইচ্ছা সত্ত্বেও তারা আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন কর্তৃক প্রবর্তিত প্রচারণার রাজনৈতিক সুবিধাগুলি উপেক্ষা করেননি। তারা তাদের নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আংশিকভাবে তাদের গুহ্য ও ম্যানিকীয়দের মতবাদ সমূহ গ্রহণ করেছিলেন। তারা কলেজ, সাধারণ পাঠাগার ও বিজ্ঞান শিক্ষাগার (দারুল্ হিকমত) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বইপুস্তক, গাণিতিক যন্ত্রপাতি দিয়ে পর্যাপ্তরূপে সুসজ্জিত করেছিলেন। অসংখ্য অধ্যাপক ও কর্মচারী তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই গ্রন্থাগারে প্রবেশের ও এর সম্পদ ব্যবহারের অধিকার ছিল সকলের কাছে উন্মুক্ত; আর বিনামূল্যে লেখার সরঞ্জামাদি দেওয়া হত।[৫৯] খলিফা প্রায়ই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্কসভা ডাকতেন, এতে বিভিন্ন একাডেমীর প্রফেসরবৃন্দ যুক্তিবিদ, গাণিতিক, আইনবিদ ও চিকিৎসাবিদ—বিভিন্ন অনুষদে বিভক্ত হয়ে, তাদের উপাধি-পরিধেয় 'খালা' পরিহিত হয়ে যোগদান করতেন। ইংরেজদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের 'গাউন' আরবীয় 'খালা' বা 'কাফতানে'র মূল রূপকে এখনও রেখেছে।

সতর্কতার সহিত সুনিয়ন্ত্রিত কর আদায়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত দু'শ সাতান্ন হাজার ডুকেট ছিল ইনস্টিটিউটগুলির বার্ষিক রাজস্ব-অধ্যাপক, কর্মচারী, শিক্ষার ব্যবস্থা ও সাধারণ বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য এই অর্থ ব্যয়িত হত। এখানে অধ্যাপকগণ মনুষ্য-জ্ঞানের সকল সমস্যা শিক্ষা দান করতেন। কেন্দ্রীয় 'দারুল হিকমতে'র সঙ্গে সংযুক্ত ছিল বৃহৎ "লজ" (ভবন)। এখানে 'ইসমাইলীয়' গূঢ় তত্ত্বে শিক্ষাগ্রহণেচ্ছু প্রার্থীদেরকে ধর্মের বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। সপ্তাহে দু'দিন, প্রত্যেক সোমবার ও বুধবারে 'দা'য়ী-হেঁদ্ দুয়াত্'—লজের মহান অধ্যক্ষ সভা আহবান করতেন; এই সভায় পুরুষ ও মহিলা, উভয়েই শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে স্বতন্ত্র আসনে সমাসীন হতেন। এসব সম্মেলনের নাম ছিল 'মজলিশ উল হিকমত' বা জ্ঞানের সম্মেলন। দীক্ষা দানের পূর্বে 'দা'য়ী-উজ্ দুয়াত' প্রধানতম গুরু, খলিফার সমীপে যেতেন, তাঁকে দীক্ষা গ্রহণেচ্ছুদেরকে যে শিক্ষা দেবেন তা পড়ে শোনাতেন এবং পাণ্ডুলিপির কভার-পৃষ্ঠায় তাঁর স্বাক্ষর গ্রহণ করতেন।[৬০]

www.amarboi.org

বক্তৃতা শেষ হলে ছাত্ররা প্রধান ধর্মগুরুর হস্ত চুম্বন করত এবং ললাটের সাহায্যে সসম্মানে প্রধানতম গুরুর স্বাক্ষর স্পর্শ করত। এই লজে বিভিন্ন স্তরের গৃহীত দীক্ষার যে বিবরণ দিয়েছেন মাকরিজি তা পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃপ্রেমের ভিত্তিতে স্থাপিত সভার এক মহামূল্য বিবরণ হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক, কায়রোর লজ খ্রিস্টান জাহানের নির্মিত সব লজের 'নমুনা হয়ে রয়েছে' আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন দীক্ষাদানের সাতটি স্তরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সাত সংখ্যাটি পবিত্র : সাতটি গ্রহ, সপ্তাহের সাত দিন এবং সাতজন ইমাম। কায়রোতে মিশরীয় পুরোহিততন্ত্র পুরাতন মরমীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হয়ে ম্যানেকীয় প্রতিষ্ঠানের উপর আরোপিত হয়েছিল। তখন সংখ্যা নয়-য়ে উন্নীত হয়েছিল।[৬২] প্রথম স্তর সবচেয়ে কঠিন ছিল, এই স্তরে নবদীক্ষিতদের মনকে রূপান্তরিত করতে ও তাকে সবচেয়ে পবিত্র অঙ্গীকার গ্রহণে অভিলাষিত করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হত। যার মাধ্যমে সে অন্ধ-বিশ্বাস ও শর্তহীন আনুগত্য সহকারে নিজেকে গুপ্ত মতবাদের সঙ্গে বেঁধে ফেলত। তারপর প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট সরল : নবদীক্ষিত ধীরে ধীরে সব তন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হতে ও এক অতৃপ্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষার যন্ত্রে পরিণত হতে পরিচালিত হত।

মাহদিয়ের ও পরবর্তীকালে কায়রোর সুবৃহৎ ভবনগুলি (গ্রাণ্ড লজেস) বিপুল ও সুদূর প্রসারী রাজনৈতিক প্রচারণার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। যে মতবাদসমূহের জ্ঞানের উপর তারা কাজ করত তা অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যেই সীমিত ছিল। ইলিউসিসের রহস্যসমূহ, টেমপ্লারস, হাল্লুমিনেটি ও ফ্রান্সের বিপ্লবীদের গোপন নীতিসমূহের মতো তাদের মতবাদগুলি শুধু কুশলীদেরকেই সামগ্রিকভাবে বা আংশিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হত : সামগ্রিকভাবে শুধু তাদেরকেই শিক্ষা দেওয়া হত যাদেরকে শত্রুর শক্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হত। জনসাধারণ ও অদীক্ষিতদের জন্য রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল ইসলাম। আর ইসলামের নৈতিক নীতিসমূহ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি কঠোরতার সঙ্গে প্রতিপালিত হত। অধিকাংশ খলিফা, বিশেভাবে আল্-মুয়িজ তাদের জীবননির্বাহে ও অনুশীলনে কঠোর ধার্মিক ও নৈতিক আইন প্রবর্তিত কর্তব্য পালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন।[৬২] আইন-বিশেষজ্ঞ ও রাষ্ট্রের অফিসারগণ ছিলেন নৈষ্ঠিক মুসলমান। তথাপি এক গোপন সংস্থা একটি রহস্যাবৃত সূত্রে কাজ করায় সমাজের বন্ধন শ্লথ হয়ে পড়েছিল। গুপ্ত দূত সংগঠন স্থায়ীভাবে ফাতেমীয়দের কর্তৃত্বকে শক্তিশালী না করে কিংবা তাদের পার্থিব ক্ষমতা সম্প্রসারিত না করে আব্বাসীয়দের নিয়ন্ত্রণ দুর্বল করেছিল।

হাসান বিন সাব্বাহ হিসায়্যারী, সাধারণভাবে হাসান বিন সাব্বাহ বলে পরিচিত এবং পাশ্চাত্যের ইতিহাসে "আততায়ী"[৬৩] গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কুখ্যাত যদিও অনুসারীদের নিকট সাইয়েদেল বলে পরিচিত, তার শিষ্যদের থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে মিশরের ফাতেমীয়দেরকে প্রতীচ্যের ইসমাইলিয়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। তার শিষ্যদেরকে কখনও কখনও "প্রাচ্যের ইসমাইলিয়া" বা 'আলামুতিয়াস' বা 'মালাহিদা অব কুহিস্তান' (কুহিস্তানের অপবিত্র নিরীশ্বরবাদীগণ) বলা হয়ে থাকে।

www.amarboi.org

হাসান ছিলেন একজন সুশিক্ষিত শিয়া পণ্ডিতের পুত্র যিনি বংশগতভাবে আরব ছিলেন—তাঁর নাম থেকে মনে হয়। তিনি পারস্যের ইখ শহরে বাস করতেন। তাঁকে সযত্নে সেকালের সব ধরনের শিক্ষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। কথিত আছে যে, তিনি একসময়ে নিজাম-উল্ মুল্ক (পরবর্তীকালে যিনি প্রাচ্যের দু'জন বিখ্যাত সেলজুক সুলতান আল্প আরস্লান ও মালিক শাহের নামজাদা মন্ত্রী হয়েছিলেন) এবং বিখ্যাত মরমী কবি ওমর খৈয়ামের সতীর্থ ছিলেন। কিন্তু এই গল্প এখন আর সমর্থনযোগ্য বলে হয় না।[৬৪] মালিক শাহের দরবারে নিরাশ হয়ে তিনি কায়রোর খলিফার দরবারে হাজির হন এবং কায়রোর লজে দীক্ষাগ্রহণ করেন। পারস্য তখন সুন্নী মযহাবের গোঁড়ামির বন্ধনে আবদ্ধ ছিল; সেলজুক সুলতানগণ সর্বদা আশারিয়া মতবাদের সংকীর্ণ ঐতিহ্যের নিষ্ঠাবান সমর্থক ছিলেন। হাসান মিশর থেকে এশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং আংশিকভাবে বলপ্রয়োগে ও আংশিকভাবে প্রতারণার সাহায্যে প্রাচীন পারস্যের প্রায় দুর্ভেদ্য দুর্গ 'আলামুত' বা ঈগলের বাসা[৬৫] এবং উচ্চতর পারস্যের[৬৬] সবচেয়ে একটি অচ্ছেদ্য দুর্গের অধিকারী হয়েছিলেন, আর যে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে তিনি সেখানকার কর্তৃত্ব চালিয়েছিলেন এবং সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকায়[৬৭] এবং প্রাচ্য ইউরোপে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন, ছোরা দিয়ে তিনি তরবারীর মোকাবিলা করেছিলেন আর নির্যাতনের বদলা নিয়েছিলেন হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে। তিনি নিজে একজন ধর্মের কঠোর অনুশীলনকারী ছিলেন এবং তাঁর শাসনসীমার মধ্যে তিনি মদ বা নৃত্য বা সংগীত—কোনটাই আমল দিতেন না। তাঁর গুহ্য মতবাদ প্রতীচ্যের ইস্‌মাইলিয়াদের গুহ্য মতবাদ থেকে পৃথক বলে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে শাহারিস্তানী ও মোহসিন ফানী সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। উভয়েই কিছুটা বিস্ময় নিয়ে তার কথা বর্ণনা করেছেন। এ বর্ণনা আমাদের অনুপ্রাণিত করে যে তারা 'ফিদায়ী'দের ছোরা সম্পর্কে সম্পূর্ণ আশঙ্কিত ছিলেন না।[৬৮] তার মতবাদের মরমী দিক বাদ দিয়ে এ কথা বলা যেতে পারে যে, তিনি দীক্ষার চারটি স্তর স্বীকার করেছিলেন। যারা প্রথম তিনটি স্তর গ্রহণ করেছিল তাদের যথাক্রমে 'ফিদাই', 'রফিক' ও 'দায়ী'—সভ্য, সঙ্গী ও আহবায়ক—এটা হাসানের ব্যবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ টেম্পলারদের প্রতিষ্ঠানগত পরিভাষায়। হাসান এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম প্রধানতম ধর্মগুরু, যদিও তিনি সর্বদা মিশরের ফাতেমীয় খলিফাদের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। আলামুতিয়া লজের চতুর্থ প্রধানতম ধর্মগুরু হাসান বিন মুহম্মদ তার লক্ষ্যকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য নিজেকে কায়রোর খলিফা মুনতাসিরবিল্লাহর পুত্র নিজারের দিক দিয়ে তাঁর বংশধর বলে দাবী করতেন। তিনি ধর্মের সকল অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পুনরুত্থান সমুপস্থিত; তার মধ্যে ইমামের অভিব্যক্তি ঘটেছে; স্বাধীনতা ও নৈতিক আইনের প্রতিবন্ধকতা মুক্তির[৬৯] মধ্যে স্বর্গরাজ্য ঘোষিত হয়েছে। এই উন্মাদ বিপ্লবী আল্‌মুতিয়াদের ইতিহাসে "আলা যিকরিহী আল্ সালাম" (তার নামের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) নামে পরিচিত; এটা 'যিক্‌রুস্ সালাম' এই বিদ্রূপাত্মক বাক্যে অবনমিত হয়। এই সময় থেকে আলামুতের ধ্বংসের পূর্ব

www.amarboi.org

পর্যন্ত দু'জন হাসানের শিষ্যবৃন্দ অসামরিক জনগণের সঙ্গে নিষ্ঠুর যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল—কোন পক্ষই কোনরূপ দয়া দেখাত না। বাস্তবিক পক্ষে তারা ছিল ইসলামের 'নিহিলিস্ট'। তাদের ছোরার তলে খ্রিস্টান ও মুসলমান উভয়ের বলী হয়েছিল। হালাকু তাদেরকে আক্রমণ করে তাদের পার্বত্য দুর্গসমূহ ধ্বংস করেন এবং পোকামাকড়ের ন্যায় খুঁজে খুঁজে তাদেরকে হত্যা করেন।[৭০]

ইসমাইলিয়াদের থেকে ক্রুসেডারগণ যে ধারণা লাভ করেছিল তা-ই ইউরোপে ধর্মীয় ও পার্থিব যাবতীয় গুপ্ত সংস্থা গঠনে পরিচালিত করেছিল। টেম্পলার ও হস্পিটালারদের প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইগ্নেটিয়াস লয়োলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যীশু-সমিতি—এগুলি এ ধরনের লোকদের দ্বারা গঠিত যাদের আত্মোৎসর্গের মনোভাব ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা আমাদের সময়ে অনতিক্রান্ত; হিংস্র ডমিনিক্যান, মৃদুতর ফ্রান্সিসক্যান হয় কায়রো নয় আলামুতের প্রভাবজাত। নাইটস টেম্পলারগণ প্রধানতম গুরু, প্রধানতম পুরোহিত, ধর্মীয় অনুরাগী, দীক্ষার স্তর-বিন্যাস ব্যবস্থাসহ প্রাচ্য ইসমাইলিয়াদের সঙ্গে গভীরভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রতীচ্য ইসমাইলিয়াদের ছোট ছোট দল ইয়েমেন, মিশর ও বারবেরিতে এখনও দেখতে পাওয়া যায় এবং তাদেরকে সাধারণ মুসলমান থেকে পৃথক করতে পারা যায় না। ভারতের পশ্চিম-উপকূলীয় অঞ্চলে একটি বিরাট সম্প্রদায় বাস করে। তারা খোজা নামে অভিহিত। তারা মূল প্রাচ্য ইসমাইলিয়াদের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি। ইসমাইলিয়া 'দায়া', পীর সদর উদ্দীন একাদশ বা দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু ধর্ম থেকে তাদের ইসমাইলিয়া মতবাদে দীক্ষিত করেন। তাঁর শিক্ষা তাদের ধর্মীয় ধারণার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল, কেননা ইসমাইলিয়া মতবাদসমূহে প্রাচীন ধর্মমতের অংশ বিশেষ সংযোজিত হয়েছিল।[৭১]

'কায়সানিয়া' ও 'হাশিমিয়া' উভয় সম্প্রদায়ই সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক; এই দলগুলি মাজিবাদের রঙ্গে রঞ্জিত। এসব দল এখন বিলুপ্ত এবং উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

'গালিয়া' বা 'গুলাত' (অতিরঞ্জনকারী দল)-কে ইবনে খালদুন ও শাহ্‌রিস্তানী শিয়াদের একটি সম্প্রদায় বলে মনে করেন। বাস্তবিক এই সম্প্রদায় নষ্টিকদের বংশধর। তাদের ইসলাম হল খ্রিস্টের স্থানে মুহম্মদ বা আলীকে, প্রধানত আলীকে বদল/বিনিময় করা। তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের 'ডোসেটি'/'নুসাইরিসা' আলীর ঐশীত্বে বিশ্বাসী, 'ইশ্‌কিয়া' 'নুমানিয়া' 'খিতাবিয়া' ও অন্যান্যরা—অবতারবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী—এরা মার্সিওনাইট, ভ্যালেনটিয়ান ও অন্যান্য ডসেটিক খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রচলিত ধারণাসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে। এদের কোন কোন সম্প্রদায় খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদের স্থানে পঞ্চত্ববাদের সমর্থক। তারা বিশ্বাস করে যে মুহম্মদ, আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন যুগ্মভাবে ঐশীত্বের প্রতিনিধি। এক ধরনের ডসেটিজম সুন্নীদের মধ্যেও প্রচলিত আছে। কুর্দিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে একজন সুন্নী তাপস[৭২] যীশু নষ্টিকদের মধ্যে যে স্থান দখল করেছিলেন; প্রায় তেমনি স্থান দখল করেছিলেন জনসাধারণের বিশ্বাসে।

'রৌশেনিয়া' সম্প্রদায় খ্রিস্টানদের মধ্যে যে ইলুমিনেটি সম্প্রদায় রয়েছে তাদেরই অবিকল প্রতিনিধি। ভারতবর্ষে আকবরের সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে যে অন্ধকার,

www.amarboi.org

প্রলয়ঙ্করী ও রক্তপিচ্ছিল যুগ চলেছিল তখন আফগানিস্তানে এই সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছিল। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বায়েজিদ[৭৩] ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত আফগান। তিনি পর্যাপ্ত স্বভাবগত ক্ষমতা ও সূক্ষ্ম প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলে মনে হয়। তরুণ বয়সে তিনি ইসমাইলিয়াদের নিকট থেকে ম্যানেকীয় মতবাদের প্রভাবে আসেন। এখনও ইসমাইলিয়াগণ খোরাসানের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস করছেন। তিনি প্রথমে যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন তা সূফীদের মতবাদ মূলতঃ পৃথক ছিল না; তিনি যতই অগ্রসর হতে থাকেন ততই ইসলাম থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে পড়তে থাকেন। এই সম্প্রদায় সংখ্যায় ও শক্তিতে বৃদ্ধি পাওয়ার পর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আকৃতি ধারণ করে এবং দ্রুততার সঙ্গে এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে প্রায় সমগ্র আফগানিস্তানকে কবলিত করে।

বায়েজীদ যে মতবাদসমূহ শিক্ষা দিয়েছিলেন তা যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে মরমীবাদ ও সর্বখোদাবাদের ওপর তার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত। দূরদর্শী পাঠক তার শিক্ষা এবং ফকির সম্প্রদায়ের তত্ত্ব অনুশীলনের মধ্যে অদ্ভুত ও কাল্পনিক সাদৃশ্য দেখতে ব্যর্থ হবে না। তিনি শিক্ষা দিতেন যে আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, আর যাবতীয় অস্তিত্বশীল বস্তু তাঁর বিভিন্ন রূপ, পীর বা ধর্মীয় শিক্ষকগণ ঐশীত্বের মহান অভিব্যক্তি; ন্যায় ও অন্যায়ের একমাত্র মাপকাঠি ঐশী প্রতিনিধি পীর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করা; কাজেই আইনের অধ্যাদেশসমূহের মরমী অর্থ রয়েছে এবং ধর্মীয় পূর্ণতা অর্জনের জন্য একমাত্র উপায় হিসেবে প্রদত্ত; আইনের মরমী অর্থ একমাত্র ধর্মীয় অনুশীলন ও পীরের উপদেশ/নির্দেশের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। এ হল ধর্মীয় পূর্ণতার উৎস—এই পূর্ণতা অর্জিত হলে আইনের বাহ্য অধ্যাদেশ আর বাধ্যতামূলক থাকে না ও বাস্তবিক নির্মূল হয়।

'বাতেনী', 'ইসমাইলিয়া' ও সমজাতীয় সম্প্রদায়গুলি সাধারণত মুসলমানদের থেকে পৃথক এদিক দিয়ে যে, তারা বিশ্বাসকে তাদের ধর্মের মূল বলে মনে করে। এদিক দিয়ে তারা খ্রিস্টানজগতের সব সংস্কারবিদ্ধ ধর্মসম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। লুথারের মতো "বিশ্বাসের মাধ্যমে ধর্মের যৌক্তিকতা প্রতিপাদনে" তারা বিশ্বাসী। লুথার খুব জোরের সঙ্গে পোষকতা করেছেন যে "খ্রিস্টে বিশ্বাস সব পাপীকে পরিত্রাণ করবে। সব শাখাদলসহ 'বাতেনী' ও ইস্মাইলিয়াগণ বিশ্বাস বা 'ঈমান'কে ঐশী ইমামের ওপর দৃঢ় নির্ভরতার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যতক্ষন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ঈমানের অধিকারী থাকবে ততক্ষণ তার বাহ্য কার্যকলাপ অকিঞ্চিৎকর।

এবার আমরা প্রকৃত শিয়া, মুহম্মদ-বংশের ইমামদের অনুসারীদের কথা আলোচনা করব। তারা সাধারণতঃ 'ইসনা আশারিয়া' নামে পরিচিত; তাদের এই নামকরণ হওয়ার মূলে রয়েছে তারা বারোজন ইমামের নেতৃত্ব স্বীকার করেন। 'ইসনা আশারিয়াগণ' মনে করেন যে নিম্নোক্ত ক্রমানুসারে 'ইমামত' অনুগমন করে ঃ

১। খলিফা আলী, সাধারণত মুর্তাযা আসাদ উল্লাহ আল্গালিব, (মনোনীত, আল্লাহর সিংহ, বিজয়ী; মৃত্যু ৪০ হিযরী ৬৬১খ্রী.) নামে অভিহিত।

২। হাসান, মুযতাবা (অনুমোদিত) অভিহিত : (৪৪ হি. ৬৬৪.)।

www.amarboi.org

৩। হোসাইন, শহীদে কারবালা (কারবালায় শহীদ) : (৬০ হি. ৬৭৯ খ্রী.)।

৪। দ্বিতীয় আলী, পবিত্রতার জন্য জয়নুল আবেদীন (ধার্মিকদের অলঙ্কার) : (মৃত্যু ৯৪ হি. ৭১৩ খ্রী)।

৫। মুহম্মদ আল্ বাকির (রহস্যের ব্যাখ্যাতা বা গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী)—তিনি ব্যাপক অধ্যয়ন ও ধর্মীয় নিষ্ঠার প্রতীক ছিলেন (জন্ম ৫৭ হি. ৬৭৬ খ্রী.—মৃত্যু ১১৩ হি. ৭৩১ খ্রী.)।

৬। জাফর আস্ সাদিক (সত্যবাদী) মুহম্মদ আল্ বাকিরের জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি ৮০ হিযরীতে (৬৯৯ খ্রী.) মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও আইনজ্ঞ হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি সব মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বোচ্চে। তাঁর পাণ্ডিত্য ও গুণাবলী, চরিত্রের উর্ধগামী পবিত্রতা ও সভ্যতা তদীয় বংশের শত্রুদেরও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল। তিনি ১৪৮ হিযরীতে (৭৬৫ খ্রী.) দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা আবুজাফর আল্ মনসুরের রাজত্বকালে পরিণত বয়সে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

৭। জাফর আস সাদিকের পুত্র আবুল হাসান মুসা আল কাজিম তাঁর ধর্মনিষ্ঠা ও "আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার প্রয়াসের" জন্য আল্ আব্দুস সালেহ (পবিত্র ভৃত্য/অনুগত) উপাধি লাভ করেছিলেন। ১২৯ হিযরীতে (৭৪৬-৭৪৭ খ্রী.) তিনি মদিনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ১৮৩ হিজরীর ২৫শে রজব (১লা সেপ্টেম্বর, ৭৯৯ খ্রী.) তারিখে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন; সেখানে হারুন অর রশীদ বেশ কয়েক বছরের জন্য তাঁকে অন্তরীণ রেখেছিলেন। কেননা হিযাযে ইমাম যে সম্মান পেয়েছিলেন। তাতে খলিফা অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। দ্য সসী বলেন যে, অন্তরীণ অবস্থায় হারুণ অর রশীদের আদেশে মুসাকে হত্যা করা হয়। তাঁর দুঃখ-দুর্দশা এবং পূত ও উন্নত চরিত্র সকল শ্রেণীর লোকদের নিকট তাঁকে অত্যন্ত প্রিয়পাত্র করে তুলেছিল এবং তাঁর জন্য বয়ে এনেছিল "ধৈর্যশীল" কাজিম উপাধি।

৮। আলী তৃতীয়—আবুল হাসান আলী যিনি তাঁর পূত চরিত্রের জন্য 'আর রেজা' বা অনুগৃহীত উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন পণ্ডিত, কবি ও প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক। তিনি ১৫৩ হিযরীতে (৭৭০ খ্রী.) মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন ২০২ হিযরীতে (৮১৭ খ্রী.) খোরাসানের তুস নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন। উম্মুল ফযল নাম্নী মামুনের এক বোনকে তিনি বিয়ে করেন।

৯। আবু জাফর মুহাম্মদ ঐশ্বর্য ও উদারতার জন্য 'আল্-যাওয়াদ' ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য 'ত্বাকী' উপাধি লাভ করেন। তিনি মামুনের ভাগ্নে এবং তাঁর কন্যা উম্মুল হাবিবকে বিয়ে করেন। খলিফা মামুন ও তাঁর উত্তরাধিকারী মুতাসিম (জ. ১৯৫ হি. ৮১১ খ্রী.—মৃ. ২২০ হি. ৮৩৫ খ্রী.) তাঁকে সর্বাধিক সমীহ করতেন।

১০। আলী চতুর্থ—ওরফে 'নকী' (পবিত্র) (২৬০ হিযরী ৮৬৮ খ্রী.)-তে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

১১। আবু মুহম্মদ আল্-হাসান ইবনে আলী আল্ 'আসকারী', উপনাম 'আল

www.amarboi.org

হাদী'—পথ প্রদর্শক : তিনি মুতাওয়াক্কিলের নিরীক্ষণাধীন সার্রামান রাআ-তে[৭৪] অবস্থিত তাঁর বাড়ী যা 'আসকার' (তাঁবু) নামেও পরিচিত—তাতে বসবাস করতেন।। তিনি স্মরণীয় ধর্মনিষ্ঠা ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী ছিলেন—তিনি কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন তিনি ২৩১ হিজরীতে (৮৪৫-৮৪৬ খ্রী.) মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৬০ হিজরীতে (৮৭৪ খ্রী.) মৃত্যুবরণ করেন। কথিত আছে মুতাওয়াক্কিল তাঁকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন।

১২। মুহম্মদ 'আল্-মাহদী' (২৬৫ হি. ৮৭৮/৮৭৯ খ্রী.) : এই শেষ ইমাম শিয়াদের বিশ্বাস অনুযায়ী পাঁচ বছর বয়সে সার্রামান রাআ'র এক গুহা থেকে অন্তর্হিত হন।[৭৫] শিয়াদের বিশ্বাস, এখনও তিনি বেঁচে আছেন; বিশ্বজনীন খিলাফতের প্রতিষ্ঠা ও মানবগোষ্ঠীর বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনার জন্য তারা প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। তাঁকে ইমাম 'গায়িব' (অনুপস্থিত ইমাম), ইমাম 'মুন্তাজির' (প্রত্যাশিত ইমাম) ও ইমাম 'কায়িম' (জীবন্ত ইমাম) বলা হয়।[৭৬]

ইস্না আশারিয়া সম্প্রদায় এখন 'শিয়া' বা ইসমাইলিয়া বলে অভিহিত—এরা দুটি শাখায় বিভক্ত : 'উসুলি' এবং 'আকবারী' (মূল-নীতির অনুসারী ও ঐতিহ্যের অনুসারী)। ইমামত ও শেষ ইমামে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে 'মুজতাহিদ' যারা নিজেদের ইমামের প্রতিনিধি বলে অভিহিত করেন তাদের ব্যাখ্যার গুরুত্বের পরিমাণের ব্যাপারে তারা একমত নন। উসুলি শাখা ব্যাখ্যাতাদের পক্ষে ইমামের রায় নাকচ করার কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেন। উসুলিরা প্রতিপন্ন করেন যে আইন সুস্পষ্ট এবং এটা তাদের কর্তব্য যে প্রজ্ঞা ও মানবচিন্তার অগ্রগতির আলোকে তা গঠন করা এবং তাদের মতো ভ্রান্ত লোকদের নির্দেশ মোতাবেক তাদের বিচার বিশ্লেষণের পক্ষে পরিচালিত না হওয়া, আর জগতকে মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত না করা। তারা অভিমত পোষন করেন যে খোদার প্রত্যাদেশের মধ্যে এমন জটিল শব্দ নেই যার ফলে ঐশী তাৎপর্য লুক্কায়িত থাকতে পারে। এসব বাণী আল্লাহর প্রেরিতপুরুষদের মাধ্যমে মানুষের নিকট তাদের অনুধাবন ও পালনের জন্য ব্যক্ত। সুতরাং প্রেরিত পুরুষদের মাধ্যমে প্রকাশিত ঐশী নির্দেশ অনুধাবনের জন্য কোন পুরোহিত বা আইনজ্ঞের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে আকবারী শাখা মুজতাহিদদের ব্যাখ্যাকে দাসসুলভ মনোভাব নিয়ে পালন করে থাকে।

উসুলি মতবাদ অনুসারে হযরতের মৌলিক বাণীসমূহ প্রকৃতির দিক দিয়ে কোরআনিক অধ্যাদেশের পরিপূরক এবং তাদের অবশ্য পালনীয় গুণ কোরআনের শিক্ষার সঙ্গে তাদের মিলের মাত্রার উপর নির্ভরশীল। সুতরাং হযরতের যেসব বাণী কোরআনের মর্মবাণীর সঙ্গে বিরোধপূর্ণ সে সব বানোয়াট বলে বিবেচিত। নৈয়ায়িক নিয়মাবলী ও সুনির্দিষ্ট তথ্য-নির্ভর স্বীকৃতি নীতিসমূহের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। এই নিয়মাবলী মুতাজিলাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নমুনা লাভ করেছে : তারা পবিত্র হাদিস থেকে হযরতের যেসব কথিত বাণী পৃথক করেছিলেন যেগুলি তাঁর

www.amarboi.org

পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা, যা তাঁর পরিবারের দার্শনিক ও আইনজ্ঞদের দৃষ্টান্ত সহকারে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছিলেন, তার সঙ্গে বিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছিল।

উসুলিগণ হাদিসসমূহকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন : (ক) সহীহ হাদিস, (খ) উত্তম হাদীস (হাদিসে হাসানা), (গ) শক্তিশালী হাদিস (হাদিসে মুসাকা) ও (ঘ) দুর্বল হাদিস (হাদিসে জইফ)। 'সহীহ হাদিস' হল এমন হাদিস যার সত্যতা চূড়ান্তভাবে নিষ্পাপ ইমাম পর্যন্ত বর্তায়, ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ইমামের বর্ণনানুযায়ী, যাঁর চরিত্রের সততা সম্পর্কে হাদিসের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে। হাদিসের সনদ বর্ণনার সাক্ষ্য সর্বদা ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতায় হওয়া চাই। 'হাদিসে হাসানা' সেই সব উত্তম হাদিস যার সনদের সাক্ষ্য প্রমাণ সহীহ হাদিসের ন্যায় নিষ্পাপ ইমাম পর্যন্ত পৌছায়। একজন মাননীয় ইমামের বর্ণনানুসারে যদিও ঐতিহাসিকগণ "বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ" বর্ণনাকারীর (সিকাহ আদিল) কথা বলেননি তথাপি তাকে প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী বলেছেন। 'হাদীসে মুসাকা' বা শক্তিমালী হাদিস এমন হাদিস যা এমন লোকে বর্ণনা করেছেন, ঐতিহাসিকগণ যাদেরকে ধার্মিক ও ন্যায়পরায়ণ" বলে বর্ণনা করেছেন, যদিও তাদের কেউ কেউ বা সকলেই "ইমাম বা আলীর অনুসারী" নন। আর 'হাদিসে জইফ' বা দুর্বল হাদিস হল সেই সব হাদিস যা এর কোন শর্ত পূরণ করে না। প্রথম তিন প্রকার হাদিসই উসুলিগণ অনুমোদন করেন।

আর, হাদিস গ্রহণযোগ্য হওয়ার আগে দেখতে হবে যে তা 'নিয়মিত পারস্পর্যে' এসেছে কিনা। কোন হাদিসকে তখনি নিয়মিত পারস্পর্যে আগত বলে ধরা হবে যখন তা বহু লোকে এক নিয়মিত সময়সীমার মধ্যে বর্ণনা করেছেন এবং 'নিষ্পাপ' ইমামে পৌঁছেছে, এই শর্তসাপেক্ষে যে প্রত্যেক যুগে এক অধিক সংখ্যক লোকে তা বর্ণনা করেছেন যে একই সঙ্গে এতগুলি লোকের পক্ষে মিথ্যা বলা অসম্ভব। আর অনিয়মিত পারস্পর্যে আগত হাদিস হল সেগুলি যার বর্ণনাকারীগণ সংখ্যায় নগণ্য এবং পূর্বের মতো সাক্ষ্য-প্রমাণহীন। এ ধরণের হাদিস "হাদিসবিদদের বিশেষ পরিভাষায়, একজনের বর্ণনা" বলে কথিত।

উসুলিগণ আইন-প্রণয়ন ও হাদিসের গ্রহণ, প্রয়োগ ও ব্যাখ্যার ব্যাপারে নিজেদের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে থাকেন। তারা 'মুজতাহিদের' ব্যাখ্যা মেনে নিতে রাজী নন, যদি তাদের বিচারবুদ্ধি ও বিবেক বলে যে তাদের ব্যাখ্যা প্রত্যাদিষ্ট বা প্রাকৃতিক আইনের, ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞার পরিপন্থী। 'আকাবরী' যেভাবে সমালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ব্যতিরেকে অসংখ্য হাদিস গ্রহণ করেন তার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন উসুলিগণ ইসলামের না হলেও অন্ততঃ শিয়াবাদের উদার মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করেন।

'দাবিস্তান' অনুসারে 'আখবারীগণ' সম্পূর্ণরূপে হাদিসের উপর নির্ভর করেন এবং ইজতিহাদের (ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনা গবেষণার) প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন—এ থেকে তারা হাদিস সমর্থক বা 'আখবারী' নামে পরিচিত। কারণ তাদের বিবেচনায় ইজতিহাদ করা ইমামদের রেওয়াজের বিরোধী। তারা প্রচলিত সব হাদিসই সহীহ বলে

www.amarboi.org

মনে করেন যদি তাতে কোন ইমাম বা হযরতের নামযুক্ত করে থাকে। হাদিস হলেই হল, এবং এতেই যে হাদিস তাদের কাছে সহীহ্ বলে পরিগণিত এবং কোন্ উৎস থেকে সে হাদিস এসেছে তা পরখ করার কোন প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেন না।[৭৭] এটা বলার প্রয়োজন রাখে না যে এই সহজ নীতির অধীনে ইসলামী শিক্ষার সঙ্গে অসংখ্য হাদিস ও বাণী এসে মিশ্রিত হয়েছিল যা ইসলামের মূলনীতির সঙ্গে সংশ্রবহীন। জনগণের হৃদয় থেকে প্রাচীন ধর্মমত একেবারে মুছে যায়নি এবং এটা অসম্ভব ছিল যে জাতীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও তাতে প্রাচীন ধর্মমত নতুন ও অনুমোদিত পোষাকে প্রকাশ পাবে না। চরম আখবারী মতবাদ যে ইসলামের মহান বীরকে ওরমুজদ ও তার বংশধরদের আমসাসপাণ্ডে পরিণত করেছে—এটা গোবিনিউ কিছুটা রুক্ষভাবে হলেও নিতান্ত অযৌক্তিকতার সঙ্গে অভিযোগ করেননি।

আখবারী মতবাদ অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত মোল্লাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য জনপ্রিয় ধর্মমত। উসুলিদের মতবাদ সমাজের সবচেয়ে বুদ্ধিজীবি এবং যাজকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনুমোদন লাভ করেছিল। সাম্প্রতিককালে উসুলী মতবাদসমূহের সর্বশ্রেষ্ঠ উল্লেখ প্রবক্তাদের অন্যতম হলেন সিরাজের অধিবাসী মোল্লা সাদরা[৭৮] (মুহম্মদ ইবনে ইবরাহিম); তিনি সম্ভবত তাঁর কালের সবচেয়ে শক্তিমান পণ্ডিত ও তার্কিক। তিনি পারসিকদের মধ্যে দর্শন ও মানবকল্যাণমূলক বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবনকারী। বুওয়াইহ্‌দের পতনের পর সাফেরীদের অভ্যুত্থান পর্যন্ত পারস্যদেশ দুর্যোগের মেঘে আচ্ছন্ন ছিল। ধর্মীয় গোঁড়ামি দর্শন ও বিজ্ঞানকে নির্বাসিত করেছিল। আভিসেনা (ইবনে সিনা)-র নাম ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল এবং তাঁর গ্রন্থসমূহ জনসমক্ষে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। এই শতাব্দীগুলিতে ইসলামী পোশাকে অনেক মাজদেকী ঐতিহ্য অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। প্রকৃত ফাতেমীয় পণ্ডিতগণ নির্বাসিত হয়েছিলেন এবং একদল ধর্মতত্ত্ববিদ জাতীয় দুর্যোগ ও কুসংস্কারের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জনগণকে অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখেছিলেন। মোল্লা সদরাকে খ্রিস্টানজাহানের একগুঁয়ে পাদরীদের ন্যায় ধর্মতত্ত্ববিদদের সঙ্গে বাদানুবাদ করতে হয়েছিল এবং তারা তাদের ধর্মীয় গোঁড়ামির রক্ষণশীলতার ওপর সামান্য আঁচড়ও সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু মোল্লা সাদরার ছিল প্রভূত অধ্যাবসায় ও বিচক্ষণতা। তিনি অনেক কষ্টে দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা পুনরুজ্জীবিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। আর একবার উসুলি মতবাদ অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করল। এর দার্শনিক প্রতিপক্ষ মুতাজিলা মতবাদ প্রশ্নাতীতভাবে ইসলামের সবচেয়ে বুদ্ধিবাদী ও উদারপন্থী দিক। উদারতা, মনুষ্য-চিন্তার সকল পর্যায়ের সঙ্গে সহানুভূতিশীলতা, মহান আশাবাদ ও ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে এই মতবাদ মুহম্মদের দার্শনিক বংশধরদের ধারণার প্রতিনিধিত্ব করেছে, যারা শিক্ষাগুরুর চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটিয়েছিল।

অদ্যাবধি যে রাজনৈতিক দলাদলি শিয়াদের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ করেছিল তা তিরোহিত হচ্ছে। এ ছাড়া অবশিষ্ট সম্প্রদায় দ্রুত ইসনা আশারিয়াদের মধ্যে বিলীন হয়ে

www.amarboi.org

যাচ্ছে। পারস্য, আরব, পশ্চিম আফ্রিকা ও ভারতের শিয়াদের অধিকাংশ এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইসনা আশারিয়া মতবাদ এরূপে শিয়া মতবাদের সঙ্গে একার্থক হয়ে পড়েছে।

আখবারীদের মতো সুন্নীরা হাদীসের উপর তাঁদের মতবাদসমূহের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে আখবারীদের সঙ্গে তাদের পার্থক্য এই যে, প্রকৃত বা সহীহ্ হাদীস হওয়ার জন্য তাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা পার হয়ে নিশ্চয়তাজ্ঞাপক হতে হয়। এখানে তারা উসূলিদের নিকটবর্তী। তারা খলিফাদের ও বিশ্বাসী সাধারণের (ইজমাউল উম্মাতের) ঐক্যমতকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং তা কোরআনের বিধি-বিধানের সম্পূরক ও প্রামাণ্যের দিক দিয়ে প্রায় তার সমকক্ষ।

সুন্নীরা বিভিন্ন মত-পার্থক্যের জন্য পরস্পর বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত এসব অপ্রধান গোষ্ঠীগত পার্থক্য অনেক সময় তাদের মধ্যে তীব্র রেষারেষি ও নির্যাতনের পথ করে দিত। যাহোক প্রধানতঃ তারা তাদের মতবাদ ও আইনের মৌলিক ভিত্তি সম্পর্কে একমত পোষন করতো এবং চারটি অপরিবর্তিত উৎস থেকে তাদের মতবাদ গৃহীত হয়েছিল বলে তাঁরা মনে করতেন। এই চারটি উৎস হল : (ক) কোরআন, (খ) হযরতের সুন্নাত বা হাদিস, (গ) ইজমাতুল উম্মাত (মুসলিম উম্মার মধ্যে ঐক্যমত) এবং (ঘ) ক্বিয়াস (ব্যক্তিগত মীমাংসা)। হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হল (১) হযরতের সকল বাণী, উপদেশ ও মৌখিক আদেশ (কওল), (২) তাঁর কার্যাবলী ও প্রাত্যহিক অনুশীলন (ফে'ল) এবং (৩) তাঁর শিষ্যদের সম্পাদিত কোন কার্য সম্পর্কে তাঁর মৌন সম্মতি-নির্দেশক নীরবতা বা তাকরির। এসব সহকারী উৎস থেকে অনুমিত নিয়মগুলি প্রামাণ্যতার দিক দিয়ে প্রভূত পরিমাণে মত-পার্থক্যের সূচনা করে। যদি নিয়মগুলি বা হাদিসের আদেশসমূহ সর্বজনবিদিত ও সার্বিক নিন্দার বিষয় হয় তবে তা সম্পূর্ণরূপে সহীহ্ ও চূড়ান্ত হবে। 'আহাদিসে মুত্ওয়াতিরেহ্'। যদি কোন হাদিস সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের জানা থাকা সত্ত্বেও সার্বজনীন নিন্দার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে না তবে তাকে 'আহাদিসে মাশহুরা' বলে অভিহিত করা হয় এবং এই শ্রেণীর হাদিস মর্যাদার দিক দিয়ে 'আহাদিসে মুতাওয়াতিরেহ্'-এর পরেই। আর 'আখবার-ই ওয়াহিদ' যার সত্যতা নির্ভর করে ব্যক্তির প্রমাণের উপর, তাদের নিকট তার কোন মূল্য নেই। কাজেই তাঁর সঙ্গে কথকদের বাস্তব সম্পর্কে নির্বিশেষে হযরতের সমসাময়িক লোক ও শিষ্যদের পরিবেশিত হাদিস প্রকৃত ও খাঁটি হাদিস বলে গণ্য হবে যদি ব্যক্তিগত সাক্ষ্যের মূল্য যাচাই করার কতকগুলি নির্বিচারমূলক শর্ত পূরণ করে। 'ইজমুল উম্মাত' বাক্যাংশ সাধারণ ঐক্যমত বুঝায়। এই সমষ্টিগত নামের অধীনে ধর্মীয়, দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিষয়ে যাবতীয় অ্যাপস্টলিক নিয়ম, ভাষ্য, টীকা, হযরতের নেতৃত্ব স্থানীয় সাহাবাদের সিদ্ধান্ত, বিশেষভাবে প্রথম চারজন খলিফার (খোলাফায়ে রাশেদীন) সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে আইন ও মতবাদের এসব উৎস বিস্মৃতির গর্ভে নির্বাসিত হয়েছে। আর প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিজস্ব বিশেষজ্ঞের আইন ও মতবাদ ব্যাখ্যা অন্ধভাবে মেনে চলেছে। একে 'তাকলিদ' বলা হয়ে থাকে। চার মযহাবের কোন মযহাবের বিশেষজ্ঞের মতবাদ না মানলে তাকে 'গোঁড়া' বলে বিবেচনা করা হয় না।

www.amarboi.org

সুন্নীদের মধ্যে চারটি মযহাবের[৭৯] প্রতিষ্ঠাতাদের নামানুসারে মযহাব বা সম্প্রদায়গুলির নাম হয়েছে : হানাফী, শাফেয়ী, মালিকি ও হাম্বলী।

আবু হানিফা[৮০] নিজের নামানুসারে প্রথম মযহাবের নামকরণ করেছিলেন। তিনি ৮০ হিজরীতে মারওয়ানের পুত্র আব্দুল মালিকের রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিয়া আইনে শিক্ষিত হন এবং ইমাম জাফর আস্ সাদিকের নিকটে আইন বিজ্ঞানে প্রথম প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন, আর আবু আব্দুল্লাহ ইবনে আল্ মুবারক ও হামিদ ইবনে সোলায়মানের নিকট থেকে হাদিস শ্রবণ করেন। আবু হানিফা প্রায়ই মহান শিয়া ইমামের উদ্ধৃতি দিতেন : তাঁর নিজ শহর কুফায় প্রত্যাবর্তনের পর যদিও তিনি আলীর সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলেন তথাপি শিয়া আইনগোষ্ঠী পরিত্যাগ করেন এবং নিজের আইন-ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এই আইন-ব্যবস্থা শিয়াদের থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পৃথক। তবে তাঁর ব্যবস্থা ও শিয়াদের ব্যবস্থার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যে তিনি কোথেকে তাঁর প্রেরণা গ্রহণ করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নেই। আইনের ব্যাখ্যায় ব্যক্তিগত রায়ের প্রতি তিনি যে স্বাধীনতা দান করেছেন তা প্রশ্নাতীতভাবে ফাতেমীয় বিশেষজ্ঞদের মতামতের প্রতিফলন বলে মনে হয়। তাঁর অনুসারীরা তাঁকে 'ইমামুল্ আজম'/ মহান নেতা বলে অভিহিত করেন। তিনি ১৫০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি যে মতবাদ শিক্ষা দিয়েছেন তা ভারতীয় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মধ্যে, আফগান, তুর্কীম্যান, মধ্য এশিয়ার প্রায় সব মুসলমানদের মধ্যে তুর্কী ও মিশরীয়দের মধ্যে প্রচলিত আছে। তদীয় মযহাবের অনুসারী সংখ্যা সর্বাধিক।

দ্বিতীয় মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা (আবু আব্দুল্লাহ) মালিক ইবনে আনাস। তিনি হারুন-অর রশীদের খেলাফত কালে ১৭৯ হিযরীতে ইন্তেকাল করেন।

তৃতীয় মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা শাফেয়ী। আবু হানিফা যে বছর ইহলীলা সংবরণ করেন সেই বছরে তিনি সিরিয়ার গাজ্জা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মামুনের খেলাফত কালে ২০৪ হিযরীতে (৮২৯ খ্রী.) মিশরে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ফাতেমীয় ইমাম আলী ইবনে মুসা আররিয়ার সমসাময়িক। শাফেয়ীর মতবাদগুলি সাধারণভাবে উত্তর আফ্রিকায়, আংশিকভাবে মিশর দক্ষিণ আরব ও মালয় উপদ্বীপে আর সিংহলের মুসলমানদের মধ্যে অনুসৃত হয়ে থাকে। বোম্বে প্রদেশের 'বোরাহ'দের[৮১] মধ্যে তাঁর অনুসারী দৃষ্ট।

চতুর্থ মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইবনে হাম্বল। তিনি খলিফা মামুন ও তাঁর উত্তরাধিকারী মুতাসিমবিল্লাহের আমলে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই দু'জন খলিফা ছিলেন মুতাজিলা মতাবলম্বী। ইবনে হাম্বলের চরম ধর্মান্ধতা, এবং যে একগুঁয়েমি সহকারে তিনি খলিফাদের বিরুদ্ধে জন-সাধারণের গোঁড়ামির উদ্দীপিত করছিলেন। তাতে তিনি দেশের শাসকদের অসম্প্রীতি অর্জন করেন। তিনি ২৪১ হিযরীতে পূতপবিত্রতার ভেতর মৃত্যুবরণ করেন। সমগ্র সাম্রাজ্যের মধ্যে মুতাজিলা মতবাদ প্রসারে মামুনের যে ব্যর্থতা এবং নির্যাতনের যে প্রকাশ মুসলিম জাহানকে মুসলমানের রক্তে প্লাবিত করেছে তার জন্য ইবনে হাম্বল ও তাঁর সমর্থকগণ দায়ী ছিলেন।

www.amarboi.org

বিভিন্ন সুন্নী মযহাবের মধ্যে আইনগত পার্থক্য সম্পর্কে আমরা অন্যত্র[৮২] বলেছি; তাদের মতবাদগত পার্থক্যগুলি উপাসনার বিস্তারিত আনুষ্ঠানিক খুঁটিনাটি বর্ণনা করে, সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য এ ধরনের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যাহোক, বলা যেতে পারে যে হাম্বলী মযহাবের লোকেরা সবচেয়ে স্পষ্ট অ্যানথ্রোপোমরফিস্ট বা খোদায় মানবদেহ আরোপকারী তাদের নিকট আল্লাহ্ সিংহাসনে সমাসীন মানুষের মতো সত্তা। অন্যান্য মযহাবের ভেতর ধারণাগুলি কাল ও জাতি অনুসারে অনেক তারতম্যের অধীন। আল্লাহতে প্রাকৃতিক গুণ আরোপ মুখ্য উপাদান। সন্দেহ নেই যে হানাফী মতবাদ মূলতঃ এসব মযহাবের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উদারপন্থী ছিল, আর শাফেয়ী ও মালেকী পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং ধারণা ও সহানুভূতির দিক দিয়ে কঠোর। কালের অগ্রগতিতে যেমন স্বৈরতন্ত্র জাতির অভ্যাস ও প্রথার উপর চেপে বসেছিল আর আইন-জীবীদের কাছ থেকে কোন বাধা না পেয়ে খলিফা ও সুলতান তাদের ভাগ্য বিধাতা হয়ে বসেছিল তেমনি যাজকতন্ত্র সমাজের সব শ্রেণীর লোকদের মনমগজ অধিকার করে বসেছিল। মযহাবের প্রধানদের নির্দেশই আইনে পরিণত হয়েছিল। হানাফীরা নিজেরা ও অন্যান্য মযহাবের সমর্থকগণ তাদেরকে অন্যান্য মযহাবের সঙ্গে বৈপরীত্যের তুলনায় 'আহ্লুর রায় ওয়াল কিয়াস' বলে অভিহিত করত, আর অন্যান্যদেরকে বলা হত 'আহলুল্ হাদিস' বা হাদিসবাদী। এরা বহুপূর্ব থেকেই আইন বা মতবাদের ক্ষেত্রে তাদের বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ স্থগিত করেছিল। মযহাব প্রধানগণ যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অপরিবর্তনীয় ও আলোচনার আওতা বহির্ভূত। এস্কিমোদের দেশে ধর্ম নীতি হলেও ইরাকীদের জন্য যে নিয়মাবলী রচিত হয়েছে তা-ই অবশ্যই সঙ্গে যাবে।

কাজেই যাজকতন্ত্র সুন্নীদের মধ্যে ক্রমবিকাশের সব আশা ধ্বংস করে দিয়েছে। ধর্মমত ও অনুশীলনের সমতাকে নিশ্চিত করার প্রয়াস গত একশ বছরের মধ্যে সুন্নী মযহাবের মধ্যে দু'টি উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহ সংঘটিত করিয়েছে। ওয়াহাবী মতবাদ উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবির্ভূত হয়েছিল ও মরুভূমি থেকে তার প্রাণশক্তি আহরণ করেছিল। 'গায়ের মুকাল্লিদ মতবাদ' মানবহৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত এবং প্রতিষ্ঠিত যাজকতন্ত্রের কঠোর ধর্মধ্বজিতা/ধর্মকপটতা থেকে নিষ্কৃতির প্রয়াস-কাঙ্ক্ষিত। 'গায়ের মুকাল্লিদগণ' প্রচলিত ধর্মমতে অবিশ্বাসী এবং তাদেরকে ভুলক্রমে ও অসঙ্গতভাবে ওয়াহাবীদের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। সুন্নী মযহাবের অন্যান্য শাখার অনুসারীদের চেয়ে গায়ের মুকাল্লিদগণ নিঃসন্দেহে অধিকতর দার্শনিক ও বুদ্ধিবাদী। সন্দেহাতীতরূপে সংকীর্ণ এবং পরিসর সীমাবদ্ধ ও সহানুভূতিশূন্য হওয়া সত্ত্বেও গায়ের মুকাল্লিদ মতবাদ সুন্নী ধর্মমতের মধ্যে এমন একটি আন্দোলন যা ভাবীকালের জন্য এক মহান সম্ভাবনাময়।

ইউরোপে সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে যে বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল তা হানাফীদের মধ্যে আরম্ভ হয়ে গিয়েছে এবং বহু পূর্ব থেকে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিল যে মুসলমানদের সব সম্প্রদায় ও মতাবলম্বীদের মধ্যে এটা অনুভূত হবে। আরবী

www.amarboi.org

কোরআনের সঙ্গে কি অনূদিত কোরআন একই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, অন্য ভাষায় উচ্চারিত প্রার্থনা, আরবী জানে না এমন ব্যক্তির মাতৃভাষায় উচ্চারিত প্রার্থনা কি হিযাযের ভাষায় উচ্চারিত প্রার্থনায় সমমর্যাদাসম্পন্ন—ভারতের মুসলমানদেরকে এমনি প্রশ্ন উদ্দীপিত করছে। বিরোধ ইতিমধ্যে অনেক তিক্ততার ও গোঁড়াদের অভিসম্পাতের জন্ম দিয়েছে। আর সংস্কারকগণ অভিনন্দন পেতে পারেন যে, তাঁরা যে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন তা এখন এক নিরপেক্ষ সরকার কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে। যে পুরাতন আপত্তি সুবিধাবাদী কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক অভিনবত্বের বিরুদ্ধে পেশ করেছে সংস্কার আন্দোলনের নেতাগণ প্রশ্নের মাধ্যমে তার জবাব দিয়েছেন : আরবী কি একমাত্র ভাষা যা আল্লাহ্ বোঝেন? যদি তা না হয়, তবে হযরত কর্তৃক নামাজ প্রবর্তনের কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? যদি উপাসককে আল্লাহর সন্নিকটবর্তী করা আর হৃদয়কে পবিত্র ও সমুন্নত করা নামাজের উদ্দেশ্য হয় তবে সে কি করে এর সমুন্নতকারী প্রভাব অনুধাবন করবে যদি সে যা না বোঝে তা শুধু বিড়বিড় করে বলতে থাকে? তারা যুক্তির মাধ্যমে হযরতের দৃষ্টান্তের প্রতি আবেদন করেছেন, যিনি তাঁর পারসিক অনুসারীদেরকে তাদের মাতৃভাষায় প্রার্থনা করতে অনুমতি দিয়েছিলেন।[৮৩] এই আন্দোলন যা এখনও ইউরোপবাসীদের কাছে অপরিজ্ঞাত তার মধ্যে বিরাট ক্রমবিকাশের বীজ নিহিত রয়েছে। এ হল সংস্কারের সূচনা, অদ্যাবধি ইসলামের ধর্মতত্ত্ববিদেরা মধ্যযুগের খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের ন্যায় জনসাধারণ বা সুলতানদের নিকট অজ্ঞাত এক ভাষার জ্ঞানের মাধ্যমে প্রভুত্বকারী প্রভাব বিস্তার করেছেন। একবার যদি সংস্কারকগণ যে নীতির খাতিরে কাজ করেছেন তা গ্রহণ করা হয় তবে আজকের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগরহিত জনগণের জন্য খ্রিস্টীয় নব ও দশম শতাব্দীতে প্রণীত ব্যবস্থা হাজার বছরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে অনুধাবন করতে হবে, ব্যাখ্যা করতে হবে।

'খারেজী মতবাদ'কে প্রায়ই সুন্নী মতবাদের একটি শাখা হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে যদিও সুন্নী মযহাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্বে এই মতবাদ প্রকৃতপক্ষে জন্মলাভ করে। যে অবাধ্য সৈন্যদল সিফ্ফিনের যুদ্ধে অর্জিত বিজয়ের ফল প্রত্যাখান করার জন্য খলিফা আলীকে বাধ্য করেছিল এবং পরে যারা নাহর্ওয়ানে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল তারাই সর্বপ্রথম 'খারেজী' বা বিদ্রোহী নাম ধারণ করেছিল। শাহ্রিস্তানী এই বিদ্রোহের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন। এরাই সেই সব লোক যারা আলীর সঙ্গে তাঁর পরম শত্রু মাবিয়ার বিবাদের সালিশের জন্য সবচেয়ে আগ্রহী ছিল। তারা তাদের প্রধানের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবু মুসাকে মুহম্মদের বংশধরদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জোর করেছিল, কিন্তু মীমাংসা হতে না হতেই এসব সৈনিক-ধর্মতত্ত্ববিদেরা, ইসলামের এই চুক্তিবিদেরা মনুষ্য-বিচারের প্রতি কোন কারণ আরোপ করার অপবিত্রতা সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে তীব্র বিরোধে নিপতিত হল। শত্রুদের সম্মুখে মুসমানদের একে অপরকে হত্যার দৃশ্যকে প্রতিরোধ মানসে সালিশের ফলাফল দেখার জন্য দুমাতুল জান্দাল-এ সৈন্যদের একটি ক্ষুদ্রাংশ রেখে অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে কুফায় চলে গেলেন।

www.amarboi.org

কুফায় বার হাজার বিদ্রোহী খলিফাকে পরিত্যাগ করল, এবং নাহ্রওয়ানে অবস্থান গ্রহণের পর তারা খলিফাকে ভীতি-প্রদর্শন করতে লাগল। রক্তপাতের প্রতি আলীর সে স্বভাবসুলভ বিতৃষ্ণা তার ফলে তিনি তাদেরকে বার বার তাদের আনুগত্যে প্রত্যাবর্তন করার জন্য অনুরোধ জানালেন। প্রতি উত্তরে তারা তাঁকে মৃত্যুর ভয় দেখাল। মানুষের ধৈর্য এই একগুঁয়েমি দীর্ঘদিন সহ্য করতে পারে না। তারা আক্রান্ত হল এবং পরপর দুটি যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করল। কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী শাহ্‌রিস্তানীর মতে পলায়ন করল এবং বাহ্‌রাইনে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করল, সেখানে সকলের জন্য ছিল আশ্রয়স্থল। তারা সেখানকার অসভ্য অধিবাসীদের মধ্যে তাদের অনিষ্টকর মতবাদগুলি প্রচার করতে লাগল। তারা আব্দুল মালিকের সময়ে পুনরায় আবির্ভূত হয়েছিল। তিনি তাদেরকে তাদের আল্‌আহ্‌সা ও আল্ বাহ্‌রাইনের ঘাঁটিতে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করেছিলেন। আবার তারা দ্বিতীয় মারওয়ানের আমলে বের হয়েছিল এবং ইয়েমেন, হিযায ও ইরাকে বিস্তার লাভ করেছিল। তারা আক্রান্ত হয়ে পরাজয় স্বীকার করেছিল এবং ওমানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। সেই থেকে সেখানে তারা বসবাস করে আসছিল। আব্বাসীয়দের শাসনাধীনে তারা আফ্রিকার বর্বরদের মধ্যে তাদের মতবাদ প্রচার করেছিল; তারা বর্বরদেরকে বাগদাদের খলিফার বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করেছিল। খারেজীগণ হল ইসলামের ক্যালভানিস্ট। তাদের মতবাদগুলি বিষাদপূর্ণ, কঠোর ও ধর্মান্ধতাপূর্ণ তারা কঠোর নিয়তিবাদী। তারা ওমরের পরে আর কারও ইমামত গ্রহণ করে না। তাদের মতে তাদের প্রধান হল বৈধ ইমামগণ। তাদের অন্যান্যদের সুন্নীদের থেকে এই অভিমত পোষন করার জন্য পৃথক, যে মুসলমানদের ইমাম নির্বাচিত হওয়ার জন্য কোন ব্যক্তিকে কোরাইশ কিংবা স্বাধীন হওয়ার প্রয়োজন নেই। দাস ও অ-কোরাইশ ব্যক্তিও কোরাইশ ও স্বাধীন ব্যক্তির মতো ইমামত বা নেতৃত্বের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত। শাহ্‌রিস্তানীর মতে, খারেজীগণ ছয়টি গোষ্ঠীতে বিভক্ত, তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ 'আযারিকা গোষ্ঠী' (আব্দুর রশীদ নাফি ইবনে আযরাকের অনুসারীগণ), 'ইবাদিয়া গোষ্ঠী' (আব্দুল্লাহ্ আবনে ইবাদের শিষ্যগণ, যিনি শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের রাজত্বকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন)', 'নেযদাত আযারিয়া' (নেযদাত ইবনে আমিরের শিষ্যগণ), 'আযারিদা গোষ্ঠী' (আব্দুল করীম ইবনে আযরাদের শিষ্যগণ) এবং 'সুফারাউস জিয়াদিয়া'।

এসব গোষ্ঠীর মধ্যে 'আযারিকা গোষ্ঠী' সর্বাপেক্ষা ধর্মান্ধ রক্ষণশীল ও সংকীর্ণমনা। তাদের মতে নিজ সম্প্রদায় ব্যতিরেকে প্রত্যেক সম্প্রদায় বিনাশের অধীন—তারা মুক্তি পাবে না; সুতরাং তাদেরকে হয় বলপূর্বক দীক্ষিত করতে হবে নতুবা নির্মমভাবে ধ্বংস করতে হবে। কোন পৌত্তলিক বা মুশরিকের (একটা ব্যাপক শব্দ যা মুসলমান, ইহুদী ও খ্রিস্টান সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে) প্রতি বিন্দুমাত্র দয়া দেখানো উচিত নয়। তাদের মতে, সব পাপই একই ধরনের একই পরিমাপের : হত্যা, ব্যাভিচার, মদ্যপান, ধুমপান সবই ধর্মের কাছে নিন্দনীয় অপরাধ। যখন শিয়া ও সুন্নী—অন্যান্য মুসলমানেরা অভিমন পোষণ করেন যে প্রত্যেক শিশু ইসলামে (শান্তি ও আনুগত্যের স্বভাবে) জন্মগ্রহণ করে[৮৪]

www.amarboi.org

এবং যতদিন না শিক্ষার দ্বারা বিপথগামী না হয় ততদিন পর্যন্ত সে শান্তি ও আনুগত্যের স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে। অপরপক্ষে, আযারিকগণ ঘোষণা করেন যে ধর্মদ্রোহীর সন্তান ধর্মদ্রোহী হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। গোঁড়া খ্রিস্টানরা যুক্তি দেখান যে শিশুকে যদি দীক্ষিত করা না হয় সে চিরতরে বিনষ্ট হয়। খ্রিস্টানদের মতো খারেজীরা ঘোষণা করেন যে, যে শিশু কালিমা না পড়বে সে মুক্তির গণ্ডী-বহির্ভূত থাকবে। হাজাজ বিন ইউসুফ আযারিকা গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেন কিন্তু তাদের রক্তক্ষয়ী, প্রচণ্ড ও নিষ্ঠুর মতবাদসমূহ নয় শতাব্দী পরে ওয়াহাবী মতবাদের মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করে।

'ইবাদিয়া' গোষ্ঠী নিশ্চিতভাবে অপেক্ষাকৃত কম গোঁড়া ছিল। তাদের অধিকাংশ সদস্য ওমানে বসতি স্থাপন করেছিল এবং মাসকাতের সীমা-রেখার মধ্যে এখনও তাদেরকে দেখতে পাওয়া যায়। আযারিকা গোষ্ঠী পরে ওয়াহাবীরা ইবাদিয়াদের সঙ্গে সাংঘাতিক বিবাদে লিপ্ত ছিল।

তাদের মতে সাধারণত মুসলমানেরা অবিশ্বাসী, তবে পৌত্তলিক (মুশরিক) নয়। ফলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। এ বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে তারা আযারিকাদের থেকে পৃথক। তাদের লোকদের বিরুদ্ধে তারা সাধারণ মুসলমানের সাক্ষ্য অনুমোদন করে। তারা এই অভিমত পোষন করেন যে একমাত্র যুদ্ধের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে মুসলমানদের দ্রব্যসম্ভার নেওয়া অবৈধ এবং শাহরিস্তানী বলেন "ধর্ম-বিদ্রোহীর সন্তানের ধর্মদ্রোহিতার উপর কোন মতামত ব্যক্ত করে না": তারা তাদের ভাই আযারিকাদের মতো হযরতের প্রধান শিষ্যদের প্রত্যাখ্যান ও অভিসম্পাত দানের বিষয়ে একমত।

ইবাদিয়াগণ এখন পর্যন্ত ওমান তাদের দখলে রেখেছে। ওয়াহাবীদের জোর তাগিদে তারা প্রাচ্য আরবের উপকূলে তাদের ক্ষমতা সংরক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। তবে তারা দ্রুতগতিতে সাধারণ মুসলমানের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে বলে মনে হয়।

মি. প্যালগ্রেভ তাঁর ট্রাভেল্‌স ইন. সেন্ট্রাল অ্যারাবিয়া গ্রন্থে ওয়াহাবীদের অনুকূল রংয়ে রঞ্জিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তারা আযারিকাদের প্রত্যক্ষ বংশধর। হাজাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক পরাজিত হওয়ার পর তাঁরা মধ্য আরবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আব্দুল ওয়াহাবের মতবাদসমূহ নাকি ইবনে আল্ আজরাকের অনুসারীবৃন্দ প্রচণ্ডতার সঙ্গে যে সব মতবাদ পোষণ করেছেন তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত। তাদের মতো ওয়াহাবীরা মুসলমানদেরকে অবিশ্বাসী বলে আখ্যায়িত করে এবং তাদের দ্রব্য লুণ্ঠন ও দাসত্ব অনুমোদন করেন। আধুনিক মুসলমানদের মধ্যে মনুষ্যে ঐশ্বরিক গুণ আরোপ সম্পর্কীয় আচরণের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ যতই প্রশংসাসূচক হোক না কেন, নেজদে বর্তমান কালের 'ইখওয়ানদের' মতবাদসমূহের মতো ধর্মও ঐশী সরকার সম্পর্কে তাদের মতবাদ বিষাদময় ও ক্যালভ্যানিস্টিক এবং প্রগতি ও বিকাশের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে বিরোধপূর্ণ।

'বাব মতবাদ ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদে পারস্যে আবির্ভূত হয় ও নানান ধরনের আভাস রঞ্জিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। মুসলিম বিশেষজ্ঞদের মতে এই মতবাদ প্রাচ্যে

www.amarboi.org

সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদের এক নতুন সংস্করণ বৈ অন্য কিছু নয়। আদিম খ্রিস্টানদের মধ্যে অ্যাগাপীদের চালচলন যেভাবে প্রাচীন ধর্মাবলম্বীরা বিবেচনা করেছে এদের নরনারীদের মিশ্র চালচলন রীতি প্রচলিত তাও সেই আলোকে বিবেচিত হয়েছে। পক্ষান্তরে, ব্যাপক গবেষণা ও অধ্যয়নের অধিকারী একজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের[৮৫] মতে, যিনি বাবীদের ধর্মীয় সাহিত্য পড়েছেন ও তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতায় মিশেছেন, বাবমতবাদ হল ইরানী মনের অন্তর্নিহিত সর্বখোদাবাদ থেকে উৎপন্ন সারগ্রাহী বিবর্তনের সাম্প্রতিক অভিব্যক্তি।

মুহম্মদ শাহের[৮৬] রাজত্বকালে, এই লেখক বলেন, জাতীয় যাজকতন্ত্রের কপটতা ও পাপ এতই বেড়ে গিয়েছিল যে একটা পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জনগণের রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা শোচনীয় অবস্থায় পৌঁছেছিল। এই অবস্থায় সিরাজের একজন তরুণ মোল্লা, মীর্জা আলী মুহম্মদ, ফাতেমীয় বলে অনুমিত, প্রচুর পরিমাণে অধ্যয়ন করেন, বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন, পবিত্র মক্কা মদীনাতে হজ্বব্রত পালন করেন, এবং দীর্ঘকাল আরব ও সিরিয়ায় বসবাস করেন। তিনি সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারের প্রচার শুরু করেন। তিনি সাধারণ মোল্লাদের কপটতা এবং ইসলাম-নিন্দিত আচরণের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্য সর্বাপেক্ষা সন্দেহজনক হাদিসের অনুমোদন প্রত্যাখান করেন। যে সব মানুষ তাঁর মতবাদ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল তাদের অন্তরে তাঁর বাণী সহানুভূতি সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের মধ্যে অসাধারণ-উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। তিনি অসংখ্য শিষ্য পেয়েছিলেন, আর তাদের মধ্যে ছিলেন কাজউইনের একজন মহিলা যাঁর জ্ঞান ও বাগ্মিতা তাঁর উদ্দেশ্যের প্রতি শক্তিশালী সমর্থন হিসেবে কাজ করেছিল। তিনি এখন 'কুররাতুল আয়িন' বা "চোখের জ্যোতি" হিসেবে সম্মানিত। মীর্জা আলী মুহম্মদ তাঁর শিষ্যদের উৎসাহ-উদ্দীপনা বাহিত হয়ে নয় তাঁর অবাধ সমুন্নতিতে সর্বেশ্বরবাদী উন্মত্ততার মুহূর্তে 'বাব হযরত-ই-আ'লা উপাধি ধারণ করেছিলেন এবং নিজেকে ঐশী সত্তার অংশ বলে জাহির করেছিলেন। তাঁর শিষ্যরা সুগঠিত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রে ব্যর্থকাম হয়। যাজকদের ধর্মান্ধতা ও রাজনৈতিক যথোপযুক্ততা নির্যাতনের জন্ম দিয়েছিল, গোবিনিউয়ের মতে এজন্য বাবীগণই মুখ্যত দায়ী ছিল; বাব তাঁর অধিকাংশ প্রধান শিষ্যসহ নিহত হন। তিনি মারা গেলেও তাঁর মতবাদ এখনও টিকে আছে। গোবিনিউ বলেন তার সামাজিক উপদেশাবলী তাঁর গৃহীত মতবাদগুলির চেয়ে অনেক অগ্রগামী ছিল। তিনি বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন, প্রথম বিবাহের স্থায়িত্বকালের মধ্যে একমাত্র বিশেষ কারণেই দ্বিতীয় স্ত্রী-গ্রহণ করার অনুমতি দিতেন। উপপত্নী রাখার ব্যাপারটি তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছিলেন, তালাক প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এবং জনসাধারণের সমক্ষে মহিলাদের আবির্ভাবের অনুমতি দিয়েছিলেন। গোবিনিউ সঙ্গতভাবেই নিরীক্ষণ করেছেন যে অবরোধ প্রথা অসংখ্য বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে এবং সন্তান-সন্ততির প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। প্রথাটি কোন ধর্মীয় ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়, এটা শুধু একটা সুবিধার ব্যাপার। পারস্যের প্রাচীন

www.amarboi.org

নৃপতিগণ একে শানশওকতের নিদর্শন হিসেবে দেখতেন, আর মুসলমান সুলতান ও প্রধানগণ তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছিলেন এবং তাদের প্রথা গ্রহণ করেছিলেন। আরবদের মধ্যে গোত্রের মহিলারা ইচ্ছামত চলাফেরার ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। হযরতের পরিবারের মহিলাগণ শিষ্যদের সঙ্গে আলোচনা করতেন, তাদের দর্শন গ্রহণ করতেন এবং পুরুষের সঙ্গে ভোজে অংশ গ্রহণ করতেন। গোবিনিউ বলেন যে মীর্জা আলী মুহম্মদ কাজেই ক্ষতিকর প্রথা থেকে নারীদের মুক্তি দানের জন্য অভিনব কোন পন্থা আবিষ্কার করেননি। তাঁর ধর্মীয় মতবাদসমূহ মূল সর্বখোদাবাদী এবং তাঁর নৈতিকতার সংবিধান নমনীয় নয়, বরং কঠোর।[৮৭]

কোন কোন মুসলমান লেখক ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহকে দু'টি ব্যাপক গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছেন : আহ্‌লুল্ বাতিন বা স্বজ্ঞাবাদী এবং আহলুজ জাহিব বা আচরণবাদী : যারা বাক্যাবলীর অর্থের মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন এবং যারা বাক্যাবলীর শাব্দিক অর্থের দিকে নজর দেন। যা'হোক, আহলুল বাতেনীদেরকে অবশ্যই 'বাতেনী' গোষ্ঠীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলবে না। আহলুল বাতিনদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মরমীবাদী সুফী, দার্শনিক মুতাফাল্লিমুন ও সাধারণভাবে ভাববাদীগণ,—জামাকশারীর ভাষায় : "যাঁরা তাদের হৃদয়ে ঐশী পরিপূর্ণতার শিকড় প্রোথিত করার জন্য প্রয়াস চালাচ্ছে," যাঁরা মানবিক উৎকর্ষতার উচ্চতম আদর্শে পৌঁছানোর জন্য সংগ্রাম করছে, এবং আইনের বিধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সময় যাঁরা আইনের মধ্যে পৃথিবীর জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সামঞ্জস্য, মানবজাতির মধ্যে শান্তি ও শুভেচ্ছার উন্নয়নের জন্য ঐশী অভিপ্রায় প্রত্যক্ষ করেন।[৮৮]

পাদটীকা

১. ইবনে খাল্লিকান ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৩। ইবনে খাল্লিকান বলেন, "খুম মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি উপত্যকার নাম এবং আত্ তুহ্ফার নিকটবর্তী। এই উপত্যকায় একটি পুকুর আছে যার নিকটবর্তী স্থানে হযরত প্রার্থনা করেছিলেন। এটা ঘটেছিল ১৮ই জুলহিজ-এ, কেননা ইবনে খাল্লিকান বলেন যে ঐ মাসের ১৮ই তারিখে ঈদুল গাদির গাদিরের বাৎসরিক ভোজোৎসব। গাদির-ই-খুম ও ঈদুল্ গাদির একই।
২. ডোজী, 'হিস্ট্রী দ্যজ মুসলমানস ডান্স ল্য এস পান' ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪।
৩. ইবনুল আসির, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১২৫।
৪. এই যুদ্ধ "উষ্ট্রের যুদ্ধ" নামে পরিচিত কারণ এই যুদ্ধে উষ্ট্রপৃষ্ঠে আয়েশা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। যেখানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং যেখানে যোদ্ধৃদ্বয় নিহত হয়েছিলেন সেই স্থানটিকে 'ওয়াদিস্ সাবা'—"সিংহের উপত্যকা" বলা হয়।
৫. এই উপাধিগুলি মেজর ওসবর্ণ আলীর প্রতি আরোপ করেছেন।
৬. শাহরিস্তানী, ১ম অংশ, পৃ. ৮৫।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. যেসব লোক খলিফাকে সালিশ করতে বাধ্য করেছিল তারাই পরে তা প্রত্যাখ্যান করল এবং তাদের সালিশের দাবীকে সমর্থন করার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। তারাই

www.amarboi.org

মূল "খাওয়ারিজ" (বিদ্রোহী)—এরাই ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসে প্রভূত অনিষ্টের কারণ হয়েছিল।

৯. বীরধর্মী উদারতা নিয়ে খলিফা আলী এমন কি তাঁর বিশ্বাসঘাতক শত্রুদের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে সর্বদা তাঁর সেনাবাহিনীকে শত্রুর আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করতে, পলাতকদের ছেড়ে দিতে, বন্দীদের প্রতি সম্মান দেখাতে এবং কখনও নারীদের প্রতি অসম্মান না করতে উপদেশ দিয়েছেন। মৃত্যুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগকালে তিনি তাঁর সন্তানদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন যে হত্যাকারীকে তরবারীর এক কোপে কেটে ফেলতে এবং তার প্রতি যেন অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রণা দেওয়া না হয়।

১০. 'রৌযাত্-উস্-সাফা' গ্রন্থের রচয়িতা উপরোক্ত ঘটনার বর্ণনা করার পর আরও বর্ণনা করেন যে হুসাইনের একজন সেবক কারবালার হত্যাকাণ্ড থেকে পলায়ন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি অস্বীকার করেছেন যে তিনি যতদূর জানেন হুসাইন (রাঃ) উমাইয়া নেতাদের কাছে কোন প্রস্তাব দেননি। এটা সম্ভবপর যে এই অস্বীকৃতির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে যে হুসাইন শত্রুদের নিকট কোন শর্ত প্রস্তাব করে নিজেকে অবনমিত করেননি। আমার মনে হয় যে, তিনি উমাইয়াদের কাছে শর্ত আরোপ করেছিলেন তাতে তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ন হয়নি।

১১. আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ান আদেশ জারি করে মদিনায় হযরতের রওজা শরীফ জিয়ারত তীর্থযাত্রীদের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

১২. ফাতেমা ও আলী (রাঃ) এবং তাঁদের বংশধরদের আহলুল বাইয়াত বলা হয়।

১৩. সুন্নী মযহাবের তৃতীয় 'স্তম্ভ, ইমাম মালিক ইবনে আনাসকে এই ধরনের অপরাধের জন্য জনসমক্ষে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

১৪. শোলায়মান ইবনে মুর্রাদ, আল্ মুখতার এবং ইয়াযিদ ইবনে মুহাল্লিব।

১৫. আব্বাসকে ইসলামের ইতিহাসের 'জন অব গাউন্ট' বলা যেতে পারে।

১৬. একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কিভাবে তিনি ব্যাপক জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন : "অনিসন্ধিৎসু ভাষা এবং বুদ্ধিদীপ্ত মনের সাহায্যে।"

১৭. শাহ্‌রিস্তানী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮৬।

১৮. 'রৌযাতুস্ সাফা' : ইবনুল আসির, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩১২।

১৯. 'আল্লাহ্ আকবর'—আল্লাহ্ মহান।

২০. পূর্ণ বিবরণের জন্য 'দি শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন্স' (ম্যাকমিলান)।

২১. আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ সাফ্‌ফা উপাধি পেয়েছিলেন—সাফ্‌ফা মানে "রক্তপিপাসু"—তার শত্রুদের বিরুদ্ধে অবাধ তরবারী ব্যবহার করার জন্য তিনি এই উপাধি পান। তার একজন উত্তরাধিকারী (মুতাযিদ বিল্লাহ) দ্বিতীয় সাফ্‌ফা উপাধি পেয়েছিলেন। প্রথম অটোম্যান সেলিম একই উপাধি পেয়েছিলেন।

২২. একজন মাজী।

২৩. ফাতেমীয়গণ হযরতের সবুজ রং তাদের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন; বণী উমাইয়ায় সাদা এবং বণী আব্বাসগণ কালো রং।

২৪. মুতাসিম বিল্লাহ (মুহম্মদ) ও ওয়াসিক বিল্লাহ (হারুন)।

২৫. আব্বাসীয় বংশের একজন তরুণ মিশরে পালিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেখানে নামমাত্র খেলাফত চালিয়েছিলেন যতদিন না ওটোম্যান সম্রাট সেলিম তার অনুকূলে শেষ আব্বাসীয় খলিফা থেকে অস্বীকৃতি লাভ করেছিলেন।

www.amarboi.org

২৬. 'আহলুল বাইয়াত' "(মুহম্মদের) বংশধরগণ"—এই উপাধি সচরাচর ফাতিমা ও আলী এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততিদেরকে দেওয়া হয়। এইনামে ইবনে খালদুন সর্বদা তাঁদেরকে তাঁদের অনুসারী ও শিষ্যদেরকে অভিহিত করেছেন—শিয়া বা মুহম্মদের বংশধরগণ। সানায়ী নিম্নের কবিতা-পঙক্তিতে সর্বসাধারণের অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছেন :

আল্লার কিতাব ও বংশ ছাড়া
রেখে যাননি রাসুল কিছু
কিয়ামত তক রইবে এসব
চলবে তাদের পিছু পিছু।

২৭. 'খাওয়ারিজী' নামকরণ বিশেষভাবে দেওয়া হয়েছিল 'দুমাতুল জন্দলের যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেসব সৈন্য হযরত আলীকে পরিত্যাগ করেছিল এবং ইসলামের বিরুদ্ধে দলগঠন করেছিল তাদেরকে বলা হয়ে থাকে। পরবর্তী কালে যারা ধ্বংসাত্মক মতবাদ গ্রহণ করেছিল তাদের বলা হয়।

২৮. মিশরের ফাতেমীয় বংশ ছাড়া ফাতেমীয়দের অন্যান্য শাখা আমির, ইমাম, শরীফ ও খলিফা উপাধি ধারণ করে মুসলিম জাহানের বিভিন্ন অংশে রাজত্ব করতেন, যেমন বণী উখেদুর, বণী মুফা, মক্কার বণী কিতাদাহ, উত্তর ইয়েমেনে বণী তাবা তাবা, দক্ষিণ ইয়েমেনে বণী যিয়াদ এবং মরক্কোতে বণী ইদরিস।

২৯. ইসনা সে দিয়ে ।

৩০. আরস্লান আল্ বাসাসিরি আব্বাসীয় সেনাধ্যক্ষ হলেও মিশরীয় ফাতেমীয়দের সমর্থক ছিলেন। তিনি বাগদাদের তৎকালীন খলিফা আল্ কায়েম বা-আমর ইল্লাহকে শহর থেকে বিতাড়িত করেন এবং আমিরুল আরবের (পারস্যের ২য় খানির সদৃশ উপাধি) শরণাপন্ন হতে বাধ্য করেন। যতদিন না আলূপ আরস্লানের পিতা ও সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা, তুগ্রিল তাকে পুনর্বাসিত করেন। সমগ্র এই কালে বাগদাদে ফাতেমীয় খলিফাদের নামে 'খোতবা' পাঠ করা হত। শুক্রবারে বিভিন্ন দেশের বড় মসজিদের মিম্বর থেকে যে উপদেশ বাণী উচ্চারিত হয় তাকে 'খোতবা' বলা হয়। আল্লাহর গুণ-কীর্তন ও একত্ববাদের ঘোষণা এবং হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এর উপর তাঁর পরিবারবর্গ ও উত্তরাধিকারীদের উপর আল্লাহর করুণা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে খোতবার শুরু হয়। তারপর শাসনরত খলিফার এবং রাষ্ট্রের দেওয়ানী কার্যপরিচালনাকারী যুবরাজের জয় প্রার্থনা করা হয়। খোতবার মধ্যে নাম উচ্চারিত হওয়া এবং টাকা তৈরি করা—এই দুটি প্রধান সুযোগ খলিফার রয়েছে এবং তা তার বৈধতার বিশেষ লক্ষণ।

৩১. ৭৫০ খ্রি. থেকে ১২৫২ খ্রি.।

৩২. ইমাম জাফর তুসীর ('দাবিস্তানে' উদ্ধৃত) মতানুযায়ী সুন্নীরা মূলত পঁয়ষট্টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল।

৩৩. 'ইমাম' শব্দটি অত্যন্ত সন্তোষজনক সংজ্ঞা দিয়েছেন ডঃ পার্সি ব্যাজার : " 'ইমাম' শব্দটি যে আরবী মূল থেকে এসেছে তার অর্থ হল লক্ষ্য নিবদ্ধ করা অনুসরণ করা—এর থেকে উৎপন্ন শব্দের প্রায় সবগুলি একই 'ধারণার ইঙ্গিত বহন করে। কাজেই 'ইমাম' মুখ্যত বুঝায় আদর্শ স্থানীয় বা যার আদর্শ অনুসরণ করা উচিত। এই অর্থে এ দেওয়ানী ও ধর্মীয় ব্যাপারে মুসলমানদের নেতা হিসেবে মুহম্মদের প্রতি প্রযোজ্য। আর উভয় ক্ষমতায় হযরতের প্রতিনিধি হিসেবে খোলাফায়ে রাশেদীন বা বৈধ উত্তরাধিকারীদের প্রতি প্রযোজ্য। শুধু ধর্মীয় অর্থের দিক দিয়ে এ চারটি মযহাব—প্রধানের প্রতি প্রযোজ্য, যেমন

www.amarboi.org

হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী। অধিকতর সংকীর্ণ অর্থে মসজিদের ইমামের প্রতিও প্রযোজ্য। যিনি প্রাত্যহিক জামাতের নামাজে নেতৃত্ব করেন; প্রখ্যাত পরহিযগারদের ওপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তবে নাজির বা স্থানীয় প্রধানের অধীনে তার চাকুরী ও বেতন নির্ভরশীল এবং তার দ্বারা চাকুরী থেকে অপসারিত হতে পারে।

কোরআনে এই শব্দটি কিতাব বা কিতাবসমূহ বা কোন জাতির বিবরণী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কিংবা ধর্মগুরু অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। সে কারণ সম্ভবত মুসলমানেরা শেষোক্ত অর্থেই শব্দটি গ্রহণ করেছেন। "যখন আল্লাহ ইবরাহিমকে কতিপয় আদেশ দিয়েছিলেন, তিনি সে সব সম্পাদন করেছিলেন। তিনি বল্লেন, "আমি তোমাকে তোমার জাতির জন্য ইমাম নিযুক্ত করেছি।" "পুনরায় ইবরাহিম, ইছহাক ও ইয়াকুব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, আমরা তাঁদেরকে ইমাম নির্বাচিত করেছি যাতে তাঁরা আমাদের হুকুম অনুযায়ী অন্যদেরকে পরিচালিত করতে পারে।" পুনরায়, "আমরা মুসাকে কিতাব দান করেছিলাম, সুতরাং তাঁর নবুয়্যত সম্পর্কে অবিশ্বাস করো না। আমরা বণী ইসরাইলদের পথ প্রদর্শনের জন্যই আর তাদের কাউকে কাউকে আমাদের হুকুম অনুযায়ী পথপ্রদর্শনের জন্য রাসুল হিসেবে প্রেরণ করেছি।"—ব্যাজার-'ইমাম এন্ড সাইদ অব ওমান' পরিশিষ্ট—ক।

৩৪. মাসুদী বলেন, "ইমামতের প্রশ্নটি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমর্থকদের মধ্যে, বিশেষভাবে নিযুক্তি-মতবাদের সমর্থক এবং নির্বাচন-মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে বিতর্কের বিষয়। নিযুক্তি-মতবাদের সমর্থক হল 'আহলে ইমামিয়া, আলী ইবনে আবু তালিব ও ফাতিমার দিক থেকে তাঁর সন্তান-সন্ততির সমর্থক শিয়াদের একটি শাখা। তারা বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ মানবজাতিকে কোন সময়েই এমন লোক ছাড়া রাখেন না, যিনি আল্লাহর ধর্মকে সংরক্ষণ করেন (এবং যিনি তাদের ইমাম হিসেবে কাজ করেন)। এরূপ লোক হয় প্রেরিত নয় তাদের প্রতিনিধি। নির্বাচন মতবাদের সমর্থক হল খাওয়ারিজদের একটি দল, মরজিয়া, আহলুস সুন্নাত (যারা হাদিস ও সর্বসাধারণ স্বীকৃত মতবাদ স্বীকার করেন), মুতাজিলা সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক লোক এবং যায়েদিয়াদের একটি দল। তারা বিশ্বাস করেন যে এটা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ইচ্ছা যে মুসলমান জাতি তাদের মধ্যে থেকে নির্বাচন করে তাকে ইমাম বানাবেন, কেননা এমন সময় রয়েছে যখন আল্লাহ তাঁর কোন প্রতিনিধি পাঠান না। শিয়ারা এরূপ ইমামদেরকে মর্যাদা দখলকারী বলে বিবেচনা করেন।

৩৫. ইবনে খালদুন বলেন, নৃপতির সৌন্দর্য কিংবা পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণবুদ্ধি কিংবা ব্যক্তিগত গুণাবলী কিছুই প্রজাদের উপকারে আসে না।...এই বিখ্যাত লেখক যার নিরীক্ষণের সূক্ষ্মতার সঙ্গে বহুমুখী পাণ্ডিত্য সমন্বিত হয়েছে, তিনি আরও বলেন, 'প্রজাদের কল্যাণের জন্য নৃপতির অস্তিত্ব। নৃপতির প্রয়োজন এজন্য যে, মানুষকে একসঙ্গে বাস করতে হয়, আর যদি ঐক্য বিধানের জন্য কোন শক্তি না থাকে তবে সমাজ ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। পার্থিব শাসক শুধু মানুষের ঘোষিত হুকুম বলবৎ করেন, কিন্তু ঐশী অনুপ্রেরণা প্রাপ্ত আইন প্রণেতার দুটি উদ্দেশ্য রয়েছে—মানুষের নৈতিক এবং সামাজিক কল্যাণ। খলিফা হযরতের প্রতিনিধি ও সহকারী। তিনি শুধু পার্থিব শাসক নন, তিনি আধ্যাত্মিক প্রধানও। খলিফাকে তাই ইমাম বলে অভিহিত করা হয়, তার মর্যাদা গণপ্রার্থনার জামাতে পরিচালকের অনুরূপ।"

ইবনে খালদুন আরও বলেন, "ইমামের প্রতিষ্ঠাতা বাধ্যতাবোধের ব্যাপার। প্রয়োজনীয় আইনসমূহ হযরতের সাহাবাদের সাধারণ সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইমাম আধ্যাত্মিক প্রধান, আর খলিফা বা সুলতান পার্থিব ক্ষমতার নির্দেশক।"

www.amarboi.org

৩৬. নিজেদের অত্যাচারের শাস্তি এড়ানোর জন্য অত্যাচারী সুলতানের আদেশে প্রচারিত এই মতবাদ সত্ত্বেও জনগণ এ কখনও সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করেনি। উমাইয়া খলিফা ওলিদ দুষ্কৃতির জন্য যার উপনাম হয়েছিল ফাসিক, তার শাসনামলে জনগণ বিদ্রোহী হয়ে তাকে গদীচ্যুত করেছিল। অনুরূপভাবে যখন (আব্বাসীয় খলিফা) মুতাওয়াক্কিলের অবিচার অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন তদীয় পুত্র সদাশয় মুনতাসির তাকে পদচ্যুত করেছিল। অটোম্যান তুর্কীদের ইতিহাসে এমন বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, জনগণ পাপিষ্ঠ ও অযোগ্য নৃপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। অসুখী আব্দুল আজিজের বিরুদ্ধে ছিল শেষ বিদ্রোহ।

৩৭. এই মতবাদের বিরুদ্ধে এখন সুন্নী মযহাবের মধ্যে সুদূর প্রসারী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। 'গায়ির মুক্বাল্লিদিন' যাদের সম্পর্কে আমরা পরে বলব, এই অভিমত পোষণ করেন যে, যদি ইমাম ব্যক্তিগত সৎ না হন তবে তার পরিচালনায় জামাতের নামাজ বাতিল হবে।

৩৮. ইবনে খালদুন; এই গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১০ম অধ্যায় দেখুন।

৩৯. শাহ্‌রিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৫।

৪০. শাহ্ রিস্তানী, ১মখণ্ড, পৃ. ১১৯, ১২০।

৪১. কারণ তারা মাত্র সাত জন ইমামে স্বীকার করতেন : (১) আলী, (২) হাসান, (৩) হুসাইন, (৪) আলী দ্বিতীয়, (৫) মুহম্মদ আল্ বকির, (৬) জাফর আস্ সাদিক এবং (৭) ইসমাইল।

৪২. মাকরিজী বলেন, তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে লুকিয়ে রেখেছিলে আব্বসীয়দের নির্যাতন বাঁচানোর জন্য। ইমাম জাফর আস্ সাদিকের জ্যৈষ্ঠপুত্র ইসমাইল অমায়িক ব্যবহার ও কর্মঠ স্বভাবের লোক ছিলেন। মাকরিজীর মতে, ইয়েমেনে কেতমায় ও আফ্রিকার প্রদেশসমূহের তাঁর বহু অনুসারী ছিল। শাহ্ রিস্তানী বলেন, ইসমাইলের মার জীবদ্দশায় অন্য কোন স্ত্রী ছিল না, যেমন খাদিজা ও ফাতিমার জীবনকালে যথাক্রমে হযরত এবং আলীর অন্য স্ত্রী ছিল না।

৪৩. মার্সেল। গোঁড়া জামালুদ্দীন বিন তুগ্রী বারদী (তাঁর মাওয়াদুল লাতাফাত গ্রন্থে) বলেন, "যদিও মুয়িয এক ধর্মবিষয়ে ভিন্নপন্থী ছিলেন তথাপি তিনি ছিলেন জ্ঞানী, বিদ্বান; উদার ও তাঁর প্রজাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণ।" ফাতেমীয় বংশের পূর্ণ বিবরণের জন্য 'এ শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন' দেখুন।

৪৪. মাকরিজী ৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে মারা যান। জামালুদ্দীন আবুল মাহাসিন ইউসুফ বিন তাগ্রী বারদী তাঁর "মওজুমো যাহেরাতে কি মুলুকে মেসরে ওয়াল কাহেবা" গ্রন্থে মাকরিজী সম্পর্কে এরূপ বলেন : "এই বছর ইহলীলা সংবরণ করেন বিদগ্ধ শেখ ও ইমাম, আইনজীবী। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও হাদিসবেত্তা তাকিউদ্দীন আহম্মদ বিন আলী বিন আব্দুল কাদির বিন মুহম্মদ বিন ইবরাহিম বিন মুহম্মদ বিন তামিম বিন আব্দুস সামাদ।

৪৫. এ হল একজন প্রতারক যাকে মুর "খোরাসানের ছদ্মবেশী ধর্মনায়ক" হিসেবে অভিহিত করে বিখ্যাত করেছিলেন। তিনি মুকান্না বলে অভিহিত হতেন। হয় তাকে কুৎসিতভাব গোপন করার জন্য নয় তো শিষ্যদেরকে অভেদ্যতার ভাবে মুগ্ধ করার জন্য তিনি সর্বদা মুখোশ পরতেন তাকে 'মাযেন দেহ-ই মাহ' (চন্দ্রের স্রষ্টা) ও বলা হত, কারন কোন এক উপলক্ষে তিনি যাদুর সাহায্যে নাখসের নামক স্থানে চন্দ্রের আলোকের দীপালি দেখিয়েছিলেন।

৪৬. এরূপ বলা হয় ইউরোপের টেবোরিভদের মতো শ্বেত পোশাক পরিধানের জন্য।

www.amarboi.org

৪৭. ইবনে খালদুনের 'জেনারেল হিস্ট্রী 'কিতাবুল ইবার' ইত্যাদি ৩য় খণ্ড' পৃ. ২০৬।

৪৮. বলবানের বিরুদ্ধে সবলের স্বাভাবিক সংরক্ষণ।

৪৯. দ্বিতীয় থিয়োডোরা, ম্যানুয়েলের মায়ের আদেশে তরবারীর আঘাতে, শূলে, বা আগুনে পুড়িয়ে হাজার হাজার পল সমর্থকদের ধ্বংস করা হয়েছিল বলে কথিত আছে।

৫০. কথিত আছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মায়মুন এক সময়ে ইমাম জাফর আস্ সাদিকের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন।

৫১. আরবীতে ইবনু খালদুন এবং ফার্সীতে ইবন-ই-খালদুন উচ্চারিত হবে।

৫২. নোয়ায়রী, 'জার্ণাল এশিয়াটিক' ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৮।

৫৩. শাহ্‌রিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৭।

৫৪. একটি আবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মিশরীয় ফাতেমীয়গণ ইসমাইলিয়াদের থেকে পৃথক ছিলেন। ইসমাইলিয়ারা মনে করতেন যে তাদের শেষ ইমাম, ইসমাইল অন্তর্হিত হয়েছেন এবং যখন "স্বর্গরাজ্য" প্রকাশিত হবে সেই সময়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করবেন। আর মিশরীয় ফাতেমীয়গণ মনে করতেন যে ওবায়দুল্লাহ আল্ মাহ্‌দী ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছেন।

৫৫. শাহ্ রিস্তানী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৮, ১৪৯।

৫৬. দাবিস্তান' পৃ. ৩৫৬।

৫৭. যিনি আহ্বান করেন।

৫৮. ম্যানী বাস্তবিকপক্ষে ত্রাণকর্তা বলে দাবী করতেন।

৫৯. মাকরিজী, ক্রেষ্টমাথি অ্যারাব (দ্য সছি), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮।

৬০. মাক্কারি।

৬১. দীক্ষার বিভিন্ন স্তরের অত্যন্ত ভাল বর্ণনা দিয়েছেন দ্য সসী, 'জার্নাল এশিয়াটিক, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৮। প্রথম স্তরের দীক্ষা গ্রহণে নবদীক্ষিতকে প্ররোচিত করার জন্য 'দায়ী' বা আহ্বায়ক তার মনে সংশয় সৃষ্টি করেন। সদর্থক ধর্ম ও বুদ্ধির বিরোধ দেখান হয়, কিন্তু এটা বলা হয় যে দৃশ্যমান আক্ষরিক অর্থের পশ্চাতে গভীরতর অর্থ রয়েছে—এই অর্থ হচ্ছে শাঁস আর শব্দ হল তার উপরের আবরণ। অবাধ অঙ্গীকার গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষানবীশের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হয় না। এই স্তর অতিক্রম করার পর তাকে দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। এই স্তরে ঐশী নিযুক্ত ইমামদের স্বীকার করে নেওয়া হয়। যিনি সব জ্ঞানের উৎস। এই বিশ্বাস তাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তৃতীয় স্তরে ইমামদের সংখ্যা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়, যে সংখ্যা পবিত্র সপ্তসংখ্যা অতিক্রম করতে পারে না। কেননা আল্লাহ সাতটি আসমান, সাতটি জগৎ, সাতটি সমুদ্র, সাতটি গ্রহ, সাতটি রং, সংগীতের সাতটি সুর, সাতটি ধাতু সৃষ্টি করেছেন, তেমনি তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্য থেকে তিনি সাতজন ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করেছেন : তাঁরা হলেন আলী, হাসান, হোসাইন, আলী ২য় (জয়নুল আবেদীন), মুহম্মদ আল্‌বাকির, জাফর আস্ সাদিক এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল সপ্তম ও শেষ ইমাম। চতুর্থ স্তরে তারা শিক্ষা দেন যে জগতের সূচনা থেকে সাতজন 'নাতিক' বা ভাষণদানকারী প্রত্যাদিষ্ট প্রচারক ছিলেন, তাঁরা লোগসে'র প্রমূর্ত রূপ, তাঁরা প্রত্যেকে আল্লাহর হুকুমে তাঁদের পূর্ববর্তী শিক্ষার পরিবর্তন সাধন করেছেন; এঁদের প্রত্যেকের আবার সাতজন করে সহকারী ছিলেন—এই সাতজনের প্রত্যেকে একজন 'নাতিক' থেকে অন্য একজন 'নাতিকের'র আগমন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে একজন অপরজনের উত্তরাধিকারী হয়েছেন। এঁদের মধ্যে যারা প্রকাশিত

www.amarboi.org

হননি তারাই 'সামিত বা 'নীরব'। সাতজন 'নাতিক' হলেন আদম, নূহ, ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা, মুহম্মদ ও ইসমাইল (জাফর আস্ সাদিকের পুত্র) 'ইমাম-ই-যমান' (সর্বকালের ইমাম)। তাঁদের সাতজন সহকর্মী হলেন সেখ, শেম, ইবরাহিমের পুত্র ইসমাইল, হারুন, সামীউন আলী এবং ইসমাইলের পুত্র মুহম্মদ। একজন 'নাতিকে'র সঙ্গে একজন 'সামিত' সংযুক্ত থাকার কারণ এই ছিল যে ধর্মগুরুন্দেরকে একজন স্বাধীন কর্মী দেওয়া, যার ফলে তারা যুগের একজন 'সামিত' প্রচারককে পছন্দ মতো নির্বাচিত করতে পারেন। পঞ্চম স্তরে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, সাতজন 'সামিতে'র প্রত্যেকের সত্যধর্ম প্রচারের জন্য বারজন করে নকীব বা প্রতিনিধি থাকতেন; কেননা সাতের পর 'বার' সংখ্যাটি সর্বোত্তম; একারণে বারটি রাশি, বার মাস, ইসরাইলদের বারটি গোত্র ইত্যাদি রয়েছে। ষষ্ঠ স্তরে নবদীক্ষিতদের মধ্যে ম্যানিকীয় দর্শনের নীতিসমূহ ধীরে ধীরে প্রবেশ করান হয়। আর যখন সে এসব মতবাদের জ্ঞানের দ্বারা পরিপূর্ণরূপে প্রভাবিত হয় তখন সপ্তম স্তরে প্রবেশাধিকার লাভ করে। এই স্তরে সে দর্শন থেকে মরমীবাদে উন্নীত হয়। তখন সে একজন 'আরিফে' পরিণত হয়। অষ্টম স্তরে সদর্থক ধর্মের প্রতিবন্ধকতা ঝেড়ে ফেলে; তখন "আবরণ" উন্মোচিত হয়, এরপর থেকে "বিশুদ্ধের সঙ্গে বিশুদ্ধের মিলন" এই মতবাদগুলির প্রবণতা বর্ণনার চেয়ে উত্তমরূপে কল্পনার বিষয়।

৬২. মোহসীন ফানী বলেন, ষষ্ঠ ফাতেমীয় খলিফা, হাকিম-বি-আমর-ইল্লাহ যাকে দ্রুজরা (ইসমাইলীয়দের একটি শাখা) এমনকি বর্তমান সময়েও ঐশী অবতার বলে বিবেচনা করে। তিনি "অপরাধের দানব" বলে চিত্রিত হয়েছেন। তার চরিত্রে অদ্ভুত বিরোধের সমন্বয় ঘটেছিল। মাকরিজী যথার্থই চিন্তা করেছেন যে তার মন সম্ভবত বিড়ম্বিত ছিল। কোন কোন সময়ে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন, আবার কোন কোন সময়ে তিনি জ্ঞানী ও দয়ালু নৃপতির মতো আচরণ করতেন। তার রাজত্বে তিনি জাতি ও ধর্মবিশ্বাসের পার্থক্য উঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি পথযাত্রীদের সংরক্ষণের জন্য কায়রোয় পথঘাট আলোকিত করার বন্দোবস্ত করেছিলেন। তিনি পুলিশ মোতায়েন করেছিলেন; তিনি বলাৎকার বন্ধ করেছেন। হাকিম-বি-আমর-ইল্লাহর বিবরণের জন্য 'শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারেসেন' পৃ. ৬০২ দেখুন। উল্লেখযোগ্য সমঃপতন হিসেবে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, ভয়ংকর আইভান যাকে অনুরূপ দানব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার যুগের সাধারণ রুশগণ তাকে চরিত্র ও ক্ষমতার এক শক্তি হিসেবে মনে করত। ঘটনা এই গ্যালিয়াজো মেরিয়া স্টোরজা, সিসিলির নরম্যান প্রধান যিনি বন্দীর নাড়িভুঁড়ি বের করতেন, পোপস পল ও আলেকজাণ্ডার ৬ষ্ঠ ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড ও জন এবং অন্যান্যদের নির্যাতন এই সত্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, বিবেকবর্জিত শক্তির ক্ষেত্রে দেশ ও ধর্ম ভেদে তাদের দুষ্কর্মের মধ্যে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

৬৩. 'সিলভেস্টার'র দ্য সসী নামটি 'হাসকিশ্' (ভারতীয় ভাং') থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন। কারণ হাসান সাববাহর অনুসারী ভাং খেতেন। এই ব্যুৎপত্তি সাধারণভাবে গৃহীত। অধ্যাপক ব্রাউনের "লিটার‍্যারী হিস্ট্রী অব পারসিয়া ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৪—৫ দ্রষ্টব্য। মোহসীন ফানীর মতে তাঁর জীবন ও মতবাদ সংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির কলমে লেখা।

৬৪. প্রপেসর ই. জি. ব্রাউন, 'লিটারারী হিস্ট্রী অব পারসিয়া' ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯০-১৯৩।

৬৫. ওয়াসাফ, কুল্লিয়াতোল্ মাওতে ইয়ানি আস্ আশিয়াতা আকাবাসৃত।

৬৬. কাথউইনের নিকটবর্তী।

৬৭. ওয়াসফ বলেন;

www.amarboi.org

৬৮. তাদের আশঙ্কা যে অমূলক নয় তা ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী সম্পর্কিত নিম্ন ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হবে। এই সুশিক্ষিত ইমাম তাঁর নিজ শহর 'রাজে' আইন-বিজ্ঞানের উপর বক্তৃতা করতেন। একদা তিনি তাঁর আচার্যের পদমর্যাদা বলে ইসমাইলিয়াদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। 'ঈগল নেস্টে' এ খবর পৌছল এবং অসতর্ক অধ্যাপককে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য অবিলম্বে একজন ফিদাইকে পাঠান হল। ফিদাই রাজে উপস্থিত হয়ে ইমাম পরিচালিত কলেজে ভর্তি হল। সে তার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ গ্রহণের জন্য সাত মাস অপেক্ষা করল। অবশেষে সে একদিন ইমামের কক্ষে একাকী গেল এবং সে দ্বার রুদ্ধ করে ইমামকে ভূতলশায়ী করল এবং তাঁর গলায় ছোরা চালাতে উদ্যত হল। ভীত-সন্ত্রস্ত ইমাম জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন আমাকে হত্যা করবে?" ফিদাই উত্তর দিল, "কারণ আপনি ইসমাইলিয়াদেরকে অভিসম্পাত করেছেন।" তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি আর তাদেরকে কখনও তাচ্ছিল্য করবেন না। ফিদাই ইমামের অঙ্গীকার মেনে নিতে রাজী হল না যতক্ষণ ইমাম তাদের প্রধানতম গুরুর নিকট বৃত্তি গ্রহণ করতে সম্মত না হলেন। এভাবে নিমকের বদলায় তিনি নিজেকে আবদ্ধ করলেন।

৬৯. ৫০৮ হিযরীতে হাসান বিন সাব্বাহ্ মৃত্যু বরণ করেন। হালাকুখাঁর মন্ত্রী ও 'জাহাস কুশা' গ্রন্থের রচয়িতা যুয়ায়িনীর অনুসরণে ওয়াসাফ এসব ইসমাইলিয়াদের সম্পর্কে নিরতিশয় তিক্ত হলেও সঙ্গত বর্ণনা দিয়েছেন।

৭০. আলমুতিয়াসদের মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের পূর্ণ বিবরণের জন্য ভন হ্যামারের "হিস্ট্রি অব দি অ্যাসাসিন" দেখুন। এর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন উড্। এমন কি খ্রিস্টান নৃপতিগণ তাদের শত্রুদের হস্ত থেকে নিস্তার লাভের জন্য আলমতিয়া আততায়ীদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। ইংল্যান্ডের রিচার্ডের অধীনস্থ মন্টফারাতের কনরাড্ একজন ফিদায়ীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। একজন পোপ ফ্রেডারিক বারবারোসাকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য একজন 'ফিদাই'কে নিয়োগ করছিলেন, কিন্তু সফলকাম হতে পারেনি। অ্যাসাসিনদের আলমুত, রাদবার অন্যান্য দুর্গ ধ্বংস করার পর তাতারগণ নির্দয়ভাবে আলমুতিয়াদেরকে হত্যা করেন।

৭১. ইসমাইলিয়াদের সংখ্যা গিলগাটে ও হানজার পর্বতসমূহেও পাওয়া যায়।

৭২. শাইখ আব্দুল কাদের জিলানী। সুন্নী মযহাবে এমন সব লোকজন রয়েছেন যারা তাঁকে অতিরঞ্জিত সম্মান দেখিয়ে থাকেন যা প্রায় আরাধনার সামিল। তিনি 'গওস-ই-আযম', 'মাহবুবে সোবহানী' 'কুতুব-ই-রাব্বানী' ("মহান নেতা, আল্লাহর প্রিয়পাত্র, পবিত্রতার ধ্রুবজ্যোতি") উপাধিতে বিভূষিত হয়েছেন। (গুলদস্তাই কেরামত দেখুন) শাইখ আব্দুল কাদির ছিলেন একজন মরমী সাধক এবং বংশসূত্রে ফাতেমীয়। তিনি মরমীবাদী ও তাপসদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন।

৭৩. পরে মিয়া রওশন বায়েজীদ নামে পরিচিত হন।

৭৪. বাগদাদের উত্তর-পশ্চিমে কয়েক দিনের দূরবর্তী একটি স্থান।

৭৫. এই দুঃখজনক ঘটনার বিবরণের জন্য এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের দশম অধ্যায় এবং 'এ শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন (ম্যাকমিলান), পৃ. ২৯৫ দেখুন।

৭৬. ক্রীস্টাডেলফিয়াদের বিশ্বাসের সঙ্গে বিশেষভাবে তুলনীয়, যাঁরা বিশ্বাস করেন যীশুখ্রিস্ট স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য পুনঃ আবির্ভূত হবেন।

৭৭. 'আদিল্লা-ই-কাতি' বা চূড়ান্ত সাক্ষ্য যাতে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে না এবং ভাবনাচিন্তা-গবেষণার কোন প্রয়োজন নেই।

www.amarboi.org

৭৮. মোল্লা সাদরা দ্বিতীয় শাহ্ আব্বাসের রাজত্বকালে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

৭৯. 'মাযহাবি-ই আরবায়া'।

৮০. আবু হানিফা আন্ নোমান ইবনে সাবিত (৬৯৯—৭৬৯)

৮১. এইসব বোরাহ আংশিকভাবে শাফেয়ী ও আংশিকভাবে মিশরীয় ইসমাইলিয়া।

৮২. "মোহামেডান ল"।

৮৩. দ্বিতীয় অধ্যায়ের পাদটীকা দেখুন।

৮৪. কুল্লো মাওলিদিন ইয়োলাদো আলা ফিতরাতেল্ ইসলাম।

৮৫. গোবিনিউ।

৮৬. পারস্যের তৃতীয় কাজার সুলতান যিনি তাঁর পিতামহের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

৮৭. এই উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা সাম্প্রতিক বিবরণ বাবীদের দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যাপক ই. জি. ব্রাউনের 'নিউ হিস্ট্রী অব দি বাব' গ্রন্থে পাওয়া যাবে। এই গ্রন্থখানি বাবীদের 'তারিখে জাদিদ' গ্রন্থের ভাষান্তর। অধ্যাপক ব্রাউনের 'ভূমিকা' অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। 'তারিখ' থেকে 'কুর্রাতুল আইনে'র মনোজ্ঞ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারা যায়। পরিশিষ্ট—৩ দেখুন। এই নতুন গ্রন্থে—'মেটিরিয়ালস ফর দি স্টাডি অব দি বাবী রেলিজিয়ান' এই মহান গ্রন্থকার জগতকে এই ধর্মের বিকাশ ও বিস্তার সম্পর্কে পর্যাপ্ত অতিরিক্ত তথ্য সরবরাহ করেছেন। বাহা মতবাদ এর সাম্প্রতিক পর্যায় এবং তা প্রধানত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এ বেশির ভাগ খ্রিস্টবিজ্ঞানের মতবাদসমূহ পরিপাক করে নিয়েছে।

৮৮. এই গ্রন্থের শেষ অধ্যায় দেখুন।

www.amarboi.org

নবম অধ্যায়
ইসলামের সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক মর্মবাণী

"জ্ঞান অন্বেষণ কর, কেননা যে আল্লাহর পথে জ্ঞান অন্বেষণ করে সে ধর্ম কাজ করে; যে জ্ঞানের কথা বলে সে আল্লাহর প্রশংসা করে; যে জ্ঞান অন্বেষণ করে সে আল্লাহর আরাধানা করে; যে জ্ঞান দান করে সে দান খয়রাত করে, আর যে উপযুক্ত পাত্রে জ্ঞান দান করে সে আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা প্রকাশ করে।"—আল্ হাদিস।

আমরা আরবের নবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগের কথা বলেছি যা তাঁকে অন্যান্য মানবগুরু থেকে পৃথক করেছে এবং আধুনিক জগতের চিন্তাধারার ঘনিষ্ঠতম নৈকট্যে এনেছে। ইসলামী ঐশীতন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র মদিনা, মক্কার পতনের পরও আরবের জনগণ ও বিদেশীদের আকর্ষণের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। এখানে দলে পারসিক, গ্রীক, সিরীয়, ইরাকী এবং উত্তর ও পশ্চিম থেকে বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির আফ্রিকাবাসী আগমন করেছিল। কিছু কিছু লোক এসেছিল নিঃসন্দেহে কৌতূহলপরবশ হয়ে, কিন্তু অধিকাংশ লোক এসেছিল জ্ঞান আহরণের জন্য এবং ইসলামের নবীর বাণী শোনার জন্য। তিনি জ্ঞানের মূল্য সম্পর্কে প্রচার করেছিলেন : "জ্ঞান অন্বেষণ কর, কেননা যে আল্লাহর পথে জ্ঞান অন্বেষণ করে সে ধর্ম কাজ করে; যে জ্ঞানের কথা বলে সে আল্লাহর প্রশংসা করে; যে জ্ঞান অন্বেষণ করে সে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে; যে জ্ঞান দান করে সে দানখয়রাত করে; আর যে যথোপযুক্ত পাত্রে জ্ঞান দান করে সে আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা প্রকাশ করে। জ্ঞান এমন বস্তু যা জ্ঞানীকে নিষিদ্ধ ও নিষিদ্ধ নয় এমন বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সমর্থ করে; এ স্বর্গের পথ উদ্ভাসিত করে; নিঃসঙ্গ অবস্থায় এ আমাদের বন্ধু, নির্জনে এ আমাদের সমাজ, পরিত্যক্ত অবস্থায় এ আমাদের সাথী; এ আমাদের শান্তির পথে পরিচালিত করে; এ বিপদে আমাদের মধ্যে সাহস সঞ্চার করে; বন্ধু মহলে এ আমাদের অলঙ্কার এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের বর্ম। জ্ঞানের সাহায্যে আল্লাহর বান্দা পবিত্রতার শীর্ষে ও মহৎ মর্যাদায় উন্নীত হয়, এ জগতে সুলতানদের সঙ্গ লাভ করে এবং পরকালে শ্রেষ্ঠ সুখ লাভ করে।"[১]

www.amarboi.org

তিনি প্রায়ই বলতেন : "জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র", এমন কি প্রয়োজন হলে "চীনদেশে গিয়েও" জ্ঞান আহরণে প্রয়োজনীয়তার উপর বারংবার তাঁর শিষ্যদেরকে তিনি জোর উপদেশ দিয়েছেন।[২] "যে জ্ঞানের অন্বেষণে গৃহ পরিত্যাগ করে সে আল্লাহর পথে পর্যটন করে।"যে জ্ঞানের সন্ধানে ভ্রমণ করে আল্লাহ্ তাকে স্বর্গের পথ প্রদর্শন করেন।"[৩]

কোরআন স্বয়ং শিক্ষণ ও জ্ঞানের সর্বোচ্চ মূল্যের প্রতি সাক্ষ্য বহন করে। 'সুরাতুল আলাকে'র[৪] উপর ভাষ্য রচনা করতে গিয়ে জামাকশারী কোরআনের বাণীর নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করেছেন : "আল্লাহ্ মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন যা তারা জানত না, আর এ তাঁর বদান্যতার শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য দেয়, কেননা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন যা তারা জানত না। আর তিনি তাদেরকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোকে আনয়ন করেছেন এবং তাদেরকে 'লেখনীর জ্ঞানের' অফুরন্ত আশীর্বাদ সম্পর্কে অবহিত করেছেন, কেননা যে জ্ঞান আল্লাহ ব্যাপ্ত করে আছেন তা থেকে মহা কল্যাণ উৎপন্ন হয়। লেখনের জ্ঞান ব্যতিরেকে অন্যান্য জ্ঞান বোধগম্য হতে পারে না কিংবা বিজ্ঞানকে জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না, প্রাচীনদের ইতিহাস অর্জন করা, তাদের বক্তব্যকে লিপিবদ্ধ করা, আসমানী কিতাবকে লেখা যায় না। এই জ্ঞান না থাকলে দীন ও দুনিয়ার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হতে পারত না।"

ইসলামী ব্যবস্থা প্রবর্তন পর্যন্ত আরব জাহান আরব উপদ্বীপ এবং উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের সীমান্তস্থিত অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। সেখানে বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের কোন লক্ষণ প্রকট ছিল না। প্রাক্-ইসলামী আরবদের মধ্যে কবিতা, বাগ্মিতা ও ফলিত জ্যোতির্বিদ্যা জ্ঞানের প্রিয় বিষয়বস্তু ছিল। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের কোন সমর্থক ছিল না। কিন্তু হযরতের বাণী জাতির জাগ্রত শক্তিকে অভিনব উদ্দীপনা জাগাল। এমন কি তাঁর জীবদ্দশায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে বাগদাদ, স্যালেরনো, কায়রো ও কর্দোভায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে রূপ নিয়েছিল। এখানে শিক্ষাগুরু স্বয়ং পবিত্র আত্মা কর্ষণের উপর প্রচার করেছিলেন : "(ভক্তি গলিত চিত্তে) আল্লাহর সৃষ্টি বিষয়ে এক ঘণ্টা চিন্তা করা সত্তর বছরব্যাপী প্রার্থনা করার চেয়ে উত্তম।"[৫] "এক ঘণ্টার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা গ্রহণ করা এক হাজার শহীদের জানাজায় উপস্থিত হওয়ার চেয়ে—এক সহস্র রজনী দণ্ডায়মান হয়ে প্রার্থনা করার চেয়ে উত্তম।" "যে শিক্ষার্থী শিক্ষার জন্য বহির্গত হয় আল্লাহ বেহেশতে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন; সে যেসব পদক্ষেপ নেয় তার প্রত্যেকটি অনুগৃহীত হয় এবং যেসব পাঠ গ্রহণ করে তার প্রত্যেকটির জন্য সে পুরস্কার পেয়ে থাকে।" জ্ঞানান্বেষণকারীকে স্বর্গে ফেরেশতারা খোশ আমদেদ জানাবেন। "বিদ্বান ব্যক্তির বাণী শ্রবণ করা এবং হৃদয়ে বিজ্ঞানের পাঠ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়া ধর্মীয় অনুশীলন অপেক্ষা উত্তম ... একশ দাস মুক্ত করার চেয়ে উত্তম"। জ্ঞানান্বেষণ ও জ্ঞানী যার অনুকূল হয় আল্লাহ পরকালে তাকে অনুগ্রহ করবেন।" "যে জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকে সম্মান করে সে আমাকে সম্মান করল।" শিশু প্রজাতন্ত্রের প্রয়োজনানুসারে

www.amarboi.org

হযরত আলী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপর বক্তৃতা করতেন। তাঁর লিপিবদ্ধ বাণীসমূহের মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করা হল : "জ্ঞানবিজ্ঞানে খ্যাতি অর্জন করা সর্বোচ্চ সম্মান।" "যে শিক্ষার জন্য জীবনপাত করে সে মরে না।" "মানুষের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার বিদ্যা।"

স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাগুরু ও তদীয় শিষ্যদের প্রধানের এরূপ অনুভূতি উদার-নীতির জন্ম দিয়েছিল এবং সকল শ্রেণীর লোকদেরকে জ্ঞানান্বেষণের জন্য অনুপ্রাণিত করেছিল। হিরার একজন শিষ্য কুফিক লিখনের কৌশল আয়ত্ত করেছিল এবং তা মুসলমানদের প্রাথমিক বিকাশের পথকে এগিয়ে নিয়েছিল। এই যুগ ছিল প্রধানত বিশ্বাস ও নিষ্ঠার যুগ, যখন মানবাত্মা উদ্দেশ্যবিহীন ও প্রাণহীন দর্শনের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। ধর্মের অনুশীলন, ধর্মনিষ্ঠার মনোভাব সংরক্ষণ এবং প্রাত্যহিক জীবনযুদ্ধে যে সব বিদ্যার ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে তার বিশেষ কর্ষণ মুসলমানদের মনোযোগের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

চিন্তা-অণুধ্যানের যুগ দ্রুত শুরু হতে যাচ্ছিল। এর বীজ ধর্মগুরুর-গঠনমূলক উপদেশাবলীর মধ্যে নিহিত ছিল। কাজের ভেতরও বিদ্বান শিষ্যগণ চিন্তা করতেন। ধর্মগুরু স্বয়ং ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি তাঁর শিক্ষার মর্ম উপলব্ধি করতে চায় তাকে অবশ্যই বিদ্বান ব্যক্তির বাণী শ্রবণ করতে হবে।[৬] প্রিয় বন্ধু, বিশ্বস্ত শিষ্য, নিষ্ঠাবান ভাই ও জামাতা, আলীর চেয়ে শিক্ষাগুরুর বাণীর তাৎপর্য কে অধিকতর হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম ছিল? তরুণ মনে বাল্য বয়সে যে শান্ত সমাহিত শিক্ষা প্রবেশ লাভ করেছিল তা ফলপ্রসূ হয়েছিল।

প্রাথমিক খলিফাদের অধীনে আরবদের অভ্যুত্থান সত্ত্বেও সাহিত্য ও কলা ইসলামের রাজধানীতে কোনভাবেই অবহেলিত ছিল না। আলী ও তাঁর চাচাতোভাই ইবনে আব্বাস কবিতা, ব্যাকরণ, ইতিহাস ও গণিতের উপর জনগণের মধ্যে বক্তৃতা করতেন; অন্যান্যরা আবৃত্তি বা বাগ্মিতার উপর বক্তৃতা করতেন। এছাড়াও কেউ কেউ প্রাচীনকালে জ্ঞানের মহামূল্য শাখা হস্তলিপিবিদ্যা শিক্ষা দিতেন।

ওসমানের মর্মান্তিক মৃত্যুর পর এই সুপণ্ডিত ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আলীকে জনগণ রাষ্ট্রের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাল। অবকাশকালে আলী শিক্ষাগুরুর উপদেশাবলী প্রজ্ঞার আলোকে অধ্যয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। একজন ফরাসী ঐতিহাসিকের ভাষায় : "তিনি (হযরত আলী) নিহত না হলে মুসলিম জগৎ আইনের সঙ্গে প্রজ্ঞার বাস্তব সংমিশ্রণের মধ্যে এবং সদর্থক ক্রিয়ার মধ্যে সত্যকার দর্শনের মূল-নীতির দৃষ্টান্ত-সৃষ্টির ভেতর হযরতের শিক্ষার বাস্তবায়ন দেখতে পেত।" জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি যে প্রগাঢ় নিষ্ঠা হযরত মুহম্মদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তা তাঁর শিষ্যের প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে প্রকাশ পেত। যে যুগে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, সে যুগে সম্ভবত ছিল না এমন মানসিক উদারতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মনোভাবের ভক্তিনিষ্ঠা ও বিশ্বাসের আন্তরিকতা। তাঁর ভাষণসমূহ, যা তাঁর একজন বংশধর বিশ্বস্ততার সঙ্গে সংরক্ষণ করেছিলেন, এবং তাঁর ধর্মসংগীত যাবতীয় কল্যাণের উৎসের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি

www.amarboi.org

এবং মানবতার প্রতি সীমাহীন বিশ্বাস চিত্রিত করেছে। ইসলামের শাসন-ক্ষমতায় উমাইয়াদের প্রবেশ মুসলিম জগতের উদারতা ও অগ্রগতির প্রতি চরম আঘাত। তাদের ঝটিকাসঙ্কুল শাসন জ্ঞানবিজ্ঞানের শান্ত সমাহিত অনুশীলনের প্রতি আত্মনিয়োগ করার কোন সুযোগই জাতিকে দেয়নি, আর এতদ সঙ্গে নৃপতিদের মধ্যে অতীতের বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক পৌত্তলিকতা যুক্ত হয়েছিল। শতবর্ষব্যাপী দীর্ঘ শাসন আমলে উমাইয়া বংশ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনের প্রতি অনুরক্ত মাত্র একজন ব্যক্তির জন্ম দিয়েছিল। এই ব্যক্তি হলেন আবু হাশিম খালিদ ইবনে ইয়াজিদ—"মারওয়ানের বংশের দার্শনিক"[৭] বলে কথিত। এই জ্ঞানানুরাগের জন্য তাঁকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

আবু সুফিয়ান ও হিন্দার সন্তানদের বিদ্বেষপ্রসূত সন্দেহ ও অক্লান্ত শত্রুতা হযরতের বংশধরদেরকে বিনীত অবসরণের জীবন যাপনে বাধ্য করেছিল। "দুর্দশাও অশান্তির রজনীতে" তাঁরা সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁদের পূর্বপুরুষের উপদেশাবলী অনুসরণ করেছিলেন এবং বুদ্ধিমূলক অনুশীলনের মধ্যে সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন। তাঁদের গভীর জ্ঞানানুরাগ, মানবতার প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা—আইনের সাধারণ ব্যাখ্যার আক্ষরিকতার বহু উর্ধ্বে অবস্থিত তাঁদের আত্মার দৃষ্টি ইসলামের আধ্যাত্মিকতা ও প্রসারতার নির্দেশক।[৮] ইমাম জাফর আস্ সাদিক কর্তৃক প্রদত্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের সংজ্ঞা মানবের অগ্রগতিতে তাঁদের বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু ধারণা প্রদান করে ঃ "হৃদয়ের সংস্কৃতি জ্ঞানের উপাদান; সত্য এর প্রধান লক্ষ্য, প্রেরণা এর পথ-নির্দেশক; প্রজ্ঞা এর অনুমোদনকারী; আল্লাহ এর প্রেরণাদাতা মানুষের শব্দ এর উচ্চারক।"[৯]

যে সব লোক তাদের প্রেম, অনুরাগ, ধৈর্য ও সহানুভূতির ফলে তাদের চারপাশে এসে সমবেত হয়েছিল তাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে হযরত-এর প্রাথমিক বংশধরগণ স্বাভাবিকভাবে তাদের অনুসারীদের বিভিন্ন ধারণার দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। তথাপি তাদের দর্শন জীবন এ ঐকান্তিকতাবিহীন শব্দযুদ্ধে পরিণত হয়নি যা টলেমীর অধীনে এথেন্স বা আলেকজান্দ্রিয়া গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ছিল।

যদিও শাসকদের মধ্যে সাহিত্য ও দর্শন বর্জিত হয়েছিল তথাপি ধর্মীয় নেতাদের দৃষ্টান্ত আরবজাতি ও তাদের অধীনস্থ জাতিসমূহের বুদ্ধিমূলক কার্যকলাপের উপর স্বাভাবিকভাবে কম ছিল না। উমাইয়াগণ চিন্তার শান্তিপূর্ন অনুশীলনকে নিরুৎসাহিত করলেও ফাতেমীয়গণ উল্লেখযোগ্য উদার নীতি-সহকারে শিক্ষার আনুকূল্য করেছিলেন। তারা অতীতের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না—অতীত তাদের পথ-প্রদর্শক ছিল না। শিক্ষাগুরুর উপদেশাবলী পাথেয় করে তাঁরা মানবজাতির বিকাশের ধারা তাঁদের সমানে রেখেছিলেন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার অনুশীলনে তাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শিক্ষাগুরু ও প্রাথমিক পর্যায়ের খলিফাদের ন্যায় "মুহম্মদের বংশের দার্শনিকগণ"[১০] জাস্টিনিয়ানের উত্তরাধিকারীদের নির্যাতনের ফলে যেসব বিদ্বান ব্যক্তি দেশান্তরিত হয়েছিলেন তাঁদেরকে সসম্মানে গ্রহণ করেছিলেন। দর্শন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে একাডেমী নেস্তোরীয়গণ এডেসা ও নিসিবিসে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তা

www.amarboi.org

ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এবং এতে যেসব অধ্যাপক ও ছাত্র ছিলেন তারা পারস্যে ও আরবে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুহম্মদ ও খলিফা আবু বকরের সময়ে যেভাবে তাঁদেরকে মদিনায় আশ্রয় দেওয়া হত অনেকেই তেমনি তাঁদের আশ্রয় দিতেন। উমাইয়াদের দ্বারা মদিনা লুণ্ঠিত হওয়ার পর বহু প্রতিভাবান পণ্ডিত পুনরায় জাফর আস্ সাদিকের নিকট সমবেত হলেন। মদিনাতুন্ নবীতে বহু ও বিচিত্র মনের সমাবেশের নিকট সমবেত হলেন। মদিনাতুন্ নবীতে বহু ও বিচিত্র মনের সমাবেশের ফলে মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন উদ্দীপিত হল। মদিনা থেকে এক অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপের স্রোত দামেস্কের দিকে প্রবাহিত হতে লাগল। আরব মরুভূমির উত্তর প্রান্তসীমায় মক্কাও মদিনা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথপার্শ্বে অবস্থিত দামেস্ক শহর প্রাচীনকাল থেকেই উমাইয়াদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল; আর সিরীয় আরবগণ স্বার্থ ও জ্ঞাতিত্বের দিক দিয়ে সেই বংশের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যাদেরকে তারা ইসলামের শাসন-ক্ষমতায় উন্নীত করতে সাহায্য করেছিল। উমাইয়াগণ স্বাভাবিকভাবে তাদের সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে এই শহরের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল; যদিও নিষ্ঠাবান মুসলমানেরা ভীতিবিহ্বলতার সঙ্গে এই শহরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তথাপি যে বহুসংখ্যক জাতি ইসলামের শাসনাধীনে এসেছিল তাদের প্রতিনিধিগণ এখানে এসে সমবেত হতেন। গ্রীক ও আরবদের মধ্যে তর্কযুদ্ধ দান্দ্বিক পদ্ধতি ও গ্রীক দর্শন অধ্যয়নে প্রেরণা জুগিয়েছিল। অক্ষরের উপর চিহ্ন ও স্বরচিহ্ন আবিষ্কার ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের চর্চাকে এগিয়ে দিয়েছিল। এই সময়ে দু'জন খ্রিস্টান লেখক উল্লেখযোগ্য সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন ও তাঁদের ধর্মান্ধ নির্যাতনকারীদের কাছ থেকে পালিয়ে দামেস্কের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা হলেন জোহান্স ড্যাম্যাস সেন্সাস এবং থিয়োডোরাস্ আবুকারা। মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের বিতর্কমূলক লেখা, তাদের গোঁড়া ভাইদের সঙ্গে বুদ্ধিবাদী ও দার্শনিক বিবাদ মদিনার চিন্তাগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল যা মুহম্মদ আল বাকর ও জাফর আস্ সাদিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এই অবস্থা দ্রুত আরবদের মধ্যে দার্শনিক প্রবণতার জন্ম দিয়েছিল। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে গ্রীক দর্শন, পারসিক ও আরবদের নিকট জ্ঞাত ছিল। জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বের শুরু থেকেই নেস্তোরীয়গণ খসরুর রাজ্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ইসলাম এসব বিভিন্ন উপাদান মিশ্রিত করে আঙ্গিক ঐক্যে পরিণত করেনি ততদিন পর্যন্ত গ্রীক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পশ্চিম এশিয়ার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের উপর কোন বাস্তব প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। উমাইয়া শাসনের শেষের দিকেই মাত্র কিছুসংখ্যক মুসলিম চিন্তাবিদ প্রাধান্য লাভ করেছিলেন; সেকালে গণমনে যেসব সমস্যা প্রাধান্য পেয়েছিল সেসব বিষয়ের উপর তাদের বক্তৃতা গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। তাদের ধ্যানধারণা বাস্তবিক পক্ষে পরবর্তী বংশধরদের চিন্তাধারাকে রূপান্তরিত করেছিল।

যা'হোক, দ্বিতীয় শতকেই মুসলমানদের সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপ আন্তরিকতার সঙ্গে আরম্ভ হয়েছিল এবং প্রধান প্রেরণা এসেছিল আরবদের শহরে বাসস্থাপন থেকে। অদ্যাবধি তারা যেসব জাতিকে পরাভূত করেছিল তাদের থেকে

www.amarboi.org

বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁবুতে বাস করত। ওসমান পরাভূত দেশে ভূমিক্রয় বা বিবাহচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। এই নীতির লক্ষ্য ছিল সুস্পষ্ট; প্রাচীন ও আধুনিক যুগের ইতিহাসে সকল জাতির মধ্যে এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। ব্রিটিশ ভারতে ও ফরাসী আলজিরিয়াতে এখনও তা বলবৎ আছে। সমগ্র উমাইয়া শাসনকালে আরবগণ রাষ্ট্রের প্রধান উপাদান ছিল—তাদের নাগরিকদের মধ্যে অভিজাত সামরিক শ্রেণী। তারা অধিকাংশ সামরিক পেশায় নিয়োজিত থাকত। জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের শান্ত পেশা সন্দিগ্ধ হাশেমীয় ও আনসারদের সন্তানদের প্রতি—আলী, আবু বকর ও ওমরের বংশধরদের প্রতি ন্যস্ত হয়েছিল। আরবগণ দূরদেশে তাদের দেশস্থিত মক্কেল-ব্যবস্থাকে নিয়ে গিয়েছিল, যে ব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকে রোমানদের মধ্যেও ছিল। এই মক্কেল-ব্যবস্থা প্রজাদের সংরক্ষণ ও বিচারের ব্যাপারে প্রজাদের সুবিধা প্রদান করত, আর বিজেতাদের দিত সংখ্যাধিক্যের অতিরিক্ত শক্তি। কাজেই প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে নেতৃত্বস্থানীয় পরিবারসমূহ বিখ্যাত মরুভূমি গোত্রসমূহের সদস্যদের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং বিজেতাদের 'মাওলা' বা 'মক্কেল'—এ পরিণত হয়, 'স্বাধীন ব্যক্তি'তে নয় বলে ভ্রান্তভাবে অনুমিত হয়েছে। হাশেমীয়দের এবং আনসার ও মুহা-জেরিনদের সন্তানদের, যারা মদিনার লুণ্ঠনের পরে বেঁচে ছিল,—এদের ছাড়াও মক্কেলদেরকে উমাইয়াদের শাসন-আমলে বৃত্তি দেওয়া হত এবং বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চার জন্য অনুমতি দেওয়া হত। আব্বাসীয়দের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল নতুন যুগ। পারসিকদের সাহায্যে তারা ক্ষমতা দখল করে ছিল: তাদের শাসন কায়েম রাখার জন্য তারা আরবের সামরিক উপনিবেশবাদীদের বন্ধুত্বের চেয়ে তাদের প্রজাসাধারণের সৌহার্দের উপর অধিক নির্ভর করত। 'আবুল আব্বাস সাফ্‌ফাহ্ রাজত্ব চালিয়েছিলেন মাত্র দু' বছর। তাঁরা ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী আল্ মনসুর ফাতেমীয়দের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করলেও প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রনেতা ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রকে সুগঠিত করেছিলেন। স্থায়ী সেনা ও পুলিশবাহিনী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং শাসনব্যবস্থার দৃঢ়তা ও সামঞ্জস্য বিধান করেছিলেন। আরবগণ অদ্যাবধি অস্ত্রবিদ্যায় প্রায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছিল; আল্ মনসুর যে সরকার পদ্ধতি গ্রহন করলেন তা তাদের প্রতিভাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করল। তারা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল, জমিজমা বন্দোবস্ত নিল এবং যে উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে তারা সামরিক অনুশীলনে নৈপুণ্য দেখিয়েছিল সেই একই উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে তারা জ্ঞানের সাধনায় আত্মনিয়োগ করল।

পশ্চিম এশিয়ার দুটি বৃহৎ নদী-বিধৌত ইউফ্রেতিসের ঐশ্বর্যশালী ও উর্বর উপত্যকা অতি প্রাচীনকাল থেকেই সাম্রাজ্যের রাজধানী ও সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই অঞ্চলেই পর পর ব্যাবিলন, চেসিফন ও সেলুসিয়ার অভ্যুত্থান ঘটেছিল। এই যুগে এখানে অস্তিত্বশীল ছিল বসরা ও কুফা তাদের দুর্বিনীত ও লঘুচিত্ত অধিবাসীদের নিয়ে। মুসলমানদের প্রথম বিজয় থেকেই বস্‌রা ও কুফা বাণিজ্যিক কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কুফা এক সময়ে রাজ্যের রাজধানী ছিল। বসরা ও কুফায়

www.amarboi.org

প্রাচ্যের সকল সক্রিয় আত্মা সমবেত হত, যারা উমাইয়াদের পঙ্কিল রাজধানীতে যেতে পারত না বা যেত না। আব্বাসীয়দের পক্ষে দামেস্ক যে শুধু কোন আকর্ষণই ছিল না এমন নয়, পরন্তু তা ছিল তাদের জন্য বিপদজনক স্থান। বস্‌রা ও কুফার জনগণের অনিশ্চিত ও লঘুচিত্ত মেজাজ এই শহরদুটিকে রাজ্যের রাজধানী করার পক্ষে অবাঞ্ছিত করে তুলেছিল। আল্ মনসুর তাঁর রাজধানীর জন্য স্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন এবং অবশেষে সেই এলাকার পরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন যেখানে এখন বাগদাদ অবস্থিত—নদীপথে বস্‌রা হতে যার দূরত্ব ছ'দিনের পথ।

কথিত আছে যে পারস্যের বিখ্যাত নৃপতি, কেসরা আনওশিরওয়ানের গ্রীষ্মাবাস ছিল বাগদাদ এবং একজন ন্যায়পরায়ণ নৃপতি হিসেবে তাঁর যে সুখ্যাতি তা থেকেই এর নাম হয় বাগদাদ বা "ন্যায়বিচারের উদ্যান।" পারস্য সাম্রাজ্যের বিলুপ্তির পর বিখ্যাত বাগদাদ শহরও বিলুপ্ত হল যেখানে বসে এশিয়ার প্রভু তাঁর অগণিত প্রজাদের প্রতি ন্যায়বিচার প্রদান করতেন। যা'হোক ঐতিহ্যে সে নাম সংরক্ষিত হয়েছে। সুদৃশ্য কেন্দ্রীয় ও স্বাস্থ্যকর স্থানের উপর মনসুরের নজর পড়ল এবং সমুদ্র থেকে উত্থিত জলদেবীর ন্যায় সে যুগের শ্রেষ্ঠ স্থপতিদের যাদুর ছোঁয়ায় খলিফার গৌরবময় মহানগরী গড়ে উঠল।

তাইগ্রিস নদীর পশ্চিম তীরে ১৪৫ হিযরীতে মনসুরের বাগদাদ মহানগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অল্প পরেই নতুন বাগদাদ নগরী গড়ে উঠল তাইগ্রিসের পূর্ব তীরে সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী যুবরাজের পৃষ্ঠপোষকতায়, যিনি পরে 'আল্ মাহ্‌দী' উপাধি ধারণ করেছিলেন। এই নতুন নগরী গঠন সৌকর্যে মনসুরের বাগদাদ মহানগরীর সৌন্দর্য ও আড়ম্বরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করত। চেঙ্গিসের সর্বধ্বংসী বাহিনী আরব জাতির সভ্যতার প্রত্যেকটি নিদর্শন ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার পূর্বে মহা নগরীর গৌরবের সময়ে বাগদাদ সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক রূপ ধারণ করেছিল—ইসলামের খলিফার যথোপযুক্ত রাজধানী।[১১]

মোঙ্গল কর্তৃক মহানগরী লুণ্ঠিত ও অবরুদ্ধ হওয়ার পূর্বে বাগদাদের সৌন্দর্য ও জমকাল রূপ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী স্তুতিরচয়িতা আনয়ারীর উজ্জ্বল পঙ্‌তিগুলির মধ্যে অমর হয়ে আছে :

জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীর্থভূমি বাগদাদ তোমায় ধন্য মানি,
তোমার মতো নয়ন-জুড়ানো বিশ্বে কোথাও নাইকো জানি।
তোমার অঙ্গের মাধুরিমা নীলিমাকেও হার যে মানায়,
তোমার প্রাণের দখিন হাওয়া স্বর্গপুরে সাড়া জাগায়।
তোমার তনুর রৌশনীতে লাজে নত পান্না হীরা চুনী সবাই,
তোমার মাটির সৌরভেতে হার মানে যে কস্তুরীবাই।
তোমার মলয় সমীরণে 'তোবা' বৃক্ষের সঞ্জীবতা,
তোমার স্নিগ্ধ সলিলে পাই কাওসারেরই মাদকতা।
তাইগ্রিসের ঐ তীরে তীরে অপ্সরীদের ঠাটঠমকে,
'খুল্লাকে'র[১২] লজ্জা জাগায়; রমণীয় কাশ্মীর জাগে ভর গমকে।
হাজার, হাজার ডিঙ্গী ভাসে তাইগ্রিসের স্ফটিক জলে,
উঠছে, নামছে, দুলছে যেমন আলোর খেলা গগনতলে।

www.amarboi.org

বাগদাদের উপাধি 'শান্তির নগরী' বা 'দারুস্ সালাম' রাজকীয় জ্যোতিষ নওবখতের একটি ভবিষ্যদ্বাণী থেকে গৃহীত। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে এই শহরের সীমানার মধ্যে কোন খলিফা মৃত্যুবরণ করবেন না, আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে সাঁইত্রিশ জন খলিফার মধ্যে কেউই এখানে মারা যাননি। বহুসংখ্যক পবিত্র আত্মা ব্যক্তির অন্তিম শয়ন এই শহরের মধ্যে বা সীমানার আশেপাশে স্থান পেয়েছে। তাঁদের সমাধি সকল মুসলমানের নিকট সম্মানের বস্তু। এ কারণে বাগদাদের উপাধি হয়েছে "পবিত্রাত্মাদের দুর্গ"। মহান ইমামগণ ও পবিত্রাত্মা শাইখদের সমাধি বা স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে এখানে। এখানে চিরশান্তির নিদ্রায় শুয়ে আছেন ইমাম মুসা আল কাজিম এবং এখানে সমাহিত রয়েছেন আবু হানিফা, শাইখ জুনাদি, শিবলী ও আব্দুল কাদির জিলানী—সুফীদের প্রধান।

ইমাম ও শাইখদের স্মৃতিস্তম্ভসমূহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে খলিফা ও তাদের সহধর্মিনীদের স্মৃতিস্তম্ভ। শহরের অসংখ্য একাডেমী, কলেজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যে দু'টি ঐশ্বর্য ও ছাত্রসংখ্যার দিক দিয়ে সকল প্রতিষ্ঠানকে অতিক্রম করেছিল। একটি নিজামিয়া কলেজ, অপরটি মুস্তানসারিয়া কলেজ। প্রথমটি পঞ্চম হিযরীর প্রথমার্ধে সেলযুক সুলতান মালিক শাহের প্রধানমন্ত্রী নিজামুল মুলক আর দ্বিতীয়টি দু'শতাব্দী পর খলিফা মুস্তানসির বিল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

খলিফাদের অধীনস্থ সংস্কৃতির ঐতিহাসিক বলেন, "এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে খলিফা তাঁর নৈতিক ও মানসিক গুণাবলীর মাধ্যমে আমাদেরকে তাঁর চরিত্রের কয়েকটি অন্ধকারময় দিক বিস্মৃত করার ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন এবং এখন মুসলিম জাহানে যে শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন শুরু হয়েছে তাতেও প্রেরণা জুগিয়েছিলেন।"[১৩] খলিফা মনসুরের আদেশেই বিদেশি ভাষার সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ প্রথম আরবীতে অনূদিত হয়েছিল। উঁচুদরের পণ্ডিত ও গাণিতিক তিনি ভারতীয় উপকথা (হিতোপদেশ), জ্যোতির্বিদ্যার উপর ভারতীয় গ্রন্থ, "সিদ্ধান্ত", এরিস্টটলের কয়েকটি গ্রন্থ, ক্লডিয়াস টলেমির'দি আল্ ম্যাজেস্ট' ইউক্লিডের গ্রন্থসমূহ এবং বহু প্রাচীন গ্রীক, বাইজান্টাইন, পারসিক ও সিরীয় গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেছিলেন। মাসুদি বলেন যে এই অনূদিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হতে না হতেই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে সেগুলি পঠিত হয়েছিল। মনসুরের উত্তরাধিকারীগণও বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিদ্বান ও জ্ঞানীদের অনুরাগী পৃষ্ঠপোষকই ছিলেন না, তারা নিজেরাও অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখার অনুশীলন করতেন। তাদের অধীনে আরবজাতির বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, অন্য কথায় বিশাল সাম্রাজ্যের সম্মিলিত জাতিসমূহ, যা নিয়ে খেলাফত গঠিত ছিল তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বিস্ময়কর দ্রুততার সঙ্গে অগ্রসর হয়েছিল।

বিশ্বের প্রত্যেক বড় জাতির এক একটা সোনালী যুগ রয়েছে। এথেন্সের পেরিক্লিয়াস যুগ, রোমের অগাস্টান যুগের মতো মুসলিম জাহানেরও গৌরবময় যুগ ছিল। মনসুরের সিংহাসনে আরোহণ থেকে মুতাজিদ-বিল্লাহর মৃত্যু পর্যন্ত সময়, শুধু

www.amarboi.org

মুতাওয়াক্কিলের রাজত্বের স্বল্পকালকে বিরতি হিসেবে নিয়ে মনসুরের সিংহাসনারোহণ থেকে মুতাজিদবিল্লাহর মৃত্যুকাল পর্যন্ত কালকে মহত্ত্ব ও শানশওকতের দিক দিয়ে উৎকৃষ্টতর না বললেও ন্যায়সঙ্গতভাবে সমকক্ষ বলতে পারি। প্রথম ছয়জন আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে, বিশেষ করে মামুনের সময়ে মুসলমানেরা অগ্রগামী সভ্যতার জন্ম দিয়েছিলেন। যখন দূরে ভারত ও চীনদেশ যুগের গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন তখন আরবজাতি তাদের স্থিতিস্থাপক প্রতিভা ও কেন্দ্রীয় অবস্থানের সুবিধার মাধ্যমে একদিকে মুমূর্ষু গ্রীস ও রোমের আর অপরদিকে পারস্যের মহামূল্য সম্পদসহ মুখ্যত বিশ্বমানবের গুরু হওয়ার জন্য উপযুক্ততা অর্জন করেছিলেন। মহান নবীর অনুপ্রেরণার প্রভাবে, যিনি তাদেরকে একটি জীবনবিধান দিয়েছিলেন, একটি জাতিতে পরিণত করেছিলেন, এবং খলিফাদের সাহায্যে, আরবজাতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাকে অধিগত করেছিল এবং শিক্ষাগুরুর শিক্ষার সঙ্গে তাকে সমন্বিত করেছিল এবং "যোদ্ধার জীবন থেকে আরম্ভ করে শিক্ষার্থী পণ্ডিতের জীবনে পদার্পণ করেছিল" হামবোল্ড বলেন, "আরবগণ দৌত্যক্রিয়া করার জন্য এবং ইফ্রেতিস থেকে গোয়াদলকুইভার ও মধ্য-আফ্রিকা পর্যন্ত জাতিসমূহকে প্রভাবিত করার জন্য প্রশংসনীয়ভাবে উপযোগী ছিল। তাদের নজিরবিহীন বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যকলাপ বিশ্বের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র যুগ হিসেবে চিহ্নিত করে।"

উমাইয়াদের শাসনকালে আমরা মুসলমানদেরকে শিক্ষানবিশীর যুগ উত্তীর্ণ হতে, যে মহান দায়িত্বপালন করার জন্য তারা আহূত হয়েছিল তার জন্য প্রস্তুতি নিতে দেখি। আব্বাসীয়দের আমলে জগতের জ্ঞানের ভাণ্ডারী হিসেবে দেখতে পাই। খলিফার প্রতিনিধিরা জগতের সবখান থেকে পুরাকালের সঞ্চিত জ্ঞানসম্পদ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করে আনেন; এসব রাজধানীতে নিয়ে আসা হয় এবং সপ্রংশস ও মূল্য-নিরূপক জনগণের সম্মুখে স্থাপন করা হয়। বিদ্যালয় ও একাডেমী সর্বত্র স্থাপিত হয়; প্রত্যেক শহরে গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয় এবং জনসাধারণের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। প্রাচীনকালের বড় বড় দার্শনিক ও কোরআনকে পাশাপাশি রেখে অধ্যয়ন করা হয়। গ্যালেন, ডায়োসকোরাইডস, থেমিসটিয়াস এরিস্টটল, প্লেটো, ইউক্লিড, টলেমি ও অ্যাপ্লোনিয়াস তাদের যথাযোগ্য সম্মান ও সমাদর লাভ করেন। সুলতানগণ নিজেরাই সাহিত্যিক ও দার্শনিক সভায় সহযোগিতা করেন। মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রথম ধর্মীয় ও স্বৈরতন্ত্রী সরকারকে দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা ও কার্যক্রমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সক্রিয় হতে দেখা যায়।

কলা ও বিজ্ঞানের কর্ষণে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক শহর অন্য শহরকে অতিক্রম করার চেষ্টা করত। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও প্রধানেরা সুলতানদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। মহান শিক্ষাগুরুর নীতি অনুসারে জ্ঞান আহরণের উদ্দেশ্যে দেশ পর্যটন ছিল একটি পবিত্র কর্তব্য। বিশ্বের প্রত্যেক জায়গা থেকে শিক্ষার্থী ও গবেষক আরব্য পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের বাণী শ্রবণ করার জন্য কর্দোভা, বাগদাদ ও কায়রোতে ভিড় জমাতেন। এমন কি খ্রিস্টানগণ ইউরোপের সুদূর প্রত্যন্ত সীমা থেকে মুসলমানদের শিক্ষা

www.amarboi.org

প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার জন্য আসতেন। যে সব মণীষী পরবর্তী জীবনে গির্জার অধ্যক্ষ[১৪] হয়েছিলেন তারাও মুসলমান শিক্ষকদের নিকট থেকে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। আল মুয়িজ লি দিন-ইল্লাহের শাসনাধীনে কায়রোর অভ্যুত্থান আব্বাসীয় ও ফাতেমীয় বংশের খলিফাদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব যোগ করেছিল। আল্ মুয়িজ ছিলেন পশ্চাত্যের মামুন—মুসলিম আফ্রিকার 'ম্যাসিনাস'—তখন মিশরের পূর্ব পর্যন্ত থেকে আতলান্তিক মহাসাগরের তীরভূমি ও সাহারার প্রান্তসীমা পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল্ মুয়িজ ও তাঁর প্রথম তিনজন উত্তরাধিকারীর শাসনামলে কলা ও বিজ্ঞান সুলতানদের বিশেষ অনুরাগ ও রক্ষিত তত্ত্বাবধানে সমৃদ্ধ হয়েছিল। কায়রোর অবৈতনিক বিশ্ববিদ্যালয়—'দারুল হিকমত'—বিজ্ঞান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আল্ মুয়িজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেই বিজ্ঞান ইনিস্টিটিউট "বেকনের তথ্যানুসন্ধানের আদর্শকে পূর্ব থেকেই অনুমান করতে পেরেছিল"। ফেজের ইদরিসীয় বংশ ও স্পেনের মুরগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলনে পরস্পরকে অতিক্রম করেছিল। আতলান্তিক মহাসাগর থেকে পূর্বদিকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত, এমন কি প্রশান্ত মহাসাগর থেকে দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে মুসলমানদের তত্ত্বাবধানে ও অনুপ্রেরণায় দর্শন ও শিক্ষার বাণী অনুরণিত হয়েছিল। যখন আব্বাসীয় বংশ প্রাচ্যের সাম্রাজ্যের উপর তাদের কর্তৃত্ব হারিয়েছিল, তখন যে প্রধানগণ সেসব অঞ্চলের শাসনের রজ্জু ধরেছিল যেসব অঞ্চলে এক সময়ে খলিফাদের একচ্ছত্র আধিপত্যের অধীনে ছিল তারা তাদের ক্ষমতার উৎস খলিফাদের ন্যায় সাহিত্য-বিজ্ঞানের চর্চায় অনুরাগ প্রদর্শন করেছিলেন। দুর্ধর্ষ তাতারদের আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের অনুশীলনের বিরুদ্ধে যাজকতন্ত্রের বিজয় ও প্রকাশ্য বিদ্বেষ সত্ত্বেও এই স্বর্ণযুগ স্থায়ী হয়েছিল। যে সব বর্বর খেলাফত উৎখাত করেছিল ও সভ্যতার ধ্বংস সাধন করেছিল তারা ইসলাম গ্রহণের পর পরই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুরাগী সংরক্ষকে পরিণত হয়েছিল।

এই যুগে খ্রিস্টান জাহানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবস্থা কি ছিল? কনস্ট্যানটাইন ও তাঁর গোঁড়া উত্তরাধিকারীদের শাসনামলে এসকেলিপিউন চিরতরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল; আদিম পৌত্তলিক সম্রাটদের উদারতার ফলে যে সব পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ছিন্নভিন্ন বা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল; "শিক্ষাকে ম্যাজিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল বা রাজদ্রোহিতা বলে গন্য করা হয়েছিল"; দর্শন ও বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা হয়েছিল। "অজ্ঞানতা ধর্মনিষ্ঠার জননী" এই যাজকীয় নীতিবাক্যের মধ্যে মানবীয় শিক্ষার প্রতি যাজকতন্ত্রের ঘৃণা রূপায়িত হয়েছিল। যাজকীয় সার্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠাতা মহান পোপ গ্রেগরি রোম থেকে সব বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠনকে নির্বাসিত করে ও অগাস্তাস সিজার-প্রতিষ্ঠিত প্যালেস্টাইন পাঠাগার ভস্মীভূত করে এই জ্ঞানবিরোধী নীতিকে কার্যকর করেছিলেন। তিনি গ্রীস ও রোমের প্রাচীন লেখকদের রচনা পাঠ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তিনি পৌরানিক খ্রিস্টধর্মের প্রবর্তন ও পুতকরণ করেছিলেন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপের প্রভাবশালী ধর্মমত হিসেবে চলেছিল—সাধকদের স্মৃতিচিহ্ন

www.amarboi.org

ও ধ্বংসাবশেষ পূজা ছিল এর অন্তর্ভুক্ত। গোঁড়া খ্রিস্টধর্ম সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। যখন স্বাধীন চিন্তা মানবমনের অগ্রগতি রোধ করার জন্য তৈরি প্রাচীর ভেঙে দিয়েছিল একমাত্র তখনি তারা নিজেদের মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল।

আব্দুল্লাহ আল্ মামুন সঠিকভাবেই আরবদের অগাসতাস বলে অভিহিত। "তিনি এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন না যে তারা আল্লাহর মনোনীত তাঁর শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে কল্যাণকামী দাস, যাদের জীবন তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের প্রতি নিবেদিত ... আর জ্ঞানের অন্বেষণকারী মহান শিক্ষকেরা জগতের প্রকৃতি জ্যোতিষ্ক ও আইনপ্রণেতা।"[১৫]

মামুনের উত্তরাধিকারী যুবরাজগন তাঁর কর্মধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের শাসনামলে বাগদাদের পঠন-পাঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক ধারা ছিল প্রকৃতপক্ষে প্রবল বৈজ্ঞানিক মানসিকতা, আর এই বিশিষ্টতা তার সমুদয় সাফল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। যে অবরোহ পদ্ধতিকে আধুনিক ইউরোপের উদ্ভাবন ও একমাত্র একচেটিয়া অধিকার বলে বিবেচিত হত তা মুসলমান পণ্ডিতেরা নিখুঁতভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। "জ্ঞাত বিষয়ক থেকে অজ্ঞাত বিষয়ে উত্তরণের মধ্যদিয়ে বাগদাদের শিক্ষাব্যবস্থা কার্য থেকে কারণে উন্নীত হওয়ার জন্য ঘটনাবলীর যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিল এবং কেবল অভিজ্ঞতা প্রদর্শিত বিষয়ই গ্রহণ করেছিল; মুসলিম শিক্ষাবিদেরা এই ধরনের মূলনীতিসমূহ শিক্ষা দিয়েছিলেন।" একই গ্রন্থকার আরও বলেছেন, "নবম শতকের আরবগণ সেই উর্বর পদ্ধতির অধিকারী হয়েছিলেন যে পদ্ধতি বহু পরে আধুনিক চিন্তাবিদদের হাতে তাদের সুন্দরতম আবিষ্কারসমূহের হাতিয়ার হয়েছিল।"

এই যুগে যেসব বৈজ্ঞানিক ও বিদগ্ধজন আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের বিবরণ দিতে হলে কয়েক খণ্ড গ্রন্থ প্রণয়নের প্রয়োজন। তারা নানাভাবে অগ্রগতির ইতিহাসে তাদের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। আরব জ্যোতির্বিদদের মধ্যে প্রাচীনতম মনীষী, মাশা আল্লাহ এবং আহমদ ইবনে মুহম্মদ আল্ নেহাবন্দী মনসুরের রাজত্বকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মাশা আল্লাহকে ঐতিহাসিক আবুল ফারাজ তাঁর কালের ফিনিক্স বলে অভিহিত করেছেন। তিনি গোলকের মণ্ডল, গ্রহনক্ষত্রের প্রকৃতি ও গতি সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন—এসব গ্রন্থ আজও বৈজ্ঞানিকদের বিস্ময় উৎপাদন করে। আহমদ আল্ নেহাবন্দী তাঁর নিজস্ব নিরীক্ষণের উপর নির্ভর করে জ্যোতিষ্কের একটি ছক—'আল্ মুস্তামাল' তৈরি করেছিলেন যা গ্রীক ও হিন্দু পণ্ডিতদের ধারণাসমূহের উপর অবিসংবাদিতভাবে অগ্রগামী পদক্ষেপ ছিল। মামুনের তত্ত্বাবধানে টলেমির 'আল্মাজেস্ট' পুনরায় অনূদিত হয়েছিল এবং সেন্দ ইবনে আলী, ইয়াহিয়া ইবনে আবি মনসুর ও খালিদ ইবনে আব্দুল মালিক 'পরীক্ষিত ছক' তৈরি করেছিলেন। বিষুব, গ্রহণ ও ধূমকেতুর আবির্ভাব এবং অন্যান্য খ-গোলীয় ঘটনাবলীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের নিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণসমূহ বহুলাংশে মূল্যবান ছিল; আর তা অনেক পরিমাণে মানুষের জ্ঞানের সীমা সম্প্রসারিত করেছিল।

মামুনের আদেশে মুহম্মদ ইবনে মুসা আল খাওয়ারিজমী টীকা ও নিরীক্ষণ সহকারে 'সিদ্ধান্ত' বা ভারতীয় ছকের নতুন অনুবাদ করেছিলেন। গণিত, জ্যামিতি, দর্শন,

www.amarboi.org

আবহাওয়া-বিজ্ঞান, আলোক-বিজ্ঞান চিকিৎসা-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর আল্‌কিন্দি দু'শ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। গ্রীক ভাষায় সম্যক পারদর্শী আল্‌কিন্দি এথেন্স ও আলেকজান্দ্রিয়ার পণ্ডিত সমাজ থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা তিনি তাঁর মূল্যবান গ্রন্থসমূহে বিধৃত করেছিলেন। সেডিলট বলেছেন, "তাঁর গ্রন্থাবলী কৌতুহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক তথ্যে পরিপূর্ণ।" আবু মা শার (মধ্য যুগের ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যাকে আল্‌বুমাফরে পরিণত করেছেন) খগোলীয় ঘটনাসমূহকে তাঁর গবেষণার বিষয় করেছিলেন, আর 'জিযআবি মা শার' বা আবু মা শারের ছক সব সময়ে জ্যোর্তিবিদ্যা-বিষয়ক জ্ঞানের অন্যতম প্রধান উৎস বলে বিবেচিত হয়েছে। মামুন ও তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী উত্তরাধিকারীদের শাসন আমলে কর্মনিরত মুসা বিন শাকিরের পুত্রদের[১৬] আবিষ্কারসমূহ, বিশেষ করে সূর্য এবং অন্যান্য জ্যোতিষ্কের মধ্যম গতি সম্পর্কীয় মূল্যায়ন ইউরোপের সাম্প্রতিক আবিষ্কারসমূহের মতোই যথাযথ, তাদের যেসব যন্ত্রপাতি ছিল তা বিবেচনা করলে তারা বিস্ময়কর যথার্থ্যের সঙ্গে ক্রান্তিবৃত্তের তির্যক গতি নিরূপণ করেছিলেন এবং সর্বপ্রথম সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চন্দ্রের উচ্চতার বিভিন্নতা লক্ষ্য করেছিলেন, তারা উল্লেখযোগ্য যথার্থ্যের সঙ্গে বিষুবের পূর্বগমন ও সৌর দূরত্বের গতি (যা গ্রীকদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল তা নিরীক্ষণ ও নিরূপণ করেছিলেন। লোহিত সাগরের তীরের উপর এক ডিগ্রি পরিমাপক থেকে পৃথিবীর আকার নির্ধারণ করেছিলেন—এটা এমন এক সময়ে করা হয়েছিল যখন খ্রিস্টান ইউরোপ পৃথিবীর সমতলত্ব ঘোষণা করেছিলেন। আবুল হাসান দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছিলেন যে বিষয়ে তিনি বলেছেন "দু'প্রান্তে বিস্তারিত নল যার সঙ্গে সংকেতের বাহু সংযুক্ত"। এই নলের উন্নতি সাধন করা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তা মারাঘা ও কায়রোর মানমন্দিরে প্রভূত সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছিল। আল্ নায়েরিজি ও মুহম্মদ ইবনে ঈসা আবু আব্দুল্লাহ মুসা ইবনে শাকিরের পুত্রদের[১৭] মহতী কার্য অব্যাহত রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে আল্ বাতানীর আবির্ভাব ঘটেছে—মুসলিম বৈজ্ঞানিকগণ প্রাচীন জাতিসমূহের স্থূল জ্যোতির্বিদ্যাকে নিয়মিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞানে পরিণত করেছিলেন। যদিও আল্‌বাতানীকে[১৮] তাঁর উত্তরাধিকারীগন অতিক্রম করেছিলেন তথাপি তিনি জ্যোতির্বিদদের মধ্যে উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। একজন যথোপযুক্ত বিচারক তাঁর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, গ্রীকদের মধ্যে যেমন টলেমি আরবদের মধ্যে তেমনি আল্ বাতানী। তাঁর জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক ছক লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়েছিল এবং তা বহু শতাব্দী ধরে ইউরোপের জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তি প্রদান করেছিল। তিনি গণিতের ইতিহাসে জ্যামিতিক ও ত্রিকোণমিতিক পরিমাপের জ্যার আবিষ্কারকের পরিবর্তে সাইন ও কোসাইনের প্রবর্তক হিসেবে সর্বাধিক পরিবিদিত।

দশম শতাব্দীর শেষের দিকে বহুসংখ্যক জ্যোতির্বিদ বাগদাদে কর্মনিরত ছিলেন। তাদের মধ্যে দু'জন আলী ইবনে আমাজুর এবং আবুল হাসান আলী ইবনে আমাজুর। সাধারণতঃ বানু আমাজুর নামে পরিচিত সর্বাগ্রগণ্য। তাঁরা তাঁদের চান্দ্রগতি গণনার জন্য সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

www.amarboi.org

কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দুর্বলতার জন্য এবং প্রত্যন্ত ও দূরবর্তী এলাকায় খলিফার কর্তৃত্ব বজায় রাখার ক্রম অগ্রসরমান অক্ষমতার দরুন দশম শতাব্দীর শেষের দিকে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় কিছুসংখ্যক অর্ধ স্বাধীন প্রধানের আবির্ভাব ঘটে। তাদের অভ্যুত্থানে স্পেন আব্বাসীয়দের ক্ষমতাচ্যুত হয়; এ সময়ে বণী ইদরিসগণ ফেজে, বণী রুস্তমগণ তাহার্তে এবং বণী আঘলাবগণ আফ্রিকার কায়রেওয়ানে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। শীঘ্রই ঐ দেশের উত্তরাঞ্চল বণী ফাতেমীয়দের করতলগত হয়। তখন কলা ও সাহিত্যের আর একটি গৌরবময় যুগের আরম্ভ হয়। ফেজ, মিকনাসা, সেগেলমেসা, তাহার্ত, টেলেমসেন, কায়রোওয়ান, সর্বোপরি কায়রো কৃষ্টি ও জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। খোরাসানে তাহেরীয়গন, ট্রানসোকিসয়ানায় সামানীয়গণ, তাবারিস্তানে পরে, পারস্যে ও বাগদাদে প্রাসাদের মেয়র হিসেবে বুয়াইদগণ বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের প্রতি অকৃপণ পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। সে যুগের সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী আব্দুর রহমান সূফী ছিলেন বুয়াইদ আমির আজাদ-উদ-দৌলার[১৯] অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁকে যথোপযুক্তভাবেই আরবদের দ্বিতীয় অগাস্তাস বলা হয়। আব্দুর রহমান তারকার আলোকমান যন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন। আজাদউদ্‌দৌলা নিজে একজন পণ্ডিত ও গাণিতিক ছিলেন; তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বাগদাদে সমাগত বিদ্বান ব্যক্তিদেরকে তাঁর প্রাসাদে সম্মানিত অতিথি হিসেবে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং তাদের মধ্যকার বৈজ্ঞানিক মতবিরোধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। খলিফা মুতাফিক বিল্লাহ্‌র পুত্র জাফর ধূমকেতুর অনিয়মিত গতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ চালিয়েছিলেন এবং সে বিষয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অন্যান্য যুবরাজগণও তাদের পাঠ্যবিষয়ের পাশাপাশি বিজ্ঞান চর্চা করতেন।

বুয়াইদদের অধীনে একদল জ্যোতির্বিদ, পদার্থবিদ ও গণিতবিদ খ্যাতি ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন—তাঁদের মধ্যে মাত্র দু'জন—আল্‌-কোহি এবং আবুল-ওয়াফা। আল্‌-কোহি গ্রহের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন এবং সে সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। উত্তর অয়নান্ত ও শরৎকালীন বিষুব সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কার মানবজ্ঞানের সীমারেখা বৃদ্ধি করেছিল। আবুল ওয়াফা খোরাসনের বুজ যান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে; তিনি ৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ইরাকে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেখানে তিনি গনিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুশীলনে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাঁর 'জিয্‌-উশ্‌-শামিল' বা 'একত্রিত/ সাধারণ ছক' পরিশ্রম, সূক্ষ্ম ও যথাযথ পর্যবেক্ষণের স্মৃতিস্তম্ভ। তিনি ত্রিকোণমিতি ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে ছেদক রেখা ও স্পর্শকের ব্যবহার করেছিলেন। এম, সেডিলট বলেন, "এসব ছিল না; টলেমির চান্দ্রবিষয়ক মতবাদের ভ্রান্তি দ্বারা নীত হয়ে তিনি প্রাচীন পর্যবেক্ষণ যাচাই করেছিলেন এবং স্বতন্ত্রভাবে কেন্দ্র ও বহিঃস্থের সমীকরণের মধ্যে এক তৃতীয় অসাম্য আবিষ্কার করেছিলেন যা ছ'শ বছর পর টাইকো ব্রাকে নিরূপণ করেছিলেন।"[২০]

মিশরের ফাতেমীয়দের অধীনে কায়রো জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার নতুন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। আযীয বিল্লাহ[২১] এবং হাকিম বি আমরিল্লাহ শাসনামলে এ যুগের অন্যতম

www.amarboi.org

শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক, পেণ্ডুলামের উদ্ভাবক ও তার দোলনের সাহায্যে সময়ের পরিমাপক, ইবনে ইউনুস[২২] সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর পৃষ্ঠপোষক ও নৃপতির নামানুসারে যে বৃহৎ গ্রন্থ 'জিয্ উল আকবর আল্ হাকিমী' প্রকাশ করেছিলেন তা সত্বর ক্লডিয়াস টলেমির আবিষ্কারকে মিথ্যা প্রমাণ করেছিল। পারসিকদের মধ্যে জ্যোতির্বিদ কবি ওমর খৈয়াম (১০৭৯) এই তত্ত্ব পুনরুজ্জীবিত করেন; গ্রীকদের মধ্যে 'ক্রাইসোকোকার সিইনট্যাকসের মধ্যে; মোঙ্গলদের মধ্যে নাসিরউদ্‌দীন তসী "জিয্ ইল্ খানী"-তে এবং চীনদের মধ্যে ১২৮০-তে চো চিয়ো কিং-এর জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই তত্ত্ব পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। এরূপে যা চীনদেশের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি আরোপিত হয়েছিল তা শুধু ছিল মুসলমানদের নিকট থেকে ধার করা আলো।[২৩]

ইবনে ইউনুস ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে ইহলীলা সংবরণ করেন এবং তাঁর আবিষ্কার ইবনুন নাবদী যিনি ১০৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কায়রোতে বসবাস করেছিলেন এবং সাধারণভাবে ইউরোপে আলহাজেন হিসেবে অভিহিত এবং আবহাওয়া-বিষয়ক আলোক প্রতিসরণ আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত হাসান ইবনে হায়সাম—এই দু' ব্যক্তি চালু রেখেছিলেন। তিনি একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন; তিনি ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও আলোকবিজ্ঞানী। তিনি স্পেনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং প্রধানতঃ মিশরে বসবাস করতেন। তিনি তাঁর আলোক, চশমা সম্পর্কীয় রচনার জন্য ইউরোপে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। এ জাতীয় তাঁর একটি গ্রন্থ রিসনার লাতিনে অনুবাদ করেছিলেন। দর্শনের প্রকৃতি বিষয়ক গ্রীকদের ভ্রান্ত ধারণাকে তিনি সংশোধিত করেছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম প্রদর্শন করেছিলেন যে আলোকরশ্মি বাহ্যবস্তু থেকে চোখে আসে—চোখ হতে নির্গমন করে বাহ্যবস্তুতে আসে না এবং তার উপর আঘাত হানে না। তিনি অক্ষিপটকে দর্শনের কেন্দ্র বলে নির্ধারিত করেছিলেন এবং প্রমাণিত করেছিলেন যে অক্ষিপটে সৃষ্ট উদ্দীপনা দৃষ্টিবাহী স্নায়ু দিয়ে মস্তিষ্কে বাহিত হয়। তিনি অদ্বৈত বা একটিমাত্র দর্শনকে দুই অক্ষিপটের প্রতিসম অংশের উপর পতিত দৃষ্টিগত প্রতিরূপের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে আলোক প্রতিসরণ বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বের সঙ্গে পরিবর্তিত হয় এবং বায়ুমণ্ডলীয় ঘনত্ব পুনরায় উচ্চতার সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। তিনি যথাযথভাবে ও পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন কিভাবে এই প্রতিসরণের ফলস্বরূপ তারকা নক্ষত্র তাদের প্রকৃত উদয় ও অস্তের পূর্বেই দৃষ্ট হয় এবং প্রদর্শন করেছিলেন যে গোধূলির সুন্দর দৃশ্য বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিসরণের সঙ্গে আলোকরশ্মির চলাচলের উপর বায়ুর প্রতিফলিত ক্রিয়ার সম্মিলিত ফল। তিনি তাঁর 'ব্যালান্স অব উইজডাম্' (জ্ঞানের ভারসাম্য) নামক গ্রন্থে গতিশীল নীতিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করেন যা সাধারণভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের একচেটিয়া অধিকার বলে অনুমিত হয়। তিনি বায়ুমণ্ডলের ভারত্ব ও তার ঘনত্বের সম্পর্ক এবং কিভাবে হালকা ও ভারি বায়ুমণ্ডলে বস্তুর ওজন পরিবর্তিত হয় তা সূক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেন। ভাসমান বস্তুর জলমগ্ন হওয়া এবং হালকা কিংবা ভারী মাধ্যমে নিমজ্জিত করলে যে শক্তিতে তারা উপরিভাগে

www.amarboi.org

উঠে আসে সে সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন; তিনি মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব পরিপূর্ণভাবে বুঝতেন এবং মাধ্যাকর্ষণকে একটি শক্তি হিসেবে অনুধাবন করতেন। তিনি পতনশীল বস্তু গতিবেগ, পতনস্থান ও পতনকালের মধ্যকার সম্পর্ক সঠিকভাবে জানতেন। কৈশিক আকর্ষণ সম্পর্কে তাঁর অত্যন্ত সুস্পষ্ট ধারণা ছিল।[২৪]

স্পেনে পিরেনীজ পর্বতমালা থেকে মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত ভূভাগে একই ধরনের মানসিক সক্রিয়তা চালু ছিল; সেভিল, কর্দোভা, গ্রানাডা, মুর্সিয়া, টলেদো এবং অন্যান্য স্থানে সাধারণ গ্রন্থাগার ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এসব স্থানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অবৈতনিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। কর্দোভা সম্পর্কে একজন ইংরেজ লেখক লিখেছেন, "কর্দোভার প্রাসাদ ও উদ্যানসমূহ যেমন সুন্দর ছিল তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চতর বিষয়েও তার দাবী কম শক্তিশালী ছিল না। পার্থিব বিষয়ের মতো মানসিক বিষয়েরও পরিপাটি ছিল। তার অধ্যাপক ও শিক্ষকমণ্ডলী তাকে ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করেছিল; তার বিখ্যাত পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষাগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীগন ইউরোপের বিভিন্ন অংশ থেকে আসত, এমন কি সন্ন্যাসিনী হরোসবিথা সুদূরবর্তী গদারশেমে তাঁর স্যাকসন কনভেন্টে থেকেও যখন ইউলোজিয়াসের শাহাদতের খবর পেয়েছিলেন তখন তিনি "জগতের উজ্জ্বলতম দীপ্তি কর্দোভার প্রশংসা না করে পারেননি। সেখানে বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখা নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলিত হত; আর চিকিৎসাশাস্ত্র আন্দালুসিয়ার চিকিৎসক ও অস্ত্রোপচারকগণের আবিষ্কারের দ্বারা এত অধিক সমৃদ্ধি লাভ করেছিল যে গ্যালেনের পর বহু শতাব্দী অতিবাহিত হলেও সে সময়ের মধ্যে তেমন কিছু অর্জিত হয়নি ... জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূগোল, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিহাস সব বিষয়ই কর্দোভায় উৎসাহের সঙ্গে অনুশীলিত হত; সাহিত্যের এতই উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল যে ইউরোপে কোন কালেই কবিতা প্রত্যেক মানুষের মুখের ভাষায় পরিণত হয়নি—যখন সকল শ্রেণীর মানুষ ঐসব আরবী কবিতা রচনা করত যা সম্ভবতঃ স্পেনের চারণ কবিদের ব্যালাড ও ক্যানজোন্টে এবং প্রভেনস ও ইতালীর ট্রুবেডার্সের নমুনা নির্দেশ করত। কোন ভাষণ বা বক্তৃতার সঙ্গে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত কোন কবিতার পঙ্ক্তি জুড়ে না দিলে বা স্মৃতির মাধ্যমে কোন বিখ্যাত কবির কবিতা থেকে উদ্ধৃতি না দিলে সে ভাষণ বা বক্তৃতা সম্পূর্ণ হত না"[২৫] এর সঙ্গে আমরা রেনানের কিছু কথা যোগ করতে পারি : "খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে পৃথিবীর এই বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত অঞ্চলে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ যে সহনশীলতা প্রতিষ্ঠিত করেছিল আধুনিক জগৎ আদৌ সেরূপ কোন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে না। খ্রিস্টান, ইহুদী ও মুসলমান একই ভাষায় কথা বলতেন, একই গান গাইতেন এবং একই সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ডে অংশ গ্রহণ করতেন। যেসব প্রতিবন্ধকতা জনগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার ভাব আনয়ন করত তা মুছে দেওয়া হয়েছিল। সকলে এক ঐক্যমতে একটি সাধারণ সভ্যতার উজ্জীবনে কাজ করতেন। কর্দোভার মসজিদসমূহ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের সক্রিয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল যেখানে সমবেত ছাত্রদের সংখ্যা হাজারের মাধ্যমে গণনা

www.amarboi.org

করা হত"[২৬] ইউরোপের প্রথম মানমন্দির আরবেরা নির্মাণ করেছিলেন। জিরাণ্ডা বা সেভিলের বুরুজ বিখ্যাত গাণিতিক জাবির ইবনে আফিয়ার নির্দেশনায় ১১৯০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল আকাশসমূহের পর্যবেক্ষণের জন্য। এর ভাগ্য কম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল না। মুরদের বিতাড়নের পর একে গির্জার ঘণ্টা ঘরে পরিণত করা হয়েছিল; স্পেনবাসীরা একে দিয়ে কি করবে তা জানত না।

ওমর ইবনে খালদুন, ইয়াকুব ইবনে তারিক, মুসলিমা আল্ মাঘরিবি, এবং প্রখ্যাত অ্যাভেরোজ (আবুল ওয়ালিদ মুহম্মদ ইবনে রুশদ) কয়েকজন পদার্থবিজ্ঞানী যাঁদের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি। এ যুগে পাশ্চাত্য আফ্রিকা নিষ্ক্রিয় ছিল না; সিউটাওতানজিয়ার, ফেজ ও মরোক্কো কর্দোভা, সেভিল এবং গ্রানাডার প্রতিযোগিতা করত; তাদের কলেজসমূহ সমর্থ অধ্যাপকদের জন্ম দিয়েছিল এবং অসংখ্য পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ জ্ঞানের সকল বিভাগে মুসলিম মনের অফুরন্ত উদ্দীপনার সাক্ষ্য বহন করেছিল।

একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ সেন্ট্রাল এশিয়ার রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত করেছিল। মহান গজনভী অভিজেতা মাহমুদ[২৭] ইয়েমিন উদদৌলা এবং আমিনুল মিল্লাত—"সাম্রাজ্যের দক্ষিণহস্ত" এবং "ধর্মের সংরক্ষক" ট্রানসোকিসয়ানা, আফগানিস্তান ও পারস্যকে গজনী শাসনের অধীনে আনয়ন করেছিল। তিনি তাঁর চারপাশে একদল পণ্ডিত ও সাহিত্যিককে সম্মিলিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন যাঁরা তাঁর উজ্জ্বল রাজত্বের গৌরবদীপ্ত আভা বিকীর্ণ করেছিলেন। আল্ আশারীর অভিনব গোঁড়া মতবাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও এবং ফলস্বরূপ বুদ্ধিবাদী চিন্তাগোষ্ঠীর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হলেও যেসব কবি তাঁর নাম জগতের ইতিহাসে বিখ্যাত করেছিলেন তিনি তাদের প্রতি ছিল অত্যন্ত দরাজদিল। এতদসত্ত্বেও আবু রায়হান মুহম্মদ ইবনে আহমদ, আলবেরুনীর মতো দার্শনিক, গাণিতিক ও ভৌগোলিকদের প্রতিভা অনুধাবন করবার দূরদর্শিতা তাঁর ছিল—ছিল কবিদের যুবরাজ ফেরদৌসী, দাকিকি ও উনসূরীর মতো প্রতিভাধর স্রষ্টাদের উৎকর্ষ হৃদয়ঙ্গম করার। আল্ বেরুনীর মন ছিল সর্ববিদ্যাসংগ্রহী। তাঁর জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ তাঁর পৃষ্ঠপোষক সুলতান মামুদের[২৮] নামানুসারী 'আল্ কানুনুল্ মাসুদী'—ক্যানন মাসুদিকাস জ্ঞান ও গবেষণার এক বড় নিদর্শন। তিনি ভারতবর্ষে ভ্রমন করেছিলেন, হিন্দুদের ভাষা শিখেছিলেন, শিখেছিলেন তাদের বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য এবং তাঁর পর্যবেক্ষণের ফল তিনি একখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন যা সম্প্রতি আমাদের নিকট ইংরেজি ভাষায় পরিবেশিত হয়েছে। যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গী, সহানুভূতিশীল মনোভঙ্গী নয়, যা আল্ বেরুনীকে তাঁর বিষয়বস্তুর অবতারণায় উদ্বুদ্ধ করেছিল তা এখনও পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে যে প্রচলিত ধারা তার সঙ্গে বিসদৃশ, এবং তা ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্রের নির্দেশক। আল্ বেরুনীর 'ইণ্ডোইকা'[২৯] নির্দেশ করে কি পরিমাণে মুসলমানেরা গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যবহার করেছিলেন এবং তাকে ফলপ্রসূর উদ্দেশ্যে কাজে লাগিয়েছিলেন। এই দুইটি বিখ্যাত গ্রন্থ ছাড়া তিনি গণিত, বংশলতিকা, গাণিতিক, ভূগোল, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন।

www.amarboi.org

আল্‌বেরুনী হিন্দুদের ধারণা ও ঐতিহ্যের প্রত্যুত্তরে বাগদাদে অনুশীলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় তাদের নিকট ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে গ্রীক-বিজ্ঞানের রেশ দেখতে পেয়েছিলেন যা খ্রিস্টীয় শতাব্দীগুলির প্রথমদিকে আনীত হয়েছিল, কিংবা সম্ভবত তারও পূর্বে গ্রীকব্যাকট্রিয় বংশের আমলে আনীত হয়েছিল। হিন্দুরা জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কীয় কোন উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলে প্রতীয়মান হয় না। যদি থাকত তবে আমরা নিঃসন্দেহে তা আলেকজাণ্ডার ও সেলুসিডা বংশের গ্রীক গ্রন্থকারদের কাছ থেকে জানতে পারতাম। চীনদের মতো তাঁরা বাইরের উৎস থেকেই বৈজ্ঞানিক ধারণাসমূহ ধার করেছিলেন এবং জাতীয় বৈশিষ্ট্যে দৃষ্টিকোণ অনুসারে তা রূপান্তরিত করেছিলেন।

মাহমুদের উত্তরাধিকারীদের শাসনামলে শিক্ষা ও শিল্পকলার পর্যাপ্ত অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল। সেলজুকদের অভ্যুত্থান এবং পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি তাদের বিরাট উদারতা আব্বাসীয়দের সুবর্ণ যুগের উদারতার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। তুগ্রিল, আলগ আর স্লান, মালিকশাহ্ ও সঞ্জর তাঁদের শক্তি ও পরাক্রম এবং কিসে জনগণের কল্যাণ নিহিত তার স্বচ্ছ অনুধাবনের জন্যই শুধু প্রসিদ্ধি লাভ করেননি, অধিকন্তু তাঁরা তাঁদের মেধা ও শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ-উৎসাহের নিমিত্তও সমভাবে স্মরণীয় হয়েছিলেন। জালালউদ্‌দীন মালিকশাহ্[৩০] ও তাঁর মন্ত্রী খাজা হাসান নিজামুল্ মুলক[৩১] তাঁদের চারপাশে একদল জ্যোতির্বিদ, কবি, পণ্ডিত ও ঐতিহাসিককে সমবেত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ওমর খৈয়াম ও আব্দুর রহমান আল্ হাজিনীর নেতৃত্বে একদল পণ্ডিত তাঁর রাজত্বকালে যে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষণ পরিচালনা করেছিলেন তার ফলে বর্ষপঞ্জীর যে সংস্কার সাধিত হয়েছিল তা গ্রিগোরীয় সংস্কারের ছ'শ বছর অগ্রবর্তী ছিল। এ সম্পর্কে একজন যোগ্য কর্তৃপক্ষ বলেছেন যে এটা অধিকতর যথার্থ ছিল।[৩২] এই নিরীক্ষণকে ভিত্তি করে যে যুগের শুরু হয়েছিল তা মালিকশাহের নামানুসারে "জালালী বর্ষ" নামে অভিহিত হয়েছিল।

খ্রিস্টান লুণ্ঠনকারীদের ধ্বংসাত্মক আকস্মিক আক্রমণ, যারা নিজেদেরকে ক্রুসেডার্স বা ধর্মযোদ্ধা বলে অভিহিত করেছিল, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মারাত্মক পরিণতি বয়ে এনেছিল। উন্মত্ত পুরোহিতরা লুণ্ঠন ও হত্যা করার জন্য যে নিষ্ঠুর বর্বরদের লেলিয়ে দিয়েছিল তারা না জানত নারী, শিশু বা বৃদ্ধের প্রতি করুণা কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি কদর। তারা নিষ্ঠুরতার সঙ্গে ত্রিপোলীর জমকাল গ্রন্থাগার ধ্বংস করেছিল; তারা আরবীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলার বহু গৌরবময় কেন্দ্র মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। খ্রিস্টান ইউরোপ আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগারের ধ্বংসের জন্য নিন্দাবাদ জ্ঞাপন করেছে যা জুলিয়াস সিজারের সময়ে ভস্মীভূত করা হয়েছিল। কিন্তু পাঁচ শতাব্দী পরে তার ক্রুসেডার্স বা ধর্মযোদ্ধারা যে অপরাধ করেছে তার জন্য সে একটি নিন্দাবাণীও উচ্চারণ করেনি। ধর্মযোদ্ধারা যে মহা অনর্থ ঘটিয়েছিল তার ফল দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। সালাদীন ও তাঁর পুত্রগণ সিরিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তা সত্ত্বেও সেদিন থেকে আজ অবধি সে অসাড়তা কাটেনি।

www.amarboi.org

মাহমুদের অভ্যুত্থান এবং বাগদাদের পতনের মধ্যে যে বিরতি কেটেছিল তার মধ্যে বেশ কয়েকজন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন যাদের মধ্যে মহান আভিসেনা (আবু আলী হুসাইন ইবনে সিনা)[৩৩], ফাত ইবনে নাবেঘাহ্ খাকানী[৩৪], মুবাশ্‌শার ইবনে আহমদ[৩৫], ও তাঁর পুত্র মুহম্মদ[৩৬] প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

আরবজাহানের উপর মোঙ্গলদের আক্রমণ উত্তরাঞ্চলের বর্বরদের রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণের মতো ছিল না। এটা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছিল। তুলনামূলকভাবে সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রের দিকে তাদের ক্রমাগত অগ্রসরের মধ্যে তারা আংশিকভাবে নমনীয় হয়ে পড়েছিল এবং তাদের আদিম দুর্ধর্ষতাও কিছুটা বিসর্জন দিয়েছিল। কিন্তু ধ্বংসকারী চেঙ্গিসের বাহিনীর ব্যাপার ছিল অন্যরূপ। পশ্চিম এশিয়ার উপর দিয়ে তারা বিপর্যস্তকারী ঝটিকার মতো বয়ে গিয়েছিল। যেখানে তারা গিয়েছিল সেখানেই তারা ধ্বংস ও দুর্দশা বহন করে এনেছিল।[৩৭] তাদের নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলা ও নির্মম হত্যাকাণ্ড কিছুদিনের জন্য এশিয়ার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা আরবের নবীর ধর্ম গ্রহণ করল তখন তাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আসল। শিক্ষা ও শিল্পকলার বিনাশকারীরা একাডেমীর স্থপয়িতা ও পণ্ডিতদের রক্ষাকারীতে পর্যবসিত হন। সুলতান খোদা বেন্দাহ (উলযায়তু খান), চেঙ্গিসখানের ষষ্ঠ অধঃস্তন পুরুষ তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। কিন্তু বর্বরগণ শহরের স্থায়ী ও সংস্কৃতিবান মানুষের মধ্যে যে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করেছিল তা সমৃদ্ধিশালী শ্রেণীগুলিকে ধ্বংস করেছিল এবং তার ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে, যদিও বোখারা ও সমরখন্দের মতো বড় শহরগুলি পুনরায় জাঁকজমকপূর্ণ হয়েছিল, তথাপি তারা পূর্বের চেয়ে অধিকতর ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মবিদ্যাবিষয়ক সংকীর্ণ সংস্কৃতির পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও মোঙ্গলরা ফখরুদ্দীন আল্ মারাগী, মুহিউদ্দীন আল্ মাগরিবী, আলী শাহ্ আল বোখারী ও অন্যান্যদের মতো দার্শনিকদেরকে রক্ষা করেছিলেন। হালাকুর উত্তরাধিকারীগণ তাদের পূর্বসূরীরা ইসলামের যে ক্ষতি করেছিল তা এভাবে পূরণ করবার চেষ্টা করেছিলেন, যখন পারস্যে মোঙ্গলেরা বিধ্বস্ত সভ্যতার সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল, তখন কুবলাই খান আরবদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চীনে প্রেরণ করেছিলেন। রাজা কোচিউ ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে জামালুদ্দীনের কাছ থেকে ইবনে ইউনুসের ছক গ্রহণ করেছিলেন এবং চীন জাতির কাজে লাগিয়েছিলেন। ইবনে শাসির মিশরের মমলুক নৃপতি মুহম্মদ বিনে কামাউনের রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। তিনি গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আরও উন্নতি বিধান করেছিলেন। তখন প্রাচ্য গগনে তৈমুরের মতো ধূমকেতু সদৃশ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছিল। "সমরখন্দের সিংহাসনে উপবিষ্ট থেকে চতুর্দশ শতকের এই দানব এশিয়ায় বৃহত্তম সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন এবং তাঁর অস্থির ইচ্ছার মধ্যে ইরান ও তুরানের অবিস্মরণীয় শত্রুতা নির্মূল করেছিলেন।" তিনি বিজ্ঞান ও কবিতার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তিনি তাঁর যুগের পণ্ডিত ও শিল্পীদের প্রতি অনুরাগী ছিলেন, নিজে একজন গ্রন্থকার ও উঁচুদরের আইন প্রণেতা ছিলেন।[৩৮] জমকাল

www.amarboi.org

কলেজসমূহ, চমৎকার মসজিদসমূহ, সুবৃহৎ গ্রন্থকারগুলি এই বিশিষ্ট ব্যক্তির জ্ঞানানুরাগের সাক্ষ্য বহন করে। ঔপনিবেশিকরণের সুবিশাল ব্যবস্থা প্রাচ্য এশিয়ার বড় বড় শহরগুলিকে, বিশেষ করে সমরখন্দকে প্রতীচ্যের পরিজ্ঞাত সকল শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা পরিশোধিত করেছিল। "স্পেনের উমাইয়া ও আরবের প্রথম আব্বাসিয়া বংশ ব্যতিরেকে ইসলামের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল সাম্রাজ্য" স্থাপন করেছিলেন তৈমুর। যাঁরা তার উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকে ঔজ্জ্বল্য দান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ জামী পিলপের অনুবাদক সুহাইলী, আলী শের আমীর প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সহধর্মিনী বিবি খানম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিতএবং তাঁর নামে অভিহিত কলেজটি অদ্যাবধি দর্শকদের মনে এটাকে আরবজাতির স্থাপত্যের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও সুন্দরতম নজির হিসেবে উপস্থাপিত করে। তৈমুর-তনয় শাহরুখ মীর্জা শিল্পকলা ও জ্ঞানের অনুশীলনে তাঁর পিতার অনুকরণ করেছিলেন। প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী তাঁর শান্তিপূর্ণ রাজত্বকাল উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তিনি যখন সমরখন্দ থেকে তাঁর রাজধানী হিরাতে স্থানান্তরিত করেছিলেন তখন সমরখন্দের ঔজ্জ্বল্যের কোন ঘাটতি পড়েনি। ট্রানসোক্সিয়ানার শাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত তাঁর পুত্র উলুগ বেগ সমরখন্দের সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক গৌরব অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। তিনি নিজে একজন উঁচুদরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন, তিনি খ-গোল নিরীক্ষণে সভাপতিত্ব করেছিলেন যা তাঁর নামকে অমর করে রেখেছে। যে সব ছকে ঐ সব নিরীক্ষণ লিপিবদ্ধ হয়েছিল তা আরবীয় চিন্তার পর্যায়ক্রমকে সম্পূর্ণ করেছিল। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠাতা কেপলারের কালে এবং উলুগবেগের কালের মধ্যে পার্থক্য ছিল মাত্র দেড় শ' বছরের।

যা'হোক মুসলমানেরা শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুশীলন ও উন্নতি সাধন করেননি। উচ্চতর গণিতের প্রত্যেক শাখায় তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করত। কথিত আছে যে গ্রীকরা বীজগণিতের উদ্ভাবক, কিন্তু ওলসনার যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে, তাদের মধ্যে "গবলেট খেলায়" আনন্দদানের কাজে বীজগণিত সীমিত ছিল। মুসলমানেরা একে উচ্চতর লক্ষ্যে নিয়োজিত করেছিলেন এবং এ পর্যন্ত এর যে মূল্য অজ্ঞাত ছিল তা প্রদান করেছিলেন। মামুনের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ডিগ্রির সমীকরণ তারা আবিষ্কার করেছিলেন এবং এর পর পরই তারা ত্রিঘাত সমীকরণ ও দ্বিপদ উপপাদ্যের বিকাশ সাধন করেছিলেন। শুধু বীজগণিত, জ্যামিতি ও গণিত নয়, আলোকবিদ্যা ও মেকানিক্স ও মুসলমানদের হাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছিল, তাঁরা খগোলীয় ত্রিকোণমিতির উদ্ভাবন করেছিলেন; তাঁরাই সর্বপ্রথম বীজগণিত জ্যামিতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন, আর ত্রিকোণমিতি গণনার ক্ষেত্রে বৃত্তচাপের জায়গায় সাইনে পরিবর্তন করেছিলেন। গাণিতিক ভূগোলের ক্ষেত্রের তাঁদের অগ্রগতি কম উল্লেখযোগ্য ছিল না, বিজ্ঞান বিভাগে, আরবজাতি যাকে 'রস্মুল আরজ' বলে অভিহিত করেছে, ইবনে হাওকাল, মাকরিজী, আল্-ইশতাখরী, মাসুদী, আল্‌বেরুনী, আল্‌কুমী ও আল্ ইদারিসি, কাজওয়াইনি, ইবনুল

www.amarboi.org

ওয়ারদী ও আবুল ফেদার গ্রন্থসমূহ নির্দেশ করে তাঁরা কি অর্জন করেছিলেন। যখন ইউরোপ দৃঢ়ভাবে পৃথিবীর সমতলত্বে বিশ্বাস করত এবং যে নির্বোধ এর বিপরীত চিন্তা করতে তাকে পুড়িয়ে ফেলত তখন আরবগণ গ্লোবের সাহায্যে ভূগোল শিক্ষা দিতেন।

পদার্থবিদ্যাসমূহ একইরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলিত হত। তত্ত্ব গঠনের পরিবর্তে পরীক্ষণ পদ্ধতি চালু হয়েছিল। প্রাচীনদের অপরিপক্ক ধারণাসমূহকে সদর্থক বিজ্ঞানে পরিণত করা হয়েছিল।[৩৯] অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে রসায়ন, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভূতত্ত্ব, প্রাকৃতিক ইতিহাস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং শ্রেষ্ঠ, শক্তিশালী ব্যক্তিদেরকে ক্ষমতার অনুশীলনে ব্যাপৃত করেছিল।

বিজ্ঞান হিসেবে রসায়ন নিঃসন্দেহে মুসলমানদের উদ্ভাবন। আবু মুসা জাবির (খ্রিষ্টান গ্রন্থকারদের জেবের)[৪০] আধুনিক রসায়নের প্রকৃত জনক। "তাঁর নাম রসায়নের জগতে স্মরণীয় হয়ে আছে। কেননা প্রিস্টিলী ও লাভোসিয়ারের যুগের ন্যায় সমান গুরুত্বের এক যুগের দ্বারোদ্ঘাটন তিনি করেছিলেন।" তাঁর পরে আরও অনেকে এসেছেন যাদের মৌলিকতা ও অধ্যবসায়, জ্ঞানের গভীরতা ও নিরীক্ষণের সূক্ষ্মতা শিক্ষার্থীদের হতবাক করেছিল এবং পরবর্তীকালের মুসলমানদের নিষ্ক্রিয়তার জন্য তাদেরকে পরিতাপ করতে বাধ্য করেছিল।

চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শল্যবিদ্যা একটা জাতির প্রতিভার সর্বোত্তম নিদর্শন এবং একটি ধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক মনোভাবের কঠিন পরীক্ষার ফল—এই বিজ্ঞান সর্বোচ্চ স্তরে বিকশিত হয়েছিল। চিকিৎসাবিজ্ঞান/ভেষজ-বিজ্ঞান নিঃসন্দেহে গ্রীকদের মধ্যে উচ্চতর স্থান লাভ করেছিল, কিন্তু পূর্বসূরীরা সভ্যতার অগ্রগমনে একে যে স্তরে পরিত্যাগ করেছিলেন আরবগণ সেই স্তর থেকে অনেক উচ্চে একে উন্নীত করেছিলেন এবং আধুনিক অবস্থার সন্নিকটবর্তী করেছিলেন। আমরা এখানে মানবজ্ঞানের এই বিভাগে এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিকাশে আরবজাতি বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে যে অবদান রেখেছিলেন সে বিষয়ের সামান্যতম আভাস দিতে পারি।

ভেষজ উপাদানের অধ্যয়ন যা আলেকজান্দ্রীয় চিন্তাগোষ্ঠীর ডায়াস কোরাইশের ধারণাকে উদ্দীপিত করেছিল তা বৈজ্ঞানিক আকারে আরবদেরই সৃষ্টি। তাঁরা রসায়নের ফার্মাসীর উদ্ভাবন করেছিলেন এবং আজ যে সব প্রতিষ্ঠানকে "চিকিৎসালয়"[৪১] বলা হয় তার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা তাঁরাই। তাঁরা প্রত্যেক শহরে জনসাধারণের জন্য হাসপাতাল নির্মাণ করেন—হাসপাতাল "দারুশ্ শিফা" (আরোগ্য নিকেতন), "মারিস্তান" (বিমারিস্তানের সংক্ষেপরূপ)—রোগীর আবাসগৃহ নামে অভিহিত হত। তারা রাষ্ট্রীয় খরচে হাসপাতাল চালাতেন।

আবু উসাইবিয়ার জীবনীমূলক অভিধানে আরব চিকিৎসকদের যে নামসমূহ সংকলিত হয়েছে তা একটি খণ্ডে পর্যবসিত হয়েছে। আবু বকর মুহম্মদ ইবনে জাকারিয়া আর রাজী (মধ্যযুগে ইউরোপে রাজেস নামে পরিচিত) দশম শতাব্দীর[৪২] সূচনায় সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন, আলী ইবনে আব্বাস[৪৩] আভিসেনা (আবু আলী হুসাইন ইবনে সিনা),

www.amarboi.org

আল্‌বুকাসিস (আবুল কাসিম খালাফ ইবনে আব্বাস), অ্যাভেন জোয়ার[৪৪] (আবু মারওয়ান ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে জুহ্‌র), অ্যাভেরেজি (আবুল ওয়ালিজ মুহম্মদ ইবনে রুশদ)[৪৫], আবেন বেসার (আব্দুল্লাহ্ ইবনে আহম্মদ আলী 'আল্ বেসার', পশুচিকিৎসা বিজ্ঞানী)[৪৬]—এঁরা হলেন সবচেয়ে উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মধ্যে কয়েকজন যাঁরা চিন্তার জগতে স্থায়ী প্রভাব রেখে গেছেন। আল্ বুকাসিস শুধু একজন চিকিৎসকই ছিলেন না, তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর শল্যচিকিৎসকও ছিলেন। তিনি তাঁর নিজস্ব ও ধাত্রীবিদ্যা বিভাগে সর্বাপেক্ষা জটিল অস্ত্রোপচার করতেন, স্ত্রীলোকদের ওপর অস্ত্রোপচারের ব্যাপারে তিনি জানিয়েছেন যে, সঙ্কোচের বিষয়টি বিবেচিত হত এবং যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদেরকে সংগ্রহ করা হত। তাঁর সময়ে শল্যচিকিৎসায় যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হত সে বিষয়ে তিনি যে পর্যাপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন তা থেকে আরবদের মধ্যে শল্যচিকিৎসার অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা গঠন করা যায়[৪৭] আভিসেনা প্রশ্নাতীতরূপে তাঁর যুগের সর্বাপেক্ষা মেধাবী ব্যক্তিত্ব ছিলেন—তিনি প্রতিভার দিক দিয়ে ছিলেন সার্বজনীন এবং রচনার দিক দিয়ে ছিলেন বিদ্যাকল্পদ্রুম। একজন দার্শনিক, গাণিতিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, কবি ও চিকিৎসক হিসেবে তিনি দুটি মহাদেশের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করেছেন এবং সঙ্গতভাবেই তিনি প্রাচ্যের এরিস্টটল হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। যাজকদের ঈর্ষা সত্ত্বেও তাঁর দার্শনিক মতবাদ বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে প্রাচ্য ও ইউরোপে অবিসংবাদিতরূপে কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিল। আভিসেনা এশিয়া মহাদেশে 'শ্রেষ্ঠ শেখ' নামে পরিবিদিত। তিনি ৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ট্রানসোক্সিয়ানার আফশানাহ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা এই প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন। আঠার বছর বয়সে তিনি বোখারায় তাঁর চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। এই সময়ে শুরু হয় তাঁর অসাধারণ রাজনৈতিক ও দার্শনিক জীবন। বিজেতা মাহমুদের অধীনে চাকুরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় তিনি গজনী রাজ্য থেকে বিতাড়িত হন। তিনি শীঘ্রই হামাদানের আমির, সামশুদদৌলার মন্ত্রী হন। পরে তিনি ইস্পাহানের আমির, আলা-উদ্-দৌলার মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি তাঁর বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গবেষণা চালান এবং তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কানুন' ও 'আরযুজা' লেখেন, যা পরবর্তীকালে সমগ্র চিকিৎসাবিদ্যার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে।

গ্রীকরা শারীরবিদ্যা সম্পর্কে স্থূল জ্ঞান রাখতেন; ওষুধ প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কেও তাদের জ্ঞান ছিল অত্যন্ত সীমিত। মুসলমানেরা শারীরবিদ্যা ও ভেষজবিজ্ঞানকে যথার্থ বিজ্ঞানে পরিণত করেছিলেন। সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতির জন্য বিশ্বের সর্বত্র গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানো সম্ভব হয়েছিল; ফলে অসংখ্য ও মহামূল্য সংযোজনের মাধ্যমে তারা তৎকালীন ভেষজবিজ্ঞানকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেন। ডায়োসকোরাইড যে অবস্থায় উদ্ভিদ্‌-বিজ্ঞানকে রেখে গিয়েছিলেন তারা তাকে বহু উচ্চে উন্নীত করেন এবং গ্রীকদের ঔষধিবিজ্ঞানকে দু'হাজার গাছ-গাছড়ার সংযোজনের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করে তোলেন। শিক্ষার্থীর শিক্ষণের কর্দোভা ও বাগদাদ, কায়রো ও ফেজে নিয়মিত বাগান থাকত—সেখানে বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা ভাষণ দিতেন।

www.amarboi.org

আদ্‌দামিরি (আল্‌ডেম্‌রি) তাঁর প্রাণীবিষয়ক ইতিহাসের জন্য মুসলিম জাহানে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন—এই গ্রন্থখানি সাত শ' বছর পূর্বেই বাকনের গ্রন্থের পরিকল্পনা ফাঁস করে দিয়েছিল।

মৃৎবিজ্ঞান 'ইলম-ই-তাশ্‌রিহুল আরদ' (মৃত্তিকা বিশ্লেষণ বিদ্যা) নামে অনুশীলিত হত।

স্থাপত্যে মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, কেননা প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে আরবজাতির স্থাপত্যের যে গৌরবময় নিদর্শন রয়েছে তা এখনও আধুনিক বিশ্বের বিস্ময়মিশ্রিত প্রশংসা পেয়ে থাকে। চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যে তাদের পশ্চাদমুখিতার জন্য দায়ী তাদের ধর্ম, কিন্তু এটা অবশ্যই স্মরণ করতে হবে যে, কোরআনে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা ইহুদীদের অনুজ্ঞার সদৃশ। এটা শুধু মুসার আইনের নিবন্ধিতা যা ইহুদীদের মধ্যে "খোদিত মূর্তি" তৈরি অত্যন্ত জোরের সঙ্গে দমন করেছিল এবং এই নিষেধাজ্ঞার তাৎপর্য প্রাক্-ইসলামী আরবদের পৌত্তলিকতা—প্রীতির জন্যই বিঘোষিত। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমানদের নিকট চিত্র ও মূর্তি তৈরি করা ছিল নিন্দনীয় এবং পৌত্তলিকতার প্রতীক বলে অবৈধ। প্রতিমাবিরোধী এই মনোভাব এতই গভীরভাবে তাদের মধ্যে দানা বেঁধেছিল যে অন্যান্য জাতি পৌত্তলিকতায় প্রত্যাবর্তন করলেও, এই জাতি পৌত্তলিকতার মধ্যে নিমজ্জিত হতে পারেনি। প্রাথমিক প্রজাতন্ত্রের একটি সভ্য ও সংস্কৃতি সাম্রাজ্যে ক্রমিক উত্তরণে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কৃতিত্বের ফলে মুসলমানেরা, এই নিষেধাজ্ঞার মর্মার্থ ধরতে পেরেছিলেন এবং সঙ্কীর্ণ আক্ষরিক অর্থের বন্ধনমুক্ত হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমুক্তির মনোভঙ্গী যা প্রাথমিক পর্যায়ে আব্বাসীয় ও স্পেনিশ খলিফাদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা-ই তাদেরকে শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকে পরিণত করেছিল। সুতরাং সমগ্র মুসলিম জাহানে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের প্রতি অনুরাগ সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে যুগপতভাবে উন্মেষ লাভ করেছিল। খলিফাদের প্রসাদ, খলিফাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী পরবর্তী নৃপতিদের অট্টালিকা এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দরদালান চিত্র ও ভাস্কর্যের দ্বারা পরিশোভিত হত।

খোদিত প্রতিকৃতি ও চিত্রকলার দ্বারা মসজিদ শোভিত করার ব্যাপারে হযরতের যে নিষেধাজ্ঞা তা আরবী অক্ষরলিপি ভিত্তিক এক চিত্রলিপি অ্যারাবেস্ক-এর জন্ম দিয়ে জগৎ-জনকে ঋণে আবদ্ধ করেছে। এই ধরনের চিত্রশিল্প প্রাচ্যের অট্টালিকার সৌন্দর্য মোহনীয় করে তুলেছে এবং প্রতীচ্যের শিল্পকলা তার বহুল অনুকরণ করেছে। অন্যান্য জাতির শিল্পকলার সংস্পর্শে আসার ফলে মুসলমানদের মধ্যে শিল্পকলা সম্পর্কে ক্রমাগত উন্নতি সাধিত হয়, আর আরব্য শিল্পকলার মধ্যে পশু ও পুষ্প, পাখি ও ফলও অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু মসজিদ অলঙ্করণের ক্ষেত্রে জীবন্ত প্রাণীর আকৃতি সবসময়েই নিষিদ্ধ ছিল। আকারের বিশুদ্ধতা ও পরিলেখের সরলতা, নমুনার কমনীয়তা ও প্রতিসাম্যের পূর্ণতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তারের সঙ্গতি, সমাপ্তির উৎকর্ষতা ও ধারণার সমুন্নতির দিক দিয়ে মুসলিম স্থাপত্য জগতের যে কোন স্থাপত্যের সমকক্ষ; আর নির্ভেজাল ও কমনীয় অলঙ্করণের সাহায্যে

www.amarboi.org

যেভাবে অসংখ্য অমকাল স্মৃতিসৌধ পরিশোভিত হয়েছিল তা রুচি ও সংস্কৃতির নিপুণতায় প্রাচীন গ্রীস ও আধুনিক ইউরোপের যে কোন বিখ্যাত স্মৃতিসৌধের নিদর্শন অতিক্রম করে। মুসলমানদের পরিশোভন কলার অন্য একটি শাখা হল অলঙ্কারপূর্ণ লেখা, এই লিপি অধিকাংশ সময়ে মসজিদ, স্মৃতিসৌধ প্রাসাদ পরিশোভনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগানো হত। কোরানের সমুদয় অধ্যায় গম্বুজ, মিনার, দরওয়াজা ও খিলানে খোদিত হত, এতে ধর্মীয় একাগ্রতা, বিশুদ্ধ একত্ববাদী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটত, যেমন খ্রীষ্টান গির্জাগুলোয় সাধুপুরুষ ও শহীদের ছবি পরিশোভিত হত।

ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পূর্বে আরবদের মধ্যে পেশা হিসেবে যে সঙ্গীত প্রচলিত ছিল তা সিরিয়া ও পারস্য থেকে আমদানী করা দাসদাসীদের মধ্যে শুধু সীমাবদ্ধ ছিল— 'কায়েন'দের মধ্যে সীমিত ছিল। হযরত সুস্পষ্ট নৈতিক কারণেই এসব অধঃপতিত রমণীয়দের নাচগান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু আব্বাসীয় ও স্পেনিশ আরব নৃপতিদের অধীনে সঙ্গীত একটি বিজ্ঞানের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিল এবং সঙ্গীতের চর্চা একটি শিল্পকলা হিসেবে স্বীকৃত হয়েছিল, সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিস্তৃত হয়েছিল। এর ওপর বিপুল সাহিত্য গড়ে উঠেছিল; স্বরমাধুর্য ও যন্ত্রসঙ্গীতের ব্যবহার অনুসারে গান সংগৃহীত ও শ্রেণীবদ্ধ হয়েছিল; প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রগুলির উন্নতি সাধিত হয় এবং নতুন বাদ্যযন্ত্রে উদ্ভাবিত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বুদ্ধিবাদ ও রক্ষণশীল মতবাদ, ভাববাদ ও আক্ষরিক অর্থ মতবাদের মধ্যে যে তীব্র বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল তা এই মধুরতম শিল্পকলাকে অধীনস্থ শ্রেণীর করতলগত করেছিল কিংবা দরবেশদের খানকার সীমানার মধ্যে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল।

বাণিজ্য, কৃষি, হস্তশিল্প ও যন্ত্রশিল্প (আর এই যন্ত্রশিল্প বলতে চীনা-মাটির বাসন থেকে যুদ্ধাস্ত্র পর্যন্ত সমুদয় জিনিস এর অন্তর্ভূক্ত ছিল)—সব কিছুর উপর বিশাল সাধারণ সাহিত্য ছিল।

ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে মুসলিম জাতি প্রাচীন বা আধুনিক কোন জাতির পশ্চাতে ছিল না। প্রথমে হযরতের জীবনেতিহাসের দিকে প্রধানতঃ মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল; কিন্তু শীঘ্রই প্রাথমিক ধারণা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বিস্তার লাভ করেছিল। প্রত্নতত্ত্ব, ভূগোল ও নৃতত্ত্ব ইতিহাসের অন্তর্ভূক্ত হয় এবং শক্তিশালী মনীষীগন এই চিত্তাকর্ষক বিষয়ের গবেষণায় এগিয়ে আসেন। ইবনে ইসহাকের সরল কার্যক্রম এবং ইবনে খালদুনের সার্বজনীন ইতিহাসের মধ্যে পার্থক্য বিরাট, কিন্তু এই ব্যবধান পূরণের জন্য নিয়োজিত ছিলেন একদল লেখক—তাদের পরিশ্রমের ফল ইসলামের প্রেরণায় আরবজাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়ার নির্দেশক।

বালাজুরি ২৭৯ হিযরী (৮৯২ খ্রি.)-তে মৃত্যুবরণ করেছিলেন—তিনি বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানেই তিনি বসবাস করেছিলেন ও কার্যনিরত ছিলেন, তাঁর 'ফুতাহুল বুলদান' (দেশ বিজয়) সপ্রশংস রীতিতে লিখেছিলেন এবং তা ঐতিহাসিক মনোভঙ্গীর বিশিষ্ট অগ্রগতির নির্দেশক।

www.amarboi.org

হামাদানী হিযরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ও চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম দিকে সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তিনি দক্ষিণ আরবের বিস্তারিত ইতিহাস রচনা করেছিলেন—এতে তিনি এই অঞ্চলের বিভিন্ন গোত্র, এদের বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহের নিদর্শন, তাদের লিপির ব্যাখ্যা, ইয়েমেনের নৃতত্ত্ব ও ভূগোল সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন। মাসুদি, আল্ বেরুনী, ইবনুল আসির, তাবারী, ইবনে খালদুন (মোহল যাকে ইসলামে মনটেকস বলেছেন), মাকরিজী, মাক্কারী, আবুল ফেদা, ন্যুওয়েরী ও মিরখোন্দের অমূল্য গ্রন্থাবলী এই এলাকায় মুসলমানদের মানসিক শক্তির পূর্ণ পরিচয় বহন করে। তাঁরা শুধু বিশেষজ্ঞই ছিলেন—তাঁরা ছিলেন বিশ্ববিদ্যাসংগ্রাহক—তাঁরা একাধারে দার্শনিক, গাণিতিক, ভূগোলবিদ ও ঐতিহাসিক। মাসুদি বাগদাদের অধিবাসী ছিলেন, জন্মগতভাবে উত্তর-আরব। তিনি প্রথম যৌবনে মুসলিম জাহানের এক বিরাট অংশ পরিভ্রমণ করেছেন। তিনি প্রথমে গিয়েছিলেন ভারতবর্ষে, মুলতান ও মানসুরা পরিদর্শন করেছিলেন।

তারপর ভ্রমণ করেছিলেন পারস্য ও কারমান, তারপর আবার গিয়েছিলেন ভারতবর্ষে—কিছুদিন তিনি কাম্বে (কামবাজ) ও দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করে সিংহলে গমন করেন। সেখানে থেকে জাহাজে করে কাম্বালা (মাদাগাস্কারে) এবং সেখান থেকে ওমানে গিয়েছিলেন, সম্ভবতঃ সেখান থেকে ইন্দোচীন উপদ্বীপ ও চীনে পৌঁছেছিলেন। তিনি মধ্য এশিয়ার দূরবর্তী অঞ্চল ভ্রমণ করেছিলেন এবং কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। তিনি ভ্রমণ সমাপ্ত করে কিছুকালের জন্য তাইবেরিয়াস ও এন্টিওকে বাস করেছিলেন এবং কিছুদিন পর তিনি বসরায় তাঁর বাস স্থাপন করেছিলেন। এখানেই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মুরুজ্ উজ যাহাব' প্রথম প্রকাশ করেছিলেন। অতঃপর তিনি ফস্তাতে (পুরাতন কায়রো) স্থানান্তরিত হন—সেখান থেকে তাঁর 'কিতাবুত্ তান্বিহ', 'মিরাট উজ্ জামান' (যুগের দর্পন—এক বিপুলকায় গ্রন্থ)—এই গ্রন্থের অংশ বিশেষ এখন সংরক্ষিত হয়েছে।[৪৮] 'মুরুজ্ উজ্ যাহাবে' (সোনালী প্রান্তরে) "তিনি তাঁর জীবনে ঐশ্বর্যময় অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন সাবলীল ও মনোজ্ঞ ভঙ্গীতে—এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনাভঙ্গীতে, যিনি বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছেন, জীবনের বিচিত্র রূপের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, যিনি শুধু জ্ঞানদান করেই আনন্দ পান না, তাঁর পাঠকদের আমোদিত করতেও চান। বহু গ্রন্থকারের নামের উদ্ধৃতির মাধ্যমে আমাদেরকে ভারাক্রান্ত না করে, দীর্ঘ ব্যাখ্যার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে তিনি যা তাঁর কাছে বিস্ময়কর, বিরল ও চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন এবং মানুষের ও তাদের আচরণের চিত্র এঁকেছেন বিবেকানুমোদিত পথে ও আখ্যায়িকার নৈপুণ্য সহকারে।"

তাবারী (আবু জাফর মুহম্মদ ইবনে জরির)-উপনাম 'আরবদের লিভি'—তিনি ৯২২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছিলেন—তিনি তাঁর গ্রন্থটিতে ৩০২ হিযরী (৯২৪ খ্রি.) পর্যন্ত ঘটনার বর্ণনা করেছিলেন। আল্ মালকিন বা এল্‌মাসিন দ্বাদশ শতাব্দীর সমাপ্তি পর্যন্ত এই কাজটি টেনেছিলেন।

www.amarboi.org

ইবনুল আসির, উপনাম, উজ্-উদ্দীন "ধর্মের গৌরব" ইরাকের জাজিরেহ বণী ওমরের অধিবাসী ছিলেন, তিনি প্রধানতঃ মউসুলে বাস করতেন। তাঁর গৃহে সে যুগের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট পণ্ডিত ও গুণী ব্যক্তিদের অতিথিশালা ছিল। তাঁর সার্বজনীন ইতিহাস, 'আল্-কামিল' ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থ আধুনিক ইউরোপের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাবলীর সঙ্গে তুলিত হতে পারে।

মাকরিজী[৪১] (তাকি উদ্দীন আহম্মদ) ইবনে খালদুনের সমসাময়িক ছিলেন। মিশর সম্পর্কীয় তাঁর গ্রন্থে তিনি দেশটির রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, বাণিজ্যিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও প্রশাসনিক অবস্থার জীবন্ত চিত্র অঙ্কন করেছেন।

আবুল ফেদারকে ভূগোলবিদ হিসেবে আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। চতুর্দশ শতকের সূচনায় তিনি হামার যুবরাজ ছিলেন। রণকৌশল ও জ্ঞান-বিজ্ঞান উভয়ের অনুশীলনে সমভাবে বিশিষ্টতার অধিকারী, প্রধান প্রধান গুণসম্পন্ন এই মনীষী প্রাচ্যের পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের যে অংশ ইসলামের রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছে এবং অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাইজান্টাইনদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেই অংশটি অত্যন্ত মূল্যবান।

ইবনে খালদুন খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তিনি ১৩৩২ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; চতুর্দশ শতাব্দীতে আফ্রিকাতে যতগুলি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তার মধ্যেই তিনি কালাতিপাত করেছেন। তাঁর সুবিখ্যাত ইতিহাসের প্রথমাংশ রয়েছে একটি উপক্রমনিকা, এটা তথ্যের ভাণ্ডার ও দার্শনিক অভিসন্দর্ভ। এই উপক্রমণিকায় তিনি সমাজের উৎপত্তি, সভ্যতার বিকাশ, রাজ্য ও রাজবংশের উত্থান-পতনের কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং অন্যান্য প্রশ্নের সাথে জাতির চরিত্রের উপর জলবায়ুর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

আরবগণ নাবিকদের কম্পাস উদ্ভাবন করেছেন, আর জ্ঞানের অন্বেষণে কিংবা বাণিজ্যের সন্ধানে জগতের সর্বত্র জলপথে ভ্রমণ করেছেন। তারা আফ্রিকায় ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সুদূর দক্ষিণে ভারতের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহের মালয় উপদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এমন কি চীনদেশও তার ঔপনিবেশিক ও সৈনিকদের কাছে তার বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছিল। তারা অ্যাজোর (Azores) আবিষ্কার করেছিলেন, এবং অনুমান করা হয় আমেরিকায় প্রবেশ করেছিলেন। প্রাচীন মহাদেশসমূহের সীমারেখার মধ্যে মানবিক প্রয়াসের প্রত্যেক দিকে তারা নজিরবিহীন ও প্রায় অতুলনীয় গতিবেগ সঞ্চার করেছিলেন। হযরত শ্রমকে কর্তব্য হিসেবে নিরূপিত করেছিলেন, তিনি শৈল্পিক সাধনার প্রতি ধর্মীয় নিষ্ঠা আরোপ করেছিলেন, তিনি অনুমোদন দিয়েছিলেন যে বাণিজ্য ও কৃষিকার্য আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রশংসনীয়। এসব উপদেশের স্বাভাবিক ফল ফলেছিল; ব্যবসায়ী, বণিক, শিল্পকর্মে নিয়োজিত শ্রেণীসমূহকে সাধারণভাবে সম্মানের চোখে দেখা হত। শাসনকর্তা, সেনাধ্যক্ষ ও বিদগ্ধ সমাজ তাদের পেশার নাম ধরে তাদের প্রতি

www.amarboi.org

বিতৃষ্ণার ভাব দেখাতেন না। শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বণিকদল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিচরণ করত; রাস্তাঘাটের পরিপূর্ণ নিরাপত্তা, পথিপার্শ্বে চৌবাচ্চা, জলাশয় ও জলাধার এবং বিশ্রামাগার বিদ্যমান ছিল। সরাইখানা সর্বত্র বিরাজ করত—এসব ব্যবসা-বাণিজ্য, কলা ও শিল্পজাত দ্রব্যের দ্রুত বিকাশে সাহায্য করেছিল।

আরবরা যে দেশে বসতি স্থাপন করত সেখানে খাল কেটে জলের সুবন্দোবস্ত করত। স্পেনে তারা বন্যা প্রতিরোধ গেট, চাকা ও পাম্পের মাধ্যমে সেচ-ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল। এখন যেসব বিরাট অঞ্চল অনুর্বর ও ঊষর হয়ে পড়ে আছে তা জলপাইয়ের বাগান দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। মুসলমানদের শাসনামলে একমাত্র সেভিল এলাকায় কয়েক হাজার তেলের ফ্যাক্টরী ছিল। তারা প্রধান প্রধান কাঁচামাল, চাউল, চিনি, তুলা এবং প্রায় সব ধরনের সুন্দর ফলের বাগানের প্রচলন করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে কম গুরুত্বপূর্ণ গাছপালা আদা, জাফরান ও সুগন্ধি নির্যাস ইত্যাদিরও প্রচলন করেছিলেন। তারা তামা, গন্ধক, পারদ ও লৌহের খনি উন্মুক্ত করেছিলেন। তারা শিল্পের কর্ষণ, কাগজ ও বয়নশিল্প, চীনামাটির বাসন, মৃৎশিল্প, লৌহ, ইস্পাত ও চামড়া শিল্প স্থাপন করেছিলেন। কর্দোভার চিত্রিত দেওয়ালের পর্দা, মুরসিয়ার পশমী বস্ত্র, গ্রানাডা, আলমেরিয়া ও সেভিলের সিল্ক, টলেদোর ইস্পাত ও স্বর্ণের কারুকার্য, সেলিভার কাগজ পৃথিবীর সবদেশের চাহিদার বস্তু ছিল। মালাগা, কার্থাজেনা, বার্সেলোনা ও কাদিজ ছিল আমদানী-রপ্তানির বিরাট বাণিজ্যকেন্দ্র। সমৃদ্ধির কালে স্পেনের আরবগণ সহস্রাধিক নৌ-জাহাজের রক্ষণা-বেক্ষণ করতেন, দানিউবে ছিল তাদের ফ্যাক্টরীসমূহ ও প্রতিনিধিবৃন্দ। কনস্তানতিনোপলের সঙ্গে তাদের বিরাট বাণিজ্য সম্পর্ক, আর এই বাণিজ্য সম্পর্ক ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর থেকে এশিয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় বিস্তৃত ছিল এবং তা পৌঁছেছিল ভারতবর্ষ ও চীনদেশের পোতাশ্রয়ে ও আফ্রিকার কূল ধরে মাদাগাস্কার পর্যন্ত। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন ইউরোপের অবস্থা ছিল কাফ্রারিয়ার বর্তমান অবস্থার মতো আবুল কাসেমের ন্যায় আলোকপ্রাপ্ত মুরগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করছিলেন। "বাণিজ্যিক তৎপরতায় উৎসাহ প্রদানের জন্য ও পর্যটনের ক্ষেত্রে প্রেরণা" দানের জন্য সরকারের কর্তৃত্বাধীনে ভৌগোলিক বিবরণ, গেজেট ও ভ্রমণতথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা, পথ-নির্দেশ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়। ইবনে বতুতার ন্যায় পর্যটকগণ তথ্যের সন্ধানে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন এবং সে-সব দেশের মানুষ, প্রাণী ও ফলমূল, খনিজপদার্থ এবং জলবায়ু ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্টসমূহ বিস্ময়কর প্রাঞ্জলতা ও নিরীক্ষণের সূক্ষ্মতা সহকারে বিশালকায় গ্রন্থসমূহ রচনা করেছেন।

শিক্ষা ও শিল্পকলা শুধু পুরুষদের মধ্যেই সীমিত ছিল না। নারী জাতির কৃষ্টি ও শিক্ষার চর্চা সমান্তরালভাবে পুরুষজাতির মতোই অনুসৃত হত; নারীরা পুরুষের মতোই সাহিত্য ও বিজ্ঞানের চর্চায় অনুরাগী ছিলেন। তাদের নিজস্ব কলেজসমূহ ছিল;[৫০] তারা চিকিৎসাবিদ্যা ও আইনবিজ্ঞান অধ্যয়ন করতেন, অলঙ্কারশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও সুকুমার সাহিত্যের উপর বক্তৃতা করতেন এবং একটি মহান সভ্যতার গৌরববর্ধনে পুরুষের সঙ্গে

www.amarboi.org

অংশগ্রহন করতেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও নৃপতিদের স্ত্রী ও কন্যারা কলেজ-প্রতিষ্ঠায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুদান প্রদানে, পীড়িতদের নিমিত্ত হাসপাতাল স্থাপনে এবং গৃহহীন, এতিম ও বিধবাদের জন্য আশ্রয় তৈরিতে অর্থ ব্যয় করতেন।[৫১]

আরব গোত্রসমূহের বিভাগ ও ঈর্ষা তাদের মধ্যকার বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার-একাত্মকরণ ও সংমিশ্রণ ঘটেনি, তবে তার ফল এই দাঁড়িয়েছে যে হিজাজে কথিত জাতীয় ভাষা ঐশ্বর্যশালী হয়েছে, ওকাজের বাৎসরিক মেলায় জনগণের সম্মেলন, কবিদের সাময়িক প্রতিযোগিতা নিয়মতান্ত্রিকতা ও পেলবতা দান করেছে। তবে কোরআনই—"একখানি গ্রন্থ যার সাহায্যে আরবগণ মহান আলেকজাণ্ডারের চেয়ে বিশালতর, রোমের চেয়ে ব্যাপকতর রাজ্য অধিকারভুক্ত করেছিল, যা তারা দশ বছরে সম্পাদন করেছিল, রোমের তা করতে একশ' বছর লেগেছিল, কেবল এই গ্রন্থের সাহায্যেই সমগ্র সেমিটিক জাতির মধ্যে তারাই নৃপতি হিসেবে ইউরোপে এসেছিল যখন ফিনিসীয়গণ বণিক হিসেবে, ইহুদীগণ উদ্বাস্তু বা বন্দী হিসেবে এসেছিল; তারা ইউরোপে এসেছিল এসব উদ্বাস্তুদের সাথে মানবজাতির নিকট আলোকবর্তিকা তুলে ধরতে—যখন দশদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল তখন তারাই হেলেনীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে মৃত অবস্থা থেকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল প্রাচ্যের মতো প্রতীচ্যকেও দর্শন, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও সঙ্গীতের সোনালী শিল্পকলা শিক্ষা দিয়েছিল এবং আধুনিক বিজ্ঞানের ধাত্রীপনা করেছিল, আর গ্রানাডার পতনকালে সেই উজ্জ্বল দিনগুলির জন্য চিরকাল কাঁদতে আমাদেরকে বিলম্বিত উত্তরসূরী বানিয়ে গিয়েছিল।"[৫২]—এই গ্রন্থই আরবী ভাষাকে বিশুদ্ধ আকারে নির্ধারিত ও সংরক্ষিত করেছিল। এর ভাষার সরল সমুন্নতি, স্টাইলে নির্ভেজাল সৌন্দর্য, উপমার বৈচিত্র্য, সৌদামিনীর চমকের মতো দ্রুত রূপান্তর নীতিবিদকে শেখায়, দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন করে, আহত দেশপ্রেমিককে তার জাতির নীতিভ্রষ্টতা ও অধঃপতন শক্তিশালী ভাষায় প্রত্যাখ্যান করে এবং স্বর্গীয় পিতা অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত বান্দার মাধ্যমে তাঁর পথভ্রান্ত বান্দাদেরকে ফিরে আসতে আহ্বান জানান—এসব সমুদয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে এর অনন্য চরিত্রের নির্দেশ করে। বিস্ময় ও বিমুগ্ধ চিত্তে সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবিগণ কোরআনের শিক্ষাকে শ্রবণ করেছেন—এ থেকেই বোঝা যায় কত গভীরভাবে জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিভিন্ন সময়ে অবতারিত—নির্যাতন ও মানসিক যাতনার মুহূর্তে, অথবা শক্ত কাজের সময় অথবা বাস্তব নির্দেশনার জন্য বিঘোষিত—তথাপি এর প্রতিটি শব্দে একটা প্রাণবন্ততা, একাগ্রতা ও শক্তি রয়েছে—এ সব গুণ একে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে পৃথক করে। পাছে এটা চিন্তা করা হয় যে আমরা সংস্কারাচ্ছন্ন তাই আমরা যে বিখ্যাত প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ থেকে আগেই উদ্ধৃতি দিয়েছি সেখান থেকে আবার উদ্ধৃতি দিচ্ছি। "আনন্দ বেদনার, ভালবাসার, সাহসিকতার ও উদ্দাম আবেগের যে মহান আলোড়ন আমাদের কানে আজ কমই বাজে তা মুহম্মদের সময় পূর্ণতা নিয়ে হাজির হত; তিনি শুধু দৃষ্টান্ত স্থানীয়দেরই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না, বরং তিনি তাদেরকে অতিক্রম করতেন, তাঁর নবুয়্যতের নিদর্শন ও প্রমাণ হিসেবে তিনি যা

www.amarboi.org

বলেছিলেন ও গেয়েছিলেন তার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আবেদন হিসেবে ... তাঁর পূর্বে কবিরা প্রেমের গান গেয়েছেন ... অন্তরা স্বয়ং বিখ্যাত উপন্যাসের নায়ক, আবলার আবাসের ধ্বংসের জন্য করুণ শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন, যাকে কেন্দ্র করে প্রেমিকের চিন্তারাজি আবর্তিত হয়ে থাকে—আবলা ইহধাম ত্যাগ করেছেন কিন্তু তার বাসস্থান তাকে জানত না। মুহম্মদ এ ধরনের কোন বিষয়ে বর্ণনা করেননি। চারণ-কবির প্রেমগাঁথা, এই জগতের আনন্দের কথা, তরবারী বা উষ্ট্র, ঈর্ষাকাতরতা বা মানবীয় প্রতিহিংসা, গোত্রের পূর্বপুরুষদের মহিমা, কিংবা মানুষের অর্থহীন, দ্রুত ও চিরতরে নিভে-যাওয়া অস্তিত্ব কোনটাই তাঁর কার্যসূচীর আওতাভুক্ত ছিল না। তিনি 'ইসলাম' প্রচার করেছিলেন। তিনি তা প্রচার করেছিলেন ঊর্ধ্বে আকাশ বিদীর্ণ করে, নিম্নে ধরণীতলে চৌচির করে, স্বর্গ-নরকের, জীবিত-মৃতের শপথ করে।"

অপর একজন বিখ্যাত লেখক কোরআন সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথা বলেছেন : "যদি কোরআন কবিতা না হয়—এটা বলা কঠিন যে এ কবিতা পদবাচ্য হবে কিংবা কবিতা পদবাচ্য হবে না—তবে এ কবিতার চেয়েও অধিক। এ ইতিহাস নয়, জীবনীও নয়। এ পর্বতের উপর বিঘোষিত সার্মনের মতো সংকলন নয়, কিংবা বৌদ্ধ সূত্রসমূহের মতো পরাবিদ্যামূলক দ্বান্দ্বিক দর্শন নয় অথবা প্লেটোর জ্ঞানী ও আহম্মকদের সম্মেলনের ন্যায় মহিমাব্যঞ্জক প্রচারবিদ্যাও নয়। এ হল একজন প্রেরিতপুরুষের আহ্বান; মূলের দিক থেকে সেমিটিক হলেও এর অর্থ এমনি সার্বজনীন ও সময়োপযোগী যে যুগের সকল কণ্ঠস্বর তা ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক গ্রহণ করেছে এবং তা প্রাসাদে ও মরুভূমিতে, নগরে ও সাম্রাজ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে, প্রথমে তা তার মনোনীত হৃদয়সমূহকে উদ্ভাসিত করেছে, পরে তা একটি পুনর্গঠনমূলক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে যার ফলে গ্রীস ও এশিয়ার সৃষ্টিধর্মী আলোকরশ্মি খ্রিস্টান ইউরোপের জমাট অন্ধকার বিদীর্ণ করতে পারে, যখন খ্রিস্টধর্ম কেবল তমিস্রার সাম্রাজ্ঞী ছিল।"[৫৩]

সাধারণভাবে মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তির সর্বপ্লাবী সাহিত্য, নীতিশাস্ত্র, অধিবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, অলঙ্কার শাস্ত্রের ক্ষেত্রে মুসলিম লেখকদের সংখ্যা ছিল শয়ে শয়ে। কাব্যজগতে মুসলিম মনীষা অদ্যাবধি অনতিক্রান্ত। আরব্য কবি মুতান্নবী (হযরতের সময়কার কবিদের হিসাব না নিয়েও) থেকে ভারতীয় কবি হালি পর্যন্ত অগণিত মুসলমান কবি রয়েছেন। মুতান্নবী নবম শতাব্দীর কবি এবং তিনি আমির সায়েফ উদ্‌দৌলার (আবুল হাসান আলী বিন হামাদানের) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁর পরে এসেছিলেন ইবনে দুরাইদ[৫৪], আবু উলা[৫৫], ইবনে ফারিদ[৫৬], তানতারানি[৫৭] ও অন্যান্য সব। স্পেনের আরব কবিগণ প্রকৃতির কবি ছিলেন; তাঁরা বিভিন্ন ধরনের কবিতার জন্ম দিয়েছিলেন; পরে সেই কবিতা দক্ষিণ ইউরোপের খ্রিস্টান জাতিসমূহের দ্বারা মডেল হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। যে সব বিখ্যাত কবি স্পেনে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে আহমদ ইবনে মুহম্মদ (আবু ওমর)[৫৮] সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মাহমুদের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সব কবি সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁদের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ফেরদৌসী ইবনের

www.amarboi.org

মৃত কবিদের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি যে সুলতানের প্রশংসাগীতি গেয়েছিলেন এবং পরে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছিলেন তারই সুখ্যাতির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিলেন। পরবর্তী গজনভী ও সেলজুক সুলতানদের অধীনে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফরাসী ছান্দসিক রীতির প্রবর্তক গীতিকবি সুজোন[৫৯] ও ওয়াত-ওয়াত; ভূতিবাদী কবি আনওয়ারী[৬০], খাকানী[৬১] ও জহির ফারিয়াবী[৬২], মহান মিষ্টীক কবি সানাসী[৬৩]—যাঁর 'হাদিকা' যেখানে ফারসী ভাষা জ্ঞাত ও খ্যাত সেখানে মূল্যবান সৃষ্টি হিসেবে বিবেচিত এবং ফরিদ উদ্দীন আত্তার[৬৪], আর রোমান্টিক কবি নিযামী—খসরু ও শিরীন ও আলেকজাণ্ডারের চারণকবি। সেলজুক বংশের অধঃপতনের পর আতাবেগ ক্ষমতাসীন হন—তাঁর শাসনামলে নীতিবাদী শেখ সাদী ও মিষ্টিক জালাল উদ্দীন রুমী সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তৈমুরের জামানায় পারস্যের অ্যানাক্রিয়ান, সুকণ্ঠ গায়ক কবি হাফিজ (সামশুদ্দিন) আবির্ভূত হয়েছিলেন। এসব কাব্যজগতের বিখ্যাত নামগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি। ইবনে খাল্লিকান ও লুৎফ আলী আজরের[৬৫] গ্রন্থে মুসলমান জাতির প্রতিভাবান কবিদের কথা বর্ণিত হয়েছে।

বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে এরূপ ছিল মুসলমানদের গৌরবময় সাফল্য আর এ সবই সম্ভব হয়েছিল একটিমাত্র লোক মুহম্মদ (দঃ)-এর জন্য তারা যে বর্বরতা ও অজ্ঞানতার গহ্বরে অদ্যাবধি নিমজ্জিত ছিল, তাঁর আহ্বানে বর্তমানের বা ভবিষ্যতের কোন আশা না করে আরবগণ জগতজনকে সমুন্নত করতে, সকলকে সভ্য বা সংস্কৃত করতে এগিয়ে গেলেন। নির্যাতিত, অবহেলিত মানবতা নবজীবন লাভ করল। যখন ইউরোপের বর্বরজাতিসমূহ ক্ষীয়মান সাম্রাজ্য বিপর্যস্ত করে অজ্ঞানতা ও নিষ্ঠুরতার অন্ধকারের মধ্যে দিশেহারা হয়ে চলছিল সেই সময়ে মুসলমানেরা এক মহান সভ্যতা গড়ে তুলেছিলেন। ইউরোপে শতাব্দীর পর শতাব্দী যখন নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎসন্নতা চলছিল তখন ইসলাম প্রগতির সারথ্য করছিল। সিজারের সাম্রাজ্যের উপর খ্রিস্টধর্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, কিন্তু তা পৃথিবীর জাতিসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারেনি। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত যে নৈরাশের, অন্ধকার ইউরোপকে গ্রাস করেছিল তা আরও গভীরতর হয়েছিল। হিংস্র ধর্মান্ধতার যুগে যাজকতন্ত্র যে পথ দিয়ে জ্ঞান, মানবতা বা সভ্যতা প্রবেশ করতে পারত সে পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। যদিও ঈর্ষাবশতঃ এই ধর্মান্ধ দেশে ইসলামী সংস্কৃতির হিতকর প্রভাব অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল তথাপি যথা সময়ে খ্রিস্টানজগতের সর্বত্র অনুভূত হয়েছিল। স্যালারনো, বাগদাদ, দামেস্ক, কর্দোভা, গ্রানাডা, মালাগার স্কুলসমূহের মাধ্যমে মুসলমানেরা বিশ্বকে দর্শনের শাস্ত্র পাঠ এবং কঠোর বিজ্ঞানের[৬৬] ব্যবহারিক শিক্ষা দান করেছিল।

পাশ্চাত্যে বুদ্ধিবাদের প্রথম অভিব্যক্তি ঘটেছিল সেই প্রদেশে যে প্রদেশ মুসলিম সভ্যতার শক্তির বশবর্তী হয়েছিল। যাজকতন্ত্র এই সুন্দর ফুলটি অগ্নি ও তরবারীর সাহায্যে ধ্বংস করেছিল, এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে জগতের প্রগতিকে পিছু হটিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীন চিন্তা মূলনীতিগুলি ইসলামে এতই শক্তভাবে শিকড় গেড়ে

www.amarboi.org

বসেছিল যে তার প্রাণশক্তি খ্রিস্টান—ইউরোপে বাহিত হয়েছিল। অ্যাবেলার্ড ইবনে রুশদের প্রতিভায় শক্তি অনুভব করেছিলেন, যে শক্তির আলো সমগ্র ইউরোপে বিকীর্ণ হয়েছিল। অ্যাবেলার্ড স্বাধীন চিন্তার জন্য এমন আঘাত করেছিলেন যা শেষ পর্যন্ত যাজকতন্ত্রের বন্দীদশা থেকে খ্রিস্টানজগতকে মুক্তি দিয়েছিল। ইবনে বাজ্জা ও ইবনে রুশদ, দেকার্তে, হবস ও লকের অগ্রদূত ছিলেন।

অ্যাবেলার্ড ও তাঁর সম্প্রদায়ের প্রভাব শীঘ্রই ইংল্যান্ডে প্রবেশ লাভ করেছিল। ওয়াইক্লিফের চিন্তা ও স্বাধীনতার মনোভঙ্গীর মৌলিকতা পূর্ববর্তী চিন্তাবিদদের বলিষ্ঠ ধারণা থেকে জাত। পরবর্তী জার্মান সংস্কারকগণ একদিক দিয়ে তাদের ধারণা পেয়েছিলেন কনস্তানতিনোপলের প্রতিমাভঙ্গকারীদের কাছ থেকে এবং অন্যদিক দিয়ে পেয়েছিলেন অ্যালবিজিনীয় ওয়াইক্লিফপন্থীদের আন্দোলন থেকে। বিদেশী বুদ্ধিবাদীদের প্রভাবে যারা কাজ আরম্ভ করেছিলেন তাদের কাজের সমাপ্তি টেনেছিলেন তারা।

যখন খ্রিস্টান ইউরোপ বিদ্যার্জনকে নির্যাতনের বিষয়ে পরিণত করেছিল, যীশুখ্রিস্টের প্রতিনিধিগন স্বাধীন চিন্তার কণ্ঠরোধ করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, পুরোহিত সম্প্রদায় হাজার হাজার নির্দোষ ব্যক্তিদেরকে চিন্তার ব্যতিক্রমের জন্য আগুনে পুড়িয়ে মারার পথ প্রশস্ত করেছিল, খ্রিস্টান-ইউরোপ মন্ত্রের সাহায্যে ভূত ছাড়াত এবং ছিন্নকন্থা ও অস্থির পূজা করত—তখন বিদ্যার্জন মুসলিম নৃপতিদের অধীনে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল এবং অভূতপূর্ব সম্মানে ভূষিত হয়েছিল। মুহম্মদের প্রতিনিধিবৃন্দ সভ্যতার অগ্রগতির কাজে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন এবং হযরত যে স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন জিজ্ঞাসার জন্ম দিয়েছিলেন ও পবিত্রতা প্রতিপন্ন করেছিলেন তারা তার বিকাশে সাহায্য করেছিলেন। ধর্মের জন্য জুলুম ইসলামে অনুপস্থিত ছিল; নৃপতিদের রাজনৈতিক আচরণ যাই হোক না কেন, সকল ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মমতের নিরপেক্ষতা ও পরিপূর্ণ সহিষ্ণুতার ক্ষেত্রে বিশ্বজগৎ তাদের চেয়ে উত্তম দৃষ্টান্ত কখনও দেখেনি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের চর্চা—একটি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার মহান নির্দেশক—মুসলমানদের মধ্যে একটি জনপ্রিয় পেশায় পরিণত হয়েছিল।

আরবদের পতন দুটি—একটি কনস্তানতিনোপলে এবং অন্যটি ফ্রান্সে—বেশ কয়েক যুগের জন্য পৃথিবীর অগ্রগতিকে পিছিয়ে দিয়েছিল এবং কয়েক শতাব্দী ধরে কালের চাকা থেমে গিয়েছিল। যদি আরবগণ তাদের রাজনৈতিক লাভের বিষয়ে একটু কম উৎসাহী হতেন, নিজেদের মধ্যে কম মতদ্বৈধতা রাখতে পারতেন, আর তাঁর যদি চার্লস মর্টেলের বর্বর স্বাগতিকদের তাড়িয়ে দিতে সমর্থ হতেন, তবে জগতের ইতিহাসের আঁধারতম যুগের ইতিহাস লেখা হত না। রেনেসাঁ, সভ্যতা, বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার বিকাশ সাত শ' বছরের জন্য এগিয়ে যেত। আমাদেরকে আলবিজেনিস এবং হুগোনটদের ধ্বংসের জন্য কিংবা টিউডর ও প্রোটেকটরদের অধীনে ইংরেজ প্রোটেস্ট্যান্ট কর্তৃক আইরিশ ক্যাথলিকদেরকে বীভৎস হত্যাকাণ্ডের জন্য ভয়ে শিহরিত হতে হত না। আমাদেরকে ব্রুণো বা সার্ভিটাস যারা মূল গির্জার বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিলেন তাঁদের হাতে একজন ব্রুণো বা সার্ভিটাসের দুর্ভাগ্যের জন্য আমাদেরকে দুঃখ করতে হত না। রোমান

www.amarboi.org

ক্যাথলিকদের বিচারের জন্য স্থাপিত বিচারালয়ের দমনমূলক তৎপরতা, ইনক্যুইজিশন দলের হত্যাকাণ্ড, আজটেক ও ইনকাসদের ধ্বংসলীলা, ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধের বহুমুখী দুর্দশা ও দুঃখকষ্ট—এসব অকথিতই থেকে যেত। সর্বোপরি, একদা যে স্পেন শিক্ষা ও শিল্পকলার প্রাণকেন্দ্র ছিল তা শতাব্দীসঞ্চিত মহিমাবঞ্চিত হয়ে আজকের মতো বুদ্ধিবৃত্তিক মরুভূমিতে পরিণত হত না। একজন খ্রিস্টান নৃপতির উন্মত্ত ধর্মান্ধতার দ্বারা নির্বাসিত মহান জাতির দুর্ভাগ্যের জন্য—যে জাতি তাদের অধিকারের কাল থেকে দেশটিকে জগতের জাতিসমূহের মধ্যে বিখ্যাত করে তুলেছিল তাদের জন্য কে শোক করেনি? সঙ্গতভাবেই বলা হয়েছে : "এক দুঃস্বপ্নের মুহূর্তে গ্রাণাডার গম্বুজশীর্ষে ক্রুশ কর্তৃক অর্ধচন্দ্র কবলিত হয়েছিল।" ইবনে রুশদ ও ইবনে বাজ্জা, ওয়ালেদা ও আয়েশার মহান মৃত্যুর ছায়া তাদের জাতির ধ্বংসস্তূপে এখনও আহাজারি করে—এখনও চারণকবির কণ্ঠে, বীরত্ব, শিক্ষা ও শিল্পকলায় নীরবে মূর্ছা যায়—যখন ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার উন্মত্ত হুঙ্কার ওঠে, যখন রাজনৈতিক শত্রুতার ভয়ঙ্কর রৌরব উত্থিত হয় কেবল তখনি প্রতিধ্বনিত হয়। খ্রিস্টধর্ম এসব মুসলিম আন্দালুসীয়দেরকে মরুভূমিতে তাড়িয়ে দিয়েছিল, স্পেনের প্রাণশক্তিকে শোষণ করে এই দেশকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক দিক দিয়ে বিনাশ সাধন করেছিল।[৬৭]

যদি মাসলামা কনস্তানতিনোপল দখল করতে পারতেন—কনস্তানতিনোপল, আইরিনির রাজধানী—ধর্মান্ধতার উগ্র সমর্থক ও নিজের সন্তানের নৃশংস হন্তা—তাহলে যে মসীলিপ্ত ক্রিয়াবলী ইসাউরীয় কমনেনি, প্যালিওলোগীদের ইতিহাস কলঙ্কিত করেছে, ল্যাটিনদের দ্বারা বাইজানটিয়াম অধিকারের ফলে যে ভয়াবহ ফলাফল দেখা দিয়েছিল—সর্বোপরি অপবিত্র যুদ্ধের বিভীষিকাময় প্রকাশ, যাতে খ্রিস্টান ইউরোপ এশিয়ার জাতিসমূহের টুঁটি চেপে মারার চেষ্টা করেছিল তা সম্ভবত ঘটত না। যাই হোক না কেন, একটি ব্যাপারে নিশ্চিত যে, যদি কনস্তানতিনোপল মুসলমানদের অধিকারে আসত, তবে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হত না এবং বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্বে খ্রিস্টানদের যাজকতন্ত্রের সংস্কার সাধিত হত। বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। স্বাধীন চিন্তার প্রবাহ ইসাউরীয় সম্রাটদের নিকট পৌঁছলেও তা অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বেদীমূলে মাথা কুটে মরছিল—এর শক্তি ততদিন পর্যন্ত অনুভূত হয়নি—যতদিন না স্যালারনো ও কর্দোভার চিন্তাগোষ্ঠীর সমন্বিত ফল—ইবনে রুশদের প্রভাব এবং সম্ভবতঃ কিছু সংখ্যক গ্রীক পণ্ডিতদের প্রভাব, যারা আরবজাতির জ্ঞানের সমুদ্র থেকে শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন—যাজকতন্ত্রের দুর্গপ্রাচীর ধূলিসাৎ করে দিয়েছিলেন।

ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতার রাজত্বের উদ্বোধন করেছিল। এটা সত্যই মন্তব্য করা হয়েছে যে, যতদিন ইসলাম তার আদিম বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিল ততদিন সে জ্ঞান ও সভ্যতার ধারক ও উন্নয়নকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে—বুদ্ধিবৃত্তির স্বাধীনতার মিত্র হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। যে মুহূর্তে তার মধ্যে বাইরের বিজাতীয় উপাদান সংযুক্ত হয়েছে তখন থেকেই সে প্রগতির প্রতিযোগিতায় পিছু হটে গিয়েছে।

www.amarboi.org

বর্তমান সময়ে মুসলমানদের স্থবিরতা ব্যাখ্যা করার জন্য স্পেন, আফ্রিকা ও এশিয়ায় দ্বাদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সে দিকে পিছন ফিরে দেখা দরকার। স্পেনে খ্রিস্টধর্ম জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবন ধ্বংস করে দিয়েছিল। মুসলমানেরা স্পেনকে একটি ফুলের বাগানে পরিণত করেছিলেন, খ্রিস্টানগণ তাকে মরুভূমিতে পরিণত করেছিল। মুসলমানরা দেশটির সর্বত্র স্কুল-কলেজ স্থাপন করেছিলেন, আর খ্রিস্টানেরা সেগুলিকে তাদের ঋষিদরবেশ ও বিগ্রহের উপাসনার জন্য গির্জায় রূপান্তরিত করেছিল। মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল কিংবা পুড়িয়ে মারা হয়েছিল; যে দু'চার জনকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল তাদেরকে দাসে পরিণত করা হয়েছিল। যারা পালিয়েছিল তারা আফ্রিকার তীরভূমিতে ভিক্ষুক হিসেবে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। আন্দালুসীয় মুসলমানদের উপর স্পেনের খ্রিস্টানেরা যে ভয়াবহ জুলুম করেছিল ইসলামের পক্ষে তা বিস্মৃত হওয়া কিংবা ক্ষমা করা যীশুখ্রিষ্ট ও মুহম্মদের সম্মিলিত বদান্যতার উপর নির্ভর করত। কিন্তু সে শাস্তি আসতে খুব দেরী হয়নি। এক শতাব্দী যেতে না যেতেই স্পেনের আগুন এক গাদা ছাইয়ের স্তূপে পরিণত হল।

পশ্চিম আফ্রিকায় তৃতীয় আল্ মোহেদ নৃপতির[৬৮] অধীনে যাজকতন্ত্রের বিজয় এবং বার্বারদের ধর্মান্ধতার উত্থান প্রগতির জোয়ার রুদ্ধ করে দিয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে সভ্যতা বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছিল তা স্তব্ধ করে দিয়েছিল, এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা-চর্চার কেন্দ্রগুলিকে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অজ্ঞানতার কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। বারবারি উপকূলে কোরসেয়ারদের বসতিস্থাপন এবং পরবর্তী মমলুকদের সময়ে বিরাজমান নৈরাজ্য শান্তিপূর্ণ জ্ঞানচর্চাকে নিরুৎসাহিত করেছিল। এশিয়ায় তাইমুর বংশের পতন, বন্য ও ধর্মান্ধ উজবেগদের অভ্যুত্থান এবং তৈমুরদের রাজধানীতে তাদের ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা জনগণের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। পারস্যে সাফায়ী বংশের অধীনে সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চা আবার শুরু হয়েছিল কিন্তু এই পুনর্জাগরণ ছিল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, আর বর্বর ঘিজাসীদের অভ্যুত্থানের ফলে ইরানের পুনর্জাগরণের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। মৃত্যুর মতো নৈরাশ্য মধ্য এশিয়ার আসন গেড়ে বসেছিল, যা এই বিষণ্ন শতাব্দীগুলি ধরে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে এবং আফগানিস্তানে ধীরে ধীরে অপসৃয়মান হচ্ছে।

প্রথম সেলিম, সোলায়মান ও মুরাদের অধীনে অটোম্যান রাজত্বে শিক্ষা অবলম্বন লাভ করেছিল কিন্তু ওসমানী বংশ মূলত একটি সামরিক জাতি। প্রথমে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, পরে নেহায়েত প্রয়োজন ও আত্মসংরক্ষণের তাগিদে তারা তাদের নির্মম শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে বাধ্য হয়েছিল—তাদের পরিকল্পনা কোন দিন শ্লথ হয়নি, তাদের লক্ষ্য ছিল রহস্যময়। তাদের দুশমন অন্তর্হিত হলেও তারা তাদের অস্তিত্বের জন্য যুদ্ধ করেই চলেছিল। এরূপ অবস্থায় জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলার অনুশীলন খুব কমই এগোতে পারে। ইসলামে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় বাধা আছে বলে যে অভিযোগ প্রায়শ করা হয়ে থাকে সে

www.amarboi.org

সম্পর্কে বলতে গিয়ে এম. গোবিনিউ নিম্নবর্ণিত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন : "তুরস্কের ন্যায় যে কোন ইউরোপীয় দেশে আড়াই শ' বছরব্যাপী সামরিক ও প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচার কল্পনা করুন; বিদেশী দাস সারকেসিয়ান, জিওরজিয়ান, তুর্কী ও আলবানিয়ানদের শাসনাধীনে মিশরের সামরিক নৈরাজ্যের মতো কিছুর পূর্বাভাষ সম্পর্কে ধারণা করুন; ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দের পর পারস্যের ন্যায় আফগান অভিযানের, নাদির শাহের নিষ্ঠুরতা, কাজার বংশের রাজ্যঅভিষেককে কেন্দ্র করে যে নিষ্ঠুরতা ও ধ্বংসলীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার চিত্র এঁকে নিন,—আপনারা এই সব পরিস্থিতির সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক সহগামী কারণসমূহকে যোগ করুন, এখন আপনারা বুঝবেন একটি ইউরোপীয় দেশে এসব ঘটলে সেখানে কি হতে পারত, যদিও সে দেশটি ইউরোপীয়। কাজেই প্রাচ্য দেশসমূহের ধ্বংসের ব্যাখ্যার জন্য কিংবা ইসলামের বিরুদ্ধে অসঙ্গত দায়িত্ব আরোপের নিমিত্ত আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন হবে না।"

সপ্তম শতাব্দীতে ইসলামের অভ্যুদয়ের পর থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত (পরে না গিয়েও), ইসলাম এমন একটি বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক মনোভঙ্গী দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল যা শক্তির দিক দিয়ে আমাদের আজকের দিনের ইউরোপ যে মনোভঙ্গীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে তার সমান। এই মনোভঙ্গী মুসলমানদের প্রগতির প্রবাহে সমানে সামনের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল এবং তাদেরকে পার্থিব ও মানসিক বিকাশের উচ্চতর স্তর অর্জন করতে সক্ষম করেছিল। গথ ও ভ্যাণ্ডালদের অভ্যুত্থানের পর ইউরোপের অগ্রগতি নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলেছিল, তাতার কিংবা উজবেগদের দ্বারা এশিয়ার যে মহাঅনর্থ ঘটেছিল, অ্যাটিলার ফ্রান্স থেকে প্রবর্তনের পর খ্রিস্টান জগতে তেমন কোন বিপদপাত ঘটেনি। এশিয়ার যুদ্ধসমূহ সে যতই নির্মম ও তীব্র, প্রচণ্ড ও অমানুষিক হোক না কেন, তা মনুষ্যত্ব ও অমানুষিকতার সমান শর্তে সংঘটিত হয়েছিল। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্টগন পরস্পর পরস্পরকে পুড়িয়ে মেরেছিল; কিন্তু বেচারা স্পেনের মুরদের পাইকারী হত্যাকাণ্ডের পর থেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমুদয় কেন্দ্রে তাতারদের অনুষ্ঠিত ভয়াবহ ধ্বংসকাণ্ডের মতো কিছুই ইউরোপ প্রত্যক্ষ করেনি। এই ধ্বংসযজ্ঞে জাতির মেরুদণ্ড, মেধাবী শ্রেণী বিনাশ প্রাপ্ত হয়।[৬৯]

আর এখন,

সিজারের বিরাট প্রাসাদে আজ মাকড়শা প্রহরা সাজায়
আফ্রাসিবের গম্বুজ–শীর্ষে শুধু কালো পেঁচা বাজনা বাজায়।

পাদটীকা

১. মোল্লা বাকির ইবনে মুহম্মদ তাকী আল্ মাজলিসীর 'বিহারুল আনোয়ার' ১ম খণ্ড, জ্ঞান অধ্যায় থেকে হাদিসটি গৃহীত এবং ইমাম জাফর আস্ সাদিক কর্তৃক পরিবেশিত; মোয়াজ ইবনে জাবাল-এর 'মুস্তারাফ', অধ্যায়—৪ থেকে এবং অধিকন্তু হাজী খলিফার 'কানৃফ উজ জুনূন', ফ্লুগেল সং পৃ. ৪৪ থেকেও উদ্ধৃত।

www.amarboi.org

২. 'মেনবাহুস্ শারিয়ত'।
৩. জামিউল আখবার।
৪. সুরা ৯৬ এবং অন্যান্য সুরা দেখুন।
৫. জামিউল আখবার।
৬. আনা মাদিনাতুন্ ইলমে আলী বাবোহা—আমি জ্ঞানের শহর, আলী তার দ্বার।
৭. মৌলবী সৈয়দ কেরামত আলীর 'মাখাজ-ই-উলুম।' এই পণ্ডিত ব্যক্তি হুগলীর ইমামবাড়ীর কিউরেটর ছিলেন প্রায় চল্লিশ বছর ধরে।
৮. মুক্কাজাল বিন ওমর যৌফির 'বিহারুল আনোয়ার' বিবৃত ইমাম আলী বিন মুসা আর রাজা 'হাদিস-ই-ইহ্লিলাজ' দেখুন।
৯. জামাল উদ্দীন আল্ কিফ্তী প্রণীত। 'তারিখুল হুকামা'—শিহাব উদ্দীন সোহ্রাওয়ার্দী প্রণীত উক্ত নামীয় অপর একটি গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিহাব উদ্দীন ছিলেন প্লেটোবাদী—ইশরাকী একজন ভাববাদী। সালাদীনের পুত্রের রাজত্বকালে গোঁড়াধর্মসভা তাঁকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিল। 'নাহ্যুল বলাগাতে'র প্রথম খোতবার সঙ্গে 'বিহারুল আনোয়ারে' প্রদত্ত জ্ঞানের উপর বর্ণিত হাদিসগুলি তুলনীয়।
১০. মাখাজি উলুম।
১১. আব্বাসীয়দের অধীনে বাগদাদের বর্ণনার জন্য 'এ শর্ট হিস্ট্রি অব দি স্যারাসেন্স' (ম্যাকমিলান্), পৃ. ৪৪৪।
১২. কেথির একটি শহর। এই শহরটি তার নারীর সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত।
১৩. ক্রেমার, 'কালচারজেস্চি দ্যাস ওরিয়েন্ট আন্টার তেন খলিফেন', ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১২।
১৪. গারবার্ট, পরে পোপ সিলভিস্টার দ্বিতীয়, কর্দোভাতে অধ্যয়ন করেছিলেন।
১৫. আবুল ফারাব।
১৬. মুহম্মদ, আহমদ ও হাসান।
১৭. মুহম্মদ ইবনে মুসা ইবনে শাকির ২৫৯ হিযরীতে (৮৭৩ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেছিলেন।
১৮. আবু আব্দুল্লাহ্ মুহমদ ইবনে সিনান আল্ বাতানী হার্বানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ৩১৭ হিযরিতে (৯২৯-৩০ খ্রি.) মারা যান।
১৯. আজাদ উদ্দৌলা (ফানা খুসরু)-র বদান্যতার ফলে বাগদাদে রুগ্নদের জন্য অনেকগুলি হাসপাতাল এবং এতিমদের জন্য আশ্রয়স্থল বা এতিমখানা স্থাপিত হয়েছিল। তিনি নযফ ও কারবালায় আলী ও হুসাইনের সমাধির উপর সৌধ নির্মাণ করিয়েছিলেন। সিরাজের উপর দিয়ে যে নদী প্রবহমান ছিল তার উপর প্রসিদ্ধ বন্দেলোমীর বাঁধ নির্মাণ করে তিনি নদীটিকে নাব্য করেছিলেন।
২০. আবু ওয়াফা ৩৮৭ (৯৯৭ খ্রি.) হিযরীতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।
২১. মিশরের সবচেয়ে বড় নৃপতি ছিলেন আযীয বিল্লাহ। তিনি তাঁর প্রজাদের যেমন ভালবাসতেন, তাঁর প্রজাগণও তাঁকে তেমনি ভালবাসতেন। এক খ্রিস্টান রমণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল, যার ভাই যেরেমিয়াহ্ এবং আরমেনিয়া জেরুজালেম ও আলেজান্দ্রিয়ার ধর্মযাজকের পদ অলঙ্কৃত করছিলেন। তারা দু'জনেই গোঁড়া 'লেকাইত' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।
২২. পরিশিষ্ট দেখুন।
২৩. সেডিলট।

www.amarboi.org

২৪. ঐতিহাসিক আয়নী বলেন যে, এই সময়ে কায়রোর সাধারণ গ্রন্থাগারে দুই লক্ষাধিক গ্রন্থ ছিল তার মধ্যে গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর ছিল ছয় হাজার গ্রন্থ। এই সময়ে যখন ইসলামের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল তখন যে হাজার হাজার গাণিতিক ও পদার্থবিজ্ঞানী সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন আমি তাদের মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছি।

২৫. স্টেইনলী লেনপুল, 'দি মূরস ইন স্পেন', পৃ. ১৪৪। কর্দোভার পূর্ণ বিবরণের জন্য 'শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন্স' (ম্যাকমিলান), পৃ. ৫১৫.

২৬. রেনান, 'অ্যাভেরোজ এট্ অ্যাভেরোইজম' পৃ. ৪। স্পেনে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ ছিল হাকাম আল্ মুস্তাসির বিল্লাহর শাসন আমলে। তিনি ৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর লাইব্রেরীর তালিকা ছিল চুয়াল্লিশ কোয়ার্টো। তিনি পৃথিবীর সর্বত্র যে কোন মূল্যে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের বই সংগ্রহ করার জন্য প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি আব্দুল ফারাজ আল ইস্পাহানীকে তাঁর বিখ্যাত সংকলন (কিতাবুল আঘানি) গ্রন্থে প্রথম কপির জন্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করেছিলেন।

২৭. ৯৯৬-১০৩০ খ্রি.।

২৮. অভিজেতা মাহমুদের পুত্র ও উত্তরাধিকারী।

২৯. 'ফিত্ তাহকিক মা'লিল্ হিন্দ'; 'শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন্স (ম্যাকমিলান) পৃ. ৪৬৩ দেখুন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আসারুল্ বাকিয়াহ' বা অতীতের নিদর্শন ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন ডঃ সাছাউ।

৩০. ১০৭৩-১০৯২ খ্রি.।

৩১. সাম্রাজ্যের প্রশাসক।

৩২. সেডিলট।

৩৩. ১০৩৭ খ্রি. -এ মৃত্যু।

৩৪. ১০৮২ খ্রি.-এ মৃত্যু।

৩৫. ১১২৫ খ্রি.-এ মৃত্যু।

৩৬. ১১৯৩ খ্রি.-এ মৃত্যু।

৩৭. তাতারদের বিভীষিকা ও ধ্বংসলীলার পূর্ণ বিবরণের জন্য 'শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারাসেন্স' পৃ. ৩৯১-৪০০ দেখুন।

৩৮. 'মালফুজাতে তৈমুরী' (তৈমুরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি) প্রাচীন অ্যাসিরীয় ও কায়ানিও নৃপতিদের স্টাইলে বিন্যস্ত হয়েছিল।

৩৯. হামবোল্ড আরবদেরকে পদার্থবিদ্যার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলেছেন।

৪০. আবু মুসা জাবির ইবনে হায়ান তারসুসের একজন অধিবাসী। ইবনে খাল্লিকান বলেন, জাবির দু'হাজার পৃষ্ঠার একখানা গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন যার মধ্যে তিনি তাঁর শিক্ষক ইমাম জাফর আস্ সাদিকের সমস্যাবলী অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন যা সংখ্যায় পাঁচশ'তে পৌঁছেছিল। 'তারিখুল হুকামা'ও দেখুন।

৪১. চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধায়কগণ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। ঔষধের মূল্য ও গুণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। রাষ্ট্র বহু চিকিৎসালয়ের খরচ বহন করত। চিকিৎসক ও ঔষধ প্রস্তুতকারকদের জন্য নিয়মিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হত এবং উত্তীর্ণ প্রার্থীদেরকে লাইসেন্স দেওয়া হত। একমাত্র লাইসেন্সধারীদেরকে ব্যবসায় চালাতে দেওয়া হত। তুঃ ক্রেমার ও সেডিলট।

www.amarboi.org

৪২. এই উঁচুদরের চিকিৎসকের উপনাম রাজী। তাঁর জন্মস্থানের নাম অনুসারে এই নাম। তিনি পর পর রাই, জান্দশাপুর ও বাগদাদের পাবলিক হাসপাতালের প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি 'হাউই' যাকে সেডিলট বলেছেন, "চিকিৎসাবিদ্যার দুর্গ"। সমুদয় জাতির চিকিৎসকেরা তাঁর 'বসন্ত ও হাম' সম্পর্কীয় গ্রন্থ থেকে পরামর্শ, দিক নির্দেশ গ্রহণ করত। তিনি 'মাইনব্লেটিভ্স-এর ব্যবহার প্রচলন করেন, 'সেটন উদ্ভাবন করেন এবং স্বরতন্ত্রের যন্ত্র আবিষ্কার করেন। তিনি দু'শ চিকিৎসাবিদ্যার বই লেখেন, তার মধ্যে কতকগুলি ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে ভেনিসে প্রকাশিত হয়। আর রাজী ৩১১ হিযরীতে (৯২৩-৯২৪ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন।

৪৩. রাজেসের পঞ্চাশ বছর পরে আলী ইবনে আব্বাসের সমৃদ্ধি কাল। তিনি ভেষজতত্ত্ব ও চিকিৎসা বিষয়ে বিশ খণ্ড বিশিষ্ট একখানা চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। এই গ্রন্থখানি বুয়াইদ আমির আজাদ উদ্-দৌলার নামে উৎসর্গীত হয়েছিল। ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে লাতিন ভাষায় গ্রন্থ খানি অনূদিত হয়েছিল। এবং ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে লীয়নসে মিচের ক্যাপেলা এই গ্রন্থ মুদ্রিত করেন। আলী ইবনে আব্বাস হিপোক্রেট্স ও গ্যালেনের অনেক ত্রুটি সংশোধন করেন।

৪৪. ইবনে জুহ্‌র বা অ্যাভেনজোয়ার তাঁর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন। তিনি পেনাফ্লোরে জন্মগ্রহণ করেন এবং চিকিৎসা ও বিজ্ঞান-বিষয়ক অধ্যায়ন শেষ করে আফ্রিকার মহান আলমোরাভাইদ নৃপতি ইউসুফ বিন তাশফিনের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। তিনি উদীয়মান চিকিৎসককে সম্মান ও ঐশ্বর্য দিয়ে পরিপূর্ণতা দান করেন। আল্‌বুকাসিসের মতো ইবনে জুহ্‌র চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঔষধের ব্যবস্থার সঙ্গে শল্যচিকিৎসাও সংযোজিত করেন। তিনিই স্থানচ্যুতি ও বিদারণের মত নিদর্শনসহ সর্বপ্রথম শ্বাসনালীর দুটি ভাগ সম্পর্কে ধারণা পোষণ করেছিলেন এবং তার চিকিৎসা করতে গিয়ে আরও কয়েকটি রোগের আবিষ্কার করেন। তাঁর পুত্রও তাঁরাই পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তিনি তাশফিনের সেনা বিভাগের প্রধান শল্যচিকিৎক ও চিকিৎসক ছিলেন।

৪৫. অ্যাভের্রোজ পাশ্চাত্যের আভিসেনা ছিলেন। রেনান তাঁর জীবনকথা ও রচিত গ্রন্থাবলী সম্পর্কে বিশ্বজনকে অবহিত করেছেন। তিনি ইবনে জুহ্‌র, ইবনে রাজা ও ইবনে তোফায়েলের সমসাময়িক। অ্যাভের্রোজ ও তাঁর সমসাময়িক মনীষীদের সম্পর্কে আমরা পরের অধ্যায়ে বলব। এরা ছাড়া রয়েছেন আবুল হাসান ইবনে তিলমিজ—'আল্ মালিকির গ্রন্থকার, আবু জাফর মুহম্মদ আত্ তালিব—যিনি প্লুরিসি সম্পর্কে লিখেছেন, এবং হিবাতুল্লা।

৪৬. আল্ বেসার ভেষজ লতাগুল্ম যোগাড় করার জন্য সমগ্র প্রাচ্যে ভ্রমণ করেন এবং বিস্তারিতভাবে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। আরব চিকিৎসকগণ বেউচিনি, দারুচিনি, সোনামুখী গাছ, কর্পূর, তেঁতুলের শাস ইত্যাদির ব্যবহার প্রচলিত করেন।

৪৭. মূত্র-পাথর অস্ত্রোপচারে তিনি আধুনিক যুগের অগ্রগামী শল্যচিকিৎসকদের সমকক্ষ ছিলেন।

৪৮. আমি শুনেছি যে ভিয়েনার গ্রন্থাগারে এই একই গ্রন্থকারের একখানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ রয়েছে—তা ত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত—গ্রন্থখানির নাম "আখ্বারুজ্ জামান"। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থখানি এবং 'মিরাতুজ্ জামান' একই গ্রন্থ।

www.amarboi.org

৪৯. ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।

৫০. মামলূক সুলতান মালিক তাহেরের ভগিনী ৬৮৪ হিযরীতে কায়রোতে এই ধরনের একটি বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

৫১. হারুন অর্ রশীদের স্ত্রী জুবাইদা অনেকগুলি এতিমখানা তৈরি করেছিলেন। আজুদ উদ্‌দৌলার স্ত্রী যে হাসপাতাল তৈরি করেছিলেন তা তাঁর স্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালের প্রতিদ্বন্দ্বী। মালিক আশরাফের কন্যা, যিনি খাতুন নামে পরিচিত, দামেস্কে একটি বিরাট কলেজ স্থাপন করেছিলেন। হেমসের নাসির উদ্-দৌল্লার স্ত্রী জামুরুদ খাতুনও একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
অনেক মুসলিম মহিলা কাব্যজগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। হযরতের কন্যা ফাতিমা কবিদের মধ্যে উচ্চ স্থান অধিকার করে আছেন। আওরঙ্গজেবের কন্যা জেবুন্নিসা—উপনাম মাখফিও কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। যখন উর্কুহার্ট তুরস্কে ভ্রমণ করেছিলেন সেখানকার বিখ্যাত জীবিত কবিদের মধ্যে তিনজন ছিলেন মহিলা; তাদের অন্যতম পারিষদ খাতুন সুলতান মুস্তাফার ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন।

৫২. ডিউটস্।

৫৩. জনসন।

৫৪. মৃত্যু—৯৩৩ খ্রি.।

৫৫. মৃত্যু—১০৫৭ খ্রি.।

৫৬. মৃত্যু—১২৫৫ খ্রি.।

৫৭. মৃত্যু—১০৯২ খ্রি.।

৫৮. ১১৭৫ খ্রি. (৫৬৯ হি.)।

৫৯. ১১৭৭ খ্রি. (৫৭৩ হি.)।

৬০. সুলতান সঞ্জর সম্পর্কে আনওয়ারীর প্রশংসাকীর্তন ফারসী ভাষায় অন্যতম সুন্দরতম কবিতা। হিন্দুস্তানের কবি সাওদা অযোধ্যার আসফ উদ্-দৌলার সম্মানে সাফল্যের সঙ্গে আনওয়ারীকে অনুকরণ করেছেন।

৬১. ১১৮৩ খ্রি. (৫৮২ হি.)।

৬২. ১২০১ খ্রি. (৫৯৮ হি.)।

৬৩. ১২৮০ খ্রি. (৫৭৬ হি.)।

৬৪. ১১৯০ খ্রি. (৫৮৬ হি.)।

৬৫. লূৎফ আলী আজরের 'আতেশ কাদেহ' (অগ্নি মন্দির) গ্রন্থটি প্রাচীনকাল থেকে কবিদের কথা বর্ণিত হয়েছে।

৬৬. মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে ইসলাম যে গতিবেগ সঞ্চার করেছিল তা এই ঘটনার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, যে সব জাতি অদ্যাবধি সম্পূর্ণরূপে নিদ্রিত ছিল সে সব জাতির সদস্যগণ প্রগতির প্রতিযোগিতায় আরবদের সাথে যোগদান করেছিল। ইসলাম মানবজাতির ধমনীকে সঞ্জীবিত করেছিল এবং যে সব সম্প্রদায় মৃত বা মরণপথের যাত্রী হয়েছিল তাদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল।

৬৭. আরবদের অধীনে স্পেনের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শিক্ষা ও শিল্পকলার অবস্থার জন্য "শর্ট হিস্ট্রী অব দি স্যারসেন্স" পৃ. ৪৭৪-৫৮০ দেখুন।

www.amarboi.org

৬৮. পশ্চিম আফ্রিকায় ফাতেমীয় শক্তির ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় দেশের 'মারাবুত' বা দরবেশ থেকে একটি রাজবংশ আবির্ভূত হয়েছিল। সুতরাং এই বংশ আল্ মোরাভিদ বা আল্ মুরাবাতিয়া নামে পরিচিত। এই বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ইউসুফ বিন তাশফিন যিনি ইবনে জুহুরের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আল্ মোহেদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল মোমিন কর্তৃক তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। তিনি মরক্কো ও যোজ ধ্বংস করেছিলেন। তারা মধ্য এশিয়ার ওয়াহাবী ও ইখওয়ান ভ্রাতৃসঙ্ঘের সমগোত্রীয় এবং সম্ভব লিবিয়ার মাহ্দীদের থেকে বেশি পৃথক ছিল না। এই বংশের প্রথম দু'জন সুলতান, আব্দুল মোমীন ও ইউসুফ জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিল্পকলায় উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু এই বংশের তৃতীয় সুলতান ইয়াকুব আল্ মনসুরের রাজত্বকালে ধর্মান্ধতা আবার জেঁকে বসেছিল।

৬৯. মোঙ্গলদের দ্বারা বাগদাদ লুণ্ঠনের ঘটনা অন্যান্য শহরে যা ঘটেছিল তার দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝানো যায়, কিন্তু বর্বরদের দ্বারা যে ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রকৃত ধারণা গঠনের জন্য তা গিবনের মতো তীক্ষ্ণধী ঐতিহাসিকের বর্ণনার প্রয়োজন। তিন দিন ধরে বাগদাদের রাস্তাসমূহের রক্তের বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল এবং কয়েক মাইল ধরে তাইগ্রিস নদীর পানি রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল। লুণ্ঠন, হত্যাকাণ্ড ও প্রকাশ্য বলাৎকারের বিভীষিকা ছয় সপ্তাহ ধরে চলেছিল। প্রাসাদ ও মসজিদ ও স্মৃতি-স্তম্ভসমূহকে সোনালী গম্বুজের জন্য অগ্নিসংযোগে ধ্বংস করা হয়েছিল কিংবা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাসপাতালের রোগী এবং কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের তরবারীর সাহায্য হত্যা করা হয়েছিল। স্মৃতিসৌধের মধ্যে অবস্থিত শেখ ও ইমামদের পার্থিব ধ্বংসাবশেষ এবং একাডেমীতে সংরক্ষিত বিখ্যাত ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের অমর গ্রন্থাবলী ভস্মীভূত করে ছাইয়ে পরিণত করেছিল; গ্রন্থসমূহ অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল; যেখানে অগ্নি দূরবর্তী ছিল এবং তাইগ্রিস নদী নিকটবর্তী ছিল সেখানে তাইগ্রিসের নদীতে তার সলিল-সমাধি দেওয়া হয়েছিল। এভাবে পাঁচ শ' বছরের সঞ্চিত সম্পদ মানবজাতির নিকট থেকে চিরতরে লুপ্ত হয়ে গেল। জাতির পুষ্প সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ প্রাপ্ত হল। নীতি ও সাবধানতা হিসেবে এটা হালাকুর প্রথা ছিল যে, তার বাহিনী যেসব দেশের ভেতর দিয়ে অভিযান চালাত সেখানকার যুবরাজ ও প্রধানদেরকে তার বাহিনীর সঙ্গে নিয়ে যেত। এসব বন্দী যুবরাজের মধ্যে ফার্সের আতবেক, সাদী বিন জাঙ্গ ছিলেন অন্যতম। প্রতীয়মান হয় যে, কবি সাদী তাঁর বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকের সঙ্গে ছিলেন। তিনি ছিলেন বাগদাদের বিভীষিকাময় অবস্থার এবং এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনগণের প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি চার পংক্তি কবিতার মাধ্যমে এই বিষাদের বিপুলতা ও ভয়াবহতার রূপদান করেছেন। অনূদিত গ্রন্থের পরিশিষ্ট–১' [মূল গ্রন্থের পরিশিষ্ট–৩] দ্রষ্টব্য।

www.amarboi.org

দশম অধ্যায়
ইসলামের বুদ্ধিবাদী ও দার্শনিক মর্মবাণী

"আল্লাহ্ কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত সে জাতি তার ভাগ্য পরিবর্তন প্রয়াসী না হয়।" **—আল্ কোরআন।**

প্রাচীন কালের অন্যান্য জাতির মতো প্রাক্-ইসলামী আরবেরাও ঘোর অদৃষ্টবাদী ছিলেন। প্রাচীন আরবদের চিন্তা ও প্রথার একমাত্র তথ্যনির্দেশক, তাদের প্রাচীন কবিতার ধ্বংসাবশেষ নির্দেশ করে যে, ইসলাম প্রচারের পূর্বে এই উপদ্বীপের লোকেরা সম্পূর্ণরূপে এক অমোঘ ও অন্ধ নিয়তির কাছে আত্মবলিদান করেছিল। মানুষ নিয়তির হাতের ক্রীড়নক ছিল। এই ধারণা মৃত্যুর প্রতি অবিবেকী ঘৃণা ও জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধা জন্ম দিয়েছিল। ইসলামের শিক্ষা আরবদের মনে বিপ্লব আনয়ন করেছিল; তারা এক বিশ্বনিয়ন্ত্রক সার্বভৌম বুদ্ধিশক্তিকে স্বীকার করেছিল, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত আত্মনির্ভরতা ও নৈতিক দায়িত্বের ধারণা লাভ করেছিল। কোরআনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, কোরআন অদ্ভুতভাবে এবং আপাতঃ দৃষ্টিতে অসামঞ্জস্যভাবে ঐশী ইচ্ছা যা শুধু সমুদয় বস্তুকে নিয়ন্ত্রিতই করে না বরং মানুষের উপর সরাসরি কাজ করে ও তার চিন্তার উৎসকে চালিত করে তার সঙ্গে মানুষের মধ্যে অবাধ ক্রিয়াশক্তি ও বুদ্ধির স্বাধীনতার সংযুক্তি ঘটায়। এ শুধু মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থেরই বিশেষত্ব নয়, একই বিশেষত্ব বাইবেলেও দেখা যায়। কিন্তু কোরআনে মানুষের দায়িত্বের বিষয়টি এত শক্তিশালীভাবে বিকশিত হয়েছে যে, মনে স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন উদয় হয় ; কিভাবে এই দুটি ধারণার সামঞ্জস্য বিধান করা যেতে পারে? যদি মানুষের যাবতীয় কাজ এক সর্বশক্তিমান ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে মানুষকে তার কার্যাবলী দ্বারা বিচার করা উচিত—ইসলামী নৈতিকতার ভিত্তিস্বরূপ এই মতবাদটি প্রথম দৃষ্টিতে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয় একটি সক্রিয় চিরঞ্জীব নীতিতে মুহম্মদের আন্তরিক বিশ্বাস ও মানুষের প্রগতিতে বিশ্বাস যুক্ত হয়ে এই রহস্যের সমাধানের নির্দেশ করে। আমি

www.amarboi.org

কোরআনের ঐশী ইচ্ছার নিরপেক্ষতা-নির্দেশক এবং মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা-নির্দেশক কিছু কিছু আয়াত উল্লেখ করে আমি আমার বক্তব্য বিষয় দৃষ্টান্ত সহকারে বুঝাব : "আর সূর্য সে তো নিজের নির্দিষ্ট স্থানেই চলমান অবস্থায় রয়েছে। এ যে তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী ও পরম জ্ঞানী[১] ... গগনমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো তাঁরই নিদর্শনগুলির অন্যতম, আর তিনি এ দুটির মধ্যে যে সব প্রাণী ছড়িয়ে রেখেছেন তাও। তিনি নিজের খুশিমত সে সবের সমাবেশ ঘটাতে পারেন।[২] ... তারা কি দেখেনি যে আল্লাহ্ পাক—যিনি গগনমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, এ-সবের সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি কিছুমাত্র ক্লান্ত হননি। তিনি তো এমন শক্তিও রাখেন যাতে তিনি মৃতদেরকে বাঁচিয়ে তুলবেন। নিশ্চয়ই তিনি সকল বিষয়ে শক্তির একমাত্র অধিকারী।[৩] ... আরও একটি সাফল্য যা এখনও তোমাদের হাতে আসেনি—আল্লাহ্ নিজেই তা ঘিরে রেখেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে শক্তির একমাত্র অধিকারী[৪]। ... আমার কাছেই তো সব জিনিসের ভাণ্ডার মওজুদ রয়েছে; নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাড়া নাজিল করি না[৫]। ... গগনমণ্ডল ও পৃথিবীর বুকে যা কিছু অদৃশ্য রয়েছে সবই যে আল্লাহতায়ালার জন্যই।[৬]... তাদেরকে পার্থিব জীবনের উপমা দিন : যেমন আসমান থেকে আমি বৃষ্টিধারা বর্ষণ করে থাকি আর সাথে সাথে পৃথিবীর গাছপালা সঞ্জীবতা লাভ করে। তারপরে তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল যা হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আসলে আল্লাহ্ সকল বিষয়ে কর্তৃত্বের অধিকারী।[৭] ... আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন—যে নাকি তাকে সাহায্য করল।[৮] ... আল্লাহতায়ালাই সৃষ্টি করেন যেমন তাঁর খুশি।[৯] ... তিনিই তো প্রত্যেকটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আকার আকৃতি ও পরিমাণ সঠিকভাবে স্থির করে দিয়েছেন।[১০] ... আসলে আপনার পালনকর্তাই যে সব কিছু করতে পারেন।[১১] ... সুতরাং দেখে নাও আল্লাহর রহমতের নিদর্শনসমূহ। কিভাবে তিনি জমীনকে সজীব করে তোলেন—তার মৃত্যুর পর। নিশ্চয়ই তিনি মৃতদেরকে বাঁচিয়ে তুলবেন। আসলে তিনিই তো সকল বিষয়ে শক্তির একমাত্র অধিকারী।[১২] ... আল্লাহর জন্য আসমান জমীনের সবকিছু। তোমরা নিজেদের মনের কথা—যা প্রকাশ বা গোপন কর—আল্লাহ্ যে সকলের হিসাব তোমাদের কাছ থেকে নেবেন, পরে যাকে খুশি মাফ করবেন আর যাকে খুশি সাজা দেবেন। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে শক্তির একমাত্র অধিকারী।"[১৩] ... আপনি বলুন—হে আল্লাহ, সব রাজ্যের মালিক তো আপনিই। যাকে খুশি দান করেন, যার কাছ থেকে খুশি ছিনিয়ে নেন। যাকে খুশি জয়ী করেন, যাকে খুশি অপদস্থ করেন। আপনার অধিকারেই তো সব রকমের কল্যাণ রয়েছে। আপনি তো সকল বিষয়ে শক্তির একমাত্র অধিকারী—একথা তো সুনিশ্চিত।[১৪] ... যাকে খুশি তিনি মাফ করেন যাকে খুশি তিনি সাজা দেবেন।[১৫] ... আল্লাহর জন্যই তো সব কিছুর রাজত্ব—গগনমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে। তিনিই তো সকল বিষয়ে শক্তির একমাত্র অধিকারী।[১৬] ... আল্লাহ্ নিজের কাজ অবশ্যই সম্পূর্ণ করেন। আল্লাহ প্রত্যেকটি জিনিসের একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।[১৭] ... আল্লাহ দিনরাত নিয়ন্ত্রণ করছেন।[১৮] আপনার মহামহিম পালন-কর্তার

www.amarboi.org

নামে তসবীহ্ পড়তে থাকুন যিনি বানিয়েছেন ও ঠিক রেখেছেন; যিনি পরিমাণ ঠিক করেছেন, তারপরে পথ দেখিয়েছেন।[১৯] ... যারা অবিশ্বাসী, তাদেরকে সতর্ক করুন— আর না-ই করুন। তাদের জন্য সমান। তারা কিছুতেই ঈমান আনবে না।[২০] ... আল্লাহ তাদের মন ও কানগুলির ওপর মোহর করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখগুলির ওপর পর্দা পড়ে আছে।[২১] আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন তবে গোটা মানব সমাজকেই তিনি সরল সহজ সত্য সঠিক সনাতন পথেই চালিয়ে নিতেন।[২২] ... আল্লাহ্ অনুগ্রহ করে তোমাদের বোঝা লঘু করে দেন, কেননা মানুষ স্বভাবতঃ দুর্বল। ... একথা সত্য সুনিশ্চিত যে আল্লাহ্ কোন কওমের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়।[২৩] ... বলুন একথা সত্য সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ যাকে চান তাকে গোমরাহ্ করেন। আর যে কেউ তার দিকে নিবিষ্ট হয়, তাকেই তিনি নিজের দিকে পথ দেখান।"[২৪]

এটা লক্ষণীয় যে "আল্লাহর বিধান" উদ্ধৃত অনেক আয়াতেই সুস্পষ্টভাবে প্রাকৃতিক নিয়ম বুঝিয়েছে। তারকা ও গ্রহরাজির সুনির্দিষ্ট গতি রয়েছে। অনুরূপ রয়েছে সৃষ্টির অন্যান্য বস্তুর কার্যধারা। জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গতায়াত, নৈসর্গিক ঘটনাবলী, জীবনমৃত্যু— সবই নিয়মের অধীন। অন্যান্য আয়াত প্রশ্নাতীতভাবে মানুষের ইচ্ছার উপর ঐশী ইচ্ছার কার্যকারিতা নির্দেশ করে। আবার এমন আয়াতও রয়েছে যাতে ঐশী কর্তৃত্ব মানুষের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। যাঁরা ঐশী সাহায্য অন্বেষণ করে আল্লাহ্ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন; আর যে হৃদয়ের আবিলতা থেকে মুক্ত হয় আল্লাহ্ তার উপর রহমত বর্ষণ করেন। আরবের নবীর পূর্বসূরীদের ন্যায় তাঁর নিজের কাছেও সর্বশক্তিমান, বিশ্বস্রষ্টা, যাবতীয় জীবের নিয়ন্তা আল্লাহর অস্তিত্ব সুতীব্র ও জীবন্ত বাস্তবতা। এক সর্বপ্লাবী চিরসচেতন ব্যক্তিত্বে "নিশ্চিত বিশ্বাসে"র অনুভূতি প্রত্যেক যুগেরই চালক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। পরিশ্রান্ত নাবিকের কাছে "পবিত্র জীবন যাত্রায়" মানুষের উর্ধ্বে বিরাজিত যে শক্তি অন্যায়ের প্রতিকার করেন, আশা চরিতার্থ করেন, হতভাগ্যকে সাহায্য করেন, তাঁর চেয়ে অধিকতর নিশ্চয়াত্মক, উত্তম ও বিশুদ্ধতর জগতের জন্য অধিকতর সন্তোষজনক বাসনা নেই। ঐশী অধ্যাদেশের অস্তিত্ব থেকেই আল্লাহর প্রতি আমাদের বিশ্বাস জন্মে। সঠিক অর্থে এই অধ্যাদেশসমূহ জ্যোতিষ্কমণ্ডলের গতিনির্ধারক নিয়মাবলীর মতোই। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা স্বেচ্ছাচারিতামূলক নয়; এ হল শিক্ষামূলক ইচ্ছা যা একজন জ্ঞানী পণ্ডিত তার জ্ঞানান্বেষণকালে একজন ধ্যানী সাধক তার সাধনার কুটিরে অনুসরণ করে থাকেন।

যা'হোক যেসব আয়াতে জোরালো ভাষায় মানবীয় দায়িত্ববোধ ও মানবীয় ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে উক্ত হয়েছে সেগুলি নিরপেক্ষতার ধারণাকে সঙ্কোচিত ও সীমাবদ্ধ করে। "যে কেউ গোনাহ কামাই করেছে, তার ফলাফল সে নিজেই তো ভুগবে।[২৫] ... আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা নিজেদের ধর্মকর্ম নিয়ে খেল-তামাশায় মেতে উঠেছে। আর পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে।[২৬] ... তারা যখন অপকর্ম করে তখন তারা

www.amarboi.org

বলে : আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে আমরা এসব করতে দেখেছি, আর আল্লাহ্ যে এসবের নির্দেশ আমাদেরকে দান করেছেন, আপনি ঘোষণা করে দিন : আল্লাহ্ অশ্লীল অপকর্মের নির্দেশ মোটেই দেন না।[২৭] ... তারাই তো নিজেদের উপর জুলুম করছে।[২৮] ... সেখানে সবাইকে যাচাই করা হবে যা কিছু আগাম পাঠিয়েছে।[২৯] ... আর যে কেউ বিভ্রান্ত হল তাতে তার নিজেরই অনিষ্ট ঘটল।"[৩০]

মানুষ তার অস্তিত্বের সীমাবদ্ধতার মধ্যে তার ক্রিয়াবলীর নিরঙ্কুশ কর্তা। সে তার কার্যাবলীর জন্য দায়ী, আর সে ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে, তার সদ্ব্যবহার বা অপপ্রয়োগের জন্য সে দায়ী। তার নিজস্ব প্রবণতা অনুযায়ী সে উপরেও উঠতে পারে আবার নীচেও নেমে যেতে পারে। যে তার প্রভুর সাহায্য কামনা করে তার জন্য রয়েছে সর্বোচ্চ সাহায্য। যে সাহায্যের কথা তার প্রভু প্রতিজ্ঞা করেছেন তার জন্য প্রার্থনা করায় কি আত্মার উন্নতি ও বিশুদ্ধি সাধিত হয় না? শক্তি ও সান্ত্বনার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করায় কি দুর্বল শক্তিশালী হয় না, দুঃখী সান্ত্বনা লাভ করে না? ঐশী বিধান ও মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে ইসলামের নবী এ ধরনের ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর যেসব বাণী যাচাইকৃত হয়ে লিপিবদ্ধভাবে আমাদের কাছে পৌঁছেছে তা থেকে আমরা ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণ ও ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য পাই। শুধু তাঁরই বাণী নয় তাঁর জামাতা—"তাঁর প্রেরণার বৈধ উত্তরাধিকারী" এবং তাঁর অব্যবহিত বংশধরগণ—যাঁরা তাঁর কাছ থেকেই তাঁদের ধারণা পেয়েছিলেন—এসব মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রকৃত ইসলামিক ধারণা পেশ করে। আর এই প্রশ্নই যুগ যুগ ধরে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মে গোষ্ঠীগত বিরোধের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই বিষয়টি আলোচনাকালে আমাদের মনে রাখতে হবে, যে সব হাদিস মযহাবসমূহকে প্রজ্ঞার সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ প্রদান করেছে তা সেভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। সেগুলি কিভাবে এবং কি পরিস্থিতিতে অস্তিত্বশীল হয়েছে তার কাহিনী তাদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যে সব হাদিস সে-সব লোকের দ্বারা বাহিত হয়েছে যারা হযরতের সঙ্গে দৈবক্রমে সংস্পর্শে এসেছিলেন তা মধ্যস্তকারীদের মনে ও স্মৃতিতে পরিবর্তন ও রূপান্তরের স্পষ্ট চিহ্ন নির্দেশ করে। সহীহ্ হাদিস সংখ্যায় অনেক; মুহম্মদের মনে মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় আন্তরিক বিশ্বাসের সঙ্গে স্বর্গীয় নিয়ন্তার ব্যক্তিত্বের প্রতি জীবন্ত বিশ্বাস যুক্ত হয়েছিল বলে যা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি তা ব্যাখ্যা করার জন্য আমি মাত্র কয়েকটি হাদিসের আশ্রয় নেব। বংশগত নীতিভ্রষ্টতা ও স্বাভাবিক পাপ-প্রবণতা জোরালোভাবে অস্বীকৃত হয়েছে। প্রত্যেক শিশুই পবিত্র ও পাপমুক্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে; পরবর্তী জীবনে সত্য ও ন্যায় থেকে সে যে সরে দাঁড়ায় তার মূলে রয়েছে তার শিক্ষা। "প্রত্যেক মানুষই স্বভাব ধর্মের ওপর জন্মগ্রহণ করে; তার পিতা-মাতাই তাকে ইহুদী বা খ্রিস্টান বা সেবীয়ান করে গড়ে তোলে; যেমন আপনারা যদি একটা পশুর জন্মের পরেই তা গ্রহণ করেন, তাতে কি আপনারা কোন বিকৃতি দেখতে পান যদি আপনি তাকে বিকৃত না করেন?" শিশুদের যথার্থ নৈতিক চরিত্র নেই; কেননা যারা

www.amarboi.org

শৈশবে মারা যায় তাদের সম্পর্কে "আল্লাহই ভালভাবে জানেন তাদের আচরণ কি হত" (যদি তারা পরিণত বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকত)। "প্রত্যেক মানুষের দুটি প্রবণতা রয়েছে : একটি তাকে উত্তম কাজের দিকে প্ররোচিত এবং অপরটি তাকে মন্দ কাজের দিকে প্ররোচিত করে।[৩১] ঐশী সাহায্য মানুষের নিকটবর্তী। যে ব্যক্তি তাঁর মনের কুমন্ত্রণাকে জয় করার জন্য আল্লাহপাকের সাহায্য প্রার্থনা করে সে তা পায়।" "তোমার নিজের আচরণই তোমাকে স্বর্গ বা নরকে নিয়ে যাবে, যেন তুমি সেজন্য পূর্ব থেকেই নির্ধারিত।" কোন ব্যক্তির আচরণ তার ভাগ্যের ফলশ্রুতি নয় কিংবা সে স্বর্গ বা নরকের জন্য দুর্দমনীয় নির্বন্ধ নিয়ে জন্মায় না, বরং তার পরিণতি তার কর্মেরই ফল, কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি মুখ্যতঃ তার ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্য দায়ী। 'প্রত্যেকের নৈতিকতা তার নিজের কর্মফলকে উন্নীত করে" কিংবা অন্য হাদিসে বলা হয়েছে "প্রত্যেক ব্যক্তি তার চরিত্র বা আচরণ অনুসারে ঐশী সাহায্য প্রাপ্ত হয়।" মানুষের আচরণ কোন ক্রমেই আকস্মিক নয়; একটি কাজ অন্য একটি কাজের ফল এবং জীবন, নিয়তি ও চরিত্র কার্যকারণ হিসেবে নির্দিষ্ট নিয়ম—"আল্লাহর নিরূপণ নীতি" দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ঘটনা ও ক্রিয়াসমূহের গ্রন্থন। শিষ্যদের উপদেশাবলীতে এই মতবাদ অধিকতর বিকশিত দেখতে পাই। "তোমার কাজের হিসাবনিকাশ উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তোমার আত্মার অবস্থার অনুসন্ধান কর; এই জীবদ্দশায় তোমার আচরণের হিসাব দাবী করার পূর্বেই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া কর। উত্তম ও বিশুদ্ধ কাজে নিজেকে নিয়োজিত কর, আত্মা আর পার্থিব আবাসভূমি ত্যাগ করার পূর্বে সত্য ও ন্যায়ের পথ অবলম্বন কর; এটা সুনিশ্চিত যে, যদি তুমি নিজেকে চালিত ও সাবধান না কর তবে অন্য কেউ তোমাকে নির্দেশ করবে না।"[৩২] "আমি আপনাদেরকে বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার মাধ্যমে আল্লাহর উপাসনা করতে অনুরোধ করি। তিনি আপনাদেরকে দেখিয়েছেন মুক্তির পথ ও জগতের প্রলোভন। আপনাদের কাছে সুন্দর মনে হলেও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকুন, আর মন্দ যতই মধুর হোক না কেন তা পরিহার করুন ... কারণ আপনারা জানেন যে তা আপনাদেরকে আল্লাহ থেকে কতদূরে নিয়ে যায়। ... শ্রবণ করুন এবং করুণাময় আশ্রয়দাতা অভিভাবক আল্লাহর বাণী থেকে সাবধানতা অবলম্বন করুন।[৩৩] পুনরায় তিনি বলেন, "হে আমার প্রভুর বান্দাগণ, আপনাদের উপর যে কর্তব্য অর্পিত হয়েছে তা সম্পাদন করুন, কারণ কর্তব্যে অবহেলা আপনাকে অবনমিত করবে। আপনার উত্তম কাজ আপনার মৃত্যুর পথ সহজ করবে। স্মরণ রাখুন প্রত্যেকটি পাপ আমাদের দেনা বাড়ায়, (যে শৃঙ্খল আপনাকে বেঁধেছে) তা গুরুতর করে। রহমতের সুসংবাদ এসেছে; সত্যের পথ সুস্পষ্ট; আপনাদের প্রতি যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা পালন করুন; বিশুদ্ধতার ভেতর জীবন নির্বাহ করুন, পবিত্রতার সঙ্গে কাজ করুন; আপনার কাজে সাহায্য করার জন্য এবং আপনার অতীত অপরাধ মার্জনার জন্য আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করুন।"[৩৪] নমনীয়তা ও সহিষ্ণুতার অনুশীলন করুন; ধর্মনিষ্ঠা ও সত্যবাদিতার সঙ্গে আচরণ করুন। নিজের বিবেক অনুযায়ী নিজ কাজের সমীক্ষা করুন, যিনি এরূপ সমীক্ষা করেন তিনি প্রভূত পুরস্কার পেয়ে

www.amarboi.org

থাকেন; আর যিনি অবহেলা করেন তিনি ক্ষতির সম্মুখীন হন। যিনি ধর্মনিষ্ঠার সাথে কাজ করেন তিনি আত্মিক শান্তি লাভ করেন। যিনি সতর্কতা অবলম্বন করেন তিনি সত্য অনুধাবন করেন; যিনি সত্য অনুধাবন করেন তিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন।" এসব উক্তির মধ্যে অদৃষ্টবাদের কোন ধারণা নেই, পক্ষান্তরে এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রতি জীবন্ত বিশ্বাসে প্রাণবন্ত আত্মার চিত্র, অথচ মনুষ্য-ইচ্ছা থেকে জাত ব্যক্তিগত শ্রম-নির্ভর মানুষের ক্রমবিকাশের উপর বিশ্বাস। প্রজ্ঞা ও জ্ঞান, সসীম ও অসীমের চেতনা সম্পর্কে মুহম্মদের সংজ্ঞা এ্যারিস্টটলের শব্দবিন্যাস ও চিন্তার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, আলীর পুত্রের প্রতি উপদেশ এ্যারিস্টটলের নীতিবিদ্যার মুগ্ধ পাঠকগণ সুবিধার সঙ্গে পর্যালোচনা করতে পারেন।

ইসলামে অদৃষ্টবাদের উপর সঠিক মতামত গঠনের জন্য 'ইহ্তিজাজ উত্ তাবৃরাসী'[৩৫] গ্রন্থ আরও উপাদান সরবরাহ করে। খলিফা আলীকে একদিন 'কাজা' ও 'কদর' সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "'কাজা' মানে আল্লাহর নির্দেশের প্রতি আনুগত্য ও পাপ পরিহার, আর 'কদরে'র অর্থ হল পবিত্র জীবনযাপনের ক্ষমতা এবং সেই সব কাজ পরিহার করা যা তাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ... বলবেন না যে মানুষ 'বাধ্যবাধকতার অধীন', তাতে আল্লাহর প্রতি জুলুম আরোপ করা হয়, আর একথাও বলবেন না যে মানুষ নিরপেক্ষ ক্ষমতার অধিকারী[৩৬] বরং আমাদের সৎ প্রচেষ্টায় তাঁর সাহায্য ও করুণাময় আমরা অগ্রগতি লাভ করি, আর (আল্লাহর নির্দেশের প্রতি) অবহেলা করে আমরা সীমা অতিক্রম করি।" তাঁর সঙ্গে কথোপকথনকারী উতবা ইবনে রাবিয়া আসাদী একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "আল্লাহর তরফ ছাড়া কোন শক্তি ও সাহায্য নেই (লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "এর অর্থ হল আমি আল্লাহর ক্রোধের জন্য শঙ্কিত নই, আমি শঙ্কিত তাঁর পবিত্রতার জন্য; আর তাঁর নির্দেশাবলী পালনের ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু আমার শক্তি তাঁর সাহায্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।"[৩৭] আল্লাহ্ আমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আমাদের জন্মগত শক্তি অনুসারে প্রচেষ্টা চালাতে। নিম্নবর্ণিত আয়াতও অনুরূপ অন্যান্য আয়াতের উল্লেখ করে খলিফা বলেছেন, "আল্লাহ্ বলেন, 'আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে, তোমাদের মধ্যে কারা (সত্য ও বিশুদ্ধতার) প্রতি প্রচেষ্টাকারী এবং কারা সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল, আর আমরা তোমাদের কাজের বিচার করব'। 'তোমরা যা জান না এমন বিষয় আয়ত্ত করতে আমি তোমাদেরকে ক্রমশঃ সাহায্য করব।'[৩৮] .... এই আয়াত-গুলি মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে সপ্রমাণ করে"[৩৯] "আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন সৎ পথে পরিচালিত করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন বিভ্রান্ত করেন"—কোরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যায় খলিফা বলেন যে এর অর্থ এই নয় যে আল্লাহ্ মানুষকে সৎ কিংবা অসৎ পথে পরিচালিত করেন, কেননা এতে মানবীয় কাজের সব দায়িত্ববোধ বিনষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, এ কথার অর্থ এই যে আল্লাহ মানুষকে সত্য পথের নির্দেশ করেন এবং মানুষ তার ইচ্ছা অনুসারে নির্বাচন করে।[৪০]

www.amarboi.org

আরব্য দর্শন পরবর্তীকালে অন্য ক্রোড়ে লালিত হয়েছিল—এ প্রথমে মদিনার চিন্তাগোষ্ঠী থেকে শক্তি আহরণ করেছিল। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা তার প্রজ্ঞার ব্যবহারের উপর প্রতিষ্ঠিত—এই মতবাদ হযরতের শিক্ষায় উদ্ভাসিত হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে উদ্ভাসিত হয়েছিল বিশ্বনিয়ন্তা সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী আল্লাহর প্রতি ঐকান্তিক ইচ্ছা। হযরত আলীর বাণীসমূহের মধ্যে এই বাণী সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছিল এবং দার্শনিক মতবাদে উন্নীত হয়েছিল। মদিনা থেকে এই দর্শন দামেস্ক, কুফা, বসরা ও বাগদাদে নীত হয়েছিল। বাগদাদে এই দর্শন উদার মতাবলম্বী চিন্তাগোষ্ঠীর জন্ম দিয়েছিল এবং প্রাথমিক আব্বাসীয় খালিফাদের শাসনামলকে গৌরবোজ্জ্বল করে তুলেছিল।

কারবালার নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও মদিনার লুণ্ঠনের ফলে ইমামদের ভাষণ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। মুহম্মদের বংশধরদের প্রধান হিসেবে জাফর আস্ সাদিকের আবির্ভাবের ফলে এই ব্যবস্থা আবার পুনরুজ্জীবিত হয়। আত্যন্তিকভাবে উদারপন্থী ও বুদ্ধিবাদী—পণ্ডিত, কবি ও দার্শনিক, কতকগুলি বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন, কৃষ্টিসম্পন্ন খ্রিস্টান, ইহুদী ও জরথুস্ত্রবাদীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগযুক্ত, যাদের সঙ্গে প্রায়ই দার্শনিক বিতর্কে লিপ্ত, এই মনীষী মদিনার চিন্তা গোষ্ঠীর ওপর বিশিষ্ট দার্শনিক বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত করেছিলেন। অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে তাঁর কতিপয় মতামত উল্লেখযোগ্য। 'জবর' (অদৃষ্টবাদ) মতবাদ এ সময়ে দামেস্কে প্রচলিত হয়ে পড়েছিল সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি নিম্নবর্ণিত মতবাদ উপস্থাপিত করেন : "যারা 'জবর' মতবাদ পোষণ করেন তারা তাদের প্রত্যেকটি পাপ কাজে আল্লাহকে অংশগ্রহনকারী বলে মনে করেন এবং তাদের অন্তরের তাগিদে যে পাপ করেন তার শাস্তি বিধান করার জন্য তাঁকে অত্যাচারী শাসকে পরিণত করেন, এটা কুফরি বা ধর্মদ্রোহিতার সামিল।" অতঃপর (সেই ভৃত্যের উপমা দিয়ে যাকে তার প্রভু কেন দ্রব্য ক্রয় করতে বাজারে পাঠিয়েছিলেন যে দ্রব্য ক্রয় করার পয়সা তার কাছে ছিল না এবং তিনি ভাল করেই জানতেন যে সে দ্রব্যটি আনতে পারবে না তথাপি তিনি তাকে শাস্তি দেন) ইমাম আরও বলেন, "জবর' মতবাদ আল্লাহকে অবিবেচক প্রভুতে পরিণত করে।"[৪১] এর বিপরীত মতবাদ অবাধ স্বাধীনতা মতবাদ (তাফীয)—মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা না বুঝিয়ে ন্যায় ও অন্যায়ের নির্বাচন সম্পর্কে শর্তবিহীন স্বেচ্ছাচারিতা নির্দেশক মতবাদ সম্পর্কে তিনি ঘোষণা করেন যে এ ধরনের নীতিকে স্বীকার করলে নৈতিকতার সমগ্র ভিত্তি ধ্বসে পড়ে। এই ধরনের মানুষের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে তাকে অবাধ স্বেচ্ছাচারিতা প্রদান করে; কেননা যদি প্রত্যেক ব্যক্তি ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণের স্বেচ্ছাচারিতা প্রাপ্ত হয় তাহলে কোন নিয়ন্ত্রণ, কোন আইনের কার্যকারিতা থাকে না—তা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।[৪২] সুতরাং 'এখতিয়ার' 'তাফীয' থেকে পৃথক। "আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে তাঁর নির্দেশাবলী অনুধাবনের ও তদনুযায়ী কাজ করার শক্তি দান করেছেন। যাঁরা বিশুদ্ধভাবে ও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে জীবন নির্বাহের চেষ্টা করে তিনি তাঁদেরকে সাহায্য করেন : তাঁরাই তাঁদের প্রভুকে পরিতুস্ট করেছে; আর যারা তাঁর অবাধ্য তারাই হল

www.amarboi.org

পাপী—অপরাধী।" অষ্টম ইমাম আর রিজা এই মতবাদসমূহ পুনঃ পুনঃ জোরালো ভাষায় পুনরুল্লেখ করেছেন—তিনি 'জবর' মতবাদ (অদৃষ্ট বাদ ও তাশ্‌বিহ্ (প্রকৃতির কোন বস্তুতে আল্লাহত্ব আরোপ) মতবাদ সম্পূর্ণরূপে ধর্মদ্রোহিতা[৪৩] বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এইসব মতবাদের পরিপোষকদেরকে তিনি "ইসলামের শত্রু" বলে ঘোষণা করেছেন, তিনি 'জবর' ও তাশবিহ্' মতবাদের সমর্থকদেরকে প্রকাশ্য হাদীস জালের অভিযোগ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি তাঁর শিষ্যদের 'তাফীয' মতবাদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় নীতি নির্ধারণ করেছেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে দুটি পথের নির্দেশ করেছেন, একটি পথ তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যায়, অন্য পথটি তোমাকে তাঁর পরিপূর্ণতা থেকে দূরে বহুদূরে নিয়ে যায়, এখন যে-কোন পথ অবলম্বন করা তোমার ইচ্ছাধীন। কষ্ট বা আনন্দ, পুরস্কার বা শাস্তি তোমার নিজের আচরণের উপর নির্ভর করবে, কিন্তু মন্দকে ভাল, কিংবা পাপকে পুণ্যে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা মানুষের নেই।"

উমাইয়াদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করা সত্ত্বেও মনের দিক দিয়ে পৌত্তলিক রয়ে গিয়েছিল। পূর্বপুরুষদের মতো তারাও ছিল অদৃষ্টবাদী। তাদের অধীনে এমন একটি চিন্তাগোষ্ঠী জন্ম নিল যা প্রাচীনদের, 'সালাফ' গোষ্ঠীর—একদল আদিম মুসলমানদের কাছ থেকে তাদের মতবাদ গ্রহণ করেছিল। এই গোষ্ঠীর লোকেরা সকলেই মৃত্যুবরণ করেছিল; ফলে যে কোন ঐতিহ্য রচনা করা তাদের যে কোন জনের নামে চালিয়ে দেওয়া সহজ হয়েছিল। জাহম বিন সাফওয়ান এই চিন্তা সম্প্রদায়—'জাবারিয়া' গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। জাবারিয়াগন[৪৪] মানুষের স্বাধীনতার পরিপূর্ণ অস্বীকৃতির ক্ষেত্রে ক্যালভিনদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাদের মতে মানুষ তাদের কোন কাজের জন্য দায়ী নয় কেননা এসব কাজ আল্লাহর কাছ থেকে আসে। তার কোন কাজ করার নিয়ামক শক্তি নেই; তার ইচ্ছার স্বাধীনতাও নেই; সে আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন, তার কোন শক্তি নেই, ইচ্ছা নেই, কোন কিছু মনোনয়নেরও ক্ষমতা নেই; আর আল্লাহ্ সম্পূর্ণরূপে তার মধ্যে কাজ সৃষ্টি করেন যেমন তিনি নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে সৃষ্টি করেন। ... আর পুরস্কার ও শাস্তি আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার অধীন।" জাবারিয়াগন ঐশী গুণাবলী সম্পর্কে কতিপয় ধারণা পোষণ করতেন কিন্তু সেগুলির কোন বিশেষ তাৎপর্য নেই।[৪৫] শাহরিস্তানীর মতে, জাবারিয়াগণ তিনটি উপদলে বিভক্ত ছিল : জাহমিয়া, নাজ্জারিয়াও জিরারিয়া। তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল গৌণ বিষয়ে কিন্তু অদৃষ্টবাদ সম্পর্কে তারা একমত ছিলেন যে মানুষের কোন স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি নেই। নাজ্জারিয়াগণ অনেক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে গিয়েছিলেন এবং দু' শতাব্দী পর আশারিয়া সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। আশারিয়াদের মতে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট জীবের ভার ও মন্দ, পুণ্যময় ও পাপময় আচরণ সৃষ্টি করেন, আর মানুষ তার অধিকারী হয়। উমাইয়া শাসকগণ জাবারিয়া মতবাদের আনুকূল্য লাভ করেছিল এবং জনগণের মধ্যে তা বিস্তার লাভ করেছিল।

www.amarboi.org

জাবারিয়াদের আপোষহীন অদৃষ্টবাদ চিন্তাশীল শ্রেণীসমূহের মধ্যে বিপ্লব আনয়ন করেছিল। এই বিপ্লবের নের্তৃত্ব দিয়েছিলেন মা'বাদ আল্ জুহানী, ইউনুস আল্ আসওয়ারী ও ঘায়লান দামেস্কী, তাঁরা স্পষ্টতঃ অনেক ধারণাই ফাতেমীয়দের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। তাঁরা উমাইয়াদের রাজধানী, অদৃষ্টবাদের ঘাঁটিতেই মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা সম্পর্কে জোর বিবৃতি দিয়েছিলেন।[৪৬] কিন্তু মানুষের স্বাধীনতার স্বীকৃতির ক্ষেত্রে তারা কোন কোন সময় 'তাশ্বীয' মতবাদের সঙ্গে সব গুলিয়ে ফেলেছিলেন। দামেস্ক থেকে বিরোধ বসরাতে পৌছেছিল এবং সেখানে দু'দলের বিরোধ চরমে উঠেছিল। 'জাবারিয়া' গোষ্ঠী নতুন একটি সম্প্রদায় 'সেফাতিয়া'দের[৪৭] সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। সেফাতিয়ারা অদৃষ্টবাদের সাথে আল্লাহতে কতিপয় গুণাবলী সমন্বিত করেছিলেন, যে গুণাবলী তাঁর অস্তিত্ব থেকে পৃথক—এগুলি জাবারিয়াগন অস্বীকার করত। সেফাতিয়াগন নিজেদেরকে 'সালাফিয়া'দের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলে দাবী করতেন। শাহ্‌রিস্তানীর মতে 'সালাফা'দের এই অনুসারিগণ সমর্থন করত যে, কতিপয় চিরন্তন গুণাবলী আল্লাহর রয়েছে; যেমন; জ্ঞান, শক্তি, জীবন, ইচ্ছা, শ্রবণ, দর্শন, বাকশক্তি, মহিমা, মহানুভবতা, দয়া, দানশীলতা, গৌরব ও মহত্ত্ব—সত্তার গুণাবলী ও ক্রিয়ার গুণাবলীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ... তারা কতিপয় বর্ণনামূলক গুণ (সেফাতো খবরিয়া) ও স্বীকার করবেন, দৃষ্টান্তস্বরূপ, হাত ও মুখমণ্ডল—এসব গুণ আল্লাহর 'অবতরিত; প্রতিবেদনের অন্তর্ভূক্ত বলে তারা অন্য কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন না এবং তদনুযায়ী, তারা এসবের নাম দিয়েছেন বর্ণনামূলক গুণাবলী।" জাবারিয়াদের মতো তারা সমুদয় আচ্ছন্নতা ও তীব্রতা সহকারে অদৃষ্টবাদের সমর্থন করতেন 'সেফাতিয়া'দের থেকে 'মুশাব্বিহা' সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।" তারা ঐশী গুণাবলীকে সৃষ্ট জীবের গুণাবলীর সঙ্গে তুলনা করতেন"[৪৮] এবং আল্লাহকে তাদের নিজেদের সদৃশ বলে পরিগণিত করতেন।[৪৯] এই যুগে অদৃষ্টবাদ সম্প্রদায়ের বিরোধীদলের অন্যতম বিখ্যাত অধ্যাপক ছিলেন ইমাম হাসান (যিনি তাঁর বাসস্থানের জন্য) উপনাম পেয়েছিলেন আল্‌বসরী। তিনি জন্মসূত্রে মাদানী ও "হযরতের বংশের দার্শনিকদের" কাছ থেকেই তিনি জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। তিনি তাঁদের উদারপন্থী ও বুদ্ধিবাদী ধারণার অধিকারী হয়েছিলেন। বসরায় বসতি স্থাপনের পর তিনি বক্তৃতা করার জন্য কক্ষের বন্দোবস্ত করেছিলেন—ইরাকের বহু শিক্ষার্থী সেখানে সমবেত হত। তিনি তাঁর ওস্তাদদের মতো মুক্ত মন নিয়ে সে যুগের দার্শনিক প্রশ্নাবলীর উপর ভাষণ দান করতেন।

তাঁর অন্যতম প্রখ্যাত শিষ্য ছিলেন আবু হুজায়ফা ওয়াসিল বিন আতা আল্ গাজ্জাল।[৫০] তিনি প্রভূত মানসিক শক্তির অধিকারী ছিলেন, বিজ্ঞান ও হাদিসে ছিল তাঁর অসাধারণ জ্ঞান। তিনি মদিনার ভাষন কক্ষেও পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। একটি ধর্মীয় মতবাদের প্রশ্নে ইমামের সঙ্গে তাঁর মত পার্থক্য ঘটেছিল এবং তিনি কক্ষ থেকে বের হতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে তিনি তাঁর নিজের চিন্তাগোষ্ঠী গড়ে তুলেছিলেন। এই ঘটনার জন্য তাঁর শিষ্যগণ 'মুতাজিলা' বা 'আহলে ইতিজালা'- বন্দোবস্ত পরিত্যাগকারী

www.amarboi.org

দল নামে অভিহিত।[৫১] তিনিও তাঁর ওস্তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠলেন এবং অধিক দিন যেতে যেতে উভয় চিন্তাগোষ্ঠী এক সঙ্গে মিশে গেল। বুদ্ধিবৃত্তিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর বিরোধিতায় তিনি অনেক সময় পরিমিতির সীমা অতিক্রম করে যেতেন এবং মোয়াবিয়া যে বিতর্ক তুলতেন তাতে তিনি মতামত পেশ করতেন, আর এই বিতর্কমূলক মত মদিনার মনীষীদের চিন্তার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ ছিল। তথাপি ওয়াসিল বিন আতার চিন্তাগোষ্ঠীর সাধারণ বুদ্ধিবাদ তাঁর পাশে শক্তিশালী ও সর্বাপেক্ষা উদার চিন্তাবিদদের সমবেত করেছিল। ফাতেমীয় দার্শনিকদের পথানুসরণ করে, তাদের প্রণীত মূলনীতি ও ধারণাকে আত্মসাৎ করে তিনি এমন সব মতবাদ প্রণয়ন করেছিলেন যা, অদৃষ্টবাদীদের ও মযহাব পন্থীদের সঙ্গে তাঁর চিন্তার পার্থক্য নির্দেশ করে। বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে তদীয় সম্প্রদায় মানুষের প্রজ্ঞার ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছিল এবং এ সময়ে যে সব গুণী শাসক রাজ্যের শাসনভার চালিয়েছিলেন তাদের সহায়তায় আরবজাতির মধ্যে জাতীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে এ মতবাদ এমন গতিবেগ সঞ্চার করেছিল যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। বিশিষ্ট পণ্ডিত, বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী, গাণিতিক, ঐতিহাসিক—বাস্তবিক খলিফাসহ সমগ্র মনীষার জগৎ মুতাজিলা চিন্তাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৫২]

আবুল হুজাইল হামদান,[৫৩] ইব্রাহিম ইব্নে সাইয়ার আন্ নাজ্জাম্[৫৪] আহমদ ইবনে হাইত, ফজল আল্ হাদাসী এবং আবু আলী মুহম্মদ আল্ জুব্বাইয়ের[৫৫] মতো গ্রীক দর্শন ও যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিরা মদনী ধারণাসমূহের সঙ্গে উক্ত উৎস থেকে আহৃত বহু ধারণা মিশ্রিত করেছিলেন এবং মুসলমানদের দার্শনিক চিন্তার সাথে অভিনবত্ব সংযোজিত করেছিলেন। এ্যারিষ্টটল, পরফিরি, ও অন্যান্য গ্রীক ও আলেকজান্দ্রিয় চিন্তাবিদদের পঠনপাঠনের ফলে মুতাজিলাদের মধ্যে নতুন এক ধরনের বিজ্ঞান জন্ম নিয়েছিল, যার নাম 'ইল্মুল কালাম' বা প্রজ্ঞার বিজ্ঞান। এই প্রজ্ঞা বা লগস[৫৬] বিজ্ঞানের সাহায্যে ধর্মের বাইরের ও ভেতরের শত্রুদের সাথে মোকাবিলা করেছিলেন—অমুসলিমরা বাইরে থেকে ইসলামকে আক্রমণ করেছিল এবং মযহাবপন্থীরা ভেতর থেকে তার অবক্ষয়ের লক্ষ্যে কাজ করছিল। রাজনৈতিক প্রশ্নে ওয়াসিলের চরম মতবাদ যা আলীর খিলাফতকেও বিচলিত করেছিল তা বহু পূর্বেই প্রত্যাহৃত হয়েছিল। ফলে মোলায়েমপন্থী মুতাজিলা মতবাদ ফাতেমীয় গোষ্ঠীর বুদ্ধিবাদের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়েছিল। এটা সুবিদিত ব্যাপার যে মুতাজিলা গোষ্ঠীর প্রধান পণ্ডিতগণ ফাতেমীয়দের অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন এবং এ বিষয়ে আদৌ কোন সন্দেহ নেই যে মোলায়েমপন্থী মুতাজিলা মতবাদ খলিফা হযরত আলীর এবং তদীয় প্রাথমিক পর্যায়ের উদারপন্থী বংশধরদেরই মতবাদ, সম্ভবতঃ মুহম্মদ (দঃ)-এরও। মুতাজিলাদের মতবাদসমূহের সতর্ক সমীক্ষা করলে দেখা যাবে যে সেগুলি অক্ষরে অক্ষরে প্রাথমিক পর্যায়ের ফাতেমীয়দের শিক্ষার অনুরূপ অথবা প্রগতিশীল সমাজের প্রয়োজন-উদ্দীপিত মতবাদসমূহের রূপান্তর এবং সম্ভবতঃ অংশত গ্রীক ও আলেকজান্দ্রিয় দর্শনের ফলশ্রুতি।

খলিফা আলী জোরালো ভাসায় আল্লাহর প্রতি আরোপিত সর্ববিধ সদৃশবাদী ও সদৃশমর্মী ধারণার নিন্দা করেছেন।" আল্লাহ কোন বস্তুর সদৃশ নন যে মনুষ্য-মন তাঁকে

www.amarboi.org

অনুধাবন করতে পারে; মানুষের প্রত্যক্ষণ লব্ধ কোন জড়বস্তুর গুণ তাঁর প্রতি আরোপিত হতে পারে না। ধর্মের পরিপূর্ণতা আল্লাহকে জানার মধ্যে নিহিত রয়েছে; জ্ঞানের পরিপূর্ণতা রয়েছে আল্লাহর সত্যতার স্বীকৃতির মধ্যে; আর সত্যতার পরিপূর্ণতা পূর্ণ ঐকান্তিকতায় তাঁর একত্বের স্বীকৃতিতে; ঐকান্তিকতার পরিপূর্ণতা হল আল্লাহর প্রতি সমুদয় গুণের অস্বীকৃতি। ... যে আল্লাহর প্রতি একটি গুণ আরোপ করে এবং যে সেই গুণকে আল্লাহ বলে মনে করে সে তাঁকে দুই খোদা এক খোদার দু' অংশ বলে মনে করে।...সে জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ কোথায় আছেন সে আল্লাহকে কোন বস্তুর সঙ্গে এক করে দেখে। আল্লাহ স্রষ্টা এজন্য নয় যে তিনি সৃষ্ট হয়েছেন; আল্লাহ অস্তিত্বশীল, এজন্য নয় যে তিনি অনস্তিত্বশীল। তিনি প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে আছেন, সেটা সাদৃশ্য বা নিকটবর্তিতার দিক নিয়ে নয়। তিনি সবকিছুর বাইরে বিচ্ছিন্নতার জন্য নয়। তিনি প্রাথমিক কারণ, গতি বা ক্রিয়ার অর্থে নয়; তিনি দ্রষ্টা, কিন্তু কোন দর্শনেন্দ্রিয় তাঁকে সন্দর্শন করতে পারে না। স্থান, কাল বা পরিমাণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই।[৫৭]...তিনি সর্বজ্ঞাতা কেননা জ্ঞানই তাঁর সত্তা; তিনি মহাশক্তিশান, কেননা শক্তি তাঁর সত্তা, তিনি প্রেমময়, কেননা প্রেম তাঁর সত্তা ...এজন্য নয় যে এই গুণগুলি তাঁর সত্তা থেকে পৃথক।... দেশ-কালের শর্তাবলী তাঁর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অপ্রযোজ্য।"[৫৮] 'সালাফ' গোষ্ঠীর চিন্তাবিদেরা 'তকদির' বলতে পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য বোঝান—এই ভাগ্য "ওজন", "পরীক্ষা", "বিচার" বুঝায়।

আসুন এখন আমরা দেখি মুতাজিলা মতবাদ বলতে কি বোঝায় অনেক গৌণ ও অপ্রধান বিষয়ে বিখ্যাত মুতাজিলা চিন্তাবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু আমি এখানে সেই সব মতবাদ সম্পর্কে উল্লেখ করব যে বিষয়ে তারা একমত। শাহরিস্তানীর মতে মুতাজিলা চিন্তাবিদরা[৫৯] ঘোষণা করেন যে "নিত্যতা ঐশী সত্তার বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক গুণ; আল্লাহ। চিরন্তন, কেননা চিরন্তনত্ব তাঁর সত্তার বিশেষ গুণ; তারা সর্বসম্মতভাবে চিরন্তন ঐশী গুণাবলী (তাঁর সত্তা থেকে পৃথক) অস্বীকার করেন এবং তারা যুক্তি দেন যে তিনি তাঁর সত্তার দিক দিয়ে সর্বদর্শী, চিরঞ্জীব ও সর্বশক্তিমান,—কিন্তু তাঁর মধ্যে চিরন্তন গুণাবলী হিসেবে অবস্থিত জ্ঞান, শক্তি বা জীবনের মাধ্যমে নয়; কেননা জ্ঞান, শক্তি ও জীবন তাঁর সত্তার অংশ। অন্যথায়, যদি এগুলিকে (তাঁর সত্তা থেকে পৃথক) চিরন্তন গুণাবলী হিসেবে বিবেচনা করা হয় তবে তা চিরন্তন সত্তার বহুত্বের স্বীকৃতির পর্যায়ে উপনীত হয়।...তারা আরও যুক্তি দেখান যে আল্লাহর বাণী সৃষ্ট; যখন সৃষ্ট হয় তখন তা অক্ষর ও শব্দে প্রকাশিত হয়। ... অনুরূপভাবে তারা সর্বসম্মতিক্রমে অস্বীকার করেন যে ইচ্ছা, শ্রবণ ও দর্শন হল ধারণা যা ঐশী সত্তার মধ্যে বিদ্যমান, যদিও তাদের অস্তিত্বের পদ্ধতি ও তাদের দার্শনিক ভিত্তির দিক দিয়ে পৃথক হয়।"[৬০] তারা সর্বসম্মতভাবে অস্বীকার করেন যে, "দারুল কারারে" (শান্তির নিলয়ে/বেহেশতে) আল্লাহর চাক্ষুষ দর্শন ঘটতে পারে। তারা পার্থিব বস্তুর গুণের সাহায্যে আল্লাহর বর্ণনা দেওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, সেটা উপদেশে বা স্থান-নির্দেশ বা অবভাস বা দেহ বা

www.amarboi.org

পরিবর্তন বা নিষ্ক্রিয়তা বা কিয়ামত—যাই হোক না কেন আর কোরআনের যে সব আয়াতে এ ধরনের গুণাবলীর বর্ণনা রয়েছে, তারা মনে করেন, সেগুলি রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে—আক্ষরিক অর্থে নয়। এই মতবাদকে তারা 'তৌহীদ'—'ঐশী একত্বের স্বীকৃতি' বলে অভিহিত করেন। ... তারা এই বিশ্বাসে একমত যে, মানুষ ভাল বা মন্দ সব কাজের কর্তা, এবং পরকালে তার কাজের দোষ-গুণের জন্য পুরস্কার বা শাস্তি লাভ করে; নৈতিক অনিষ্ট, অবিচার, বিশ্বাসহীনতা, অবাধ্যতা আল্লাহর প্রতি নির্দেশিত হতে পারে না, কারণ যদি তিনি জুলুম বা অত্যাচার সৃষ্টি করতেন তবে তিনি অত্যাচারী বা জুলুমকারীতে পরিণত হতেন। ... তারা সর্বসম্মতভাবে সমর্থন করেন যে সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ্ শুধু তাই করেন যা হিতকর ও মঙ্গলজনক, জ্ঞানলোকে যা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর সেটাই তাঁর ওপর ন্যস্ত, যদিও তারা সর্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিতকরণে ও করুণা বর্ষণে আল্লাহর সত্তা কিভাবে বাধ্যবাধকতা অনুভব করেন যে বিষয়ে একমত নন।

অধিকন্তু তারা মত পোষণ করেন যে মানুষের কার্যকলাপ সম্পর্কে কোন চিরন্তন নিয়ম নেই; যে ঐশী অধ্যাদেশসমূহ মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে তা বিকাশের পরিণতি। আল্লাহ আইনের মাধ্যমে বিধিনিষেধ জারি করেন এবং তা ক্রমশ পরিণতি লাভ করে। একই সময়ে তারা বলেন যে সৎ কাজ করে সে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়, আর যে মন্দ কাজ করে সে শাস্তি পায় এবং তাদের মতে এটা প্রজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মুতাজিলাগণ বলেন যে, সমুদয় জ্ঞান প্রজ্ঞার মাধ্যমে অর্জিত হয় এবং অবশ্যই যেসভাবে অর্জিত হতে হবে। তারা আরও বলেন যে ভাল-মন্দের জ্ঞানও প্রজ্ঞার এলাকাভুক্ত প্রজ্ঞার আলোক নিপাতিত হওয়ার পূর্বে ভাল মন্দের পার্থক্য আমাদের নিকট অপরিজ্ঞাত থেকে যায়। সর্বপ্রদাতার করুণার জন্য কৃতজ্ঞতাবোধ প্রজ্ঞাই বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করে থাকে, এমন কি সে বিষয়ে কোন আইন প্রণীত হওয়ার পূর্বেও। তারা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, আল্লাহ সম্পর্কিত জ্ঞান প্রজ্ঞার আওতাভুক্ত এবং আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই পরিবর্তনের অধীন অথবা বিনাশের অধীন। "তাঁরা উল্লেখ করেন যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তার প্রেরিত পুরুষকে পাঠিয়েছেন মানুষের কাছে তাঁর নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করার জন্য। ...তারা ইমামত প্রশ্নে মতদ্বৈধতা দেখান; কেউ কেউ মনে করেন ইমাম নিযুক্তিক্রমে পরম্পরাগত হবেন, আবার কেউ কেউ মনে করেন যে জনগণের ইমাম নির্বাচনের অধিকার রয়েছে।" কাজেই মুতাজিলারা 'সিফাতিয়া'দের সাক্ষাৎ বিপরীতধর্মী, "কেননা এরাও অন্যান্য 'আহলে সুন্নাত'দের মতে, আল্লাহ্ যা খুশি তাই করতে পারেন। কারণ তিনি বিশ্বজগতের সার্বভৌম নিয়ন্তা। তিনি যা ইচ্ছা করেন, আদেশ করেন. এটাই তাদের কাছে ন্যায়বিচার। 'আহলুল ইতাজালা'দের মতে যা শুধু প্রজ্ঞা ও বুদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাই 'আদল' বা ন্যায়বিচার, আর যা (মানবজাতির) কল্যাণ ও সমৃদ্ধির জন্য (বা সেই মোতাবেক হয়)। 'আহলুল আদল বলেন যে, আল্লাহ সৃষ্ট শব্দাবলীর মাধ্যমে আদেশ ও নিষেধ জারি করেছেন। 'আহলুস্ সুন্নাত' (সিফাতিয়াদের) মতে, শ্রুতি থেকেই জ্ঞান বিষয়ই অবশ্য পালনীয়। কেবল (পার্থিব) জ্ঞান প্রজ্ঞার মাধ্যমে অর্জিত হয়। প্রজ্ঞা বলতে

www.amarboi.org

পারে না কোন্‌টা ভাল বা কোন্‌টা মন্দ কিংবা কোনটা অবশ্য পালনীয়। পক্ষান্তরে, 'আহ্‌লুল আদল' বলেন সব জ্ঞানই প্রজ্ঞার মাধ্যমে আসে।[৬১] তারা এতিহ্যবাহী 'অদৃষ্টবাদ' বলতে বিচার ও নিষ্কৃতি, বিপদ ও সমৃদ্ধি রোগ ও স্বাস্থ্য, মৃত্যু ও জীবন, এবং নৈতিক কল্যাণ ও অকল্যাণ, পাপ ও পূণ্য ব্যতিরেকে আল্লাহর অন্যান্য কার্যকলাপ যা মানুষকে পরবর্তী কাজের জন্য দায়ী করে,—সে সব উল্লেখ করেছেন। এই অর্থে সমগ্র মুতাজিলা সম্প্রদায় পদটিকে ব্যবহার করেন।"

এ পর্যন্ত মুতাজিলা সম্প্রদায়ের মতবাদগুলি সাধারণভাবে আলোচনা করেছি; কিন্তু মুতাজিলা সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের এমন কিছু মতবাদ রয়েছে যা তাদের অব্যবহিত শিষ্যদের বাইরে স্বীকৃতিলাভ না করলে সেগুলি উল্লেখ দাবী রাখে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে আবুল হুজায়েল হামদান উল্লেখ করেন যে স্রষ্টা তাঁর জ্ঞানের বলে জানেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান হল তাঁর সত্তা; তিনি ক্ষমতাবলী, কিন্তু তাঁর ক্ষমতা হল তাঁর সত্তা; তিনি জীবনের বলেই জীবন্ত, কিন্তু তাঁর জীবন হল তাঁর সত্তা। শাহ্‌রিস্তানী বলেন, "মতবাদটি দার্শনিকদের থেকে গৃহীত", আসলে মতবাদটি মদনী চিন্তাগোষ্ঠীর থেকেই নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও স্বীকার করেন যে ইচ্ছার স্বাধীনতা একটি অবান্তর লক্ষণ, বিকাশ ও গভীরতার পরিপূর্ণতার অতিরিক্ত। ইবরাহিম ইবনে সাইয়ার আস্ নাজ্জাম,— "দার্শনিকদের গ্রন্থের একজন কুশলী শ্রমশীল ছাত্র", উল্লেখ করেন যে "মানুষ ঐশী জ্ঞান ব্যতিরেকেই চিন্তার মাধ্যমে স্রষ্টার স্বীকৃতিতে উপনীত হতে পারে এবং পাপ-পূন্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে পারে ...আর ন্যায়পরায়ণ আল্লাহর অন্যায় করার ক্ষমতা নেই।" মুয়াম্মার ইবনে আব্বাদ আস্ সুলামি প্লেটোর "মূল নমুনা" তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, অবান্তর লক্ষণ বস্তুর কতিপয় প্রজাতির মধ্যে চিরস্থায়ী, আর প্রত্যেকটি অবান্তর ব্যক্তির মধ্যে অবস্থান করে, যদিও এর স্থায়িত্ব (মনুষ্য-মনের) কোন ধারণার বলেই হয়ে থাকে। মুয়াম্মার ও তাঁর অনুসারিবৃন্দ এই মতবাদের জন্য ভাববাদী বলে অভিহিত। আবু আলী মুহম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব, যিনি আবু আলী জুব্বাই বলে পরিচিত, উল্লেখ করেন যে ক্রিয়া উৎপত্তি ও প্রথম উৎপাদন মানুষের অধিকারে এবং মানুষের প্রতি ভালমন্দ, বাধ্যতা-অবাধ্যতা আরোপিত হয়। আর ইচ্ছার স্বাধীনতা কর্মের পূর্ব-শর্ত এবং দৈহিক পূর্ণতা ও গভীরতার বাড়তি শক্তি। ইমামুল হারামায়েন, আবুল মা'আলী আল্ জুয়াইনী যদিও নিজেকে মুতাজিলা বলে অভিহিত করেননি, তবে বিপরীত পন্থীরা তাঁকে মুতাজিলাদেরই অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি অভিমত পোষণ করেন যে ক্ষমতা ও ইচ্ছার স্বাধীনতার অস্বীকৃতি এমন একটি বিষয় প্রজ্ঞা ও চেতনা অস্বীকার করে; কোন উপকার ছাড়া কোন ক্ষমতার স্বীকৃতি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতার অস্বীকৃতির সামিল। আর (শক্তির) কোন দুর্বোধ্য প্রভাব যা ' চালিকা শক্তি' গঠন করে তা যে কোন বিশেষ প্রভাবের অস্বীকৃতির পর্যায়ে পড়ে। যতদূর শর্ত ও অবস্থা তাদের নীতি অনুযায়ী অস্তিত্বশীল বা অনস্তিত্বশীল বলে বিশেষিত হতে পারে না (কিন্তু তাদের উৎপত্তির প্রেক্ষিতে অবশ্যই ব্যাখ্যা হবে)। মানুষের ক্ষেত্রে কর্ম (অস্তিত্বশীল অবস্থা

www.amarboi.org

হিসাবে) তার শক্তির প্রতিই আরোপিত হতে পারে—যদিও উৎপত্তি ও উৎপাদনের দিক দিয়ে নয়, কেননা পূর্বে অস্তিত্বশীল ছিল না এমন কোন কিছু সার্বভৌম ক্ষমতা দ্বারা অস্তিত্বে রূপ পরিগ্রহ করা; সে কর্ম তার অস্তিত্বের জন্য (মানুষের) মধ্যে অবস্থিত শক্তির উপর নির্ভরশীল যা আবার তার অস্তিত্বের জন্য অন্য কোন কারনের উপর নির্ভরশীল; এর সঙ্গে ঐ কারণের সম্পর্ক (মানুষের) শক্তির সঙ্গে তার কাজের সম্পর্কের সঙ্গে অভিন্ন। কাজেই একটি কারণ অপর একটি কারণের উপর নির্ভরশীল, এবং এভাবেই তা আদিকারণে গিয়ে শেষ হয়—এভাবে কারণসমূহ ও তাদের কার্যপ্রক্রিয়ার স্রষ্টা, নিরপেক্ষ স্বয়ংসম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্তায় পৌছে। শাহরিস্তানী আরও বলেন, "এই মতবাদ মা'আলী খোদাবাদী দার্শনিকদের কাছ থেকে আহরণ করেছিলেন, তবে যুক্তিবিজ্ঞান কালামের মাধ্যমে তা উপস্থিত করেছিলেন।"[৬২]

এ হল মুতাজিলা চিন্তাবিদদের ধারণাসমূহের সাধারণ রূপরেখা কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা সম্পর্কে যা প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক দেশে মানুষের মনকে আন্দোলিত করেছে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে প্রায়ই রক্তক্ষয়ী ও ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছে।

সমুদয় সদৃশ্যবাদমুক্ত ঐশী একত্বের ঘোষক ও নৈতিক দায়িত্ববোধের প্রবক্তা হিসেবে মুতাজিলাগণ স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের "আহ্সাবুল আদল ওয়াত্ তৌহীদ"—'ঐশী একত্বের ও ন্যায়পরায়ণতার সমর্থক' অভিহিত করেছিলেন এবং তাদের বিরোধী চিন্তাবিদদেরকে "মুশাব্বিহাস"—সদৃশ্যবাদী হিসেবে নামাঙ্কিত করেছিল। তারা যুক্তি প্রদর্শন করেছিল : যদি পাপ আল্লাহর থেকে আসে এবং আল্লাহর দ্বারা সৃষ্ট হয়, এবং মানুষ তা করার জন্য পূর্বনির্ধারিত হয়, তবে তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি প্রদান স্রষ্টাকে অত্যাচারী আল্লাহতে পরিণত করে—এটা হল ধর্মদ্রোহিতা; কাজেই প্রজ্ঞা ও প্রত্যাদেশ উভয়ই ঘোষণা করে যে ধর্মনিষ্ঠা ও পাপ, সদাচার ও অসদাচার, ভল ও মন্দ মনুষ্য-ইচ্ছার ফল; যদি মানুষকে বলা হয়েছে ভাল ও মন্দ কি, তথাপি তার ক্রিয়াবলীর উপর তার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ভাল ও মন্দ নির্ভর করে যা উচিত তার উপর; কেননা আল্লাহর সৃষ্টি ন্যায়রায়ণতার দ্বারা শাসিত। প্রজ্ঞা ও ন্যায়পরায়ণতা মনুষ্য-ক্রিয়াসমূহের নিয়ামক নীতি আর সাধারণভাবে মানবজাতির শান্তির হিতকারিতা ও অগ্রগতির—ন্যায়-অন্যায়ের প্রধান মানদণ্ড। আল্লাহ কি ঘোষণা করেননি যে "মানবজাতির কল্যাণের জন্য তিনি কি দুটি পথ দেখান নি? তিনি কি তাদেরকে তাদের বুদ্ধি প্রয়োগ করতে আদেশ দেননি?" বুদ্ধিবাদী ও উপযোগবাদীরা সদর্থক প্রত্যাদেশের সঙ্গে প্রজ্ঞার সামঞ্জস্য বিধানের ওপর নৈতিক নিয়মের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তারা হযরত ও তাঁর সাক্ষাৎ বংশধরদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অগ্রসর হয়েছিলেন। নিরবচ্ছিন্ন বিকাশ প্রক্রিয়ার পরিণতি ও ফলাফল হিসেবে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের নির্দেশক প্রত্যেক আইনের ক্ষেত্রে তারা বিবর্তনবাদ সমর্থন করেছিলেন। এইজগতে মানুষের সুদীর্ঘ প্রাচীনত্ব[৬৩] সম্পর্কে তাদের ধারণায় আধুনিক জগতের প্রাকৃতিক দার্শনিকদের প্রেক্ষিতে তারা সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে অবস্থান করে।

www.amarboi.org

মুতাজিলা মতবাদ সাম্রাজ্যের প্রত্যেক জায়গার চিন্তাশীল ও সংস্কৃতিমনা লোকদের মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। স্পেনে যখন এই মতবাদ স্থান করে নিয়েছিল তখন আন্দালুসিয়ার সকল কলেজ ও একাডেমী তার করতলগত হয়েছিল। মনসুর ও তার অব্যবহিত উত্তারাধিকারীগণ বুদ্ধিবাদ উৎসাহিত করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা মুতাজিলা মতবাদকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেননি। এশিয়ার "মহান" নৃপতি, মামুন মুতাজিলা সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন; আর তিনি ও তদীয় ভ্রাতা মুতাসিম এবং ভাগ্নে ওয়াসেক সমগ্র মুসলিম জাহানে বুদ্ধিবাদী চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস নিয়েছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বে বুদ্ধিবাদী চিন্তাধারা এমন গুরুত্ব অর্জন করেছিল যে আধুনিক ইউরোপও সম্ভবতঃ তা অর্জন করতে পারেনি। বুদ্ধিবাদীগণ মসজিদে প্রচার করতেন ও কলেজে ভাষণ দিতেন;তাঁরা নিজেরা জাতির তরুণদের চরিত্রের রূপান্তর ঘটাতেন। তাঁরা খলিফাদের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন ; একথা অস্বীকার করতে পারা যাবে না যে তারা তাদের প্রভাব বুদ্ধিমত্তার সঙ্গেই প্রয়োগ করতেন। অধ্যাপক, প্রচারক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, মন্ত্রী, বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে তাঁরা আরবজাতির জন্ম ও বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিলেন। পশ্চিম আফ্রিকায় বণী ইদরিসদের অভ্যুত্থান এবং ফাতেমীয় বংশের প্রতিষ্ঠা এশিয়ায় মুতাজিলা মতবাদের গৌরব বিনষ্ট হওয়ার পর মুতাজিলা মতবাদকে সঞ্জীবিত করেছিল।

এখন স্বভাবতই মনে প্রশ্ন উদিত হয় যে, অদৃষ্টবাদ ও অন্ধ কর্তৃত্বে নিগড়ে প্রজ্ঞার বন্ধন দশা যা হযরত ও তাঁর বংশের দার্শনিকগণ নিরুৎসাহিত করেছিলেন তা কিভাবে মুসলিম জাহানের চিন্তা ও অনুশীলনে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পুর্বে আমরা মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তির অন্য একটি পর্যায়ের ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করব। মুতাজিলা মতবাদ কিছুটা যৌক্তিকতার সাথেই ইউরোপের মধ্যযুগের স্কলাশটিক দর্শনের সঙ্গে তুলিত হচ্ছে। কথিত হয়েছে যে স্কলাশটিসিজম এল "প্রজ্ঞার সাহায্যে ধর্মের কতিপয় মতবাদের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের জন্য বুদ্ধিবৃত্তির আন্দোলন।" মুতাজিলা মতবাদ প্রজ্ঞা ও সদর্থক প্রত্যাদেশের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস চালিয়েছিল। এই সমান্তরাল ভাব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এখানেই সমাপ্ত হয়। খ্রিস্টধর্মে অনেক মতবাদ রয়েছে যার ব্যাখ্যা ও যৌক্তিকতা প্রদর্শন প্রয়োজন। তিনটি "প্রকৃতির" ঐক্য বিষয়ক ত্রিত্ববাদ, আদিম পাপ, রূপান্তর বাদ—সবই কিছুটা বুদ্ধিবৃত্তিক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল। সেই অনুযায়ী খ্রিস্টধর্মের মতবাদসমূহ ব্যাখ্যার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল বিজ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তার পূর্বে স্কলাশটিক মতবাদ খ্রিস্টধর্মে প্রবেশ লাভ করার জন্য। ইসলামে ব্যাপার ছিল অন্যরূপ; আল্লাহর একত্ববাদ বা 'তৌহীদ্'—মুহম্মদের ধর্মের ভিত্তি—এই নীতি ব্যতিরেকে ইসলামে অন্য কোন মতবাদ নেই যার অনুমোদনের জন্য প্রজ্ঞার ওপর কোনরূপ বাধ্যতা চাপানো হয়েছে। "উৎপত্তি ও প্রত্যাবর্তন" বিষয়ক মতবাদ—মাবদা মা'আদ—"আল্লাহ থেকে আসা এবং আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন"—আর মানুষের নৈতিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কীয় মতবাদ যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টিকর্তা—আদি

www.amarboi.org

কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত। আত্মা তার পার্থিব অবস্থান থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পরও সম্পূর্ণরূপে তার অস্তিত্ব হারাবে না—দেহ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া পরও তা আত্মসচেতন সত্তা হিসেবে বিরাজমান থাকবে—এই ধারণা জ্ঞানী ও মূর্খ নির্বিশেষে সকলেই পোষণ করেছেন। অতি স্বল্প সংখ্যক লোকই পরকালে অবিশ্বাস করেছে। সাধারণভাবে মুসলিম জনতা পরকালে বিশ্বাসী, যদিও এই পারলৌকিক অস্তিত্ব সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। এছাড়া নৈতিক দায়িত্ববোধ সম্পর্কে, মানুষ কিভাবে তার দায়িত্ববোধ পালন করবে সে বিষয়ে বিপুল মতপার্থক্য রয়েছে, কিন্তু তার শক্তির সঠিক বা বেঠিক ব্যবহারের ব্যাপারে যে সে দায়ী এ সম্পর্কে তেমন কোন মতদ্বৈধতা নেই। এই দুটি প্রশ্ন হযরত বিচার বিশ্লেষণের ব্যাপকতম স্বাধীনতা দিয়েছিলেন; যতদিন পর্যন্ত আদি ধারণাসমূহ সংরক্ষিত ও স্বীকৃত হয়েছিল ততদিন পর্যন্ত মুহম্মদের ধর্মব্যবস্থায় সর্বোচ্চ বুদ্ধিবাদী চিন্তাধারা অনুমোদিত হয়েছিল। কাজেই ইসলাম ধারণের যুগ থেকে ক্রিয়ার যুগে, বিশ্বাসের যুগ থেকে প্রজ্ঞার যুগে কোন মধ্যবর্তী পর্যায় ছাড়াই প্রবহমান ছিল। কিন্তু খ্রিস্টধর্মে এই মধ্যবর্তী স্তরটি ছিল অপরিহার্য।

হযরতের এ খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে স্বাধীন চিন্তা নিঃসন্দেহে ও সম্ভবতঃ সঙ্গতভাবে নিরুৎসাহিত হত। কিন্তু কোন প্রশ্নই পরিত্যক্ত হত না, কর্তৃত্বের ভয় দেখিয়ে কোন সন্দেহকেই নিস্তব্ধ করে দেওয়া হত না। যদি হযরত কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ হতেন তবে সবিনয়ে তা স্বীকার করতেন।[৬৪] সুতরাং মুতাজিলা মতবাদ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এই মতবাদ ইউরোপের স্কলাশটিসিজিসমের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কিন্তু বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এ মতবাদ ইউরোপীয় বুদ্ধিবাদের সমগোত্রীয়। স্কলাশটিসিজম গির্জার ছত্রছায়ায় কাজ করেছে, মুতাজিলা মতবাদ ধর্মীয়ব্যবস্থার নেতৃত্বের সংযোগে কাজ করেছে, ইসলামের প্রকৃত স্কলাশটিসিজম পরবর্তীকালে সৃষ্টি।

পদার্থবিজ্ঞানসমূহের অনুশীলন আরবজাতির প্রতিভাকে নবদিগন্তের সঙ্গে পরিচিত করেছিল। একদল চিন্তাবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল যারা 'হোকামা' ('হাকিম' শব্দের বহুবচন, অর্থ বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক) নাম ধারণ করেছিলেন, তাদের যুক্তিপদ্ধতি ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের সদৃশ, তাদের অধিকাংশ ছিল মুতাজিলা, তাদের কয়েকজনের মতবাদ এ্যারিষ্টটলের ও আলেকজান্দ্রিয়ার নব্য-প্লেটোবাদীদের দার্শনিক ধারণার রংয়ে রঞ্জিত ছিল। যদিও ধর্মান্ধতা ও মূর্খতা তাদেরকে ধর্মদ্রোহী ও ধর্মচ্যুত নির্দেশক ঘৃণ্য উপাধিতে কলঙ্কিত করেছিল, তথাপি ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠা অবশ্যই স্বীকার করে যে তারা ইসলাম থেকে পরিত্যক্ত হননি কিংবা এমন মতবাদ পেশ করেননি যে কারণে তাদের মতবাদ ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বা তাঁর অব্যবহিত বংশধরদের রচনাবলীর মধ্যে কোন সমর্থন লাভে সমর্থ নয়।

এসব দার্শনিক সবচেয়ে জোরালোভাবে বিবর্তন ও প্রগতিশীল ক্রম-বিকাশে যে মতবাদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন তা তাদের অন্যতম প্রখ্যাত প্রতিনিধি আল্

www.amarboi.org

হাজেন (ইবনে আল্ হায়সাম)-এর ভাষায় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে। এ বিষয়ে দার্শনিক ধারণাসমূহ এভাবে সংক্ষেপিত করা যেতে পারে : "অস্তিত্বশীল জড়বস্তুর ক্ষেত্রে খনিজ পদার্থের জগৎ সবচেয়ে নিম্নস্তরের, তারপর আসে উদ্ভিদ জগৎ, তারপর প্রাণিজগৎ, এবং সর্বশেষে মনুষ্যজগৎ। দৈহিক দিক দিয়ে মানুষ পার্থিব জগতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু আত্মার দিক দিয়ে সে অধ্যাত্ম বা অপার্থিব জগতের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের উর্ধ্বে রয়েছে শুধু অধ্যাত্ম সত্তাসমূহ—ফেরেশতাগণ৬৫—তাদের উপরে রয়েছেন আল্লাহ; এভাবে সর্বনিম্নস্তর সর্বোচ্চ স্তরের সঙ্গে প্রগতির শৃঙ্খলে সম্পর্কিত। কিন্তু মানুষের আত্মা নিয়ত এই জড়ের শৃঙ্খল অপসারণ করার কাজে ব্যাপৃত এবং জড়মুক্ত হয়ে সে আবার আল্লাহর নিকট উন্নীত হয়, সেখান থেকে এসেছে।" এই ধারণাসমূহ পরবর্তীকালে মাওলানা জালাল উদ্দীন রুমীর 'মসনভী'তে ব্যক্ত হয়েছে; প্রচলিত ধর্মমতের প্রতি রুমীর নিষ্ঠার ব্যাপারে আদৌ প্রশ্ন উঠে না।

অজৈব খনিজ জগৎ হতে
সুপ্তি ভেঙে জেগে উঠি উদ্ভিদ জগতে;
সেথা থেকে নবীন মৃত্যুর মাঝে
প্রাণীর আদলে জাগি নতুনের সাজে।
আবার নতুন আবর্তনে
প্রাণী থেকে মানব-সন্তানে
নবরূপে জেগে উঠি নবীন উল্লাসে
কভু ডরি না তাই মৃত্যুর বিলাসে।
মানুষ থেকে যদি মরি একবার
উঠবো পালকশোভিত হয়ে ফেরেশতা খোদার;
আর একবার নতুন মরণে
কি যে হবো আমি, কে জানে?
তারপর ফিরে যাবো অনন্তের অন্তরের মাঝে,
যাঁর নির্দেশে এসেছিলাম এইখানে ধরণীর কাজে।

দার্শনিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন আল্ কিন্দি, আল্ ফরাবী। ইবনে সিনা, ইবনে বাজ্জা, ইবনে তোফায়েল ও ইবনে রুশদ।৬৬

আল্ কিন্দি৬৭ (আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক), উপনাম "বিখ্যাত দার্শনিক" কিন্দার প্রসিদ্ধ পরিবারের একজন বংশধর এবং তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে আরবের বেশ কয়েকজন যুবরাজ ছিলেন। তাঁর পিতা, ইসহাক বিন আস্ সাব্বাহ, আল্ মাহদী, আল্ হাদী ও হারুনের অধীনে কুফার গভর্ণর ছিলেন। আল্ কিন্দি বসরা ও বাগদাদে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও তাঁর জ্ঞানের গভীরতার জন্য তিনি খলিফা মামুন ও খলিফা মুতাসিমের শাসনমালে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। তিনি দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

www.amarboi.org

গ্রীক, ফার্সী ও ভারতীয় ভাষাসমূহে পণ্ডিতএবং উক্ত জাতিসমূহের দর্শন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত আল্ কিন্দিকে আল্ মামুন এ্যারিস্টটল ও অন্যান্য গ্রীক গ্রন্থকারদের গ্রন্থ অনুবাদ করার জন্য নির্বাচিত করেছিলেন। মাঙ্ক বলেন, "ষষ্ঠদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর যে বার জন প্রতিভাধর মনীষী পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন কার্ডান তাঁকে তাদের মধ্যে গণ্য করেছেন।"

আবু নসর ফারাবী। (আবু নসর মুহম্মদ বিন মুহম্মদ তুরখান আল্ ফারাবী) ট্রানসোক্সিয়ানার ফারাব শহরের অধিবাসী বলে এই নামে অভিহিত হয়েছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ, গাণিতিক ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি এ্যারিস্টলের ভাষ্যকারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত ও সূক্ষ্মদর্শী বলে বিবেচিত। তিনি আলেমোর যুবরাজ, সায়েফ উদ্দোলা আলী ইবনে হামদানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তিনি দামেস্কে ৩৩৯ হিযরীর রজব মাসে (৯৫০ খ্রিস্টাব্দের) ডিসেম্বর মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে এখানে শুধু কয়েকখানা গ্রন্থের বিষয় উল্লিখিত হবে সেই উর্বর যুগে আরব-মনীষার প্রবণতা দেখানোর জন্য। 'বিজ্ঞানের বিশ্বকোষে' (ইহ্সাউল্ উলুম) তিনি সমুদয় বিজ্ঞানের সাধারণ পর্যালোচনা করেছেন। এই গ্রন্থের লাতিন সংক্ষিপ্তসার এই গ্রন্থের ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে, এ পাঁচটি অংশে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন শাখা-ভাষা, যুক্তিবিদ্যা, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ এবং রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করে। ফারাবীর অন্য বিখ্যাত গ্রন্থ, যা রোজার বেকন ও আলবার্টাস বহুলাংশে ব্যবহার করেছেন তা ছিল এ্যারিস্টটলের 'অর্গাননে'র ভাষ্য। তাঁর "প্লেটো ও এ্যারিস্টটলের দর্শনের প্রবণতা", নীতিশাস্ত্রের উপর তাঁর নিবন্ধগ্রন্থ—"আস্ সিরাতুল ফাজিলা" এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর তাঁর গ্রন্থ—"আস্সিয়াসাতুল মাদিনেয়া", যা তাঁর বৃহত্তর ও ব্যাপকতর গ্রন্থ—"মাবা-দিউল্ মৌজুদাত"-এর অংশ—এসব গ্রন্থ তাঁর মনীষার বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন। দর্শন ও চিকিৎসাবিদ্যা ছাড়া ফারাবী সঙ্গীতের অনুশীলন করেছিলেন এবং তাকে একটি বিজ্ঞানে 'উন্নীত'-করেছিলেন। তিনি সঙ্গীতের তত্ত্ব ও কলা এবং বাদ্যযন্ত্রের নির্মাণ সম্পর্কে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। একখানা গ্রন্থে তিনি প্রাচীনকালের সঙ্গীতের সাথে তাঁর আমলের সঙ্গীতের তুলনামূলক আলোচনা করেছিলেন। আবুল কাসিম কিন্দারস্কী, একজন উঁচুস্তরের বিচারক, ফারাবীকে তাঁর শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী ইবনে সিনার সমান আসনে বসিয়েছেন।৬৮

ইবনে সিনা সম্পর্কে আমি পূর্বেই বলেছি যে তিনি একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছিলেন। দার্শনিক হিসেবে তিনি কোনভাবেই মহান স্ট্যাগিরাইট এর তুলনায় নিকৃষ্ট ছিলেন না। তিনি প্রশ্নাতীতরূপে তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ছিলেন এবং ধর্মান্ধ ও স্বার্থপর ব্যক্তিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর পরবর্তী যুগসমূহের চিন্তার ওপর নিজের প্রতিভার অমর স্বাক্ষর মুদ্রিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর বিপুলকায় গ্রন্থাবলী তদীয় অসাধারণ মানসিক শক্তির সাক্ষ্য বহন করে।৬৯ তিনি এ্যারিস্টটলীয় দর্শনকে প্রণালীবদ্ধ করেছিলেন এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণে মণ্ডলের বুদ্ধি বিষয়ক তত্ত্বের সাহায্যে

www.amarboi.org

এ্যারিস্টটলের খণ্ডিত মনোবিজ্ঞানে "আল্লাহ্ ও মানুষের মধ্যকার শূন্যতা" ভরাট করে দিয়েছিলেন। আরব্য দার্শনিকদের মহান লক্ষ্য ছিল বিশ্বচরাচরের ঐক্য সম্পর্কীয় পূর্ণ তত্ত্বের মাধ্যমে জগতের ব্যাখ্যা দান যা শুধু মননকেই তৃপ্ত করে না, ধর্মীয় বোধকেও পরিতৃপ্ত করে। সেই অনুসারে তারা বিজ্ঞানের দার্শনিক দিকের সাথে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকের সামঞ্জস্য বিধান করার চেষ্টা করেছিলেন। এভাবেই দু'টি বুদ্ধিবৃত্তি তত্ত্বের বিকাশ ঘটে,—নিষ্ক্রিয় প্রজ্ঞা বা নৈর্ব্যক্তিক আত্মা পার্থিব আকারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরিবর্তন ও মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, আর সক্রিয় আত্মা অপরিবর্তনীয়ের সঙ্গে যোগযুক্ত ও অপরিবর্তনীয়। হৃদয় ও আত্মার সুস্থির অনুশীলনের মধ্য দিয়ে উচ্চতর প্রজ্ঞার সান্নিধ্যে নিজেকে উন্নীত করতে পারে। কিন্তু এই অনুশীলন যতটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ততটাই বুদ্ধিবৃত্তিক। ইবনে সিনার এ সব ধারণা উচ্চতম মাত্রায় উপস্থাপিত করেছেন। তিনি তাঁর যুগের দার্শনিক আকাঙ্ক্ষার প্রকৃষ্ট ও সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত প্রবক্তা। "নৈতিক নিষ্ঠার দিক দিয়ে ইবনে সিনার শিক্ষার চেয়ে অধিকতর মর্মস্পর্শী কোন শিক্ষার সাক্ষাৎ লাভ করা কঠিন।" কঠোর যৌক্তিক আলোচনা তাঁর লেখার বিশিষ্ট লক্ষণ। মানুষের আত্মা ও আদি নিরপেক্ষ কারণের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বিদ্যমান—যে ধারণা জালালউদ্দীন রুমীর প্রত্যেক পংক্তিতে বিধৃত হয়েছে—ইবনে সিনার প্রধান প্রচেষ্টা ছিল এই তত্ত্বকে প্রতিপাদন করা।

শাহারিস্তানী ইবনে সিনার বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে চয়ন করে তিনি তাঁর মতবাদসমূহের সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন। ইবনে সিনার বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা এবং অন্যান্য সমজাতীয় বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়ার পর শাহরিস্তানী বর্ণনা করেছেন যে দার্শনিক ইবনে সিনা অধিবিদ্যা দশটি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন—প্রথম পাঁচটি প্রসঙ্গে তিনি জ্ঞানবিদ্যার উৎপত্তি, পরীক্ষাকরণ, আরোহাত্মক অনুমান, অবরোহাত্মক অনুমান; জড় ও শক্তি; কার্যকারণ সম্পর্ক; মৌলিক ও অবান্তর, এবং সামান্য ও বিশেষ নিয়ে আলোচনা করেছেন ষষ্ঠ ও সপ্তম প্রসঙ্গে তিনি প্রতিপাদন করেছেন যে আদিকারণ—যে সত্তার অস্তিত্ব নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের বলে অনিবার্য সে সত্তা একক ও নিরপেক্ষ। অষ্টম ও নবম প্রসঙ্গে তিনি বিশ্বজগতের ঐক্য, আদিকারণে ও প্রথম জাত সক্রিয় প্রজ্ঞার সঙ্গে মানবাত্মার সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সর্বশেষে, তিনি পরকালের অস্তিত্ব—প্রত্যাবর্তন (মা'আদ) মতবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি মানবাত্মার ব্যক্তিগত স্থায়িত্ব ঘোষণা করেন এবং যুক্তি দেখান যে জড়দেহের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তার ব্যক্তিসত্তা অক্ষুণ্ন রাখবে; কিন্তু পরকালের অস্তিত্বের সুখদুঃখ হবে নিতান্তই আধ্যাত্মিক এবং পূর্ণতা অর্জনের জন্য প্রদত্ত মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক শক্তি সদ্ব্যবহার বা অসদ্ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল হবে। শেষোক্ত প্রসঙ্গে তিনি মানবজাতির জন্য প্রেরিতপুরুষের প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছেন। প্রেরিত-পুরুষ মানুষের নিকট ঐশী নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করেন, এবং সাধারণ লোকের বোধগম্য, উপদেশমূলক গল্পকারে আল্লাহতায়ালার ও মানবজাতির নৈতিক দাবী তাদের কাছে ব্যাখ্যা করেন, যা তাদের

www.amarboi.org

নিকট আবেদনশীল ও তাদের হৃদয়ে স্থিতিশীলতা আনয়ন করেন। প্রেরিতপুরুষ ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও অপকর্ম থেকে প্রতিনিবৃত্ত থাকেন এবং সামাজিক ও নৈতিক ক্রমবিকাশের ভিত্তিস্থাপন করে, তারাই জগতে আল্লাহর প্রকৃত পয়গাম্বর।

আবু বকর মুহম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া, উপনাম 'ইবনুল সাইয়ে'—জনগণের নিকট যিনি ইবনে বাজ্জা নামে পরিচিতি এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যাকে "অ্যাভেনপেস" বলেন, স্পেনের সর্বাপেক্ষা নামজাদা আরব দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি শুধু উল্লেখ্যযোগ্য চিকিৎসক, গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছিলেন না, পরন্তু প্রথম শ্রেণীর একজন সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। তিনি খ্রিস্টীয় একাদশ শতকের শেষের দিকে সারাগোসায় জন্মগ্রহণ করে এবং ১১২৮ খ্রিস্টাব্দে সেভিলে বাস করেন বলে বর্ণিত হয়ে থাকে। অতঃপর তিনি আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হন, যেখানে আল্মোরা ভাইদের অধীনে উচ্চ রাজকার্যে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনি ১১৩৮ খ্রিস্টাব্দে ফেজ নগরীতে মৃত্যুবরণ করেন। সমগ্র হিসেবে তাঁর অনেক গ্রন্থই আমাদের নিকট এসেছে এবং এগুলি সে যুগের মুসলিম মনীষার ব্যাপকতা ও বিস্তৃতির নির্দেশ করে।

ইবনে তুফায়েল (আবু বকর মুহম্মদ ইবনে আব্দুল মালিক ইবনে তুফায়েল আল কায়সি) গ্রাণাডা প্রদেশের, আন্দালুসিয়ার একটি ক্ষুদ্র শহর গদিস্কে (ওয়াদি-আল) দ্বাদশ শতাব্দীর সূচনায় জন্মগ্রহণ করে। তিনি চিকিৎসক, গাণিতিক, দার্শনিক, কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন এবং আল্ মোহেদ বংশের প্রথম দু'জন নৃপতির দরবারে উচ্চ সম্মান লাভ করেছিলেন। ১১৬৩ খ্রি. থেকে ১১৮৪ খ্রি. পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয় আল্ মোহেদ নৃপতি আবু ইয়াকুব ইউসুফের রাজদরবারের মন্ত্রী ও চিকিৎসকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। তিনি প্রাচীন নব্য প্লেটোবাদের শাখা, অনুধ্যানমূলক আরব্য দর্শন, "ইশরাকী" চিন্তাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই মতবাদ আধুনিক মরমীবাদের সমগোত্রীয়। তাঁর অনুধ্যানমূলক দর্শন মরমী সমুন্নতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এ দর্শন এমন একটি পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল যা স্বজ্ঞা ও প্রজ্ঞা উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "হাই বিন ইয়াকজান" কোন ধরনের প্রশিক্ষণের অধীন নয় এমন ব্যক্তির বুদ্ধি ও প্রত্যক্ষণের ক্রমিক ও পর্যায়ক্রমিক বিকাশের প্রতিবেদন।[৭০]

ইবনে রুশদ বা অ্যাভের্রোজ (আবুল ওয়ালিদ মুহম্মদ ইবনে আহমদ) ৫২০ হিযরীতে (১১২৬ খ্রি.) কর্দোভায় জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর পরিবারের লোকেরা দীর্ঘকাল ধরে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক মর্যাদা লাভ করে আসছিলেন। তাঁর পিতামহ আল্ মোরাভাইদ নৃপতিদের অধীনে প্রধান কাজীর (কাজী উল কুজ্জাত) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইবনে রুশদ প্রথম শ্রেণীর আইনজ্ঞ ছিলেন তিনি চিকিৎসা-বিজ্ঞান, গণিত ও দর্শনচর্চায় প্রধানত নিয়োজিত ছিলেন। ইবনে তুফায়েল তাঁকে আবু ইয়াকুব ইউসুফের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং নৃপতি তাঁকে অনুগৃহীত করেছিলেন। ১১৬৯ খ্রি. থেকে ১১৭০ খ্রি. পর্যন্ত তিনি সেভিলে কাজীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন এবং ১১৮২ খ্রি. কর্দোভাতে কাজীর পদে সমাসীন হয়েছিলেন। ইয়াকুব আল্ মনসুরের আল্ মোহেদদের

www.amarboi.org

সিংহাসনে আরোহণের কয়েক বছরের জন্য ইবনে রুশদ নৃপতির সম্মান ও উপঢৌকন লাভ করেছিলেন। কিন্তু যখন বার্বারদের গোঁড়ামির প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল তখন তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি আইনজীবী ও মোল্লাদের রোষে নিপতিত হয়েছিলেন যারা তাঁর দার্শনিক লেখায় বিরক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের জন্য ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। ইবনে রুশদ প্রশ্নাতীত রূপে আরবজাহানের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও দার্শনিক এবং "এ্যারিস্টটলের অন্যতম সুক্ষদর্শী ভাষ্যকার"—বলেন মাঙ্ক। ইবনে রুশদ অভিমত পোষণকরেন যে মানুষের সর্বোচ্চ প্রয়াস পরিপূর্ণতা অর্জনের দিকে নিয়োজিত হওয়া উচিত অর্থাৎ সক্রিয় সার্বজনীন বুদ্ধিবৃত্তির সাথে অভেদাত্ম হওয়া; এই পরিপূর্ণতা শুধু অধ্যয়ন ও অনুধ্যান বা চিন্তার মাধ্যমে এবং আত্মার নিকৃষ্ট বৃত্তির সাথে জড়িত কামনা, বিশেষ করে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে জড়িত বাসনা বর্জন করেই অর্জন করা যায়—অনুর্বর অনুধ্যানের মাধ্যমে নয়। তিনি আরও অভিমত পোষণ করেন যে প্রত্যাদেশ মানবজাতির মধ্যে চিরন্তন সত্য প্রচার করার জন্য অপরিহার্য ছিল, যে সত্য ধর্ম ও দর্শন সমভাবে ঘোষণা করেছে; ধর্ম বিজ্ঞানের সাহায্যে তার অনুসন্ধান চালায়; আর জনগণের নিকট বোধগম্য লৌকিক উপায়ে তার সত্য শিক্ষা দেয়; কেবল দর্শন ব্যাখ্যার সাহায্যে ধর্মের প্রকৃত সত্য অবধারণ করতে সমর্থ কিন্তু মূর্খ লোকেরা শুধু আক্ষরিক অর্থ অনুধাবন করে। অদৃষ্টের প্রশ্নে তিনি অভিমত পোষণ করেন যে মানুষ তার কার্যসমূহের সম্পূর্ণ বিধায়ক নয়, কিংবা নির্ধারিত অপরিবর্তিত নিয়মের দ্বারাও আবদ্ধ নয়। কিন্তু ইবনে রুশদ বলেন যে সত্য নিহিত রয়েছে এ দুয়ের মধ্যে। "আল্ আমরো বায়নাল আমরায়নে"—বলেন ফাতেমীয় ইমামগণ এবং এর দ্বারা তারা প্রায় এরূপ বুঝাতে চেয়েছেন। আমাদের কার্যকলাপ আংশিকভাবে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর এবং আংশিকভাবে আমাদের বাইরে অবস্থিত কারণের উপর নির্ভরশীল। আমরা একটা বিশেষ ভঙ্গীতে ইচ্ছা পোষণ করতে ও কাজ করতে পারি, কিন্তু আমাদের ইচ্ছা সর্বদা বাইরের কারণের দ্বারা দমিত ও নিয়ন্ত্রিত। এসব কারণ প্রকৃতির সাধারণ নিয়মাবলী থেকে জন্মে; একমাত্র আল্লাহ তাদের পারম্পর্য সম্পর্কে অবহিত। এটাই ধর্মতত্ত্বের ভাষায় 'কাজা' ও 'কদর'। ইবনে রুশদের রাষ্ট্রদর্শন মানুষের যে কোন ধরনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল। তিনি খোলাফায়ে রাশেদীনের অধীনে আরব প্রজাতন্ত্রকে সরকারের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছেন যাতে প্লেটোর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। তিনি বলেন যে মোয়াবিয়া উমাইয়া রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এই আদর্শকে নস্যাৎ করেছেন এবং সর্ববিধ বিপদপাতের পথ উন্মুক্ত করেছেন। ইবনে রুশদ নারীকে প্রত্যেক দিক দিয়ে পুরুষের সমান বলে বিবেচনা করেছেন এবং যুদ্ধ, দর্শন ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের জন্য সমান সুযোগ দাবী করেছেন। তিনি আরব, আফ্রিকা ও গ্রীসের মহিলা যোদ্ধাদের উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে সঙ্গীতে মহিলাদের শ্রেষ্ঠত্বের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে, যদি মহিলাদেরকে পুরুষের মতো একই মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা হত তবে তারা তাদের স্বামীদের ও ভ্রাতাদের সমকক্ষতা লাভ করত। তিনি তাদের নিকৃষ্ট মর্যাদার জন্য তাদের জীবনের অপ্রস্তুতাকেই দায়ী করেন।

www.amarboi.org

ইবনে রুশদের সাধনার ফলে আরব্য দর্শন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। হযরত ও তাঁর মধ্যে কালের ব্যবধান ছয়'শ বছরের। এই শতাব্দীগুলিতে আরব-মনীষা প্রত্যেক দিক দিয়ে বিস্তার লাভ করেছিল। ইবনে সিনা ও ইবনে রুশদের মতো প্রতিভাবান দার্শনিকেরা যাবতীয় গুরুত্বপুর্ণ প্রশ্নের উপর যুগ যুগ ধরে যে চিন্তার সম্পদ আহরিত হয়েছিল এবং যা আধুনিক যুগে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, সে বিষয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন এবং যৌক্তিক যাথার্থ্যসহ এমনভাবে তাঁদের মতবাদগুলি প্রণয়ন করেছিলেন বর্তমান যুগের অগ্রগামী বৈজ্ঞানিকদের ধারণার সঙ্গে যার পার্থক্য নগণ্য। এসব চিন্তাবিদ নিজেদেরকে মুসলমান বলে দাবী করতেন এবং সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীগণ তাদেরকে সেভাবেই স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ইবনে সিনা ধর্মান্ধ বা তাঁর সুখ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিদের তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ রোষ ও ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মরমী কবি সানায়ী, যার ধর্মশিক্ষার কথা তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুরা সন্দেহ করেছেন কিন্তু আজ যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় না, তাঁর একটি অমর কবিতায় বু'আলী সিনার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।[৭১]

ইবনে রুশদ ধর্ম ও দর্শনের সামঞ্জস্যের উপর লিখেছেন এবং তাঁর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, গভীর ধর্মভাবাপন্ন আব্দুল কবির বর্ণনা করেছেন যে ইবনে রুশদ ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারে উৎসুক ছিলেন।[৭২] আল্ আনসারী ও আবদুল ওয়ালিদ বলেছেন যে ইবনের রুশদ ইসলাম ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিলেন এবং তাঁর সাম্প্রতিক জীবনীকার বলেন, "ইবনে রুশদ ইসলাম ধর্মের একজন নৈষ্ঠিক বিশ্বাসী ছিলেন—এই অনুমানের প্রতিবন্ধকতা করার মতো কিছুই নেই, বিশেষভাবে যখন আমরা বিবেচনা করি যে এই ধর্মের মতবাদসমুহের মধ্যে অযৌক্তিক ও অলৌকিক উপাদান নেই এবং ধর্ম বিশুদ্ধতম অতিবর্তী খোদাবাদের সন্নিকটবর্তী।"[৭৩]

খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর সমাপ্তি বুদ্ধিবাদ ও বিজ্ঞানের জন্য অমানিশার অশুভ লক্ষণে পরিপূর্ণ ছিল। ইবনে সিনার মতো তারকা তখনও দিক-চক্রবালে উদিত হয়নি; কিন্দি ও ফারাবীর মতো শিক্ষাগুরু আরবজাতির উপর তাঁদের স্বাক্ষর মুদ্রিত করে তিরোহিত হয়েছেন। মযহাবী আন্দোলন তখন আব্বাসীয়দের পার্থিব বা আধ্যাত্মিক সকল কর্তৃত্বের ক্ষেত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে; যে সব বুদ্ধিবাদী ও দার্শনিক জগতের ইতিহাস মুসলমান জাতির নাম গৌরবের আসনে বসিয়েছিলেন তাদের ওপর আইনের বিশেষজ্ঞরা পথভ্রষ্টের নিষেধাজ্ঞা লটকিয়ে দিয়েছে; এক নির্দয়, অনুদার ও নিগ্রহমূলক আনুষ্ঠানিকতা ধর্মতত্ত্ববিদদের মনমগজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে; ধর্মধ্বজী ইপিকিউরীয় মনোভাব সম্পাদশালীদের এবং অজ্ঞ ধর্মান্ধতা দারিদ্রদেরকে অধিকার করেছে; রাত্রির অন্ধকার তখন গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে এসেছে—এসব অবস্থার মধ্যে ইসলাম এলোমেলো চলছিল যেমন অবস্থায় যাজকতন্ত্র খ্রিস্টধর্মকে চালিত করেছিল। সত্যের অনুরাগীদের জন্য প্রসবযন্ত্রণা ও দুদর্শনার এমন যুগে একটি ক্ষুদ্র চিন্তাবিদ গোষ্ঠী মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানের দীপ প্রজ্বলিত রাখার জন্য, জনগণের মধ্যে অধিকতর স্বাস্থ্যকর মনোভাব

www.amarboi.org

প্রবর্তনের জন্য, অজ্ঞতা ও ধর্মান্ধতার দিকে মুসলমানদের ক্রমনিম্নগতি বন্ধ করার জন্য, বাস্তবিকপক্ষে, সামাজিক কাঠামোকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য একটি "ভ্রাতৃসংঘ" গঠন করেছিলেন। তারা তাদেরকে "ইখওয়ানুস্ সাফা" (পবিত্রতার ভ্রাতৃসংঘ) বলে অভিহিত করেছিলেন। এই পবিত্রতার ভ্রাতৃসংঘ বসরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে বসরা দ্রুত ক্ষীয়মান খিলাফতের অধীনেও সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় নগরী-বুদ্ধিবাদ ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়াকলাপের আবাসভূমি হিসেবে গৌরব অক্ষুণ্ন রেখেছিল। এই ভ্রাতৃসংঘে নির্ভেজাল চরিত্রের ও বিশুদ্ধতম নৈতিকতার অধিকারী ব্যক্তি ছাড়া কাউকেই প্রবেশাধিকার দেওয়া হত না; জ্ঞান ও মানবতার প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ছিল এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ছাড়পত্র; তাদের মনোভাবের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী বা গুহ্য কিছুই ছিল না; তাঁদের পরিস্থিতির প্রয়োজনে এবং কঠোর ধর্মতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক স্বেচ্ছাচারের অধীনে কাজ করার জন্য তাদের আন্দোলন কিছুটা রহস্যাবৃত ছিল। তারা সংঘের প্রধান, জায়েদ বিন রিফা' আর বাসস্থানে নীরবে ও বিনীতভাবে মিলিত হতেন এবং দার্শনিক ও নৈতিক বিষয়াবলী উদার মনোভাব ও মতবাদের ব্যাপকতা নিয়ে আলোচনা করতেন যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা আধুনিক যুগেও সুকঠিন। তাঁরা খিলাফতের সকল শহরেই সংঘের আঞ্চলিক কার্যালয় গঠন করেছিলেন, সেখানে তাঁরা চিন্তাশীল লোক পেতেন যাঁরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে কাজ করতে ইচ্ছুক ও উপযুক্ত ছিলেন। এই মানবহিতৈষী ও বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের পরিচালক ছিলেন জায়েদসহ পাঁচ ব্যক্তি, যাঁরা ভ্রাতৃসংঘের প্রাণশক্তি ও আত্মাস্বরূপ ছিলেন। তাঁদের চিন্তাধারা সত্যিকার সর্বোচ্চ অর্থে ছিল সারগ্রাহী। তাঁরা চিন্তার কোন বিভাগকেই ঘৃণা করতেন না, তাঁরা "প্রত্যেক ময়দান থেকেই পুষ্প চয়ন করতেন।" মরমীবাদ তাঁদের দার্শনিক ধারণাসমুহেক কিঞ্চিৎ রঞ্জিত করলেও সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার উপর তাদের চিন্তা ছিল অত্যন্ত বাস্তববাদী ও মানবিক। তাঁদের পরিশ্রমের ফল হিসেবে তারা জগৎকে স্বতন্ত্র গ্রন্থে তৎকালীন জ্ঞানের যে সাধারণ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করেছেন তা একত্রে রাসায়েল[৭৪]-ই-ইখওয়ানুস্ সাফাওয়া খুল্লানুল্ ওয়াফা" (পবিত্রতার ভ্রাতৃসংঘ ও অকপটতার মিত্রসংঘের পুস্তিকাসমূহ)—সংক্ষেপে "রাসায়েল-ই-ইখওয়ানুস্ সাফা" (পবিত্রতার ভ্রাতৃসংঘের পুস্তিকাসমূহ) নামে পরিচিত।[৭৫] এই পুস্তিকাসমূহে মনুষ্য-অধ্যয়নের প্রত্যেকটি বিষয়—জ্যোতির্বিজ্ঞান, ও মৃৎবিজ্ঞানসহ পদার্থবিদ্যা; জীববিজ্ঞান, শারীরবৃত্ত, প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ, অধিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, পরলোকতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। তাঁদের রিসালাগুলি সেকালের সমুদয় বিজ্ঞান ও দর্শনের জনপ্রিয় বিশ্বকোষে পরিণত হয়েছে। প্রাণীদের বিবর্তন সম্পর্কে দশম শতাব্দীর এসব বিবর্তনবাদীর তত্ত্ব সুবিধাজনকভাবেই বর্তমানযুগের অনুমোদিত তত্ত্বের সঙ্গে তুলিতে হতে পারে। কিন্তু আমি তাদের রচনার বৈজ্ঞানিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক দিক নিয়ে ততটা-ব্যাপৃত নই যতটা তাদের নৈতিক দিক নিয়ে ব্যাপৃত। "পবিত্রতার ভ্রাতৃসংঘে"র নীতিবিদ্যা আত্মসমীক্ষা ও সমুদয় ভেজাল থেকে মানবীয় চিন্তার বিশুদ্ধিকরণ বা

www.amarboi.org

নৈর্ব্যক্তিকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। নৈতিক গুণাবলীকে বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলীর উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল; আর ধৈর্যসম্পন্ন আত্ম-অনুশীলন ও আত্মসংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত আত্মার শক্তি সর্বোচ্চ গুণ হিসেবে বিবেচিত হয়।[৭৬] "ক্রিয়া ছাড়া বিশ্বাস, ক্রিয়া ছাড়া জ্ঞান নিরর্থক।" ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, কোমলতা ও শান্তভাব, ন্যায়পরায়ণতা, করুণা ও সত্য, গুণের সমুন্নতি, অন্যের জন্য আত্মত্যাগ প্রত্যেক দিক দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হত; কপটতা, বিশ্বাসঘাকতা, প্রবঞ্চনা,হিংসা, অহঙ্কার, জুলুম ও মিথ্যা প্রত্যেক পাতায় নিন্দিত হয়েছে এবং সমগ্র রিসালার মধ্যে আবেগের বিশুদ্ধতা, মানুষের জন্য আত্যন্তিক ভালবাসা, মানুষের প্রগতিতে বিশ্বাস ইতর প্রাণীকেও স্পর্শ করে এমন বদান্যতা ব্যাপ্ত হয়ে আছে।[৭৭] "ইতরপ্রাণী ও মানবজাতির মধ্যে বাদানুবাদের চেয়ে সুন্দরতর, অধিকতর মানবিক আর কি হতে পারে? তাদের নীতিবিদ্যা সব পরবর্তী রচনার ভিত্তি হয়েছে।[৭৮] তাদের ধর্মীয় মতবাদ, ফারাবী ও ইবনে সিনার ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে অভেদ—জগৎ আল্লাহর নিকট থেকে নির্গমন, তবে সরাসরিভাবে নয়। আদি নিরপেক্ষ কারণ প্রজ্ঞা বা সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তিকে সৃষ্টি করেছিলেন; এ থেকে আগমন করেছিল 'নাফসি নুফাস', নৈর্ব্যক্তিক আত্মা; এই নৈর্ব্যক্তিক আত্মা থেকে এসেছে আদি জড়—যাবতীয় পার্থিব অস্তিত্বের মূলীভূত উপাদান। প্রোটোপ্লাজম; সক্রিয় বুদ্ধিবৃত্তি এই আদি জড়কে রূপান্তরিত করছে এবং তাকে আকার-আকৃতি নিতে সামর্থ্য করেছে এবং তাকে গতিশীল করেছে, যার থেকে মণ্ডল ও জ্যোতিষ্ক তৈরি হয়েছে। তাদের নৈতিকতা আদি কারণের উপর প্রতিষ্ঠিত, আর আদি কারণ তাঁর সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খলে সম্পর্কিত; কেননা নৈর্ব্যক্তিক আত্মা মানুষ রূপে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে ও জীবনের পরিশুদ্ধি, আত্মা-অনুশীলন, বুদ্ধিবৃত্তিক অধ্যয়নের মাধ্যমে পরিপূর্ণতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিয়ত সংগ্রাম করছে—যে উৎস থেকে এসেছে সেই উৎসে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস পাচ্ছে এ হল 'মা'আদ; এ হল সেই প্রত্যাবর্তন যার কথা হযরত শিক্ষা দিয়েছেন; এ হল সেই বিশ্রাম ও শান্তি যার কথা আসমানী কিতাবসমূহে উক্ত হয়েছে। এভাবে 'পবিত্রতার ভ্রাতৃসংঘ শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাদের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে আমরা যাই চিন্তা করি না কেন এটা অনস্বীকার্য যে তাদের নৈতিকতা ছিল বিশুদ্ধতম, তাদের নীতিবিদ্যা ছিল অনুভবে সর্বোচ্চ—এ ছিল ধর্মমতত্ত্ববিদদের নীতিবোধ থেকে স্বতন্ত্র স্তরের। ধর্মতত্ত্ববিদরা ধর্মান্ধ মুস্তানজিদকে বাগদাদে তাদের বিশ্বকোষ ভস্মীভূত করতে প্ররোচিত করেছিল মোঙ্গলদের দ্বারা বাগদাদ ভস্মীভূত হওয়ার পূর্বে।

এ্যারিস্টটলীয় দর্শন "নিরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতা"র উপর প্রতিষ্ঠিত এই দর্শন আরব-মণীষা ও আরবজাতির বাস্তবমুখী মানসিকতার সঙ্গে অধিকতর অন্তরঙ্গ। এ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যা ও অধিবিদ্যা স্বাভাবিকভাবে আরব বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের ধারণার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল। স্বজ্ঞা ও বিশেষভাবে অস্পষ্ট ও মরমী চিন্তার উপর নির্ভরশীল নব্য-প্লেটোবাদ ভাগ্যহত শিহাব উদ্দীন সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক জনপ্রিয় করার পূর্বে আরবদের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসতে পারেনি। তদনুসারে আদিকারণ সম্পর্কে

www.amarboi.org

এ্যারিস্টটলের ধারণা এই যুগের দার্শনিক ও অধিবিদ্যক রচনার মধ্যে অনুসৃত হয়েছে। স্ট্যাগারাইদের প্রভাবে একদল আরব দার্শনিক জড়ের নিত্যতায় বিশ্বাসের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। এসব লোক 'দাহরিস' (দাহর/প্রকৃতি থেকে) নাম গ্রহণ করেছিল। ক্রেমার বলেন, "এসব দার্শনিকদের মৌলিক ধারণা আধুনিকযুগে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জন্য যে ধারণা অগ্রগতি লাভ করেছিল তার সঙ্গে অভিন্ন।" কিন্তু তারা নিরীশ্বরবাদী ছিলেন না যেভাবে তাদের শত্রুরা তাদেরকে অভিহিত করেছিল। নিরীশ্বরবাদ দৃশ্যমান ও পার্থিব জগতের অতিরিক্ত ও বহির্ভূত শক্তি বা কারণের অস্বীকৃতি। এসব দার্শনিক তেমন কিছু স্বীকার করেননি। তারা শুধু এই অভিমত পোষণ করতেন যে আদি কারণের প্রতি কোন গুণ আরোপ করা কিংবা কিভাবে তিনি জগতের মধ্যে ক্রিয়া করেন তা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে, তারা 'তালিল'বা অজ্ঞেয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন।

কাজেই একথা সুস্পষ্ট যে মুহম্মদের ইসলাম ধর্মের মধ্যে এমন কিছু নেই যা মানবজাতির প্রগতি বা বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। তাহলে কিভাবে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পর থেকে ইসলামের অনুসারীদের মধ্যে দর্শন মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছিল এবং একটা বুদ্ধিবাদ বিরোধী যাজকতান্ত্রিক ভাব জনগণকে পেয়ে বসেছিল? কিভাবে অদৃষ্টবাদ যা কোরআনের শিক্ষার মাত্র একটি পর্যায় তা মুসলমানদের এক বিশাল অংশের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছিল? তাদের ভেতর দর্শনে "অবলুপ্তি" ঘটেছিল বলে যে অনুমান করা হয় সে সম্পর্কে আমি দেখাতে চাই যে বুদ্ধিবাদ ও স্বাধীন চিন্তা তখনও ইসলামে প্রাণহীন হয়ে পড়েনি কেননা পারস্যের 'সাফায়ী' নৃপতিদের অধীনে আভিসেনা ইবনে সিনার মতবাদের পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। কিন্তু আমি যেসব প্রশ্ন প্রণয়ন করেছি সেগুলি মুসলমান জনসাধারণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং আমি এই ফলশ্রুতির কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে চাই।

আব্বাসিয়া খলিফা মুতাওয়াক্কিলের সিংহাসনারোহণের পূর্বে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে খ্রিস্টান জগতের অবস্থার অনুরূপ অবস্থা ইসলাম জাহানে উপস্থিত ছিল। সমগ্র মুসলিম জাহান দু'টি শিবিরে বিভক্ত ছিল। একটা শিবির কর্তৃত্বের সমর্থক এবং অন্যটির প্রজ্ঞার সমর্থক। প্রথম দলটি মানুষকে নিছক নজিরের সাহায্যে প্রাকৃতিক ও অতিপ্রাকৃতিক বিষয়ে নির্দেশ দান করত, অপর দলটি মানবীয় বিচারবুদ্ধির আলোকে নজিরের মাধ্যমে নির্দেশিত বিষয়াবলীর ব্যাখ্যা দান করত। এই দু'দলের মধ্যে পার্থক্য ছিল সামঞ্জস্যবিধানের অতীত। প্রথম দলটি আইনজীবীদের দ্বারা গঠিত ছিল—এমন এক শ্রেণীর লোক যাদেরকে প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক দেশে প্রায়শ যৌক্তিকভাবেই সংকীর্ণমনা, নিজের মতের যাথার্থ্য নিয়ে স্পর্ধিত এবং নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে অত্যন্ত সন্দিগ্ধচিত্ত বলে অভিহিত করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল জনসাধারণ। "বিশপের ধর্মমত হল মুদির ধর্মমত। কিন্তু সেই মুদির দর্শন কোন অর্থেই অধ্যাপকের দর্শন নয়। সুতরাং যেখানে বিশপ সম্মানিত হবে সেখানে অধ্যাপক প্রহৃত হবেন। বুদ্ধি এমন একটি শক্তি যা মানুষ নিজের বলে দাবী করে; এ এমন শক্তি যা সত্য ও মিথ্যার

www.amarboi.org

পার্থক্য নির্দেশক। এরূপে জনসাধারণ যারাজন্ম বা সম্পদের আভিজাত্যের দাবী সম্পর্কে সহিষ্ণু তারা বুদ্ধির আভিজাত্যের দাবীর অধীনে উদ্বিগ্ন বোধ করবে।"[৭৯]

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আমি উল্লেখের সুযোগ পেয়েছিলাম যে হযরত কর্তৃক ঘোষিত অধিকাংশ আইনসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত একটি আদিম ও প্রাচীন সমাজের চলন্ত প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রয়োগ করা হয়েছিল। তাঁর পরে খলিফা হযরত আলী নতুন ধর্মের ব্যাখ্যাতা ছিলেন। কোরআন এই আইন-সংক্রান্ত মতবাদ স্বল্প এবং যে কোন পরিস্থিতিতে বা যুগে প্রযোজ্য। খোলাফায়ে রাশেদীনের সময়ে এসব মতবাদ প্রধানত আলী ও তদীয় শিষ্য ইবনে আব্বাস ব্যাখ্যা করতেন।

তাঁদের মৃত্যুর পর যে সব লোক তাঁদের ভাষণ শাসন করতেন কিংবা তাঁদের রায় শ্রবণ করতেন তাদের নিজেদের গরজে আইন-বিজ্ঞানের ক্লাস চালু করেছিলেন। ফকিহ্‌বা আইনজ্ঞগণ সংখ্যায় বেড়ে গিয়েছিল; তারা ধর্মীয় আইন-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী আলোচনা করতেন, ধর্মবিদ্যা, ধর্মের রীতি-নীতি এবং জীবনের সাধারণ সম্পর্ক বিষয়ে তাদের মতামত প্রদান করতেন। ধীরে ধীরে তারা জনগণের বিবেকের সংরক্ষকে পরিণত হলেন। স্বাভাবিকভাবেই হযরত কখন কিভাবে কাজ করতেন তা আবিষ্কার করার জন্য তীব্র বাসনা অনুভূত হয়েছিল। ফলে হাদিসের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল, চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ হয়েছিল। কিন্তু মদিনার চিন্তাগোষ্ঠী ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যবস্থা বা পদ্ধতির কোন একানুবর্তিতা ছিল না। মুহম্মদের অব্যবহিত বংশধরগণ একটি নির্দিষ্ট নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন যদি তারা হযরতের বা খলিফা আলীর সময়ের কোন নজির পেতেন, যা তাদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা নিশ্চিতকরণের ধোপে টিকত এবং যা পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য হত, তবে তারা তার উপর তাদের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতেন; যদি তা না হত,তবে তাদের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করতেন, তাদের নিকট আইন ছিল আরোহমূলক ও পরীক্ষণাত্মক; তারা প্রত্যেক নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের অত্যাবশ্যকতার অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। উমাইয়াদের প্রাথমিক পর্যায়ে তেমন কোন নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল না, গভর্নরগণ তরবারির সাহায্যে তাদের নিজেদের বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী শাসনকার্য চালাতেন এবং বিবেকের অন্তর্ভুক্ত ব্যাপারগুলি ফকিহ্‌দের প্রতি ন্যস্ত করতেন। কিন্তু পরবর্তী উমাইয়াদের সময়ে আইনজীবীগণ চটুল জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য অতিশয় গুরুত্ব লাভ করেছিল। যখন আব্বাসিয়া বংশ ক্ষমতায় আসীন হল তখন ইমাম জাফর আস্ সাদিকের ভাষণকক্ষে দু'জন শিক্ষার্থী নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করতেন—একজন ছিলেন আবু হানিফা[৮০] এবং অপরজন ছিলেন নালিক বিন আনাস[৮১] তাঁরা পরবর্তীকালে সুন্নী মযহাবের আশ্রয়স্থল ছিলেন। আবু হানিফা ইরাকের এবং মালিক মদিনার অধিবাসী ছিলেন। উভয়েই কঠোর নৈতিকতাসম্পন্ন ও অত্যন্ত কোমল প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং মযহাবের ভিত্তি সম্প্রসারিত করার ব্যাপারে সবিশেষ মনোযোগী ছিলেন। তাঁরা হযরতের বংশের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং সে কারণে তাদেরকে অনেক দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে হয়েছিল। আবু হানিফা কুফায় প্রত্যাবর্তন করার পর সেখানে

www.amarboi.org

তিনি একটি স্কুল খোলেন এবং সেটাই বর্তমানের বিখ্যাত হানাফী মযহাবের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। তিনি অধিকাংশ হাদিসকে অসত্য বলে বর্জন করেছিলেন[৮২] এবং কোরআনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতেন; আর কিয়াসের (সাদৃশ্যমূলক অনুমানের) সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে সরল কোরআনের বাণীকে প্রয়োগ করার প্রয়াস পেতেন। আবু হানিফা মানবজাতির প্রকারভেদ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না এবং তিনি মদিনা ও বাগদাদের বাইরে কোন শহরে যাননি। তিনি ছিলেন অনুধ্যানশীল আইনবেত্তা এবং তাঁর দু'জন শিষ্য—আবু ইউসুফ যিনি হারুন অর রশীদের অধীনে বাগদাদের প্রধান কাজীর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন আর মুহম্মদ আশ্ শায়বানি। তাঁরা আবু হানিফার ধারণাকে একটি নিয়মিত রূপ দিয়েছিলেন। মালিক স্বতন্ত্র পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, তিনি তাঁর রীতি থেকে অনুমান ও "আরোহমূলক সিদ্ধান্ত" পরিহার করেছিলেন। তিনি হযরতের স্মৃতি-অধ্যুষিত মদিনায় তাঁর জীবনের প্রত্যেকটি বাস্তব বা অনুমানসূচক ঘটনা আবিষ্কারে নিয়োজিত হয়েছিলেন এবং তাঁর মতবাদ এর উপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর পথ ছিল "অভ্যস্ত পথ"[৮৩] এবং সরল আরবজাতি ও আফ্রিকার সমজাতীয় বংশগুলির ক্ষেত্রে তাঁর ঘোষণা অধিকতর গ্রহণীয় হয়েছিল, ফাতেমীয়দের বুদ্ধিদীপ্ত মতবাদ বা আবু হানিফার অনুধ্যানমূলক তত্ত্বের চেয়ে তাঁর মতবাদই তাদের মতো প্রাচীন সমাজের অধিকতর উপযোগী হয়েছিল। অল্প পরেই আবির্ভূত হলেন ইমাম শাফেয়ী, তিনি শক্তিশালী ও সতেজ মনের অধিকারী ছিলেন এবং আবুহানিফা ও মালিকের চেয়ে জগৎ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান রাখতেন। আর তিনি আবু ইউসুফ ও মুহম্মদ আশ্ শায়বানির চেয়ে কম যুক্তিবাদী ছিলেন। জাফর আস্ সাদিক, মালিক ও আবু হানিফার থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি একটি সারগ্রাহী চিন্তাগোষ্ঠী গঠন করেছিলেন। এই গোষ্ঠী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেও প্রধানত সমাদর লাভ করেছিল। বর্ধিষ্ণু ও মিশ্র জাতির পরিবর্তনশীল অবস্থায় হানাফী মযহাবের চেয়ে কম উপযোগী হলেও এই চিন্তা গোষ্ঠীর উন্নতির পর্যাপ্ত সম্ভাবনা ছিল, যদি পরবর্তীকালের কঠোর আনুষ্ঠানিকতা এই সম্ভাবনাকে নস্যাৎ না করত তবে তা স্থায়ী কল্যাণ আনতে পারত।[৮৪] কমবেশী পরস্পর স্বতন্ত্র চারটি মযহাব এরূপে মুসলিম জাহানে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ফাতেমীয় রীতি প্রধানত শিয়াদের মধ্যে সক্রিয় ছিল, যারা সাম্রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল, মালেকী মতবাদ আরব উপদ্বীপের এক বিরাট অংশে বারবারদের ও অধিকাংশ স্পেনিশ মুসলমানদের মধ্যে সক্রিয় ছিল; শাফেয়ী মতবাদ বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন শ্রেণীর মধ্যে এবং হানাফী মতবাদ মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও মিশরের অধিকতর সম্মানিত শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। খিলাফতে হানাফী মতবাদের মর্যাদা ইহুদীদের মধ্যে ফ্যারিসীদের মর্যাদার অনুরূপ ছিল। মিশ্র জাতির প্রয়োজন চরিতার্থ করতে সমর্থ একমাত্র চিন্তাগোষ্ঠী। মযহাব হিসেবে রাজদরবারের নৈতিকসমর্থন লাভ করেছিল। ফাতেমীয় রীতিকে স্বীকার করলে হযরতের বংশধরদের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হত; মালেকী মতবাদ ও শাফেয়ী মতবাদকে একটি উদারপন্থী প্রশাসনের ক্ষেত্রে গ্রহণ করলে সাম্রাজ্যের স্বার্থ সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ত। কাজেই যখন কলেজ ও মাদ্রাসায়[৮৫]

www.amarboi.org

বুদ্ধিবাদের শাসন চলত তখন হানাফী মতবাদ মসজিদে ও বিচারালয়ে[৮৬] কর্তৃত্ব করত। ধর্মতত্ত্ববিষয়ক মতবাদের ক্ষেত্রে হানাফী মতবাদ সেফাতী মতবাদের দিকে নিবিষ্ট ছিল, কিন্তু বিভিন্ন সুলতানের আমলে এই মতবাদের কিছুটা রদবদল ঘটত। এই যুগে হানাফী মতবাদ স্থিতিস্থাপকতার জন্য বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। আহমদ ইবনে হাম্বল, যিনি সাধারণভাবে ইমাম হাম্বল নামে পরিচিত ছিলেন, এই সঙ্কট সন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন—তিনি একজন কঠোরপন্থী সংস্কারক এবং তাঁর মতের সঙ্গে পৃথক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ইস্পাত কঠিন ব্যক্তিত্ব; তিনি হানাফী মতবাদের কপট উদারতায় মর্মাহত এবং মালেকী মতবাদের সঙ্কীর্ণতা ও শাফেয়ী মতবাদের আটপৌরে ভাবের প্রতি সমভাবে বিরক্ত হয়ে হাদিসের উপর ভিত্তি করে সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্য একটা আইনব্যবস্থা প্রণয়নে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। আবু হানিফা অধিকাংশ প্রচলিত হাদিস পরিহার করেছিলেন; ইবনে হাম্বলের আইনব্যবস্থায় অসামঞ্জস্যপূর্ণ, অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর গল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, বা পরস্পর অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং যা বানোয়াট ছিল। এখন থেকে শুরু হল প্রগতি ও পশ্চাদমুখীতার দলগুলির মধ্যে তীব্র সংগ্রাম। ইবনে হাম্বল চরম ভাবাপন্ন সেফাতিয়া মতবাদ অবলম্বন করেছিলেন; তিনি এই শিক্ষা মুদ্রিত করে দিয়েছিলেন যে আল্লাহ মনুষ্যদৃষ্টিতে দৃশ্যমান; তাঁর গুণাবলী তাঁর সত্তা থেকে পৃথক; তিনি সিংহাসনে সমাসীন—এই বিবৃতিকে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে; মানুষ কোন অর্থেই স্বাধীন নয় এবং প্রত্যেক মানবীয় কাজ আল্লাহর প্রত্যক্ষ ক্রিয়া ইত্যাদি। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। জনসাধারণ তাঁর বাগ্মিতা বা প্রচণ্ডতায় বিমোহিতা হয়ে তাঁর আহ্বান গ্রহণ করেছিল; হানাফী আইনবিদগণ, যাদের প্রভাব বাস্তবিকপক্ষে অশিক্ষিত জনসাধারণের উপর নির্ভর করত এবং যারা হারুন অর রশীদ ও মামুনের দরবারে বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন, এই নতুন সংস্কারকের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। মিম্বর থেকে প্রজ্ঞার সমর্থক এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রবক্তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার হতে থাকল। বাগদাদের রাজপথে প্রায়ই দাঙ্গা-হাঙ্গমা ও রক্তপাত ঘটত। মুতাসিম ও ওয়াসিক কঠোর হস্তে ক্রোধান্ধ সংস্কারদের ধর্মান্ধতামূলক আক্রমণ দমন করেছিলেন। এই বিশৃঙ্খলার মহানায়ককে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল, তিনি সেখানেই পবিত্রতার সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছিলেন; তাঁর মরদেহের শোভাযাত্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার নরনারী যোগদান করেছিল।[৮৭] তাঁর আইনব্যবস্থা বৃহত্তর জনশক্তির মধ্যে বিস্তার লাভ করতে পারেনি; হানাফী মতবাদের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে এই মতবাদ আবু হানিফার মতবাদসমূহকে নতুন বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। তারপর থেকে হানাফী মতবাদ আবু হানিফা ও ইবনে হাম্বলের শিক্ষার সমন্বিতরূপে পরিণতি লাভ করে।

যখন মুতাওয়াক্কিল সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন বিভিন্ন দলের অবস্থা ছিল এরূপ : বুদ্ধিবাদী সম্প্রদায় ছিল রাষ্ট্রের নিয়ন্তা শক্তি; তারা গুরুত্বপূর্ণ অফিসসমূহের প্রধান ছিলেন, তারা ছিলেন কলেজের অধ্যাপক, হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক,

www.amarboi.org

মানমন্দিরসমূহের পরিচালক; তারা ছিলেন ব্যবসায়ী; বাস্তবিক তারা সাম্রাজ্যের জ্ঞান ও সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করতেন, সমাজের শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী ও প্রভাবশালী শ্রেণীর মধ্যে বুদ্ধিবাদ ছিল নিয়ন্ত্রক মতবাদ, সেফাতী মতবাদ সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল, আর অধিকাংশ কাজী, প্রচারক, বিভিন্ন পদমর্যাদার আইনজীবী এই মতবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নিষ্ঠুর মদ্যপ, কোন কোন সময়ে প্রায় উন্মাদ, মুতাওয়াক্কিল সেফাতী দলের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনের সুবিধা প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন। এই পদক্ষেপ সহসা তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলল এবং ধর্মান্ধদের আদর্শ খলিফায় পরিণত করল। তদনুসারে সরকারের অধীনে সব অফিস থেকে প্রগতিশীল দলের প্রত্যাখ্যানের রাজাজ্ঞা ঘোষিত হল। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমুহ বন্ধ করে দেওয়া হল; সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চা নিষিদ্ধ ঘোষিত হল এবং বাগদাদ থেকে বুদ্ধিবাদীদেরকে খুঁজে বের করা হল। একইসঙ্গে মুতাওয়াক্কিল খলিফা আলী ও তাঁর পুত্রদের সমাধি-সৌধ ধূলিসাৎ করেছিলেন। যে ধর্মান্ধ আইনজীবীগণ এখন ইসলামের পুরোহিত শ্রেণীতে পর্যবসিত, তারা রাষ্ট্রের শাসক-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। মুতাওয়াক্কিলের মৃত্যু এবং মুন্তাসিরের সিংহাসনারোহণ আর একবার প্রগতিবাদীদের ললাটে বিজয়-সাফল্য এনে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের সাফল্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। নির্দয় ও রক্তপিপাসু মুতাজিদ বিল্লাহর অধীনে যাজকতন্ত্রের সাফল্য সম্পূর্ণ হল। তিনি নির্মমভাবে বুদ্ধিবাদীদের উপর নির্যাতন চালিয়েছিলেন। বুদ্ধিবাদীগণ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে "ন্যায়বিচার" মনুষ্য-ক্রিয়াবলীর প্রাণবস্তুকারী নীতি; আল্লাহ্ স্বয়ং "ন্যায়বিচারে"র মাধ্যমে বিশ্বজগৎ শাসন করেন, ন্যায়বিচার তাঁর সত্তার উপাদান; ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি ব্যক্তির ইচ্ছা নয়—মানব-জাতির কল্যাণ। এই মতবাদগুলি মারাত্মকভাবে বিপ্লবাত্মক, এতে খলিফাকে অন্যায় করার ঐশী অধিকার দানের লক্ষ্য সামনে রাখে। টম পেইন এর চেয়ে মন্দতর কিছু প্রচার করতে পারত না। অপরপক্ষে, যাজকীয় দল সঙ্গতভাবে শিক্ষা দিয়েছিল, "আল্লাহ্ বিশ্বের সার্বভৌম প্রশাসক, যেহেতু নৃপতি কোন অন্যায় করতে পারেন না তেমনি আল্লাহ্ কোন অন্যায় করতে পারে না।" এ দুটি মতবাদের কোনটি সত্য সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারত না। আব্বাসীয়দের অধীনে বুদ্ধিবাদের দিন ফুরিয়ে গিয়েছিল। বাগদাদ থেকে নির্বাসিত হয়ে এই মতবাদ কায়রোতে আশ্রয় নিয়েছিল; এটা আরও খারাপ ছিল, কারণ একটিমাত্র স্থান যাকে মৃত্যুর শত্রুতা নিয়ে আব্বাসীয়রা ঘৃণা করত তা হল কায়রো। বুদ্ধিবাদের নামটিই বাগদাদের খলিফাদের নিকট ভয়ানক অর্থ বহন করত। আইনজ্ঞদের কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের গ্রন্থ থেকে ধর্ম বিরোধমূলক বিষয় বেছে বের করার জন্য—এসব দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদেরকে তখনও যাজকীয় প্রভাবের অধীনে দুর্ভাগ্যজনক অবস্থায় বাস করতে হয়েছিল। যেসব গ্রন্থে প্রচলিত ধর্মমতের বিন্দুমাত্র বিরোধিতামূলক কোন বিষয় মিলত সেগুলি আগুনে ভস্মীভূত করা হত এবং গ্রন্থকারদেরকে নির্যাতন করা হত ও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। এ সময়ে ইসলাম গোঁড়া খ্রিস্টান জাহানের দৃশ্য উপস্থাপিত করেছিল। এমন এক সময় ছিল যখন রাজকীয় শক্তি বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত

www.amarboi.org

হওয়া সত্ত্বেও এই মতবাদ তার প্রভাব জনগণের মধ্যে পুনরুদ্ধার করত। তাদের নিরবচ্ছিন্ন বিবাদের ফলে যাজকতন্ত্র নিয়ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হত; এসব উপলক্ষে তারা প্রায়ই তরবারী, ইষ্টক ও প্রস্তর নিক্ষেপের মতো অধিকতর শক্তিশালী যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করত, কিন্তু বিতর্কে তাদের পরাজয় তাদের অনুসারীদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করত। এ সময়ে পশ্চাদমুখী দল অপ্রত্যাশিত মৈত্রীর সাহায্য পেত। এ পর্যন্ত তারা ঐতিহ্যের তথ্য-ভাণ্ডারের সাহায্যে বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করত। যে আবু মুসা আশারী আমর বিন আসের কূটচালে আলীর খিলাফতের অধিকার পরিহার করতে বাধ্য করেছিলেন তাঁর বংশধর হাসান আল্-আশারী[৮৮] মুতাজিলাদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি তাদের যুক্তিবিদ্যা, দর্শন ও কালাম অধ্যয়ন করেছিলেন। দাম্ভিকতা-প্রণোদিত হয়ে আংশিকভাবে সম্ভবত উচ্চাকাঙ্ক্ষায় চালিত হয়ে। একদিন তিনি বসরার জামে মসজিদে এক বিরাট মাহফিলের সামনে মুতাজিলা মতবাদ প্রত্যাহারের ও সিফাতি মতবাদ গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর নাটকীয় ভঙ্গী ও বাগ্মিতাপূর্ণ শব্দ শৈলী জনগণকে মুগ্ধ করেছিল এবং যারা দোদুল্যমন ছিল তৎক্ষণাৎ তাঁর মতবাদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করল। আশারী এখন খিলাফতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব; আইনজ্ঞগণ তাঁকে আদর করেন, জনসাধারণ তাঁকে প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধা করেন খলিফা তাঁকে সম্মান করেন। তিনি যাজকতান্ত্রিক দলকে এতদিন তাদের যা অভাব ছিল তা পূরণ করে দিয়েছিলেন—একটি যৌক্তিক পদ্ধতি দিয়েছিলেন, মুতাজিলা, দার্শনিক ও ফাতেমীয়গণের বিরুদ্ধে যাজকীয় ধর্মতত্ত্বের সংরক্ষণ করেছিলেন। আবুল হাসান স্বল্প পরিবর্তনসাপেক্ষে সেফাতিয়া মতবাদসমূহ সমর্থন করেছিলেন।

শাহারিস্তানীর মতবাদগুলির সংক্ষিপ্ত-সার বহুসংখ্যক মুসলমানের বর্তমান মানসিক আড়ষ্টতা ব্যাখ্যা করবে। আমাদের গ্রন্থকার বলেন, তিনি যুক্তিসহকারে বর্ণনা করেছিলেন যে আল্লাহর গুণাবলী চিরন্তন এবং তাঁর উপাদানের মধ্যে অস্তিত্বশীল, কিন্তু গুণাবলী শুধু তাঁর উপাদান নয়, বরং তাঁর চিরন্তন ইচ্ছার মাধ্যমে ইচ্ছা করেন, কেননা এটা সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী শাসক, এবং একজন মহাপ্রতাপশালী শাসক হিসেবে তাঁরই রয়েছে আদেশ ও নিষেধের ক্ষমতা, সুতরাং আল্লাহ আদেশ ও নিষেধ প্রদান করেন, ...তাঁর নির্দেশনা চিরন্তন, তাঁর মধ্যেই অস্তিত্বশীল, আর নির্দেশনা তাঁরই এখতেয়ারভুক্ত; আল্লাহর ইচ্ছা অবিভাজ্য, চিরন্তন, তাঁর ইচ্ছাধীন সমুদয় বস্তু তিনি ব্যাপ্ত করে আছেন, সেটা তাঁর নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্ম হোক কিংবা তাঁর সৃষ্ট জীবের কর্ম হোক—এই পরবর্তী শ্রেণীর কর্ম যতটা তাঁর দ্বারা সৃষ্ট ততটা মানুষের "নিজেদের উদ্দেশ্যসিদ্ধ"[৮৯] নিজস্ব কর্ম নয়, ... নৈতিক দিক দিয়ে ভাল-মন্দ, হিতকর-ক্ষতিকর, সমুদয় কার্য তিনি ইচ্ছা করেন; যেহেতু তিনি জানেন ও ইচ্ছা করেন, সুতরাং তিনি তাঁর জ্ঞানানুসারে তাঁর সৃষ্ট জীবের দিক দিয়ে ইচ্ছা করেন এবং স্মরণ গ্রন্থ অর্থাৎ আমলনামার অন্তর্ভুক্ত করান, যে আমলনামায় তাঁর পূর্বজ্ঞান তাঁর বিধান, তাঁর সিদ্ধান্ত ও তাঁর নিষ্পত্তির সমবায়ে গঠিত; এর মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই; "উদ্দেশ্যসিদ্ধ" কর্ম বলতে এমন কর্ম বুঝায় যা পূর্ব-

www.amarboi.org

নির্ধারিত ও সৃষ্ট শক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয় এবং সৃষ্ট শক্তির অবস্থার অধীনে সংঘটিত হয়। "সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে প্রত্যেকটি মানবীয় কর্ম আল্লাহ থেকে আসে, অথবা তা আল্লাহর নির্দেশক্রমে পূর্ব-নির্ধারিত এই কাজটি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি সম্পন্ন করে এবং "উদ্দেশ্যসিদ্ধ বা অর্জনে"র ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তি কাজটি সম্পন্ন করে, কাজটি মুখ্যভাবে আল্লাহর, গৌণভাবে মানুষের। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি একজন লোক একটি চিঠি লেখে, তবে তার চিঠি লেখার ইচ্ছাটি তার চিঠি লেখা উচিত এই চিরন্তন নির্দেশের ফল; তারপর সে কলম ধরে, এটা আল্লাহর ইচ্ছা যে তার অনুরূপ কাজ করা উচিত ইত্যাদি। যখন লেখাটি সমাপ্ত হয় তখন তার "অর্জনে"র ফলশ্রুতি। শাহরিস্তানী অত্যন্ত সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করেছেন যে, আবুল হাসানের মতে, ক্রিয়ার (উৎপাদনের) ব্যাপারে কোন প্রভাব সৃষ্ট ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হয় না। এই যোগ্য ধর্মতত্ত্ববিদ আরও উল্লেখ করেন যে, "আল্লাহ্ মহাপ্রতাপশালী শাসক হিসেবে তাঁর সৃষ্ট জীবের ওপর শাসন চালান, সৃষ্ট জীব তাঁর ইচ্ছা অনুসারে ক্রিয়া করে এবং তাঁর অনুগ্রহ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করে; যদি তিনি সব মানুষকে স্বর্গে প্রবেশ করান তবে এতে কোন অন্যায় কিছু নেই, আর যদি তিনি সকল মানুষকে নরকে প্রেরণ করেন তবে তাতে তাঁর কোন অনায় হবে না, কারণ অন্যায় এমন এক ধরনের নির্দেশনা যা বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং তা নির্দেশকের নিয়ন্ত্রণের আওতাভুক্ত নয়। বস্তুর প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের বিপরীতক্রমের ব্যাপারেও তার কোন অন্যায় নেই। আল্লাহ্ সার্বভৌম শাসক, তাঁর দিক থেকে কোন অন্যায়-অবিচার কল্পনা করা যায় না এবং তাঁর প্রতি কোন অন্যায় আরোপিত হতে পারে না ... প্রজ্ঞার বিচারে যা আল্লাহর দিক থেকে করণীয়—যা হিতকর হোক বা খুব সুবিধাজনক হোক বা কল্যাণ নির্দেশক হোক, তা তাঁর উপর আরোপিত হতে পারে না। ... আর (মানুষের) বাধ্যতার ভিত্তি আল্লাহর ক্ষেত্রে কোন বাধ্যতামূলক আবশ্যকতা সৃষ্টি করে না।"...

আবুল হাসানের মতবাদগুলি উল্লেখ করার পর শাহরিস্তানী আবুল হাসানের প্রধান শিষ্য আবু আব্দুল্লাহ বিন কাররাম—যাঁর শিক্ষা এক বৃহত্তর জনসমষ্টি গ্রহণ করেছিল—এর মতবাদ আলোচনা করেছেন। "আমরা তাঁকে একজন সেফাতী মতাবলম্বী বলে বিবেচনা করি।" এই লোকটি উল্লেখ করেছিলেন যে, ঐশী গুণাবলী তাঁর উপাদান থেকে স্বতন্ত্র, আল্লাহকে চাক্ষুষ দেখা যাবে, তিনি ইচ্ছানুসারে মাঝে মাঝে মানবীয় ক্রিয়া সৃষ্টি করেন।

ইবনে আসাকিরের গ্রন্থ[১০] সম্পর্কে উল্লেখ না করলে আল্ আশারীর মতবাদসমূহের বিবরণ সম্পূর্ণ হবে না। শাহরিস্তানী তাঁর আশারিয়া মতবাদসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরনে দার্শনিক ও আইনবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করেছেন। পক্ষান্তরে, ইবনে আসাকির বিরোধী চিন্তাগোষ্ঠীর মধ্যে সমান ভারসাম্য রক্ষা করার কোন ভান করেননি। আশারীর ন্যায় তাঁর কাছেও বুদ্ধিবাদীদের মতবাদসমূহ উৎকট ধর্মচ্যুতি। আপোষহীন প্রচণ্ডতা নিয়ে তিনি তাদের শিক্ষা বর্জন করেছেন। গোঁড়া অনুসারীদেরকে ধর্মের মূল নীতিসমূহ অবশ্যই বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করতে হবে—আশারীর এই জোরদার নীতির যে ব্যাখ্যা তিনি

www.amarboi.org

দিয়েছেন তা সেসব প্রবণতা বুঝতে সাহায্য করে যা প্রাথমিক অবস্থায় মুসলমান সমাজের বিকাশকে গতিশীল করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত যা মুসলিম জাতিসমূহের অগ্রগতিকে স্তব্ধ করতে সফল হয়েছিল ও শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে তাদের বৌদ্ধিক শক্তিকে পঙ্গু করেছিল। যাবতীয় প্রশ্ন-করণকে অধর্মাচরণ ও ক্ষমাহীন পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। যখন প্রশ্ন করার মনোভাবকে শয়তানের প্রকাশ বলে অভিহিত করা হয়েছিল। কোরআনে বলা হয়েছে "আল্লাহ্ সব দেখেন" সুতরাং এটা অনুমিত হয়েছিল যে তাঁর দৃষ্টিশক্তি রয়েছে এবং বিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই তা "কারণ ব্যতিরেকে" গ্রহণকরতে হবে—এভবেই আশারী যুক্তি দিয়েছিলেন আর এভাবেই যুক্তি দিয়েছিল তাঁর সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে।

আল্ আশারী ও তাঁর বিশিষ্ট প্রবক্তা ও সমর্থকের মধ্যে আড়াই শ' বছরের কাল-ব্যবধান। এই সময়ের মধ্যে ইসলাম একটা বিরাট পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে চলেছিল। আশারী নির্বিচারী ধর্মতাত্ত্বিক গোষ্ঠী শুরু করার পূর্বে একদিকে বুদ্ধিবাদ এবং অপরদিকে যাজকতন্ত্রের মধ্যে প্রভুত্বের লড়াই চলেছিল। আল্ আশারী যাজকতন্ত্রকে সরবরাহ করেছিলেন এমন একটি হাতিয়ার যা তাদের পূর্বে ছিল না। ইবনে আসাকির মন্তব্য করেছেন, "আল্ আশারী প্রথম রক্ষণশীল যুক্তিবিদ,[১১] যিনি বুদ্ধিবাদী ও অন্যান্য ধর্ম-ভ্রষ্টদের সঙ্গে তাদের যুক্তিবিদ্যার নীতি অনুসারে যুক্তিবিন্যাস করেছেন।" বুদ্ধিবাদ ও যাজকতন্ত্রের (মযহাবের) রক্ষণশীলতা ও মুক্তিচিন্তার মধ্যে মীমাংসার প্রচেষ্টা হিসেবে তাঁর মতবাদগুলি চরমপন্থী ধর্মতত্ত্ববিদ ও ধর্মযাজকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি লাভ করেছিল। যারা এই যুক্তিরীতির মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে বুদ্ধিবাদকে তার শক্তি ও প্রভাবের সর্বোচ্চ শিখর থেকে উৎখাত করতে পারে, যা সে লাভ করেছিল আল্ মামুন ও তাঁর দুজন অব্যবহিত উত্তরাধিকারীর আলোকোজ্জ্বল রাজত্বকালে। প্রাথমিক বুয়াইদগণ বুদ্ধিবাদের প্রতি অনুকূল মনোভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছিলেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহে মধ্য এশিয়ায় বুদ্ধিবাদের প্রভাব ছিল সর্বাধিক। ইবনে আসাকির বলেন, "ফেনা খসরু (আজাদ উদ্‌দৌলা)[১২]-র পূর্ব পর্যন্ত ইরাকে মুতাজিলাদের শক্তি ছিল খুবই প্রচণ্ড।" তাঁর রাজত্বকালে আশারিয়া মতবাদ প্রথম রাজদরবারের আনুকূল্য লাভ করেছিল এবং ক্রমশ সকল শ্রেণীর মধ্যে বিস্তার লাভ করতে থাকে। হিযরী পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত আশারিয়া মতবাদকে মুতাজিলা মতবাদের সাথে প্রায়ই গুলিয়ে ফেলা হত, যে মতবাদ আল্ আশারী তাঁর নাটকীয় পরিহারের পূর্ব পর্যন্ত সমর্থন করতেন। তাঁর শিষ্যরা প্রায়ই সেইসব দলের হাতে নিগ্রহ ভোগ করতেন যারা রক্ষণশীলতা স্বপক্ষে বিশেষ সমর্থন দাবী করতেন।

সেলজুক বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান তুঘ্রিলের শাসনমালে আল্ আশারীর শিষ্যবৃন্দ অ-রক্ষণশীলতার সন্দেহে অভিযুক্ত ও নির্বাসিত হতেন। সুলতান নিজে ইমাম আবু হানিফার একজন শিষ্য ছিলেন এবং হানাফী মতবাদ সমর্থন করতেন। তিনি মসজিদের মিম্বর থেকে ধর্মমতের বিরোধীদের ওপর জনগণকে অভিসম্পাত প্রদানের জন্য আদেশ

— ২৯

www.amarboi.org

দিয়েছিলেন। ইবনে আসাকিরের মতে, তাঁর মন্ত্রী,[৯৩] যিনি একজন মুতাজিলা ছিলেন, এই অভিসম্পাতের আশারিয়াদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং আল্ আশারীর শিষ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ইমাম ও পণ্ডিতদের উপর নির্যাতন শুরু করেন।

তুঘ্রিল বেগের রাজত্বকালে যে মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশের অধীনে আশারিয়া সম্প্রদায় কষ্টক্লেশে পথ চলতেন তাঁর মৃত্যুতে সে বাধা অপসারিত হয়েছিল এবং সুলতান আল্প আরস্লানের সিংহাসন আরোহণে ও সুন্নাত জামাতের আনুকূল্যকারী নিজামুল মুলকের আবির্ভাবে আশারিয়া চিন্তাগোষ্ঠী প্রবল প্রতাপশালী সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। "তিনি নির্বাসিতদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনলেন, তাদেরকে সম্মানিত করলেন, তাদের নামে বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত করলেন।" এরূপে মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানের একজন উদারতম পৃষ্ঠপোষক নিজের অজ্ঞাতে এমন একটি প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন যা বহুলাংশে অন্যান্য কারণ অপেক্ষা মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিসমূহের বন্ধ্যাকরণের জন্য দায়ী।

ইবনে আসাকিরের আশারিয়া সম্প্রদায়ের অগ্রগতির বিবরণ উদ্দীপনাময়। ইরাক থেকে এই মতবাদ আয়ুবাইদ[৯৪] ও মমলুকদের অধীনে সিরিয়া ও মিশরে ছড়িয়ে পড়েছিল; ইরাক থেকে এই মতবাদ ইবনে তুমার্ত[৯৫] পশ্চিম আফ্রিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এই মতবাদ মরক্কোতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। "ইবনে হাম্বলের কিছু সংখ্যক অনুসারী ও আবু হানিফার দলভুক্ত কিছু লোক ছাড়া আল্ আশারীর সমর্থকদের সঙ্গে মোকাবিলা করার মতো কোন সম্প্রদায় ছিল না।" ইবনে আসাকির বলেন, "আহমদ ইবনে হাম্বল ও আল্ আশারীর মধ্যে ধর্মীয় মতে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান ছিল,এবং বিশেষভাবে মৌলিক প্রশ্নসমূহের ব্যাপারে ও হাদিসের প্রামাণ্যতার স্বীকৃতি-বিষয়ে তাঁদের মধ্যে পার্থক্য ছিল না।" তিনি আরও বলেন, "এ কারণে হাম্বলীগণ ভিন্ন ধর্মমতপন্থীদের বিরুদ্ধে সবসময়ে আশারিয়াদের উপর নির্ভর করতেন, কারণ আশারিয়া সম্প্রদায় রক্ষণশীলদের মধ্যে একমাত্র যুক্তিবাদী গোষ্ঠী ছিল।" আল্ আশারীর মূলনীতিসমূহ আলোচনা কালে ইবনে আসাকির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদসমূহ পাশাপাশি স্থাপন করেছেন।

অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতবাদ আলোচনা করার পর আল্ আশারীর ভাষায় তিনি মুতাজিলা মতবাদসমূহের (যেসব ব্যাপারে তারা সঠিকপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন) আলোচনা করেছেন। তিনি আমাদের বলেছেন যে, আল্লাহকে চর্মচোখে দেখা যেতে পারে, মানুষের সঙ্গে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কোন সাদৃশ্য আছে, হাশরের দিন দৈহিক পুনরুত্থান ঘটবে—এসব ধারণা মুতাজিলা সম্প্রদায় বর্জন করেছেন। তিনি বলেন, "তারা কবরের শাস্তির[৯৬] বিষয়ও প্রত্যাখ্যান করেছেন"; তারা হযরতের শাফায়াতের ব্যাপারেও বিশ্বাস করেন না; তারা অভিমত পোষণ করেন যে মানুষের পাপ একমাত্র ক্ষমতাশীল করুণাময় আল্লাহতায়ালাই মাফ করতে পারেন, মানুষের সুপারিশের মাধ্যমে তাঁর করুণা বা বিচার প্রভাবিত বা বিপথগামী করা যেতে পারে না; তারা বিশ্বাস করেন যে কোরআন

www.amarboi.org

সৃষ্ট ও হযরতের নিকট অবতরিত (নাজিলকৃত) এবং "মানুষের প্রয়োজন অনুসারে আইন ঘোষিত হয়েছে।"

মুতাজিলা মতবাদ বর্ণনা করার পর ইবনে আসাকির আল্ আশারীর ধর্মমতের বিস্তারিত আলোচনায় অগ্রসর হন। তাঁর মতবাদগুলি সংখ্যায় চব্বিশটি, তবে আল্ আশারীর ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী ও বুদ্ধিবাদী ইসলামের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য তাঁর কয়েকটি মতবাদের উল্লেখই যথেষ্ট। আল্লাহর একত্ববাদ ও হযরতের নবুয়্যতে যে বিষয়ে সব মুসলমান একমত—সে বিষয়ে স্বীকারোক্তির পর আশারিয়াদের ধর্মমত এরূপ—

"আমরা ঘোষণা করি যে স্বর্গ ও নরক সত্য, শেষ বিচারের দিনের আগমন নিশ্চিত এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ মৃতদেরকে কবর থেকে পুনরুত্থিত করবেন; আর বিচারের দিনে আল্লাহ মানুষের দৃষ্টিতে দৃশ্যমান হবেন।[৯৭] আমরা ঘোষণা করি যে আল্লাহর কালাম (আল্ কোরআন) ও তার প্রতিটি অংশ চিরন্তন; জগতের কোন কিছুতেই তা ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে অস্তিত্বশীল হয় না; আসলে তিনি ইচ্ছা না করলে কোন কিছুই অস্তিত্বশীল হয় না। আমরা বিশ্বাস করি যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কার্যাবলী, তাদের লক্ষ্য ও পরিণতি এবং যা এখনও ঘটেনি, সে সমুদয় সম্পর্কে অবগত আছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে মানুষের কার্যসমূহ তাঁর ইচ্ছা থেকে জন্মলাভ করে এবং তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়; আর (আল্লাহর সাহায্য ছাড়া) কোন কিছু জন্ম দেওয়া বা সৃষ্টি করা মানুষের শক্তিবহির্ভূত। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে মানুষের আত্মার জন্য যা কিছু ভাল এবং যা কিছু বর্জনীয় তা সে ভাল করতে কিংবা পরিহার করতে সমর্থ নয়।"

অতঃপর আশারিয়াদের মতবাদ এভাবে বর্ণিত হয়েছে;—"আমরা হযরতের সুপারিশে বিশ্বাস করি এবং এও বিশ্বাস করি যে আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রেহাই দেবেন।" "আমরা হাশরে দিবসে যীশু-বিরোধী মহাপুরুষের আগমন দু'জন ফেরেশতা মনকির ও নকিরের মৃত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কেও বিশ্বাস করি। আমরা হযরতের মিরাজেও[৯৮] বিশ্বাসকরি; আমরা একথাও বিশ্বাস করি যে সমুদয় মন্দ চিন্তা শয়তান কর্তৃক প্ররোচিত হয়; আমরা বৈধ ইমামদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাকে পাপ কাজ বলে মনে করি।[৯৯]

শাহরিস্তানী দার্শনিক বিশ্লেষণ অপেক্ষা এই সংক্ষেপ-সার মুসলিম বিবর্তন সম্পর্কে আল্ আশারীর মনোভঙ্গীকে স্পষ্ট ক'রে নির্দেশ দেয়।

মুতাজিলা চিন্তাবিদদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য আবুল হাসান এক প্রতিদ্বন্দ্বী 'যুক্তিবিজ্ঞানের' উদ্ভাবন করেন—মুসলমানদের বাস্তব স্কলাশটিক ধর্মতত্ত্ব—একে যদিও মুতাজিলা-প্রতিষ্ঠিত 'ইলমুল কালাম'-এর একটি প্রশাখা বলে অনুমিত হয়, তথাপি ইলমুল কালাম থেকে বহু অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অধিকাংশ মুতাজিলা 'ধারণাবাদী', আশারিয়াগণ 'মুতাকাল্লিমুন'—হয় তারা 'বাস্তববাদী' নয় রূপান্তরিত 'নামবাদী'। আশারিয়াগণ বলেন যে, অজ্ঞতার মতো নেতিবাচকগুণ

www.amarboi.org

একটি বাস্তব সত্তা, কিন্তু মুতাজিলাগণ ঘোষণা করন যে এটা একটি গুণের অস্বীকৃতি, দৃষ্টান্তস্বরূপ, অজ্ঞতা জ্ঞানের অনুপস্থিতি। আশারিয়া যুক্তিবিদরা সমর্থন করেন যে কোরআন সৃষ্ট নয় ও চিরন্তন; মুতাজিলাগণ ঘোষণা করেন যে, বিশেষ উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে হযরতের প্রতি নাজিলকৃত আল্লাহর বাণী হল কোরআন, তা না হলে 'নাসিখ' ও মন সুখে'র কোন অর্থ হয় না, কেননা এটা স্বীকৃত যে কতিপয় পরবর্তী আয়াত তার পূর্ববর্তী আয়াতকে রদ করেছিল।

এভাবে আশারিয়া মতবাদ প্রাচ্যের প্রবল প্রতাপশালী চিন্তাগোষ্ঠীতে রূপলাভ করেছিল। যখন সুশিক্ষিত বুয়াইয়াগণ রাজপ্রাসাদের মেয়রের পদ লাভ করেছিল বুদ্ধিবাদ আবার বাগদাদে তার মস্তক উত্তোলন করেছিল। কিন্তু আশারিয়া মতবাদ কখনও জনসাধারণের উপর তার প্রভাব হারায়নি; আর মুতাজিলারা কখনও তাদের পূর্ব গুরুত্ব ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়নি। বুইয়াদরা ছিলেন বুদ্ধিবাদী, কিন্তু সেলজুকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হওয়া সত্ত্বেও আশারিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রেনান[১০০] মন্তব্য করেছেন যে ইতিহাসের দুর্ঘটনার শিকার হওয়ার ফলে ইসলাম বিভিন্ন বংশের সম্পদে পরিণত হয়ে ধর্মান্ধতার কবলে নিপতিত হয়েছিল এবং স্পেনিয়ার্ড, বার্বার, পারসিক, তুর্কীদের হাতে কঠোর ও সম্পূর্ণ নির্বিচারবাদে পরিণত হয়েছিল। "স্পেনে ক্যাথরিক খ্রিস্টধর্মে যা ঘটেছিল ইসলামেও সেই একই ঘটনা ঘটেছিল; যদি ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষে ও সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনায় (খ্রিস্টান জাহানে) ধর্মীয় পুনরুজ্জীবন সমুদয় জাতীয় বিকাশ রুদ্ধ করে দিত তবে সমগ্র ইউরোপে যা ঘটতে পারত (তাই ঘটেছিল মুসলিম জাহানে)।" এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। পারসিকগণ সবসময়েই তাদের নৃপতির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঐশীত্বের ধারণা সংশ্লিষ্ট করে থাকে; তুর্কী, মোঙ্গল, বার্বার জাতি তাদের প্রধানদেরকে আল্লাহর সাক্ষাৎ বংশধর হিসেবে বিবেচনা করে; ইসলাম ধর্মগ্রহণ করলেও নৃপতি বা যুবরাজদের প্রতি তাদের সম্মানের ক্ষেত্রে কোনরূপ নড়বড় হয়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আরবগণ ধর্মান্ধতার সেই দৈত্যটাকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করেছিল, যাকে খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা স্পেনবাসীদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়েছিলেন; তারা ব্যর্থ হয়েছিল এবং যে মুহূর্তে চ্যান্সেলার আল্ মনসুর তাঁর উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে জনসমর্থন আদায়ের জন্য স্পেনে বুদ্ধিবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন; একই জনতা যারা পূর্বে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে ধর্মবিরোধীদের পুড়িয়ে মারতে সাহায্য করেছিল তারাই কর্দোভার বাজারে দার্শনিক গ্রন্থসমূহ ভস্মীভূত করতে সহায়তা করেছিল। সালাদীনের বিজয়াভিযান আশারিয়া মতবাদকে মিশরে নিয়ে গিয়েছিল। যখন বুদ্ধিবাদ প্রাচীন শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাস্ত হল, ইমাম গাজ্জালীর রচনা যা প্রধানতঃ দর্শনের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল তা মযহাবের হস্তকে শক্তিশালী করেছিল। আবু হামিদ মুহম্মদ ইবনে আল্ গাজ্জালী[১০১] নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান ও পূত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন এবং বিজ্ঞানের রহস্যের জগতে ডুব দিয়েছিলেন; এমনকি তিনি স্বাধীন চিন্তারও আশ্রয় নিয়েছিলেন। সহসা একটি শক্ত ভিত্তি যার ওপর পরিশ্রান্ত আত্মা বিশ্রাম

www.amarboi.org

নিতে পারে তার প্রতি আন্তরিক ইচ্ছা, যে মনোভঙ্গী পরবর্তী যুগসমূহে একইভাবে কাজ করেছে তাঁর হৃদয়ের কথা বলেছিল; আর তিনি দার্শনিক থেকে মরমীবাদীতে পরিণত হলেন। তাঁর 'মানকিজ' গ্রন্থে, যে গ্রন্থখানা তাঁর ধর্মীয় ভ্রাতাদের নিকট কথিত বা লিখিত, তিনি বর্ণনা করেছেন কিভাবে তার সহজাত প্রেরণা নিয়ে জ্ঞানের জন্য তিয়াস অনুভব করেছেন এবং তার অন্বেষণে সর্বত্র গমন করেছেণ, সবকিছুর ভেতর ডুব দিয়েছেন, প্রত্যেক বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে পরিচিত করেছেন এবং কিভাবে প্রথম জীবনে যে সব মতবাদ তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল তা বর্জন করেছেন। তিনি বলেছেন যে তিনি হযরতের সেই বাণীটি জানতেন যে বাণী ঘোষণা করেছে যে প্রত্যেক শিশু প্রকৃতির কোলে সত্যের জ্ঞান সহ জন্মগ্রহণ করে এবং জানতে চায় সে সত্য কি। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেছেন কিভাবে সংশয় দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং কিভাবে তাঁর পরিণতি থেকে সত্যের উচ্চতর এলাকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে অর্থাৎ মরমী উত্তরণের মাধ্যমে পরিত্রাণ লাভ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থে দার্শনিকদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ উদ্যত হয়েছে; তিনি তিন শ্রেণীতে দার্শনিকদের বিন্যস্ত করেছেন : (১) দাহ্‌রিজ অর্থাৎ যারা জড়ের নিত্যতায় বিশ্বাসী এবং যারা স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকার করে। (২) পদার্থবাদ বা নিসর্গবিদ অর্থাৎ যারা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, কিন্তু তারা ভাবে যে মানবাত্মা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর অনস্তিত্বে পর্যবসিত হয়; সুতরাং মানুষের কাজের কোন হিসাবনিকাশ হবে না; উভয় শ্রেণীর দার্শনিক নাস্তিক। (৩) খোদাবাদী দার্শনিক (প্লেটো ও এ্যারিস্টটল) "তাঁরা প্রথম দু'শ্রেণী দার্শনিকদের মতবাদসমূহ খণ্ডন করেছেন এবং আল্লাহ তার দ্বারা সত্যিকার বিশ্বাসীকে যুদ্ধ থেকে রক্ষা করেছেন।" "কিন্তু তাঁদেরকেও অবশ্যই নাস্তিক বলে ঘোষণা করতে হবে; আর মুসলিম দার্শনিকদেরকেও যারা তাঁদেরকে অনুসরণ করেছেন, বিশেষ করে ফারাবী ও ইবনে সিনা, কেননা তাঁদের দর্শন এতই বিভ্রান্তিপূর্ণ যে সেখানে মিথ্যাকে খণ্ডন করার জন্য মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করা যায় না। এই দু'জন দার্শনিকের রচনা থেকে আমরা যা আবিষ্কার করতে পারি তা হল জ্ঞান তিনটি শিরোনামে বিভক্ত হতে পারে; একটি শ্রেণীকে আমরা অবশ্যই 'নাস্তিকতা' বলে ঘোষণা করতে পারি, অপরটিকে ধর্মচ্যুতি বলে এবং তৃতীয় শ্রেণী সম্পর্কে আমাদের কোন কিছু বলার প্রয়োজন নেই।" এসব সরলতা সত্ত্বেও গাজ্জালীর রচনার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবহারিক বিচক্ষণতা প্রদর্শিত হয়েছে। তিনি জ্ঞানকে শুধু বিশ্বাসের চেয়ে অনেক উচ্চতর বিষয় বলে প্রশংসা করেছেন, এবং ধর্মান্ধ নির্বিচারবাদের বিরোধিতা করেছেন যে, নির্বিচারবাদ যাবতীয় বুদ্ধিমূলক জিজ্ঞাসা ও জ্ঞান বর্জন করে, কারণ এ তাঁর অসমাদৃত দার্শনিকগণ অনুশীলন করে থাকেন। তিনি এই নির্বিচারবাদকে ইসলামের নির্বোধ বন্ধু বলেছেন। একই সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, নৈতিক অনুশীলন, আত্মশুদ্ধি, ব্যবহারিক দয়া, তরুণদের শিক্ষা, আর তাঁর যুগের মোল্লাদের নীতিবিগর্হিত ও অপদার্থ জীবন পরিহারের উপর তাঁর উপদেশাবলী তাঁর চরিত্রের সততার প্রতিফলন।[১০২]

এই সময় থেকে বুদ্ধিবাদ ও যাজকতন্ত্রের (মযহাব) মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলছিল। ১১৫০ খ্রিস্টাব্দে খলিফা মুস্তানজিদের আদেশে সব সরকারি ও বেসরকারি

www.amarboi.org

গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ইবনে সিনার দার্শনিক গ্রন্থসমূহ এবং 'রাসায়েল-ই-ইখওয়ানুস্ সাফা'র সমুদয় কপি ভস্মীভূত করা হল। ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে আর্ রুকন আব্দুস সালামকে নাস্তিক বলে অভিযুক্ত করা হল, আর জনতা ও পুরোহিতগণ তাঁর গ্রন্থগুলির বহ্ন্যুৎসব করার জন্য অগ্রসর হল। যে মোল্লা এই উৎসবে সভাপতিত্ব করেছিলেন তিনি চেয়ারের ওপর দণ্ডায়মান হয়ে দর্শনের বিরুদ্ধে ভাষণ দিলেন। বইগুলি বের করে এনে তার কাছে দেওয়া হল; বইগুলি নাস্তিকতার ওপর দু'একটি মন্তব্য করে তিনি সেগুলি আগুনে নিক্ষেপ করলেন। মায়মুনাইদের একজন শিষ্য এই অদ্ভুত দৃশ্যের সাক্ষী ছিলেন, এবং তার বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমি এই মোল্লা বিশেষজ্ঞের হাতে ইবনুল হায়সাম (আল্ হাজেনের) জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ দেখলাম। যে বৃত্তের সাহায্যে গ্রন্থকার জ্যোতিষ্কমণ্ডলের অবস্থান প্রদর্শন করেছেন তার দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষন করে বিশেষজ্ঞটি অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন, "হায় দুর্ভাগ্য! হায় কপাল! কী ভয়ানক দুর্বিপাক!"—এই বলে তিনি বইটি আগুনে নিক্ষেপ করলেন। এমন কি ইমাম আল্ গাজ্জালীর প্রভাব এবং সুলতানদের সার্বভৌম ক্ষমতা, যাদের কেউ কেউ অন্তরে বুদ্ধিবাদী ছিলেন, কর্তৃত্বের গুরুভারে প্রজ্ঞার চূড়ান্ত বিজয় প্রতিহত করতে পারত না, যদি মোঙ্গলদের তরবারী সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত না করত। "একজন খান, একজন আল্লাহ্; খানের আদেশ যেমন অপরিবর্তনীয়, তেমনি আল্লাহর বিধানও অপরিবর্তনীয়।" অসংখ্য তরবারীর মদতপুষ্ট এই মতবাদের চেয়ে অধিকতর যৌক্তিক বা অধিকতর অপ্রতিহত মতবাদ আর কি কিছু হতে পারে? বুদ্ধিবাদ, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্যশিল্প বন্যর্বরতার হিমবাহে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। হালাকুর উত্তরাধিকারীদের শাসনাধীনে যে আলোকরশ্মি পশ্চিম এশিয়ায় বিকীর্ণ হয়েছিল তা ছিল অস্তায়মান সূর্যের শেষ আভা। মুসলিম জাহানে বুদ্ধিবাদ ও দর্শন প্রবর্তন লক্ষ্যে যে কোন প্রচেষ্টাকে ধ্বংস করার জন্য সহজাত ধর্মান্ধতার নীতি সক্রিয় ছিল। আইনজীবী সম্প্রদায় শুধু প্রতাপশালী ছিল না বরং তারা ছিল স্বৈরতন্ত্রের প্রধান অবলম্বন। আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি যে, এর পরিণতি হিসেবে যাজকতন্ত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মনমগজ দখল করে নিয়েছিল এবং কালক্রমে তা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। তারা কোন কিছু যাজকতন্ত্রীয় (বা মযহাবী) দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যম ছাড়া প্রত্যক্ষণ করতে পারত না। হযরত বুদ্ধির প্রয়োগের উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, আর তাঁর অনুসারীরা বুদ্ধির অনুশীলনকে পাপ বলে গণ্য করেছে। তিনি মনুষ্য-পুজা ও মানুষের প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাভক্তির বিরুদ্ধে প্রচার করেছিলেন। সুন্নীরা ও চার মযহাব 'সালাফকে বিধিবদ্ধ করেছিলেন, আখবারী ও তাদের গবেষকগণও। তাদের বিধিবদ্ধ পন্থা থেকে যে কোন ব্যতিক্রম, তা হযরতের শিক্ষা ও বুদ্ধির সঙ্গে যতই সামঞ্জস্যপূর্ণ হোক না কেন সেটা অপরাধমূলক। তিনি (হযরত) বলেছিলেন যে "প্রেতাত্মা, ছায়ামূর্তি ও অনুরূপ বিষয়ের সঙ্গে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই।" এখন যে বিষয়ে তারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। তিনি তাদেরকে জ্ঞানের অন্বেষণে পৌত্তলিকদের দেশে গমন করার জন্যও উৎসাহিত করেছেন। কিন্তু নিজের বাড়িতে তাদের তা দিলেও তারা তা গ্রহণ করে না।

www.amarboi.org

'সাফায়ী' শাসকদের অধীনে বুদ্ধিবাদ ও দর্শন আর একবার প্রাণ ফিরে পেয়েছিল, কিন্তু প্রাথমিক আব্বাসীয়দের আমলে যে রূপ প্রাণোজ্জ্বলভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছিল তেমন করেনি। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইরান নিদারুণ দুর্দশার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করেছিল; এই সুদীর্ঘ কালব্যাপী বিপদপাত ও গোলযোগের সময়ে যে তমিস্রা দেশটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন তাতে সুন্নী আইনজীবীদের চেয়ে অধিক মাত্রায় শিয়া মোল্লাগণ খ্রিষ্টান জাহানের পাদরীদের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তারা ফাতেমীয় ইমামদের প্রতিনিধি—এই ভিত্তিতে তারা দাবী করতেন যে আইনের ব্যাখ্যা দানের ক্ষমতা একমাত্র তাদেরই এখতিয়ার ভুক্ত। উসূলী মতবাদসমূহের পুনরুজ্জীবনকারী, মোল্লা সাদরা, যাঁর বিষয় আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, মুহম্মদের ধর্ম তাঁর অব্যবহিত বংশধরগণ যেভাবে বুঝত ও অনুভব করত তার ভিত্তিতে দেশবাসীর মধ্যে দর্শন, বিজ্ঞানের পঠন-পাঠনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এ কাজটি নিঃসন্দেহে সহজ কাজ ছিল না, কিন্তু তিনি কৌশল ও বিচারবুদ্ধি সহকারে কাজ করতেন। ইবনে সিনার দর্শন আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। ইরানের রাজনৈতিক দুর্দৈব, আফগান শাসনামলে জীবনের ক্ষয়ক্ষতি, পারস্যের সিংহাসনে কাজারদের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও ইবনে সিনার দর্শন বহু পরিশীলিত শ্রেণীর ওপর তার প্রভাব স্থায়ীভাবে রক্ষা করতে পেরেছিল। ইবনে সিনার দর্শনের একটি শ্রেষ্ঠ সংক্ষেপ-সার দ্বিতীয় শাহ আব্বাসের[১০৩] রাজত্বকালে "গওহরে মুরাদ" ("কামনার মুক্তা" নামে আব্দুর রাজ্জাক বিন আলী বিন আল্ হাসান আল্ লাহিজী প্রকাশ করেছিলেন। এতে রয়েছে ইবনে সিনার দর্শনের সংক্ষেপ-সার যা খলিফা আলী ও তাঁর বংশধরদের, এবং ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী, নাসির উদ্দীন তূসী, ইমাম তাফ্তাজানী ও অন্যান্যদের মতো দার্শনিক ও পদার্থবিজ্ঞানীদের মতামতের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যাত ও উদাহরণ সহকারে আলোচিত।

আব্দুর রাজ্জাকের কতকগুলি মতবাদ খুবই চিত্তাকর্ষক। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুতাজিলা মতবাদ ও আশারিয়া মতবাদ আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, "মুতাজিলা চিন্তাবিদগণ 'কালামে'র বিজ্ঞান উদ্ভাবন করেছিলেন ধর্মের নীতিসমূহ ও সমাজের প্রয়োজনসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং প্রজ্ঞার নীতিসমূহের মাধ্যমে (কোরআনের) আয়াতসমূহ ও হাদিসগুলির ব্যাখ্যা করার জন্য, যেগুলি আপাততঃ দৃষ্টিতে অসঙ্গত বলে প্রতীয়মান হয়; পক্ষান্তরে তাদের প্রতিপক্ষগণ (কোরআনের আয়াতসমূহ ও হাদিসসমূহকে) আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করতেন আংশিকভাবে ধর্মান্ধতা থেকে ও আংশিকভাবে রাজনীতির খাতিরে; তারা (কোরআন ও হাদিসের) ব্যাখ্যা নিষিদ্ধকরে দিয়েছিলেন; মুতাজিলাদের ব্যাখ্যা ও তাদের মতামতকে ধর্মবিরোধিতা বলে আখ্যায়িত করেছিলেন তার তাদেরকে 'আহলে সুন্নাত ও জামাতে'র বিরোধী বলে পরিগণিত করেছিলেন।...(এই প্রতিপক্ষ দলের) অনেকেই আল্লাহকে বস্তু-সত্তা হিসেবে চিন্তা করার পাপে নিপতিত হয়েছেন। তারা সকলে আল্লাহতে মানবদেহ আরোপের

www.amarboi.org

দোষে দুষ্ট। তারা সকল প্রকার ব্যাখ্যার দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন বলেই এরূপ ঘটেছে। আল্লাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট ও অনুরূপ আয়াত এবং আল্লাহর সন্দর্শন (দিদার) সম্পর্কীয় হাদিস তারা তাদের আক্ষরিক অনুমোদন সহকারে ব্যাখ্যা করেছেন যতক্ষণ না তারা একটি থেকে 'পার্থিবতা' ও অন্যটি থেকে 'সাদৃশ্য' অনুমান করেছেন। এসব চিন্তাবিদের প্রথমে যুক্তি-বিন্যাসের কোন পদ্ধতি ছিল না, তারা কোরআন ও হাদিসের আক্ষরিক অর্থের ওপর নির্ভর করতেন সুপণ্ডিত মুতাজিলা ইমাম আবু আলী জুব্বাইয়ের একজন বিখ্যাত শিষ্য আবুল হাসান আশারীর আবির্ভাবের পূর্বে। আবুল হাসান যুক্তিবিদ্যা ও যুক্তি-বিন্যাস সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি 'মযহাব-ই-ইতাজালা' পরিত্যাগ করে 'আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত' অবলম্বন করেছিলেন; তিনি এই সম্প্রদায়ের অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রচুর প্রয়াস চালিয়েছিলেন—অদ্যাবধি এই সম্প্রদায়ের কোন প্রভাব ছিল না। সে কারণ তাঁর নামানুসারে এই দলের নামকরণ করা হয়েছিল। তিনি মুতাজিলাদের আদর্শানুযায়ী নীতি ও নিয়মাবলীর উদ্ভাবন করেছিলেন।...যেহেতু অত্যাচারী সুলতানেরা দেখেছিলেন যে এই মযহাবের মতবাদগুলি তাদের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তারা এই মযহাবকে সমর্থন করেছিলেন। সুতরাং আশারিয়া মতবাদ আহ্‌ল-ই-ইসলামের মধ্যে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল। যেহেতু মুতাজিলাদের মতবাদসমূহ প্রজ্ঞার নীতিসমূহের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল কাজেই অকপট হৃদয়ের অধিকারী এবং বৃহৎ গোষ্ঠীর স্বীকৃতি লাভ করেছিল। মুতাজিলা গভীরভাবে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেছিলেন, কাজেই এই অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাপ্ত যুক্তি-বিন্যাসের কৌশল তারা অধিবিদ্যক ও ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনায় প্রয়োগ করেছিলেন। যখন আশারিয়া চিন্তাবিদগণ বিষয়টি জানতে পারল, যেহেতু তারা মনে করত যা ইসলামে নেই তা ধর্মবিরোধিতা, তখনি তারা দর্শনের পঠন-পাঠনকে অবৈধ ও বিপজ্জনক বলে ঘোষণা করলেন। এই সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টার আহ্‌ল-ই-ইসলামের মধ্যে দর্শন জনপ্রিয়তা থেকে বঞ্চিত হল—সুপণ্ডিত মুতাজিলা দার্শনিকদের গুরুত্ব ক্ষুণ্ন হল। আশারিয়া চিন্তাবিদেরা দর্শনের এই বিরোধিতার জন্মদাতা, কেননা, তা না হলে দর্শন কোনক্রমেই ধর্ম বা কোরআন ও হাদিসের রহস্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ...প্রেরিত-পুরুষগণ ও তাদের প্রতিনিধিবৃন্দ দর্শনের সত্যগুলি ব্যাখ্যা করেছেন, যে সত্যগুলি সাদৃশ্যের দিক দিয়ে ঐশী। ..."মানুষের কার্যাবলীর স্বাধীনতার প্রেক্ষিতে তিনটি দল রয়েছে : প্রথমটি 'জবর মতবাদ' (অদৃষ্টবাদ), এটা আশারিয়াদের মতবাদ; তারা বলেন যে মানুষের ক্রিয়া আল্লাহতায়ালা তাৎক্ষণিকভাবে সৃষ্টি করেন এবং মানুষের দিক থেকে তার ইচ্ছা প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই, এমন যে, যখন কোন মানুষ আগুন জ্বালে, আলোক প্রজ্জ্বলন ক্রিয়া আল্লাহর কাজ বলে অভিহিত করা হয়।" এই মতবাদের নীতিবিগর্হিত বৈশিষ্ট্য উন্মোচিত করে গ্রন্থকার আরও বলেন, "দ্বিতীয় দল, 'তাফীযে'র সমর্থক, কিছু সংখ্যক মুতাজিলা এই 'তাফীয' মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন। তারা এই অভিমত' পোষণ করতেন যে ন্যায় বা অন্যায়, যে কোনটিকে নির্বাচন করার অবাধ ক্ষমতা মানুষের রয়েছে এবং তদনুসারে

www.amarboi.org

সে কাজ করে। তৃতীয় দলটি ফাতেমীয় ইমামদের দল। দার্শনিক ও বুদ্ধিবাদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ যে অংশ সমর্থন করেন যে মানবীয় কার্যকলাপ মানুষের অব্যবহিত সৃষ্টি, আল্লাহ্ ভাল ও মন্দ বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ দান করেন তারাও এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।"...

খ্রিস্টান জগতে যে ধর্মমত রক্ষণশীল হওয়ার দাবী করে তার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে ইসলামের যে দল অনুরূপ দাবী করে তার বর্তমান অবস্থার তুলনা না করে আমরা পারছি না। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে ক্যাথলিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার পর থেকে লুথারের অভ্যুত্থান পর্যন্ত ক্যাথলিজম বিজ্ঞান, দর্শন ও জ্ঞানচর্চার ঘোরতর শত্রু ছিল; সে অগণিত লোককে ধর্মবিরোধিতার জন্য আগুনে পুড়িয়ে মেরেছে; দক্ষিণ ফ্রান্সে স্বাধীন চিন্তার কণ্ঠরোধ করেছিল এবং বুদ্ধি নির্ভর ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠানসমূহ জোর করে বন্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু লুথার ও ক্যালভিনের বিদ্রোহের পর ক্যাথলিজম আবিষ্কার করেছিল যে বিজ্ঞানের অনুশীলন কিংবা দর্শন গবেষণা বিশ্বাসীকে অবিশ্বাসীতে পরিণত করতে পারে না। সে তার পরিধি বিস্তৃত করেছিল, এবং এখন সে উদারপন্থী চিন্তাবিদ বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সবাইকে তার পতাকা তলে সমবেত করেছে। একজন অ-খ্রিস্টানের কাছে যে সংস্কারপ্রাপ্ত খ্রিস্টান সম্প্রদায়গুলির চেয়ে অধিকতর উদার মনোভঙ্গীর উপস্থাপনা করে। পাঁচশ' বছর ধরে ইসলাম মানবজাতির বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের কাজে সাহায্য করেছিল, কিন্তু তখন একটা প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন শুরু হওয়ায় সহসা মনুষ্য চিন্তার সমগ্র প্রবাহ পরিবর্তিত হয়ে গেল। বিজ্ঞান ও দর্শনের অনুশীলনকারীদেরকে ইসলামের গণ্ডীবহির্ভূত বলে ঘোষিত হল। সুন্নী মযহাবের পক্ষে কি রোমের ক্যাথলিক সম্প্রদায় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা অসম্ভব? অনুরূপভাবে নিজেকে প্রসারিত করে বহুমুখী হওয়া কি তার পক্ষে সম্ভব নয়? মুহম্মদের ধর্মে এমন কিছু নেই যা এ পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ইসলামিক প্রোটেস্ট্যান্টিজম, এক পর্যায়ে মুতাজিলা মতবাদ পূর্বেই পথ করে দিয়েছে। কেন মহান সুন্নী সম্প্রদায়গুলি তাদের প্রাচীন শৃঙ্খল ছিন্ন করে নবজীবনে উন্নীত হবে না?

পাদটীকা

১. সু. ৩৬ আ. ৩৮।
২. সু. ৪২. আ. ২৮।
৩. সু. ২৬ আ. ৩৭।
৪. সু. ৪৮ আ. ২১।
৫. সু. ১৫ আ. ২১।
৬. সু. ১৬ আ. ৭৭।
৭. সু. ১৮ আ. ৪৫।
৮. সু. ২২ আ. ৪০।
৯. সু. ২৪ আ. ৪৫।
১০. সু. ২৫ আ. ২।
১১. সু. ২৫ আ. ৫৪।

www.amarboi.org

১২. সু. ৩০ আ. ৫০।
১৩. সু. ২ আ. ২৮৪।
১৪. সু. ৩ আ. ২৬।
১৫. সু. ৫ আ. ১৮।
১৬. সু. ৫ আ. ১২০।
১৭. সু. ৬৫ আ. ৩।
১৮. সু. ৭৩ আ. ২০।
১৯. সু. ৮৭ আ. ১-৯।
২০. সু. ২ আ. ৬।
২১. সু. ২ আ. ৭।
২২. সু. ১৩ আ. ৩১।
২৩. সু. ১৩ আ. ১১।
২৪. সু. ১৩ আ. ২৭।
২৫. সু. ৪ আ. ১১১।
২৬. সু. ৬ আ. ৭০।
২৭. সু. আ. ২৮।
২৮. সু. ৯ আ. ৭০।
২৯. সু. ১০ আ. ৩০।
৩০. সু. ১০ আ. ১০৮।
৩১. সহীহ্ বোখারী : 'আল্লাহ্ যাকে সাহায্যে করেন সে নিশ্চিত, নিরাপদ।" বর্ণনায় আবু সায়েদ আল্ খুজরি।
৩২. 'নাহ্জুল বালাগাত', পৃ. ৪৩ (হযরত আলী (রাঃ)-র খুতবার সংকলন–এই সংকলন করেছেন তাঁর একজন বংশধর শরীফ রেজা।–এটা উল্লেখ করেছেন ইবনে খাল্লিকান। এই গ্রন্থ ১২৯৯ হিযরীতে তাবরিজে মুদ্রিত হয়।
৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬।
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০।
৩৫. 'তাব্-রাসীর সাক্ষ্য'–শেখ উত্ তাব্রাসী কর্তৃক হাদিস সংকলন।
৩৬. ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা।
৩৭. 'ইহ্তিজাজ উত্ তাবরাসী' পৃ. ২৩৬।
৩৮. আল্ কোরআন।
৩৯. 'ইহ্ তিজাজ উত্ তাবরাসী' পৃ. ২৩৭।
৪০. প্রাগুক্ত।
৪১. 'ইহ্তিজাজ উত্ তাব্রাসী' পৃ. ২৩৬।
৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫।
৪৩. যে 'জবর' মতবাদে বিশ্বাস করে সে ধর্মদ্রোহী।–ইহ্ তিজাজ উত্ তাবরাসী, পৃ. ২১৪।
৪৪. শাহরিস্তানী জাবারিয়াদের দুটি শাখায় বিভক্ত করেন–এক বিশুদ্ধ জাবারিয়া এবং দুই মোসোয়েম পন্থী জাবারিয়া। প্রথম দলের মতে কোন অর্থেই মানুষের প্রতি কর্ম বা কর্মের শক্তি আরোপিত হতে পারে না, আর দ্বিতীয় দলের মতে, মানুষের ক্ষমতা আছে বটে তবে তা আদৌ কোন কাজে আসে না।

www.amarboi.org

৪৫. শাহ্‌রিস্তানী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯।
৪৬. শাহ্‌রিস্তানী, ১ম খণ্ড পৃ. ৫৯-৬৩।
৪৭. গুণারোপকারীগণ।
৪৮. আত্‌তাশবিহো বেসেফাতেল্ মোহাদ্দেসাত্
৪৯. শাহারিস্তানী, 'সেফাতিয়া' বা সদৃশবাদী এবং তাদের পরে যাদের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করেন। "পরবর্তী যুগে কতিপয় চিন্তাবিদ প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাসের সমর্থকদের অতিক্রম করেছিলেন এবং বলতেন যে (আল্লাহর গুণাবলীর নির্দেশক) উক্তিগুলি নিঃসন্দেহে আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এগুলি যেভাবে আছে রূপকের আশ্রয় ছাড়াই ব্যাখ্যাত হওয়া চাই এবং সেই সঙ্গে শুধু আক্ষরিক অর্থের ওপরই জোর দেওয়া চলবে না, এরূপ জোর দিলে প্রাথমিক পর্যায়ের মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস লঙ্ঘিত হয় এবং তা বিশুদ্ধ সদৃশবাদে পর্যবসিত হয়।"
৫০. তিনি আব্দুল মালিক, ওয়ালিদ ও হিশামের শাসনামলে জীবিত ছিলেন। তিনি ৮৩ হিযরী (৬৯৯-৭০০ খ্রি.) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১ হিযরী (৭৪৮-৭৪৯ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন।
৫১. শাহারিস্তানী, পৃ. ৩১ : 'গওহরী মুরাদ' 'মুতাজালা' 'গিয়াস-উল্ লোগাত' এবং 'ফারহাং' (লক্ষৌ, ১৮৮৯ খ্রি.) তৃতীয় সিলেবলে আকার (ফাত্‌হ্) যোগে উচ্চারিত হয়।
৫২. আমরা এখানে দু'তিন জন বিখ্যাত মুতাজিলা চিন্তবিদের নাম উল্লেখ করতে পারি যারা এখনও খ্যাতিমান বলে স্বীকৃতি। যেমন, ইমাম জামাকশারী, 'কাশ্‌শাফে'র গ্রন্থকার, যে গ্রন্থ কোরআনের ভাষ্য হিসেবে সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা পাণ্ডিত্যপূর্ণ ; মাসুদি–ইমাম, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক; বিখ্যাত আল্ হাজেন, আবুল ওয়াফা ও মির্কহোন্দ।
৫৩. মুতাওয়াক্কিলের খিলাফতের সূচনায় ২৩৫ হিজরী (৮৪৯-৮৫০ খ্রি.) তে মৃত্যু।
৫৪. আবুল হুজায়েলের ভাগ্নে।
৫৫. ৮০১ খ্রি. জন্ম এবং ৯৩৩ খ্রি. মৃত্যু।
৫৬. শাহ্‌রিস্তানী, পৃ. ১৮; ইবনে খাল্লিকান।
৫৭. 'নাহজুল্ বালাগাত', মুতাজিলা চিন্তাবিদ, ইবনে আবিল হাদিদের ভাষ্য দেখুন।
৫৮. ইমাম জাফর আস্ সাদিক থেকে।
৫৯. শাহ্‌রিস্তানী বলেন, "মুতাজিলাগণ নিজেদেরকে "আহলুল আদল ওয়াত্ তৌহীদ"–'ঐশী একত্ব ও ঐশী ন্যায়বিচারের সমর্থক বলে অভিহিত করেন এবং কোন কোন সময় "কাদারিয়া" বলেন। সত্যিকারভাবে মুতাজিলা চিন্তাবিদগণ নিজেরা তাদের ক্ষেত্রে 'কাদারিয়া' নাম কখনও প্রয়োগ করেননি; এই নাম মুতাজিলাদের শত্রুরা চরমপন্থী মুতাজিলাদের ক্ষেত্রে আরোপ করেছিলেন, যারা 'তাফীয' মতবাদ সমর্থন করতেন এবং যে মতবাদ ফাতেমীর ইমামগণ নিন্দা করতেন, তারা সর্বদা এই উপাধি প্রত্যাখ্যান করতেন এবং তা অদৃষ্টবাদীদের ক্ষেত্রে চাপাতেন, যারা আল্লাহকে সমুদয় ক্রিয়ার কর্তা বলে ঘোষণা করতেন। শাহ্‌রিস্তানী একথা স্বীকার করতেন। কিন্তু তিনি অদৃষ্টবাদীদের বেলায় 'কাদারিয়া' শব্দের প্রয়োগ খণ্ডন করার চেষ্টা করতেন। "যারা আল্লাহ বিশ্বাস করে তাদের ক্ষেত্রে কিভাবে এর প্রয়োগ হয়?"–শাহ্‌রিস্তানী, পৃ. ৩০।
৬০. শাহ্‌রিস্তানী, পৃ. ৩০।
৬১. শাহ্‌রিস্তানী, পৃ. ৩১।
৬২. তুলনীয়; ইবনে রুশদের ধারণাসমূহের সঙ্গে জুয়াইনীর ধারণাসমূহের তুলনা করা যেতে পারে। শাহ্‌রিস্তানী স্পষ্টত; ফাতেমীয়দের চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হননি। শাহ্‌রিস্তানী,

www.amarboi.org

১ম খণ্ড, পৃ. ৭০-৭১। 'আবুল মা'আলীর মতবাদ গোঁড়া শাহরিস্তানী পন্থীদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৬৩. তারা হযরত আলী বর্ণিত একটি হাদিস, যা "বাহ্রুল আনওয়ার" সৃষ্টিতত্ত্ব থেকে নেওয়া, তাদের ধারণা অনুমিত হয়েছিল।"

৬৪. উত্তর ছিল: "আল্লাহ্ সবচেয়ে ভাল জানেন।"

৬৫. 'গওহর-ই-মুরাদে'র গ্রন্থকারের কথা আমি পরে কিছুটা বিস্তারিতভাবে বলব, যিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে "ধর্মতন্ত্রের ভাষায়" "ফেরেশতা" বলতে যা বুঝায় তা বিজ্ঞানের ভাষায় প্রাকৃতিক শক্তি নিচয়।

৬৬. শাহ্রিস্তানী আরও অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন, যেমন ইয়াইয়া আল্ নাহ্য়ী, আবুল ফারাজ আল্ মুফাসসির, আবু সোলায়মান আল্ সাজযি, আবু বকর সাবিত বিন কুর্রাহ্, আবু সোলায়মন মুহম্মদ আল্ মুকাদ্দাসি, আবু তামাম ইউসুফ বিন মুহম্মদ নিশাপুরী, আবু জায়েদ আহমদ বিন সাহ্য আল্ বলখী, আবু মুহারিব আল্ হাসান বিন সাহ্শ বিন মুহারিব আল্ কুমী, আহমদ বিন তাইয়েব আল্ সার্রাখরি, তাল্হা বিন মুহম্মদ আল্ নাফসী, আবু হামিদ আহমদ বিন মুহম্মদ আল্ সাফজারি, ঈষা বিন আলী আল্ ওয়াজির, আবু আলী আহমদ বিন মুসকুয়্যা, আবু জাকারিয়া ইয়াহইয়া বিন আদি আল্ জুমাইরী, আবুল হাসান আল্ আমরি। তিনি স্পেনের কোন দার্শনিকের উল্লেখ করেননি।

৬৭. ১৩ থেকে ৮৪২ খ্রি. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৬৮. 'উইয়ুন-উল-মাসায়েল' (ডায়েটারিসির সংস্করণ, পৃ. ৫২) দেখুন। যেখানে তিনি অবরোহমূলক যুক্তিবিন্যাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, সৃষ্টি সার্বভৌম বুদ্ধির ক্রিয়া এবং জগতের কোন কিছুই আকস্মিক নয়।

৬৯. বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক তাঁর দুটি গ্রন্থ–'শিফা' ও 'নাজাত' এখনও পুরোপুরি টিকে আছে।

৭০. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৭১. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

৭২. 'ফাস্সুল মাকাল' (১৮৫৯ খ্রি. মিউনিকে প্রকাশিত মুলার সংস্করণ) ৫৭৫ হিযরীতে আল্মোহেদ নৃপতি ইউসুফ ইবনে তাশ্ফিনের জন্য লিখিত হয়েছে বলে কথিত-এই গ্রন্থে তিনি এই সামঞ্জস্য স্থাপন করেছেন।

৭৩. রেনান, অ্যাভের্রোজ এট অ্যাভের্রোইজম, পৃ. ১৬৩।

৭৪. 'রিসালা'–পুস্তিকা; রাসায়েল এই শব্দের বহুবচন।

৭৫. ১৩০৫ হিযরীতে হাজী নূরউদ্দীন, ৪ খণ্ডে এই গ্রন্থ প্রকাশ করেন বোম্বেতে।

৭৬. তৃতীয় 'রিসালা' ৪র্থ খণ্ড, দেখুন।

৭৭. চতুর্থ 'রিসালা, ৪র্থ খণ্ড, দেখুন।

৭৮. উদ্দীনের 'আখলাক-ই-নাসিরি' 'আখলাক-ই-জালালী এবং হুসাইন ওয়াইজ 'কাশিফি'র আখলাক-ই-মুহ্ সিনি'।

৭৯. লিউইজ, হিস্ট্রী অব ফিলোসফি, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯।

৮০. এবং

৮১. পূর্ববর্তী অধ্যায়ের এদের কথা বর্ণিত হয়েছে।

৮২. ইবনে খাল্লিকান।

৮৩. 'মুয়াত্তা'–অভ্যস্ত পথ–তাঁর আইনবিজ্ঞানের নাম।

৮৪. শাফেয়ী মতবাদ ভারতের হানাফীদের মধ্যে দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে।

www.amarboi.org

৮৫. মাদ্রাসা এক ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলেজ, স্কুলের মত।

৮৬. বিচারালয় বা দরবার (মাহ্‌শমাহ্)।

৮৭. পরিশিষ্ট দেখুন।

৮৮. আল্ আশারী বসরায় ২৬০ হিজরীতে (৮৭৪ খ্রিঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশ কাল বাগদাদে অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর চল্লিশ বছর বয়ঃক্রম কাল পর্যন্ত মুতাজিলাদের অনুসারী ছিলেন। তিনি তাঁর পুরাতন মত পরিবর্তনের কারণ হযরতের উপদেশের প্রতি আরোপ করেছিলেন, যে উপদেশ তিনি রমজান মাসে স্বপ্নের মাধ্যমে পেয়েছিলেন।

৮৯. শাহরিস্তানী পরে এই শব্দটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৯০. আবিল কাসিম বিন আল্ হাসান বিন হেবাতুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন আল্ হাসান আলী শাফেয়ী, উপনাম ইবনে আসাকির ৪৯৯ হিযরীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ৫৭১ হিযরীতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তিনি দামেস্কের ইতিহাস রচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি একজন কঠোর শাফেয়ী, এবং আশারীর একজন প্রচণ্ড সমর্থক ছিলেন। তিনি আশারীকে ইসলামের পুনরুজ্জীবনকারী ও অগ্রগামী সমর্থক ছিলেন। তাঁর গ্রন্থটির নাম "ক্ষতিকর সত্য সম্পর্কে হাসান্ আল্ আস্কারীর সম্পাত।"

৯১. মুতাকাল্লিম বিল্ নিসান।

৯২. আল্ মালিক ফেনা খসরু রাজপ্রাসাদের মেয়র হিসেবে ৩৬৭ থেকে ৩৭২ হিযরী পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। কিভাবে ফেনা খসরু মুতাজিলা সমর্থক প্রধান কাজীর বাটীতে "বিদ্বান ব্যক্তিদের সমাবেশে" যোগদান করার পর জানতে পেরেছিলেন যে সেই সমাবেশে একজনও আশারিয়া দলের পণ্ডিত ছিলেন না, সে সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে বাগদাদে একজনও আশারিয়া পণ্ডিত নেই। তখন তিনি কাজীকে বাইরে থেকে একজন আশারিয়া পন্ডিত আনার জন্য চাপ দেন। বর্ণিত হয়েছে যে তাঁর অনুরোধে আল্ আশারীর অন্যতম বিখ্যাত শিষ্য আল্ বাকীল্লানাকে বাগদাদে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। ফেনা খসরু তাঁর তত্ত্বাবধানে তাঁর ছেলের শিক্ষার ভার অর্পণ করেছিলেন। এই কাহিনী সত্য হোক কিংবা মিথ্যা হোক, তাঁর রাজত্বকাল থেকে আশারিয়াদের অভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল।

৯৩. আবু নসর মনসুর কুন্দরী উপনাম আমিদ-উল্-মুলক।

৯৪. সালাদীন ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণ।

৯৫. উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার আল মোহেদ বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

৯৬. কবরের শাস্তির (আজাবের) বিষয় পরে স্পষ্টতর হবে।

৯৭. এটা বিশ্বাস করা হয় যে মৃতকে কবরস্থ করার তিন দিন পর মনকির ও নকির নামক দু'জন ফেরেশতা কবরে মৃতদেরকে দণ্ডের আঘাতে জীবিত করেন এবং তার অতীত জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তার উত্তর লিপিবদ্ধ করেন। তারা পরমার্শদাতা বিচারক হিসাবে কাজ করেন। এই বিশ্বাস স্পষ্টত: মিশরীয়দের ধারণার একটি প্রশাখা; ইসলাম প্রচারের পূর্বে এই মতবাদ আরবদেশের লোকসাহিত্যে গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছিল।

৯৮. হযরতের মিরাজে বিশ্বাস ইসলামে সর্বজনীন। আশারিয়া সম্প্রদায় ও বিভিন্ন মযহাব পন্থীগণ বিশ্বাস করেন যে, হযরত দৈহিকভাবে মর্ত্য থেকে স্বর্গে নীত হয়েছিলেন, বুদ্ধিবাদীরা অভিমত পোষণ করেন যে মিরাজ ছিল আধ্যাত্মিক উড্ডয়ন, এটা ধাপে ধাপে মানবাত্মার উত্তরণের নির্দেশক, যতক্ষণ বা বিশ্বআত্মার সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলন সাধিত হয়।

www.amarboi.org

৯৯. রক্ষণশীল সুন্নীরা বিশ্বাস করেন যে, একবার যখন খলিফার প্রতি আনুগত্যের পবিত্র শপথ গ্রহণ করা হয় তখন তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা ধর্মীয় পাপ; ফলে সকল মুসলিম নৃপতি অভিষেক কালে খলিফার অনুমতি নিতেন, সে খলিফা যতই অশক্ত হোক না কেন, আর এই অনুমোদনের ফলে প্রজাদের দিক থেকে সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকে অবৈধ করে তুলত।

১০০. 'অ্যাভেরোর্জ এট্ অ্যাভেরোইজম'।

১০১. তিনি ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দে (৪৫০ হি.) খোরাসানের তুস শহরে (ফেরদৌসীর জন্ম স্থান) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১১১১ খ্রিস্টাব্দে (৫০৫ হি.) মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ইহ্ইয়া-উল-উলুম' ("ধর্মের বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন"); 'মানকিজ মিন আজ জালাল' ("ভ্রান্তি থেকে পরিত্রাণ") 'মাকাসিদ্-উল্ ফালাসিকা ("দার্শনিকদের প্রবণতাসমূহ"); আব 'তাহ্ফাতুল্ ফালাসিকা' ("দার্শনিকদের বিনাশন")। এই গ্রন্থের খণ্ডন করে। ইবনে রুশদ 'তাহ্ফাতুত্ তাহফাতুল ফালাসিফা ("দার্শনিকদের বিকাশনের বিনাশন") ইত্যাদি; অধ্যায়-১১ দেখুন।

১০২. পরবর্তী অধ্যায় দেখুন।

১০৩. এই সুলতান সম্পর্কে কথিত আছে যে তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ প্রথম আব্বাসের মতো সকল ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। তিনি প্রায়ই তাঁর মূলনীতির উল্লেখ করতেন যা এ বিষয়ে তাঁর আচরণ নিয়ন্ত্রিত করত; "আমার জন্য নয়, আল্লাহর জন্যই মানুষের বিবেকের বিচার; এবং যা মহান স্রষ্টা ও বিশ্বের প্রভুর বিচারালয়ের অন্তর্ভুক্ত সে ব্যাপারে আমি কখনও হস্তক্ষেপ করব না।"

www.amarboi.org

একাদশ অধ্যায়

ইসলামের মরমীবাদী ও ভাববাদী মর্মবাণী

তিনি আদি ও অন্ত, প্রকাশ্য ও গুপ্ত, আর তিনি সব বিষয়ে অবহিত।

—আল্ কোরআন

যে মরমীবাদী দর্শন আধুনিক পারস্য সাহিত্যের অন্তরাত্মা তার বিশিষ্ট উৎপত্তি হল কোরআনের বাণীর প্রতি মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দল যে নিগূঢ় তাৎপর্য আরোপ করেছিলেন তা থেকে ঐশী পরিব্যাপ্তির যে সমুন্নত অনুভূতি নিয়ে হযরত প্রায়ই কথা বলতেন, ব্যগ্র ও মরমী তন্ময়তার যে গভীরতা তাঁর ধর্মনিষ্ঠাকে বিশিষ্টতা দান করেছিল তাই মুসলিম মরমীদের প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছিল। হযরতের জীবদ্দশায় যখন কর্তব্য সমাধা ধর্মীয় অনুধ্যানের আগে স্থাপিত হয়েছিল তখন ইসলামের চিন্তামূলক ও মরমী উপাদানের পরিপূর্ণ বিকাশের খুব কম সুযোগই ছিল। এই মরমীবাদী ও অনুধ্যানমূলক উপাদান সব ধর্মেই ও সকল জাতির মধ্যেই বর্তমান। তথাপি এই বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি ও জাতির বিশিষ্টতা এবং বাস্তব বস্তুর সঙ্গে নৈর্ব্যক্তিক অবস্থাকে সংমিশ্রিত করার প্রবণতা অনুসারে পরিবর্তিত হয়। হিন্দুরা অসীমের মধ্যে সসীমের অবলুপ্তিকে শান্তির পরিণতি বলে বিবেচনা করেন এবং সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য এক নির্দিষ্ট বিন্দুতে অবিচল থাকেন ও পরিপূর্ণ ঔদাসীন্যের নিকট আত্মসর্মপন করেন। অসীমের ধারণা তাকে এমন ভাবে পেয়ে বসেছে যে তার পক্ষে পুরোহিত ও আল্লাহর মধ্যে কিংবা নিজের ও আল্লাহর মধ্যে বস্তুগত ভাবে পার্থক্য নির্দেশ করা, আর শেষ পর্যন্ত উপাস্য ও প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ যার মধ্যে তিনি প্রকাশিত বলে অনুমিত হয় তার মধ্যেও পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন হয়ে পড়ে। শ্রীমদ্‌ভগবত গীতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ক্রমশ ও এ ধরনের অনুধ্যান স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভেদ—এই আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তে পর্যবসিত হয়। এভাবে আমরা দেখি কতই না অদ্ভুতভাবে সর্বখোদাবাদ চরম অভিব্যক্তিতে বস্তু পূজায় পর্যবসিত হয়, যা ঐশীত্বের অন্যান্য ধারণার পূর্বগামী হয়েছিল। শৈশবে মানবমন এক অবিমিশ্র ভীতিভাব ছাড়া কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয় জ্ঞাত ছিল না। আদিম অরণ্যানী যা

www.amarboi.org

মানুষ তখনও স্পর্শ করেনি, বিশালকায় পর্বতরাজি যা দূরে অবস্থিত ছিল, রাত্রির অন্ধকার তার ভয়ানক, অতি প্রাকৃতিক আকৃতি নিয়ে তার চারপাশে ঘোরাফেরা করত, অরণ্যের শীর্ষে বাতাস আর্তনাদ করত—সব মানুষের শৈশবমনে ভীতি ও বিস্ময় জাগাত। তার নিজের বা নিজের অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী বা অধিক ভীতি-উদ্রেককারী প্রত্যেক জড়বস্তুকে সে পূজা করত। ধীরে ধীরে সে প্রকৃতির যাবতীয় বস্তুতে ভাব বা আদর্শ আরোপ করত এবং ভাবত যে এসব ভাব বা আদর্শ উপাসনার যোগ্য। কালক্রমে এসব স্বতন্ত্র ভাব/আদর্শ এক সার্বজনীন সর্বব্যাপী ভাব/আদর্শে পর্যবসিত হয়েছিল। জড়বাদী সর্বখোদাবাদ বস্তুপূজা থেকে উত্তরণের ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ।

প্রাচ্য চিন্তার সন্ততি, নব্য-প্লেটোবাদ খ্রিস্টধর্মের ওপর তার বৈশিষ্ট্য মুদ্রিত করেছিল, আর সম্ভবতঃ খ্রিস্টের নৈশভোজন বিষয়ক ধারণার জন্ম দিয়েছিল। জোহান্স স্কোটাস ও একহার্ট[১] ব্যতিরেকে ইউরোপের সব মরমীবাদী মধ্যযুগে একমাত্র এই ভিত্তির ওপর সংগ্রাম করেছিলেন। অসীমের প্রতি উচ্চতর আকৃতির নির্দেশক প্রকৃত মরমীবাদ মুসলমানদের "অন্তরের আলোক" তত্ত্বের ফলশ্রুতি।

কোরআনের বাণীতে গভীরতর ও গূঢ়তর তাৎপর্য রয়েছে—ইসলাম জাহানের মহত্তর ব্যক্তিদের এই ধারণা কোরআনের "বচন ও মতবাদে"র কাঠিন্য এড়িয়ে যাওয়ার কামনা থেকে জন্ম নেয়নি, বরং তা জন্ম নিয়েছে একটি গভীর প্রত্যয় থেকে যে এসব বাণী জনপ্রিয় ভাষ্যকারগণ যে অর্থ বহন করে বলে অনুমান করেন তার চেয়ে অধিকতর তাৎপর্য নির্দেশ করে। ঐশী পরিব্যাপ্তির গভীর অনুভূতি—যে অনুভূতি কোরআনের শিক্ষাসমূহ ও হযরতের নির্দেশাবলী থেকে উৎপন্ন ও তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ, এই প্রত্যয়ের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে মুসলমানদের মধ্যে যে অনুধ্যানমূলক বা ভাববাদী দর্শনের জন্ম দিয়েছে তা-ই সুফীবাদ নাম ধারণ করেছে, এবং মুসলমানদের মধ্যে সেই মতবাদের বিস্তারে নব্য-প্লেটোবাদী ধারণার উপস্থিতি সম্ভবতঃ সাহায্য করেছে। প্রাচ্যে ইমাম আল্ গাজ্জালী ও প্রতীচ্যে ইবনে তোফায়েল মুসলমানদের মধ্যে মরমীবাদের দু'জন মহান প্রতিনিধি ছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি যেসব দর্শনে জ্ঞান অভিজ্ঞতা নির্ভর বা প্রজ্ঞা-নির্ভর বলে নির্দেশিত হয়েছে তার প্রতি ইবনে তোফায়েল ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং সুফীবাদের আশ্রয় নিয়েছেন। প্রাচ্যের মুসলমানদের মধ্যে সুফীবাদের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে আল্ গাজ্জালীর প্রভাব প্রভূত সাহায্য করেছে এবং মুসলিম প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা ভাববাদী দর্শন গ্রহণ করেছেন। মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী (তুরস্ক) যাঁর 'মসনবী'[২] সুফীরা অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, সানায়ী, যাঁকে জালালউদ্দীন রুমী তাঁর গুরু বলেছেন,[৩] ফরিদউদ্দীন আত্তার, সামশুদ্দীন হাফিজ, খাকানী, নীতিবাদী সাদী, উপাখ্যানকার নিজামী-সকলেই এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

এটা অনুমান করা অবশ্যই ঠিক হবে না যে ইসলামে আল্ গাজ্জালী "অন্তর-আলোক" তত্ত্বের প্রথম প্রচারক। আল্লাহর স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান (তা'য়ার্রুফ) ধর্মের মধ্যে অন্তর্নিহিত রয়েছে। আল্লাহর নৈকট্য লাভের ও তাঁর সঙ্গে যোগস্থাপনের নিয়ত বা ইচ্ছা

www.amarboi.org

প্রকৃত ধর্মনিষ্ঠা অপরিহার্য। হযরতের মিরাজ (উড্ডয়ন) অসীমের সঙ্গে সসীমের পরিপূর্ণ মিলনের নির্দেশক। যেসব নর-নারী ঐকান্তিকভাবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও নির্দেশ লাভের আকুতি প্রকাশ করে কেবল তাদের হৃদয়ের সঙ্গেই আল্লাহ্ কথা বলেন না, বরং যাবতীয় জ্ঞান সেই সার্বভৌম প্রজ্ঞার থেকে আসে; হযরতের নিকট এই জ্ঞান আসত 'ওহী'র মাধ্যমে; আর কোন মধ্যস্থতা ছাড়াই তিনি তাঁর মনোনীত বান্দাদের নিকট (ফিসির্রাত কালবই) হৃদয়ের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা জ্ঞাত করাতেন। ইসলামে এর নাম 'ইলমে লাদুন্নি' বা আল্লাহ্ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান।[৪] কোরআনে যেখানে বলা হয়েছে "আমরা তাঁকে (মনোনীত বান্দাকে) আমাদের থেকেই জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলাম" আল্লাহ্‌র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের একই ধারণা বিখ্যাত হাদিসে স্থান পেয়েছে যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ বলেছেন "আমার পৃথিবী ও আমার আকাশ আমাকে ধারণ করতে পারে না, কিন্তু আমার বিশ্বাসী বান্দার হৃদয় আমাকে ধারণ করতে পারে।"[৫] মানুষের হৃদয়ে ঐশী অঙ্গীকারের সহানুভূতিশীল নির্দেশ ধ্বনিত হয় যখন প্রার্থনার মাধ্যমে তা সমুন্নত হয়; সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ শোনেন যে প্রার্থনা আমি করি। হে আমার প্রভু, তোমায় জন্যই প্রশংসা।"[৬]

একই অতীন্দ্রিয়বাদ অন্যান্য হাদিসেও পাওয়া যায়; আলী তাঁর ভাষণে অন্তরালোকের উপর আলোচনা করেছেন,[৭] ফাতিমাত্ আজ্ জাহরা (আমাদের জ্যোতির মহিলা) তাঁর প্রচারের মধ্যে[৮] এ বিষয়ে আলোচনা রেখেছেন; শহীদ[৯] হুসাইনের পুত্র আলীর পৌত্রের প্রার্থনার মধ্যে এর তন্ময় প্রকাশ ঘটেছে। তবে অন্তরালোক সম্পর্কীয় এসব প্রাথমিক বিবরণীর মধ্যে কোথাও এ ধরনের নির্দেশনার কোন ভিত্তি নেই। যে হযরত বা তাঁর সাক্ষাৎ আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারীদের কেউ কখনো সত্যের অন্বেষণে জাগতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন কিংবা যে কৃচ্ছ্রতাবাদের তিনি তীব্র নিন্দা করেছেন তা পালনের জন্য প্রচার করেছেন।[১০] মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদের বিকাশে যথার্থই এরূপ ঘটেছে। আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতা[১১] অর্জনের প্রচেষ্টায় কিছু সংখ্যক মুসলমান এই নীতিসূত্র বিস্মৃত হয়েছেন যে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের উপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভরশীল। কিভাবে এটা ঘটেছে তা চিত্তাকর্ষক।

মরমীবাদী ধর্মমত খ্রিস্টধর্ম কিংবা ইসলামে কোন নতুন বিকাশ নয়। এটা রোমকদের মধ্যেও ছিল এবং ইহুদীদের নিকটও অপরিজ্ঞাত ছিল না। আর্য ভারত এই ভাব উন্মত্ততার পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং প্রতিটি ধারায় তা অনুশীলিত হত। ভারত থেকে তা পাশ্চাত্য ও মধ্য এশিয়ায় নীত হয়েছিল, এসব জায়গায় মরমী অনুশীলন উদ্ভট আকার ধারণ করেছিল। যেখানে এইভাব প্রোথিত হয়েছিল সেখানে তা বহির্জগতের সঙ্গে যাবতীয় যোগাযোগ প্রত্যাহার, সমুদয় পারিবারিক বন্ধন ও দায়িত্ব-কর্তব্য পরিবর্জন এবং অন্যান্য বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে মাত্র একটি বিষয়ে মানব-মনের অভিনিবেশকে বুঝাত। বাস্তবিক, এটাই মরমী ধর্মমতের সার বলে প্রতিবেদিত হয়। যীশুখ্রিস্টের আহ্বান ছিল মরমীবাদীদের প্রাচীনতম শিক্ষার প্রতিধ্বনি। পক্ষান্তরে, ইসলামের নবীর কম চিত্তাকর্ষক কর্তব্যের বিশ্বস্ত সম্পাদন মানুষের সেবাকে আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য

www.amarboi.org

উপাসনা বস্তে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর আহ্বান ছিল পুরাতন ধারণার সাক্ষাৎ বিরোধিতাপূর্ণ।

দুর্ভাগ্যবশতঃ, খলিফা আলীর[১২] হত্যাকাণ্ডের পর প্রাথমিক ও সত্যকার খিলাফতের ধ্বংসের ফলে যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল, সমুদয় বিভীষিকাসহ মদিনা-লুণ্ঠন এবং দামেস্কের অধিকতর ইন্দ্রিয় পরায়ণ নৃপতিদের শাসনাধীনে যে পৌত্তলিক স্বেচ্ছাচারিতা সমাজজীবনে প্রচলিত হয়েছিল তা বহু ঐকান্তিকতাকামী মুসলমানদেরকে নির্জনতা ও ধর্মের কোলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। ধর্মনিষ্ঠার পরবর্তী স্তরই হল বৈরাগ্য। সেই থেকে মরমীবাদী ধর্মমতের বিবর্তন স্বাভাবিক পথেই চলেছে। বিশেষ পশমী বস্ত্র (খিরকা) অনুশোচনা ও পার্থিব বিষয়ের পরিবর্জনের নিদর্শন হিসেবে অনেক পূর্ব থেকেই[১৩] শুরু হয়েছিল। আধ্যাত্মিক বিকাশ সম্পর্কীয় সুফী-তন্ত্র পরিপূর্ণ আত্মত্যাগ এবং আল্লাহর চিন্তায় পূর্ণ সমাহিত চিত্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুফীগণ বিশ্বাস করেন যে এই সমাহিত-চিত্ততা ও মানসিক অভিনিবেশের[১৪] বলে তারা ঐশী সত্তার সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠতর যোগসম্পর্কে স্থাপন করতে ও সত্যের অধিকতর যথার্থ পরিচয় লাভ করতে পারেন। এই বিশ্বাস নিঃসন্দেহে বহু পবিত্রাত্মা ও ভক্তিমান নর-নারীকে ধর্মের সেবায় উৎসর্গীত হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং যুগপৎভাবে উদ্ভট ধারণার অধিকারী এক শ্রেণীর লোকের সৃষ্টি করেছিল।

খলিফা আলী এবং তাঁর বংশের ইমামগণ সর্বাধিক পরিমাণে 'অন্তরালোকে'র অধিকারী বলে বিবেচিত হন। আবু নসর আস্ সাররাজ তাঁর সুফী-দর্শন গ্রন্থ 'আল্ লুমা'[১৫] জুনায়েদের[১৬] বাণী হিসেবে উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে আলী যদি এতগুলি যুদ্ধে লিপ্ত না হতেন তবে তিনি যে বিশাল 'ইলমে লাদুন্নি,[১৭] লাভ করেছিলেন[১৮] তা জগদ্বাসীকে দান করে যেতে পারতেন। ফরিদউদ্দীন আত্তারের[১৯] 'তাজকিরাতুল আউলিয়া'[২০] গ্রন্থে মরমীবাদী সাধকদের তালিকা ষষ্ঠ ধর্মীয় ইমাম জাফর আস্ সাদিককে সিল্সালা/আধ্যাত্মিক পরম্পরা হযরত আলীতে পৌছে এবং তাঁর মাধ্যমে হযরত মুহম্মদ (দঃ)-এ পৌছে।[২১] অল্পসংখ্যক লোকে আবু বকর (রাঃ) পর্যন্ত সিলসালা (আধ্যাত্মিক পরম্পরা) টানেন।

প্রথম দুই শতাব্দীতে যেসব পূণ্যাত্মা নরনারী সমৃদ্ধি লাভ করে ছিলেন তারা সুফীদের চেয়ে অধিকতর বৈরাগ্যবাদী ছিলেন। তারা জগৎ পরিবর্জন করে সর্বতোভাবে যুহ্দ ও তাকওয়া (ভক্তি ও ধর্মনিষ্ঠা)-র মধ্যে নিজেদেরকে সমর্পণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইমাম হাসান আল্ বসরী[২২] ইবরাহিম বিন আদহাম,[২৩] মারুফ কার্খী,[২৪] জুনায়েদ,[২৫] রাবেয়া[২৬] যিনি ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন, বায়েজীদ বোস্তামী এবং আরও অনেকে। তৃতীয় হিযরী শতকে যখন জুনায়েদ সমৃদ্ধি অর্জন করেছিলেন তখন সুফীবাদ ইসলামী দর্শনের একটি স্বীকৃত শাখায় পরিণত হয়েছিল, কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত চিন্তায় এ যে প্রশ্রয় দিয়েছিল তাতে বিভিন্ন ব্যক্তির মনে সুফীবাদ সুস্পষ্টভাবে অ-ইসলামিক রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করেছিল। আবু নজর আস্ সার্রাজ পুরাতন ধারণাসমূহের বিশৃঙ্খলা থেকে যে সব অদ্ভুত প্রবণতা জন্ম নিয়েছিল তা বর্জন

www.amarboi.org

করেছিলেন। মরমীবাদী ধর্মমতের কতিপয় শিক্ষক জোহান্স এগ্রিকোলার মতবাদ প্রবর্তনের পূর্বেই ঘোষণা করেছিলেন যে পরিপূর্ণ জ্ঞান "জ্ঞাতা"কে নৈতিক নিয়মের যাবতীয় প্রতিবন্ধ থেকে মুক্ত করে।[২৭]

সূফী দর্শনের প্রণালীবদ্ধকরণে আস্ সার্রাজ ছিলেন আল্ গাজ্জালীর পূর্বসুরী। সুফীবাদকে নিয়ন্ত্রিত খাতে চালাতে চেষ্টা করা সত্ত্বেও এ সেই পুরাতন নষ্টিক এবং প্রায়ই বিপরীত স্রোতে প্রবাহিত হয়েছিল। এতদসত্ত্বেও যে পাঁচশ' বছর হযরতের মৃত্যু ও আল্ গাজ্জালীর আবির্ভাবের মধ্যে অতীত হয়েছিল তখনও বহু নরনারী তাদের বিদ্যাবত্তা, ধর্মনিষ্ঠা ও চরিত্র মাহাত্ম্যের জন্য শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করতেন। আল্ গাজ্জালীর শিক্ষক, বিখ্যাত ইমামুল হারামায়েন ছিলেন তাদের অন্যতম।

প্রাচ্যের সুফীবাদ বহুলাংশে তার প্রণালীবদ্ধকরণ এবং যে বর্ণ ও সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়েছে তার দরুণ ইমাম আল্ গাজ্জালীর কাছে ঋণী। জগতের রঙ্গমঞ্চে তাঁর আবির্ভাব ছিল সময়োপযোগী এবং যে সব কারণ আমি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করতে চাই সেজন্য সুন্নী মযহাবের প্রাণবন্ত হওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল।

৩২০ হিযরীতে আল্ আশারী পরলোকগমন করেন; আল্ গাজ্জালী ঠিক এর ১৩০ বছর পর, মুসলিম বর্ষপঞ্জীর পঞ্চম শতকের শেষের দিকে জন্মগ্রহণ করেন এবং চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর পুনরুজ্জীবন ধর্মীয় রচনার কাজ শুরু করেন। পঞ্চম শতক ইসলামের ইতিহাসে খুবই সংকটময় সময়। যখন মুহম্মদের ধর্ম খ্রিস্টান জাহানের সঙ্গে মরণ-রণে ব্যাপৃত, যখন তার অস্তিত্ব বিপন্ন, তখন তার অভ্যন্তরে বিশ্বাসঘাতক শত্রু তাঁকে বিষময় করে তুলছিল। হাসান সাব্বাহর মূলনীতিগুলি তাঁর প্রতি অন্তর্নির্হিত ও প্রশ্নাতীত আনুগত্য মুদ্রিত করে দিয়েছিল ফাতেমীয় খলিফা নিজারের প্রতিনিধি হিসেবে, এই সম্প্রদায় তাঁকে অবতরিত ইমাম হিসেবে সাধারণতঃ মনে করত। তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে সত্যের পথ তাঁর মাধ্যমে ও তাঁর মধ্যে গিয়ে পৌঁছেছে। 'হাশিশ' দ্বারা নীত হয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্য ও তার নির্দেশের অবিচল প্রতিপালনের জন্য পরকালে যে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি তিনি পেয়েছিলেন তার পূর্বাভাস তাঁর শিষ্যগণ জাগরণ অবস্থায় দেখতে পেত। প্রত্যেক জায়গা থেকে সংগৃহীত কুমারীগণ তাঁর শিষ্যদের গলায় তাঁর শৃঙ্খল পরিয়ে দিতে সাহায্য করত। তাঁর গুপ্ত সংবাদবাহকগণ বিভিন্ন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে অথচ এক দুর্দমনীয় চালক শক্তির নিয়ন্ত্রণের মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার প্রত্যেক শহর, পৌরসভা ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রত্যেক গৃহে এই মারাত্মক ভ্রাতৃসংঘের গুপ্ত সদস্য বর্তমান ছিল। ধর্মের প্রতি বীরত্বব্যঞ্জক সেবা, জ্ঞান, ধর্মনিষ্ঠা বা চরিত্রের মহত্ত্ব—কোন কিছুই ইসলামের এই বিধ্বংসী গোষ্ঠীর[২৮] বিরুদ্ধে কোন রক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করেনি। সমাজের এই শত্রুদের দ্বারা মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম ব্যক্তিদের ধ্বংস করেছিল। তাদের প্রচার শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমিত ছিল না। ইহুদী, খ্রিস্টান, জরথুস্ত্রবাদী ও হিন্দু—সকলেই ধর্মান্তর করণে তাদের কপট পদ্ধতির শিকারে পরণত হয়েছিল। নরনারী,, এমন কি শিশুদেরকে পর্যন্ত স্বর্গের থেকে অব্যবহিত পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে প্রলুব্ধ করা হত।

www.amarboi.org

ইসলামের এসব শত্রুদের বিরুদ্ধে মোকাবিলার উদ্দেশ্য রক্ষণশীল শক্তিসমূহকে প্রাণবন্ত করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। যখন আশারিয়া মতবাদ কঠোর আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয়েছিল, তখন জনগণের মধ্যে মরমীবাদী মতবাদ অবাধ স্বেচ্ছাচারিতার রূপ নিয়েছিল। প্রত্যেক নরনারী ধর্মের অনুশীলনে বিরক্তিবোধ করে সুফীবাদে, নিয়ম-নিরপেক্ষ জীবনে পাড়ি জমাত। বাইরের ও ভেতরের শত্রুদের ভীতি-সন্ত্রস্ত মনে দার্শনিক যুক্তিবিন্যাস তাৎক্ষণিক কোন সান্ত্বনা আনয়ন করতে পারেনি। নৈতিক ধারণার দিক দিয়ে সাধারণ শৈথিল্য এবং আদর্শের দিক দিয়ে বিস্ময়কর অধঃপতন দেখা দিয়েছিল, ইসলামের ঠিক এই সংকটময় মুহূর্তে আল্লাহতে মরমীবাদী জীবনের ও সর্বশক্তিমানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে ব্যক্তি-আত্মার সত্যানুরক্তির প্রতি আল্ গাজ্জালীর আহ্বান বহু বিক্ষিপ্ত হৃদয়ের তারে প্রতিক্রিয়ার সুর তুলেছিল। এই আহ্বান মানসিক চাপ হ্রাস করেছিল এবং রক্ষণশীল ধর্মমতকে এমন একটি হাতিয়ার দিয়েছিল যার সাহায্যে হাসান বিন সাব্বাহর শিষ্যদের ধ্বংসাত্মক শিক্ষাসমূহকে প্রতিহত করা গিয়েছিল।[২৯]

এটা বিশ্বনিয়ন্তার বিধান যে, সেখানে ধর্ম আনুষ্ঠানিকতায় পর্যবসিত হয় সেখানে আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা জাগ্রত করার জন্য বিপরীত স্রোতের সৃষ্টি হয়। 'দি ফোর রানার্স এণ্ড রাইভাল্স অব ক্রিশ্চিয়ানিটি' গ্রন্থের লেখক যেসব লোক তাদের জ্ঞানানুসারে প্যালেস্টাইনের পুরাতন ধর্মমতকে প্রাণবন্ত করার চেষ্টা করেছিলেন তাদের প্রত্যেকের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একমাত্র নাজারাতের প্রেরিতপুরুষ ইসরাইলদের জাতীয় খোদার স্থানে স্পিরিটের উপাসনার জন্য মিষ্টিক আহ্বানের মাধ্যমে ইহুদী ধর্মের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন।

আল্ গাজ্জালীর পূর্বে সংস্কারক ইমামগণ ছাড়াও অন্যান্য স্বজ্ঞাবাদী আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অব্যবহিত পূর্বে এসেছিলেন আস্ সার্রাজ ও আল্ কুশাইবী।[৩০] কিন্তু আল্ গাজ্জালী তাদের গ্রন্থের উপর প্রতিযোগিতার প্রস্তর স্থাপন করেন এবং সুন্নী মযহাবকে আশারিয়া নির্বিচারবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করেন।

স্বয়ং আল্ গাজ্জালী-কথিত তাঁর জীবনের প্রচেষ্টা ও দুর্দশা, সংশয় ও আশা এবং পরিশেষে "অন্ধকার থেকে আলোকে" উত্তরণের কাহিনী আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের এক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ। এই বিকাশ ধারা বৈরাগ্যবাদে পরিসমাপ্তি লাভ করেছিল যা বহু সংশয়—কণ্টকিত হৃদয়ে এনে দিয়েছিল সান্ত্বনা ও স্বস্তি।

আল্ গাজ্জালী ৪৫০ হিযরীতে (১০৫৮ খ্রি.) খোরাসানের মেশেদের নিকটবর্তী, তুস[৩১] শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশেষভাবে শক্তিশালী ও স্বাধীন মনের অধিকারী ছিলেন, কেননা তিনি তাঁর 'মানাকিজ' গ্রন্থে বলেছেন যে 'তকলিদ' বা সামঞ্জস্য বলে কথিত সব ধর্মমতের যে মাপকাঠি তা তিনি অতি অল্প বয়সেই বর্জন করেছিলেন। 'তকলিদ' বর্জন করে ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির অনুশীলনের জন্য একটি পথ বের করা সব যুগে ও সব ধর্মমতে ধর্মতত্ত্ববিদেরা নিরতিশয় পাপ বলে বিবেচনা করেছেন। সুন্নী মযহাবে সামঞ্জস্য বলতে চারটি মযহাবের যে কোন একটি মযহাবের

www.amarboi.org

মূলনীতিগুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বুঝায়। আল্ গাজ্জালী সপ্রশংস স্পর্ধার সঙ্গে বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ বিনা বিচারে মেনে নিতে অস্বীকার করেন।[৩২] কিন্তু তিনি সর্বদা নিজেকে শাফেয়ী মযহাবের বলে দাবী করতেন, এবং সেই মযহাবের মতবাদগুলি কম-বেশি মেনে চলতেন। ইবনে খাল্লিকান যথার্থই বলেন যে আল্ গাজ্জালী শাফেয়ী মযহাবের পণ্ডিত ছিলেন। "জীবনের শেষ প্রান্তের দিকে শাফেয়ী মযহাবের ভেতর তাঁর সঙ্গে তুলিত হওয়ার মতো কোন পণ্ডিত ছিলেন না।" বিশ বছর বয়সে আল্ গাজ্জালী তুস থেকে নিশাপুরে গমন করেন। ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দে মোঙ্গলদের দ্বারা বিধ্বস্ত হওয়ার পূর্বে নিশাপুর বিদ্যার বিরাট কেন্দ্র ছিল। এখানে তিনি নিজামিয়া কলেজে ইমামুল হারামায়েন আল্ জুয়াইনীর ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। তাঁর ভর্তির মাত্র কয়েক বছর পূর্বে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ৪৭৮ হিযরীতে (১০৮৪ খ্রি.) তাঁর (ইমামুল হারামায়েনের) মৃত্যু পর্যন্ত আল্ গাজ্জালী এই সাধক ইমামের নিকট অধ্যয়ন করেন। তখন আল্ গাজ্জালীর বয়স আটাশ। তিনি ছিলেন উচ্চাভিলাষী, শক্তিমান, মুসলিম জাহানের সর্ববিধ শিক্ষায় পারদর্শী। তিনি সেলজুক সুলতান মালিক শাহের প্রধানমন্ত্রী। নিজামুল মুলকের[৩৩] দরবারে গমন করেন। নিজামুল মুলক পাণ্ডিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার উদার পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে তাঁর চারপাশে জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে সমবেত করেছিলেন। তিনি তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের ব্যাপারে নবাগত উচ্চাভিলাষীর যোগ্যতা স্বীকার করেছিলেন। অত্যল্প কাল নিজের পারিষদে নবিশির পর তিনি বাগদাদের একটি কলেজে আল্ গাজ্জালীকে অধ্যাপনার পদ দান করেছিলেন। যেভাবে অধ্যাপক ও প্রভাষকসহ প্রত্যেক পদমর্যাদার উচ্চকর্মচারী এক কেন্দ্র থেকে অন্য কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হতেন তার চেয়ে অন্য কিছুই মুসলিম জাহানের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের অসাধারণ নিষ্ঠা কিংবা বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যে সেলজুক সুলতানগণকে প্রতিপত্তি স্থাপন করেছিলেন। তা এত সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করতে পারে না।

আল্ গাজ্জালী বাগদাদে ছ বছর কাল অধ্যাপনার কাজ করেছিলেন। স্কলাশটিক ধর্মতত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যার উপর তাঁর বক্তৃতা শ্রবণের জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থী সমবেত হত। ৪৮৮ হিযরীর (১০৯৫ খ্রি.) শেষের দিকে সাংঘাতিক স্নায়বিক দৌর্বল্যের ফলে তিনি বাগদাদ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। যেসব বিষয়ে তিনি বক্তৃতা প্রদান করতেন তা তাঁর নিজ মযহাবের সমর্থক ও প্রচারকদের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ শক্তিশালী করে তুলেছিল। বুদ্ধিবাদ ও যাজকতন্ত্রের তুলনামূলক গুণাবলীর বিষয়ে এক পক্ষকাল চিন্তা থেকে অবসর গ্রহণের পর আশারিয়া চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আত্মার শান্তি খুঁজে পেতে আল্ গাজ্জালীর দশ বছর সময় লেগেছিল। তিনি নিজেই বলেছেন যে, তিনি সেই শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন হযরতের বাণীর মধ্যে, যা তিনি প্রত্যাদেশের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছিলেন, যা বিশ্বস্রষ্টা সব খোদাপ্রেমিকে মঞ্জুর করে থাকেন। দীর্ঘ পর্যটনের সময়ে তিনি প্রত্যেকটি বিদ্যাপীঠ, প্রত্যেকটি স্কলাশটিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছিলেন সেসব জায়গায় তিনি

www.amarboi.org

পুণ্যাত্ম ব্যক্তিদেরকে পার্থিব ও অপার্থিব, সব ধরনের জ্ঞান-চর্চায় ব্যাপৃত দেখতে পান। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের তাণ্ডব নৃত্য জেরুজালেমের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল (শাবান ৪৯২ হি.[৩৪]) তার অব্যবহিত পূর্বে তিনি সেখানে অবস্থান করছিলেন। প্রতীয়মান হয় যে তিনি দামেস্কে সবচেয়ে দীর্ঘসময় অতিবাহিত করেছিলেন। সেখানে তিনি নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত প্রধান মসজিদের এক কোণে বক্তৃতা দিতেন। মসজিদের এই নিভৃত কোণ এখনও 'ইমাম আল্ গাজ্জালীর জাভিয়া, নামে কথিত হয়। যখন তাঁর দীর্ঘ সফর শেষে তিনি নিশাপুরে ফিরলেন তখন তাঁর বয়স হয়েছিল আটচল্লিশ বছর। জীবনের সেই মধ্যাহ্নে তিনি অবসন্ন ও পরিশ্রান্ত, যদিও তিনি যা চেয়েছিলেন তাই-ই পেয়েছিলেন— আল্লাহর জ্ঞান ও আত্মার শান্তি। তাঁর মহান ও উদারহৃদয় পৃষ্ঠপোষক নিজামুল্মুলক, হাসান সাব্বাহর বিশ্বাসঘাতক সঙ্গী, একজন ইসমাইলিয়া ফিজাই কর্তৃক ৪৮৫ হিযরীতে (১০৯২ খ্রি.) নিহত হন। আল্ গাজ্জালী তখনও বাগদাদে বক্তৃতা করতেন।

মালিক শাহ্ তাঁর সাম্রাজ্যের লৌহমানব, তাঁর বিশ্বস্ত কর্মচারীর নিহত হওয়ার ছ মাস পরেই মৃত্যুবরণ করেন। মালিক শাহের অন্যতম পুত্র সনজর, তুঘ্রিল ও আল্প আরস্লানের সঙ্কুচিত সাম্রাজ্যের শাসনকার্য চালাতেন এবং নিজামুল মুলকের এক পুত্র ফখরুল মুলক এ সময়ে সনজরের অধীন প্রধানমন্ত্রীর কার্য পরিচালনা করতেন। তাঁর প্রখ্যাত পিতার মতো তিনিও ছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক। ফখরুল মুলক অবিলম্বে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে নিশাপুরে মায়মুসিয়া নিজামিয়া কলেজে[৩৫] উচ্চ অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করলেন। এখানে শুরু হল উৎপাদনক্ষম মনের বিস্ময়কর ক্রিয়া যা ইসলামের আবেগধর্মী ও মরমী দিকের উপর তার স্বাক্ষর মুদ্রিত করে গিয়েছে।

'মুনকিজ্ মিন্ আজ্ জালাল' (অন্ধকার থেকে নিষ্কৃতি)[৩৬] স্পষ্টতই এই সময়ে রচিত। এই গ্রন্থখানি কথোপকথনের আকারে রচিত। এতে তিনি তালেবীন বা সত্যান্বেষীদেরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। প্রথম শ্রেণী হল নির্বিচারবাদী আশারিয়া যুক্তিবাদী (আশারিয়া মুতাকাল্লিমুন); তাদের ধারনাসমূহ তারা "অবরোহাত্মক অনুমান" (রায়) ও "অনুধ্যানমূলক চিন্তার" (নজর) উপর ন্যস্ত করেন। তাদের অসন্তোষজনক নির্বিচারবাদ পরিমিত সমালোচনার মাধ্যমে নির্মূল করা হয়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বাতেনীয় বা ইসমাইলিয়া[৩৭] যারা একজন "জীবন্ত ইমাম" থেকে তাদের জ্ঞান আহরণ করেন বলে স্বীকার করেন। 'ইখওয়ানুস্ সাফা'র গ্রন্থকারগণসহ দার্শনিকদের ধারণাসমূহ যা দর্শন সংগ্রহ ছাড়া কিছুই নয়—তা পরীক্ষা করার পর আল্ গাজ্জালী 'তালেমীয়দের' অর্থাৎ ইসমাইলীয়দের শিক্ষাসমূহের নির্মম সমালোচনা করেন এবং তাদের অনৈসলামিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেন। তারা জীবন্ত ইমামের অনুসরণ করেন এই উক্তির উত্তরে তিনি বলেন, "হযরত রয়েছেন, কাজেই কেন আমরা অন্য নেতার অনুসরণ করব?"[৩৮] তিনি আরও যোগ করেন যে, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসী ধর্মবিরোধী জনগণের মধ্যে এতদূর সফলতা লাভ করতে পারত না, যদি তাদের প্রতিপক্ষগণ বির্তকে শক্তিহীন না হত। চতুর্থ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হল সুফী, স্বজ্ঞাবাদী—"আলোক ও অভিব্যক্তির সমর্থক।" অন্য ভাষায়, তারা

www.amarboi.org

সত্য দেখতে পান যেখানে অন্যান্যরা প্রজ্ঞার মাধ্যমে ঐশী উপাদান অনুধাবন করেন। মসুলে আল্ গাজ্জালীর অল্পকাল পরে যিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের রচনা করেছিলেন সেই ঐতিহাসিক ইবনুল আসিরের মতে, 'ইহ্ইয়া-উল-উলুম'[৩৯] (জ্ঞানের পুনরুজ্জীবন) ইমাম আল্ গাজ্জালী নিশাপুরে প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই লিখেছিলেন। এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে; তবে এই গ্রন্থ তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। 'ইহ্ ইয়া-উল-উলুম' সুফীবাদের দর্শন নীতিশাস্ত্রের বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত বিশ্বকোষ।

আল্ আশারী অস্তিত্বের রহস্য বিষয়ক সব জিজ্ঞাসাকেই নিন্দনীয় বলেছেন। যদিও দার্শনিক ও দর্শন, বুদ্ধিবাদ ও তার আদর্শ সম্পর্ক সমভাবে নির্বাচারবাদী, তথাপি আল্ গাজ্জালী এসব দিকে দৃকপাত করেছেন; এসবের মূল্যায়ন করেছেন এবং অভাবজ্ঞাপক দেখেছেন; তাঁর মতে যে লক্ষ্যে মানবতা প্রয়াস চালাচ্ছে সেদিকে এদের সীমাবদ্ধতা দেখেছেন। আর এর চেয়ে অধিক যা তা হল, একই ধর্মের অনুসারী[৪০] হিসেবে তিনি তাদেরকে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন। এটা বিচিত্র যে পরবর্তী যুগসমূহের শ্রেষ্ঠ মরমীবাদীগণ তাঁর সম্পর্কে কমই উল্লেখ করেছেন। জালালউদ্দীন রুমী, আত্তার ও সানায়ীর গুণকীর্তন করেছেন, কিন্তু আল্ গাজ্জালীর অতীন্দ্রিয়বাদের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেননি। একি এজন্য যে তিনি ইসলামের যে আবেগধর্মী দিকের প্রতি জোর দিয়েছিলেন তা ধর্মযোদ্ধারদের সঙ্গে প্রায় দু'শ বছরব্যাপী জীবন-মরণ রণে তার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল বলে? পশ্চিম এশিয়ায় খ্রিস্টানদের আক্রমণের অব্যবহিত পরে মধ্য এশিয়ায় মোঙ্গলদের দুর্ধর্ষ বাহিনী তার ধ্বংসপথে সভ্যতা ও সংস্কৃতির শেষ চিহ্নটুকু মুছে দিয়ে গিয়েছিল। বাগদাদ লুণ্ঠনের পরে যে দীর্ঘ অমানিশা নেমে এসেছিল তার মূলে ছিল এই খ্রিস্টান-আক্রমণ। এটা অসম্ভব নয় যে তাঁর মৃত্যুর অনতিদীর্ঘকাল পরে যে মহা-সমর ইসলাম জাহানের উপর নিপতিত হয়েছিল তাতে তাঁর আদর্শ ও বাণীর শক্তি নীরস হয়ে পড়েছিল। তথাপি সর্বশক্তিমান আল্লাহর সঙ্গে যোগস্থাপনের বিশ্বাস, তার বাসনা ও অনুভূতির তীব্রতা প্রকৃত নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ শিষ্যদের হৃদয়ে স্থায়ী হয়েছিল; দার্শনিক ও বুদ্ধিবাদীরা প্রজ্ঞার মাধ্যমে যা পেয়েছিলেন আরিফগণ তার দর্শন লাভ করেছিলেন বলে দাবী করেছেন। আল্ গাজ্জালীর মরমীবাদী দর্শনের আবেগধর্মী অংশ দরবেশদের আশ্রমে স্থান পেয়েছিল; জাভিয়া, রাবাত[৪১] ও খানকাহ্[৪২] সর্বত্র গড়ে উঠেছিল। যে সব পূণ্যাত্মা ব্যক্তি অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি দাবী করেছিলেন—যে দৃষ্টি প্রজ্ঞার আওতার বাইরে, তারা নিজেদের আবাস স্থাপন করেছিলেন, শিষ্যগণ তাদের চারপাশে ভিড় জমাত; তারা তরিকা স্থাপন করেছিলেন এবং তাদের শিষ্যদেরকে মরমী জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তাদের অনেকেই অকপট ও সত্যানিষ্ঠ ছিলেন, কেউ কেউ ছিল জালিয়াত। এই প্রথম শ্রেণীর প্রভাব (যখন স্থায়ী হত) ছিল নিঃসন্দেহে হিতকর; বিভিন্নমুখী প্রবণতাসহ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রভাব ছিল বিশৃঙ্খলাপূর্ণ।

আল্ গাজ্জালীর নির্বিচারবাদী ধর্মতত্ত্বের (কালাম) উপর আস্থা ছিল না,এবং তিনি এক প্রজ্ঞার বিরোধী বলে পরিত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু যথার্থ বিজ্ঞানসমূহ; অঙ্ক, জ্যামিতি

www.amarboi.org

ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে তিনি সম্পূর্ণরূপে অপ্রতিরোধ্য এবং সন্দেহ বা বির্তকের অতীত বলে বিবেচনা করতেন। নিশাপুরে তিনি আর যেসব গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তার মধ্যে ছিল: 'মাকাসিদুল ফালাসিফা' (দর্শনের উদ্দেশ্য), এবং 'তাহ্ ফাতুল ফালা সিফা' (দর্শন খণ্ডন)—এ দু'খানি গ্রন্থই দর্শন এবং দার্শনিকদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত—এতে তিনি দার্শনিক যুক্তিবিন্যাসের নিরর্থকতা ও দর্শনের শিক্ষার অসন্তোষজনক বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করার প্রয়াস পান।

৫০০ হিযরীর মহররম মাসে সুগঠিত সমাজের চিরশত্রু পবর্তের বৃদ্ধ, হাসান সাব্বাহর একজন গুপ্তঘাতকের হাতে পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধু ফখরুল মুলক আলীর[৪৩] হত্যাকাণ্ডের পর মর্মাহত হৃদয়ে আল্ গাজ্জালী তাঁর নিজ শহর তুসে অবসর গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি তাঁর ছাত্রদের জন্য একটি মাদ্রাসা ও শিষ্যদের জন্য একটি খানকাহ্ প্রতিষ্ঠিত করেন। এখানে তিনি বক্তৃতা করতেন এবং তাঁর রচনা বিষয়ে কঠোর পরিশ্রম করতেন—এই কাজ ইসলাম জাহানে তাঁকে বিরাট ব্যক্তিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছিল। ৫০৫ হিযরীর ১৪ই জমাদিউস্ সানী (১১১১ খ্রি. এর ১৮ই ডিসেম্বর) সোমবারে এই মহান সুফী পরলোকগমন করেন।

তাঁর জীবনাবসানে এমন ব্যক্তিত্বের তিরোধান ঘটল, যিনি তাঁর মরমীবাদী চিন্তাধারা সত্ত্বেও বিশেষভাবে শক্তিশালী চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রভাব তাঁর মৃত্যুর পরও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। শাফেয়ী মযহাবের অনুসারী হিসেবে ইমাম আল্ গাজ্জালী ইমাম আবু হানিফার তীব্র বিরোধী ছিলেন, তিনি মনে হয় কিয়াস (সাদৃশ্য অনুমান) ও ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা[৪৪] যাকে ইমাম আল্ গাজ্জালী উৎসাহিত করেছিলেন, কঠোরভাবে অননুমোদন করেছেন। একদিক দিয়ে মিষ্টিক ইমাম তাঁর বৈরাগ্যের দ্বারা মুসলমানদের ধমনীর রক্ত শীতলকরে দিয়েছিলেন এবং তাদের অগ্রগতি ও ক্রমবিকাশের শক্তি[৪৫] রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন, অপরদিক দিয়ে তিনি আশারিয়া সম্প্রদায়কে ভাববাদে অভিষিক্ত করেছিলেন যা এই সম্প্রদায়ের চিন্তার মধ্যে ছিল না।

যেখানে যাজক ও আইনবিদেরা ধর্মীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে সেখানে ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি বলবৎকরণের ও প্রচলিত মতের সঙ্গে বিরোধিতা দমনের ইচ্ছা প্রত্যেক ধর্মীয় জীবনব্যবস্থায় অভিশাপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। ইসলাম এ থেকে অব্যাহতি পায়নি, যদিও ইসলাম 'বেদাতী' (নব্যপন্থী)-দের চেয়ে 'অবিশ্বাসীদের' প্রতি কম কঠোর মনোভাব পোষণ করে থাকে। গোঁড়া মুসলমানেরা এদেরকে 'আহলুল্ বিদা' বলে থাকেন। যেসব লোক আধ্যাত্মিক সমুন্নতিতে ভোগেন কিংবা যাদের মন সাতিশয় আত্মনিগ্রহ দ্বারা বিকল তারা বুদ্ধিবাদী ও সংস্কারকদের সঙ্গে নির্যাতনের শিকার হয়ে থাকেন। মরমীবাদের ইতিহাস[৪৬] মনুসর আল্ হাল্লাজের কাহিনী অত্যন্ত মর্মন্তুদ। ফেরদৌসীর মতো ফরিদউদ্দীন আত্তার মুহম্মদের বংশধরদের সমর্থক ছিলেন; অধিকন্তু তিনি ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর সুফী। 'মাজহারুল আজায়েব'[৪৭] গ্রন্থে আত্তার তাঁর জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, জন্মস্থান তুস থেকে নির্বাসিত হওয়া; তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ

www.amarboi.org

এবং পরবর্তীকালে বিদেশ ভ্রমণের বিবরণ দিয়েছেন। অনেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন; অনেককে মৃত্যুর পর শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তাদের রচনাবলী আগুনে ভস্মীভূত করা হয়েছে। এমনকি আল্ গাজ্জালীর 'ইহ্ইয়া উল্ উলুম', একদা আরবের সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র কর্দোভাতে একই ভাগ্য বিপর্যয়ের অধীন হয়েছে।[৪৮] কিন্তু এই দমনমূলক-প্রক্রিয়া মরমীবাদী ধর্মমতের প্রসার বন্ধ করতে সফলতা লাভ করেনি। প্রত্যেক পুণ্যাত্মা ব্যক্তি যাঁর চারদিকে শিষ্যরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা সাধুপুরুষ বা 'ওলী'তে পরিণত হয়েছিলেন। সাধুপুরুষ/ তাপসদের প্রতি অলৌকিক ক্ষমতা আরোপিত হয়েছে। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকাংশ প্রসিদ্ধ সুফীগণ, যাঁরা এখন প্রথম শ্রেণীর ওলীদের অন্তর্ভুক্ত যেমন জুনায়েদ ও বায়জিদ, তীব্রভাবে অলৌকিক কার্যের অনুশীলন নিরুৎসাহিত করেছিলেন, তথাপি 'তাজকিরাতুল আউলিয়া'এবং 'নাফাহাতুল উন্স' তাপসদের অলৌকিক ক্রিয়ার সবিশেষ বর্ণনা দিয়েছে। এই অলৌকিক ক্রিয়ার নাম 'কারামত', আল্লাহ প্রদত্ত শক্তির সাহায্যে এই ধরনের ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। আজকাল "মানসিক প্রভাব"-এর প্রতি সম্ভবত এসব ক্রিয়া আরোপিত হতে পারে। 'তাসিরুল্ আনজার'-এর আওতাভুক্ত সম্মোহন, এবং টেলিপ্যাথি বা ভাবের যোগাযোগ বহুকাল ধরে প্রাচ্যে পরিবিদিত। এর কিছু কিছু কাজ নির্জ্ঞান সম্মোহনের ফল।

সুফীবাদ দ্রুত ইরাক ও পারস্য থেকে ভারতবর্ষে প্রবেশ লাভ করল এবং সেখানে অনুকূল পরিবেশ লাভ করল। বহু সংখ্যক সুফী সাধক-সাধিকা হিন্দুস্থান ও দাক্ষিনাত্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের জীবদ্দশায় পবিত্রতা ও কল্যাণকর কাজের জন্য খুব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের সমাধি অদ্যাবধি মুসলমানদের নিকট, এমন কি হিন্দুদের নিকটও, তীর্থভূমি হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে।[৪৯] এসব তাপস তাদের প্রতিষ্ঠিত কলেজ বা খানকায় যাঁরা সমবেত হতেন তাদেরকে ইসলামী খোদাতত্ত্ব ও সুফী জীবনপদ্ধতি শিক্ষা দিতেন। তাঁরা তাঁদের উত্তরাধিকারীদের মতো "সাজ্জাদানশীন[৫০]" বলে অভিহিত করেন। তাঁরা যথার্থই আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। পাশ্চাত্যে তাঁদেরকে বলা হয় শেখ। ভারত বর্ষে 'পীর' বা 'মুর্শীদ'—এবং তাঁদের শিষ্যগণ 'মুরীদ' নামে পরিচিত। পীরের মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী তাঁর শিষ্যদেরকে সুফী-তরিকায় দীক্ষাদানের সুযোগ লাভ করেন। তাঁদেরকে দীক্ষাদানের মুরীদ বানানোর ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দানের এই সুযোগ "সাজ্জাদানশীনদের অন্যতম ভূমিকা, যা তাঁরা সম্পাদন করেন কিংবা সম্পাদন করেন বলে অনুমান করা হয়। যেখানে পূর্ব পুরুষদের দেহ সমাহিত রয়েছে সেই সমাধিস্তম্ভের তিনি তত্ত্বাবধায়ক, এবং আধ্যাত্মিক পরম্পরা তাঁর ভেতর দিয়ে প্রবহমান বলে অনুমান করা হয়। সমগ্র ভারতবর্ষে যেসব দরগাহ্ যা মাজার দেখতে পাওয়া যায় তা বিখ্যাত দরবেশদের সমাধি। তাঁরা জীবদ্দশায় সাধুপুরুষ বলে অভিহিত হতেন। তাঁদের কেউ কেউ 'খানকা' প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেখানে তাঁরা নিজেরা বাস করতেন এবং শিষ্যদেরকে সুফীমতবাদ শিক্ষা দিতেন। অনেকের খানকা ছিল না, তাঁরা যখন মারা যেতেন তাঁদের সমাধি দরগায় পরিণত হত। তাঁরা অনেকেই সুফী ছিলেন;

www.amarboi.org

তবে তাঁদের কেউ কেউ মিয়া রওশন বায়েজীদের[৫১] শিষ্য ছিলেন। তিনি আকবরের সময়ে জীবিত ছিলেন, তিনি একটি স্বতন্ত্র গুহ্য ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং প্রধান হিসেবে বিশিষ্ট পদমর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদেরকে দরবেশ বা 'ফকির' বলে অভিহিত করতেন এই অনুমানের উপর যে তাঁরা জগৎকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাঁরা আল্লাহর বিনীত দাস; তাঁদের শিষ্যগন তাঁদেরকে 'শাহ' বলে সম্মান দেখাত। যদিও ফার্সী শব্দ 'দরবেশ' ব্যুৎপত্তি ও অর্থের দিক দিয়ে মুসলিম সংস্কৃতিজাত, তবে দরবেশগণকে সবসময়েই পশ্চিম এশিয়ায় দেখা যেত। হিব্রুদের অপ্রধান প্রেরিত পুরুষগণ 'নবীয়ীন' বলে আখ্যায়িত হতেন, তারাই ছিলেন আধুনিক কালের 'দরবেশদের' একমাত্র আদর্শ। ব্যাপটিস্ট জন যেমন হেরোডের স্ত্রীর সামনে তাঁর দুঃসাহস প্রদর্শনের জন্য প্রাণ হারিয়েছিলেন, প্রাসাদে সুলতান ও যুবরাজদের চ্যালেঞ্জ করার জন্য তেমনি শত শত দরবেশ প্রাণ দিয়েছিলেন। এসব ভারতবর্ষীয় ওলীদের মধ্যে অন্যতম সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ওলী ছিলেন শাহ নিজামুদ্দিন আউলিয়া। তিনি গজনী থেকে এসেছিলেন এবং দিল্লীতে তাঁর সমাধি অবস্থিত। সেখানে তিনি দীর্ঘকাল বসবাস করেছিলেন। তিনি ১৩২৫[৫২] খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে কথিত আছে। খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্তী নিজামুদ্দিন আউলিয়ার পূর্বেই ভারতে এসেছিলেন বলে মনে হয়। তিনি ৬৬৩ হিযরীতে (১২৬৫ খ্রি.) আজমিরে ৯৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। ভারতবর্ষের সব অঞ্চল থেকে মুসলমান ও হিন্দু তীর্থযাত্রীরা আজমিরে অবস্থিত তাঁর সমাধি প্রাঙ্গনে গমন করেন।[৫৩]

অপর একজন ওলী বুরহানউদ্দীন সেন্ট্রাল ভারতের বুরহানপুরে সমাহিত। বুরহানপুর তাঁর নামানুসারে রাখা হয়েছে। শাহ কবীর দরবেশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফররুখ শিয়রের রাজত্বকালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি বিহারে সাসারামে সমাহিত আছেন। তাঁর একজন বংশধর এখনও তাঁর খানকার তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত আছেন। দিল্লীর পাঠান বাদশাহ, আলাউদ্দীন খিলজীর সভাকবি আমির খসরুকেও একজন সূফী সাধক[৫৪] বলে দাবী করা হয়।

পশ্চিমে দরবেশী তরিকা সবদিকে উদ্ভূত হয়েছিল। সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ তরিকাগুলির অন্যতম ও সম্ভবত সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী তরিকা হল "কাদেরিয়া" তরিকা। এই তরিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রখ্যাত সুন্নী সাধক শেখ মুহীউদ্‌দীন আব্দুর কাদির জিলানী (রঃ)।[৫৫] অপর এক তরিকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা জালালউদ্‌দীন রুমী—তাঁর উপাধি অনুসারে এই তরিকার নামকরণ হয় "মৌলবীয়া" তরিকা। সদস্যদের পূত ও পবিত্র চরিত্রের জন্য এই তরিকার খুব সুনাম আছে। "নকশাবন্দিয়া তরিকা অপর একটি শক্তিশালী তরিকা। ভারতে এই তরিকার অনুসারী সমধিক।

কিন্তু খুব কম লোকেই সাধক হতে পারে, আর তার চেয়েও স্বল্প সংখ্যক লোকে জীবনের প্রাত্যহিক কর্তব্য সমাধার সঙ্গে অভিনিবিষ্ট নিষ্ঠা সম্পন্ন পূত পবিত্র জীবনের সমন্বয় ঘটাতে পারে। বৃহত্তর মানবসমাজের নিকট জগৎ পরিত্যাগ করার এবং ঐশী

www.amarboi.org

চিন্তায় সম্পূর্ণ আত্মনিমগ্ন হওয়ার আহ্বান মানসিক নিষ্ক্রিয়তার প্ররোচক। মুসলিম জাতিসমূহের বর্তমান অবক্ষয়ের জন্য আশারিয়াদের আচার নিষ্ঠা ও সূফীদের বৈরাগ্য দায়ী। নিম্নের মরমী শিক্ষা একমাত্র একটি ফলোৎপাদন করতে পারে, তা হল বুদ্ধিবৃত্তিক পক্ষাঘাত ঃ—

রাজার মুকুট যেই আরোপিতে পারে ভিক্ষার ঝুলিতে
কঠিন বাস্তব যেই মুছে দেয় শিল্পীরতুলিতে
জীবনকে দেখে যেই অলীক রূপকথা হেন
সত্য-সিন্ধু পারে সেই পৌঁছে যায়, জেনো।

এখন আমি আল্ গাজ্জালীর সূফী-খোদাতত্ত্ব ও খোদাতাত্ত্বিক জীবনবোধ সম্পর্কে আলোচনায় ফিরে আসছি। নিশ্চয়ই তিনি সৃষ্টির রহস্যবিষয়ক একচেটিয়া কোন জ্ঞানের দাবী করেননি কিংবা তাঁর মতবাদসমূহ এত অধিক গুহ্য নয় বা পরবর্তী যুগের সূফীরা প্রচার করেছেন। আস্ সারাজের মতো তিনি জীবন সম্পর্কীয় এমন একটি পরিকল্পনা প্রস্তাব দিয়েছেন যা তাঁর বিবেচনায় জীবনের চরম লক্ষ্য—"আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন ও আল্লাহ্র সন্দর্শনে চরম শান্তি লাভের জন্য সত্যকার পথ (তরিকা)। কিন্তু এই তরিকার উপর তাঁর গুরুত্ব আরোপের মূলে রয়েছে তাঁর ব্যাপকতর সৃষ্টিতত্ত্ব সুতরাং এর অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। সমগ্র প্রকৃতি ও সমগ্র অস্তিত্ব সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ সৃষ্টি—তাঁর এই উক্তি কোরআনে যা বলা হয়েছে তারই প্রতিধ্বনি। তাঁর মতবাদ ব্যাপকতর হতে শুরু করেছে যখন তিনি বিশ্বজগৎ সম্পর্কে তাঁর ধারণা বলতে শুরু করেছেন। তিনি সমগ্র সৃষ্টিকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন : দৃশ্যমান জগৎ ও অদৃশ্য জগৎ, দৃশ্যমান জগৎ (আলামুল মুলক) জড়জগৎ, বিবর্তন, পরিবর্তন ও বিকাশের অধীন। এখানে তিনি বুদ্ধিবাদীদের (মুতাজিলাদের) সঙ্গে একমত।

যে অদৃশ্য মনুষ্য-ইন্দ্রিয়ের অগম্য অর্থাৎ যে জগৎ ইন্দ্রিয়াতীত তাকে তিনি দু'ভাগে ভাগ করেছেন : (১) 'আলামুল জবারুত[৫৬]—এই জগৎ বিশুদ্ধ জড় ও বিশুদ্ধ শক্তির জগতের মধ্যবর্তী, এটা সম্পূর্ণ জড়াত্মক নয়, আবার সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম নয়—এতে উভয়ের ধর্ম বিদ্যমান রয়েছে। প্রাকৃতিক শক্তিগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। যদি আল্ গাজ্জালী আমাদের যুগের লোক হতেন তবে তিনি রঞ্জনরশ্মির গুণাবলীর মতো আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহের কোন কোন বিষয়কে 'আলামুল জবারুতে'র অন্তর্ভুক্ত করতেন। সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ঐশী জগৎ—'আলামুল মালাকুত'[৫৭] তাঁর মতবাদের সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক অংশ। 'আলামুল মালাকুত' 'ধারণা'র জগৎ" মানুষের আত্মা এই জগতের অন্তর্ভুক্ত। এ তার আদি আবাসভূমি থেকে স্ফুলিঙ্গ বিশেষ এবং যখন তার পার্থিব বন্ধন ছিন্ন হবে তখন তা তার নিজস্ব নিকেতনে ফিরে যাবে।

এই যে বিভাগ এটা আল্ গাজ্জালী কোরআন থেকেই অনুমান করেছেন। সাদৃশ্যমূলক অনুমানের প্রতি তাঁর যে ঘৃণা তা তাঁকে প্রচলিত অবরোহমূলক পদ্ধতিতে অনুমান করার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এইতত্ত্ব কিংবা এই বিভাগ মোটেই

www.amarboi.org

নতুন নয়, কেননা 'উয়ুনুল মাসায়েল'[৫৮] গ্রন্থে ফারাবী এই ধরনের মতবাদ উপস্থাপিত করেছেন। মুতাজিলাদের মতে 'মীজান' (দাঁড়িপাল্লা যাতে মানুষের কার্যাবলীর ভাল মন্দ ওজন করা হবে), (লেখনী) এবং 'লওহ' (সংরক্ষিত স্থান যেখানে আল্লাহর অধ্যাদেশ লিখিত আছে) রূপক। পূর্বেই বলা হয়েছে যে আশারী এগুলিকে বাস্তব ও বস্তুগত বলেই ঘোষণা করেছেন। ইমাম আল্‌ গাজ্জালী অন্য পন্থা অবলম্বন করেছেন; তিনি এগুলিকে 'আলামুল মালাকুত' বা ধারণার জগতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এভাবে তিনি যাজকীয় মতবাদের সঙ্গে তাঁর "অন্তরালোক মতবাদ" ও মানুষের আত্মার উর্ধ্বগতির বাসনার সঙ্গে সমন্বিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।

কোন কোন চরমপন্থী সুফী বিশ্বাস করেন যে যখন আল্লাহর চূড়ান্ত নৈকট্য অর্জিত হয় তখন মানুষের আত্মা আল্লাহতে অবলুপ্ত হয়। একে 'হুলুল্‌' বা অবলুপ্তি এবং কোন কোন সময় 'ইত্তিহাদ' বা মিলন বলা হয়। কিন্তু আস্‌ সার্রাজ ও আল্‌ গাজ্জালী কঠোরভাবে এই সর্বখোদাবাদী মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন, যদিও প্রায়ই নৈকট্য বুঝাতে 'রিসাল' ও রিসালাত শব্দের প্রয়োগ করেছেন। এমন কি যখন সুফী 'ফানা ফিল্লাহ' (আল্লাহতে বিনাশন)—এর কথা বলেন তখন তিনি বুঝান না যে মানুষের আত্মা বিশ্ব আত্মার সঙ্গে মিয়ে যায়। আল্‌ গাজ্জালীর ধারণা তাঁর মহান পূর্বসূরীর ধারণার মতো। তা হল ব্যক্তির আত্মা বা রুহ্‌ আল্লাহর নির্দেশে আলামুল মালাকুত, নামক আল্লাহর নিকটতম জগৎ থেকে নির্গত হয় এবং জৈবিক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আবার তার আবাসে প্রত্যাবর্তন করে। এটাই কোরানিক ঘোষণা "আমরা তোমার কাছ থেকে আসি আর তোমার কাছেই ফিরে যাই"[৫৯] এর অর্থ।

মুতাজিলা, আশারিয়া ও আল্‌ গাজ্জালীর অনুসারীগণের মধ্যে মৌলিক বিষয়ে কোন পার্থক্য নেই; তাদের মতপার্থক্য ধর্মীয় মতবাদসমূহের দৃষ্টিকোণ নিয়ে। বুদ্ধিবাদীরা মনে করেন যে আল্লাহর জ্ঞান প্রজ্ঞার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব। তাঁরা বুদ্ধি বা প্রজ্ঞার প্রতি আবেদন করেন কেননা কোরআনে যে এক আল্লাহর উপাসনার প্রতি আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে তা প্রজ্ঞা-নির্ভর। আশারিয়াগণ বিশ্বাস করেন যেভাবে তাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে; সুফীরা বিশ্বাস করেন যেভাবে তাঁরা "অন্তরালোকে"র কথা বলেন। সুফীদের মতে, সত্যের অন্বেষণকারী তীব্র "আত্যান্তিকতা" ও আল্লাহর সঙ্গে যোগসম্পর্কের মাধ্যমে ক্রমিক স্তর/ মোকামগুলি অতিক্রম করতে করতে এমন জায়গায় পৌঁছতে পারেন যেখান থেকে তিনি প্রকৃতপক্ষে ঐশী বৈশিষ্ট্যের দর্শন লাভ করতে পারেন। নবিশির প্রথম পদক্ষেপ বা স্তর হল নিয়ত করা বা মনস্থ করা, তারপর আসে তওবা (অনুশোচনা ও পরিবর্জন)। এখন সে সম্মুখবর্তী পথে দণ্ডায়মান, একে বলা হয় 'মুজাহেদা' (প্রয়াস)। দীর্ঘকাল সাধনা করার পর তন্ময়প্রাপ্ত আত্মা তখনও আবরিত সর্বব্যাপী তাঁর সকাশে উপস্থিত হয়। হাফিজ এক ভাববিহ্বল মুহূর্তে এই স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন, সুফী পরিভাষায় একে বলা হয় 'মুহাযরা' বা 'হুযুরি'। এই স্তরে আত্মা আল্লাহতে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করে এবং জগতের যাবতীয় অসারতা পরিত্যাগ করে।[৬০] পরবর্তী স্তর হল

www.amarboi.org

"আবরণ-উত্তোলন" (মুখাশাফা)। যে আবরণ অদৃশ্য শক্তিকে আবরিত করে রাখে তা উত্তোলিত বা অপসৃত হয় এবং আল্লাহ্ ভক্তের হৃদয়ে ব্যক্ত হন। চূড়ান্ত বা সর্বশেষ স্তর হল 'মুশাহাদা' (সন্দর্শন) এই স্তরে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্ত আত্মা সত্যের সম্মুখীন হয় এবং "মানব হৃদয়ে" সত্যের আলোকসম্পাত ঘটে।

এমন কি প্রাথমিক স্তরে এক বস্তুর উপর সমগ্র চিন্তা নিবিষ্ট করার মনস্তাত্ত্বিক প্রয়াস মুরীদদেরকে অদৃশ্য বস্তু দর্শন করতে, ফেরেশতা ও প্রেরিত পুরুষদের বাণী শ্রবণ করতে এবং তাঁদের থেকে নির্দেশনা লাভ করতে সাহায্য করে থাকে। একেবারে একই ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সমুন্নতি সব যুগেই খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখা গেছে। সুফীদের পরিভাষায় যে সাধনা বা চেষ্টার বলে স্তর অতিক্রম করা হয় তার নাম 'হাল' বা তন্ময়তা। এটা একটা আনন্দাবস্থা বা বা বাসনাবস্থা। যখন সত্যান্বেষীকে এই অবস্থা পেয়ে বসে তখন তিনি গভীর তন্ময়তা বা ওয়্দ অবস্থায় নিমজ্জিত হন। খানকাতে দরবেশদেরকে এই গভীর "তন্ময় অবস্থায় পৌছার সাধনায় নিমজ্জিত দেখতে পাওয়া যায়।

সুফীদের মতে অন্তরালোকের মাধ্যমেই তাঁর নিকট আল্লাহর জ্ঞান আসে; বুদ্ধিবাদীরা ঘোষণা করেন যে প্রজ্ঞা থেকে তাঁর নিকট এই জ্ঞান আসে। এটা স্রষ্টার দান। কোরআন কি আল্লাহর সৃষ্টি ও প্রকৃতির রহস্য সম্পর্কে "চিন্তাভাবনা বিচারবিবেচনা করা"র জন্য নিয়ত মানুষের প্রজ্ঞা ও তার বুদ্ধির দুয়ারে আহ্বান জানায় না? যদি কোরআন বুদ্ধির অনুশীলনের ব্যাপারে নিন্দা করত তবে কি কোরআন মানুষকে প্রকৃতির বিস্ময়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করার জন্য পরামর্শ দিত এবং এই বিস্ময়কর জগৎ দৈবাৎ সৃষ্টি কিংবা তা সর্বব্যাপী বুদ্ধির সৃষ্টি—তা তাদেরকে ভেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপদেশ দিত? ধর্ম ও বুদ্ধিবাদ পরস্পর সম্পর্কিত ও গ্রন্থিবদ্ধ। যদি আমরা এমন কিছু দেখি যা দর্শনের ফলের সঙ্গে বিরোধিতাপূর্ণ বলে মনে হয়, তবে আমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে, যেখানে কোন মূলীভূত তাৎপর্য রয়েছে এবং বুদ্ধি দিয়েই তার রহস্য ভেদ করতে হবে। ইবনে রুশদ 'ফাসলুল মাকাল'[৬২] গ্রন্থে অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে এই বাক্যটি প্রকাশ করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই; ধর্ম আল্লাহর থেকে প্রত্যাদেশ; দর্শন মনুষ্যমনের চিন্তার ফসল। সুতরাং তিনি আল্ গাজ্জালীর ক্ষেত্র থেকে বহু দূরে নন। কারণ আল্ গাজ্জালী আশারীর মতো বিশ্বাস করতেন না যে পৃথিবী সমতল কারণ কোরআনে বলা হয়েছে "আল্লাহ্ জগতকে কার্পেটের মতো বিছিয়ে দিয়েছেন।" তিনি বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও গাণিতিক ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তারকা ও গ্রহ নিচয় পূর্ব-নির্ধারিত নিয়মাবলী অনুযায়ী পৃথিবীর চারিদিকে পরিভ্রমণ করছে। প্রকৃতির সর্বত্র সেই সর্বশক্তিমান, প্রদাতা ও সর্বজ্ঞের নিদর্শন বিদ্যমান। এরূপে তিনি ইবনে সিনা, ইবনে রুশদ ও সাধারণভাবে বুদ্ধিবাদীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। খুঁটিনাটি পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে আল্ গাজ্জালী আশারিয়া মতবাদকে কঠোর আচারনিষ্ঠা থেকে রক্ষা করেছেন এবং এর সঙ্গে এক সমুন্নত আবেগ-ধর্মিতা সংযোজিত করে এর মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছেন। তবে তিনি এসব দার্শনিকদের একই পথে বিচরণ করেছেন।

www.amarboi.org

সেনুসি ভ্রাতৃসংঘ[৬৩] কাদেরিয়াদের মতো ধর্মীয় তরিকা নয়, তবে নিঃসন্দেহে উত্তর ও মধ্য আফ্রিকার পরিমার্জনা ও উন্নতিকরণে ভ্রাতৃসংঘের শিক্ষার মধ্যে মরমীবাদী তাৎপর্য উদ্দীপিত করেছেন। সংগ্রাম ও প্রগতির জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন না করেও তারা তাদের দীক্ষিত ও শিষ্যদেরকে 'অন্তরালোকে'র কিছু পাঠ প্রদান করেছেন।

যে সমুন্নত ভাববাদ হযরতের বাণীতে, ইমামদের প্রচারণায় এবং "অন্তরালোকে"র ব্যাখ্যাতা, বুদ্ধিবাদী, দার্শনিক ও সুফীদের শিক্ষার মধ্যে অভিব্যক্তি লাভ করেছে তা ইসলামের শ্রেষ্ঠ মণীষীদের জীবনকে রূপায়িত করেছে ও তাদের কর্মসমূহকে অনুপ্রাণিত করেছে। ইমাদউদ্দীনের মতো বীর, সালাউদ্দীন বিন আইয়ুবের (ইউরোপীয় ইতিহাসে সালাদীন) মতো শাসকগণ ইসলামের মধ্যেই তাঁদের জীবনের নিয়ামক নীতি খুঁজে পেয়েছেন। সানায়ী, আত্তার ও জালালউদ্দীনের মতো কবিগণ সেই সার্বজনীন প্রেমের জোরালো অভিব্যক্তি ঘটিয়েছেন যা সৃষ্টির নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্তি হয়ে আছে; তাঁদের কবিতার প্রতি অনেক মুসলমান এত অধিক সম্মান ও সমাদর প্রদর্শন করেন যা কোরআনের প্রতি আরোপিত সম্মান ও সমাদরের তুলনায় সামান্য কম।

কিন্তু খ্রিস্টান জগতের মতো মুসলিম জাহানেও সুফীবাদ ব্যবহারিক দিক দিয়ে অনেক ক্ষতিকর ফল উৎপন্ন করেছে। নিখুঁত সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তির ক্ষেত্রে মরমীবাদ ভাবাবাদী দর্শনের মহত্তম রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ ঐশী সত্তার গুণাবলী এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিয়ে তাদের মস্তিষ্ক ঘামান না। মানবসমাজের অজ্ঞ ও অলস মহল প্রকৃত জ্ঞানকে অবজ্ঞা করে প্রকৃত দর্শনের ক্ষেত্র বর্জন করে, এবং মরমীবাদে নিজেদেরকে নীত করে। তারা নিজেদেরকে 'আহ্‌লে মারিফাত' বা তাসাউফপন্থী বলে দাবী করে থাকে। গাজ্জালীর সময়ে এ ধরনের ব্যাপার ঘটেছিল, তাঁর তীব্র অনুযোগের বলে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছিল। যে কৃষক তার কৃষিকাজ ছেড়ে দিয়ে "প্রগতিশীল লোকদের" সুবিধা দাবী করেছিল। বাস্তবিক অমার্জিত মরমীবাদের প্রতি বড় আপত্তি, সেটা ইসলামে হোক কিংবা খ্রিস্টান জাহানে হোক, তা হল—তা আসলে কোন ধর্ম নয়, যেখানে তা প্রচলিত হয় সেখানে মানবমনকে অব্যবস্থিত চিত্ত করে তোলে, সমাজের ভিত্তিকে দুর্বল করে এবং মানুষের শক্তিকে পঙ্গু করে; তা স্বাভাবিকভাবেই বস্তুতে ঈশ্বরত্ব আরোপ মতবাদ ও নৈসর্গিক খোদাবাদে পর্যবসিত হয়।

তথাপি ভাববাদী দর্শনের মহত্তম রূপ যে হিতকর প্রভাব দান করেছে তা উপেক্ষা করার নয়; ইবনে রুশদের ভাববাদ ইউরোপে সার্বজনীন ঐশীত্বের ধারণার বিকাশ সাধন করেছিল। খ্রিস্টান ইউরোপ তার আত্মগত খোদাবাদের প্রকাশ এবং তার ফলস্বরূপ পৌরণিক ধর্মমতের তীব্র জড়বাদ থেকে মুক্তির ব্যাপারে পাশ্চাত্য মননে মুসলিম ভাববাদের প্রতিষ্ঠার কাছে ঋণী। ইবনে রুশদের লেখনীর প্রভাবই চিন্তাশীল ব্যক্তিদেরকে জড়জগৎ ও মনোজগতের সম্পর্কবিষয়ক বিরাট সমস্যার দিকে আকর্ষণ করেছিল এবং সর্বব্যাপী শক্তির ধারণা তাদের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করেছিল, "যে শক্তি

www.amarboi.org

পাথরের মধ্যে সুপ্ত, প্রাণীর মধ্যে স্বপ্নবৎ ও মানুষের মানুষের মধ্যে জাগ্রত", "এমন একটি বিশ্বাস যে লুক্কায়িত জীবনীশক্তি বিভিন্ন ধরনের বস্তু ও সংগঠনের উৎস তা কেবল ঐশী সত্তার শিহরণ যা সবকিছুর মধ্যে বর্তমান।"

জোরের সাথে বলতাম আমি তিনি হন বিশ্ব-আত্মা
ভাল ক'রে জানতাম যদি দেহ-আত্মার সম্পর্কটা।
প্রত্যেকটি অণু মাঝে হাজির যে আছেন তিনি
দেখতে কেউ পায় না তাঁকে, লুক্কায়িত আছেন তিনি।

পাদটীকা

১. ১২৬০-১৩২৮ খ্রি.।
২. 'মানুষের সেবাই প্রকৃত ধর্মনিষ্ঠা' এই বিষয়ের ওপর 'মসনবীর একটি নীতিমূলক গল্পের সুন্দর ইংরেজি অনুবাদ করেছেন লেই হান্ট :
এভাবে কবিতাটি শুরু :
আবু বেন আদহেমের বংশ বাড়ুক দ্রুতগতি
একদা নিশীথে জাগিলেন তিনি ভাঙি সুপ্তি।...
৩. পরিশিষ্ট দেখুন।
৪. আল্লামনাহু মিল্লাদুন্না ইলমা। সু. ১৮ আ, ৬৫।
৫. মিশকাতুল্ আনওয়ার। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ রেনল্ড নিকলসন তাঁর 'মিস্টিক অব ইসলাম' গ্রন্থে এই হাদিসটি উদ্ধৃত করেছেন। সুফী সাহিত্যে এই গ্রন্থকারের জ্ঞান সমগ্র ইউরোপের অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তিনি এতে ক্ষুদ্র পরিসরে পারস্যের মরমীবাদের একটি প্রাঞ্জল সংক্ষেপ-সার উপস্থাপিত করেছেন।
৬. সামে 'আল্লাহ লেমান্ হামেদা—রাব্বানা লাকাল্ হাম্দ।
৭. 'নাহজুল বালাগাত'। নাহজুল বালাগাতের দু'খানা ভাষ্য রয়েছে—একখানা ইবনে আবিল হাজিদের রচনা; অন্যটি পারস্য ভাষায় লুৎফুল্লাহ্ কাশানীর লেখা। ইবনে আবিল হাজিদের পূর্ণ নাম শারহের সম্পাদকীয় নোটে "আবু হামিদ আবদুল হামিদ বিন হিবাতুল্লাহ্ বিন মুহম্মদ বিন মুহম্মদ বিন হোসাইন বিন আবিল হাজিদ" বলে উল্লিখিত। তিনি ৫৮৬ হিযরীতে (১১৯০ খ্রি. ডিসেম্বর) জিলহজ্জ মাসে মাদায়েনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন মুতাজিলা ও একজন শিয়া এবং সে সব উপাদি নোটের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর আইনবিশারদ ছিলেন; জ্ঞানবিজ্ঞানে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন; তিনি যুক্তিবিজ্ঞানী ও কবি ছিলেন; খলিফা নাসির ও জাহিরের অধীনে তিনি "দিওয়ানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইবনে খাল্লিকান (দ্য স্লেন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৩, জিয়াউদ্দীন ইবনুল আসিরের জীবনী) তাঁকে ইজউদ্দীনের আইনজ্ঞ ও একজন পণ্ডিত ব্যক্তি" বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু ইবনে আবিল হাজিদের বিখ্যাত গ্রন্থ, 'নাহ্জুল বালাগাতে'র ভাষ্য সম্পর্কে উল্লেখ করেননি। আর তিনি যে মুতাজিলা ও শিয়া ছিলেন, সে কথারও উল্লেখ করেননি। ইবনে আবিল হাজিদ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও উপাসনার কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে তিনি বিচারদিনে আল্লাহর চাক্ষুষ দর্শন সম্পর্কে আশারিয়া সম্প্রদায়ের অভিমত ব্যাখ্যা করেছেন।

www.amarboi.org

ইবনে আবিল হাজির ৬৫৫ হিযরীতে (১২৫৭ খ্রি.) মোঙ্গল কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংসের পূর্ব বছরে সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

৮. লুমাতুল বায়সা।

৯. সাহিফাই-ই-কামিলা।

১০. হযরত ও তদীয় প্রাথমিক শিষ্যগণ "রাত্রির বেশি সময়ে সাধন-ধ্যানে অতিবাহিত করতেন এবং দিনে জাগতিক কার্যাবলী সম্পাদন করতেন।" এভাবেই কাজ করতেন পঞ্চম উমাইয়া খলিফা, ওরম বিন আব্দুল আজিজ। সুতরাং অনেকের চেয়েই দরবেশ হিসেবে তিনি অধিকতর বিবেচিত হওয়ার যোগ্য ছিলেন।

১১. 'ইনসানে কামিল'।

১২. এই খণ্ডের অধ্যায়-৮দেখুন; আরও দেখুন 'এ শর্ট হিষ্ট্রি অব দি স্যারাসেন্স' পৃ. ৫২ ও ৭০।

১৩. খ্রিস্টধর্মে চটের বা চুল দিয়ে তৈরি কাপড় একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। 'খিরকা' দীর্ঘ বালিশের ওয়াড়ের মতো মিহি কাপড়। সুফীরা যে পশমী বস্ত্র পরিধান করেন তা থেকে তাদের নামকরণ করা হয়েছে; 'সুফ' শব্দের অর্থ পশম। 'আহ্‌লুস্ সাফ্‌ফা' যে সব ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি হযরতের মসজিদের বাইরে উপবেশন ও শয়ন করতেন এবং তাঁর কাছ থেকে খাদ্য গ্রহণ করতেন, তাদের সঙ্গে কিংবা 'ইখওয়ানুস সাফা' বা পবিত্রতার ভ্রাতৃসংঘের সাথে 'সুফী' শব্দটির কোন যোগসম্পর্ক নেই।

১৪. বর্ণিত হয়েছে যে আবু সায়েদ বিন আবিল খায়ের, যিনি সুফী সাহিত্যে উচ্চতর স্থানে অধিকার করে আছেন, হিন্দু যোগীদের মতো তাঁর মনকে তাঁর নাভি প্রদেশে নিবদ্ধ রাখতেন। ডঃ নিকলসনের 'স্টাডিজ ইন ইসলামিক মিষ্টিসিজম' (কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস) গ্রন্থে আবু সায়েজ বিন খায়েরের চমৎকার জীবনী সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রফেসর ই. জি. ব্রাউনের 'লিটারারী হিষ্ট্রি অব পারসিয়া' দেখুন। তিনি ইবনে সিনার সমকালীন বলে অভিহিত। তিনি ১০৪০ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

১৫. 'আল্ লুমা ফিত্ তাসাউফ'; তাসাউফ সুফীদের দর্শন। 'স্টাডিজ ইন ইসলামিক মিষ্টিসিজম'-এর রচয়িতা ডঃ নিকলসন সম্প্রতিকালে সাতিশয় যত্নসহকারে আস্ সার্রাজের 'লুমা' গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। 'নুরউদ্‌দীন আব্দুর রহমান জামীর (নাজা-হাতুল উন্‌স, কলিকাতা, সং পৃ. ৩১০) মতে আস্‌সার্রাজ সুফী সাধকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। জামার বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে তিনি একজন বিখ্যাত গাণিতিক ও নৈর্ব্যক্তিক বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। তিনি আল্ গাজ্জালীর প্রায় এক শ' বছর পূর্বে ৩৭৮ হিযরীতে (৯৮৮ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

১৬. 'আল্ লুমা', পৃ. ১২৯। জুনায়েদ ইসলামের একবারে প্রাথমিক পর্যায়ের সুফী ছিলেন। তিনি ২৯৭ হিযরী (৯১০ খ্রি.)-তে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন বলে কথিত আছে যে "সুফী মতবাদ" ইসলাম ও কোরআনের মতবাদের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে গ্রন্থিবদ্ধ।

১৭. আল্ ইল্‌মুল্ লাদুন্নিয়ো।

১৮. ভারতীয় কবি দবির আলীকে "আল্লাহর রহস্য পরিজ্ঞাতা" (রমুজদানে খোদা) বলে অভিহিত করেছেন।

১৯. এই গ্রন্থের ২য় খণ্ডের অধ্যায়-৯ দেখুন। আতার ৫৪৫ হিযরী (১১৫০ খ্রি.) জন্মগ্রহণকরেন এবং ৬২৭ হিযরীতে (১২২৯-১২৩০ খ্রি.) মোঙ্গলদের দ্বারা নিহত হন বলে বিশ্বাস করা হয়।

www.amarboi.org

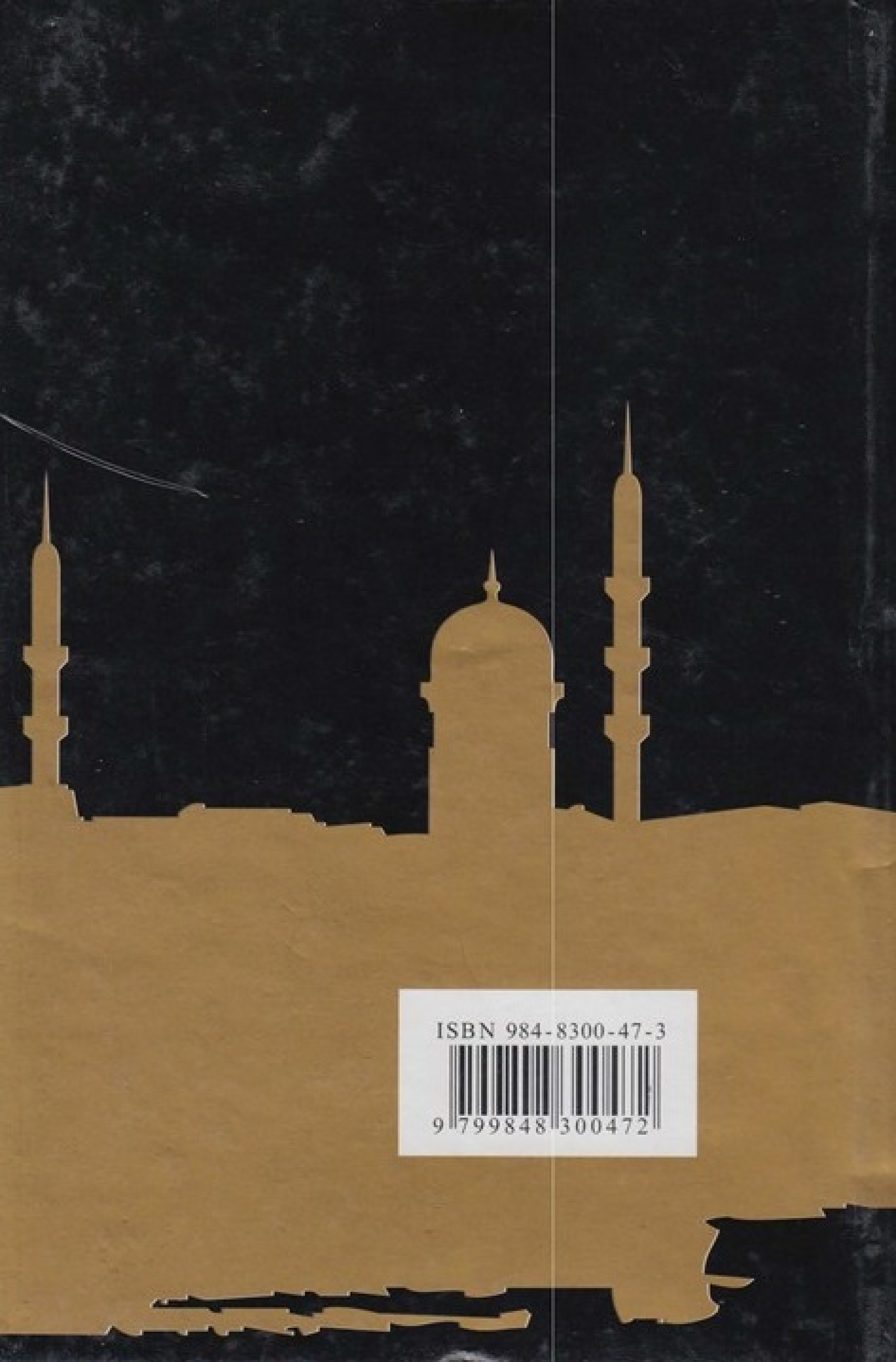

ISBN 984-8300-47-3
9 799848 300472